তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

প্রথম খন্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পারা

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা তালেব আলী
পুনর্লিখন ও সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

মুদ্রকঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৯৮ইং হিজরী, ১৪১৯
মিলাদুন্নবী স. উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত।

চতুর্থ প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০১০, মহররম ১৪৩১ হিজরী।

বিনিময় ঃ তিনশত সত্তর টাকা মাত্র।

TAFSIRE MAZHARI (Volume - I): Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi Rh. Translated by Maulana Taleb Ali and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh.

Exchange : Taka Three Hundred seventy only. US $ 20.00

ISBN 984-70240-0001-9

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

মহাকালের পথ ধরে মহাজীবনের পথে এগিয়ে চলেছে মানুষ। যাত্রা শুরু হয়েছে রূহের জগত থেকে। তারপর পৃথিবীর পথ। তারপর মৃত্যুর অনিবার্য তোরণ। তারপর অনন্ত জীবন। সে জীবনে রয়েছে চির-স্বস্তি অথবা চির-শাস্তি। ওই স্বস্তি ও শাস্তির বিষয়টি নির্ধারিত হবে পৃথিবীর কর্মকান্ডের উপরেই। তাই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনকে সংযত, শুদ্ধ ও পরিশীলিত না করে আমাদের উপায়ই নেই। ঔদাসীন্য ও স্বেচ্ছাচরণ তাই আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ।

মাটির মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের সীমা পরিসীমা নেই। অনন্ত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এই পৃথিবীতে তিনিই প্রেরণ করেছেন আমাদের প্রকৃত সুহৃদ নবী ও রসুলগণকে। এ হচ্ছে তাঁর অপার অনুকম্পা। তাঁদের মাধ্যমেই এসেছে জ্ঞান, প্রেম ও পথনির্দেশনা।

জ্ঞানের পথই প্রকৃত পথ। আর প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যাদেশসঞ্জাত জ্ঞান। মহাগ্রন্থ আল কোরআনই সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ। প্রত্যাদেশ (ওহী) আর আসবে না। সুতরাং শেষতম, শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ মহাজ্ঞানের আকর এই কোরআনুল করিমের দ্যুতিকেন্দ্রে এসে দাঁড়াতেই হয় সকলকে। বিশ্বাসীকেও। অবিশ্বাসীকেও। কিন্তু বিশ্বাসীরা পথ পায়। অবিশ্বাসীরা পায় না। বিকৃত বিশ্বাসীরাও পথে থেকে যায়। গন্তব্যের সন্ধান জানে না। আমরা যারা চাই জ্ঞানের উদ্বোধন, চাই পথ ও পথশেষের নির্ভুল সফলতা — তাদেরকে কোরআনকেন্দ্রিক মানস গঠন করতেই হবে। এর বিকল্প কিছু নেই।

অনস্তিত্বের অন্ধকারে আমরা আলো হয়ে ফুটেছি। কার দয়ায়? কার দানে? কার অভিপ্রায়ে? কার মহিমায়, কার পরাক্রমে নিশ্চিত হচ্ছে আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু, আমাদের জীবনোপকরণ। আমাদের রোদনে ও রহস্যে বার বার এ সকল প্রশ্ন নাড়া দিয়ে যায়।

অনুসন্ধিৎসার বিরল বাতাসে বার বার আন্দোলিত হতে হতে আমরা এখন এসে পড়েছি একবিংশ শতাব্দীর উপকূলে। সাথে করে এনেছি উত্তরাধিকার, অঙ্গীকার — মহাযাত্রার, মহাজীবনের। অভিজ্ঞানের অনন্ত অভিযাত্রা অকূল পাথারের হাতছানি হয়ে আমাদেরই জন্য অপেক্ষমান। যারা যাত্রী তারা কোথায়?

এসো মানবতা। এসো বেহেশত থেকে আগত প্রথম মানুষের রক্তপ্রবাহ। এসো শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অক্ষয় প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার — এসো গ্রহণ করি আমাদের সত্তার, আত্মার, পিপাসার পরিচয়। প্রত্যাদেশিত পাদপ্রদীপেই তো রয়েছে আমাদের প্রত্যয়িত প্রশ্রয়। সন্তাপবিহীন, স্খলনহীন আশ্রয়।

মূর্খতার তিমির ভেদ করে আমাদেরকেই হয়ে উঠতে হবে সূর্যোদয়সম জ্ঞানোদয়ের শাদা ভোর। তাজা প্রত্যুষ। শানিত সকাল। তাই এই অনন্য আধ্যাত্মিক উৎসব। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ অমর উদ্যোগ তাফসীরে মাযহারীর বঙ্গ-পদবিক্ষেপ।

বাংলাদেশের মর্মমূলে রয়েছে আল্লাহ্ প্রেম, নবী প্রেম ও অনন্তজীবনের প্রেম। কিন্তু হৃদয়ের এই অনাবিল আর্তিকে আমরা মান্য করেছি বড় বিলম্বে। নইলে প্রায় তিনশ' বছর আগের এই কালজয়ী সৃষ্টিকে এতদিন পরে বঙ্গ-দর্পণে ও দর্শনে প্রতিবিম্বিত হতে দেখবো কেনো?

তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা শ্রদ্ধার্হ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী র. ছিলেন প্রথিতযশা আলেম ও আরেফ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইনের অধস্তন বংশধর ছিলেন তিনি। ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের

হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ও বোদ্ধা। আর ছিলেন আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নেসবতে সিদ্দীকির (হজরত আবুবকর সিদ্দীক রা. এর আত্মিক সংশ্লিষ্টতার) রঙে পূর্ণ রঞ্জিত। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আরেফ হজরত মাযহারে শহীদ জানে জানা র. এর প্রিয় মুরিদ ও খলিফা ছিলেন তিনি। এভাবেই তিনি তাঁর প্রজ্ঞাকে করেছিলেন অধীত বিদ্যা (এলমে হুসুলী) এবং সত্তাসঞ্জাত বিদ্যার (এলমে হুজুরীর) অবাক সমাহার। তাই তাঁর বিবরণে রয়েছে একই সঙ্গে রহস্যের সুবাস, বুদ্ধির ঝলক এবং সুসিদ্ধান্তের সংশ্লেষ। তাফসীর শাস্ত্রের জগতে তিনি এনেছেন বর্ণনা পরম্পরার (রেওয়ায়েতের) সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির (দেরায়েতের) সম্মিলিত নির্ভরতা। তার সঙ্গে মিলিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টির (ফেরাসাতের) নিখুঁত পর্যবেক্ষণকে। তাই তিনি কালজ হয়েও কালোত্তর। অন্তরাল হয়েও স্মরণমুখর।

যারা স্থূলদর্শী এবং তাফসীর শাস্ত্রকে স্বকপোলকল্পিত মতবাদের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত তারা তো পেচকসদৃশ। সমুজ্জ্বল সূর্যালোক তাদের কাম্য নয়। তারা এ আলো এড়িয়ে চলতে চায়। তাফসীরে মাযহারীর বিলম্বিত বঙ্গায়নকেও তারা হয়তো শুভদৃষ্টিতে দেখতে নারাজ।

অন্তরের আলো ছাড়া কোনো বিষয়ের মূল প্রকৃতি অনুভবগ্রাহ্য হয় না। আলোকিত অন্তর্লোক ছাড়া সরল পথরেখা দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয় না। আর শ্রুতির আওতায়ও আসে না আল্লাহ্‌পাকের অমোঘ ঘোষণাটি — আলা লিল্লাহিদ্ দীনুল খলিছ (সাবধান হও -আল্লাহ্‌র জন্যই বিশুদ্ধ ধর্ম)। এই অন্তর্লোকের প্রবহমানতাকে যথামান্যতা দিয়েছেন আমাদের সম্মানিত তাফসীরকারক। তাফসীর গ্রন্থটির নামকরণে মুদ্রিত রেখেছেন তাঁর পীর কেবলা ও কাবা'র নাম। কারণ, প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী ছিলেন তিনি। পীর ও মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্ ব্যতিরেকে যে মানুষের জ্ঞানকেন্দ্রের সম্ভাবনার পূর্ণউন্মোচন ঘটেনা — তা তিনি জানতেন। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ হজরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সংস্কার প্রবাহের এক বিরল বিকাশকে তাঁর মাধ্যমে বিকশিত হতে দেখেছি আমরা। সেই মহান মোজাদ্দেদের খলিফা ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী — তাঁর খলিফা খাজা সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী — তাঁর খলিফা খাজা নূর মোহাম্মদ বদাউনি এবং তাঁর খলিফা ছিলেন মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

আমরা আমাদের অযোগ্যতাকে স্বীকার করেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এই জ্ঞানগর্ভ তাফসীর গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তরিত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া কেন্দ্রিক কতিপয় ফকির দরবেশের যুথবদ্ধ উদ্যোগটিকে আল্লাহপাকই তাঁর আপন করুণায় বাস্তব রূপ দিয়ে চলেছেন। দ্বিধাজড়িত পদবিক্ষেপকে দান করেছেন শক্তি, সহায়তা ও বাস্তবতা। আর আমরাও এগিয়ে চলেছি কেবল সংকল্পের বিশদ্ধতাকে অবলম্বন করে। আমাদের সঙ্গী হিসেবে সদাজাগ্রত রয়েছে ভয় ও সাহস। পাপী আমরা। সকল অপরাধের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রাপ্তির নিবেদন জানিয়ে চলেছি আমাদেরই পরম প্রেমময়

প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে। হে আমাদের প্রিয় প্রতিপালক। আমাদেরকে মার্জনা করো। চিরতরে আমাদেরকে নিমজ্জিত করো তোমার দয়া ও ভালোবাসার সীমাহীন সমুদ্রে। সকল পবিত্রতা, স্তবস্তুতি তোমার। সকল গৌরব, কৃতিত্ব ও মহিমাও তোমার। তুমি রহমান। তুমি গফুর। আমরা তোমারই মিলন প্রত্যাশী। আমাদের বিরহকাতরতাকে প্রশমিত করো। যে মহাগ্রন্থ তুমি অবতীর্ণ করেছো তোমার অক্ষরের অমুখাপেক্ষি (উম্মি) রসুলের বক্ষাধারে তার আক্ষরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তোমার অতুলনীয় বানীবৈভবের দ্যুতিচ্ছটার সন্ধান যেনো আমরাও পাই।

হে আমাদের জীবন মৃত্যুর অধিকারী মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্। তোমার অপার পরাক্রমে আমরা সন্ত্রস্ত। আমাদেরকে পরিত্রাণ দাও। দাও ভালোবাসা — তোমার, তোমার প্রিয়তম রসুলের। রসুলশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে দয়া করে পৌঁছে দাও আমাদের অন্তরোৎসারিত অফুরন্ত দরুদ ও সালাম — তাঁর সকল নবী রসুল ভ্রাতৃবৃন্দ, সম্মানিত সহচরবৃন্দ, পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর ও আউলিয়া সম্প্রদায়কেও। তাঁরা তোমারই দল। তোমার দলই বিজয়ী। তাঁদের মাধ্যমে বিশেষ করে পীর ও মোর্শেদের মাধ্যমে আমাদেরকেও দান করো বিজয়। প্রবৃত্তির উপর। পার্থিবতার উপর। অজ্ঞতার উপর। আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ (বিশ্বাস) প্রদাতা হে আমাদের আল্লাহ্ — এই অধম ফকিরের প্রিয় ফরজন্দ ও অনুবাদক মাওলানা তালেব আলীর অনুবাদ প্রচেষ্টাকে কবুল করো। কবুল করো এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক ও শারীরিক সকল প্রকার সহযোগীকে। আমাদেরকে দাও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আর আমাদেরকে নিরাপদ রাখো আগুনের আযাব থেকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

উল্লেখ্য — বাংলা তরজমাটি আমরা গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কুরআনুল করীম থেকে। কারণ, এই তরজমাটিই আমাদের বিবেচনায় অধিকতর সুন্দর। এর জন্য আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আরো উল্লেখ্য — মূল তাফসীরে মাযহারী আরবী ভাষায় রচিত। আর আমাদের অনুবাদটি করা হয়েছে দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে।

বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট আবেদন — মুদ্রণজনিত কিংবা অন্য কোনো বিচ্যুতি দৃষ্টিতে এলে জানাবেন। সকলের জন্য কল্যাণ কামনা ও সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

প্রথম পারা — সুরা ফাতিহা ঃ আয়াত ১ — ৭

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১ — ১৪১

দ্বিতীয় পারা — সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪২ — ২৫২

তাফসীরে মাযহারী

প্রথম খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পারা

সুরা ফাতিহা ঃ আয়াত ১-৭

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১-২৫২

প্রথম পারা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

সুরা ফাতিহা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ○ اَلرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ○

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ○ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ○ صِرَاطَ

الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ○

❒ প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহেরই প্রাপ্য,
❒ যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,
❒ কর্মফল– দিবসের মালিক।
❒ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,
❒ আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর,
❒ তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ,
❒ যাহারা ক্রোধ-নিপতিত নহে, পথভ্রষ্টও নহে।

নামকরণ

সুরা ফাতিহার একটি নাম আলহামদু শরীফ। আরেকটি নাম ফাতিহাতুল কিতাব। অর্থ–গ্রন্থের উদ্বোধনী। কোরআনের অবতরণিকা এই সুরা দিয়েই শুরু হয়েছে। তাই এই নামকরণ। আরেকটি নাম হচ্ছে উম্মুল কোরআন। অর্থ–কোরআনের জননী। এই সুরা দিয়েই কোরআন শুরু হয়েছে বলে সুরাটি কোরআনের মা স্বরূপ। এই সুরার আরেকটি নাম সাব্‌উ মাসানী। অর্থাৎ অনুপম বাণীসপ্তক। সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, সাতটি আয়াত রয়েছে এই সুরায়। সুরাটি

নামাজে বারংবার আবৃত্তি করা হয়। মাসানী বলা হয় এই কারণে যে, সুরাটি একবার মক্কা শরীফে, আরেকবার মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, মক্কা শরীফই এই সুরার অবতরণ স্থল। আল্লামা ইবনে জারীর হজরত আবু হোরায়রা রা. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হজরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন—সুরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু শরীফ হচ্ছে উম্মুল কোরআন, ফাতিহাতুল কিতাব, সাব্‌উ মাসানী। আলহামদু সুরার আরেকটি নাম সুরা কান্‌জ (ভান্ডার)। হজরত আলী রা. থেকে ইসহাক ইবনে রওয়াহা বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন—এই সুরাটি আরশের নিম্নস্থিত ভান্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা ফাতিহার আরেকটি নাম সুরা শিফা। ফযীলত অধ্যায়ে একটু পরেই আমি এই মর্মে আলোচনা পেশ করবো যে, সুরা ফাতিহা সকল ব্যাধির প্রতিষেধক।

'বিসমিল্লাহ্' অর্থ আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করি। 'বিস্‌মি' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'বা' এবং 'ইসিম' শব্দ দু'টি দিয়ে। অতি ব্যবহারের ফলে ইসিমের 'আলিফ' অক্ষরটি লুপ্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজ এর উক্তি আল্লামা বাগবী উল্লেখ করেছেন এভাবে—হে মানুষেরা! তোমরা 'বা' অক্ষরটিকে প্রলম্বিত আকারে লিপিবদ্ধ করো, সুন্দরভাবে প্রতিভাসিত করো 'সিন'। আর 'মিম' বর্ণটিকে করো গোলাকৃতি। এতে করে আল্লাহর কালামের সম্মান করা হবে।

'ইসিম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'সামু' থেকে, 'ওয়াসমুন' থেকে নয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় 'সামিউন' এবং 'সামিয়াতুন'। 'বা' অক্ষরটি সঙ্গী ও সাহায্য কামনা অথবা বরকত অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্পাকের জিকির দ্বারা সাহায্য কামনা করা হয়ে থাকে। 'বা' অব্যয়টি 'আররহীম' শব্দের পরে লুপ্ত একটি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ 'আক্বরাউ' (আমি পড়ি)। যেমন বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা বাক্যটিতে দেখা যায়। সমধিক পরিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে—প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ উল্লেখ থাকাই বাঞ্ছনীয়। আবদুল কাদির তাঁর হাবী আরবাইন গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে লিখেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— যে কাজ বিসমিল্লাহ্র সঙ্গে শুরু না হয় সে কাজ অসমাপ্ত থাকে। অর্থাৎ সহজ কথায় এরকম বলা কর্তব্য যে, আল্লাহ্পাকের নামে আমি পাঠ আরম্ভ করলাম।

আল্লাহ্ ঃ কারো কারো অভিমত হচ্ছে 'আল্লাহ্' শব্দটি একটি মৌল শব্দ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে 'আল্লাহ্' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে 'ইলাহ্' (উপাস্য) শব্দটি থেকে। ইলাহ্ শব্দের 'হামজা'র স্থলে 'আলিফ' ও 'লাম' যুক্ত করা হয়েছে। আর এমতো সংযোজন করা হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে, যদ্দরুন 'আল্লাহ্' শব্দটি সিদ্ধ। কেনোনা, ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিলিত এবং পৃথক অবস্থায় শব্দ দু'টি যেনো একার্থবোধক হয়। পরিশেষে বলা যায় শব্দটি ওই চিরস্থায়ী সত্তার মহিমান্বিত নাম যা সকল প্রকার অপরিচ্ছন্নতা ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এজন্যই

নামটি স্বমহিমায় ভাস্বর। নতুন কোনো শব্দের মাধ্যমে এর বিশেষণ সংযোজন নিষ্প্রয়োজন। তাই এককত্ব প্রকাশের পবিত্র বাক্যটি হচ্ছে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। কখনো আবার শব্দটির ব্যবহার তার মূল অর্থের উপরও প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। যেমন বলা হয়েছে–"হুয়াল্লাহু ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ" (তিনিই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের একমাত্র উপাস্য)।

আর রহমানির রহীমঃ 'রহমান' এবং 'রহীম' শব্দ দু'টির অর্থ- দাতা ও দয়ালু। দু'টি শব্দই উৎপন্ন হয়েছে রহমত শব্দটি থেকে। রহমত অর্থ আন্তরিক নম্রতা। যার পরিণতি হচ্ছে কল্যাণ ও অনুগ্রহ। স্মর্তব্য, আল্লাহ্পাকের গুণবাচক নামের উপক্রমণিকা 'বা' শব্দ এখানে ধর্তব্য নয় বরং মুখ্য বিষয় হচ্ছে অর্থ ও উপসংহার। যেমন বলা হয়, রহমত বা অনুকম্পার পরিণতি হচ্ছে ইহ্সান বা অনুগ্রহ। উপক্রমণিকা বা সূচনা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।

কোনো কোনো ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন– 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দ দু'টি সম অর্থজ্ঞাপক। বিশেষণের আধিক্য বুঝাতে শব্দ দু'টি একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে– 'রহীম' শব্দটির তুলনায় 'রহমান' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আর 'রহমান' শব্দটি যেমন আল্লাহ্পাকের জন্য সুনির্দিষ্ট, 'রহীম' শব্দটি তেমন সুনির্ধারিত নয় (বিশ্বাসীদের সঙ্গে রসুল স. এর সম্পর্ক নির্ণায়ক রূপে কোরআনের একস্থানে তাঁর স. জন্য 'রউফুর রহীম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'রহমান' শব্দটির এরকম ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়না)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওই নাম দু'টির যুথবদ্ধ রূপ পূর্ণ অনুগ্রহকে প্রকাশ করে। তারা একে অপরের আধিক্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত করে। অনুকম্পার এই আধিক্য অপরিমেয়। ব্যাপকতর অর্থবোধক বলে পৃথিবীতে 'রহমান' এবং এতাদৃশ ব্যাপক নয় বলে আখেরাতে 'রহীম'। আখেরাতে কেবল আল্লাহ্ভীরুগণই অনুকম্পা লাভে ধন্য হবেন। অনুকম্পা বন্টনের এবম্বিধ প্রকার হচ্ছে পরিমাণমূলক। আর অনুকম্পা বন্টন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও হওয়া সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণটি বিচার্য হলে পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানেই তিনি রহমান এবং কেবল আখেরাতেই তিনি রহীম। তাই পরজগতে কেবল মু'মিনরাই উপকৃত হবেন। আর ইহজগতে মু'মিন কাফের উভয়েই উপকৃত হবে। আখেরাতের নেয়ামত অমূল্য। আর পৃথিবীর নেয়ামত স্বল্পমূল্য অথবা দুর্মূল্য। আর 'রহমান' শব্দটি আল্লাহ নামের সঙ্গে নামবাচক বিশেষ্যের মতোই সুনির্দিষ্ট। তাই রহমানের উল্লেখ এসেছে রহীমের আগে। আর ইহকালতো পরকালের আগেই। তাই রহীমের পূর্বে রহমানের উল্লেখ নিতান্তই সঙ্গত।

বিস্‌মিল্লাহ্ কোনো সুরা বা কোরআনের অংশ কিনা

মদীনা মুনাওয়ারা ও বসরার ক্বারীগণ এবং ইমাম আবু হানিফা ও কুফার অন্যান্য ফকিহ্গণের অভিমত হচ্ছে– বিস্‌মিল্লাহ্ সুরা ফাতিহার অংশ নয়। অন্য কোনো সুরারও অংশ নয়। বরকতের জন্য এবং দুই সুরার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য

প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ্‌র অধিষ্ঠান। কারো কারো মতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ কোরআনের অংশ নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ অবশ্যই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত। আর বিস্‌মিল্লাহ্‌ অবতীর্ণ হয়েছে দুই সুরার পার্থক্য নির্ণায়ক রূপে।

ইমাম হাকেম, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের নীতিমালার অনুসরণে বিশুদ্ধ হাদিস রূপে হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. প্রথম প্রথম দু'টি সুরার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন, তখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ অবতীর্ণ হয়। ইমাম আবু দাউদ এই হাদিসটিকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার অভিমতটি বিশুদ্ধতর। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসানকে বিস্‌মিল্লাহ্‌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, দুই মলাটের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবই কোরআন।
আমার বক্তব্য হচ্ছে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ কোরআনের অন্তর্ভূত না হলে পৃথকীকরণের আরো অনেক উপায় থাকা সত্ত্বেও কোরআন লেখকগণ প্রতি সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করতেন না। যেমন তারা 'আমীন' শব্দটি পুনঃ পুনঃ লিখেননি।

বিসমিল্লাহ্‌ কি সুরা ফাতিহার অংশ

বিসমিল্লাহ্‌ যে সুরা ফাতিহার অংশ নয় তার প্রমাণ হিসেবে হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসটি পেশ করা যায়। হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌ স., হজরত আবুবকর এবং হজরত ওমরের পিছনে অনেক নামাজ পড়েছি। তাঁরা কেউই উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ্‌ পড়েননি।

দ্বিতীয় প্রমাণ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত ওই হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, আমি নামাজকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। এই হাদিসটি আমি অনতিবিলম্বে ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করবো।

তৃতীয় প্রমাণ হিসেবে আসছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মা'কাল থেকে ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদিসটি যেখানে উল্লেখ রয়েছে, আমার পিতা আমাকে নামাজের মধ্যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সহ আলহামদু সুরা উচ্চ স্বরে পড়তে শুনলেন। নামাজ শেষে তিনি আমাকে বললেন, বৎস! ইসলামে নতুনত্ব (বেদাত) সংযোজন থেকে বিরত থেকো। আমি হজরত রসুল স., হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের পিছনে নামাজ পড়েছি। কিন্তু তাঁদেরকে কখনোই বিসমিল্লাহ্‌ থেকে ক্বেরাত শুরু করতে শুনিনি। তাঁরা ছিলেন বেদাতের ঘোর শত্রু। ইমাম তিরমিজি বর্ণিত হাদিসেও এরকম উল্লেখ রয়েছে যে, আমি মহানবী স., আবুবকর, ওমর ও ওসমানের পিছনে নামাজ পড়েছি। কিন্তু তাঁদেরকে কখনো বিসমিল্লাহ্‌ (সশব্দে) পড়তে শুনিনি। মক্কা এবং কুফার ক্বারীগণ ও হেজাজের অধিকাংশ ফকিহ্‌ বলেছেন, বিসমিল্লাহ্‌ সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সুরার অংশ নয়। অন্যত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে কেবল দুই সুরার মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর

জন্য। বিশুদ্ধ সূত্র সহযোগে হাকেম 'ওয়ালাক্বাদ আতাইনাকা সাবয়াম মিনাল মাসানি ওয়াল ক্বোরআনিল আজীম'– এ আয়াতটির তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়েরের ওই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে, সাবউ মাসানী ও উম্মুল কোরআন হচ্ছে সুরা ফাতিহা। আর বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সুরা ফাতিহার সপ্ত আয়াতের একটি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস যেভাবে পাঠ করতেন, আমিও সেভাবে পাঠ করি। তিনি আরও বলেছেন, বিসমিল্লাহ্ সুরা ফাতিহার সপ্তম আয়াত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি উল্লেখ করেছেন– রসুলে পাক স. তাঁর নামাজ শুরু করতেন বিসমিল্লাহ্ দ্বারা। আমি (গ্রন্থকার) মনে করি, বিসমিল্লাহ্ সুরা ফাতিহার সপ্তম আয়াত– হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এই উক্তিটি তাঁর নিজস্ব অভিমত। হাদিসটি মারফু নয়। আর ইমাম তিরমিজি বর্ণিত হাদিসটি সূত্রবিচারের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালীও নয়।

অপর একদল আলেম এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিসমিল্লাহ্ সুরা তওবা ব্যতীত (সুরা ফাতিহাসহ) কোরআনের অন্য সকল সুরার অংশ। ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর কোরআনের সকল অনুলিপিতেই সুরা তওবা ব্যতীত সমস্ত সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমি বলি, এর দ্বারা এতোটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, বিসমিল্লাহ্ কোরআনের অন্তর্ভূত। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণ করা যায় না যে, বিসমিল্লাহ্ প্রত্যেক সুরার অংশ। কী করে তা সম্ভব? এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদিসসমূহ বিদ্যমান। সুরা মুল্‌ক সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন– এটি তিরিশ আয়াত সম্বলিত কোরআনের একটি সুরা। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে আমি বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনায় আনবো। এখন শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আয়াত গণনাকারীগণ এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বিসমিল্লাহ্ ছাড়াই সুরা মুল্‌কের আয়াত সংখ্যা তিরিশ।

আলহামদু (সকল প্রশংসা) ঃ পার্থিব সৌন্দর্যের মৌখিক প্রকাশের নাম হামদ্। সে সৌন্দর্যের সঙ্গে নেয়ামত বা অনুগ্রহরাজি সম্পৃক্ত থাকুক বা না থাকুক। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার (হামদ্ ও শুকরিয়ার) মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। কৃতজ্ঞতা অনুগ্রহ লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিব্যক্তির দিক থেকে বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট করা যায়। কখনো আন্তরিক অনুভবের মাধ্যমে, কখনো অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দ্বারা, আবার কখনো ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু প্রশংসা কেবল ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব। তাই রসুল স. এরশাদ করেছেন - প্রশংসা হলো কৃতজ্ঞতার ভিত্তি। যে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করলো না, সে ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাও পালন করলো না। –এ বর্ণনাটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, কাতাদা এবং আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে। 'হামদ' শব্দটি 'মাদাহ্'

শব্দটির সঙ্গে সাধারণভাবে তুলনামূলক সম্পর্কধারী। পার্থিব কিংবা অপার্থিব সৌন্দর্য প্রশংসিত হলে, ওই প্রশংসাকে 'মাদাহ্' বলে। 'হামদ' এর সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে সুনির্দিষ্ট শব্দটি গঠিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে– এই সুনির্দিষ্ট অবস্থাটি আবার কী রকম? একটি তো জাতিবাচক বিশেষণ যা সর্বজনবিদিত। আর অপরটি হচ্ছে সামষ্টিক প্রকাশ। সমষ্টিগতভাবে সকল প্রশংসাইতো আল্লাহ্পাকের জন্যে। তিনি তাঁর বান্দাগণের কার্য সমূহের স্রষ্টা। তিনি বলেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা যা কিছু নেয়ামত পেয়েছো, সে সমস্ত আল্লাহ্র দিক থেকেই এসেছে। এতে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্পাক জীবিত, ক্ষমতাশালী, অভিপ্রায়াধিকারী ও শক্তির মালিক। একারণে তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী।

এর পরের শব্দটি হচ্ছে 'লিল্লাহ্'। 'লিল্লাহ্' এর অর্থ কেবল আল্লাহ্র। 'লি' আল্লাহ্ শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট করেছে। আরবী ভাষারীতি অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ্ একটি পূর্ণ বাক্য– যার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র। এই বাক্যটির মাধ্যমে বান্দাদেরকে প্রশস্তি প্রকাশের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাক্যের উহ্য অংশটিসহ পূর্ণ উদ্ধৃতি হবে .এরকম- 'কুল আলহামদুলিল্লাহ্ (হে মানব সকল! বলো, সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র)। এরকম বলা হলে পরবর্তীতে আগত 'ইয়্যাকা না'বুদু'বাক্যটির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। যেহেতু না'বুদু কথাটির বক্তা বান্দা নিজেই।

রব্বিল আ'লামীন ঃ অর্থ বিশ্বসমূহের প্রভুপালয়িতা। 'রব' শব্দের আরেকটি অর্থ সত্ত্বাধিকারী। যেমন বলা হয়, 'রব্বিদ্ দার'– গৃহের সত্ত্বাধিকারী। রব শব্দটি তরবিয়ত অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কোনোকিছুকে ক্রমপরিণতির দিকে পৌছানোর নাম তরবিয়ত। তরবিয়ত বা প্রতিপালনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, "খলিদুন সওমুন ওয়া যায়িদুন আদলুন।" 'রব' শব্দটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য হতেই পারে না। আর বিশ্বজগত সমূহের উন্মেষ, স্থিতি এবং স্থায়িত্ব রবের (প্রভুপালয়িতার) মুখাপেক্ষী।

আ'লামীন (বিশ্বসমূহ) ঃ 'আলম' (বিশ্ব) শব্দের বহুবচন (কোরআন এবং হাদিসে 'আলম' শব্দের একবচনসুলভ ব্যবহার নাই)। ব্যবহারিক দিক থেকে আলামীনের একবচন হিসেবে 'আলম' শব্দটি পরিদৃষ্ট হয় না। 'আলম' বলতে ওই বস্তুকে বুঝানো হয়– আলমের স্রষ্টা যার সম্পর্কে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যেমন সীল বলা হয় ওই বস্তুকে যার দ্বারা সীলমোহর করা হয়। সম্ভাব্য সকল কিছুকেই আলম নামে অভিহিত করা যায়। সকল সৃষ্টিই সম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুমকিনুল ওজুদ)। তাই সকল সৃষ্টিকে আলম বলা যেতে পারে। ফেরাউন বলেছিলো, জগতের প্রভুপালক কে? হজরত মুসা আ. বলেছিলেন, তিনিই সারা জাহানের রব, যিনি নভোমন্ডল, পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের সকল কিছুর সত্ত্বাধিকারী।

জগতের রয়েছে বহুতর বিন্যাস। তাই এখানে বহুবচনের ব্যবহারই সঙ্গত। ওয়াহাব বলেছেন, আল্লাহ্পাক আঠারো হাজার আলম সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে এ

পৃথিবী একটি আলম। বিশ্বসমূহের তুলনায় পৃথিবী যেনো সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রক্ষিত একটি তশ্তরী (পিরিচ)। হজরত কাব আহবার বলেছেন, আলম সমূহের সংখ্যা এবং আল্লাহ্পাকের সৈন্যসংখ্যা আল্লাহ্পাক ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞানসম্পন্ন সৃষ্টিকুলের নাম আলম। যেমন, মানুষ, ফেরেশ্তা ও জ্বিন। অন্যান্য সৃষ্টি এদের অধীন।

আর রহমানীর রহীম (পরম দাতা ও দয়ালু) ঃ কোরআন পাঠকগণ এখানে বিরামস্থলে মৃদু উচ্চারণকে সিদ্ধ রেখেছেন। এ আয়াতটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সুরা ফাতিহার অংশ নয়। যদি হতো তবে 'আর রহমানীর রহীম' বাক্যটি পুনরাবৃত্ত হতো না। আর অকারণ পুনরাবৃত্তি একটি অসুন্দর ব্যাপার। এরকম দুর্বল বর্ণনাভঙ্গি ভাষাবিদগণের নিকট অনভিপ্রেত। কেউ কেউ বলেছেন, 'রব্বিল আলামীনের' কারণ স্বরূপ 'আর রহমানীর রহীম' উল্লেখিত হয়েছে (কেনো তিনি বিশ্বসমূহের প্রভু? উত্তর হচ্ছে- এ কারনে যে, তিনি রহমান ও রহীম)।

মালিকি ইয়াউমিদ্দিন(প্রতিফল দিবসের মালিক) ঃ ক্বারী আসিম, কাসাই এবং ইয়াকুবের পঠনে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা-লিক'। অন্যান্য ক্বারীগণ পড়েছেন 'মালিক'। ক্বারী আবু ওমর পড়তেন 'আর রহী ম্মালিকি ইয়াউমিদ্দিন'। অর্থাৎ 'আর রহীমের' মীমকে তিনি মালিকির মীমের সঙ্গে সন্ধি করতেন। এভাবেই দুই হরকত বিশিষ্ট শব্দের সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। শর্ত হচ্ছে, শব্দ দু'টি হতে হবে সমুচ্চারিত অথবা সমুচ্চারণের নিকটবর্তী। বিস্তৃত বিবরণ এরকম - একজাতীয় দু'টি অক্ষর দু'টি শব্দের অন্তিমে ও প্রারম্ভে উল্লেখিত হলে সন্ধিবদ্ধ উচ্চারণ করা যায়। এরকম অক্ষরের সংখ্যা সতেরটি (অবশ্য কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে)। এই সতেরটি অক্ষর হচ্ছে – বা, তা, ছা, হা, র, সিন, আঈন এবং আঈন থেকে ইয়া। এই সন্ধিবদ্ধতাকে ইদগম বলে। নিম্নে ক'টি উদাহরণ দেয়া হলো –

১. যাহাব্ বি সাময়িহিম– এখানে যাহাব এর 'বা' এবং বিসাময়িহিম এর 'বা' পাশাপাশি বিদ্যমান থাকার কারণে সন্ধিসিদ্ধ উচ্চারণ হয়েছে।
২. গইরাযাতিশ্ শাউকাতিত্ তাকুনু লাকুম– এখানে 'শাউকাত' এবং 'তাকুনু' শব্দ দু'টিতে 'তা' অক্ষরটি পাশাপাশি থাকার কারণে ইদগম হয়েছে।
৩. লা আব্রহ্হাত্তা– এখানে 'আব্রহ্' শব্দটির শেষে এবং 'হাত্তা' শব্দটির প্রথমে 'হা' থাকায় ইদগম হয়েছে।
৪. ফাস্তাগ্ফার রব্বাহু– এক্ষেত্রে 'র' বর্ণটি পাশাপাশি থাকার কারণে যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
৫. ওয়া তারান্নাসু সুকারা– এটি 'সিন' অক্ষরের ইদগমের উদাহরণ।
৬. ওয়াত্ত্বিয় য়ালা কুলুবিহিম– এটি আঈনের ইদগমের একটি দৃষ্টান্ত।
৭. তায়রিফ ফি উজুহিহিম - এখানে ইদগম হয়েছে 'ফা' অক্ষরের।

৮. গঈনের ইদগমের উদাহরণ হচ্ছে– ওয়া মাইয়াব্তাগি গইরল ইসলাম।

৯. ক্বফ এর ইদগমের দৃষ্টান্ত এরকম– আদরাকাহুল গারাকুক্বলা।

১০. কাফ এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে– ইন্নাকা কুনতাবিনা।

১১.লাম এর দৃষ্টান্ত– জায়াল্লাকুম।

১২. ওয়াও এর নিয়ম– ইল্লাহুউউয়াল মালাইকাহ্।

১৩. গোল হা এর দৃষ্টান্ত– ইন্নাহ্ হুয়া।

১৪.ইয়া এর ইদগম এরকম– নুদিই্ইয়ামুসা।

বর্ণিত বর্ণগুলোর মধ্যে সন্ধি করা শুদ্ধ হলেও এর সঙ্গে রয়েছে আরো কিছু নিয়ম। যেমন 'তা' অক্ষরটি পাশাপাশি লিপিবদ্ধ হলেও একটি যদি উত্তম পুরুষ এবং অন্যটি যদি মধ্যম পুরুষ জ্ঞাপক হয় তবে সন্ধি হবে না। যেমন কুনতুতুরবা - এখানে 'তা' বর্ণ দু'টি ইদগম না হয়ে ইজহার হবে (পৃথক পৃথক ভাবে স্পষ্ট উচ্চারিত হবে)। আবার পাশাপাশি উল্লেখিত দু'টি বর্ণের প্রথমটি তানবীন অথবা তাশদীদ যুক্ত হলেও ইদগম হবে না। যেমন, ওয়াসিউল আলীম, ছুম্মা মিক্বদ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আরো বলা যায়, লা ইয়াহ্জু'নকা কুফ্রুন– এখানে 'কাফের' পূর্ব অক্ষর 'নুন' ইখফার অক্ষর। তাই আবু আমের এক্ষেত্রে সন্ধি করেননি। সন্ধিবিরোধী আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে– প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর হজফ বিশিষ্ট (মাহ্জুফ) হলেও ইদগম হবে না। এ সকল ক্ষেত্রে হজফের কারণেই এক জাতীয় দু'টি অক্ষর পাশাপাশি অবস্থান নিতে পেরেছে। যেমন, ইয়াবতাগি গইরাল ইসলাম– এখানে মূল শব্দটি ছিলো 'ইয়াব্তাগি' ইয়াকু কাজিবা– মূলে ছিলো 'ইয়াকুন।' আরেকটি দৃষ্টান্ত এরকম- 'ইয়াখলু লাকুম', যা মূলে ছিলো 'ইয়াখ্লু'। –এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে ক্বারী আবু আমের ইদগম ও ইজহার উভয় ব্যবস্থাকেই সিদ্ধ রেখেছেন। আরেকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হচ্ছে– 'আলি লুত।' অধিকতর শুদ্ধ বিধান হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ইদগম সিদ্ধ। ক্বারী আবু আমেরের অভিমত হচ্ছে – 'হুয়া' শব্দের হা বর্ণটি যদি পেশ যুক্ত হয় এবং তারপর যদি ওয়াও বর্ণটি আসে তবে ইদগম হবে। যেমন– হুয়া ওয়া মাইইয়া'মুরু বিল আদ্লি। –এসকল অবস্থায় ইদগম করা না করা সম্পর্কে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তবে ইদগমের বর্ণনাবলী সমধিক শক্তিশালী।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মালিক' এবং 'মা-লিক' এর অর্থ এক-ই। যেমন ফারিহীন এবং 'ফা-রিহিন', 'হাজিরিন' এবং 'হা-জিরিন'। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্বাধিকারী হিসেবে ব্যবহৃত 'মা-লিক' শব্দটি 'মালিক' শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। আরবী ভাষায় প্রবাদ রয়েছে 'মা-লিকুদ্দার' অর্থ 'রব্বুদ্দার' (গৃহের সত্বাধিকারী)। মালিক শব্দের অর্থ রাজা বা সম্রাট– যা গঠিত হয়েছে মূল্ক শব্দটি থেকে। 'মালিক' এবং 'মা-লিক'– এই দু'রকম উচ্চারণই আল্লাহ্পাকের বিশেষণ রূপে সুবিদিত। কাজেই কেবল মালিক উচ্চারণটি সর্বজনমান্য বলা যায় না। কেউ কেউ

বলেছেন মালিক অথবা মা-লিক তিনিই, যিনি অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। তাই এই শব্দ দু'টিকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়।

'ইয়াউমিদ্দিন' অর্থ প্রতিফল দিবস। ওই দিবসকে প্রতিফল দিবস বলে, যেদিন পুরস্কার ও তিরস্কার কার্যকর হবে। 'কামা তাদিনু তুদান' শব্দটি গঠিত হয়েছে দ্বীন শব্দ হতে। এর অর্থ হচ্ছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। এটি একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ এবং মারফু হাদিস (যে হাদিসের সূত্র রসুলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত সংযুক্ত)। কামিল গ্রন্থে হজরত আদী শিথিল সনদের সঙ্গে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন মুরসাল রূপে। মালিক বিন দিনারের মাধ্যমে আহমদ বর্ণনা করেছেন - এই আয়াতটি তওরাত শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ফুজালা বিন উবাইদ থেকে মারফু হিসেবে ইমাম দায়লামী বর্ণনা করেছেন, এটা ইঞ্জিল শরীফের বাক্য। ইমাম মুজাহিদ বলেছেন, ইয়াউমিদ্দিন অর্থ হিসাব নিকাশের দিন। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে– 'যালিকাদ দিনুল কাইয়িমু' (আর এটা সোজা হিসাব)। কেউ কেউ বলেছেন, 'দ্বিন' অর্থ পরাক্রম। আরবীভাষীগণ বলেন, 'দাইয়ান তুহু ফাদানা' (আমি তাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করলাম, সে অনুগত হয়ে গেলো)। 'দ্বিন' শব্দের অর্থ ইসলাম ও আনুগত্যও হতে পারে। কেনোনা ওই সময় ইসলাম ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুই ফলদায়ক হবে না। ওই দিনটিকে বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এজন্য যে, ওই দিন ব্যতীত অন্য সকল দিনে সৃষ্টির জন্য রূপক অর্থে মালিক শব্দটির ব্যবহার হওয়া সম্ভব। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন এবং 'ইয়্যাকা না'বুদু' (আমরা তোমারই ইবাদত করি) – এই ঘোষণার প্রতি আহবান জানানো। এখানে বিশেষণকে ক্রিয়ার আধারের সঙ্গে একারণেই সম্বন্ধিত করা হয়েছে যে, এখানে ক্রিয়ার আধার কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত। এরকম সম্বন্ধিত অবস্থা রয়েছে 'সারিক্বুল লাইলাহ্' বাক্যটিতে। 'মা-লিক' শব্দটি কর্তৃপদ– যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপক। কিন্তু এখানে অতীতকাল হিসেবেই অর্থবহ। যেমন, ওয়ানাদা আছ্হাবুল জান্নাহ্। যে ঘটনা আত্মপ্রত্যয়শীল এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক, বুঝতে হবে তা সংঘঠিত হয়েছে। ব্যাপারটি এরকমই। তাই আল্লাহ্র বিশেষণ হিসেবে 'মা-লিকি ইয়াউমিদ্দিন' বিশেষণের ব্যবহার সুসঙ্গত। রব্বিল আলামীন, আর রহমানীর রহীম, মা-লিকি ইয়াউমিদ্দিন এসমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্পাক সকল স্তব-স্তুতির অধিকারী। তাই তিনি ব্যতীত উপাসনা লাভের যোগ্য কে? ইয়্যাকা না'বুদু (আমরা তোমারই ইবাদত করি) – এ বাক্যটির ভূমিকা স্বরূপ আল্লাহ্তায়ালার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমেই। প্রমাণ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব, পরাক্রম এবং দয়া দাক্ষিণ্যকে। এভাবেই প্রমাণিত হয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার পার্থক্য। এভাবেই তাঁর অদৃশ্য ও অব্যক্ত গুণাবলী যেনো দৃশ্যগোচর হয়। আর এ অবস্থায় যেনো সৃষ্টির সমর্পনেচ্ছাকে সহজাত বিকাশ লাভের সুযোগ করে

দেয়া হয়েছে। বান্দা এবার উচ্চারণ করুক 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্‌তাঈন' (হে করুণানিধান দয়াময়, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। ক্বারীগণ 'নাস্‌তাঈন' শব্দের 'নুন' বরং প্রতিটি পেশ যুক্ত বর্ণ বিরাম স্থলে 'রওম' এবং 'ইশমাম' আনুনাসিক রূপে উচ্চারণ করেন। এমতাবস্থায় আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা হবে এরকম– বর্ণিত বিশেষণে বিশেষিত হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট আনুগত্যের সামর্থ্য কামনা করি। শুধু ইবাদতের সামর্থ্য কামনাই নয়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ে আমরা তোমারই সহায়তা যাচনা করি।

জ্ঞাতব্যঃ দার্শনিক এ্যারিস্টটল ও তার অনুসারীদের মতবাদ হচ্ছে– আল্লাহ্‌পাক সমস্ত সৃষ্টির কার্যকারণ নীতি। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ও অনুভূতি ব্যতিরেকেই। যেমন, সূর্যের আলোকচ্ছটা সূর্যের বিনা ইচ্ছাতেই বিকিরিত হয়। জগতের নিত্যনতুন ঘটনা প্রবাহই শুধু নয় বরং জগতের সূচনাও তাঁর পরম সত্তার সাথে একীভূত। এ জগত নিত্য পরিবর্তনশীল হলেও সম্ভাবনার আদিজগত অপরিবর্তনীয়। আর ভিন্ন দৃষ্টিতে সৃষ্টিও অনাদি। রহ্‌মানীর রহীম উচ্চারণ দ্বারা এই বাতিল মতবাদটির প্রতি প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। রহমত অর্থ বাধ্যবাধকতাহীন দয়া, করুণা। করুণাকারী করুণা করতে বাধ্য নন বরং তিনি তাঁর আপন ইচ্ছায় করুণা বিতরণ করেন। কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের নাম রহমত হতে পারেনা। আল্লাহ্‌তায়ালা এজন্যই রহমান এবং রহীম যে, সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান তাঁর কর্তব্যভূত নয় এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোনো দায়বদ্ধতাও তাঁর নেই। বরং তিনি দয়া করে এজগতকে সৃষ্টি করেছেন - সৃষ্টির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন এবং সৃষ্টিকে নিয়ে চলেছেন পূর্ণতা ও ক্রমপরিণতির দিকে।

আরবী ভাষায় বাকভঙ্গির বিভিন্ন রূপান্তর রীতিসিদ্ধ। প্রথম থেকে মধ্যম পুরুষ এরকম বাকভঙ্গি আরবী ভাষায় সুপ্রচল। এরকম রূপান্তরশীল বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রোতার অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করা। ইবাদত বা উপাসনা হচ্ছে চরম অসহায়ত্ব ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বিনয়নম্রতার নাম। আরবী প্রবাদ বচনে রয়েছে– তারিকুন মুয়াব্বাদুন।

'না' বুদু' ও 'নাস্‌তাঈন' শব্দ দু'টিতে উত্তম পুরুষের বহুবচন 'আমরা' ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে পাঠকের সঙ্গে তার সঙ্গী-সাথীগণ সম অংশীদার হন। এই বর্ণনাভঙ্গিটি হচ্ছে দলবদ্ধ উপাসনার প্রতি ইঙ্গিত। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ইয়্যাকা' শব্দটি ক্রিয়া ও কর্তৃপদের পরে আসার কথা। কিন্তু এখানে ক্রিয়া ও কর্তৃপদের পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের মহিমা, উপাস্য হওয়া এবং সাহায্যদাতা হওয়ার বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলতেন, না'বুদুকা ওয়ালা না'বুদু গইরুক্ (হে আল্লাহ্! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, আর তোমার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক

করিনা। হজরত জুহাকের সূত্রপরম্পরায় এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বাক্যের ওয়াও (এবং) সংযুক্ত হওয়ার কারণে অর্থ দাঁড়াবে এরকম - হে আল্লাহ্! (আমরা) তোমার নিকট সাহায্য কামনা করেই শুধু তোমারই ইবাদত করি।

'ইহ্দিনা' অর্থ আমাদেরকে দেখাও। এই প্রার্থনাভঙ্গিটিও ইয়্যাকা নাস্তাঈন (আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি) এর অনুরূপ। এখানেও বলা হচ্ছে ইহ্দিনাস্ সিরত্বল মুস্তাকীম অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। এই সরল পথই মানুষের চরম আর্তি এবং প্রাপ্তি। তাই পৃথক বাক্যের মাধ্যমে এই প্রার্থনাটি পেশ করা হয়েছে। হেদায়েতের প্রকৃত অর্থ হলো বিনম্র পথপ্রদর্শন। কেবল কল্যাণ ও পুণ্য লাভ বুঝাতেই হেদায়েত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো- এই প্রার্থনাটি মহানবী মোহাম্মদ স. এর মাধ্যমে উচ্চারিত তাঁর সকল উম্মতের প্রার্থনা। তাঁর হেদায়েত প্রাপ্তি তো পূর্বাহ্নেই সুনিশ্চিত ছিলো। এই প্রার্থনাটি উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে হেদায়েত প্রাপ্তির নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্য হেদায়েত প্রাপ্তদের জন্যও এই প্রার্থনাটি জরুরী। প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তরে অধিকতর হেদায়েতপ্রাপ্তির কামনা চিরবহ্নিমান। আর আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতের এটাই মতাদর্শ যে, আল্লাহ্পাকের করুণা ও হেদায়েত অন্তহীন। আল্লামা ইবনে কাসীর 'কানাবেলের' বর্ণনা অনুযায়ী বলেছেন 'সিরত্বল' শব্দটি কোরআন মজীদের কোনো কোনো স্থানে 'আল' সহযোগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবার কোথাও উল্লেখিত হয়েছে 'আল' ব্যতিরেকেই। তিনি 'সিরত্ব' শব্দের প্রথম বর্ণটি 'ছ্বদ' এর পরিবর্তে 'সিন' পড়েছেন। সিন যুক্ত সিরত্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গলাধকরণ করা। আরবীভাষীগণ বলে থাকেন সারতিত্ তোয়ামু আয় ইয়াব্তালিয়াহ্ অর্থাৎ খাদ্য গলাধঃকরণ করেছেন অথবা গিলে ফেলেছেন। যখন কেউ খাদ্যের গ্রাস গলাধঃকরণ করেন তখনই বলা হয় সারতুত্ তোয়াম। অনুরূপ যে পথে অধিক সংখ্যক পথচারী চলেন, সে পথকে বলা হয় আত্তারিকু ইয়াস্রুতুস্ সাবিলা। অন্যান্য ক্বারীগণ সিরত্ব শব্দটি পাঠ করেছেন 'ছ্বদ' সহযোগে। আর এটাই কুরায়েশদের আঞ্চলিক উচ্চারণ। ক্বারী খাল্ফ্ কোরআন মজীদের সবখানেই সিরত্ব শব্দটি উচ্চারণ করেছেন 'ছ্বদ' এবং 'ঝা' এর মাঝামাঝি উচ্চারণে। খাল্লাদ কেবল এখানেই পাঠ করেছেন 'মুস্তাক্বীম' অর্থ সমতল, সরল। প্রকৃত অর্থ হলো সত্যপথ। কেউ কেউ অর্থ করেছেন ইসলাম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইব্নে জারীর এরকমই বর্ণনা করেছেন। হজরত আবুল আলিয়া এবং হজরত ইমাম হাসান বলেছেন, সিরত্বল মুস্তাক্বীম হচ্ছে হজরত রসুল স.এবং তাঁর প্রধান সহচর হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরের পথ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার পরে আমার আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে

আঁকড়ে ধোরো। তিনি আরো নির্দেশ করেছেন— আমার পরে আবুবকর ও ওমরের অনুসারী হয়ো।

সিরত্বল্লাজিনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম— এই বাক্যটি 'সিরত্বল মুস্তাকীম' বাক্যটির পূর্ণ দ্যোতনাকে প্রকাশ করেছে। সুদৃঢ় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই এরূপ বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে,ওই সমস্ত লোকের পথ যাঁদের মুস্তাক্বীম হওয়ার বিষয়টি সুস্বীকৃত। এর অর্থ দাঁড়াবে এরকম— আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে ওই সমস্ত লোকের পথানুগামী করো, যাঁদেরকে তুমি করুণাসিক্ত করেছো। ওই করুণাসিক্ত লোকেরাই ইমান ও আনুগত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁরা হচ্ছেন
নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্।

ইলাইহিম, আলাইহিম এবং লাদাইহিম কোরআন মজীদের যে বাক্যাবলীতে রয়েছে, সে সমস্ত বাক্যের বিরামস্থলে অথবা মিলিতাবস্থায় 'হা'কে পেশ যুক্তাবস্থায় পাঠ করেছেন ক্বারী হামজা। অন্যান্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন যের সহযোগে। ইবনে কাসীর বহুবচনের 'মীম'কে মিলিতাবস্থায় (পরে সাকিন না থাকলে) পেশ সহযোগে এবং ইশ্‌বা সহ পড়েছেন। কিন্তু নিয়ম হলো পরবর্তী বর্ণ সাকিন হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ইশ্‌বা' করে বা না করে দুই নিয়মেই পাঠ করা সিদ্ধ। ওয়ারশ বলেছেন, আলিফ শূন্য মিলিতাবস্থায় ইশ্‌বা করে পাঠ করা সিদ্ধ। কিন্তু বহুবচনের 'মীম' এর পর আলিফ মিলিত হলে, 'হা' এর পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট এবং 'ইয়া' সাকিন হলে (যেমন— বিহিমুল আসবাব এবং আলাইহিমুল ক্বিতাল)। হামজা এবং কাসায়ী 'হা' এবং 'মীম'কে পেশ সহযোগে পাঠ করেছেন। এ সকল ক্বারী ব্যতীত অন্যান্য ক্বারী 'মীম' কে পাঠ করেছেন পেশ বিশিষ্ট অবস্থায়। প্রকৃত নিয়ম এটাই। ক্বারীগণ 'হা' কে যের যুক্ত অবস্থায় পাঠ করে থাকেন, যেহেতু তার পূর্বের 'ইয়া' সাকিন অথবা যের বিশিষ্ট। এ ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে কেবল বাক্যের মিলিতাবস্থায়। তবে বিরাম অবস্থায় পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট থাকায় সকলেই যের যুক্ত পাঠকে মান্য করেছেন। এর পরেও অবশ্য ক্বারী হামজার মতানৈক্য থেকেই যায়।

গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াদ্দল্লিন- এই বাক্যটি আন্‌আম্‌তা আলাইহিম বাক্যের ব্যাখ্যা বোধক। অর্থাৎ যাঁদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর করুণা দানে ধন্য করেছেন, তাঁরাই পথভ্রষ্টতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার গজব থেকে সুরক্ষিত। অথবা বাক্যটি একটি প্রকাশ্য বা বিমুক্ত বিশেষণ। এমতাবস্থায় সর্বনামকে অনির্দিষ্ট মেনে নিতে হয়— ফলে কোনো নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত দলকে নির্দেশ করা যায়না। যেমন, আরবী কবিতায় বলা হয়েছে—ওয়ালাক্বদ আমুররু আলাল লাইয়িমি ইয়াসুব্বুনি (যখন আমি কোনো কদর্য স্বভাব বিশিষ্ট লোককে অতিক্রম করি যে আমাকে গালি দেয়)। অথবা একথাও বলা যায় 'গইর' শব্দটি এমন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত যে, তার বিপরীত শব্দ মাদ্ একটি হেদায়েত, এজন্য সর্বাবস্থায় তা সুনির্দিষ্ট। সম্বন্ধিত হওয়ার কারণেই এখানে সুনির্দিষ্ট অবস্থাটি এসেছে। যেমন বলা হয়—আলাইকুম

বিল হারকাতে গাইরাস্‌সুকুন। 'আলাইহিম' শব্দটি কর্তৃকারকে অবস্থান গ্রহণ করার দরুণ কর্তৃবাচ্য হয়েছে (অর্থাৎ বাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'গইর' শব্দটি 'মাগদুবি' শব্দটির কর্মপদ, যার কর্তৃপদ রয়েছে উহ্য)। আর লাম শব্দটি 'গইর' শব্দের না সূচক– কে অধিকতর শক্তিশালী করেছে যেনো প্রকৃত বাক্য ছিলো এরকম - লা মাগদুবি আলাইহিম (না তাদের পথে, যাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ হয়েছে)। প্রতিশোধ স্পৃহার উল্লাস ও উদ্দীপনার নাম গজব। কিন্তু এর সম্পর্ক যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে করা হয়, তখন তার মর্ম হবে গজবের পরিণাম বা পরিসমাপ্তি। আযাব এবং দালালাহ্‌ শব্দ দু'টি হেদায়েত শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ (যে পথ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছায়, ওই পথের প্রতি বৈমুখ্যই দালালাহ্‌)। সে পথের রয়েছে অনেক স্তর। স্তরান্তর। হজরত আদি বিন হাতেম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন– যাদের প্রতি গজব অবতীর্ণ হয়েছে তারা ইহুদী। আর যারা পথভ্রষ্ট, তারা খৃষ্টান। এই হাদিসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ্‌ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিরমিজি স্বীকার করেছেন, হাদিসটি হাসান। অন্যান্যরাও আদি বিন হাতিম থেকে এ বর্ণনাটি পেশ করেছেন। হজরত আবু জর থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এই হাদিসটির অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ, রবী বিন আনাস এবং সাঈদ বিন আসলামের সঙ্গে এই ব্যাখ্যাটি সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ইবনে আবি হাতেম বলেন, এই ব্যাখ্যাটিতে মতবিরোধ রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আমি বলি, 'গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দ্বল্লিন' অর্থাৎ গজবগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট– এই শব্দ দু'টিতে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অবাধ্য এবং বেদাতী সম্প্রদায় শামিল রয়েছে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেন– গজবুল্লাহি আলায়হি (তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গজব)। কাফের এবং বেদাতীদের সম্পর্কে বলেছেন ফামাজা বা'দাল হাক্কী-ইল্লাদ্‌ দালাল এবং আল্লাজিনা দল্লা সা'ইউহুম ফিল হায়াতিদ্দুনিয়া।

সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে ক্ষণিক বিরামসহ আমীন বলা সুন্নত। হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দু'অবস্থাতেই তাশদীদবিহীন অবস্থায় এই শব্দটি পাঠ করা যায়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বাগবী বলেছেন, আমীন শব্দের অর্থ শুনুন এবং কবুল করুন। অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং গ্রহণ করুন। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইমাম ছা'লাবী উল্লেখ করেছেন, আমি নবী করিম স. এর নিকটে আমীন শব্দটির অর্থ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন– ইফয়াল। ইবনে আবী শায়বা তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী দালায়েল পুস্তকে হজরত আবু মায়সারা থেকে বর্ণনা করেছেন– হজরত জিব্‌রাইল আ. রসুল স. কে সুরা ফাতিহা পাঠ করিয়েছেন এবং ওয়ালাদ্‌দ্বল্লিন শেষে বলেছেন, এবার বলুন আমীন। ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন– উচ্চ মর্যাদাশালী

সাহাবী হজরত আবু জোহাইর বলেছেন, আমীন হচ্ছে পত্রের উপর সীলমোহর করার মতো। তিনি আরো বলেছেন, আমি এক রাতে রসুল স. এর সঙ্গে বাইরে বের হলাম। চলতে চলতে আমরা এমন এক লোকের নিকট পৌঁছলাম, যিনি পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া প্রার্থনা করছিলেন। রসুলেপাক স.এরশাদ করলেন, যদি সে তার দোয়াতে সীলমোহর করে দেয়, তবে আল্লাহ্পাক তার দোয়া কবুল করবেন। সঙ্গীদের একজন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দোয়াকে সীলমোহর করতে হয় কীভাবে? তিনি স. বললেন, 'আমীন' দিয়ে। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. নির্দেশ করেছেন (হে মানুষেরা) ইমাম যখন ওয়ালাদ্দ্বল্লিন বলবেন তখন তোমরা বলবে আমীন। ওই সময় ফেরেশতারাও আমীন বলেন। যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের অনুরূপ হয়, তার অতীত পাপের উপর ক্ষমার কলম আন্দোলিত হয়। আবু দাউদ, তিরমিজি ও দারা কুতনীতে রয়েছে- রসুল স. যখনই ওয়ালাদ্দ্বল্লিন পাঠ করতেন তখনই বলতেন, আমীন। এই হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে ইবনে হাব্বান শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন।

ফযীলত

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন– আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ, সুরা ফাতিহার মতো কোনো সুরা তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল অথবা কোরআন– কোনো আসমানী কিতাবেই নেই। এটা সেই অনুপম ও অনন্য বাণীসপ্তক যা আল্লাহ্পাক আমাকে দান করেছেন। তিরমিজি এই হাদিসটি লিখেছেন এবং হাদিসটিকে বিশুদ্ধ এবং হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের মাপকাঠি অনুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা ক'জন রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হজরত জিব্রাইলও এক পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ উপরের দিকে দরোজা খোলার মতো আওয়াজ পাওয়া গেলো। হজরত জিব্রাইল আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এই দরোজাটি আগে কখনো নিরর্গল করা হয়নি। বর্ণনাকারী (হজরত ইবনে আব্বাস) বর্ণনা করেছেন, ইত্যবসরে আকাশ থেকে এক ফেরেশতা নেমে এলেন এবং রসুল স. এর সম্মুখবর্তী হয়ে নিবেদন করলেন, এই মুহূর্তে আপনাকে দু'টি নূরের অধিকার দেয়া হলো। যে অধিকার অন্য কোনো নবী পাননি। একটি হলো ফাতিহাতুল কিতাব এবং অপরটি হলো সুরা বাকারার শেষাংশ। এই দু'টি নূরের একটি থেকে আপনি যদি একটি বর্ণও পাঠ করেন, তবে পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী হবেন। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন– আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমি আমার বান্দাগণের নামাজকে দুইভাগে ভাগ করেছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দাদের। বান্দারা যা চাইবে তাই পাবে। রসুল স. আরো এরশাদ করেন- যখন বান্দা বলে আলহামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা

আল্লাহ্‌র) তখন আল্লাহ্ বলেন, হামাদানি আবদি (আমার বান্দা আমার অনেক প্রশংসা করেছে)। বান্দা যখন বলে, আর রহমানির রহীম। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার খুব গুণগান করছে। বান্দা মালিকি ইয়াউমিদ্দিন বললে আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করছে। যখন বান্দা বলে, ইয়া কানা'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্‌তাঈন। তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা হলো আমার ও আমার বান্দার মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ। আমার নিকট আমার বান্দার জন্য সে বস্তুই প্রস্তুত রেখেছি যা আমার বান্দা চায়। বান্দা যখন বলে, ইহ্‌দি নাস্‌সিরত্বল মুস্তাক্বীম; সিরত্বল্লাজিনা আন্‌-আম্‌তা আলাইহিম, গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দ্বল্লিন। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করলাম। আরো প্রার্থনা করলেও কবুল করবো। মুসলিম।

ইবনে উমাইর থেকে আবদুল মালিক মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন - সুরা ফাতিহা সকল রোগের মহৌষধ। বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে এ হাদিসটি দারেমী তাঁর মসনদে এবং বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ইমানে লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন - হে জাবের! আমি কি বলবো কোরআনের সর্বোত্তম সুরা কোনটি? হজরত জাবের বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এরশাদ করুন। রসুল স. বললেন, সুরা ফাতিহা। হজরত জাবের বলেন, আমার মনে হলো, রসুল স. যেনো বললেন, ফাতিহা হলো সকল ব্যাধির মহৌষধ। হজরত জাবের কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, সুরা ফাতিহা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক। হাদিসটি খালই তাঁর ফাওয়ায়েদ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সাঈদ বিন মায়াল্লী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা হচ্ছে - আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। স্ব-সূত্রে ইমাম বোখারী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বলেছেন, সুরা ফাতিহা কোরআনের দুই তৃতীয়াংশ।

আবু সুলায়মান বলেছেন, এক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সাহাবী যাত্রাপথে এক মৃগী রোগীর সাক্ষাত পেলেন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো। সাহাবাদের একজন সুরা ফাতিহা পাঠ করে তার কানে ফু দিলেন সে দিব্বি সুস্থ হয়ে উঠলো। রসুল স. এঘটনা জানতে পেয়ে এরশাদ করলেন, এরকমতো হবেই। কারণ, কোরআন জননী ফাতিহা হচ্ছে সকল ব্যাধির প্রতিষেধক। ইমাম ছা'লাবী এই বর্ণনাটি আবু সুলায়মানের উদ্বৃতিসহ মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ্ এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন– সুরা ফাতিহা বিষেরও ঔষধ। সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে এবং বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ইমানে এ হাদিসটি লিখেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা প্রবাসে ছিলাম। পথ চলতে চলতে এক স্থানে থামলাম। সেখানে এক দাসী এসে বললো, এই জনপদের সর্দারকে সাপে কেটেছে। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ওঝা আছে? সাহাবাদের একজন দাঁড়ালেন এবং দাসীর সাথে গিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে সর্দারের সর্পদষ্ট স্থানে ফুঁ

দিলেন। লোকটি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেলো। প্রবাস বাস শেষে গৃহে ফিরে আমরা হুজুর স. এর নিকট এ ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. ওই সাহাবীকে বললেন, তুমি কেমন করে জানলে যে এটা একটা মন্ত্র? বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু শায়েখ এবং ইবনে হাব্বানও এরকম হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. সুরা ফাতিহা পাঠ করে আমার উপর ফুঁ দিয়েছেন এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, তাঁর মুখের পবিত্র লালা আমার মুখে দিয়েছেন। আউসাত গ্রন্থে এ হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিবরানী। হজরত আ'নাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, শয্যায় শুয়ে সুরা ফাতিহা এবং সুরা কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করলে মৃত্যু ব্যতীত অন্য সকল বিপদ থেকে নিরাপদ ও নির্ভয় থাকা যায়।

সুরা বাকারা

সুরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। জননী আয়েশা রা. থেকে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, (হজরত আয়েশা বলেন) সুরা বাকারা এবং সুরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি রসুল পাক স. এর সঙ্গে ছিলাম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১

❑ আলিফ্- লাম-মীম।

আলিফ্ লাম মীম - এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রারম্ভে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণের বিভিন্নমুখী মন্তব্য রয়েছে। যেমন– ১. কেউ কেউ বলেছেন, সুরার প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ এই অক্ষরগুলো ওই সুরারই নাম। ২. কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো একটি বাক্যের শেষ এবং অন্য বাক্যের সূচনা সম্পর্কে সতর্কবার্তা (বক্তার আসল উদ্দেশ্য হলো এক বাক্যের পরিসমাপ্তি এবং অন্য বাক্যের সূচনাচিহ্নকে এগুলো দ্বারা সনাক্ত করা)। ৩. কারো কারো অভিমত হচ্ছে- এগুলো বিভিন্ন শব্দের আদ্যাক্ষর। যেমন, আরবের একজন প্রসিদ্ধ কবির বর্ণনায় রয়েছে– 'ফাকুলতু লাহা কিফি ফারতাল লি ক্বফ।'

আবুল আলীয়া থেকে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলিফ লাম মীম এর আলিফ দ্বারা ইলাউল্লাহ্, লাম দ্বারা লুতফে খোদা এবং মীম দ্বারা মালিক বেজাওয়াল বুঝানো হয়েছে। আবুল আলীয়া থেকে আরদ ইবনে হামীদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম এরকমও বর্ণনা

করেছেন যে, আলিফ লাম র, হা মীম এবং নুন এর সমষ্টি হচ্ছে 'আর রহমান'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলিফ লাম মীম এর অর্থ আনাল্লাহু আলীম (আনা শব্দের আলিফ, 'আল্লাহ্' শব্দের লাম এবং 'আলীম' শব্দের মীম)। আল্লামা বাগবী সাঈদ ইবনে জোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আলিফ লাম মীম ছুদ অর্থ আনাল্লাহু আয়্‌লামু ওয়াফছাল (আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং সকল কিছুর সুষ্ঠ সমাধান দাতা)। অনুরূপ আলিফ লাম র অর্থ 'আনাল্লহ আরা' (আমি আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা)। আলিফ লাম মীম র অর্থ আনাল্লাহু আয়্‌লামু ওয়া আরা (আমি আল্লাহ্ সমধিক পরিজ্ঞাত ও দ্রষ্টা) ১। কোনো কোনো প্রাজ্ঞজনের ধারণা আবজাদের হিসাবানুযায়ী এর মর্ম হচ্ছে- জাতির জীবনেতিহাসের সময়কাল নিরূপণ এবং ওই জাতির মহৎ বিবর্তনকে চিহ্নিতকরণ২। যেমন– বোখারী তাঁর ইতিহাসে এবং ইবনে জারীর অশক্ত সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.এর খেদমতে কতিপয় ইহুদী আগমন করলো। তিনি স. সুরা বাকারা পাঠ করলেন। ইহুদীরা হিসাব করে এবং মনে কিছু ভেবে নিয়ে বললো, আমরা এমন ধর্মে কেমন করে আসবো যাঁর স্থায়িত্ব মোটে একাত্তর বৎসর (আবজাদের হিসাবে আলিফ লাম মীমের গাণিতিক সংখ্যা দাঁড়ায় একাত্তরে)। রসুল স. তাদের কথা শুনে মৃদু হেসে নীরব হয়ে গেলেন। ইহুদীরা বললো, আরো কিছু কি আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আরো অবতীর্ণ হয়েছে 'আলিফ লাম মীম ছুদ', 'আলিফ লাম র' এবং 'আলিফ লাম মীম র'। ইহুদীরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললো, আবুল কাশেম! তুমিতো আমাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ঠেলে দিলে। আলিফ লাম মীম ছুদের সংখ্যা একশ একষট্টি, আলিফ লাম র এর সংখ্যা দু'শ একত্রিশ এবং আলিফ লাম মীম র এর সংখ্যা দুইশ একাত্তর। ভাবালে কিন্তু আমরা তো এখন ভীষণ সংশয়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারছি না কোনটা গ্রহণ করবো আর কোনটা পরিত্যাগ করবো।

---

১. হজরত আলীয়া এবং ইবনে আব্বাসের মন্তব্য সমুহের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হরূফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন প্রতিটি বর্ণ কোনো না কোনো শব্দের বাহন।

২. পারস্যের অধিবাসীরা তাদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস অথবা কোনো রাজার অভিষেক কিংবা কোনো ঘটনা সংঘঠিত হওয়ার তারিখের স্মৃতিচারণের জন্য আরবী বর্ণমালার আবজাদ করে বিভিন্ন সংখ্যা নির্ধারণ করে রেখেছিলো। আবজাদ সংখ্যার আবিষ্কারক আরবী নয়। আর আরবে এর প্রচলনও ছিলো না। তাই একে আরবী নিয়ম বলে সনাক্ত করা সঙ্গত নয়। ইহুদী পন্ডিতেরা বিষয়টি জানতো। তাই তারা হরূফে মুকাত্তায়াতের আবজাদ হিসাব কষতে প্রবৃত্ত হয়েছিলো।

আমি বলি, হরূফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো এসেছে, তার সবগুলোই সত্যপন্থী আলেমগণের নিকট পরিত্যাজ্য। ১. প্রথম মতটি পরিত্যাজ্য একারণে যে, এগুলো সুরার নাম হলে একই সুরার এরকম মিশ্রিত নাম

অশোভনীয়। আলংকারিকগণ এরকম জগাখিচুড়ী নাম কিছুতেই পছন্দ করবেন না। একই বিষয়ের তিন অথবা দুই তিন অথবা ততোধিক বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নাম রুচিসম্মত নয়। আর কিছু সুরার নামকরণ হবে, আবার কিছু সুরা হবে নামবিহীন–এরকম ব্যবস্থা নামকরণকারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। ২. দ্বিতীয় মতটি একারণেই গ্রহণীয় নয় যে, এগুলোকে এক বাক্যের শেষ ও অন্য বাক্যের শুরু বলে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এরকম হলে প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে এই ব্যবস্থাটি বলবৎ থাকতো। ৩. তৃতীয় অভিমতটিও ভুল। শব্দসমূহের কোনো কোনো বর্ণকে নির্বাচন করে একত্রিত করার রীতি আরবী ভাষায় নেই। এসম্পর্কে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে কিফি শব্দটি দ্বারা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কবির সম্বোধনকৃত উক্তি কাফ যা ওয়াকাফতু শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এই রীতিটি হরূফে মুকাত্তায়াতের অক্ষর বিন্যাসের সম্পূর্ন বিপরীত। কবিতার দৃষ্টান্তটির সঙ্গে হরূফে মুকাত্তায়াতের কোনোই সৌসাদৃশ্য নেই (আলিফ লাম মীম এর আলিফ দ্বারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত, লাম দ্বারা স্নেহাশীষ এবং মীম দ্বারা সীমাহীন রাজত্ব – এরকম মর্ম গ্রহণ করা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না)। এবার আসা যাক কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি সম্পর্কে। বর্ণিত উক্তিগুলো অপ্রচলিত এবং বিরোধাভাস সম্পন্ন। তাছাড়া উক্তিগুলো ভাষা ও অলংকারশাস্ত্রবিরুদ্ধ। একেক শব্দের একেক অক্ষরকে নির্দিষ্ট করে একত্রিত করা। ইচ্ছে মতো কোনো অক্ষর গ্রহণ ও বর্জন করা অভাবনীয়। শেষ প্রসঙ্গটি হচ্ছে ইহুদীদের কথোপকথন। তাদের মন্তব্য শুনে রসুল স. মৃদু হেসেছিলেন। তাঁর এই মৃদু হাসি অনুমোদন মূলক ছিলো না। ছিলো অবজ্ঞামূলক। তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা দেখে তিনি এরকম উপেক্ষাসূচক হাসি হেসেছিলেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, বিচ্ছিন্ন এই অক্ষরগুলো শপথের অক্ষর। অক্ষরগুলো শপথের মহিমাকে প্রকাশ করেছে। অক্ষরগুলো আল্লাহ্‌পাকের নাম সমূহের মূল আর ভাষারও আদি। তাই আল্লাহ্ ওগুলোর দ্বারা শপথ উচ্চারণ করেছেন। এই অভিমতটি গ্রহণ করলে এমন একটি বিষয়কে স্বীকার করে নিতে হবে, যার কোনো প্রমাণপঞ্জি কিংবা কোনো অকাট্য দলিল নেই। তাই এ অভিমতটিও ধর্তব্য নয়। মোট কথা, এ সম্পর্কে কোনো অভিমতই গ্রহণযোগ্যতাকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বনামধন্য মুফাস্‌সির কাজী বায়যাবী আরেকটি অভিনব ও বিতর্কিত অভিমতকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে– অক্ষরগুলো বাক্যের আদি অংশ ও ভাষার মূল; তাই কতিপয় অক্ষর দ্বারা কিছু কিছু সুরা শুরু করা হয়েছে- উদ্দেশ্য ওই সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা, যারা কোরআন মজীদ যে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ- একথা স্বীকার করে না। তারা আরো বলে, তোমরা যা পড়ে শোনাচ্ছো– তা তো তোমাদের কথা মতোই অক্ষরাশ্রয়ী। তাদেরকে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কোরআন যদি আল্লাহ্‌পাকের বাণী না হয়– তবে তোমরা এতোদৃশ বাণী নির্মাণ করতে পারো না

কেনো? সুরার শুরুতে হরূফে মুকাত্তায়াতের প্রতিষ্ঠার আরো একটি উদ্দেশ্য, মানুষের স্মৃতিতে এমন একটি গুঞ্জরণকে আন্দোলিত করে তোলা– যা তাদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে সুপ্রকট করে। বর্ণ ব্যতিরেকে লিখা ও পড়া অসম্ভব! তাই অনক্ষর কোনো ব্যক্তির উপরে অবতারিত বিচ্ছিন্ন শব্দরাজির এরকম রহস্যাচ্ছন্নতা একটি নিশ্চিত অলৌকিকত্ব (মোজেজা) নয় কি? এই রহস্যপূর্ণ বর্ণগুলোর মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা হয়েছে, তার সম্মুখে আরবী ভাষা বিশারদগণ বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য। মোট কথা, লক্ষ্য করতে হবে আরবী বর্ণমালার চৌদ্দটি বর্ণ উনত্রিশটি সুরার শুরুতে সন্নিবেশিত হয়েছে– যেগুলো গণনায় বর্ণসমষ্টির সমান অথচ ব্যবহারে অর্ধেক। আর পরিমাণ নির্ধারণও এরকম যে, কোনো অক্ষরই এর আওতা বহির্ভূত থাকেনি। হরূফে মুকাত্তায়াত হিসেবে যে চৌদ্দটি বর্ণ নির্ধারণ করে অধিকাংশ বাক্যগঠিত হয়, সেগুলো দিয়েই অন্য অক্ষরগুলোর ব্যবহার নিতান্তই কম। যেমন, আলিফ লাম মীম, আলিফ লাম র ইত্যাদির উদ্দেশ্য এই যে, একই বর্ণমালা দ্বারা আল্লাহ্ ও মানুষের বাক্যাবলী গঠিত হলেও, হে কোরআন অস্বীকারকারীগণ (হরূফে মুকাত্তায়াত সহ) কোরআন সদৃশ বাণী নির্মাণ করতে তোমরা অক্ষম হয়েছো কেনো? এ প্রসঙ্গের শেষ কথাটি হচ্ছে এই যে, হরূফে মুকাত্তায়াত আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসুলের একধরনের রহস্যময় আলাপন, যা দুর্জ্ঞেয়। এটাই আমার সার কথা এবং সঠিক সমাধান। বিষয়টি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের একান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ এখানে যোগ্যতারহিত। আর এ বিষয়ে সাধারণকে জ্ঞান দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্র রসুলও তাঁর পরম প্রিয় প্রভুপালকের ইচ্ছানুসারী। রসুল স. এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণ অবশ্য এর ব্যতিক্রম। ইমাম বাগবী বলেন, হজরত আবুবকর সিদ্দিক রা. বলেছেন– প্রত্যেক গ্রন্থেরই একটি গোপন রহস্য থাকে। আর কোরআনের গোপন রহস্য হচ্ছে, কোনো কোনো সুরার প্রথমে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। হজরত আলী বলেছেন, প্রতিটি পুস্তকের একটি সার সংকলন থাকে। আর কোরআন মজীদের সার সংকলন হলো এই বিচ্ছিন্ন হরফগুলো। হজরত আবুবকর, হজরত আলী ও অন্যান্যদের নিকট থেকে ইমাম ছা'লাবীও এরকম বর্ণনা পেশ করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন সমরখন্দী। সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম কুরতুবী, রবীয়া ইবনে খাসয়াম, আবুবকর ইবনে আম্বরি, ইবনে আবী হাতেম। মুহাদ্দিসগণের একটি বড় দলও বিভিন্ন সূত্রসহযোগে এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন। হজরত সাজওয়াদী বলেছেন, এ সম্পর্কে সুপ্রবীণ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ইন্নাহা সির্‌রুন বাইনাল্লাহি ওয়া বাইনা নাবীইয়্যিহি সল্লাল্লাহু ওয়া আলইহি ওয়া সাল্লাম (এগুলো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর মধ্যকার গোপন রহস্য)। এরকম বাকভঙ্গি গোপন আলাপনের ইঙ্গিতবহ।

এরকমও বলা হয়েছে যে, বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ই রাখেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র রসুলও কিছু জানেননা, রসুলের অনুসারীগণ তো নয়ই। এই অভিমতটি যুক্তিসম্মত নয়। অভিমতটি মেনে নিলে একথাটিও মেনে নেয়া জরুরী হয়ে পড়ে যে, কোরআন অর্থবহ নয় (শব্দ ও অর্থ সহযোগেই কোরআন প্রকাশিত হয়েছে। কোরআন যেমন কেবল শব্দমালার সংকলন নয়, তেমনি সম্পূর্ণত অর্থনির্ভরও নয়। কোরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থের সমন্বয়। – উর্দু অনুবাদক)। শ্রোতাকে কিছু জানানোই বক্তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে– তাই হরূফে মুকাত্তায়াতের অর্থ অবশ্যই রয়েছে। নতুবা ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম, যেমন কোনো ভারতীয় ভাষাভাষীকে আরবী ভাষায় বক্তৃতা শোনানো হচ্ছে। এরকম ভাবলে কোরআন সামগ্রিক ভাবে বোধগম্যতার আড়ালে থেকে যাবে। তখন একে হেদায়েতও বলা যাবেনা। আর আল্লাহ্পাকও এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ছুম্মা ইন্না আলাইনা– বায়ানুহু (অতঃপর বর্ণনার দায়িত্ব আমার উপরেই)। আল্লাহ্তায়ালার এই প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং আল্লাহ্ জানেন আর কেউ জানেন না– হরূফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে এই অভিমতটি গ্রহণীয় নয়। কারণ, আল্লাহ্পাকের পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হওয়া অসম্ভব। সুস্পষ্ট (মোহকামাত) আয়াত যেমন সত্য, তেমনি অস্পষ্ট (মোতাশাবিহাত) আয়াতও সত্য। তাই আল্লাহ্তায়ালার জন্য এটা নিতান্তই জরুরী যে, তাঁর কৃত অঙ্গীকারাণুসারে অবতীর্ণ কোরআনের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি অবশ্যই তাঁর প্রিয় রসুলকে জানাবেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফে সানী কাদ্দাসা সির্রুহু হরূফে মুকাত্তয়াতের রহস্য জানতেন। সারকথা হচ্ছে, অস্পষ্ট আয়াত সমূহের জ্ঞান রসুল স. এর তো ছিলোই, সেই সঙ্গে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসারীগণও এই জ্ঞান রাখেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি 'রসিখিনা ফিল ইলম' (জ্ঞানে সুগভীর) দের মধ্যে একজন। আর যাঁরা অস্পষ্ট আয়াত ও বিচ্ছিন্ন বর্ণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, আমি তাঁদেরও একজন। শব্দগত কিছু তারতম্যসহ মুজাহিদও এরকম বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরীফে এরকম উল্লেখিত রয়েছে যে, বুঝা যায় না আমার উম্মতের পূর্ববর্তীগণ উত্তম না পরবর্তীগণ। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের জ্ঞান ছিলো সুবিস্তৃত ও সুগভীর। সুমহান ছিলেন তাঁরা। হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফে সানী র. দাবী করেছেন, আল্লাহ্পাক কোরআন পাকের হরূফে মুকাত্তায়াতের রহস্য আমার নিকট উন্মোচন করেছেন। কিন্তু সাধারণ্যে এ সম্পর্কে বিবরণ প্রদান অসম্ভব।

কেউ কেউ বলেন, বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো আল্লাহ্পাকের নাম। যেমন– আল্লাহ্র নাম ও সিফাত কিতাবে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এই মর্মে বর্ণনা পেশ করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া। বলা হয়েছে, এ বর্ণনাগুলোর সনদও সহীহ্। ইবনে মাজা বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে হজরত আলী তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, ইয়া কাফ, হা, ইয়া,

আঈন, ছ্বদ ইগফিরলী। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, কাফ,হা, ইয়া, আঈন, ছ্বদ – এর অর্থ তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য দেয় না।

কতিপয় আলেম বলেছেন, বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো কোরআনের নাম। হজরত কাতাদা থেকে আবদুর রাজ্জাক এরকম বিবরণ এনেছেন। হজরত কাতাদার উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, বিচ্ছিন্ন অক্ষর দ্বারা কোরআন এবং কিতাবের নাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

আমি বলি, বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার দ্বারা আল্লাহ্পাকের নাম উদ্দেশ্য হলে, একথা মেনে নিতে হবে যে– নামগুলো হবে অবশ্যই গুণবাচক। আর গুণবাচক নাম আল্লাহ্তায়ালার সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে নির্দেশ করে না। আর কোরআনের নাম বলে মেনে নিলে গুণবাচক নামকেই ধরে নিতে হবে। যেমন কোরআন, ফোরকান, নূর, হায়াত, রূহ্, জিকির, কিতাব ইত্যাদি। কিন্তু একথাটিও মেনে নেয়া যায় না। কারণ, আল্লাহ্র নাম এবং কোরআনের নামের অর্থ মানুষ জানে। কিন্তু হরূফে মুকাত্তায়াতের অর্থ মানুষেরা জানে না। এই জ্ঞান বক্তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন– তাকেই এই জ্ঞান দান করেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এমতটি সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তায়াত আল্লাহ্পাক এবং তাঁর প্রিয় রসুলের মধ্যবর্তী একটি গোপন রহস্য। এরহস্য ভেদ করে- এমন কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কাউকে কাউকে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যটির অংশ দান করেন। হরূফে মুকাত্তায়াত যেমন সাধারণের জ্ঞানবহির্ভূত। তেমনি আয়াতে মুতাশাবিহাতের অর্থও সাধারণের নাগালের বাইরে। 'আর রহমানু আলাল আরশিশ্তাওয়া, ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম'– এ সকল আয়াতের শব্দগত বা প্রকাশ্য অর্থ করা যায় না। মোতাজিলারা এরকম করেছে– তাই তারা ভ্রষ্ট। মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এসমস্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ জানতেন। তাঁর কতিপয় একনিষ্ঠ অনুসারীগণও জানতেন।

দুর্বোধ্য এ বিষয়টি সম্পর্কে এতোটুকু বলা যায় যে, আল্লাহ্পাকের গুণাবলী অসীম ও অশেষ। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, 'হে প্রিয় নবী! আপনি বলুন– আমার আল্লাহ্পাকের বাণী লিখতে গিয়ে সাগরের সমূদয় পানিও যদি কালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে আমার প্রভুর বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সাগর শুকিয়ে যাবে।' আরো বলেছেন, 'পৃথিবীর সমস্ত গাছকে যদি লেখনী করা হয়, সাত সাগরের পানি যদি হয় কালি– তবে কলম ও কালি এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে– তবু আল্লাহ্পাকের কথা শেষ হবেনা।'

এটা চিরন্তন সত্য যে, শব্দকে আশ্রয় করা হয় কোনো না কোনো অর্থ প্রকাশের জন্য। শব্দ সসীম। কিন্তু আল্লাহ্পাকের সত্তা ও বৈশিষ্ট্যাবলী অসীম। আর মানবিক জ্ঞান আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর মহিমা আয়ত্ত করতে অক্ষম। তবে হ্যাঁ, আত্মিকভাবে এই উদাহারণরহিত জ্ঞান সম্পর্কে বিস্ময়বিমূঢ় পরিচিতি যৎকিঞ্চিত লাভ করা যেতেও পারে। আর বিষয়টি কেবল সাধারণ ব্যক্তি

নয়– বিশেষ ব্যক্তিরও ধারণা অপেক্ষা উচ্চে। যেমন–হজরত আবুবকর সিদ্দিক রা. বলেন, অনুসন্ধানের পরে না পাওয়াটাও একটি জ্ঞান। আর আল্লাহ্‌পাকের সত্তাসম্ভূত রহস্যকে জ্ঞানাবদ্ধ করার চেষ্টা শিরক। কিন্তু তাঁর গুণাবলী বস্তুজগতের গুণাবলীর সঙ্গে এক ধরনের সাদৃশ্য রচনা করেছে। তাই সে সমস্ত গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি তাঁর অতুলনীয় গুণাবলীকে প্রকাশ করেছেন। যেমন, এলেম (জ্ঞান), হায়াত (জীবন), সামা (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), ইরাদা (অভিপ্রায়), রহমত (দয়া), কহর (বিপদ) ইত্যাদি। আল্লাহ্‌তায়ালার এসব গুণাবলী সম্পর্কে যখন বিবরণ দান করা হয়,তখন মানুষ মনে করে, আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীকে জ্ঞানায়াত্ত করে ফেলেছি। মনে করে, গুণাবলীর প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে। এই ধারণা সত্যানুসরণ থেকে বহু দূরে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত গুণাবলী নয় বরং গুণাবলীর সুদূরবর্তী কিছু প্রচ্ছায়া ছাড়া অন্য কিছু লাভ করা তাঁদের ক্ষমতাতীত। আল্লাহ্‌তায়ালার এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে সৃষ্টিজগত যার কোনো প্রকার সাদৃশ্যই কল্পনা করতে পরে না। হজরত নবী করীম স. তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করতেন, আয় আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার ওই সমস্ত নামের মাধ্যমে ডাকি যা কেবল তোমারই জন্যে নির্ধারিত। যা তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছো অথবা তোমার কোনো সৃষ্টিকে জানিয়ে দিয়েছো কিংবা যা রেখেছো অন্তরালবর্তী সংরক্ষণে– যা কাউকে জানাওনি। এই হাদিসটি ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ্ কিতাবে এবং হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে লিখেছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি দীর্ঘ হাদিস থেকে এই বর্ণনাটি এনেছেন ইমাম আহমদ ও আবু ইয়া'লী। যে বর্ণনাটির প্রথমেই উল্লেখ ছিলো লিমান আসাবাহ্ আল্লাহুম্মা। হজরত আবু মুসা থেকে তিবরানীও এরকম বলেছেন।

শেষ কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ওই নামগুলো গোপনীয় এবং মানুষের ভাষা ও অভিধানের ঊর্ধ্বে। আবার কতিপয় নাম তিনি তাঁর হাবীব স. এবং তাঁর যথার্থ অনুসারীদেরকে ইল্‌হামের (আত্মিক প্রক্ষেপণের) মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদেরকে দিয়েছেন দিব্যজ্ঞান–যার মাধ্যমে তাঁদের সামনে সকল রহস্য উন্মোচিত হয়। যেমন– আল্লাহ্‌পাক হজরত আদম আ.কে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন এমন দিব্যজ্ঞান– যার আলোকচ্ছটায় প্রতিটি বস্তুর তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। তাই তিনি সহজে বুঝতে পারতেন, কোন্ শব্দটি কোন বস্তুর জন্য সমীচীন। ফলে মনে হতো তিনি যেনো আগে থেকেই এসব জানতেন। এ ব্যাপারটিও সম্ভব যে, হরূফে মুকাত্তায়াত তেলাওয়াতের সময় আল্লাহ্‌র ওই সমস্ত নাম বা নামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মর্ম নবী করীম স. এর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হতো। আমার শায়েখ উস্তাদ কতো সুন্দররূপেই না বলেছেন, কেউ যদি কাশ্‌ফ (আত্মিক দৃষ্টি) সহযোগে কোরআনকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তার সম্মুখে এই রহস্যের অর্গল উন্মোচিত হবে। কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌পাকের বরকতের সুগভীর সমুদ্র। এই সুগভীর সুবিশাল সীমাহীন সাগরে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো এমতো বিকশিত

হয়— যেনো উত্তাল এক উর্মিমুখরতা আরো গভীরতর কোনো সুবিশাল সাগরের দিকে সতত প্রবহমান। যদি সেই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে হুরূফে মুকাত্তায়াতকে কোরআনেরই নাম নির্ধারণ করা যায়, তবে সত্বরই সুস্পষ্ট হয় যে, সমস্ত কোরআন মজীদই এই সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বর্ণ সমূহের অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যা।

আমি বলি, এ বিষয়ে আল্লামা বায়যাবীর মত বর্ণিত অভিমতের বিরুদ্ধে নয়। কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের একটি প্রকাশ্য ও আরেকটি অপ্রকাশ্য মর্ম রয়েছে। প্রতিটি উচ্চারণের সীমারেখায় রয়েছে একটি দিকনির্দেশনা। প্রতিটি বর্ণেরও রয়েছে একটি সীমাচিহ্ন। সেগুলোরও দিকনির্দেশ রয়েছে। আল্লামা বায়যাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই প্রতিটি মূল অক্ষর যেমন প্রকাশ্যতঃ কোরআনের মূল প্রকৃতি হয়েছে, তেমনি অধিকাংশ বাক্য গঠিত হয়েছে এই অক্ষরগুলো দিয়েই। কোরআনে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম অনুষঙ্গ, অভাবনীয় রহস্যের দ্যুতিচ্ছটা। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো যেনো সেই নিগুঢ় নির্যাস, যেনো আল্লাহ্পাকের অনিঃশেষ অনুকম্পার জলধিতরঙ্গ - উদ্বেলিত নির্ঝর। এই গোপনতম রহস্যাচ্ছন্নতার বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই অবহিত। আর তিনি নিছক প্রেম ও পবিত্র অভিপ্রায় বশতঃ এই জ্ঞানের অবহিতি দিয়েছেন তাঁর প্রিয় রসুলকে এবং সেই সূত্রে রসুলের পথের দিকে আহবানকারী অনুসরণনিষ্ঠদেরকে। কোন উপায়ে তিনি এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

❐ ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, সাবধানীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশক।

এই গ্রন্থটি হচ্ছে ওই পবিত্র গ্রন্থ— যা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. পাঠ করেন এবং যা অস্বীকার করে মুশরিকেরা। 'জালিকা' শব্দটি দ্বারা কোরআনের ওই অংশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে (এই সুরা বাকারার পূর্বে) অবতীর্ণ হয়েছিলো। এরকমও হতে পারে যে, এখানে সম্পূর্ণ কোরআনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে— যার কিছু অংশ অবতীর্ণ করা হয়েছে পূর্বাহ্নেই। সকল অবস্থায় 'জালিকা' শব্দটি উদ্দেশ্য এবং কিতাব শব্দটি বিধেয়। অর্থাৎ এই কিতাব হচ্ছে ওই কিতাব— যা প্রদানের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে রসুলে পাক স. কে। এরকমও বলা যায় যে, এ হচ্ছে সেই পরিপূর্ণ গ্রন্থ যা কিতাব নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

'কিতাব' শব্দটি বিশেষণ এবং এর পরের শব্দগুলো বিধেয়– এরকমও বলা যেতে পারে। কতিপয় মুফাস্‌সির উল্লেখ করেছেন, এখানে 'হাজা' শব্দটি উহ্য রয়েছে। আর এই উহ্য বাক্যটি সহ অর্থ হবে এরকম– হে মোহাম্মদ স.। আপনার উপর যা প্রত্যাদেশ করা হয়, তা হচ্ছে এই কিতাব–যা অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার আমি করেছি তওরাত ও ইঞ্জিলে। অথবা 'ইন্না সানুলক্বি আলাইকা ক্বওলান ছাক্বিলা'– একথার দ্বারা যে অঙ্গীকার আমি করেছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'জালিকা' শব্দটি উহ্য উদ্দেশ্যটির বিধেয়। আর 'কিতাব' হচ্ছে এর বিশেষণ। 'কিতাব' শব্দটি যদিও মাছদার বা ধাতু– কিন্তু তার অর্থ হবে মকতুব বা লিখিত। আরবী ভাষায় ধাতুর সঙ্গে কর্ম পদের অর্থ গ্রহণ করার রীতি বহুল প্রচলিত। এর অর্থ হচ্ছে মিলিত করা, একত্রিত করা। এ কারণেই সেনাবাহিনীকে বলা হয় কুতাইবাতুন। কারণ, অনেক লোক সেখানে একত্রিত থাকে। গ্রন্থের নাম কিতাব রাখা হয়েছে একারণে যে, এতে বর্ণ সমূহের পারস্পরিক মিলন অথবা সন্ধি নিশ্চিত হয়। নামকরণের এটাও একটি কারণ যে, এটা লিপিবদ্ধ। 'জালিকা' শব্দটি দ্বারা দূরবর্তী ইঙ্গিত করা হয়, যে ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিতাবের উচ্চ মর্যাদার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

লা রইবা ফিহী– এর অর্থ এই কিতাবের প্রমাণাদি এমতো প্রকাশ্য, যৌক্তিক এবং দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ও ন্যায়ানুগতাপ্রিয় ব্যক্তি একে ওহী বলে আখ্যায়িত করতে এতোটুকুও সন্দিহান হতে পারেন না। বিধেয় এখানে নেতিবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কারণে এর অর্থ দাঁড়াবে এরকম– হে মানব সকল, এই কিতাব যে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে আগত তাতে সন্দেহমাত্র নেই। 'লা'– সত্তাগতভাবে নেতিবাচক। 'রইবা' বিশেষ্য এবং 'ফীহ্' হচ্ছে খবর। এরকমও বলা যায় যে, 'ফী' বিশেষণ, 'লিল মুত্তাক্বীন' খবর এবং 'হুদা' অবস্থা হওয়ার কারণে জবর বিশিষ্ট। অথবা 'লা'- কে খবর হিসেবে উহ্য মেনে নিতে হবে। যেমন, 'লা খইরা' শব্দটিতে খবর উহ্য রয়েছে। আর 'ফীহ্' শব্দটিকে 'হুদা' শব্দটির খবর বলা যেতে পারে। 'হুদা' শব্দটি নাকেরা হওয়ার দরুণ এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফীহ্'। এভাবে প্রতিপাদ্য বাক্যটি হবে 'লা রইবা ফীহী হুদান।' উত্তম বিধান হচ্ছে – এ সমস্ত সম্মিলিত অথবা পৃথক বাক্য সুসাব্যস্ত করা। এভাবে প্রতিটি পরের বাক্য পূর্বের বাক্যের তাগিদ হয়। যেহেতু দু'টি বাক্যের মধ্যবর্তীতে কোনো সংযোজক বর্ণ ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই 'জালিকাল কিতাব' এমনই একটি বাক্য হিসেবে দণ্ডায়মান হয়, যাতে করে একথা বুঝা যায় যে–এই কিতাব এমনই উচ্চস্তরে সমাসীন, যা চূড়ান্ত বিশেষণে বিশেষিত। এদিক থেকে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' বাক্যটিকেও এরকম নিঃসন্দিগ্ধ মনে করতে হবে। আল্লামা ইবনে কাসীর 'ফীহ্' শব্দের 'হা' কে মিলিত অবস্থায় 'ইশবা' করে পাঠ করেছেন। আর শুধু এ ক্ষেত্রেই নয় যে জমিরে

গায়েবের প্রথম অক্ষর সাকিন হবে সেটাকে মিলিত অবস্থায় 'ইশবা' করেই পড়তে হবে। অর্থাৎ যেরকে 'ইয়া' এর উচ্চারণ সহযোগেই পড়তে হবে, যদি তার পূর্বাক্ষরে হরকত থাকে। আর উক্ত হরকতযুক্ত অক্ষর যদি যের বিশিষ্ট হয় তবে 'ইয়া' দ্বারা 'ইশবা' হবে। অন্যথায় 'ইশবা' হবে 'ওয়াও' দ্বারা। যেমন, ইয়াহ্যিবুহু লাহু। কিন্তু এখানে যে শর্তটিকে মান্য করতে হবে তা হচ্ছে, শেষ অক্ষরটি সাকিনযুক্ত হতে পারবে না। সাকিনযুক্ত অক্ষর মিলিত থাকলে 'ইশবা' বাতিল হবে। এটা হচ্ছে ক্বারীগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমত। যেমন, ইয়ারদাহু, ইয়া'তিহি, নুয়াল্লিহি, নুসলিহি, ফায়ালক্বিহি, ইয়াত্তাক্বিহি। 'হা' এর পূর্বাক্ষর হরকত যুক্ত হলে, তার উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কে ক্বারীগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইনশাল্লাহ্ উপযুক্ত স্থানে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এখানে সংক্ষেপে শুধু এতোটুকুই বলা যায় যে, ক্বারীগণ পূর্বাক্ষরে হরকত দেখেই 'ইশবা' করে থাকেন। কেউ কেউ ধারণা করেন, হরকত যুক্ত পূর্বাক্ষর উহ্য অক্ষরের সমকক্ষ। তাই তারা পাঠ করেন সাকিন সহযোগে। আবার কেউ কেউ একে পাঠ করেন ইখতেলাছ এর আকারে। কারণ, এই পদ্ধতিতে পূর্বাক্ষরের হরকতকে বহিরাগত বলে মনে করা হয়, যা উহ্য অক্ষরের উপর জোর দেয়। এই কিতাব পথপ্রদর্শন করে তাঁদেরকে যাঁরা মুত্তাকী। এই সম্মানিত গ্রন্থের বাক্যাবলী এক অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রমাণের পরে প্রামাণ্য বিষয়, কারণের পরে কার্য - এভাবে এই পবিত্র গ্রন্থটি হয়েছে পূর্ণতার চরমতম শিখরস্পর্শী। তাই এই বাণীবৈভব যে আল্লাহ্‌রই সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। যাঁরা সাবধানী, সদাসতর্ক এবং আল্লাহ্‌কে সমীহ্ করে চলেন, তাঁরা এর আবেদনের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য। এই নিয়মেই তাঁরা লাভ করেন হেদায়েত।

হেদায়েত শব্দটি ব্যবহৃত হয় দু'টি অর্থে। একটি হচ্ছে– গন্তব্যের প্রতি পথনির্দেশ। দ্বিতীয়টি – গন্তব্যস্থলে পৌছানো। হাদি শব্দটি যদিও ক্রিয়ামূলক, তবুও শব্দটি কর্তৃপদের অর্থবাহী। হাদি অর্থ হেদায়েতকারী উত্তম পথপ্রদর্শক। প্রথম অর্থের ভিত্তিতে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এরকম– কোরআনের নির্দেশনা দ্বারা কেবল ওই সমস্ত মানুষ উপকৃত হতে পারেন, যাঁরা আল্লাহ্‌ভীরু (মুত্তাকী)। তবে সাধারণভাবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের জন্যই পথপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে এই কোরআনে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- 'হুদাল্লিন্নাস' (সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত)। তবে বিশ্বাসীরাই কেবল এ থেকে উপকৃত হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে হেদায়েতকে আল্লাহ্‌ভীরুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার কারণটিও সুস্পষ্ট। গন্তব্যস্থলে উপনীত হতে পারেন কেবল তাঁরাই, যাঁদের বিবেকের আয়না অমলিন, তমসাবিমুক্ত। যেমন, উত্তম আহার্য নিরোগ মানুষকে পরিপুষ্ট করে আর রোগগ্রস্তদেরকে করে অধিকতর পীড়িত। আল্লাহ্‌পাক অন্য আরেক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'ওয়া নুনায্যিলু মিনাল ক্বুরআনি মাহুয়া শিফা উঁ ওয়া রহমাতুল্লিল মু'মিনীনা ওয়ালা ইয়াজিদুজ্জ্বলিমিনা ইল্লা খসারা।'

মুত্তাকী ওই ব্যক্তি, যে পৃথিবীপরবর্তী জীবনের অনিষ্ট ও শাস্তি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছে। সেই অনিষ্টকারী বিষয়টি হচ্ছে শিরিক (আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অংশীস্থাপন)। শিরিক মুক্ত থাকা হচ্ছে মুত্তাকীর সর্বনিম্ন যোগ্যতা। পাপ ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত থাকা মধ্যবর্তী স্তর। আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত কার্যাবলী থেকে বিমূখ হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। এই সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহ্ হাক্কা তুক্বতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা আংতুম মুসলিমুন।'

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেকে কোনো কিছুর চেয়ে উত্তম অথবা অধম মনে না করাই হচ্ছে তাকওয়া (সাবধানতা)। শাহার ইবনে হাওশাব বলেছেন, তিনিই মুত্তাকী– যিনি নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকেন। এমনকি অতিসংশ্লিষ্টতার ভয়ে অনেক বৈধ বিষয়াবলীও পরিত্যাগ করেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত নোমান বিন বশীরের উদ্ধৃতিতে ইবনে আদীর বর্ণনায় এসেছে– রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী যা সহজবোধ্য নয়। যাঁরা এসমস্ত সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত, তাঁরা তাঁদের সম্মান ও ধর্মপরায়নতাকে আবিলতামুক্ত করেছে। আর যারা সন্দিগ্ধতায় লিপ্ত তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে নিষিদ্ধতায়। দৃষ্টান্তটি এরকম–এক রাখাল তার পশুপাল চরাচ্ছে কোনো নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে। যে কোনো মুহূর্তে সে সেই চারণভূমিতে প্রবেশ করতে পারে। শোনো। অভিনিবেশী হও। প্রতিটি রাজ্যাধিপতির একটি নিষিদ্ধ সীমানা আছে। আর আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ সীমানা যবনিকাবৃত। মনে রেখো, শরীরে রয়েছে একটি গোশত্‌পিন্ড। সেই গোশত্‌পিন্ড শুদ্ধ ও সঠিক থাকলে শরীরও সুস্থ ও সঠিক থাকে। আর যখন সেটি অশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন শরীরও অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। শুনে নাও, ওই গোশত্‌পিন্ডটি হচ্ছে হৃদয়।

আল্লামা তিবরানী তাঁর সগীর গ্রন্থে লিখেছেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে, তাকে পরিত্যাগ করো। আশ্রয় করো সন্দেহ বিমুক্ততাকে।

আমি বলি, হাদিস শরীফে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের যে উল্লেখ এসেছে তাকেই সুফী দর্শনের ভাষায় বলা হয় ফানায়ে কলব (অন্তর্নিমজ্জন) – যার চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে, ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌তে নিমজ্জন)। এই স্তরটি বেলায়েতের প্রাথমিক স্তর। সন্দিগ্ধতা থেকে মুক্তি বেলায়েতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বেলায়েত অর্জনই তাকওয়াকে নিশ্চিত করে (বেলায়েতের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত ব্যক্তিবর্গই পূর্ণ মুত্তাকী)। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, 'কেবল মুত্তাকীরাই তাঁর বন্ধু (অলি)।' এই আয়াতে অবশ্য তাকওয়ার দরোজায় দন্ডায়মান ব্যক্তিদেরকেও মুত্তাকী বলে অভিহিত করা হয়েছে (তারা যদিও এখনো তাকওয়ার পূর্ণ

পরিচ্ছদাবৃত নন তবুও তার প্রবেশপথের সম্মুখে দন্ডায়মান– আশা করা যায় এই তোরণ অতিক্রম করে শেষাবধি তারা গন্তব্যে উপনীত হতে পারবেন)। এমতাবস্থায় 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীনের' অর্থ হবে ওই হাদিস শরীফের অনুকূল যেখানে বলা হয়েছে, 'মান কাতালা কাতিলান্ ফা লাহু সালবুহু'। এই হাদিসে নিহত বলা হয়েছে তাকে যে বর্তমানে নিহত না হলেও ভবিষ্যতে হবে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি ভবিষ্যতে যারা তাকওয়ার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হবেন, তাদেরকে মুত্তাকী বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

❒ যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন মুত্তাকীগণের বৈশিষ্ট্য। শিরিকমুক্ততাকে যদি তাকওয়ার অর্থে নির্দেশ করা হয় তবে অদৃশ্যে বিশ্বাসকে সিফাতে এহতেরাজিয়া বলতে হবে। অথবা বলতে হবে সিফাতে কাশেফা। ইমান, নামাজ, জাকাত এর অন্তর্ভূত। এগুলো মৌলিক আমল। ইমান হচ্ছে আমলের মস্তক। নামাজ ও জাকাত দ্বীনের স্তম্ভ। এখানে সিফাত শাহেদা হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। এমতাবস্থায় 'আল্লাজিনা' থেকে শেষপর্যন্ত মুবতাদা এবং বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে 'উলায়িকা আলা হুদা'। ক্বারী ওয়ারশ 'ইউ'মিনুনা' শব্দটিকে 'ওয়াও' সহযোগে পাঠ করতেন– যা ব্যবহৃত হয়েছে হামজার পরিবর্তে। ক্বারী আবু জাফর সকল সাকিন যুক্ত হামজাকে নিরুচ্চারিত রাখেন। 'পেশ' এর পরে উল্লেখিত হলে 'ওয়াও' দ্বারা এবং যেরের পরে হলে 'ইয়া' দ্বারা পরিবর্তন করেন। এই নিয়মের বাইরে রয়েছে নাব্বিহুম আমবিহিম নাব্বিনা। ক্বারী আবু আমর সকল অবস্থায় সাকিনযুক্ত হামজাকে অনুচ্চার্য রাখেন। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে জজম অবস্থায় সাকিন হয় অথবা শব্দান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি অনুচ্চার্য রাখেন না। যেমন র– ইয়া. মুছাদাহ। ক্বারী ওয়ারশও ক্রিয়াপদের প্রথম অক্ষরে ব্যবহৃত সাকিনযুক্ত হামজাকে উহ্য রাখেন। তিনি নুদিয়া এবং নুতিহি শব্দ দু'টিকে এই নিয়মবহির্ভূত বলেছেন। ক্রিয়াপদের মধ্যবর্তী অক্ষরে হামজা উল্লেখিত হলে র-ইয়া এবং মধ্যবর্তী যের বিশিষ্ট ক্রিয়াপদে অবলুপ্তির রীতি নেই।

ইমানের অর্থ ঃ ইমানের আভিধানিক অর্থ স্বীকৃতি প্রদান। আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'ওয়ামা আন্‌তা বিমুমিনিন্ লানা (আর তুমি আমার স্বীকৃতি প্রদানকারী নও)। এখানে মুমিন অর্থ স্বীকৃতিদানকারী, স্বীকৃতি প্রদানকারী। স্বীকৃতির সম্পর্ক মন ও

মুখের সঙ্গে। শরিয়তগত অর্থ হচ্ছে, রসুল স. আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে যা এনেছেন তার প্রতি মনে ও মুখে স্বীকৃতি প্রদান করার নামই ইমান। এই জ্ঞান হচ্ছে সুদৃঢ় জ্ঞান। মৌখিক স্বীকৃতি ব্যতীত কেবল আন্তরিক স্বীকৃতি পূর্ণাঙ্গ নয়। বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য কেবল আন্তরিক স্বীকৃতি গ্রহণীয়। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন,'এতদসত্ত্বেও ফেরাউনের মন মুসার মোজেজার প্রতি দৃঢ় আস্থাবান হয়েছিলো কিন্তু আত্মম্ভরিতার কারণে সে তা মানেনি।' এখানে মনের স্বীকৃতির সঙ্গে মুখের স্বীকৃতি ছিলো না বলে তা গ্রহণ করা হয়নি। আল্লাহ্‌পাক আরো বলেছেন, 'ইহুদীরা যেরূপ আপন সন্তানদেরকে চিনে, তেমনি নবী মোহাম্মদকেও চিনে।' এখানেও মনের স্বীকৃতিকে ধরা হয়নি। তবে হ্যাঁ, বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে মনের স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 'যাকে কুফরীর উপর বলপ্রয়োগ করা হয় অথচ তার মনে রয়েছে ইমানের প্রশান্তি এতে কোনো অপরাধ নেই।'

মোট কথা, শুধুই আন্তরিক স্বীকৃতি কেবল বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্তব্য। অন্যথায় স্বীকৃতি বলতে বুঝতে হবে মৌখিক ও আন্তরিক স্বীকৃতি। আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'আর আল্লাহ্‌পাক সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকেরা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।' মুনাফিকদের আমল ইমানের সাথে সংযুক্ত নয়। তাই সালাত কায়েমের সম্পর্ক ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তেমনি অন্যান্য সৎকর্ম সমূহও সম্পৃক্ত ইমানের সঙ্গে।

মুসলিম শরীফে হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা একদিন রসুল পাক স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। সহসা উপস্থিত হলেন শুভ্র পরিচ্ছদাবৃত এক আগন্তুক। তাঁর কেশরাজি ছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পথশ্রান্তির কোনো চিহ্ন তাঁর অবয়বে পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না। আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারলাম না। তিনি অগ্রবর্তী হলেন এবং হাঁটু মুড়ে রসুল স. এর অতিসন্নিকটবর্তী হয়ে বসলেন। হাত রাখলেন রসুল স. এর পবিত্র উরুর উপর। তারপর নিবেদন করলেন, (ভ্রাতা) মোহাম্মদ! বলুন ইসলাম কী ? তিনি স. এরশাদ করলেন, ইসলাম হচ্ছে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতযোগ্য কেউ নেই এবং মোহাম্মদ স. তাঁর রসুল - নামাজ পাঠ করা, জাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং বাহন ও পাথেয় থাকলে আল্লাহ্‌র গৃহের হজ করা। আগন্তুক বললেন, যথার্থ বলেছেন। হজরত ওমর রা. বলেছেন, আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম (এ কেমন লোক!) প্রশ্ন করছে। আবার নিজেই জবাবের অনুমোদন দিচ্ছে। আগন্তুক পুনরায় বললেন, ইমান কী ? হজরত স. বললেন ইমান হচ্ছে আল্লাহ্‌পাককে, ফেরেশতাকুলকে, আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহকে, তাঁর নবীগণকে, কিয়ামত দিবসকে এবং অদৃষ্টের ভালোমন্দকে আন্তরিক প্রত্যয়ে গ্রহণ করা। আগন্তুক বললেন, ঠিকই বলেছেন। পুনরায় প্রশ্ন করলেন আগন্তুক, এহসান কী ? এরশাদ হলো, এহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। এরকম না হলে, তিনি তোমাকে দেখছেন এরকম প্রতীতি রাখো।

আগন্তুক বললেন, কিয়ামতের কথা বলুন। কবে তা সংঘটিত হবে? তিনি স. বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকর্তার চেয়ে উত্তরদাতা অধিক অবগত নন। আগন্তক বললেন, কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন ? তিনি স. বললেন, দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে (দাসী অধিক সন্তানবতী হবে)। অন্যান্য আলামত হচ্ছে নগ্নপদ, বিবস্ত্র ছাগ চারণকারী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দর্পিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। হজরত ওমর বলেছেন– আগন্তক চলে গেলেন, আমি বসে রইলাম। রসুল পাক স. বললেন, ওমর! আগন্তকটি কে তুমি জানো? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই সমধিক অবগত। তিনি স. বললেন, তিনি ছিলেন জিব্রাইল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। বোখারী ও মুসলিম কিঞ্চিত শব্দগত তারতম্য সহকারে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. আরো এরশাদ করলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে বিবস্ত্র, নগ্নপদ, বোবা ও বধির জনপ্রশাসক হবে। 'গইব' বা অদৃশ্যের জ্ঞান বস্তুতঃ পাঁচটি এমন বিষয়ের জ্ঞান, যা আল্লাহ্পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। অতঃপর রসুল স. সুরা লুকমানের শেষাংশ থেকে পাঠ করলেন। ১. কিয়ামতের বিষয়ে কেবল আল্লাহ্ই জানেন আর কিয়ামতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় যা আল্লাহ্ ব্যতিত কেউ অবগত নয় ২. মেঘমালার বর্ষণ ৩. মায়ের উদরের সন্তান পুত্র না কন্যা তা কেবল তিনিই জানেন ৪. ভবিষ্যতের জ্ঞান ৫. মৃত্যুবরণের স্থান – নিঃসন্দেহে আল্লাহ্পাক এসকল বিষয়ে অবহিত।

বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য আমলের নাম। আল্লাহ্পাক বলেন, আরবের বেদুইনেরা বলে আমরা ইমান এনেছি। হে নবী। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা ইমান আনো নাই। তোমরা বরং বলতে পরো– আমরা মুসলমান হয়েছি।

কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমান ও ইসলাম কখনো ভিন্নার্থক আবার কখনো সমার্থক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইমান ও ইসলাম অবশ্যই দু'টি পৃথক বিষয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইমানকে ব্যবহারিক অর্থে ইসলাম হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে, 'ইজক্বলা লাহু রব্বুহু আসলিম ক্বলা আসলামতু লি রব্বিল আ'লামীন।' এই আয়াতে ইসলাম শব্দটি উল্লেখিত হলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে ইমান। সার কথা হচ্ছে ইসলাম বলতে প্রকাশ্য আমল এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস উভয়কেই বুঝায়।

বিল গয়িব–এখানে 'গয়িব' শব্দটি মাসদার। শব্দটি মুবালিগা হিসেবে 'ইউ' মিনুন' শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্পাক বলেন, 'আলিমুল গইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্'। ওই সকল বস্তুকে গয়িব বলে যা মানবচক্ষুর অন্তরালবর্তী। যেমন আল্লাহ্পাকের জাত, সিফাত, ফেরেশতা, মৃত্যুত্তোর জীবন, বেহেশত, দোজখ, পুল সিরাত, মিজান, কবরের শাস্তি ইত্যাদি।

মুত্তাকীগণ বিশুদ্ধচিত্ত। তাঁদের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রত্যক্ষ। তাঁরা ওই সমস্ত কুটিল মনের অধিকারী প্রতারকদের মতো নন, যারা মুসলমানদের সামনে ইমান প্রকাশ করে, আর তাদের অসাক্ষাতে অস্বীকার করে। এমনও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতের স্পষ্ট মর্ম হবে এরকম– যেমন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুল পাক স.- কে স্বচক্ষে দেখেছে, তাঁর স. পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করেছে- তার উপর তাঁর স. নূর সূর্যকিরণের চেয়ে সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট ছিলো। ওই ব্যক্তির জন্য রসুল স. এর প্রতি ইমান আনা এবং তাঁর আহবানে সাড়া দেয়া তেমন বিস্ময়কর ও প্রশংসার্হ নয়। বরং ওই ব্যক্তির ইমানই প্রশংসাধন্য যে তাঁকে স. না দেখেই ইমান এনেছে। যিনি ব্যতীত প্রতিপালনকারী কেউ নেই, সেই আল্লাহ্পাকের কসম! ইমানের ক্ষেত্রে কেউ তার চেয়ে অধিক মহান নয়, যে রসুল স. কে না দেখেই ইমান এনেছে এবং তাঁর আহবানকে মান্য করেছে। একথার সাক্ষ্য হিসেবে হজরত ইবনে মাসউদ 'আলিফ লাম মীম' থেকে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পাঠ করলেন।

ওয়া ইউক্বিমুনাস্সলাহ– এবং নামাজ কায়েম করে। 'ইউক্বিমুন' অর্থ ইউহাফিজুন– অর্থাৎ মুত্তাকীরা ওই সকল লোক যারা নামাজের যথাযোগ্য হক সংরক্ষণ করে, শর্তসমূহ ও সীমারেখাকে যথানিয়মে মান্য করে। নামাজের রোকন সমূহ এবং প্রকাশ্য কর্মকান্ড, যেমন ওয়াজিব ও সুন্নত সমূহ পালন করে। অভ্যন্তরীণ অবস্থা অর্থাৎ একাগ্রচিত্ততাকেও সুসংরক্ষিত রাখে। 'ইউক্বিমুন' এর অর্থ কোনো কিছুকে সুন্দর ও সরল করা। সালাত শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রার্থনা। নামাজ প্রকৃতপক্ষে দোয়া বা প্রার্থনাই। তাই নামাজকে সালাত বলা হয়েছে। ক্বারী ওয়ারশ সালাত শব্দটির 'লাম' হরফকে মোটা করে পড়েছেন। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য ক্বারীগণ পড়েছেন পাতলা করে। অবশ্য 'আল্লাহ্' শব্দের লামকে মোটা করে পড়ার ব্যাপারে সকল ক্বারীই একমত। তবে এক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে যে, লাম অক্ষরের আগের অক্ষর জবর অথবা পেশযুক্ত হতে হবে।

ওয়া মিম্মা রজাক্বনাহুম ইউনফিকুন– তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। 'রিজিক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হিস্সা বা অংশ। 'ইনফাক্ব' অর্থ কোনো বস্তুকে আপন অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। ব্যবহারিক অর্থ সৎপথে সম্পদ ব্যয়। এই বাক্যটি ওই সকল আরববাসীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বিনা বাক্যব্যয়ে নবীপাক স. এর প্রতি ইমান এনেছিলেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

❐ এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

এরশাদ হচ্ছে, হে নবী। মুত্তাকী বা সাবধানী তারাই যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে ইতোপূর্বে (তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও অন্যান্য আকাশী পুস্তিকায়) – সকল কিছুর প্রতি ইমান এনেছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে– এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ওই সকল আহলে কিতাবগণকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা জ্ঞানে ধারণীয় এবং ইন্দ্রিয়ে অনুভবনীয় বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছেন। সাথে সাথে শরিয়তের আমলও কার্যকর করেছেন। তাঁরা ওই সমস্ত বিষয়েও বিশ্বাসী যা কেবলই শ্রুতিনির্ভর। শ্রুতি ছাড়া যা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত। এই আয়াতে সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা সম্মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'তানায্যালুল মালাইকাতু ওয়াররূহ্' বাক্যটিতে রূহ্ ও মালায়িকা শব্দ দু'টির সম্মিলন ঘটেছে। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু মুসা আশআরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ধরণ হচ্ছে এরকম– যারা আহলে কিতাব (পূর্ববর্তী নবীর উম্মত) আবার হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা স. এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনকারী।

ইনজাল অর্থ অবতরণ। এখানে লাওহে মাহফুজ থেকে হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহ্র কালাম অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মহামর্যাদামন্ডিত আল্লাহ্তায়ালার অসীম জ্ঞানভান্ডার থেকে সসীম মানবের জ্ঞানে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে ইনজাল শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। দুই শব্দের মাঝখানে যখন টেনে পড়ার (মাদ) এর ব্যাপারটা আসে, তখনও আবু জাফর, ইবনে কাসীর এবং সুসী না টেনেই পড়েছেন। আর কালুণ এবং দাওরী কখনো টেনে কখনো না টেনে পড়েছেন। এরা ছাড়া অন্য ক্বারীগণ টেনে পড়েছেন। এ ধরনের টেনে পড়াকে মাদ্দে জায়েয এবং মাদ্দে মুনফাসিল বলে। আরো এক ধরনের মাদ রয়েছে, যাকে বলে মাদ্দে মুত্তাসিল, যে মাদ থাকে একই শব্দের মধ্যে। যেমন আল মা-উ, ওয়াস্সামা-উ- এই সকল মাদ প্রলম্বিত উচ্চারণে পড়তে হয়। এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। এই মাদকে বলে মাদ্দে ওয়াজিব। মাদ্দে মুত্তাসিল ও মাদ্দে মুনফাসিলের ব্যাপারে অবশ্য ক্বারীগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে কাসীর, আবু আমর এবং কালুণ মাদ্দে মুত্তাসিলকে তিন হরকত পরিমাণ টেনে পড়েছেন।

ইবনে আমের, কুসাই পড়েছেন চার হরকত পরিমাণ এবং আসেম পাঁচ হরকত পরিমাণ। ওয়ারশ এবং হামজা পড়েছেন ছয় হরকত পরিমাণ। এই মতানৈক্য কেবল ওই মাদের বেলায় যেখানে মাদের হরূফের পরে হামজা থাকে। মাদের পর সাকিন থাকলে সকল ক্বারীই ছয় হরকত পরিমাণ টেনে পড়তেন। যেমন, ওয়ালাদ্দল্লিণ, আলিফ লাম মীম। এধরণের মাদকে বলে মাদ্দে লাজেম। কিন্তু সাকিনযুক্ত হরূফে যদি যতি টানতে হয়, তবে ক্বারীগণের সর্বসম্মত মত হচ্ছে— দুই হরকত, চার হরকত অথবা ছয় হরকত টেনে পাঠ করা যাবে। আর হরূফে সাকিন যদি পেশ যুক্ত হয়, তবে তা সাত হরকত পরিমাণ টেনে পড়ার ব্যাপারে সকল ক্বারী একমত। যেমন, নাস্তাঈন।

'পরলোকে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী' পরলোক অর্থাৎ আখেরাতের বিপরীত শব্দ হচ্ছে দুনিয়া। দুনিয়া শব্দটি গঠিত হয়েছে দুনু শব্দ থেকে— যার অর্থ নিকটবর্তী। যেহেতু বর্তমানে এটাই নিকটতম তাই এর নাম দুনিয়া বা পৃথিবী। আখেরাত বা পরকাল হচ্ছে পরবর্তী পৃথিবী। আখেরাতে একিন বা বিশ্বাস হচ্ছে সুদৃঢ় জ্ঞাননির্ভর। সন্দেহাতীত বিশ্বাসের নামই একিন। এই একিন অর্জিত, স্বয়ম্ভু নয়। তাই আল্লাহ্পাককে মুকিন (একিনলব্ধ জ্ঞানের অধিকারী বলা যায় না)।

জ্ঞাতব্য ঃ দার্শনিকগণের মতে মানুষ তিন ধরনের জ্ঞানে জ্ঞানবান। ১. হুসুলী। হুসুলী অর্থ অর্জিত জ্ঞান। চিন্তাশক্তির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাকে বলে এলমে হুসুলী বা অর্জিত জ্ঞান। ২. হুজুরী। হুজুরী হচ্ছে সত্তাগত জ্ঞান। চিন্তাশক্তির প্রবেশাধিকার এখানে নেই। সত্তার অনুভূতি যেমন চিন্তা ব্যতিরেকেই অনুভবনীয়। ৩. কাসবী। অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সংশ্লেষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয়- তাকে বলে এল্‌মে কাসবী। ধারণা, দৃঢ় প্রত্যয়, অনুমান ইত্যাদি এই জ্ঞানেরই শাখা প্রশাখা। কাজেই একিন বা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী - এরকম বাক্য ব্যবহার আল্লাহ্পাকের মর্যাদার অনুকূল নয়। তাঁর জ্ঞান স্বয়ম্ভু,স্বতিষ্ঠ, স্বপ্রতিষ্ঠিত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

❒ তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক-নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

আপন প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে যাঁরা রয়েছে তাঁরাই সফলকাম। ইতোপূর্বে তাঁদের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- তাঁরা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। সালাত কায়েম করে। প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে দান করে। পূর্ববর্তী ও

বর্তমানে অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস করে। আখেরাত সম্পর্কেও তাঁরা নিশ্চিত বিশ্বাসী। এসমস্ত গুণাবলী সফলকাম হওয়ার সহায়ক বরং এসকল গুণবিশিষ্টদের জন্য সফলতা অনিবার্য। সফলতার এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌পাকের দিক থেকেই। তাই 'মির্‌রব্বিহিম' বলে মুত্তাকীদের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। 'মুফ্‌লিহুন' অর্থ সফল। শব্দটি এসেছে 'ফালাহ্‌' শব্দ থেকে। তাঁদের এই সাফল্য লাভ হবে পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানেই। এখানে তাঁদের আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে থাকা এবং সফলকাম হওয়ার সংবাদ দু'টি 'এবং' বা 'ওয়াও' এর মাধ্যমে সংযুক্ত করে পেশ করা হয়েছে। কারণ সংবাদ দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির। এক ধরণের হলে 'ওয়াও' এর উল্লেখ ব্যতিরেকেই বর্ণনা করা হতো। যেমন অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে, 'উলা-ইকা কাল আ'নাম বাল হুম আদাল্লু উলায়িকা হুমুল গফিলুন'–তারা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, তারাই উদাসীন (গাফেল)। এখানে একই ধরনের দু'টি সংবাদ বিবৃত হয়েছে বলে 'এবং' সংযোজক ব্যবহৃত হয়নি। হুমুল মুফ্‌লিহুন–এর হুম সর্বনামটি পার্থক্যপ্রকাশক (বিধেয় এবং তার বিশেষণের পার্থক্যকারী)। এরকমও বলা যায় যে, 'হুম' সর্বনামটি পার্থক্যপ্রকাশক নয় বরং উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিধেয় হয়েছে 'মুফ্‌লিহুন'–বরঞ্চ উভয়ে মিলিত হয়ে পূর্বের 'উলা-ইকা' এর বিধেয় হয়েছে।

মোতাজিলা সম্প্রদায় সর্বনামটিকে সীমাবদ্ধ সর্বনাম বলে প্রমাণ করে যে, কবীরা গোনাহ্‌কারীরা চিরদিনের জন্য নরকবাসী। তাদের অভিমত দুর্বলতাদুষ্ট। তাই পরিত্যাজ্য। কারণ, আল মুফ্‌লিহুন বলে ওই সমস্ত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে–যাঁরা পূর্ণ সফলকাম। অন্যেরা পূর্ণ সফলকাম না হলেও সাধারণ সফলতার অধিকারীও যে হবে না- এ রকম ইঙ্গিত এখানে নেই।

পরবর্তী আয়াতে আসছে মুত্তাকীদের বিপরীত মেরুর লোকদের আলোচনা, যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। প্রসঙ্গটি ভিন্নতর। তাই সংযোজক অব্যয় ব্যতিরেকেই পরবর্তী বাক্যটি শুরু হয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

❑ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

'কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ নেয়ামতকে গোপন করা। ব্যবহারিক অর্থ– ইমানের বিপরীত বস্তু–অবিশ্বাস বা সত্য প্রত্যাখ্যান। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করা বা না করা একই কথা। সতর্ক করা এবং না করা দু'টি পৃথক কাজ, তাই দু'টি পৃথক বাক্যেই এ দু'টি কাজকে বিবৃত করা যেতো। কিন্তু দু'টি নির্দেশের প্রতিফল যেহেতু একই– তাই দু'টি বাক্যকে একাকার করা হয়েছে। 'আম' শব্দটির প্রথম অক্ষর 'হামজা' প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তাগিদ প্রদানার্থে। 'ইনজার' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা বা সতর্ক করা। এখানে এর বিপরীত শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, কল্যাণ লাভ অপেক্ষা অকল্যাণ থেকে অব্যাহতির প্রসঙ্গটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'তাহারা বিশ্বাস করিবে না'–এটাই উপসংহার। সতর্ক করা বা না করা তাদের কাছে এক বরাবর। তাদের সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, তারা কস্মিনকালেও বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে না। কারণ–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۚ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

❒ আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

ক্বলব বা অন্তর হচ্ছে একটি গোশ্তের টুকরা। এর আকৃতি মসুর ডালের দানার মতো। বাম পাঁজরে–এর অবস্থান। বুদ্ধিকেন্দ্র অথবা জ্ঞানকেন্দ্র বুঝাতেও কখনো কখনো ক্বলব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে-'ইন্না ফি জালিকা লা জিকরা লিমান কানা লাহু ক্বলবুন'। আল্লাহ্পাক সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। মূল বা আনুষাঙ্গিক সকল সৃষ্টি তাঁরই সৃজনশীলতার অধীন। কার্যকারণ নীতি তাঁরই সুনির্দিষ্ট বিধান। এই বিধানের নেপথ্যেই রয়েছে তাঁর সৃজনের উন্মেষ। মানুষ যখন তার ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচালিত করতে চায়, তখন আল্লাহ্ই তার অনুভব ও ইচ্ছাকে কার্যে রূপ দেন। নয়তো মানুষের ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকতো। কার্যে পরিণত হতে পারতো না। অভিপ্রায়কে বাস্তবায়ন করা না করা সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাধীন। তিনি ইন্দ্রিয়কে স্থবির ও বুদ্ধিকে অকার্যকর করার ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কখনো কখনো তিনি অনুভূতিকে তার নিজস্ব সীমায়

স্থির রাখেন। ফলে অনুভূতির প্রভাব ক্বলব বা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না। রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, মানুষের মন আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় ও অলৌকিক দুই অঙ্গুলীর মধ্যে। তিনি অন্তরসমূহকে যেমন ইচ্ছা তেমনি করে দেন। তিনি স. প্রার্থনা করতেন, হে অন্তরের আবর্তনবিবর্তনকারী আল্লাহ্! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যমুখী করে দাও।

কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরকে পবিত্র করা আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। তাই তাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী দর্শন এবং সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দরোজা চিররুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তারা নিদর্শনাবলীও মোজেজাগুলো অবলোকন করে বটে, কিন্তু অন্তরে এসবের প্রভাব ধারণ করার যোগ্যতা তাদের নেই। এই অবস্থাকেই মোহর করে দেয়া বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে 'ত্বা' (সীলমোহর)। কোথাও উল্লেখিত হয়েছে আগফাল (উদাসীনতা)। কখনো বলা হয়েছে আকিস্সা। আবার কোথাও বলা হয়েছে গিশাওয়া (যবনিকা)। এখানে মোহর করার অর্থ পাথর বা সীসা দ্বারা মোহরাঙ্কিত করা নয়। বরং অর্থ হবে অযোগ্যতার মোহরাঙ্কন। এরকমও বলা যায় যে, আল্লাহ্পাক তাদের মন, চক্ষু ও কর্ণকে আচ্ছাদনের অধীন করে দিয়েছেন। অথবা এরকমও অর্থ হতে পারে যে, খতম বা মোহর হচ্ছে ওই কৃষ্ণকলংক, যা পাপের নির্যাসরূপে অন্তরের উপরে পতিত হয়। হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে ইমাম বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, মুমিন বান্দা গোনাহের কাজ করলে তার অন্তরে সৃষ্টি হয় একটি ক্ষুদ্রাকৃতির কালো দাগ। এর পর যদি সে তওবা করে, পাপ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে অন্তরের কালো দাগ অপসারিত হয়। অন্তর তখন পরিচ্ছন্ন হয়ে নির্মল রূপ ধারণ করে। আর যদি সে পাপের পথেই অনড় থাকে তবে ওই কালো দাগ প্রশস্ততর হতে থাকে। শেষে সমস্ত অন্তঃকরণই তমসাচ্ছাদিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'কাল্লাবাল র'না আলা ক্বলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবুন।'

আমি বলি, এই আয়াতের মর্মই উপরোল্লিখিত হাদিসে বিবৃত হয়েছে। এই অবস্থাটি অন্য হাদিসে এইভাবে বলা হয়েছে–ইজা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু (যদি অন্তর অশুদ্ধ হয়, তবে সমস্ত শরীরই অশুদ্ধ হয়ে যায়)। অশুদ্ধ অন্তর বিশুদ্ধ অন্তরের সম্পূর্ণ বিপরীত। গোনাহ্ করলে মুমিনদের এই অবস্থা হয় (অন্তরে কালো দাগ পড়ে)। কাফেরদের অবস্থা অবশ্য অন্যরূপ। তাদের ক্ষেত্রে ফাসাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে ত্বা, আগফাল অথবা আকিস্সা। এই আয়াতে কাফেরদের ক্বলবের অবস্থা খতম শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো বস্তুতে সীলমোহর করার অর্থ, ওই বস্তুর চূড়ান্ত অবস্থা নিশ্চিত করে ফেলা এবং ওই বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আবরিত করা। কাফেরদের ক্বলবকে খতম বা সীলমোহর করে চিরদিনের জন্য হেদায়েতের আলো থেকে আড়াল করা হয়েছে।

এরকমও বলা যায় যে, তাদের কুলব সম্পূর্ণরূপে অকর্মন্য ও অকেজো। মোহরাঙ্কনের মাধ্যমে এই অকর্মণ্যতারই চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

শুধু কুলবই নয়—তাদের শ্রুতিও মোহরাঙ্কিত। তাই বলা হয়েছে, ওয়া আলা সাময়িহিম—এবং কর্ণ। সামা শব্দটি একবচন। শব্দটি ক্রিয়ামূল। আর ক্রিয়ামূল বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয় না, তাই এখানে একবচনই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ হবে বহুবচনসুলভ। মন ও কানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অন্য আয়াতে মন ও চোখের মোহরাঙ্কনের ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে, 'খতমাল্লাহু আলা ক্বালবিহি ওয়া জায়ালা আলা বাস্ব রিহি গিশাওয়া।' এখানে খতম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মনের জন্য এবং গিশাওয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে চোখের জন্য। এই আয়াতে হৃদয় এবং শ্রুতির জন্য খতম এবং দৃষ্টির জন্য গিশাওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'ওয়া আলা আব্স্বারিহিম।' আবস্বার হচ্ছে বাস্বার শব্দের বহুবচন। এখানে অর্থ হবে, তাদের চক্ষু বা চক্ষুসমূহের উপরে রয়েছে আবরণ। আয়াতের শেষপাদে বলা হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (ওয়া লাহুম আযাবুন আজীম) আযাব শব্দটি এসেছে আযাবুশ্ শাই থেকে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে আরববাসীগণ আযাবুশ্ শাই শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করেন। আযাব বা শাস্তি অপরাধীকে পুনর্বার অপরাধী হতে বাধা দেয়। তাই শাস্তিকে বলে আযাব। শব্দটি আরো ব্যাপক পরিসরে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তাই সকল দুঃখ-ব্যথাকে আযাব বলে অভিহিত করা হয়। যদিও তা সকল ক্ষেত্রে শাস্তি নয়। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আযাব শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয়েছে তা'যীব থেকে। এর অর্থ আনন্দ বা আস্বাদ নিবারণ করা।

আজীম শব্দটি হাকির (নগন্য) শব্দের বিপরীত। আজীম অর্থ মহা বা মহান। আরেকটি অর্থ বৃহৎ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝

❒ মানুষের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী,' কিন্তু তাহারা বিশ্বাসী নহে;

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, ইবনে সলুল, মানাব ইবনে কুশাইর, জায়েদ বিন কায়েস এবং তাদের সতীর্থদেরকে লক্ষ্য করে। তারা ছিলো ইহুদী এবং মুনাফিক। আয়াতে মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে বলে এদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। 'নাস' (মানুষ) শব্দটি মূলে ছিলো 'আন্ নাস'। 'মিন' এর সঙ্গে যোগ করতে যেয়ে মধ্যের হামজাটি লোপ পেয়েছে। নাস শব্দটি

ইনসান শব্দের বহুবচন। ইন্‌স থেকেও নাস শব্দটি গঠিত হতে পারে। মানুষ পরস্পরের প্রতি সৌহার্দশীল হয়, তাই এমনটি হতে পারে। আনাসুন বা ইন্‌স থেকেও শব্দটির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এর অর্থ– প্রকাশিত। যেমন কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে, 'আনাসা মিন জানি বিত্তুরি নারা'–তুর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আগুন প্রকাশিত হলো।' মানুষেরা পরস্পরের প্রত্যক্ষগোচর তাই তাদেরকে নাস বলা হয়। জ্বিন সম্প্রদায় অপ্রত্যক্ষ বলেই তাদেরকে জ্বিন বলা হয়। আন্‌নাস শব্দটির 'আল' নির্দিষ্টবাচক অব্যয়, যা জাতিবাচক আর 'মিন' হচ্ছে গুণবাচক। কেউ কেউ বলেন, উল্লেখিত পদ হচ্ছে 'মান'। আর উল্লেখ্য বা সম্পৃক্ত পদ হচ্ছে আল্লাজিনা কাফারু। আর একথাও বলা যেতে পারে যে, 'মান' সম্বন্ধবাচক সর্বনাম। এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, তারাই মোহরাঙ্কিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। বরং তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অগ্রদূত। শঠতা ও প্রবঞ্চনাসহ তারা সকল দোষে দুষ্ট। আয়াতে কেবল আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বিধৃত হয়েছে। কেনোনা, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের মধ্যে এ দু'টিই মুখ্য এবং চরম মর্যাদামন্ডিত।

ওই সকল ইহুদী ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'তাহারা বিশ্বাসী নহে।' এ হচ্ছে তাদের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ। এখানে 'ওয়ামাহুম বি মু'মিনিন' না বলে 'ওয়ামা আমানু' বলা যেতো। এরকম বললে প্রতিবাদটি হতো তাদের বক্তব্যের সমান্তরাল। কিন্তু প্রতিবাদটি অধিকতর শক্তিশালী করার মানসে তাদের সম্পর্কে এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, তারা বিশ্বাসী (ই) নয়। এতে করে তারা হয়েছে ইমানদারদের দল থেকে পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত। নেতিবাচকতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এখানে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ؕ

❒ আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজদিগকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

ওই ইহুদী ও মুনাফিকেরা প্রবঞ্চক। তাই বলা হয়েছে, 'ইউখদিউন্নাল্লাহ্ (তারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করতে চায়)।' খদিয়ু শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুকে গোপন করা। শব্দটি আরবী প্রবাদ খদায়া দিব্বু থেকে এসেছে। এর মাধ্যমে আপন গহ্বরে লুকিয়ে গুইসাপ যেমন শিকারীকে প্রবঞ্চনা দেয়–সেই প্রবঞ্চনার প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে। গুইসাপের এরকম প্রতারণাকে আরববাসীরা খদায়া দিব্বু বলে থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চাওয়ার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রতারিত করতে চাওয়া। রসুলের প্রসঙ্গ এখানে উহ্য রয়েছে। সুতরাং, প্রকৃত অর্থ হবে তারা আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রতারণা করতে চায়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে প্রতারণাকে আল্লাহ্ তাঁর নিজের সঙ্গে প্রতারণা বলে গণ্য করেছেন। কারণ, রসুল আল্লাহ্ নন বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সুতরাং তার প্রতিনিধির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, সে আচরণ প্রবর্তিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিই। বিষয়টি পরিষ্কাররূপে কালাম মজীদের অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, মাই ইউতিইর্ রসুলা ফাক্বদ আতাআল্লাহ্—যে রসুলের অনুসরণ করলো, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌র অনুসরণ করলো। আরো উল্লেখিত হয়েছে—ইন্নাল্লাজিনা ইউবাইয়ুনাকা ইন্নামা ইউবাইয়ুনাল্লাহ্, ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম—যারা আপনার হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করছে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌র হাতেই বায়াত গ্রহণ করছে, তাদের হাতের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র হাত।

দু'জন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, সে কর্মটি হয় শক্তিশালী। মুনাফিকেরা প্রকাশ্যতঃ ইমানের দাবীদার। আল্লাহ্‌তায়ালাও প্রকাশ্যতঃ তাদের সঙ্গে সে রকমই আচরণ বজায় রাখেন। রসুলুল্লাহ্ স. এবং অন্যান্য মুসলমানেরাও আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিধান মেনে চলেন। কিন্তু মুনাফিকদের গোপন অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর। তারা সরাসরি অবিশ্বাস প্রকাশকারীদের তুলনায় অধিকতর নিকৃষ্ট। তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্যই জানেন। তাঁর প্রিয়তম রসুলকেও তিনি এ বিষয়ে যথাঅবহিতি দান করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট গোপন কোনো কিছুই নেই। তথাপি মুনাফিকেরা গোপনে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে চায়। তাদের ধোঁকায় তারা নিজেরাই বন্দী। তাদের ধোঁকার প্রতিক্রিয়া প্রকৃত অর্থে তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হয়। চরমতম মূর্খ বলেই তারা একথা ভাববার প্রয়াস পায় যে, রসুলপাক স. এবং বিশ্বাসীদেরকে আমরা প্রতারণাবদ্ধ করে ফেলেছি। তারা জানেনা—সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলকে মুনাফিকদের প্রতারণা ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে ক্রমাগত সংবাদ দিয়ে চলেছেন। উদাসীনতা ও অচেতনতাই তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে অপারগ করে দিয়েছে। তারাই প্রতারিত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ওয়ামা ইয়াশ্‌উরুন (ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

❐ তাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাচারী।

'মারাদুন' অর্থ ব্যাধি বা অসুস্থতা। শারীরিক অর্থ গ্রহণ করলে এর উদ্দেশ্য হবে অস্বাভাবিক অসুস্থতা যা শরীরকে দুর্বলতর করে এবং অবশেষে শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। আত্মিক দিক থেকে অর্থ করলে উদ্দেশ্য হবে, মূর্খতা, হিংসা অথবা অবিশ্বাস। অশুভ ধারণাকেও মারাদুন বা অসুস্থতা আখ্যা দেয়া যায়। অনিরাময়যোগ্য শারীরিক অসুস্থতা যেমন শারীরিক মৃত্যু ঘটায়, তেমনি অনপনেয় অভ্যন্তরীণ ব্যাধি আত্মিক মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। এরকম অবস্থা চিরস্থায়ী ধ্বংসের কারণ। মুনাফিকেরা বিবেকের ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা মুসলমানদেরকে দেখতো হিংসার দৃষ্টিতে। মুসলমানদের ক্রমোন্নতি ও প্রভাব তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিলো। প্রথম থেকেই তাদের অন্তরে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের মনোভাব। তাই এই আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি।' সত্য প্রত্যাখ্যানের এই ব্যাধি প্রথম থেকেই তাদের অন্তরে ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা সেই ব্যাধিকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তাদের এই পীড়া উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মোহরাংকনের মাধ্যমে আল্লাহ্ কেবল এই পীড়াকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করে দিয়েছেন। কোরআনের আয়াত যত নাজিল হয় তাদের শত্রুতাও ততই বৃদ্ধি পায়। এমনও বলা যায় যে, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের উন্নাসিকতা ও শত্রুতার রহস্যকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থাকেই আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন—বলা হয়েছে।

ওই মুনাফিকদের জন্য রয়েছে চরম যন্ত্রণাদগ্ধ শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যাচারী। বিমা কানু ইয়াক্জিবুন (তারা মিথ্যাচারী) এই অংশটির মা অব্যয়টি মুস্দারিয়া। 'ইয়াকজিবুন' শব্দটি কুফাবাসিরা তাশদীদবিহীন অবস্থায় পড়তেন। যেমন এই আয়াতে লিখা হয়েছে। অন্য ক্বারীগণ পড়তেন তাশদীদসহ (ইউকাজ্জিবুন)। প্রথম উচ্চারণ অনুযায়ী অর্থ হয় মুনাফিকদের দাবী মিথ্যা (যেমন পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে)। দ্বিতীয় উচ্চারণের অর্থ—মুনাফিকেরা রসুলে করীম স. কে তাঁর আগোচরে অসত্যারোপ করতো যে অসত্যারোপন ছিলো মিথ্যা। দুই উচ্চারণের প্রকৃত মর্ম একই। অর্থাৎ মুনাফিকেরা মিথ্যাচারী। আর মিথ্যাচারীতার জন্যই তাদের অদৃষ্টে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১,১২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ○

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ○

❒ তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না' তাহারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।'

❐ সাবধান! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা ইহা বুঝিতে পারে না।

'ফাসাদ' শব্দের অর্থ অশান্তি বা অনাসৃষ্টি। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে সোলেহ বা শান্তি। সকল অকল্যাণজনক কাজকেই ফাসাদ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। পক্ষান্তরে, সকল শুভ কাজকেই বলা হয় সোলেহ। আলোচ্য আয়াতে মদীনার মুনাফিকেরা যে অশান্তি বা ফাসাদ সৃষ্টিকারী সে কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকেরা একথা স্বীকার করে না। তারা কোরআনের প্রতি এবং রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নিজেরা তো বিশ্বাস করেই না। অন্যদেরও বিশ্বাস করতে বাধা দেয়। মক্কার মুশরিকদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য সরবরাহ করে। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী করে তোলে। সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করার প্রয়াস অবশ্যই ফাসাদ। রক্তক্ষয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেয়ে অধিক অশান্তি আর কী হতে পারে?

মুসলমানেরা তাদেরকে সদুপদেশ দিতেন। বলতেন, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না। তারা বলতো, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী (ইন্নামা নাহনু মুছলিহুন)। বিস্ময়ের ব্যাপার—তারা অসত্যকেই সত্য রূপে দেখতে পেতো। তাই নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই এরকম জবাব দিতো। তাদের দৃষ্টিতে অশুভই শুভ হিসাবে প্রতিভাত হতো। তাই অনুশোচনার পথে না গিয়ে মুখের উপরে বলে দিতো, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। এরকমও হতে পারে যে, তারা মুসলমানদের (সাহাবাগণের) সামনে এমন বলার সাহস পেতো না। নিজেদের মধ্যে এরকম বলাবলি করতো। তাদের উক্তির শুরুতেই থাকতো 'ইন্নামা' শব্দটি যার অর্থ 'নিশ্চয়'। তাদের বলার মাধ্যমে প্রকাশিত হতো তাদের শান্তিকামিতার নিশ্চিত ধারণা।

পরের আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবীকে সতর্ক করে দিয়ে জানাচ্ছেন, সাবধান! তাদের কথা বিশ্বাসনীয় নয়। 'আমরা দেশে কোনো গোলোযোগ সৃষ্টি করিনা' 'আমরা সম্প্রীতিবাদী' 'আমরাইতো শান্তিকামী'—এরকম যতো মধুর কথাই তারা বলুক না কেনো—তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ তারা কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী। এই আয়াতটি মুনাফিকদের অসৎ উক্তির প্রতি চরমতম প্রতিবাদ। আরবী বাকভঙ্গির চূড়ান্ত প্রতিবাদী রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে এই বাক্যটিতে। প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে 'আলা' (সাবধান)। সুনিশ্চিত কোনো কিছুকে প্রকাশ করতে গেলে প্রথমেই এই শব্দটি উল্লেখ করাই আরবী ভাষাভঙ্গির নিয়ম। এরপর ব্যবহৃত হয়েছে ইন্না শব্দটি। যার অর্থ নিশ্চয় বা অতি অবশ্যই। এরপর এসেছে হুম সর্বনামটি—যার অর্থ তারা (মুনাফিকেরা)। তারপর মুফসিদুন (অশান্তি সৃষ্টিকারী) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর পার্থক্য সৃষ্টিকারী সর্বনাম হুম এবং বিধেয়কে সুনির্ধারণকারী আল (হুমুল) সহযোগে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

❒ যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমরাও বিশ্বাস কর', তাহারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করিব?' সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না।

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হয় অপরাপর লোকেরা যেমন ইসলামে আস্থা এনেছে, তোমরাও সেরকম আস্থাবান হও-এখানে অপরাপর লোক অর্থ মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ। তাঁরাই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলামে আস্থা স্থাপনকারী। অপরাপর লোকের মধ্যে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আগত সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীরাও রয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা আহবান জানাচ্ছেন, তাঁরা যেমন ইমান এনেছেন তোমরাও তেমনি ইমান আনো (যেহেতু তাঁরাই সত্যের মাপকাঠি)। এই আহবানটি আল্লাহ্পাকের অভূতপূর্ব দয়া প্রদর্শনের নিদর্শন। মুনাফিকদের নিশ্চিত অবিশ্বাস ঘোষণার পরেও আল্লহ্পাক তাদেরকে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। কারণ আল্লাহ্ পাক চান, অশান্তি অবলুপ্ত হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক প্রশান্তি।

কতোই না মূর্খ মুনাফিকেরা। এই আহবানের জবাবে তারা বলে– নির্বোধেরা যেমন বিশ্বাস করে, আমরাও কি সে রকম বিশ্বাসী হবো? তারা সাহাবাগণকে অনভিজ্ঞ ভাবতো। নিজেদেরকে মনে করতো উচ্চ মর্যাদাধারী। তাই এহেন গর্হিত উচ্চারণ অনায়াসেই তাদের রসনায় উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে জানাচ্ছেন, হে আমার রসুল। নিশ্চিতরূপে জেনে নিন, ওই সকল লোকেরাই নির্বোধ। তারা অহরহ রসুলের মোজেজাসমূহ অবলোকন করছে। তওরাত পাঠের মাধ্যমে শেষ নবী যে আপনি, সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছে। তবুও ইমান আনছে না। সুতরাং তাদের নির্বুদ্ধিতা স্বতঃসিদ্ধ। পূর্বের আয়াতের মতো এই আয়াতের শেষেও তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'লা ইয়া'লামুন'-তারা বুঝতে পারে না। ফাসাদ বা অশান্তি অনুভব করতে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পূর্বের আয়াতটি ছিলো অশান্তি সৃষ্টি করার কুফল সম্পর্কে। তাই সেখানে বলা হয়েছিলো, লা ইয়াশ্উরুন। এই আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ইমান প্রসঙ্গ। তাই বলা হয়েছে, 'লা ইয়া'লামুন।' কারণ, বিশ্বাস প্রসঙ্গটি সূক্ষ্মতর। বিশ্বাস ও ধর্মানুভূতি গভীরতর অভিনিবেশের দাবী রাখে।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝

❑ যখন তাহারা বিশ্বাসীগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করিয়াছি,' আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের দলপতিগণের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি; আমরা শুধু তাহাদের সহিত ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।'

মুনাফিকদের আচরণ এক রকম নয়। একেক সময় একেক প্রেক্ষিতে তারা একেক কথা বলে। বিশ্বাসীদের সাক্ষাতে বলে আমরাও বিশ্বাসী । আর তারা যখন তাদের নেতাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন তাদেরকে বলে, আমরাতো তোমাদেরই দলের। তাদের নেতাদেরকে এই আয়াতে শায়াতিন বলা হয়েছে। 'শায়াতিন' শব্দটি 'শয়তান' শব্দের বহুবচন। শাতনুন ধাতু থেকে এই শব্দটির উদ্‌গতি। এর অর্থ, দূর হয়ে যাও। ইবলিস সত্য থেকে দূর হয়ে গিয়েছিলো বলেই তার নাম শয়তান। শাতন শব্দ থেকে এই শব্দটি উদ্‌গত হয়ে থাকতে পারে। 'শাতা' অর্থ বাতিল (পরিত্যক্ত)। বাতিল শয়তানের আরেকটি নাম। এই অভিমত অনুসারে 'শাতা' এর সঙ্গে 'নুন' অক্ষরটি যুক্ত হয়ে শাতান বা শয়তান গঠিত হয়েছে। শয়তান অর্থ গণৎকারও হতে পারে। গণৎকারেরাও শয়তানের অধীন। শয়তান তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। মুনাফিকদের নেতা বা দলপতিরাও শয়তানের অধীন। তাই এই আয়াতে তাদেরকে শায়াতিন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুনাফিকদের দলপতি ছিলো পাঁচজন–বনি আসলামের কা'ব বিন আশরাফ,জুহাইনা গোত্রের আবু বুরদাহ্, বনি আসাদ সম্প্রদায়ের আব্দুদ্‌দার, আউফ বিন আমের এবং শাম দেশের আবদুল্লাহ্ বিন সাওদা।

শয়তান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিদ্রোহী বা সীমালংঘনকারী। শয়তান-জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ভূত হতে পারে। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, 'শায়াতিনাল ইনসি ওয়াল জ্বিন (এভাবেই আমি মানুষ এবং জ্বিনের মধ্য থেকে নবীগণের শত্রু হিসেবে শয়তানদেরকে সৃষ্টি করেছি)। অন্য এক স্থানে এরশাদ করেন, 'মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস' (আমি মানুষ এবং জ্বিন শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি)।

মুনাফিকরা তাদের শয়তান দলপতিদের কাছে বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। তাদের (বিশ্বাসীদের) সঙ্গে আমরা কেবল ঠাট্টা-মশকরা করে থাকি। 'ইস্‌তাহ্‌জিউ' অর্থ তামাশা। আর 'মুস্‌তাহ্‌জিউ' অর্থ তামাশা বা

ঠাট্টাকারী। মুনাফিকদের নিভৃত আলাপনের অবস্থাটি আসলে এরকম– তারা তাদের দলপতিকে বলে, আমরা তো তোমাদেরই দলে। দলপতিরা বলে, তবে তোমরা দ্বীন ও ইমানের দাবী করো কেনো? তারা বলে, (ওঃ এই কথা!)। আমরা তো তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করে থাকি মাত্র।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

❒ আল্লাহ্ তাহাদের সহিত তামাশা করেন, আর তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার অবকাশ দেন।

আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে তামাশা করেন, অর্থ মুনাফিকদের তামাশা মুনাফিকদের দিকেই ফিরিয়ে দেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ পাকের তামাশা এরকম–যখন অবিশ্বাসীরা জান্নাতের খোলা দরোজার দিকে এগিয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ দরোজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আগুনের দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, বিশ্বাসীদের জন্য একটি নূর প্রজ্বলিত করা হবে। সে নূরের আলোয় তাঁরা সহজে পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবেন। আর মুনাফিকদের পুলসিরাত অতিক্রমকালে সেই নূরকে আড়াল করা হবে। আল্লাহ্পাক এক আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'ফা দুরিবু বাইনাহুম বি সুয়ারিল্লাহু বাব'– অতঃপর তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী হয়ে যাবে, যার দরোজা থাকবে কেবল একটি। হজরত হাসান বলেন, ঠাট্টা তামাশা করার আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্পাক তাদের প্রতারণা পরিকল্পনাকে মু'মিনদের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিতাবুস্ সিহ্াত গ্রন্থে হাসান থেকে ইবনে আবিদুদ্দুনিয়া বর্ণনা করেছেন–যারা মানুষের সঙ্গে ঠাট্টা-পরিহাস করে, তাদের একজনের জন্য বেহেশতের দরোজা খোলা হবে। তাকে বলা হবে এখানে এসো। যখন সে দরোজায় পৌঁছে যাবে, তখনই দরোজা বন্ধ করে দেয়া হবে। হাদিসটি মুরসাল এবং হাসান।

'আল্লাহু ইয়াস্তাহ্জিউ বিহিম' বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের সাথে সংযোজক অব্যয় ব্যতীতই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাকই তাদের প্রতিফল দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এমতো ক্ষেত্রে মু'মিনদের জন্য কোনো প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই।

'আল্লাহু ইয়াস্তাহজিউ বিহিম'এর স্থলে 'আল্লাহু মুসতাহ্জিউবিহিম' বলা হয়নি। রহস্য এই যে, তাদের উপহাসের প্রতিফল তাদের প্রতিই পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তিত হবে। বার বার সর্বনাম (তাহারা, তাহাদের, তাহাদিগকে) ব্যবহারের দ্বারা এই ক্রিয়ার (তামাশা করা) পুনসংঘটনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য এক স্থানে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আওয়ালা ইয়ারাওনা আন্নাহুম ইউফতানুনা ফি কুল্লি আ'মিন মাররতান আওমাররতাইনি'–ওরা কি দেখে না, বৎসরে একবার বা দু'বার তারা বিপদাপদে আপতিত হয়। 'ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম' অর্থ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অবসর দান

করেন। ইয়ামুদ্দু শব্দটি গঠিত হয়েছে 'মাদ্দাল জাইশা' থেকে। মাদ্দাল জাইশা অর্থ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। অথবা শক্তিশালী করা। মাদ্দা এর প্রকৃত অর্থ আধিক্য। মাদ এবং আমওয়াদ একার্থবোধক। তফাত শুধু এতোটুকুই যে, সৎকর্মের ক্ষেত্রে আমওয়াদ, অসৎ কর্মের ক্ষেত্রে মাদ ব্যবহৃত হয়। আমওয়াদ শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই আয়াতটি উল্লেখ করা যায়–'ওয়ামদাদনাকুম বি আমওয়ালিউ ওয়াবানিন'– (আর আমি সন্তান ও সম্পদ দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছি)।

'ফি তুগ্ইয়ানিহিম'–অর্থ পাপ ও অবিশ্বাসে সীমা অতিক্রমণ। ক্বারী কাসায়ী 'তুগ্ইয়ান' শব্দটি সবসময় ইমালা সহকারে পাঠ করেছেন।

'ইয়া'মাহুন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বোধশক্তি বিনষ্ট হওয়া। দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়াকে বলে আ'মা। এ সকল অর্থকে আয়াতে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদেরই অবাধ্যতায় বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে কালক্ষেপণের অবকাশ দেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬,১৭,১৮

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ○ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ○

❒ ইহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তাহারা সৎ পথেও পরিচালিত নহে।

❒ তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ্ তখন তাহাদের জ্যোতিঃ অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না–

❒ তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

'ইশতারাউ' শব্দের অর্থ বিনিময় কামনা। 'দালালা' অর্থ কুফরী এবং 'হুদা' অর্থ ইমান। আর পুঁজি বাড়ানোর বাসনার নাম 'তিজারা'। উদ্ধৃত তিনটি আয়াতের প্রথমটিতে এই শব্দ ক'টির মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ইমান ও সৎপথের বিনিময়ে কুফরী ও ভ্রান্তপথ ক্রয় করেছে, তাই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। পরিণতিতে সৎপথেও পরিচালিত হতে পারেনি। তারা মুহতাদিন বা হেদায়েতপ্রাপ্ত নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের দুর্দশার বিষয়টিকে অধিকতর পরিস্ফুট করে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তটি চমকপ্রদ। তাই বলা হয়েছে 'মাসালুহুম'। বিরল দৃষ্টান্ত উল্লেখের ক্ষেত্রে এরকম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কামাসালাল্লাজি এর আল্লাজি অর্থ আল্লাজিনা। অন্য আয়াতেও এমতো ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন,ওয়াখুদ্ তুম কাল্লাজি খাদু– এখানেও 'আল্লাজি' 'আল্লাজিনার' অর্থবোধক। অন্যান্য ক্ষেত্রে এরকম শব্দ ব্যবহার বিধিসম্মত নয়। যেমন, আল কাইয়্যুমিন (দন্ডায়মান ব্যক্তিগণ) এর স্থলে আল কাইয়্যুম (দন্ডায়মান ব্যক্তি) বলা যায় না। এরকম পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা যায়, আল্লাজি বলার উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত বাক্যের উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাজি কোনো পূর্ণ নামপদ নয় বরং এটা যেনো পূর্ণ নামপদের একটি অংশ। আর আংশিক নামপদের বহুবচন হয় না। আল্লাজিনা শব্দটি আল্লাজি এর বহুবচনও নয়। এটি একটি পৃথক নামপদ। তবে এটা কিছুটা ব্যাপক অর্থবাহী।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্তটি এরকম–যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তখন সে আলো নিভিয়ে দিলেন। মানুষ পথ চলে আলোতে, আগুনে নয়। তাই আলো অপসারণের কথা বলা হয়েছে। আলো হচ্ছে আগুনের ক্রিয়া। আল্লাহ্তায়ালাই সকল ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। আলো অপসারণের বিষয়টির সঙ্গে অন্য কোনো রহস্য জড়িত থাকাও সম্ভব। অথবা আলোর অবলুপ্তির বিষয়টিকেই গুরুত্বহ করে তোলার জন্যই এরকম বাকভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই ক্রিয়াটি বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে।

আল্লাহ্ আলো অপসারণ করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন। আলো অপসারণের কথা বললেই তাদের দূরবস্থার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু এর পরেও অন্ধকারে ফেলে দিলেন বলা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে, তারা কিছুই দেখেনা। লক্ষ্যণীয় যে, দৃষ্টান্তের শুরুতে এক ব্যক্তির অগ্নি প্রজ্বলনের কথা বলা হয়েছে। শেষে উল্লেখ করা হচ্ছে বহুবচন (তাহাদের)। জুলমত বা অন্ধকার শব্দের বিশেষণ রূপে বলা হয়েছে, 'লা-ইউবস্বিরুন' (দেখতে পায় না)। এরকম বিবরণভঙ্গির উদ্দেশ্য পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভয়াবহতাকে প্রকাশ করা। তারাকা (ফেলে দেয়া) ক্রিয়ার কর্মপদ হচ্ছে লা-ইউবস্বিরুন (দেখতে পায় না)। এটি একটি পূর্ণ অকর্মক ক্রিয়া। এই বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে দর্শনক্ষমতাকে অকার্যকর করে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক এক ধরনের হেদায়েত দান করেছিলেন কিন্তু সে তার হেদায়েতের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সে তার যোগ্যতাকে চিরস্থায়ী কল্যাণের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। যখন তার হেদায়েত লাভের যোগ্যতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলো, তখন সে হয়ে গেলো দৃষ্টিহীনদের মতো আক্ষেপকারী। পূর্বে আলোচিত আয়াতের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। 'আমরা বিশ্বাস করেছি' এই সত্য বাক্যটি তারা মুখে উচ্চারণ করেছে। সাথে সাথে আন্তরিক অবিশ্বাসের মাধ্যমে তাকে বিনষ্টও করেছে। অথবা ব্যাপারটি এরকম– আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের বিশ্বাসকে আগুনের সঙ্গে তুলনীয় করেছেন।

সে আগুন জ্বলেছে এবং তার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ সংরক্ষণ করতে পেরেছে। এমনকি মুসলমানদের সঙ্গে গনিমতেরও অংশীদার হয়েছে। কিন্তু সে আগুন স্থায়ী নয়, তাই পার্থিব জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদের অপবিশ্বাসের কারণেই পরকালে ধ্বংস ডেকে এনেছে তারা। আর পৃথিবীতে মুনাফিকদের আসল রূপ প্রকাশ করে দেয়াও আগুনের আলো নিভিয়ে দেয়ার মতো।

উপরোদ্ধৃত শেষ আয়াতে বলা হয়েছে—তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। তারা বধির একারণে যে, সত্য আহবানের প্রতি তারা কর্ণপাত করেনি। তাদের অন্তরও সত্যকে ধারণের অনুপযুক্ত। তাই তারা আন্তরিক স্বীকৃতিসহ সত্যের মৌখিক ঘোষণা দিতে পারেনি। অতএব তারা প্রকৃত অর্থেই মূক, বোবা। আর চোখ থাকলেও তারা দৃষ্টিহীন একারণে যে, তাদের দৃষ্টিতে সত্যের স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়নি। প্রকৃত অর্থেই তারা দৃষ্টিহীন। তাই তারা অবশ্যই অন্ধ। শেষ বাক্যটি যেনো উপরোক্ত বর্ণনাবলীর উপসংহার। আপন ইচ্ছায় তারা হেদায়েতের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে। প্রত্যাবর্তনের পথকে করেছে চিররুদ্ধ। তাই এই চূড়ান্ত ঘোষণা- তারা আর ফিরবে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯,২০

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

❒ কিংবা যেমন আকাশের মুষলধারে বৃষ্টি, যাহাতে রহিয়াছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারিগণকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।
❒ বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহারা তখনই পথ চলিতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টিতে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে আরো দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। 'সাইয়াবুন' অর্থ অবতরণ। এখানে এর অর্থ মেঘ। আসল অর্থ বৃষ্টিপাত। মুষলধারার বর্ষণ। আয়াত শুরু হয়েছে 'আও' (কিংবা) সহযোগে। এই শব্দটির মাধ্যমে দৃষ্টান্তের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে এভাবে—পূর্ববর্তী উদাহরণ অথবা এই উদাহরণ। মর্ম হবে এরকম, হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় তোমরা আগের এবং এখনকার যে কোনো একটি উপমার মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা বুঝে নিতে পারো। কোরআনের অন্য স্থানেও এরকম বর্ণনাভঙ্গির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, ওয়ালা তুতি' মিনহুম ইসমান ওয়া কুফরাহ। এর ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম—হে মানুষ ও জ্বিন। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে করণীয় আচরণ সম্পর্কে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া গেলো। এখানে বুঝা যায়, অনুসরণের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে মানুষ, জ্বিন উভয়ই সমতুল।

'সামা-আ' অর্থ আকাশ। এই আয়াতে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় 'আল' সহযোগে হয়েছে আস্‌সামায়ি। এভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে সম্পূর্ণ আকাশকে। কেউ কেউ বলেছেন, সামাআ অর্থ মেঘ। যা কিছু উচ্চ, তাকে বলে সামাআ। এর সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়েছে প্রকারগত অবস্থা নির্ধারণকল্পে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতসমূহে এই শব্দটির ব্যবহার থেকে বুঝা যায়, আকাশ থেকেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, 'ওয়া আনযালনা মিনাস্ সামায়ি মাআন তাহুরা'—আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হজরত হাসানের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, বৃষ্টি মেঘ থেকে বর্ষিত হয়, না আকাশ থেকে? তিনি বলেছিলেন, আকাশ থেকে। মেঘ তো অবলম্বন মাত্র। ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শাইখ বর্ণনা করেন—খালেদ বিন মাদান বলেছেন, বৃষ্টি আরশের নিম্নদেশ থেকে নির্গত হয়ে এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে নামতে থাকে। এভাবে নামতে নামতে পৃথিবীর আকাশে আছরাম নামক স্থানে জমায়েত হয়। সেখানে সৃষ্টি হয় কালো মেঘ। বৃষ্টি ওই কৃষ্ণ মেঘে প্রবেশ করে এবং পরে বর্ষিত হয় পৃথিবীতে। আল্লাহ্‌পাক ওই বৃষ্টিময় মেঘকে যেদিকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন। ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শাইখ হজরত ইকরামা থেকে আরো বর্ণনা করেন, বৃষ্টি সপ্তম আকাশ থেকে বর্ষিত হয়।

মুষলধারার বর্ষণের মধ্যে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদুৎ-চমক। 'যাহাতে' সর্বনামটি সাইয়াবুন অথবা সামায়ি শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সামায়ি বা আকাশ শব্দটি পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, 'আস্‌সামা-উ মুনফাতিরুন বিহ্।' আরেক স্থানে বলা হয়েছে 'ইনফাতারাত জুলমাত।' মর্ম হচ্ছে ঘন পুঞ্জিভূত অন্ধকার— মেঘের, বৃষ্টির, রাতের। বজ্রধ্বনি নির্গত হয় মেঘ থেকে। বিদ্যুৎও বিকিরিত হয় মেঘের মাধ্যমে। বজ্র ও বিদ্যুৎ (র'দ এবং বারক) হচ্ছে শব্দমূল। তাই এগুলোর বহুবচন হয় না। হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, মেঘ

পরিচালনাকারী ফেরেশতার নাম র'দ। আর বিদ্যুৎ বা বারক হচ্ছে সেই ফেরেশতার অগ্নিযষ্টির ঝলক। ফেরেশতাগণ ওই অগ্নিযষ্টি দ্বারাই মেঘ পরিচালনা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, মেঘ বাধাগ্রস্ত হলে বজ্রধ্বনির সৃষ্টি হয়। আবার কেউ বলেছেন, বজ্রধ্বনি হচ্ছে ফেরেশতাদের তস্‌বী পাঠের আওয়াজ। মুজাহিদ বলেছেন, র'দ এক ফেরেশতার নাম। তাঁর আওয়াজকেও র'দ বলা হয়। এখানে বলা হয়েছে, বজ্র ও বিদ্যুৎ মেঘবৃষ্টিতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, বৃষ্টিপাতের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎপাত। আর ব্যাকরণবিধি অনুযায়ী এখানে বজ্রের আওয়াজ ও আলোককে কর্তৃকারকরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বৃষ্টি, বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ বিকিরণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রাণভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়। তাদের আশংকা থাকে— এই বিকট আওয়াজ তাদের শ্রুতিকে পর্যুদস্ত করবে। ফলে তারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা অজ্ঞান হয়ে যাবে। মৃত্যু বা অজ্ঞানাশংকা বুঝাতে এখানে 'সওয়ায়িক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য আয়াতেও। যেমন, 'ফা সাওয়ায়িক্ব মানফিস্ সামাওয়াত'–আকাশের অধিবাসীগণ মৃত্যুবরণ করবে। প্রত্যেক বিধ্বংসী শক্তিকে সায়ীকাহ বলা হয়। উদ্ধৃত শব্দ বিশ্লেষণগুলোকে একত্র করলে মর্ম দাঁড়ায় এই– ভয়াবহ বজ্রনির্ঘোষ এবং প্রলয়ংকরী বিদ্যুতাগ্নিসহ ফেরেশতাকুল যেদিকে গমন করেন সেদিককে ধ্বংস না করে ছাড়েন না।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লাহু মুহিতুম বিল কাফিরিন'–আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। এর অর্থ– অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে পরিত্রাণ পাবে না। তারা রয়েছে অপরিত্রাণের অনড় বেষ্টনীতে। বিদুৎ-চমক তাদেরকে প্রায় দৃষ্টিহীন করে ফেলে। এই আয়াতটি আগের আয়াতটির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এটি একটি পৃথক বাক্য। এটি একটি প্রশ্নের জবাব, যে প্রশ্নটি উহ্য রয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, বজ্রবিদ্যুৎ যখন তাদেরকে ঘিরে রেখেছে তখন তাদের অবস্থা কী? উত্তর হচ্ছে, তাদের তখন প্রায় দৃষ্টিরহিত অবস্থা। যখন চমকে ওঠে, তখন তারা পথ চলতে উদ্যত হয়। পরক্ষণেই বিদ্যুৎ নিভে গেলে থেমে যায়। এভাবেই বারংবার তারা আশাহত হতে থাকে। আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে শ্রুতিহীন এবং দৃষ্টিহীন করে দিতে পারতেন। অর্থাৎ প্রচন্ড বজ্রনির্ঘোষের মাধ্যমে তাদেরকে সম্পূর্ণ বধির এবং সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুচ্চমকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দিতে পারতেন। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। এতে করে বুঝা যায়, প্রতিটি মৌল ও যৌগ ক্রিয়াকলাপ এবং মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্। আয়াতের শেষে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।'

শাইয়্যুন শব্দমূল থেকে গঠিত হয়েছে শাইয়িন (সমস্ত কিছু) শব্দটি। কখনো কখনো শব্দটি ব্যবহৃত হয় কর্তৃকারক রূপে। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ

করেছেন, 'কুল আইয়্যু শাইয়িন আকবারু শাহাদাতান কুলিল্লাহ।' কর্মপদ রূপেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। এরকম ব্যবহার অনুসারে শব্দটি সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) সকল কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহু খলিকু কুল্লি শাইয়িন'– আল্লাহ্‌পাক সকল সম্ভাব্য বস্তুর স্রষ্টা। আলোচ্য আয়াতে শব্দটির অর্থ নেয়া হয়েছে সাধারণ ব্যবহারবিধি অনুসারে। আল্লাহ্‌পাক কৃদীর। বস্তুকে অস্তিত্বশীল করার পূর্ণ ক্ষমতা (কুদরত) তাঁর রয়েছে। কুদরত অর্থ, ইচ্ছে করলে করা,ইচ্ছে না করলে না করা। আল্লাহ্‌পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রসঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার শোভনীয় নয় বলা যায়।

ঘনঘোর বৃষ্টিকে উপমিত করা হয়েছে ইসলাম ও কোরআনের সঙ্গে। বজ্রনিনাদ ও বিদুৎ-চমক হচ্ছে ধর্মের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ। এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে গেলে প্রয়োজন সমর্পণসিদ্ধতা, নিখাদ উপাসনাপ্রবৃত্তি, রিপুরিক্ততা, সাধনা, সংযম ইত্যাদি। হজরত আনাস থেকে মুসলিম, আহমদ এবং তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বেহেশত আকর্ষণহীন আর দোজখ আকর্ষণীয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, বেহেশত সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌পাক হজরত জিব্‌রাইলকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্‌রাইল বেহেশত এবং বেহেশতের সামগ্রীসমূহ দেখে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ! যে ব্যক্তি বেহেশতের বৈভবের কথা শুনবে, সে বেহেশতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। এরপর বেহেশতকে ঢেকে দেয়া হলো সংযম এবং দুঃখময় সাধনার আবরণে। আল্লাহ্‌পাক বললেন, পুনঃপ্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্‌রাইল পুনঃঅবলোকন করে বললেন, তোমার সম্মান ও পরাক্রমের কসম! আমার মনে হচ্ছে কেউ আর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। দোজখ সৃষ্টির পরও আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দেশ দিলেন, হে জিব্রাইল প্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্‌রাইল দোজখ দেখে বললেন, আয় আল্লাহ্। তোমার শান শওকতের কসম! দোজখের কথা শুনলে কেউই দোজখে প্রবেশ করতে চাইবে না। আল্লাহ্ তখন দোজখকে ঢেকে দিলেন মনোমুগ্ধকর আচ্ছাদনে। তারপর বললেন, পুনঃপ্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্‌রাইল পুনরায় দেখে বললেন, তোমার মহানুভবতার শপথ! এখন সেখানে প্রবেশ না করে কেউ ছাড়বে না। বিষয়টি কোরআনুল করীমে উল্লেখিত হয়েছে এইভাবে–'ওয়া ইন্নাহা লা কাবীরাতুন ইল্লা আলাল খশিয়িন'–বিনম্রজন ব্যতীত অন্যদের নিকট নামাজ একটি বিরাট বোঝা।

বজ্রনিনাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার ওই সমস্ত নিদর্শন, যা শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে। আর বিদুৎ-চমক হচ্ছে বিজয় এবং প্রচুর গনিমতের মাল। মুনাফিকেরা এ সব পেয়েছিলো। তাই তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। এই বাহ্যিক অনুসরণের কারণেই তারা পার্থিব শাস্তি (মৃত্যুদন্ড অথবা বন্দীজীবন)

থেকে অব্যাহতি লাভ করছিলো। গনিমতের সম্পদ না পেলে ফুটে উঠতো তাদের আসল চেহারা। তখন বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনেও তারা গড়িমসি করতো। ওই সমস্ত সুস্পষ্ট প্রমাণকেও বিদুৎ-চমক বলে ধরে নেয়া যায়, যা সরল পথপ্রদর্শনের সহায়ক। যা ইবাদতের কঠোর পরিশ্রমকে সহজতর করে দেয়। কর্ণকুহরে আঙ্গুল দেয়ার কারণ হচ্ছে এই–তারা সত্যের আহবান শুনতে চায় না, সত্যের নিদর্শনও দেখতে চায় না। তারা পরস্পরে বলাবলি করতো, এই কোরআন তোমরা শুনোনা। মৃত্যুর ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়ার অর্থ হচ্ছে এমতো আশংকা যে, আমরা যদি ইমান গ্রহণ করি তবে ইবাদতের কঠোর পরিশ্রমের বোঝা কাঁধে নিতে হবে। জেহাদের সমন এলে যুদ্ধে যেতে হবে। শ্রমসাধ্য ইবাদত ও যুদ্ধভীতি তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য। তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'হে নবী। আপনি তো তাদের ভীতিগ্রস্ত অবস্থা দেখেছেন। তখন তারা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এভাবে, আতংকাবস্থায় তারা যেনো মৃত্যুকে দেখছে।' কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর আরেকটি উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তারা মনে করতো–শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতগুলো না শুনলে হয়তো তারা শাস্তিমুক্ত থাকতে পারবে। কিন্তু মূর্খেরা একথা বুঝতে পারে না যে, কান বন্ধ করে বজ্রের গর্জন থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও তাদের শেষ রক্ষা হবে না। যেমন কোনো খরগোশ সামনে শিকারীকে দেখে আত্মগোপনের সুযোগ না পেয়ে চক্ষু বন্ধ করে রইলো–এতে করে কি তার শেষ নিষ্কৃতি হবে?

আল্লাহ্‌পাক কাফেরদেরকে পরিবেষ্টনকারী–একথার অর্থ পৃথিবীতে তাদের জন্য বিভিন্ন যাতনা ও লাঞ্ছনা তো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে আখেরাতে সুনির্ধারিত শাস্তি। আগেই বলা হয়েছে, বিদুৎ-চমক অর্থ বিজয়াভিযান, গণিমত অথবা শৌর্যবীর্য। সত্য প্রত্যাখ্যানকারিরা যেহেতু লোভী, তাই বিজয়, গনিমত ইত্যাদি তাদের দর্শনশক্তিকে অনতিবিলম্বে অকার্যকর করে দেবে। বিদ্যুচ্চমকের আরো একটি অর্থ হতে পারে সুস্পষ্ট এবং সুউজ্জ্বল প্রমাণ। এই সুস্পষ্ট এবং সুউজ্জ্বল প্রমাণাদি তাদের ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টি ও বিবেককে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবে। বিদুৎ-চমক দেখলে তারা পদবিক্ষেপে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে । আলো নিভে গেলে থেমে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা দোদুল্যমান অন্তরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। পার্থিব লাভ দেখলে নিশ্চিন্ত হয়, আর বিপদ দেখলে পিছিয়ে যায়।'

আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলুপ্ত করে দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে সত্যদর্শনের দৃষ্টি এবং সত্যকথা শোনার ক্ষমতাও দিয়ে দিতে পারেন। এই অনুষঙ্গটি অন্যস্থানে ঘোষিত হয়েছে এভাবে- আমি যদি ইচ্ছা করতাম,তবে সকলকে হেদায়েত দান করতাম। কিন্তু আমার এই কথা সুনির্ধারিত যে, আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো।

আস্ সুদ্দীর পদ্ধতিতে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের একটি উদ্ধৃতি আবু মালেকের মাধ্যমে আল্লামা ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন। তিনি আরেকটি বিবরণ দিয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবাগণের মাধ্যমে মুর্‌রা থেকে। বিবরণটি এই–মদীনার দু'জন মুনাফিক মুশরিকদের দলে ভিড়বার পরিকল্পনা নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলো। পথে শুরু হলো ঘনঘোর বৃষ্টি, বজ্রধ্বনি ও বিদুৎ-চমক। যখন বিকট আওয়াজে বজ্রপাত শুরু হলো তখন তারা প্রাণভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করালো। যখন বিদ্যুৎ চমকাতো তখন তারা পথ চলতে চেষ্টা করতো। আর বিদ্যুৎ নিভে গেলেই থেমে যেতো। তারা আর গন্তব্যের দিকে যেতে সাহস করলো না। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ আবাসে ফিরে এলো। তারা ঠিক করলো, আর নয়। সকাল হলেই নবীপাক স. এর দরবারে যেয়ে তওবা করতে হবে। সকাল বেলা তারা যথারীতি রসুল স. এর দরবারে যেয়ে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করলো। এই ঘটনাটি দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়ে থাকবে। আর কানে আঙ্গুল দেয়া মুনাফিকদের একটি সাধারণ স্বভাব। রসুল স.এর দরবারে তারা নতুন আয়াত অবতীর্ণ হলে কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকতো। তাদের ভয় হতো, হয়তো বা এই আয়াত তাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হচ্ছে। হয়তো তাদেরকেই হত্যা করার নির্দেশ এসেছে এই আয়াতে। তাদের এই আচরণ বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎতের সময়কার হতবিহ্বলতার মতো (কানে আঙ্গুল দেয়ার মতো)। নির্বিঘ্ন বিজয় এবং সম্পদপ্রাপ্তির সময় তারা বলতো, মোহাম্মদের আনীত ধর্মতো এখন সত্যিই মনে হচ্ছে। তাদের এই অবস্থা বিদ্যুৎ-ঝলক দেখে পথ চলতে চেষ্টা করার মতো। বিপদাপদের সময় পরিদৃষ্ট হতো তাদের আসল রূপ। তখন তারা বলতো, মোহাম্মদের ধর্মের অনুসরণ করার কারণেই এসব হচ্ছে। এভাবে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করতো। তাদের এ অবস্থা বিদ্যুৎ নিভে যাওয়ার সময়ের থেমে পড়ার মতো। ইবনে জারীর।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, জুলমত (অন্ধকার) শব্দের মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন (মোতাশাবেহাত) আয়াতগুলোর মতো। এই অনুভূতিটি চিন্তা বিবেকের অতীত। আর বার্‌ক (বিদ্যুৎ) শব্দটির মর্ম সুস্পষ্ট (মোহকাম) আয়াতগুলোর মতো চিন্তা বিবেকের আওতায় ধরা যায়। তাই বিশুদ্ধ মু'মিনের দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, বোধ্য এবং অবোধ্য সকল কিছুর উপরই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যেহেতু এসমস্ত কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে। আর যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা ও শঠতা, তারাই ফেতনা ফাসাদের উদ্যোক্তা। তারা তাদের প্রবৃত্তিপ্রসূত দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতগুলোর ভ্রান্ত বিশ্লেষণে রত হয়। এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলতে গেলে তারা কানে আঙ্গুল দেয় (মুনাফিকদের মতো)। তাদের অভিমত পবিত্র আয়াতগুলোর প্রকৃত মর্মের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রকৃত অর্থের প্রতি তাদের ভয় মৃত্যুভয়ের মতো। কোরআন মজীদকে তারা করতে চায় তাদের কল্পনার অনুকূল। অবাস্তবতার অভিযাত্রী

তারা। কোরআনের কোনো বিধানকে তারা তাদের অর্বাচীনতার অনুকূলে দেখতে পেলে তার গুণগ্রাহী হয়। ইমানের ঘোষণা দেয়। আর সামান্য প্রতিকূলতাতেই সত্য প্রত্যাখ্যান করে বসে। তখন তাদের বিকৃত বিশ্বাসই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র অবলম্বন। এই বিকৃত ব্যাখ্যাকারীরাই বিভিন্ন বিভ্রান্ত দল উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তারা বলে, প্রতিটি বস্তুই আকৃতি বিশিষ্ট; আর সব কিছুরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিরাবয়ব ও দৃষ্টান্তবিহীন সত্তার প্রতি তাদের কোনোই স্বীকৃতি নেই। তাই আনুরূপ্যহীন আল্লাহ্‌কে তারা স্বীকার করে না। যদি স্বীকার করে তবে তাকে দেহবিশিষ্ট বলে জানে। কেউ কেউ আবার তার দর্শনে অস্বীকৃত হয়। কেউ অস্বীকার করে কবরের শাস্তি, পাপ পুণ্যের ওজন, পুলসিরাত ইত্যাদি। কেউ বলে কোরআন সৃষ্ট (অথচ কোরআন আল্লাহপাকের বাণী) যা সৃষ্টির বৃত্তভূত নয়। এ সমস্ত অবিশ্বাসী ও বিকৃত বিশ্বাসীরা রাফেজী, খারেজী, মোতাজিলা ইত্যাদি বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তারা যেনো বলতে চায়, আমরা কোরআনের কিছু অংশে বিশ্বাস করি এবং কিছু অংশে বিশ্বাস করি না। এ রকম মনোভাব সুস্পষ্ট অবিশ্বাসের নাম। তাদের এহেন অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে– আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন।

ওয়া মিনান্নাস (৮ নং আয়াত) থেকে এই আয়াত পর্যন্ত ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং প্রবৃত্তিপ্রমত্ত মুনাফিকদের স্বভাববৈশিষ্ট্যের সম্যক বিবরণ দেয়া হয়েছে। একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারা ইমানের দাবী পেশ করলেও তাদের ইমান কস্মিনকালেও গ্রহণীয় নয়। তারা প্রতারক। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, এই প্রতারণা তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা মিথ্যাবাদী, বঙ্কিমবিশ্বাসী। তাদের অন্তরের কুটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কঠোরতম শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তাদের জন্য। তারা বলে, আমরা শান্তিপ্রয়াসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই অশান্তির জনক। নিতান্তই অজ্ঞ তারা। তাই বুঝে না– প্রকৃত করণীয় কী। অজ্ঞতামুক্ত হওয়ার জন্যই তাদেরকে আহবান করা হয়েছে, অপরাপর লোকের (সাহাবায়ে কেরামের, আহলে বাইতের) ইমানের মতো ইমান গ্রহণ করো। এই ইমানের নিশানবাহী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। এই জামাত বিভ্রান্ত দল উপদলগুলো অপেক্ষা সংখ্যায় এবং মর্যাদায় গরিষ্ঠ।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, শ্রেষ্ঠ জামাতের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের হাত (হেফাজত) রয়েছে।

আল্লাহ্‌পাকের সদয় আহবানের জবাবে তারা বলেছে, 'আমরা কি নির্বোধদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবো।' নিজেদের অপবিশ্বাসের অনুকূলে পেতো না বলেই তারা সাহাবাগণকে নির্বোধ মনে করতো। রাফেজী ও খারেজীরাও তাঁদেরকে এরকম মনে করে থাকে। সাহাবাগণের মধ্য থেকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তায়ালা খলিফা নির্ধারণ করেছেন। তাঁরাই আল্লাহ্‌'র সন্তোষভাজন। এটাই সাহাবাদের প্রতি তাদের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ।

তাদের উপমা সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তির মতো, যার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সীমিত পরিসর। সুতরাং পৃথিবীর সীমিত পরিসরই তাদের উপকারে আসে। মৃত্যুর অন্ধকার ঘনায়মান হয়ে উঠলে তাদের অদৃষ্ট হয়ে ওঠে ঘন অন্ধকারাচ্ছাদিত। মৃত্যুত্তোর জীবন হচ্ছে প্রকৃত ইমানের অক্ষয় আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়, যা কেবল প্রকৃত বিশ্বাসীদেরই অধিকারভূত। মহানবী মোহাম্মদ স. এর সময়ের এবং পরবর্তীকালের সকল অপবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এই আয়াতগুলোতে। আমি বলি, রসুল স. এর জামানায় পরবর্তী বাতিল ফেরকাগুলোর অস্তিত্ব না থাকলেও উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে বিবৃত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এর স্বপক্ষে রয়েছে অনেক হাদিস এবং পূর্বসুরী তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল্লাহ্‌পাকই সর্বজ্ঞ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

❑ হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা আত্মরক্ষা করিতে পার,

---

'ইয়া আইয়্যুহান্নাস' অর্থ হে মানব সম্প্রদায়। যারা এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যারা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় বর্তমান ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে যারা আসবেন—সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌। সকল মানুষকেই এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। সকলের প্রতি এরশাদ হচ্ছে, তোমরা তোমাদর স্রষ্টা ও প্রতিপালকের ইবাদত করো।

'আন্নাস' শব্দটি 'আল' এবং 'নাস' সহযোগে গঠিত। আল হচ্ছে সমষ্টিবাচক বহুবচন এবং নির্দিষ্টবাচক অব্যয়। তাই আন্নাস হচ্ছে সার্বজনীন মানবতা। সাহাবায়ে কেরাম এরকমই বুঝতেন।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেন, কোরআনে 'ইয়া আইয়্যুহান্নাস' বলে মক্কাবাসীদেরকে এবং 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু' বলে মদীনাবাসীদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কায় অবিশ্বাসীরাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্বাসীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। তাই এরকম সম্বোধন করা হয়েছে যাতে করে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে এই সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল হয়। মদীনার অবস্থা ছিলো এর বিপরীত।

সেখানে বিশ্বাসীরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। তাই তাঁদের মর্যাদা রক্ষার্থে মদীনার সকলকেই ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু (হে বিশ্বাসীগণ) বলে ডাকা হয়েছে।

যিনি প্রতিপালক, তিনিই উপাসনা লাভের যোগ্য। প্রতিপালনকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়)। যদিও আল্লাহ্তায়ালার নিছক সত্তা-ই ইবাদত লাভের উপযুক্ত, তদুপরি তিনি লালনপালনকারী। তাই কৃতজ্ঞতাবদ্ধতার কারণেও কেবল তাঁরই ইবাদত করা উচিৎ। উপাসনার এই অত্যাবশ্যকীয়তা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেরই দায়িত্বভূত। মু'মিনরা তো উপাসনা করবেই। কারণ, তারা বিশ্বাসী। কাফেরদেরকেও উপাসনা করতে হবে বিশ্বাস স্থাপনের পর। কারণ, উপসানাকারীকে অবশ্যই বিশ্বাসভাজন হতে হবে। বিশ্বাসবিহীনতায় উপাসনা হয় না।

'আল্লাজিনা খলাক্ব কুম' অর্থ, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটা রব্বাকুম (প্রতিপালক) এর বিশেষণ, যার মাধ্যমে সৃষ্টির মর্যাদা ও কারণ নির্ণীত হয়েছে। অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টি করা, যে সৃষ্টির নমুনা পূর্বে ছিলো না।

'ওয়াল্লাজিনা মিন ক্বলিকুম' অর্থ, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়টি সকল মানুষেরই জানা। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি সে কথাই প্রমাণ করে। অন্য আয়াতেও এ বিষয়টির প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'হে নবী। এটা নিঃসন্দেহ যে, আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? তবে তারা অবশ্যই কলবে, আল্লাহ্। পূর্ববর্তীদের উল্লেখ এ কারণে হতে পারে যে, মানুষেরা যেনো সহজ চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই আল্লাহপাকের সার্বজনীন সৃজনশীলতার বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এটি এমন একটি ইঙ্গিত যা অস্বীকার করার যো নেই।

'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন' অর্থ–যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো। এ অবস্থাটি হচ্ছে উপাসনাকারীর অবস্থা। অর্থাৎ উপাসনাকারীগণ যেনো অন্তরে এমতো আশা পোষণ করে যে, আল্লাহ্পাক আমাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিবেন। এই আশার সঙ্গে থাকতে হয় ভয়। কারণ আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময়। ইমান চায়, ভয়মিশ্রিত আশা অথবা আশাশোভিত ভীতি। এরকম অর্থও হতে পারে যে, উপাসনা লগ্নে এ রকম আশা পোষণ করা–আমরা ধর্মভীরুগণের পবিত্র দলের অন্তর্ভূত হবো। যারা ধর্মভীরু তারা শরিয়তবিরোধী কর্মকান্ড থেকে বিমুখ। এই বিমুখতার নামই তাকওয়া (আত্মরক্ষা, সাবধানতা)। যথাকর্তব্য সম্পাদনের ভিত্তি এই তাকওয়ার উপরেই। বরং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই প্রকৃত তাকওয়া। 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন' বাক্যটি 'খলাক্বকুম' (সৃষ্টি করেছেন) ক্রিয়ার কর্মপদের অবস্থাব্যঞ্জকও হতে পারে। এই ধারণাসূত্রে অর্থ দাঁড়াবে এরকম–আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের নিকট থেকে তাকওয়ার আশা করা যায়। কারণ, তোমাদের সত্তা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া সৃষ্টির কারণ ও উপকরণ রয়েছে। তাই স্বভাবতঃই তোমাদের

নিকট থেকে তাকওয়ার আশা করা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, বাক্যটি পূর্বোক্ত উক্তির কারণ। তাই অর্থ হবে এরকম—এ জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমরা যেনো আত্মরক্ষা করতে পারো। কাযী বায়যাবী বলেছেন, ব্যাখ্যাটি দুর্বল। ভাষাবিদগণের নিকট থেকে এ ধরনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দেখা যায় না। ব্যাকরণবিদ সিবওয়াইহ্ বলেছেন, লায়াল্লা এবং আসা শব্দ দু'টি আশাব্যঞ্জক অব্যয়। কোরআন মজীদের যে সকল স্থানে এই অব্যয় দু'টি বিদ্যমান, সে সকল স্থানে বিষয়বস্তুর বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আমি বলি, সিবওয়াইহ্ এর অভিমতটি শুদ্ধ নয়। তার কথা মেনে নিলে সকল সৃষ্টিরই মুত্তাকী (তাকওয়া অবলম্বনকারী) হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরকম হওয়া অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, সিবওয়াইহ্ এর মতবাদের অনুকূলে অন্য একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। যেমন—তোমাদের সৃষ্টিরহস্য এরকম যে, তোমাদের আত্মরক্ষা করার অনুষঙ্গটি ছিলো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সকলে নয় বরং কিছু সংখ্যক লোক একে বাস্তবায়ন করতে ব্রতী হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রতিপালন এই অনুগ্রহ দু'টি ইবাদতকে অপরিহার্য করেছে। একথাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, পুণ্যদানও আল্লাহ্পাকের একটি অনুদান। নতুবা উপাসনাই যদি কেবল পুণ্য লাভের কারণ হয়, তবে মানুষকে মনে করতে হবে এমন এক শ্রমিক, যে শ্রমের পূর্বেই তার পারিশ্রমিক নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হবে আল্লাহ্পকের পরিচয় লাভ। এই পরিচয় লাভের পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ্র সৃষ্টিবৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা। এই পরিচিতি বা মারেফতের মূল মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্পাকের সিফাতের (গুণাবলীর) পরিচয় লাভ। তাঁর জাতের (সত্তার) পরিচিতি অর্জনায়ত্ব নয়। অর্জিত জ্ঞানে তাঁর সংকুলান হয় না। এই সর্বোচ্চ পরিচিতি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার করুণানির্ভর।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

❑ যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল

উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহের সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন শয্যারূপে। শয্যা অর্থ এমন বিছানা যা বাসোপযোগী। অতি শক্ত নয়। অতি কোমলও নয়।

'ওয়াস্ সামাআ' অর্থ এক বা একাধিক আকাশ। 'বিনাআ' অর্থ আচ্ছাদন বা ছাদ। এই শব্দটি শব্দমূল এবং অর্থের দিক থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য। আল্লাহ্পাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আকাশ থেকে সৃষ্টি হয় বাষ্প। এ বাষ্পই মেঘের মাধ্যমে বৃষ্টিরূপে আপতিত হয়। এই আপতন বা বর্ষণকে 'আনযালা' শব্দটির মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে। বৃষ্টিপাতের ফলে অংকুরোদ্গম ঘটে উদ্ভিদের। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ফলমূল। সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কুদরত। বৃষ্টি মিশ্রিত মাটির মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে ফলমূল উৎপাদন নিশ্চিত করেন। মাটি ও পানি বাহ্যিক কারণ। প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালাই। 'মিনাস্ সামারাত' এর 'মিন' অব্যয়টির অর্থ কিয়দংশ অথবা সম্পূর্ণ। 'আররিয্ক্ব' (জীবিকা) শব্দটি আখরজা (উৎপাদন) ক্রিয়ার কর্মপদ। 'লাকুম' শব্দটি 'রিয্ক্ব' শব্দের বিশেষণ অথবা কর্মপদ। 'রিয্ক্ব' হচ্ছে শব্দমূল। 'আখরজা' শব্দটিও নিজস্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বাক্যটির অর্থ হবে—ফলমূল উৎপন্ন করা হয়েছে তোমাদের জীবিকার জন্য।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, ফালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদাঁও ওয়া আংতুম তা'লামুন—সুতরাং জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির কোরো না। অর্থাৎ এমন যেনো না হয় যে, আল্লাহ্পাকের মতো করে তোমরা অন্য কারো উপাসনায় লিপ্ত হও অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্পাকের প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করো। আল্লাহ্পাক প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন এবং প্রতিপক্ষহীন। 'সমকক্ষ স্থির কোরো না' এই নিষেধাজ্ঞাটি পূর্বের আয়াতের 'ইবাদত করো' আদেশটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি আদেশ। অপরটি নিষেধ। অথবা সমকক্ষ দাঁড় করানোর ব্যাপারটা পূর্বের আয়াতের আত্মরক্ষা করার বিষয়টির সাথে জড়িত। যেনো সমকক্ষতার আশংকা থেকেও আত্মরক্ষা করতে বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা হবে- যদি তোমরা শংকাগ্রস্ত হও, তবুও কাউকে আল্লাহ্পাকের সমতুল কোরো না। অথবা এই আয়াতের প্রারম্ভিকা (আল্লাজি জায়ালালাকুম) এর সঙ্গেও সমকক্ষ না করার আজ্ঞাটি সম্পর্কযুক্ত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এরকম অবস্থায় অর্থ হবে- সেই পবিত্র সত্ত্বা, যিনি ভূপৃষ্ঠকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করেছেন। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবিকাস্বরূপ মাটিতে উৎপন্ন করেছেন ফলমূলের সমাহার। সমকক্ষহীনতাই তাঁর জন্য শোভনীয়। সুতরাং তাঁর সমকক্ষ স্থির করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

'ওয়া আংতুম তা'লামুন' অর্থ জেনে শুনে। বলা হচ্ছে, তোমরা জ্ঞানসম্পন্ন। তোমরা তো বিষয়টি জানো এবং বুঝ। একটু চিন্তা করলেই আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির না করার বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। হুঁশিয়ার করার জন্যই এখানে 'ওয়া

আংতুম তা'লামুন' বলা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, যাদের বুদ্ধিজ্ঞান কম তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাতে পারবে। প্রকৃত অর্থ হবে এরকম, তোমরা তো জানোই গোটা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালা। বিষয়টি তোমরা স্বীকৃতিও দিয়ে থাকো (যেমন অন্য আয়াতে এসেছে- হে নবী। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্)।

এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী আয়াত আল্লাহ্পাকের তাওহীদ (এককত্ব) বিষয়ক। আল্লাহ্র সৃষ্টিনৈপুণ্যের প্রতি চিন্তা নিক্ষেপ করার কথাও আয়াত দু'টোতে বিবৃত হয়েছে। এবার শুরু হবে কোরআন এবং যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- সেই মহান রসুলের সত্যতা বিষয়ক আলোচনা, যা ইমান বা বিশ্বাসেরই বলয়ভূত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩, ২৪

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

❐ আমি আমার দাসের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা তাহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহবান কর।

❐ যদি তোমরা আনয়ন না কর, এবং কখনই করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণের জন্য যাহা প্রস্তুত রহিয়াছে।

অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করতো, ঘটনাপরম্পরায় যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে তা আল্লাহ্র বাণী নয়। কবিরা যেমন একের পর এক পঙক্তি রচনা করে যায়—এ অনেকটা সে রকমই। কবিতা আবৃত্তির মতোই এগুলোকে আল্লাহ্র বাণী বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের ধারণা হতো, আল্লাহ্র বাণী হলে সম্পূর্ণ কোরআনই অবতীর্ণ হতো এক সঙ্গে। ঘটনা ও পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়িত থাকতো না। তাদের এই সন্দেহের প্রতিবাদে আল্লাহ্তায়ালা এখানে এমন এক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছেন যা মোকাবেলা করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। ভবিষ্যতেও কেউ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবে না।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করছেন, আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি— এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, দাস বা বান্দাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী। আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। তাই পূর্ণ অনুগত বান্দাই দাস নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। রসুল মোহাম্মদ স.কে এখানে দাস সম্বোধনের মাধ্যমে চরমতম মর্যাদা দেয়া হয়েছে। প্রকৃত দাস বা বান্দা তিনিই। অন্য সকল বিশ্বাসী বান্দারা তাঁরই অনুসরণের সৌভাগ্য লাভের কারণে বান্দা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

আল্লাহ্‌পাক জানাচ্ছেন, অবতীর্ণ সুরা সম্পর্কে সন্দিহান হলে তোমরা এর অনুরূপ সুরা পেশ করো। সুরা অর্থ কোরআন পাকের একটি নির্দিষ্ট অংশ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে সুরাতুল মদীনা শব্দ থেকে। যার অর্থ শহরের প্রাচীর। প্রাচীর যেমন শহরকে সীমাবদ্ধ করে—এখানে সুরা বলতে তেমনি কোরআনপাকের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সুরা শব্দের আরেকটি অর্থ মর্যাদা। কোরআন পাঠকারী এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সুরা এই মর্যাদার প্রকাশক বলেও ধরে নেয়া যায়। কিন্তু এই আয়াতের সুরা প্রথমোক্ত অর্থেই গৃহীতব্য। এখানে সুরা অর্থ সুরার অংশবিশেষ। সুরার আয়াত সংখ্যা হবে কমপক্ষে তিন।

'মিম্‌ মিস্‌লিহি' অর্থ অনুরূপ। শব্দটি সুরা শব্দের বিশেষণ। মিস্‌লিহি এর 'হি' সর্বনাম। মিস্‌লিহি এর প্রকৃত অর্থ এর (তাহার) অনুরূপ। এই সর্বনামটি সম্ভবত মা আনযালনা (যা অবতীর্ণ করেছি) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমতাবস্থায় মিন অব্যয়টি তাবয়ীজিয়া অথবা বয়ানিয়া কিংবা জায়েদা হবে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম—অলংকরণশোভিত অনুপম ছন্দবিশিষ্ট এই কোরআনের মতো একটি সুরা পেশ করো। উল্লেখিত সর্বনামটি 'আলা আবদিনা' (আমার দাসের প্রতি) এর সঙ্গেও সম্বন্ধিত হওয়া সম্ভব। এ নিয়মে মিন অব্যয়টি সূচনাসূচক বলে গণ্য হবে। এমতো বিশ্লেষণে আয়াতের অর্থ নির্ধারিত হবে এরকম—রসুল মোস্তফা স. এর মতো উম্মী (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী) নবী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সুরা নিয়ে এসো। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এতে করে কোরআন যে সর্বাংশে আল্লাহ্‌র রচিত বাণী সে কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর এবাণীর অনুরূপ কোনো বাণী নির্মাণের সাধ্য কারো নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বতঃসিদ্ধ। অন্য আয়াতে একথা বলে দেয়া হয়েছে। যেমন—'হে নবী আপনি সকলকে বলে দিন, মানুষ ও জ্বিন সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে কোরআনের অনুরূপ একটি বাক্য প্রস্তুত করুক। (কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হলেও এরকম কোনো বাক্য প্রস্তুত করতে পারবে না)।

আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে আরো বলা হয়েছে, তোমরা যদি সত্যবাদি হও তবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সকল সাক্ষীকে (বাতিল মাবুদদেরকে) এগিয়ে আসতে বলো। সকল সাক্ষী অর্থ অবিশ্বাসীদের মিথ্যা

উপাস্যসমূহ। অথবা অবিশ্বাসীরা যাদের সাহায্য পাবে বলে মনে করে তারা। এর অর্থ আরবী ভাষার কবি এবং সাহিত্যবিশারদকুল। তারাই সুন্দর সুললিত বাণী চয়নে সমর্থ। আল্লাহ্‌পাক এখানে তাদের প্রতিও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন, তারাও ছিলো অবিশ্বাসী। তারা চেষ্টা করতে পারতো। মিথ্যা সাক্ষীও পেশ করতে পারতো। কিন্তু পারেনি। কারণ বিষয়টি কেবল বাণী নির্মাণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। এতে রয়েছে সত্য কিংবা মিথ্যার সুস্পষ্ট ঘোষণার ব্যাপার। স্রষ্টার মোকাবেলা কি সৃষ্টি কখনো করতে পারে– না করা সম্ভব? পরের আয়াতে বলা হচ্ছে, 'যদি তোমরা অসমর্থ হও'। আর অসমর্থ তো হবেই। শুধু তোমরা নও তোমাদের পরবর্তীদের জন্যও অসমর্থতা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তবে এবার মেনে নাও যে, কোরআন হচ্ছে মোজেজা– অক্ষমকারী। এখন একটি পথ খোলা রইলো–বিশ্বাস করা। সুতরাং বিশ্বাস করো। ওই আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো যে আগুনের ইন্ধন মানুষ এবং পাথর। 'ওয়াকুদু' অর্থ দাহ্য বস্তু, যদ্দারা আগুন প্রজ্বলিত করা হয়। দোজখের দাহ্য বস্তু বা ইন্ধন মানুষ এবং পাথর। 'ওয়াকুদু' শব্দটি শব্দমূল হওয়াও সম্ভব। আর এটিকে শব্দমূল ধরে নিলে মানুষ এবং পাথর এর পূর্বে একটি সম্পূর্ণ পদ উহ্য আছে মনে করতে হবে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– দোজখের দহনপ্রখরতা মানুষ এবং পাথরের প্রজ্বলনের কারণে হবে। এ ব্যাপারে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, হাকেম, বায়হাকী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। মুজাহিদ এবং আবু জাফরের এসম্পর্কিত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে। প্রথম শ্রেণীর মুফাস্‌সিরগণও এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ উচ্চারণ করেননি। বক্তব্যটি এই- জাহান্নামে ইন্ধন হবে কৃষ্ণকায় গন্ধক পাথর। কেউ কেউ বলেছেন, সকল প্রকার পাথরই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরকমও বলা হয়েছে যে, এই সংবাদটির মাধ্যমে দোজখাগ্নির প্রলয়ংকরী দহন ক্ষমতা এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'ফাইল্লাম তাফ্‌য়ালু (যদি তোমরা আনয়ন না কর)। এখানে 'ইন' অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইন' অর্থ যদি। 'যদি' কখনো সুনিশ্চিত নয়। কোরআনের অনুরূপ সুরা প্রস্তুত করতে না পারার বিষয়টি সুনিশ্চিত। তাই এখানে 'ইন' এর পরিবর্তে 'ইজা' অব্যয়টি ব্যবহার করা যেতো। কারণ, ইজা একটি সুনিশ্চিন্ততা সূচক অব্যয়। 'যদি জায়েদ আসে তবে আমিও আসবো'-এরকম বাক্যের মধ্যে আমার আসার ব্যাপারটি নিশ্চয়তাহীন। 'যদি সূর্য উদিত হয় তবে আমি আসবো'-এখানেও যদি ব্যবহারের কারণে আমার আসার নিশ্চয়তা সন্দেহজনকতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞান সন্দেহের অতীত। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সকল কালের সংবাদই তিনি সন্দেহাতীত রূপে জানেন। তবুও এখানে যদি উল্লেখ করার কারণ এই যে, ১. তাদের উপহাস প্রবণতার প্রতিকূলে তাদেরকে উপহাসের সম্মুখীন করাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। যেমন, কেউ বললো, আমি শুক্রবারে তোমাদের কাছে আসবো। একথা শুনে কেউ বললো, শুক্রবার যদি না আসে। এরকম উক্তিকে উপহাস ছাড়া আর কী মনে করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌পাক সুনিশ্চিত যে, তাঁর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাধ্য কাফেরদের নেই। তবুও তিনি 'যদি' ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে

উপহাসের সম্মুখীন করে দিয়েছেন। ২. আল্লাহপাক কথা বলেছেন তাদের ধারণার সাযুজ্য বজায় রেখে। তাদেরকে ক্ষণিক চিন্তাভাবনার সুযোগ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে – এই দোজখ প্রস্তুত রাখা হয়েছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারিদের (কাফেরদের) জন্য। এই বাক্যটির পশ্চাতে রয়েছে একটি উহ্য প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে, দোজখ কার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে? উত্তর-কাফেরদের জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে–রসুল স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। বোখারী, মুসলিম। হজরত নোমান বিন বশীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে–হজরত রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, দোজখের সবচেয়ে নিম্নতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একজোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর প্রভাবে আগুনে ফুটন্ত ডেকচির মতো তার মগজ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে, তার চেয়ে অধিক শাস্তিভোগকারী আর কেউ নেই। বোখারী; মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন–রসুল স. এরশাদ করেছেন, জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর জ্বলে জ্বলে লাল রঙ ধারণ করেছে। আরো এক হাজার বছর জ্বলতে জ্বলতে হয়েছে শাদা। এরপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্বলিত হতে হতে হয়েছে ঘনকৃষ্ণ আঁধারের মতো।

হজরত নোমান বিন বশীর বর্ণনা করেন–রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমি তোমাদেরকে দোজখানল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক হতে বলছি। হজরত নোমান বিন বশীর বলেন, রসুল স. কথাগুলো বলছিলেন অতি উচ্চস্বরে। যদি তিনি স. এখন এস্থানে উপস্থিত থাকতেন তবে তাঁর পবিত্র কণ্ঠস্বর বাজারের অধিবাসীরাও শুনতে পেতো। তিনি তখন এমনই উদ্দীপিত ছিলেন যে, তাঁর স. কম্বল লুটিয়ে পড়েছিলো তাঁর পদতলে। দারেমী। হাদিসের বর্ণনা দৃষ্টে বুঝা যায় জাহান্নাম বর্তমান।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদিগকে ফল-

মূল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই; 'তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রহিয়াছে, তাহারা স্থায়ী হইবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে। আর এখানে দেয়া হচ্ছে বেহেশতের শুভ সংবাদ। ভয় ও আশা পরস্পরবিজড়িত (একই টাকার এপিঠ-ওপিঠের মতো)। এদিক থেকে এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সংযোজিত। আর আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বর্ণনারীতি এই যে, ভয়ের পরে আশার সঞ্চার, আবার আশার পরে ভীতি প্রদর্শন (যাতে নৈরাশ্য কিংবা উদাসীনতা কোনোটিই অতি প্রশ্রয় না পায়)।

আগের আয়াতের ক্রিয়াকর্মের সাথে এই আয়াতের ক্রিয়াকর্মের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সেই আগুনকে ভয় করো (ফাত্তাকুন্নারল্লাতি)-পূর্বের আয়াতের এই বাক্যাংশটির সঙ্গে এই আয়াতের শুভসংবাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে–ইমান আনো, অগ্নি থেকে রক্ষা পাও এবং জান্নাতের শুভসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ্পাক অবশ্য এভাবে সোজাসুজি সুসংবাদ দান করেননি। তাঁর রসুলকে এ সুসংবাদ জানাতে বলেছেন। এরূপ বলার উদ্দেশ্য ইমান ও তাকওয়া অবলম্বনকারীদের উন্নত মর্যাদা যে সুস্বীকৃত এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলা। আল্লাহ্পাক সরাসরি সুসংবাদ দিলে বিশ্বাসী ও সৎ কর্মশীলদের সুউন্নত যোগ্যতা স্পষ্টতর হোতো না। তাই বলা হয়েছে, (হে রসুল) তাদেরকে শুভসংবাদ দিন (কারণ তারা শুভসংবাদ লাভের অধিকার অর্জন করেছে)।

'বাশারাত' অর্থ শুভসংবাদ। অন্য আয়াতে যেখানে শাস্তির সুসংবাদ দাও, এ কথা বলা হয়েছে সেখানে শব্দটি এসেছে পরিহাসরূপে। শুভসংবাদ অথবা শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেই এই শব্দটির ব্যবহার অধিক।

'ওয়া আমিলুস্ সলিহাত' অর্থ– এবং যারা সৎকর্ম করেছে। সৎকর্ম গুণটি মানুষের নামের মতোই তার গুণবত্তাকে প্রকাশ করে। স্মরণ রাখতে হবে, সৎকর্ম ওগুলোই যেগুলোকে শরিয়ত সৎকর্ম বলে নির্দেশ করেছে। আল্লামা বাগবী বলেন, হজরত মু'আজ রা. বলেছেন, ওই কর্মকে সৎকর্ম বলে যার মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা (এলেম), নিয়ত (সংকল্প), ধৈর্য (সবর) এবং নিষ্ঠা (এখলাস)। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রা. ওয়াআমিলুস্ সলিহাত পাঠ করে বলেছেন,দম্ভরহিতাবস্থায় কেবল আল্লাহ্র জন্য অন্তরকে শুদ্ধ রাখার নাম সৎকর্ম। এই আয়াতে বিশ্বাস এবং সৎকর্মকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, বিশ্বাস এবং সৎকর্ম দু'টি পৃথক বিষয়। এ কথাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, জান্নাতের সুসংবাদ লাভের পূর্ণ অধিকার পেতে হলে বিশ্বাস ও সৎকর্মের (ইমান ও আমলের) সমন্বয় সাধন করতে হবে।

'জান্নাত' শব্দটি 'জানাহ্' শব্দটির বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, যে বাগান বৃক্ষলতা দ্বারা আচ্ছাদিত। 'জান্নাতসমূহের নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী'– এর অর্থ জান্নাতের অট্টালিকা ও বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী। নদী নয়- নদীর পানি প্রবাহিত হয়। কিন্তু পানি শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে– পৃথিবীর নদ নদী যে রকম নির্দিষ্ট খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়, জান্নাতের নদীর সে রকম নির্দিষ্ট প্রবাহপথ নেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে মোবারক, ইবনে জারীর এবং বায়হাকী।

জান্নাতবাসীদেরকে যখন বেহেশতের ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, এগুলো তো সে রকমই যে রকম আমরা পৃথিবীতে পেতাম। বলা হয়েছে, 'হাজাল্লাজি রুজিক্বনা'-এর অর্থ হচ্ছে জীবিকারূপে, অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাপ্ত জীবিকার মতো। এখানে মতো (মাসাল) শব্দটি উহ্য রয়েছে। উপমার স্থলে এসেছে উৎপ্রেক্ষা। উপমাকে নেপথ্যে রেখে সরাসরি উপমিতকে প্রকাশ করার নামই উৎপ্রেক্ষা।

বাহ্যিক আকার ও আকৃতির দিক থেকে জান্নাতের নেয়ামত ও ফলমূল দুনিয়ার ফলমূলের মতো। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতবাসীগণ যেনো সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো আকার আকৃতির সম্মুখীন হয়ে বিব্রত বোধ না করেন। জান্নাতের উপকরণসমূহ সম্পূর্ণতই ভিন্ন প্রকৃতির হলে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা দুরূহ হতো। তুলনা করতে গেলে কোনো না কোনো ধরনের সাযুজ্য অবশ্যই প্রয়োজন। তাই কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতের ফল রঙ ও আকৃতির দিক থেকে পৃথিবীর ফলের মতো। কিন্তু আস্বাদের দিক থেকে পৃথক। অবশ্যই পৃথক। রঙ ও আকৃতিগত আনুরূপ্যের কারণেই জান্নাতিরা এরকম বলবে যে, এরকম জীবিকা আমাদেরকে আগেও দেয়া হতো। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের পর তারা বেহেশতি আস্বাদে আপ্লুত হবে।

এরপর আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে মুতাশাবিহা (অনুরূপ) শব্দের মর্ম হচ্ছে, ফলগুলো রঙের দিক থেকে এক রকম- কিন্তু স্বাদের দিক থেকে ভিন্নতর। হজরত হাসান এবং কাতাদা বলেছেন, চিত্তাকর্ষন যোগ্যতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ফলগুলো একটি অপরটির অনুরূপ। একটি অপেক্ষা অপরটি নিম্নমানের নয়। (পৃথিবীর ফলে এরকম তারতম্যহীনতা পরিদৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর ফল পাকা, কাঁচা, ছোট, বড়, ভালো, মন্দ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। জান্নাতের ফল এরকম বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়)।

ইমাম বাগবী স্ব-সনদে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন- রসুল স. এরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ সেখানে পানাহার করবেন। কিন্তু তাঁরা মল-মূত্র, নাকের শ্লেস্মা, মুখের লালা– এসব থেকে মুক্ত থাকবেন। তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস হবে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) এবং তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্)। তাঁদের হজম ক্রিয়া

সম্পন্ন হবে ঢেকুরের মাধ্যমে। শরীরের ঘামে থাকবে মেশ্ক আম্বরের সুবাস। মুসলিম।

এই আয়াতের আরেকটি অর্থ এরকমও হতে পারে যে, (জান্নাতের এই প্রাপ্তি) পৃথিবীর ওই সমস্ত আমল ও ইরফানের ফল। অন্য আয়াতেও এই ধারণার পরিপোষকতা রয়েছে। যেমন, 'স্বাদ গ্রহণ করো যে আমল তোমরা (পৃথিবীতে) করেছিলে।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বলেছেন, মহানবী স. এরশাদ করছেন, জান্নাতের মাটি অতীব পবিত্র এবং পানি অতীব মিষ্ট। আর মনে রেখো জান্নাত একটি খোলা প্রান্তর। তার বৃক্ষরাজি হলো তাসবীহ্, তাহমীদ এবং তকবীর (আল্লাহু আকবর)। উতুবিহি মুতাশাবিহা (তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে।) —একথার অর্থ শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে যে, সেখানকার কৃতিত্ব, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের মাপকাঠি হবে আল্লাহ্ পরিচিতি এবং সৎকর্ম। মানুষের আমলে যেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তাদের বিনিময় প্রাপ্তিও হবে তারতম্য সম্ভূত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বলেছেন, জান্নাতের থাকবে একশ'টি তোরণ। এক তোরণ থেকে অন্যটির দূরত্ব হবে একশ' বছরের দূরত্বের সমতুল্য। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তবে সেখানে বলা হয়েছে, এক দরোজা থেকে অন্য দরোজার দূরত্ব হবে আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। মাসাবিহ্ রচয়িতা মেশ্কাত এবং ইমাম তিরমিজি তাঁর সুনান গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। জান্নাতিদের জন্য জান্নাতে রয়েছে তাঁদের পবিত্র সঙ্গীনিরা। হজরত হাসান বলেছেন, 'আয্ওয়াজুন' অর্থ জান্নাতিদের ওই সকল বিগত যৌবনা সহধর্মিনীগণ। তাঁদেরকেই যৌবনহীনতা ও পার্থিব অপরিচ্ছন্নতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে জান্নাতে তাঁদের সঙ্গিনী করে দেয়া হবে। সঙ্গিনীগণ হবেন পূতঃপবিত্রা। এর অর্থ মল-মূত্র, ঋতুস্রাব, নাসিক্য শ্লেস্মা এবংবিধ সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। চারিত্রিক কলুষতা থেকেও তাঁরা পবিত্র থাকবেন। শারীরিক পবিত্রতা অর্জনকে তাহারাত বলে। চারিত্রিক পবিত্রতাকেও তাহারাত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আর 'মুতাহ্হারা অর্থ অতিপবিত্র। আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁদেরকে পবিত্র করেছেন বলে মুতাহ্হারা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আযওয়াজুন বা যাওজ শব্দটির অর্থ জোড়া। যেমন, দু'টি জুতাকে একত্রে জুতা, জুতাজোড়া এবং দু'টি মোজাকে একত্রে মোজা বা মোজাজোড়া বলা হয়। তেমনি পুরুষ ও স্ত্রীকে একত্রে জওজী শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

শেষে বলা হয়েছে, 'তারা সেখানে স্থায়ী হবে'— এর অর্থ সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনও বহিষ্কৃত হবে না। স্থায়ীত্বের কথা বলে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, বেহেশতের অনুগ্রহরাশি পৃথিবীর অনুগ্রহরাশির মতো নিঃশেষপ্রবণ ও অস্থায়ী নয়। যেনো এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে—ওই নেয়ামতসমূহ কি চিরকালীন ও অনিঃশেষ? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

ইমাম বাগবী ইমাম বোখারীর পদ্ধতিতে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন—নবীপাক স. এরশাদ করেছেন, যে দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁরা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুউজ্জ্বল। এর পরে প্রবেশকারী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতর নক্ষত্র সদৃশ। জান্নাতিরা মলমূত্র, থুথু, শ্লেস্মা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকবে। তাঁদের চিরুনী হবে স্বর্নের। স্বেদ হবে মেশ্‌ক আম্বরের মতো সৌরভমন্ডিত। আঙটিগুলো হবে সুরভিতে ভরপুর। তাঁদের স্ত্রীগণ হবেন পরমাসুন্দরী (হুরে আইন), আয়তআঁখিনী। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী হবেন তাঁরা (সেখানে থাকবে শুধু প্রেম ভালোবাসা! মানুষ যেমন আপন সত্তাকে ভালোবাসে, জান্নাতবাসীরা তেমনি পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে)। বেহেশতবাসীরা হবে হজরত আদম আ.এর মতো উচ্চতাধিকারী (বিশ গজ দেহবিশিষ্ট)। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে—যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁদের চেহারা হবে চতুর্দশীর চাঁদের মতো। পরে যাঁরা প্রবেশ করবেন তাঁরা হবেন সুউজ্জ্বল তারকামন্ডলীর মতো। তাদের প্রত্যেকের থাকবে দু'জন স্ত্রী। সত্তর গজ প্রশস্ত বস্ত্রে সুশোভিতা থাকবেন তাঁরা। স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার কারণে উরুদেশের অস্থিসকল এবং ধমনীর রক্তপ্রবাহ পরিচ্ছদাবৃতা হওয়া সত্ত্বেও পরিদৃষ্ট হবে। হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন রসুল স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতের রমণী যদি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল। আকাশ বাতাস হয়ে উঠবে সুবাসে ভরপুর। জান্নাতের হুরের মাথার উড়নী পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অধিক দৃষ্টিনন্দন হবে। বোখারী, মুসলিম। হজরত উসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন— রসুল স. এরশাদ করেছেন, কে আছে এমন, যে জান্নাতের অধিকার লাভের জন্য প্রস্তুত, যে জান্নাত সংশয়াতীত। কাবা শরীফের প্রতিপালকের শপথ! জান্নাত হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল নূর, সুবাসিত উদ্যান, সুউন্নত ও সুদৃঢ় প্রাসাদপুঞ্জ, প্রবহমান স্রোতস্বিনী, সুপক্ব ফলমূল, রূপসী রমণী, হাজারো রকম পোশাক পরিচ্ছদ, স্থায়ী আবাসস্থল, অপরিমেয় আহার্য, সবুজ রঙের জরির কাজ করা বিশেষ ধরনের পরিধেয় ইত্যাদি নেয়ামতের সুপ্রতুল সমাহার। সকলে আরজ করলেন, হে আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত নবী। আমরা সকলেই প্রস্তুত। রসুল স. এরশাদ করলেন, ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) বলো। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতীগণ হবেন শ্মশ্রুবিহীন, বিনম্র। অশেষ যৌবনের অধিকারী হবেন তাঁরা। তাঁদের পোশাক কখনো পুরনো হবে না। ইমাম মুসলিমের বর্ণনাতেও একথাগুলো বলা হয়েছে।

হজরত আলী রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—জান্নাতে থাকবে একটি বাজার। সেখানে কোনো ক্রয়বিক্রয় হবে না। সেখানে থাকবে কেবল নারী পুরুষের ছবি। যে ব্যক্তি যে ছবির প্রতি আকৃষ্ট হবে সে তাতেই প্রবিষ্ট হতে পারবে। জান্নাতের

রূপসী হুরেরা একটি সমাবেশে মিলিত হয়ে মধুর কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠবে। বলবে, আমরা অক্ষয়া, অবিনাশীনি, সুখ ও শান্তি বিভূষিতা, অনটনহীনা, ক্ষুধা, অভাব ও রোষ বিমুক্তা। আমরা সদা আনন্দিতা। আমরা তাঁদের জন্যই আনন্দঘন উল্লাস যাঁরা আমাদের। আমরাও তাঁদের। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি হজরত আলী রা. থেকে এবং আহমদ ইবনে মুনাব্বাহ্ আবু মুয়াবিয়া থেকে সরাসরি রসুল স, এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন– রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে একটি বিপণনস্থল থাকবে। প্রতি শুক্রবারে জান্নাতীদের সমাগম হবে সেখানে। সেখানকার মৃদুমন্দ সমীরণের প্রভাবে তাঁদের রূপবৈচিত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাঁদের গৌরবমন্ডিত পরিচ্ছদগুলোও হতে থাকবে নানা সুবাসে মদীরাপ্লুত। তাঁদের সৌন্দর্য হতে থাকবে উত্তরোত্তর চিত্তাকর্ষক। এরকম অবস্থায় যখন তাঁরা আপন ভার্যাগণের সম্মুখীন হবেন, তখন ভার্যাকুল বলবে, আজ তুমি কতো সুন্দর। তাঁরা বলবেন,আল্লাহ্র কসম! তুমিও তো আজ পরম রূপবতী।

আমি বলি, পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টি কেবল পার্থিব সম্পদ, আহার্য, পরিধেয় ও যুগলজীবনের প্রতি নিবদ্ধ। এ সকল ব্যতীত উন্নততর নেয়ামত পৃথিবীতে নেই। আল্লাহ্পাক তাই তাঁর প্রিয় নবী মোহাম্মদ স. এর মাধ্যমে এ সকল বস্তু আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। উর্ধ্বস্তরের নেয়ামতসমূহ তো আলোচনার অতীত। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে–রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন–আমি আমার দাসদের জন্য এমন অনুগ্রহরাশি সৃষ্টি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো অন্তঃকরণও অনুভব করেনি। প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে, কেউ জানে না তাদের চক্ষু শীতলকারী বস্তু সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে–শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, আজ আমি তোমাদের প্রতি আমার প্রসন্নতা ঘোষণা করছি। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবো না। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসের বিবরণে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন–হজরত রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, জান্নাতে আল্লাহ্পাক তাঁর এবং জান্নাতবাসীদের মধ্যস্থিত অন্তরাল অপসারিত করে দেবেন। তখন সকলে আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভে ধন্য হবে। তাঁর পবিত্র দীদার অপেক্ষা অধিক সুখকর কোনো কিছুই সেখানে থাকবে না। অতঃপর রসুল স. তেলাওয়াত করলেন, সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত এবং আল্লাহ্পাকের দীদার।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. এরশাদ করেন, সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের একজন জান্নাতীর সহধর্মিণী, পরিচারক এবং পারিবারিক উপকরণগুলো এক হাজার বছরের পথের পরিসরবিশিষ্ট হবে। সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতী সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ্পাকের দীদার লাভে মগ্ন থাকবেন। এরপর রসুল

স. তেলাওয়াত করলেন, ওই দিন অনেকের মুখমন্ডল হবে অধিকতর প্রফুল্লতামন্ডিত। তাঁরা তাঁদের প্রভুপ্রতিপালকের দর্শন লাভে কৃতার্থ হবে। আহমদ, তিরমিজি।

আল্লামা ইবনে জারীর এবং কবীর গ্রন্থে আস্ সুদ্দী নির্ভরযোগ্য সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন– যখন আল্লাহ্পাক মাসালুহুম কামাসালি ল্লাজিনাস্ তাওক্বদা নারা এবং আও কাসাইয়্যেবিম মিনাস্ সামায়ি (আয়াত ১৭, ১৯) আয়াত দু'টিতে মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলেন, তখন মুনাফিকেরা জ্বিনগ্রস্ত রোগীর মতো বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ তো অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাশালী, তবে তাঁর দৃষ্টান্তগুলো এতো নিম্নমানের কেনো? তাদের এহেন ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করলেন–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

❐ আল্লাহ্ মশা কিংবা উহার উচ্চ পর্যায়ের কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা জানে যে এই সত্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে; কিন্তু যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহারা বলে যে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি সত্যপথ পরিত্যাগিগণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত (শানে নুজুল) আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার এর আরেকটি শানে নুজুল বর্ণনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ্পাক মক্কার মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন, মৌমাছিও যদি মূর্তিগুলো থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তবুও তারা মৌমাছির কাছ থেকে সেগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অন্যত্র আল্লাহ্পাক তাদের

কৌশলাবলম্বনকে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তখন তারা বলতে শুরু করলো, দেখো আল্লাহ্ চরম উন্নত ও মর্যাদাশীল হওয়া সত্ত্বেও মাছি মাকড়সার আলোচনা করেছেন। তাদের মূর্খতার প্রত্যুত্তর হিসেবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এই শানে নুজুলটি বর্ণনা করেছেন আবদুল গণীর পদ্ধতিতে ওয়াহেদী। বর্ণনাটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। কিন্তু আবদুল গণী ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাছাড়া এখানে আরো একটি সন্দেহ বিদ্যমান, সেটি হচ্ছে– আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুতরাং মক্কার মুশরিকেরা কি করে এই আয়াতের লক্ষস্থল হয়। এমতাবস্থায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সনদ ও অর্থগত দিক দিয়ে প্রথমোক্ত শানে নুজুলটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ।

'হায়া' অর্থ দ্বিধাবিজড়িত অবস্থা। অথবা সংকোচ বা লজ্জা। এ অবস্থাটি হচ্ছে– সদম্ভে অসৎকর্ম করা এবং সৎ অসৎ সকল কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার মধ্যবর্তী অবস্থা। হায়া– আল্লাহ্তায়ালার একটি বিশেষ গুণ হিসেবে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি এই– রসুলপাক স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্পাক বৃদ্ধলোককে শাস্তি প্রদান করতে সংকোচ (হায়া) বোধ করেন। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী এবং হজরত সালমান থেকে আবিদুদ্দুনিয়া এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে–যখন বান্দা তার প্রভুর নিকট হস্ত উত্তোলন করে, তখন পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করতে লজ্জাবোধ করেন। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। হজরত সালমান থেকে ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন-বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ সকল দৃষ্টান্ত দিয়ে 'হায়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ, ভয়, লজ্জা, সংশয় ও সংকোচকেই হায়া বলে। এ সমস্তের প্রতিক্রিয়া থেকে আল্লাহ্তায়ালা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কাজেই এখানে হায়া অর্থ হবে মুক্ত থাকা বা পরিত্যাগ করা। যেমন কোনো কাজে লজ্জাবোধ করলে মানুষ তা পরিত্যাগ করে। হায়া শব্দের বাহ্যিক অর্থ অসৎকর্ম পরিত্যাগ। কিন্তু এরকম অর্থ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি প্রযোজ্য হতেই পারে না। কেনোনা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা কোনোক্রমেই অসৎকর্ম নয়। কাফেরেরা বিভিন্ন বিষয়ে বালখিল্যতা করতো। তুচ্ছ দৃষ্টান্তই তাদের বাচালতার জন্য উপযোগী। আল্লাহ্পাক এখানে তাই করেছেন। হায়া শব্দটি এখানে কাফেরদের অসদাচরণেরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন অন্য স্থানেও এরশাদ হয়েছে- 'মন্দ কাজের পাল্টা জবাব মন্দই'। এখানে অবশ্য বিষয়টি ছিলো দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উত্তমতা ও অনুত্তমতা সম্পর্কিত। আল্লাহ্পাক বলেছেন, তুচ্ছ বৃহৎ সকল দৃষ্টান্তই আল্লাহ্তায়ালা পেশ করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণতঃই স্বাধীন। মশা, মৌমাছি, মাকড়সা সকল কিছুকেই উপমা হিসেবে নির্বাচন করা যায়, এতে লজ্জার কিছু নেই। সুতরাং সংকোচের কী আছে? যারা বিশ্বাসী তাঁরা সহজেই মেনে নেয় যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ আল্লাহ্

প্রভুপ্রতিপালকের নিকট থেকেই এসেছে। এর শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, উপমা, সবকিছুই যথাযথ। তাঁরা সহজে একথা বুঝে নিতে পারেন যে, তুচ্ছ বস্তুর দৃষ্টান্ত তুচ্ছ বস্তুর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন। মর্যাদাশীলদের জন্যই মহৎ উপমার কথা ভাবা যেতে পারে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারিদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা নিতান্ত মূর্খ বলেই এরকম প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা দেখায়। বলে, তুচ্ছ উপমা প্রয়োগের পশ্চাতে তাহলে আল্লাহ্তায়ালার অভিসন্ধি কী?

'বি হাজা মাসালা' অর্থ এই উপমা। তুচ্ছ ও নগণ্য উক্তির উদ্ধৃতি দিতে গেলে হাজা শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, সে তো এই। শেষে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, এরকম করার অর্থ, এর মাধ্যমে অনেককে বিপথগামী করে দেয়া এবং অনেককে সত্যপথ প্রদর্শন করা। এরকম উপমা প্রয়োগের ফলে কেবল সত্য পথ পরিত্যাগকারিরাই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তাদেরকেই আল্লাহ্পাক সত্যচ্যুত করতে চান। একথাটি হচ্ছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত কাফেরদের পরিহাসমূলক উক্তির জবাব। তারা বলতো, আল্লাহ্ কী অভিপ্রায়ে এরকম উপমা পেশ করেছেন? আল্লাহ্র জবাব হচ্ছে, সত্য পরিত্যাগকারিগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

'কাসিরা' অর্থ অনেক। এখানে কাফেদেরকেও অনেক বলা হয়েছে (ইউদিল্লুবিহি কাসিরা)। আবার অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইমানদারদেরকেও (ইয়াহ্দিবিহি কাসিরা) এর অর্থ সংখ্যাগত দিক থেকে কাফেরেরা অধিক এবং গুণগত দিক থেকে মুমিনেরা।

কাফেরদের প্রশ্ন ছিলো, আল্লাহ্ কী অভিপ্রায়ে প্রশ্নটি পেশ করেছেন? আয়াতে এ প্রশ্ন উল্লেখের পরপরই জানানো হচ্ছে, উপমা উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে দু'টি— পথপ্রাপ্তি (হেদায়েত) ও পথভ্রষ্টতা (গোমরাহী)। আয়াতের বাকভঙ্গি দৃষ্টে এ কথা বুঝা যায় যে, উপমা উস্থাপনের বিষয়টি পর্যায়ক্রমে চলতেই থাকবে। এর মাধ্যমে বিশ্বাসীরা লাভ করবে উন্নততর হেদায়েত আর অবিশ্বাসীদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হবে ভ্রষ্টতা। কেবলই ভ্রষ্টতা। বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের কারণেই এরকম হবে। একই অবতীর্ণ আয়াতের প্রতিক্রিয়া হবে দু'টি। নিঃসন্দিগ্ধতা ও সন্দেহ এভাবে পরস্পরবিরোধী গন্তব্যকে সুনিশ্চিত করবে।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে—'অমা ইউদিল্লুবিহি ইল্লাল ফাসিক্বিন'— এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ সত্য পথ পরিত্যাগকারিগণ (ফাসিক্বিন) ব্যতীত অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। শরিয়তের পরিভাষায় কবীরা গোনাহকারিদেরকে ফাসেক বলে। 'ফিস্ক্ব' এর তিনটি স্তর। ১. বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ অস্বীকার করা। অস্বীকৃতি বা অবিশ্বাসই সর্ববৃহৎ পাপ। কোরআন মজীদে উল্লেখিত ফাসেক শব্দটি এই অর্থেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ২. 'ফিসক্ব' এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পাপাভ্যস্ততা। ৩. তৃতীয় স্তর হচ্ছে পাপলিপ্ততা (সগীরা গোনাহ্ বারবার করা - পাপকে মন্দ জানা সত্ত্বেও)।

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

❒ যাহারা আল্লাহের সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে 'যাহারা' (আল্লাজিনা) অর্থ ফাসেকেরা এবং গোনাহগার মুসলমানেরা। বলা হয়েছে যারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে– একথা বলে তওরাতে উল্লেখিত ওই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্পাক ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পদিত হয়েছিলো। অঙ্গীকারটি ছিলো এই– তোমরা মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনবে এবং তওরাতে বর্ণিত মোহাম্মদ স. বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, গোপন করবে না। অথবা ওই অঙ্গীকারের প্রতি এখানে ইঙ্গিত হয়ে থাকবে, মানুষের রূহ্ সৃষ্টির পর রূহের জগতে যে অঙ্গীকারানুষ্ঠান হয়েছিলো। আল্লাহ্পাক সকল রূহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আলাস্তুবিরব্বিকুম (আমি কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই?) সকল রূহ সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, বালা (হ্যাঁ)। 'নক্বদু' শব্দের অর্থ রশি বা দড়ির পাক খুলে দেয়া। প্রতিশ্রুতি ছিন্ন করার ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রশি দ্বারা যেমন দু'টি বস্তুর মধ্যে সংঘবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি অঙ্গীকারের মাধ্যমে দুই পক্ষের অটুট সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সংযোগছিন্নতাকে 'নক্বদু' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা আরবী ভাষার রীতি।

বলা হয়েছে–'মিম্ বা'দি মীসাক্বিহী' এর অর্থ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর অর্থাৎ ওয়াসুক্ব বা বন্ধনাবদ্ধ হওয়ার পর। মিসাক্ব অর্থ ওই সমস্ত আয়াত বা কিতাব, যার মাধ্যমে অঙ্গীকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাক্যাংশটির শুরুতেই 'মিন' অব্যয়টি যোগ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের শুরুতেই ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

এরপর বলা হয়েছে– আল্লাহ্পাক যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে। অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ স.সহ অন্য সকল নবী রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের সম্পর্ককে অটুট রাখে না। অথচ নির্দেশ ছিলো এই যে, লা নুফার্ রিকু বাইনা আহাদিম্ মির রুসুলিহ্ (আমরা রসুলগণের মধ্যে ব্যবধান রাখি না)।

ইহুদীরা হজরত মোহাম্মদ স.- কে অস্বীকার করে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবধান রচনা করেছে। ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে বলেছে, আমরা কিতাবের কিছু নির্দেশ মান্য করি, আবার কিছু নির্দেশ মান্য করি না। এছাড়া আত্মীয়তার অধিকার বজায় রাখতেও আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা সে নির্দেশকেও অমান্য করেছে।

এরপর আল্লাহ্ এরশাদ করছেন, 'এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়' (ওয়া ইউফ্সিদুনা ফিল আর্দ)। অশান্তি বা ফাসাদ অর্থ আল্লাহ্পাকের বিধানকে এবং রসুলপাক স.– কে অবমাননা করা। শস্যহানী, পশুপালের ক্ষতিসাধন– এসকল অপকর্মে লিপ্ত হওয়া।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, উপরোক্ত অপকর্মগুলো যারা করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা কল্যাণ ও সুপথ প্রাপ্তির পরিবর্তে ভ্রষ্টতা ও অকল্যাণকে গ্রহণ করেছে। ইতোপূর্বে অবিশ্বাসীদের স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের অস্বীকৃতি, অসদাচরণ ও উপহাসপ্রবণতার কথা বলা হয়েছিলো। এই আয়াতের শেষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত-এই একটি কথায় তাদের সুনিশ্চিত পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং একথা এখন স্পষ্ট হলো যে, তারা প্রকৃত দয়াময় আল্লাহ্তায়ালার অধিকার সম্পর্কে নিতান্তই অসচেতন। তারা আল্লাহ্তায়ালার দয়া ও পরাক্রম নিয়মিত চাক্ষুস করছে। দেখছে জীবনকে, মৃত্যুকে, বিশাল সৃষ্টিরহস্যকে। এতো কিছু দেখেও মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্তায়ালাকে বিশ্বাস করা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। কিন্তু তারা তা করেনি। সুতরাং একথা সুনির্ধারিত যে, ক্ষতিগ্রস্ততাই তাদের ললাট লিখন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

❒ তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে।

'আমওয়াতান' অর্থ মৌল অণু, মিশ্ররূপ, শুক্রবিন্দু, রক্ত ও গোশ্তের টুকরা এবং নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব। জীবনের উন্মেষ এরকম নিষ্প্রাণ অবস্থা থেকেই। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ গঠিত হয়েছে দশটি উপাদান দিয়ে। বস্তুজগতের পাঁচটি এবং আধ্যাত্মিক জগতের পাঁচটি। বস্তুজগতের পাঁচটি উপাদান হচ্ছে, আগুন, পানি, মাটি বাতাস-এই ভূতচতুষ্টয় এবং এগুলোর সুসংহত অবস্থা নফ্স (প্রাণ)।

আর আধ্যাত্মিক জগতের পাঁচটি উপাদান হচ্ছে, ক্বলব, রূহ্, সির, খফি ও আখ্ফা। বস্তুজগতের পাঁচটি উপাদানের ব্যাপারটা মোটামুটি সকলে জানে। কিন্তু আধ্যাত্মিকজগতের উপাদানসমূহ সর্বজনবিদিত নয়। যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর তাঁরাই কেবল এগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন। আলোচ্য আয়াতে ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল মাটির প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ এসেছে, 'খলাক্বকুম মিন তুরাব' (তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করা হয়েছে)। কিয়ামতের দিন শয়তান যখন মৃত্তিকাসম্ভূত মানুষের মর্যাদা ও মহিমা অবলোকন করবে, তখন চিৎকার করে বলবে, ইয়া লাইতানি কুংতুতুরবা' (হায়! আমিও যদি মাটি হতাম)। মৃত্তিকাসম্ভূত হওয়ার কারণেই মানুষ আল্লাহ্পাকের দীদার লাভে ধন্য হতে পারবে। তাই প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা আল্লাহ্ দর্শনের তুলনায় অন্যান্য আধ্যাত্মিক দর্শনকে পথে পড়ে থাকা বস্তু বলে মনে করে থাকেন।

'ফা আহ্ইয়াকুম' অর্থ তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক জগতের উপাদান সমূহের সঙ্গে সন্নিবেশিত ও সঞ্জীবিত করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা মৃত্যুনিথরতাকে মুহূর্তমধ্যে জীবন দান করেন, তারপর পৃথিবীর জীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর মৃত্যুদান করেন। মৃতকে জীবন দান আল্লাহ্তায়ালার একটি মহান অনুগ্রহ। আয়ুর সীমানায় ইতিরেখা টেনে দেয়াও আরেকটি মহিমান্বিত অনুগ্রহ। কারণ, পৃথিবীর আয়ুকে পিছনে ফেলে গেলেই কেবল চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুনরায় জীবন্ত করবেন' (ছুম্মা ইউহ্ইকুম) এর অর্থ কিয়ামতের সময় হজরত ইস্রাফিল ফেরেশতা যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন সেদিন; তোমরা পুনর্জীবন লাভ করবে। মৃত্যু থেকে এই পুনরোত্থান পর্যন্ত জীবন হচ্ছে কবরের জীবন। কবরের জীবনকে প্রকৃত অর্থে হায়াত বলা যায় না। কারণ, সেখানে মানুষের দশটি উপাদান সমন্বিত অবস্থায় থাকে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, কবরে হায়াত বা জীবনই যদি না থাকবে তবে সেখানে শাস্তি অথবা স্বস্তি লাভ হবে কীভাবে? জবাবে এরকম বলা যায় যে, শাস্তি এবং স্বস্তি অর্থাৎ আযাব ও সওয়াবের জন্য উল্লেখিত দশটি উপাদানের সমন্বিত অবস্থা থাকা আবশ্যিক নয়। শাস্তি ও শান্তি মানুষের পূর্ণ অবয়বের প্রতি কবরের জগতে প্রযোজ্য না হওয়াই সমীচীন। যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনের প্রতি আস্থাশীল, তাঁদের পক্ষে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। আল্লাহ্পাক এক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'এমন কোনো বস্তু নেই যে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা না করে। কিন্তু তোমরা বুঝ না।' অন্য এক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা কি দেখোনা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকলেই আল্লাহ্পাককে সেজদা করে-চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা এবং অনেক মানুষ।' হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার পৃষ্ঠদেশে কোনো পুণ্যবানের আগমন ঘটেছে কি? অপর পাহাড় জবাব দেয়, হ্যাঁ। এ কথা বলে সে আনন্দিত ও আন্দোলিত

হতে থাকে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিবরানী। অন্য আরেক স্থানে আল্লাহ্পাক ফরমান, 'আমি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ পর্বতরাজির নিকট আমানত (শরিয়তের দায়িত্ব) পেশ করলাম। কিন্তু তারা অক্ষমতা প্রকাশ করলো, ভীত হলো।'

উদ্ধৃত আয়াতে প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার যে কথা বলা হয়েছে তা পার্থিব ভাষা কিংবা পার্থিব পরিবেশভূত নয়। তাই শেষে মন্তব্য করা হয়েছে, 'তোমরা তা বুঝ না।' অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনের বিষয়টি তোমাদের নিকট অজ্ঞাত। ইমাম রাজি এবং ইমাম গাজ্জালী অবশ্য বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত সেজদাকে প্রকৃত সেজদা এবং পবিত্রতা বর্ণনাকে প্রকৃতার্থেই পবিত্রতাবর্ণন বুঝতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ বিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, জড়জগত, উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের তাসবীহ্ পাঠ (পবিত্রতা বর্ণন) ভাষাগত নয়, মর্মগত। জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন প্রকৃতিতে আল্লাহ্পাকের কুশলী সৃজন নৈপুন্য ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ্পাকের এককত্বের প্রশংসা ও পবিত্রতা তারা ভাবগতভাবে প্রকাশ করে। গ্রন্থকার হজরত পানিপথী র. মনে করেন, সৃষ্টিকুল কেবল ভাবগত নয়, ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠেও মশগুল। বিষয়টি প্রমাণ করতে যেয়ে তিনি দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে, 'এমন কোনো সৃষ্টবস্তু নেই যে তাঁর হাম্‌দ (প্রশংসা) এবং তাসবীহ্ (পবিত্রতা) উচ্চারণ না করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না।' এই আয়াতে উল্লেখিত তাসবীহ্ পাঠের ব্যাপারটি কেবল মর্মগত এবং বাধ্যগত হতে পারে না। কারণ, আয়াতের শেষাংশে মানবকুলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না'। অর্থাৎ বিষয়টি তোমাদের নিকট দুর্বোধ্য। মনে রাখেতে হবে, বিষয়টি দুর্বোধ্য বটে, কিন্তু অবোধ্য নয়। অতএব প্রকৃত অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেহেতু তোমাদের বুঝবার যোগ্যতা নেই তাই তাদের তাসবীহ্ পাঠ তোমরা বুঝ না। যদি যোগ্যতা থাকতো তবে নিশ্চয়ই বুঝতে। সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টার নিদর্শন। সৃষ্টিকুল একটি নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ। এই বন্ধন ছিন্ন করার সাধ্য তার নেই। সৃষ্টির মর্মগত তাসবীহ্ পাঠের ব্যাপারটা সর্বজনগ্রাহ্য। সর্বমান্য এ বিষয়টিকে নির্দেশ করাটা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এ আয়াতে ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠের কথাই বলা হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে, সৃষ্টিকুলের তাসবীহ্ পাঠ আসলে ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠই। কিন্তু তোমরা যোগ্যতারহিত বলে এই ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠের ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারো না। অগণিত বৃক্ষকুল ও সেগুলোর অসংখ্য পত্রপল্লব, অপরিমেয় খনিজ পদার্থ, অগণন কীট পতঙ্গ, পশুপাল অনির্ণিতব্য অণু পরমাণু তাদের স্ব স্ব ভাষায় সতত তাসবীহ্ পাঠরত। হে মানুষ। তোমরা তাদের উচ্চারণ শুনতে পাওনা। তাই বিষয়টি তোমাদের নিকট সহজবোধ্য নয়।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'তারা কি দেখে না নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল কিছু অবশ্যই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়।' এই আয়াতে আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের সকল কিছু যে স্ব-ইচ্ছায়, পূর্ণ সজাগ হয়ে আল্লাহ্র আনুগত্যে অবনমিত হয়; সেই অবনমিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাধ্যগত অথবা স্বভাবগত আনুগত্যের কথা এখানে বলা হয়নি। প্রকৃতিগত মান্যতা তো সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু মানুষ সেজদাবনত হয় স্বেচ্ছায় এবং স্ব-অনুভূতিতে। তাই দেখা যায়, কেউ সেজদা করে। কেউ করে না। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য সকলেই সেজদা করে। তাই আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই যে, অন্যান্য সৃষ্টি মানুষের মতো নয়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ সেজদা করে, কেউ করে না— এরকম নয়। তারা সকলেই সেজদা করে এবং স্ব-ইচ্ছায়, স্ব অনুভূতিতেই করে। কারণ, সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু অনুভূতিশীল ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'ছুম্মা ইলাইহি তুরজাউন' অর্থ পরিণামে তোমরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে। অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর কৃতকর্মের ফল দানের জন্য তোমাদেরকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। এই আয়াতটি মাদানী। অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ। এই বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে মদীনার মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে। তারা অবশ্য আগে থেকেই হাশর-নশর ও কিয়ামত সম্পর্কে জানতো এবং বিশ্বাসও করতো। কারণ, তারা যে আসমানী কিতাব পেয়েছিলো, সেখানে এ বিষয়টির বর্ণনা রয়েছে। জানানো প্রয়োজন হয় অজ্ঞ ও অবিশ্বাসীদেরকে। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। কারণ, এই বর্ণনার মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ স.-এর রেসালতকে প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য—যে রেসালতকে তারা অস্বীকার করে। অথবা যারা মৃত্যোত্তর জীবনকে অস্বীকার করে, তাদের নিকট বিষয়টি পরিস্ফুট করাই এই আয়াতটির উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। যিনি অস্তিত্বহীনতাকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম, পার্থিব মৃত্যুর পর তিনি পুনরুত্থান ঘটাতেও সক্ষম— এই কথাটিই এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৯

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

❒ তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

মানুষ পৃথিবীর সকল বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করে। আখেরাতের কল্যাণ লাভের আয়োজনও এই পৃথিবীতেই। 'পৃথিবীর সব কিছু'– একথা বলে পৃথিবীর সকল নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই নেয়ামতসমূহ উপভোগ করা এবং এসব থেকে উপকার গ্রহণ করা জীবিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আর এই জীবনদানের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উক্তও হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন'।

পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টির পর আল্লাহ্ মনোসংযোগ করেছেন আকাশের দিকে। বলা হয়েছে 'ছুম্মাস্তাওয়া-ইলাস্ সামায়ি' (তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন)। এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ প্রাচীন তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হবে, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে আরোহণ করলেন। এই ব্যাখ্যাটি আররহ্মানু আলাল আরশিস্ তাওয়া (রহমান অর্থাৎ আল্লাহ্ আরশে অধিষ্ঠিত হলেন) – আয়াতের অনুরূপ। ইবনে ফিসান, ফারাহ্ ও ব্যাকরণবিদগণের একটি বিরাট দল এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, ইস্তাওয়া শব্দের অর্থ, ইচ্ছা করলেন অথবা মনোনিবদ্ধ করলেন। 'ইস্তাওয়া' অর্থ ইচ্ছা। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন, ইস্তাওয়া ইলাইহিম কাস্ সাহামিল্ মুর্সাল (নিক্ষিপ্ত তীরের মতো তাদের প্রতি মনোসংযোগ করলো)। এখান থেকেই ইস্তাওয়া শব্দের উৎপত্তি। শেষ কথা হচ্ছে, সকল দিকের আকর্ষণমুক্ত হয়ে নিবিষ্টচিত্তে বিশেষ কোনো কিছুর প্রতি লক্ষ্য করার নাম ইস্তাওয়া।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, এই আয়াতে 'ছুম্মা' (তৎপর) শব্দটি ব্যবহার করার দু'টি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে এই– পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সকল কিছু সৃজন এবং আকাশ সৃজনের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। অপর কারণটি হচ্ছে– আকাশ পৃথিবীর তুলনায় অধিক মর্যাদাশীল। পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতেই এই 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'ছুম্মা কানা মিনাল্লাজিনা আমানু'। দ্বিতীয় কারণটি অধিক যুক্তিসঙ্গত। প্রথম কারণটিকে গ্রহণ করলে এই আয়াতটি হয়ে উঠবে অন্য একটি আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বি। সেই আয়াতটি হচ্ছে, 'ওয়াল আরদ্বা বা'দা জালিকা দহাহা', (আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত করেছেন)। এখানে দেখা যাচ্ছে, আকাশ সৃষ্টির পর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে আকাশ আগে এবং পৃথিবী পরে সৃজিত হয়েছে বলে মানতে হয়। অথচ এই আয়াতে পৃথিবীর পরে আকাশ সৃষ্টির দিকে মনোসংযোগ করার কথা বলা হয়েছে। এরকম হলে এখানে 'তৎপর' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বিপরীত।

ইমাম বাগবী 'ওয়াল আরদ্বা বা'দা জালিকা দহাহা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে, আল্লাহ্পাক প্রথমে সৃষ্টি

করেছেন ভূমন্ডল এবং এতদস্থিত উৎপাদনশীল বস্তুসমূহ। তারপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন নভোমন্ডলের দিকে এবং আকাশ সৃষ্টির শেষে পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আকাশ সৃষ্টি এবং ভূমন্ডল বিন্যাস একই সাথে করা হয়েছে। এই আয়াতের 'বা'দা' (পরে) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে 'মা আ' (সঙ্গে)। অন্য একটি আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'উতুলিম্ বা'দা জালিকা জানিম' - এখানেও 'বা'দা' শব্দের অর্থ হবে 'মাআ'। সুরা হামিম সেজদার 'খলাক্বাল আর্দ্বা ফি ইয়াউমাইনি' আয়াতের ব্যাখ্যায় বাগবী বলেছেন, রবিবার ও সোমবার এই দুইদিনে আল্লাহ্পাক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 'ওয়া ক্বদ্দার ফিহা আক্বওয়াতাহা' আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, মঙ্গল ও বুধ, এই দুই দিনে নির্ধারিত হয়েছে মর্তবাসীদের আহার্য। এভাবে ভূবনমন্ডল সম্পর্কিত সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার জন্য লেগেছে মোট চারদিন। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'দুনিয়ায় বসবাসকারীদের খাদ্য নির্ধারণে চার দিন সময় অতিবাহিত হলো'। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, 'তৎপর তিনি বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুই দিনে সাত আসমান সৃজন করেছেন'। এ বক্তব্যগুলো উচ্চারণ করেছেন প্রাচীন তাফসীরবিদগণ।

'উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন'– একথার অর্থ, তিনি আকাশের ত্রুটি ও অমসৃণতা অপসারিত করেন। আকাশে কোনো ফাটল নেই। আর আকাশ অসমতলও নয়। 'উহাকে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে আকাশের সর্বনাম হিসেবে। 'সামায়ি' অর্থ, আকাশসমূহ। এ শব্দটির মাধ্যমে আকাশের অবয়বকে নির্দেশ করা হয়নি।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, জ্যোতির্বিদগণ বলেছেন, আকাশ নয়টি। এটা তাদের আবিষ্কার। কোরআন মজীদে বর্ণিত সাতটি আকাশ ছাড়া অন্য দু'টি আকাশ হচ্ছে আওলাস ও সাওয়াবিত্। আবার কেউ বলেছেন, পৃথক পৃথকভাবে ছয়টি এবং সম্মিলিতভাবে তিনটি মিলে একটি – এভাবে আকাশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতটি। শেষোক্ত তিনটিকে ধরা হয়েছে একটি আকাশ, যা কেন্দ্র বহির্ভূত। কেউ বলেছেন, কেন্দ্রের বাইরে পাঁচটি এবং কেন্দ্র মধ্যে দু'টি-এই নিয়ে সাতটি। এই সাতটি আকাশের মধ্যে আরো অনেক আকাশ বিদ্যমান। মধ্যবর্তী পরিসরসমূহ আকাশ দিয়েই ভরাট করা হয়েছে। এর মধ্যে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। সেখানে রয়েছে অনির্ণেয় পরিক্রমনশীল নক্ষত্রমন্ডলী। জ্যোতির্বিদগণ এগুলোকে বিচরণশীল আকাশ বলে অভিহিত করেছেন।

আমি বলি, জ্যোতির্বিদগণ তারকারাজির অনল বিকিরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আকাশের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তারা যখন লক্ষ্য করলো–চাঁদ, তারা ও গ্রহপুঞ্জ দিনরাত চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে, তখন তারা তাদের অবলোকন সীমাকে একটি আকাশ বলে নির্ধারণ করলো। তারপর তারা দেখলো, সপ্তাকাশের তারকারাজি ছাড়াও আরো অনেক তারকা ভিন্নতর কক্ষপথে আবর্তনশীল। আরো দেখলো,

সাত আকাশের নক্ষত্রগুলোর গতিবিধিও একরকম নয়। কোনোটির গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। কোনোটির গতি শ্লথ। এবং সেগুলো আকারে ও প্রকারে সাদৃশ্যপূর্ণও নয়। কোনোটি যাচ্ছে উত্তর সৌর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ সৌর গোলার্ধের দিকে। কোনোটি চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। শেষে তারা এ ব্যাপারটিও লক্ষ্য করলো যে, একমাত্র চাঁদ ব্যতিরেকে অন্য নক্ষত্রগুলো– ধীরগামী, দ্রুতগামী, পূবমুখী, পশ্চিমমুখী, বিরতিসহ, বিরতিবিহীন– বিভিন্ন অবস্থায় ধাবমান। তখন তারা স্থির করলো, এগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী আকাশও অসংখ্য। এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা আকাশের সংখ্যা তিরিশটি বলে অভিহিত করেছে। তবুও বিষয়টি তাদের নিকট দুর্জ্ঞেয় হয়েই রয়েছে। সমস্যার সমাধান তারা করতে পারেনি। গবেষণা যদি নিরন্তর চলে, তবে হয়তো সমস্যার সমাধান কখনো হয়ে যেতেও পারে। এই প্রসঙ্গটির শেষ সমাধান হচ্ছে এই–তাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য সিদ্ধান্তমূলক নয়। তাই তা গ্রহণীয়ও নয়। তাদের মতামত সমাধানের পরিবর্তে নতুনতর সমস্যা সৃষ্টি করেই যাচ্ছে। তারা বলে, আকাশগুলো পরস্পরমিলিত এবং সেগুলোর ধ্বংস অসম্ভব। তাদের দাবী হচ্ছে, সকল আকাশ কোনো এক মহাকাশের আবর্তন প্রভাবে আবর্তিত হয়। কিন্তু যুক্তি ও ধর্ম বলে, অন্য সকল সৃষ্টির মতো আকাশগুলোও অনিবার্যরূপে বিনাশশীল। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে'। আর আকাশগুলো পরস্পরমিলিতও নয়। এক আকাশের সঙ্গে অন্য আকাশের বিশাল দূরত্ব রয়েছে– ইসলাম একথাই বলে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী মোহাম্মদ স. একদা সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলেন, আকাশে ভেসে এলো এক টুকরো মেঘ। তিনি স. বললেন, তোমরা জানো ওটা কী? সাহাবাগণ আরজ করলেন, আল্লাহ্পাক ও তাঁর রসুল সমধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, ওটা হচ্ছে মেঘ–মাটির জন্য প্রবহমান পানির মতো। আল্লাহ্পাক এখন ওটাকে এমন একটি সম্প্রদায়ের দিকে চালিত করেছেন যে সম্প্রদায় আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞভাজন নয়, তারা পানি যাচনাও করেনি। তিনি পুনঃ এরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো তোমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, উপরে রয়েছে আকাশ, যা সুসংরক্ষিত ছাদ ও সুবদ্ধ তরঙ্গসদৃশ। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি বলতে পারো তোমাদের এবং আকাশের মধ্যে ব্যবধান কতো? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। তিনি বললেন, তোমাদের এবং আকাশের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্ব। তিনি পুনরায় বললেন, বলতে পারো আকাশের উপরে কী রয়েছে? তাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ্পাক ও তাঁর রসুলই একথা বলতে পারবেন। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, এই আকাশের উপরে রয়েছে আরেকটি আকাশ। আর ওই দু'টি আকাশের মধ্যে রয়েছে পাঁচশ' বছরের পথের সমদূরত্ব।

এভাবে একের পর এক প্রশ্ন এবং উত্তর করে যাচ্ছিলেন রসুলে পাক স.। ক্রমাগত সাতটি আকাশের বিবরণ দিলেন তিনি। তারপর বললেন, সাত আকাশের ঊর্ধ্বে কী রয়েছে বলো? সাহাবাগণ অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন, সর্বোপরি রয়েছে আরশে আজীম। ঊর্ধ্বতম আকাশ থেকে যার অবস্থান পাঁচশ' বছর পথের দূরত্বের সমান। রসুল স. পুনরায় বললেন, এবার বলো, তোমাদের নিচে কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, মাটি। তোমরা কি জানো মাটির নিচে কী? সাহাবাগণ বললেন, তাঁরা জানেন না। তিনি এরশাদ করলেন, এই মাটির নিচে রয়েছে আরেকটি পৃথিবী। এই দুই পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথের সমমাপের। এভাবে তিনি স. নিম্নস্থিত সাতটি পৃথিবীর বর্ণনা দিলেন। অতঃপর বললেন, ওই পরম সত্তার শপথ! আমার জীবনদীপ যাঁর হস্তায়ত্ব। যদি তোমরা এই স্থান থেকে একটি রশি সর্বশেষ পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দাও, তবে তা পবিত্রতম সত্তার প্রতিই ছুঁড়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, 'হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্জাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলীম' (তিনিই সূচনা, তিনিই সমাপ্তি, তিনিই প্রকাশ, তিনিই অপ্রকাশ, আর তিনিই সবকিছু পরিজ্ঞাত)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে এ বিষয়টি অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, সব কিছুই আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের ও শক্তির অধীন। তাই হাদিসে উল্লেখিত রশি নিক্ষেপকে তাঁর দিকেই নিক্ষিপ্ত হবে বলা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী, আর তিনি আরশারোহী। তাই বলা হয়েছে, তিনি রহমান, আরশের উপর অধিষ্ঠিত।

আমি বলি, রশি নিক্ষেপের ব্যাপারটি মোতাশাবেহাত (দুর্বোধ্য) আয়াতের পর্যায়ভুক্ত। তাঁর আরশাধিষ্ঠানের বিষয়টিও তাই। বিষয়টির অর্থ এরকম হতে পারে যে, সর্বশেষ পৃথিবীতে রশি ছুড়ে দিলে সে রশি শেষ পর্যন্ত আরশ স্পর্শ করবে। হাদিস শরীফ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আরশ এবং তার মধ্যস্থিত সকল আকাশ বৃত্তাকার। আর আকাশ পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তাই হাদিসের মর্ম হবে— সর্বশেষ পৃথিবীই হোক আর যেদিকেই হোক, রশি ছুঁড়ে দিলে সে রশি শেষ পর্যন্ত পৌছে যাবে আরশে।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্র সন্নিধানভূত। বিশ্বাসীদের অন্তর (ক্বলব) হচ্ছে, আলমে সগীর (ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত জগত)। বৃহত্তম জগতে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ, যা আল্লাহ্পাকের তাজাল্লীর (বিশেষ জ্যোতির) ধারক। আরেকটি বিশেষ জ্যোতি প্রতিফলিত হয় কাবাগৃহে। অন্য আরেকটি রহমানী জ্যোতি আরশের উপরে পরিব্যাপ্ত, যা আলমে কবীর বা বৃহত্তম জগতের কেন্দ্রবিন্দু। রহমান আরশে অধিষ্ঠিত— বলে ওই জ্যোতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যাসূত্রে অনেকের অভিমত এই যে, নিক্ষিপ্ত রশি আরশ পর্যন্ত পৌছবে এরকম অতিরিক্ত কথা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি সর্বত্র

পরিব্যাপ্ত। সুতরাং রশি যেদিকে বা যেখানেই ছুঁড়ে মারা হোক না কেনো, তা আল্লাহ্‌র দিকেই ছুঁড়ে মারা হবে। হাদিসে কুদসীতে এরকম উল্লেখিত হয়েছে যে, মু'মিনের ক্বলব ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।

ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন— আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে একাত্তর, বায়াত্তর, অথবা তিয়াত্তর বছর পথের ব্যবধান। আকাশগুলোর পারস্পরিক দূরত্বও এরকম। আকাশের উপরে রয়েছে একটি মহাসমুদ্র, যার নিম্নদেশ এবং উপরিদেশের দূরত্ব দুই আকাশের দূরত্বের সমান। এর উপরে রয়েছে পাহাড়ী ছাগলাকৃতির আটজন ফেরেশতা। তাঁদের বক্ষ ও পশ্চাদ্দেশের প্রশস্ততা সুবিশাল - দুই আকাশের মধ্যবর্তী ব্যবধানের অনুরূপ। ওই ফেরেশতাবৃন্দের পৃষ্ঠোপরি রয়েছে আরশে আজীম। আরশে আজীমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা দুই আকাশের দূরত্বের মতো। আল্লাহ্‌পাকের অধিষ্ঠান এ সকল কিছুর উপরে।

আমি বলি, হাদিস শরীফে বর্ণিত দূরত্বের গতি নির্ণিত হয়েছে পথপরিক্রমণের গতি অনুসারে— যার পরিমাপ নির্ণিত হয় দ্রুতগামীতা ও ধীরগামীতাকে অবলম্বন করে। তাই কোথাও পাঁচশ' বছর— আবার কোথাও একাত্তর, বায়াত্তর, তিয়াত্তর— এ রকম কথা বলা হয়েছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, এখানে সংখ্যা নির্দেশ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং দূরত্বের সুপ্রতুলতা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। যেমন আমরা আধিক্য বুঝাতে যেয়ে বলে থাকি, হাজার হাজার, লাখ লাখ, ইত্যাদি। আর একাত্তর বায়াত্তর তিয়াত্তর বলা হয়েছে একারণে যে, বর্ণনাকারী এখানে নিজেই দূরত্বের বিশালতা নির্ণয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই তিনি সুনির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে স্থির থাকেননি। এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান কোনো নির্ভরযোগ্য বিষয় নয়। বিষয়টি আসলে পানির উপরে চিত্রাংকনের মতো ব্যাপার। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা পরিত্যাজ্য হওয়াই সমীচীন। শরিয়তসমর্থিত অভিমত এই যে, সকল গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে প্রথমাকাশে। আল্লাহ্‌পাক তাই এরশাদ করেছেন, 'আমি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালায় সুসজ্জিত করেছি'। দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং শ্লথগতিসম্পন্ন গ্রহনক্ষত্রসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁরই নির্ধারিত কক্ষ পথে পরিক্রমণশীল। এ যেনো পানিতে সন্তরণরত মৎসকুল। আর আকাশ স্থির।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'ওয়া হুয়া বি কুল্লি শাইয়্যিন আলীম'— এর অর্থ, তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তিনিই সকল বস্তুর স্রষ্টা। তাই তিনি সকল মৌলবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। কল্যাণ নির্ভরতাই তাঁর সৃষ্টির মূল ভিত্তি।

জ্ঞাতব্য ঃ ১. শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলভী র. বলেন, নক্ষত্ররাজি যদি থেমে থেমে অগ্রসর হয়, তাহলে এটা জরুরী হবে যে, প্রতিটি নক্ষত্রের জন্য পৃথক পৃথক আকাশ থাকবে এবং সেগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকবে না। যদি থাকে,

তবে এক তারকা অন্য তারকার আকাশে ঢুকে পড়বে এবং শুরু হবে ধ্বংসলীলা। বিষয়টি বোধগম্য নয়। আল্লামা বায়যাবী বলেন, নক্ষত্রকুলের আবর্তনের প্রকৃতি দু'রকম। একটি হচ্ছে, আপন কক্ষপথে আবর্তন। যে পথ বিস্তৃত রয়েছে নবম আকাশ পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আপন কেন্দ্রমূলের উপর আবর্তন। এরকম হলে দিনরাত, মাস, বছর পরিমাপ করা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় ঋতু নির্ণয়ের ব্যাপারটিও। গতিপথ ভিন্নতর হলেও অবশ্য কিছু আসে যায় না। কারণ, সেগুলোর কক্ষপথ সুনির্দিষ্ট। ভাষ্যকার ও টিকাকারদের নিকট পুরো ব্যাপারটিই জটিল ও সন্দেহযুক্ত। তাই তাদের অনেকেই এ সম্পর্কিত দীর্ঘ বিবরণকে পরিহার করেছেন। তবে এই বিষয়টি সরলীকরণযোগ্য যে, চন্দ্র নক্ষত্র ও গ্রহমালা পৃথিবীর আকাশে বিদ্যমান। তাদের গতি যেমন পৃথক তেমনি গতিপথও পৃথক। তারা তাদের আপনাপন কক্ষপথে সতত সঞ্চরণশীল, যেমন, মৎসকুল সন্তরণশীল পানিতে। কক্ষপথ সুনির্ধারিত বলেই পারস্পরিক সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

২. প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ আকাশের সংখ্যা বিন্যাস প্রকৃতি এবং অবস্থান সম্পর্কে নানান কথা বলেছেন। কোরআনের অধিকাংশ ভাষ্যকার সেগুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় আয়াতের আলোচনায় এনেছেন। আমি মনে করি, আকাশ মার্গের রহস্যের শেষ নেই। তাই কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মতবাদের উপর সমাধান উপস্থাপন করা সমীচীন নয়। কোরআনে এরকম আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, অনিশ্চয়তার উপর বিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করা যায় না। তবে কোরআনের আলোকে জ্যোর্তিবিদদের মতবাদকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এটাই প্রকৃত জ্ঞানীগণের পথ।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের অনেক অভিমতকেই অস্বীকার করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে চল্লিশ কোটি সৌরজগত। দশ কোটি আকাশ এবং ত্রিশ কোটি গ্রহ। প্রতিটি আকাশের আশেপাশে তিনটি করে গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র আপন কক্ষপথে পরিক্রমণরত। তাদের একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো সংযোগ নেই। একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব কখনো লক্ষলক্ষ মাইল, আবার কখনো কোটি মাইলের অধিক। মহাকাশের ঊর্ধ ও অধঃ নির্ণয় করা দূরূহ। দিক নির্ণয়ের ব্যাপারটি সেখানে সত্যিই জটিল। আকাশ সৃষ্টির মূল উপাদান সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনো কোনো হদিস্ করতে পারেনি। বিদ্যুৎ, উল্কাপিন্ড, ধূমকেতু, মহাজাগতিক রশ্মি এসমস্তের অবস্থান এখনো অনুমাননির্ভর। এগুলোর অবস্থান, আগমন, প্রত্যাগমন, আবর্তন ও পরিক্রমন সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণ করা সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। নবুয়তের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে আশ্রয় করা ছাড়া এ রহস্যের উন্মোচন সম্ভব নয়। তথ্য, তথ্যান্তর, বাদ, প্রতিবাদ– এসব নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান। আল্লাহ্পাকের বাণীতে আকাশ, আরশ ও কুরসী সম্পর্কে যে বিবরণটুকু রয়েছে

তাই যথেষ্ট। এই আলোচনায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। সতত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার বাণীকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারটা মূর্খতার অশ্বারোহীর স্বর্গগমনের মতো।

৩. রশি ছুঁড়ে মারলে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছবে– এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি বলেন, এখানে আল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান ও শক্তি। সম্মানিত গ্রন্থকার (কাযী ছানাউল্লাহ্) এরকম ব্যাখ্যাকে অতিরিক্ত মনে করেন। তাঁর মতে বিষয়টি মোতাশাবেহ্ (দুর্বোধ্য)। প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্পাকের সন্নিধানপ্রাপ্ত। তাদের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা একারণেই সম্ভবপর হচ্ছে। এ ধারণাটি সুফী দার্শনিকদের নিকট স্বীকৃত। টিকাকার মনে করেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ না থাকলেও হাদিসটি সম্পূর্ণতঃ শুদ্ধ এবং এপ্রসঙ্গে সুফী দার্শনিকগণের মন্তব্যই যথার্থ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩০

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

❐ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি,' তাহারা বলিল 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বলিলেন, 'আমি জানি যাহা তোমরা জান না।'

তৃতীয় নেয়ামতের বর্ণনা শুরু হয়েছে এখান থেকে। এই আয়াতে ফেরেশতামন্ডলীর উপরে হজরত আদম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরাও এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অন্তর্ভূত। এখানে জারি হয়েছে আনুগত্যের বিধান এবং অস্বীকৃতি পরিহারের নির্দেশনা। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক প্রথমে সৃষ্টি করেন গগনমন্ডল, ধরিত্রী এবং ফেরেশতাকুল। তারপর ফেরেশতাদেরকে আকাশে, জ্বিনদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেন। জ্বিনেরা দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকে। শুরু হয় হিংসা, দ্বেষ ও অশান্তি। অবশেষে রক্তপাত। অনাসৃষ্টি উৎখাতের জন্য আল্লাহ্পাক তখন ধরাবক্ষে প্রেরণ করেন এক বিশাল ফেরেশতা বাহিনী। ওই সকল ফেরেশতাদেরকেও জ্বিন বলা হয়। তারা ছিলেন জান্নাতের রক্ষী বাহিনী। জান্নাত থেকেই জ্বিন নামকরণ করা

হয়েছে। ওই ফেরেশতা বাহিনীর নেতা ছিলো ইবলিস। ইবলিসের নেতৃত্বে ফেরেশতারা এসে প্রথিবীর জ্বিনদেরকে বিতাড়িত করলেন। জ্বিনেরা পালিয়ে গেলো দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। তখন জ্বিন নামক ফেরেশতারাই পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে গেলেন। তখন ইবলিস হলো মাটি ও আকাশের একচ্ছত্র অধিপতি। জান্নাতের প্রধান প্রহরী হয়ে গেলো সে। তাই কখনো সে ধরাধামে, কখনো ঊর্ধ্বধামে, আবার কখনো জান্নাতে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করতো। এ অনন্য পদমর্যাদা তাকে অহংকারী করে তুললো। সে ভাবতে লাগলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শুরু হলো নতুন অধ্যায়। আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাকুলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি'। ইবলিসও ছিলো এ ঘোষণার লক্ষ্যস্থল। পরবর্তী আয়াত (আয়াত ৩৪) দৃষ্টে একথাই বুঝা যায়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু হোরায়রা) বলেন, রসুল পাক স. আমার হাত ধরে এরশাদ করলেন, আল্লাহ্পাক মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে। পর্বতরাজি রবিবারে। বৃক্ষলতা সোমবারে। অসৎকর্ম সমূহকে মঙ্গলবারে। নূর বা জ্যোতিকে বুধবারে এবং পশুকুলকে বৃহস্পতিবারে। সবশেষে শুক্রবারে তিনি সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। তখন ছিলো আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। এই হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির ছয়দিন পরে সৃষ্টি করা হয় হজরত আদমকে। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, জ্বিন সম্প্রদায় দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করেছে। তারপর বিতাড়িত হয়েছে। বিতাড়নকারী ফেরেশতারাও দীর্ঘকাল বসবাসের পর আল্লাহ্পাক পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের ঘোষণা দিচ্ছেন। তাই যদি হবে, তবে পৃথিবী সৃষ্টির ছয়দিন পর আদম আ. সৃষ্ট হয়েছেন– এ কথা বলা হয়েছে কেনো? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির ছয়দিন পরের শুক্রবারটিই যে আদম আ. এর সৃষ্টিলগ্ন ছিলো– হাদিস শরীফের বর্ণনায় সেকথা স্পষ্ট বিবৃত হয়নি। সম্ভবতঃ হজরত আদমের সৃষ্টিলগ্নের শুক্রবার ছিলো দীর্ঘকাল পরের কেনো এক শুক্রবার। এই উত্তরই যথার্থ। আর এই ব্যাখ্যাটি কোরআন পাকের বর্ণনার অনুকূল। কোরআনে বলা হয়েছে, আকাশ, জমিন ইত্যাদি সৃজিত হয়েছে ছয়দিনে। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

'খলিফা' অর্থ প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি হচ্ছেন হজরত আদম। খলিফা প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্পাকের বিধানাবলী ও বিধানানুসারী বিষয়ের প্রচলন, পথ-প্রদর্শন, সত্য পথের আহবান, আল্লাহ্র নৈকট্যার্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। এতে আল্লাহ্পাকের কোনো প্রয়োজন নিহিত নেই। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সৃষ্টিকূল তাঁর মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্যই তিনি প্রতিনিধি প্রেরণের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতারহিত। সরাসরি আল্লাহ্পাকের প্রত্যাদিষ্ট বিধান

গ্রহণ করতেও তারা অক্ষম। তাই আল্লাহ্‌পাক এই প্রতিনিধিত্বের পরম্পরা শুরু করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন হজরত আদমের মাধ্যমে।

আল্লাহ্‌পাকের ঘোষণা শুনে ফেরেশতারা বিস্মিত হলেন এবং বিনয়াবনত স্বরে বললেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আপনি এরকম করলে পৃথিবীতে পুনরায় শুরু হবে অশান্তি ও রক্তপাত। আপনার সপ্রশংস স্তব স্তুতি ও পবিত্রতা বর্ণনের জন্য আমরাই তো রয়েছি। ফেরেশতাদের একথা আল্লাহ্‌তায়ালার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিরূপে উত্থাপিত হয়নি। তাঁদের এমতো উক্তির পিছনে হজরত আদমের প্রতি কোনো হিংসা দ্বেষও ছিলো না। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে সংঘটিত অশান্তি ও রক্তপাতের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিলো। পুনরায় সেখানে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে ভেবে তাঁরা এরকম মন্তব্য করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, তাঁরা নিষ্পাপ এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্য। তাই বলেছেন, 'আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করি'।
'নুসাব্বিহু বিহামদিকা' অর্থ সপ্রশংস স্তুতিগান। দু'টি শব্দ রয়েছে এই বাক্যাংশটিতে। একটি হচ্ছে তাসবীহ্‌ এবং অন্যটি হাম্‌দ। তাসবীহ্‌ অর্থ আল্লাহ্‌পাককে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত জানা এবং তা প্রকাশ করা। 'বিহামদিকা' অর্থ আমরা এমন অবস্থায় তোমার তাসবীহ্‌ পাঠ করি, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রশংসা (হামদ)। আর আমাদেরকে তাসবীহ্‌ ও হাম্‌দ প্রকাশের (সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণার) সামর্থ তো দিয়েছো তুমিই। নুকাদ্দিসু ও নুসাব্বিহু সমার্থবোধক শব্দ। 'নুকাদ্দিসু লাক' বাক্যাংশের লাম অব্যয়টি অতিরিক্ত অথবা অনতিরিক্ত, দু'টোই ধরা যায়। যদি অতিরিক্ত না ধরা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে– আমরা তোমারই জন্য প্রবৃত্তিকে পাপ থেকে পবিত্র করি। এ অবস্থায় নুকাদ্দিসু শব্দের কর্মপদ উহ্য হবে। আর অতিরিক্ত ধরলে নুকাদ্দিসু লাক এর কাফ সর্বনামটি কর্মপদ বলে গণ্য হবে। ফেরেশতাগণ ফাসাদ বা অশান্তির বিপরীতে সপ্রশংস পবিত্রতা এবং রক্তপাতের বিপরীতে পবিত্রতা বর্ণনার কথা বলেছেন।

এক ব্যক্তি রসুলপাক স. এর নিকট আরজ করেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌। সর্বোত্তম কথাটি কী? তিনি স. বললেন, ওই কথাটিই সর্বোত্তম কথা যা ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিলো। তা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি। হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম বলেছেন, এই কথাটি সৃষ্টির জন্য রহমতের কারণ। এই কথার কারণেই সৃষ্টিকুল তাদের জীবনোপকরণ (রিজিক) পেয়ে থাকে। এই বর্ণনাটি এনেছেন হজরত জাবের থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং হজরত হাসান থেকে বাগবী।

ফেরেশতাগণ আগেই জেনেছিলেন যে, হজরত আদমের বংশধরগণের মধ্যে কেউ কেউ হবে বাধ্য এবং কেউ কেউ হবে অবাধ্য। কেউ মু'মিন, কেউ কাফের। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন, ফেরেশতাকুল মানবজাতি থেকে উত্তম। কারণ, ফেরেশতাদের মধ্যে কোনোরূপ অবাধ্যতা নেই। নির্দেশাবলীর নিখুত প্রতিপালনই

তাঁদের স্বভাব। তাঁরা অবিদ্রোহী, নিষ্পাপ। তাই তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন, তাঁরাই আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধি। তাই তাঁরা মানব সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিনয়াবনত অনুযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ধারণা সঠিক নয়—এ আয়াতের শেষ বাক্যটিতে সেকথাই পরিস্ফুট হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জানো না। ফেরেশতারা জানতেন না যে, কোনো কোনো মানুষের অন্তরে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রকৃত প্রেম দান করবেন। যার কারণে তাঁরা আল্লাহ্পাকের রহস্যময় নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবেন। বিশুদ্ধ প্রেমিক হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন। হাদিস শরীফে এসেছে— যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে। হজরত আনাস এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে—আল্লাহ্পাক বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অন্বেষণে ব্রতী হয়। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। তখন আমি হয়ে যাই তাঁর কান, যদ্দারা সে শোনে। আমি হয়ে যাই তাঁর চক্ষু, যার দ্বারা সে দেখে।

ফেরেশতারা বুঝতে পারেনি মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কী (তাঁরা নিষ্পাপ বটে কিন্তু প্রেমিক নন, সুতরাং প্রেমের মর্যাদা তাঁরা বুঝবেন কীভাবে)? হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, ওহে আদম তনয়। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার শুশ্রুষা করবো কী করে। তুমি তো সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক। তুমি তো রোগশোকের অতীত। আল্লাহ্ বলবেন, স্মরণ করো— আমার ওমুক বান্দা পীড়াগ্রস্ত হয়েছিলো, অথচ তুমি তার সেবা যত্ন করোনি। তার সেবা যত্ন করলেই আমার সেবা যত্ন করা হতো। পুনঃ এরশাদ হবে, হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট আহার্য যাচনা করেছিলাম— তুমি দাওনি। সে পূর্বের মতো বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ওমুক ক্ষুধার্ত বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলো— তুমি দাওনি। তাকে খাদ্য দিলে আমাকেই দেয়া হতো।

প্রসিদ্ধ সুফীদার্শনিকদের নিকট এ বিষয়টি সতঃসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান যে, ভূপৃষ্ঠের সকল কিছু সূর্যের প্রখর কিরণ সহ্য করতে পারে না। মাটি পারে। অন্যান্য সৃষ্টি তেমনি আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে সিফাতি) কতকাংশে ধারণ করতে সক্ষম হলেও সত্তাগত বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে জাতী) ধারণ করতে পারে না। প্রকৃত বিচ্ছুরণ নয় বরং উভয় প্রকার বিচ্ছুরণের সুদূরবর্তী ছায়া প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করেই সৃষ্টিকে তৃপ্ত থাকতে হয়। কেবল মানুষ এর ব্যতিক্রম। মানুষের মূল উপাদান মাটি। মাটিসহ সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম দশটি উপাদান নিয়ে মানুষের অস্তিত্ব গঠন করা হয়েছে। মানুষ তাই মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমাহার। মহাবিশ্ব

হচ্ছে আলমে কবীর এবং মানুষ আলমে সগীর। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তার মতো সমষ্টিভূতিসম্পন্ন নয়। মানুষ তাই প্রকৃত প্রতিনিধি। প্রকৃত আমানতের দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই রয়েছে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'অবশ্যই আমি পৃথিবী ও পর্বতরাজির নিকট আমানত পেশ করলাম, তারা ভীত হলো। কেবল মানুষ একে গ্রহণ করলো। নিঃসন্দেহে মানুষেরা শ্রেষ্ঠ জালেম এবং জাহেল।'

মানুষকে জালেম বা অত্যাচারী বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা আত্মঅত্যাচার করেছে। যে দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের নেই, সে দায়িত্ব তারা স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। জাহেল বা মূর্খ বলা হয়েছে এ কারণে যে, আমানতের গুরুভার সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। কিন্তু এই অত্যাচার ও অজ্ঞতাই তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছে। আলমে কবীর যাকে নেয়নি, তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে তারা। তাই তারা বাহ্যত ক্ষুদ্র জগত (আলমে সগীর) হলেও কার্যতঃ মহাবিশ্ব (আলমে কবীর) অপেক্ষা ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্পাক তাই এরশাদ করেছেন, জমিন ও আসমান আমাকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত মু'মিন বান্দার ক্বলব আমাকে ধারণ করতে পারে।

হজরত আদমকে যে ইতোমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, ফেরেশতারা তা জানতেন না। আমি জানি যা তোমরা জানো না— এ কথা দ্বারা সে বিষয়টি প্রকাশ পায়। পৃথিবীর সকল প্রকার মাটি এবং সকল ধরনের পানি একীভূত করে আল্লাহ্পাক তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং রূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাঁকে দান করেছেন জীবন। সৃষ্টি-গৌরব হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, এক দলা মাটি থেকে আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। ওই মাটিটুকুর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সকল ধরনের মাটি। তাই তাঁর সন্তানেরা বিভিন্ন বর্ণের। কেউ কালো, কেউ শাদা। আবার কেউ বিভিন্ন মিশ্র বর্ণের। তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন প্রকারের। কেউ উগ্র, কেউ নম্র। কেউ উৎকৃষ্ট, কেউ নিকৃষ্ট। আবার কেউ পূতঃপবিত্র অন্তরের অধিকারী। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, বায়হাকী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া এবং হাকেম।

আমি বলি, সারা জগতের মাটি একত্রীকরণের রহস্য এই যে, সকল প্রকারের কর্মদক্ষতা যেনো হজরত আদমের মাঝে সন্নিবেশিত হয়। আল্লামা বাগবী বলেন, আল্লাহ্পাক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি, তখন তাঁদের মধ্যে এ মর্মে আলাপচারিতা শুরু হয়ে গেলো যে, আল্লাহ্পাক যা খুশী তাই করতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদের চেয়ে উত্তম কোনো সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করবেন না। যদি করেনও তবে জ্ঞানের দিক থেকে আমরা তাদের চেয়ে অগ্রগামী থেকেই যাবো। কারণ, তার চেয়ে অনেক আগেই আমাদেরকে সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু দর্শন

করেছি, মানুষের সে সৌভাগ্য হয়নি। তাদের এই আলাপচারিতার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌তায়ালা আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে দিচ্ছেন এভাবে–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

❐ এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে-সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

সকল কিছুর নাম বলতে কী বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে হজরত আদমকে সমস্ত সৃষ্টির নাম বা শিরোনাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বাগবী বলেছেন, তাঁকে প্রতিটি বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে–এমন কি পেয়ালা পিরিচের নামও। এ বর্ণনাটি তিনি এনেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, অতীত ও ভবিষ্যতের সমুদয় বস্তুর নাম শেখানো হয়েছে তাঁকে। রবী বিন আনাস বলেছেন, তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ফেরেশতাকুলের নাম। কেউ বলেছেন, তাঁর সন্তানদের নাম। কেউ বলেছেন, সকল কারিগরি বস্তুর নাম। ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে পৃথিবীর সকল ভাষা– যে ভাষায় মানুষেরা কথা বলে। আমি বলি, উল্লেখিত অভিমতসমূহ আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। কেনোনা, সওয়াব ও নৈকট্যের ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর কোনোটিই মর্যাদা নির্ণায়ক নয়। বর্ণিত বিষয়গুলো সমস্তই পার্থিব। নবী ও রসুলগণের পার্থিব জ্ঞান অন্যাপেক্ষা অধিকতর নাও হতে পারে। যদি উপরের ব্যাখ্যাগুলো গ্রহণ করা হয়, তবে মর্যাদার দিক থেকে হজরত মোহম্মদ স. অপেক্ষা হজরত আদমই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হবে। তিনি স. সকল ভাষায় পন্ডিত ছিলেন না। কারিগরি বা অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানও তাঁর অধিক ছিলো না। তিনি স. বলেছেন, পার্থিব ব্যাপারে তোমরা আমার চেয়ে বেশী জানো। তাই আমার মতে, 'যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন'– এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে তাঁর নিজের সমুদয় নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেউ হয়তো বলতে পারেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম তো অশেষ। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, যদি আল্লাহ্‌পাকের নামসমূহ লিখতে সাগরের পানিকে

কালিরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে তাঁর নাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সাগরের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্যত্র এরশাদ করেছেন, ওয়ালাও আন্নামা ফিল্ আরদ্বে মিন্ শাজারতিন্ আকলামুন ওয়াল্ বাহ্রু ইয়ামুদ্দুহু মিম্ বায়্দিহি সাবয়াতু আব্হুরিন মা নাফিদাত্ কালিমাতুল্লাহ্'। এই আয়াতগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে— মানুষের সীমিত জ্ঞানে আল্লাহ্পাকের অশেষ নামের সংকুলান হবে কি করে? রসুল মোহাম্মদ স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, আয় আল্লাহ্পাক! আমি তোমার ওই নামের মাধ্যমে নিবেদন করছি, যে পবিত্র নাম তোমার পরম সত্তা-সংশ্লিষ্ট এবং ওই সকল নামের ওসীলা গ্রহণ করছি, যে সকল নাম তোমার অবতীর্ণ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। আর ওসীলা গ্রহণ করছি ওই সকল নামেরও যা তোমার সৃষ্টিজগতের কাউকে শিখিয়েছো, ওই সমস্ত নামেরও যে সম্পর্কে কারো কোনো জ্ঞান নেই। এই হাদিস হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী ও আহমদ। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের অনেক নাম তিনি ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। হজরত আদমকে যদি আল্লাহ্পাকের সমুদয় নাম শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, তবে আরেকটি জটিলতার সৃষ্টি হয়। যে নামগুলো অন্য কেউই জানে না, সেগুলো তিনি জানবেন কীভাবে? এই জটিলতার নিরসন এভাবে হওয়া সম্ভব যে, নাম সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান নয়, সীমিত জ্ঞান তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। তিনি ছিলেন পরম প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার পরম সত্তার নিগূঢ় সাহচর্যধন্য এবং বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। অনন্য সাহচর্য এবং নিগূঢ় সৌভাগ্যের কারণেই তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁর সত্তাগত নাম ও গুণাবলীর প্রতি চিত্তসংযোগ করতেন, তখনই তা দিবালোকের মতো প্রতিভাসিত হয়ে উঠতো। বিষয়টি ওই সুযোগ্য ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মতো, যিনি কোনো সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সাথে সাথে মানসপটে ভেসে ওঠে তার সমাধান।

যদি কোনো প্রতিবাদকারী এই মর্মে প্রতিবাদ উত্থাপন করে যে, আমার এই ব্যাখ্যা মনগড়া এবং অনুমাননির্ভর। এরকম অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা হারাম। পূর্ববর্তী তাফসীরবিদগণের ব্যাখ্যার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন মজীদের খেয়ালী ব্যাখ্যা করে সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। আরো বর্ণিত হয়েছে— অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্র কালাম সম্পর্কে কেউ যদি কিছু বলে, সে যেনো তাঁর আবাসস্থল হিসেবে খুঁজে নেয় দোজখকে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরীফে উল্লেখিত এই ভর্ৎসনা কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী নির্মাণ করে। ব্যাখ্যা হতে হবে ওহী বা প্রত্যাদেশ নির্ভর। নিছক বুদ্ধিনির্ভর নয়।

তাফসীর (ব্যাখ্যা) শব্দটি তাফসীরাহ্ শব্দটি থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। প্রস্রাব ভর্তি বড় বোতলকে বলা হয় তাফসীরাহ্, যা দেখে চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করতে পারে। তেমনি মুফাসসির (ব্যাখ্যাকার) তাকেই বলা যেতে পারে, যিনি আয়াতের শানে নুজুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এবং সে সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণনা করেন। তাফসীরের অর্থই হচ্ছে শানে নুজুল বর্ণনা করা। বিষয়টি এবার পরিষ্কার যে, ওই তাফসীর নিষিদ্ধ যার শানেনুজুল সঠিক নয়। কিন্তু আয়াতের ভাবগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধতা নেই। তাবীর বা ভাবগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে হতে হবে পূর্বাপর সকল আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং কোরআন ও সুন্নাহ্র পূর্ণানুকূল। এরকম ব্যাখ্যা অগ্রহণীয় নয়। জ্ঞানপ্রবীণগণ এরকম ব্যাখ্যার বিরোধী নন। তাবীল শব্দটি গঠিত হয়েছে আওল শব্দ থেকে, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স.এরশাদ করেন, সাত রকম অক্ষরবিন্যাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের একটা বহিরাবরণ এবং একটি অন্তরায়ন রয়েছে। এতদোভয়ের সীমারেখায় একটি উদয়স্থল রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন— কোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে সাতটি আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গিকে মান্য করে। প্রতিটি বর্ণের রয়েছে একটি প্রকাশ্য দিক, আরেকটি আধ্যাত্মিক দিক। উভয় দিকের সীমা রেখায় রয়েছে, একটি করে আবির্ভাব স্থল। বাগবী বলেছেন, উদয়স্থল অর্থ আরোহনস্থল। আল্লাহ্পাক যাঁকে জ্ঞান দান করেন, সে-ই জ্ঞানারোহী হয়। এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে নিষ্ঠাবান গবেষকদের প্রতি আল্লাহ্পাক গুঢ় অর্থের দ্বার উম্মোচন করবেন। কাউকে দানে ধন্য করবেন, কাউকে করবেন বঞ্চিত। আল্লাহ্পাক নিজেই এরশাদ করেছেন, 'জ্ঞানবান অপেক্ষা রয়েছে অধিক জ্ঞানবান'।

আমি বলি, বর্ণনার পরম্পরা লংঘিত হয়েছে বলে যদি আমার অভিমতের প্রতি আপত্তি তোলা হয়, তবে আমি বলবো, আমার অভিমত অন্য তাফসীরকারদের মতের সঙ্গে মিলেনি এ কথা ঠিক। কিন্তু তাঁদের মতামতগুলোও রসুল স. এর সরাসরি কোনো বাণী নয়। তাঁরা গবেষণা করেছেন। কিন্তু গবেষণার ফলাফল একরকম হয়নি। আমার বক্তব্যও সে রকমই গবেষণা নির্ভর। সকল বস্তুর নাম (এমনকি পেয়ালা পিরিচেরও), বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের নাম, সন্তান-সন্ততিগণের নাম, সকল কারিগরি কৌশলের নাম—এ সকল ব্যাখ্যা আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রতিকূল কিন্তু নয়। যেমন, আল্লাহ্তায়ালার একটি নাম হচ্ছে আল আউয়াল। যার অর্থ, তাঁর পূর্বে কিছুই ছিলো না। আরেকটি নাম 'আল আখির'। অর্থাৎ যাঁর পরেও কিছু নেই। তেমনি তাঁর আরেক নাম 'আজ্জাহির' (প্রকাশ্যতম)। আরেকটি নাম 'আল বাতিন' (গোপনতম)। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রকাশ্য বস্তুসমূহের নামের কথা বলেছেন। বিষয়টিকে সর্বসাধারণবোধ্য করে তোলাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ, সাধারণের জ্ঞান

অনুযায়ী কথা বলাই ছিলো জ্ঞানপ্রবীণগণের রীতি। আল্লাহপাকই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত।

তাফসীরবিদগণ বলেছেন, 'আরাদ্বাহুম' শব্দটিতে যে, 'হুম' সর্বনামটি রয়েছে তা দ্রব্য-সামগ্রীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যদিও দ্রব্য-সামগ্রীর কথা আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। এই দ্রব্যসম্ভারের নামই হজরত আদমকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। 'হুম' সর্বনাম পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এতে করে বুঝা যায়, জ্ঞানবানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। আমার অভিমত ছিলো, 'আসমা' বা নাম বলতে এখানে আসমায়ে ইলাহিয়া বা আল্লাহ্তায়ালার নাম মনে করতে হবে। এই অভিমতটি গ্রহণ করলে 'আরাদ্বা হুম' শব্দের হুম সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে হজরত আদমের সঙ্গে। সর্বনামটি বহুবচন তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, হজরত আদমের সঙ্গে বহুবচন সর্বনামটি যুক্ত হয় কিভাবে। জবাবে বলতে হয়, হজরত আদমের মর্যাদার আধিক্য বুঝাতেই এ রকম করা হয়েছে। আরেকটি জবাব হচ্ছে, হজরত আদম বলতে এখানে বনী আদম (আদম সন্তানগণ) বুঝানো হয়ে থাকবে। পূর্ব পুরুষের নামের সঙ্গে পরবর্তী বংশধরেরা পরিচিত হয়। এটি একটি বহুল প্রচলিত নিয়ম। যেমন রবীয়া, মুজার—এগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষদের নাম। কাযী বায়যাবী বলেছেন, আলা খওফিম্মিন ফির আউনা ওয়া মালাইহিম— এই আয়াতের অর্থও এ রকমই। প্রকাশ্যতঃ একথাও জানা গিয়েছে যে, আল্লাহ্পাক হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে নবী রসুলগণকে বের করে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেছিলেন এবং সকলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। হজরত মোহাম্মদ স. হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসা আলাইহিমুস্সালাম— সকলেই ছিলেন ওই অঙ্গীকারানুষ্ঠানের অন্তর্ভূত। তদসত্ত্বেও এখানে হুম সর্বনামটি হজরত আদমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াই অধিক সমীচীন। কেনোনা নবী রসুলগণের নামগুলো এই সর্বনামের পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া এই সর্বনামের পূর্বে স্পষ্ট করে হজরত আদমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কষ্টকর বিশ্লেষণের প্রতি ধাবিত না হওয়াই উত্তম। হজরত উবাই বিন কাব আরাদ্বাহুম শব্দটিকে পাঠ করতেন 'আরাদ্বাহা' এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ পাঠ করতেন— আরাদ্বাহুন্না। তাঁদের পাঠ অনুযায়ী হুম সর্বনামটি হজরত আদমের নামের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়।

ফেরেশতাগণ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বহন করার উপযোগী নন। একটি প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা এ কথাটি প্রমাণ করে দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো এই, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো'। তাফসীরবিদগণের একটি বড় দলের অভিমত হচ্ছে, 'এই সমুদয়' বলতে পৃথিবীর দ্রব্যসামগ্রীর কথা বলা হয়েছে। আর আমার অভিমতানুসারে অর্থ হবে, 'এই সমুদয়ের নাম' অর্থ যা হজরত আদম ও তাঁর সন্তানেরা জানেন— ওই নামসমূহ তোমরা বলো।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে — রসুল স. বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন হজরত আদম ছিলেন আত্মা এবং শরীরের মধ্যবর্তী স্থলে। রসুল স. এর পবিত্র অবয়ব বর্ণনা করতে যেয়ে এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, তিবরানী এবং আবু নাঈম। বর্ণনা করেছেন আবুল জাদআর মাধ্যমে ইবনে সা'দ। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নবী রসুলগণের জন্য নির্ধারিত জ্ঞান নবুয়তের পূর্ণত্ব এবং তাজাল্লীয়ে জাতী (পরমসত্তার জ্যোতি) হজরত আদমের সৃষ্টির পূর্বেই হজরত মোহাম্মদ স. কে দেয়া হয়েছিলো এবং তখনো তিনি (হজরত মোহাম্মদ) আত্মা ও দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। কেননা সত্তাসম্ভূত পূর্ণ জ্যোতি ধারণ করতে পারে কেবল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা ব্যতীত দেহ গঠিত হয় না। হজরত আদমও আত্মা ও দেহবিশিষ্ট হওয়ার পর তাঁর অনাগত সন্তানদের রূহ বা আত্মাকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং পরম সত্তার জ্যোতি অধিক গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

'যদি তোমরা সত্যবাদি হও'— এ কথার অর্থ তোমরা তো ধারণা করো, তোমরা আদমের চেয়ে উত্তম। এই দাবীকে যদি তোমরা সত্য বলেই মনে করো, তবে ওই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যা হজরত আদম এবং তাঁর সন্তানেরা বলতে সক্ষম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩২

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

❒ তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'

আল্লাহ্পাকের প্রশ্নের ধরণ দেখে ফেরেশতারা বুঝলেন, তাঁদের চেয়ে হজরত আদমই অধিক জ্ঞানী ও উত্তম। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হলেন এই ভেবে যে, তিনি এই প্রশ্নের মাধ্যমে দয়া করে প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। তাঁরা তখন এমনভাবে জবাব দিলেন যাতে পূর্ণ বিনয় এবং হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বললেন, আপনি পবিত্র, মহান। আপনার বক্তব্য, ক্রিয়াকলাপ, তত্ত্বজ্ঞানহীনতা থেকে পবিত্র। আমরা জানি না। আমাদের জ্ঞান কখনই আপনার অনির্ণেয় জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম নয়। আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী, বিজ্ঞানবিভূষিত। আমরা কেবল অতটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদেরকে দয়া করে শিখিয়েছেন।

আয়াত শেষে আল্লাহ্‌পাকের দু'টি গুণবাচক নাম বিবৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে আলিম। অপরটি হাকিম। আলিম অর্থ জ্ঞানী, ন্যায় পরায়ণ বিচারক। হাকিম অর্থ যিনি আপন বিধানকে সুস্পষ্ট, সঠিক ও সুদৃঢ় করেন।

ফেরেশতাগণ যখন তাঁদের পূর্ণ অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করলেন, হজরত আদমকে প্রদত্ত অনুগ্রহ ফেরেশতাদেরকেও দান করবেন। তাই তিনি হজরত আদমকে নাম সমূহের বিবরণ দিতে বললেন। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে –

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ○ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ○

❐ তিনি বলিলেন, 'হে আদম! উহাদিগকে ইহাদের নাম বলিয়া দাও।' যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ নিশ্চিতভাবে আমি তাহা জানি?'

❐ যখন ফেরেশতাদের বলিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলীস্ ব্যতীত সকলেই নত হইল; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তাফসীরকারদের বক্তব্য অনুসারে 'বি আসমায়িহিম' শব্দের হুম সর্বনামটি ওই নাম সমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে শিখিয়েছিলেন। আর আমার ব্যাখ্যানুসারে সর্বনামটি ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এই বক্তব্যানুযায়ী বাক্যটির অর্থ হবে এরকম– হে আদম! তুমি ফেরেশতাদেরকে ওই সব নাম জানিয়ে দাও, যে সব নাম জানবার যোগ্যতা আমি তাদেরকে দান করেছি। এখানে আসমায়িহিম এর স্থলে আসমায়িকুম বলা হয়নি। যদি এরকম হতো তবে বুঝা যেতো হজরত আদম যে নামগুলো জানেন তার

সবগুলোই ফেরেশতাদেরকে শিক্ষা দেয়ার হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। কিন্তু সকল নাম জানবার যোগ্যতা তাদের নেই। যদি থাকতো, তবে তাঁরাও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সমান্তরালে এসে দাঁড়াতেন। তাই আসমায়িকুম না বলে আসমায়িহিম বলা হয়েছে। যাতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদের জ্ঞান অনুযায়ী জ্ঞানদান করতে হুকুম দিয়েছেন হজরত আদম আ.কে।

হজরত আদম আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ যথাপ্রতিপালন করলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আকাশমন্ডল এবং মৃত্তিকামন্ডলের সকল সংগুপ্ত বিষয়াবলী আমি সম্পূর্ণ অবহিত। 'আমি কি তোমাদের বলিনি'– একথাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতের (আয়াত ৩০) ওই বাক্যটির প্রতি ইঙ্গিত, যেখানে বলা হয়েছে, 'ইন্নি আ'লামু মালা তা'লামুন' (আমি জানি যা তোমরা জানো না)। ইমামে হারামাইন এবং আবু আমর ইন্নি শব্দটি যবরযুক্ত ইয়া সহযোগে পাঠ করেছেন। এই নিয়মে সকল সম্বন্ধ পদে ইয়া অক্ষরটি থাকার কথা। তবে এরপর যদি জবরবিহীন আলিফ থাকে তবে যবর সহযোগে পাঠ করা যাবে। কিছু অক্ষর অবশ্য এই বিধানের বাইরে। যথাস্থানে এ সম্পর্কিত আলোচনা আসবে। অন্যান্য ক্বারীগণ কয়েকটি স্থান ব্যতীত এরকম 'ইয়া'তে যবরযুক্ত করেন না। ইনশাআল্লাহ্, যথাস্থানে এ সমস্তের আলোচনা এসে যাবে।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা ব্যক্ত করো এবং গোপন করো, আমি সে সকল বিষয় নিশ্চিতভাবে জানি।' এখানে 'ব্যক্ত করো' বলে ফেরেশতাদের ওই উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে তাঁরা বলেছিলেন, 'আতাজয়ালু ফিহা মাঁই ইয়ুফছিদু ফিহা।' (তারা সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে)। আর 'গোপন রাখো' বলে ফেরেশতাদের ওই আলাপচারিতার দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের মধ্যে সঙ্গোপনে করেছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কাউকে সৃষ্টি করবেন না।

হজরত আদমের পবিত্র শরীর যখন মক্কা শরীফ ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে পতিত অবস্থায় ছিলো তখন ইবলিস তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে ফেললো, একে আবার কেনো সৃষ্টি করা হলো। এরপর ইবলিস হজরত আদমের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলো। মুখ-গহবর পথে প্রবেশ করে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে বের হয়ে গেলো। বললো, এ কেমন সৃষ্টি, যে কোনো কিছু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। এর অভ্যন্তর ভাগ যে একেবারে শূন্য। এরপর সে তার সঙ্গী ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, ধরে নাও এই সৃষ্টিটি তোমাদের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্পাক যদি তোমাদেরকে এর আনুগত্যের নির্দেশ দেন, তবে তোমরা কী করবে? সঙ্গীরা সমস্বরে জবাব দিলেন, আমরা আমাদের মহিমময় ও প্রতাপশালী প্রভুপালকের নির্দেশ মান্য করবো। ইবলিস মনে মনে বললো, আমি

যদি তার উপর প্রাধান্য পাই তবে তাকে ধ্বংস করে ফেলবো। আর সে যদি প্রাধান্য পায় তবে আমি তাকে অমান্য করবো। আমি হবো বিরোধী, বিদ্রোহী। ইবলিসের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ঘোষিত হলো, 'আদমের প্রতি নত হও।' আয়াতে নির্দেশ পালনকারী হিসেবে ফেরেশতাদের কথা এসেছে এবং ইবলিসের অমান্য করার কথাও এসেছে। বলা হয়েছে, 'ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হলো।' সে (ইবলিস) অমান্য করলো ও অহংকারী হলো। সুতরাং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। 'গোপন রাখো' বলে ইবলিস অন্তরে হজরত আদমের প্রতি যে হিংসা গোপন রেখেছিলো, সে সম্পর্কেও ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে। তখন ব্যক্ত করা ও গোপন করার ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম— ফেরেশতাদের প্রকাশ্য মান্যতা এবং ইবলিসের গোপন অভিসন্ধি, সকল কিছুই আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চিতরূপেই জানেন।

আয়াতে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীগণ আল্লাহ্পাকের বিশেষ বান্দা। এই বিশিষ্ট বান্দাগণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের থেকে উত্তম। ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন হজরত জিব্রাইল আ.। আল্লাহ্পাক তাঁকে রসুলগণের প্রতি দূত হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

আলেমগণ বলেছেন, সাধারণ মানুষ অর্থাৎ অলি আল্লাহ্গণ (নেককার ও মুত্তাকীগণ) সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। এই অভিমতটি অবশ্য কোরআনপাক দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। তবে অনেক হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট কোনো কোনো মু'মিন কোনো কোনো ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। ইবনে মাজা। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেন, আল্লাহ্পাক হজরত আদম ও তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করলে ফেরেশতাবৃন্দ বলেছিলেন, হে আমাদের মহান প্রতিপালক! মানুষেরা পানাহার করেন, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, পশুর উপরে আরোহন করেন। আমাদেরকে তো এসব কোনো কিছুই করতে হয় না। আপনি বরং তাঁদের জন্য দুনিয়া নির্ধারণ করে দিন। আর আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন আখেরাত। আল্লাহ্পাক বললেন, এ কেমন কথা? যাকে আমি আপন হাতে সৃষ্টি করলাম, যার মধ্যে স্বীয় রূহ ফুৎকার করলাম, তাকে আমি কেমন করে ওই সকল সৃষ্টির সমতুল করে দেবো - যারা আমার 'কুন' কথার সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে। শো'বুল ইমানে ইমাম বায়হাকী এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আদম সন্তানেরা বেহেশতে আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। ফেরেশতামন্ডলী এই মহিমান্বিত সম্পদ এবং শ্রেষ্ঠ গণিমত থেকে বঞ্চিত থাকবেন! এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ফেরেশতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল অলি বেহেশতে আল্লাহ্পাকের দীদার লাভ করবেন তাই নয়, সাধারণ বিশ্বাসীরাও এ নেয়ামত লাভে ধন্য হবেন। অবশ্য মর্যাদার

তারতম্যহেতু দর্শনেরও ন্যূনাধিক্য থাকবে। কেউ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা, কেউ সপ্তাহান্তের শুক্রবারে দর্শন লাভ করবেন। কেউ লাভ করবেন বছরে একবার। আবার কেউ সুদীর্ঘ দিবস পরে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, সকল ধরনের বিশ্বাসীরাই সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বাসীরা যদি ফাসেক, ব্যভিচারী অথবা অবাধ্যও হয় তবুও তারা শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, মাই ইয়া'মাল মিসক্বলা জাররাতিন খইরঁই ইয়ারাহ্ – যে অনু পরিমাণ সৎ আমল করবে সে তাও দেখতে পাবে। মহানবী স. বলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণকারীর অন্তরে গমের দানা পরিমাণ সৎকর্ম অবশিষ্ট থাকলেও– অথবা বলেন, ইমানের কণা অবশিষ্ট থাকলেও দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। হজরত আনাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে, আর ওই অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে; যদিও সে চুরি করে ও ব্যভিচারী হয়, যদিও সে চোর হয় ও ব্যভিচার করে, যদিও সে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয় এবং ব্যভিচারাভ্যস্ত হয়। আবু জর যদি এতে অসন্তুষ্ট হয় তবুও। কিন্তু বুদ্ধি বলে, নিস্পাপ ফেরেশতা অপেক্ষা পাপাচারী মানুষের উত্তম হওয়া উচিত নয়। শরিয়তও তাই বলে। আর আল্লাহ্পাকও এরশাদ করেছেন, 'আমি কি পাপীদের সমান্তরালে আমার অনুগতদের রাখবো?' এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা তো সুস্পষ্টই যে, পাপী মানুষ শাস্তি আস্বাদনের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বেহেশতে প্রবিষ্ট হবে। সে শাস্তি হবে কখনো পার্থিব জীবনে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে। কখনো শাস্তি হবে কবরে অথবা দোজখে। খাঁটি তওবা করলে বিনা শাস্তিতে জান্নাত লাভ হতে পারে। অপর দিকে আল্লাহ্পাকের করুণাভাজন যাঁরা, তাঁরা তওবা অথবা শাস্তি ব্যতিরেকেই বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেভাবেই হোক শাস্তি ভোগের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপীরা আর পাপী থাকেন না। তাঁরা তখন অলি, নেককার ও মুত্তাকীদের দলভুক্ত হয়ে যান। যদিও অলিগণের সুউন্নত মর্যাদার স্তরে উন্নীত হন না। সিদ্ধান্ত তো শেষ পরিণতিনির্ভরই হওয়া উচিত। তাহলে সাধারণ মানুষ যে সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম– এ কথা বলতে বাধা কোথায়? আল্লাহ্পাকই সমধিক পরিজ্ঞাত।

এই আয়াতে আরো একটি বিষয় জানা গেলো যে, ফেরশতাগণের জ্ঞানভান্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। মনুষ্যজাতির মাধ্যমে তাঁরা জ্ঞানলাভ করতে পারেন। কেউ যদি বলেন, কথাটা ঠিক নয়, কারণ আল্লাহ্পাক অন্যত্র বলেছেন, প্রত্যেক ফেরেশতার পদমর্যাদা ও অবস্থানস্থল সুনির্ধারিত। জবাবে একথা বলা যায় যে, এই আয়াতের মূল মর্ম হচ্ছে এরকম– আল্লাহ্তায়ালার নাম ও গুণাবলীর স্তরে ফেরেশতাদের অধিকতর উন্নতি লাভ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁরা পরম সত্তা (মাকামে জাত) পর্যন্ত উন্নতি করতে পারেন না।

ক্বারী আবু জাফর 'লিল মালা-ইকাতি' এর স্থলে পাঠ করেছেন 'লিল মালা-ইকাতু' অন্য একস্থানে উল্লেখিত কুররব্বিকুম কেও তিনি পাঠ করতেন কুর্‌রব্বুকুম। অন্য ক্বারীগণ উভয় স্থানে যের সহযোগে পাঠ করেছেন।

সুজুদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিনয়। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে মাটিতে মস্তক স্থাপন করা। ফেরেশতাদেরকে যে সেজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, সম্ভবত সে সেজদার মর্ম হবে সেজদায়ে শরিয়াহ। সেজদার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বয়ং আল্লাহ্। আর হজরত আদমের মর্যাদার আধিক্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে হজরত আদমকে নির্বাচিত করা হয়েছে কেবলা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসটিও এই অর্থটি বহন করছে, যেখানে বলা হয়েছে - রসুল স. এরশাদ করেছেন, যখন মানুষ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেজদাবনত হয়, তখন শয়তান এক কোনে যেয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাঁদতে তাকে। বলে, হায় আক্ষেপ! মানুষকে সেজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা সেজদা করে জান্নাত লাভ করছে। আমাকেও সেজদা করতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু আমি করি নাই। এখন জাহান্নামই আমার পরিণাম।
আমি মনে করি, 'লি আদামা' শব্দের 'লাম' অব্যয়টি ইলা (প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– আদমের প্রতি মনোনিবদ্ধ (মোতাওয়াজ্জোহ্) করে আমাকে সেজদা করো। কবি সাহাবী হজরত হাস্‌সান রা. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর প্রশংসাসূচক একটি কবিতায় ইলা অর্থে লাম ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি হচ্ছে–

আলাইসা আউয়ালু মান সাল্লা লি ক্বিবলাতিকুম
ওয়া আরাকান্নাসি বিল কুরআনি ওয়াস্ সুনান

অর্থঃ হজরত আবু বকর কি ওই সকল লোকদের প্রথম নন যাঁরা কেবলামুখি হয়ে নামাজ আদায় করেন। আর তিনি কি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র উপরে সর্বাধিক অভিজ্ঞ নন? কবিতায় 'লি ক্বিবলাতিকুম' শব্দটির লাম ব্যবহৃত হয়েছে ইলা (প্রতি) অর্থে।

হজরত আদম সৃষ্টির প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে ফেরেশতাবৃন্দের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিলো। তাই তওবা হিসেবে তাঁদের দায়িত্বে একটি সেজদা অবধারিত হয়ে যায়। এই সেজদার পরোক্ষ কারণ ছিলেন হজরত আদম। তাই– লি আদামা (আদমের জন্য) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম– আদমের কারণে আমাকে সেজদা করো। এই নিয়মে 'লি আদামা' শব্দের 'লাম' অব্যয়টিকে কারণ বাচক (সবব) হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, সল্লি লি দুলুকিশ্‌শাম্‌স (সূর্য হেলে পড়ার কারণে নামাজ আদায় করো)। এখানেও কারণ হিসেবে 'লাম' ব্যবহৃত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থেও সেজদা শব্দটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনার্থে হজরত আদমের প্রতি সেজদাবনত হও। হজরত ইউসুফ আ. এর ভ্রাতাগণ সেজদার মাধ্যমে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। বাগবী বলেছেন, এই তাফসীরটি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন, হজরত আদমকে সেজদার সময় ফেরেশতারা মাটিতে মাথা রাখেন নি। তাঁরা কিঞ্চিত অবনমিত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন। শেষ নবী মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর সময়ে সেজদার মাধ্যমে অভিবাদনের প্রথা রহিত হয়ে যায়। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সালাম আদান প্রদানের নিয়ম।

আমি বলি, হজরত আদম ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র পবিত্র নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই হজরত আদমের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছিলো অনিবার্য। রসুল পাক স. বলেছেন, যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি সহীহ্।

'ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হলো' এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, সে ছিলো ফেরেশতাদের দলভুত। এ রকম মনে করলে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, সকল ফেরেশতা নিষ্পাপ নয়। অধিকাংশ নিষ্পাপ। মানুষের মধ্যে যেমন অধিকাংশ পাপী। অল্প সংখ্যক নিষ্পাপ। কেউ কেউ বলেছেন, ইবলিস ছিলো জ্বিন সম্প্রদায়ভূত। তবে সে লালিতপালিত হয়েছিলো ফেরেশতাদের সাহচর্যে। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে বসবাস করার কারণে তার প্রতিও ফেরেশতা শব্দটি প্রযোজ্য হতো। এ রকমও বলা যায় যে, ফেরেশতাদের সঙ্গে জ্বিনদের প্রতিও সেজদার হুকুম জারি করা হয়েছিলো। কিন্তু উল্লেখকালে ফেরেশতাদের উল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠদের প্রতি নির্দেশ জারি করলে অধস্তনরাও আপনা আপনি ওই নির্দেশের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। আলাদা করে অধস্তনদের উল্লেখ না করলেও চলে। এ রকম মনে করা যেতে পারে যে, ফেরেশতাদের একাংশ এবং জ্বিনেরা জাতিগতভাবে এক। তাদের মধ্যে রয়েছে কেবল বাহ্যিক পার্থক্য। কেউ অবশ্য এই মতবাদের বিরুদ্ধে ওই হাদিসটি উপস্থাপন করতে পারেন, যেখানে বলা হয়েছে– ফেরেশতাদের সৃষ্টি নূর থেকে, জ্বিনদের সৃষ্টি বিশুদ্ধ আগুন থেকে এবং মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে। হজরত আয়েশা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায়, ফেরেশতা ও জ্বিন সত্তাগতভাবে পৃথক– তবুও একথা বলা সঙ্গত হবে যে, উক্ত হাদিসে জ্বিনদের এক বিশেষ প্রকারের কথা বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে ফেরেশতাদের সত্তাগত পার্থক্য রয়েছে। তারা স্ত্রীও নয়। পুরুষও নয়। তাই তারা বংশবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যশূন্য। বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, নূর (আলো) এবং নার (আগুন) অবিকল এক না হলেও সমগোত্রীয়। পার্থক্য তো শুধু এতোটুকু যে, আগুনের চেয়ে নূর উজ্জ্বলতর। অন্য এক আয়াতে

বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্পাক ও জ্বিনদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে– একথায় সুস্পষ্ট হয় যে, ফেরেশতা এবং জ্বিন মূলত এক। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

ইবলিস আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ অমান্য করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। সে আদমকে সম্মান জানাবে না বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ সত্ত্বেও সে স্বীয় সিদ্ধান্তে অটলই রয়ে গেলো। এভাবে সে হয়ে গেলো অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত। কাফের। আল্লাহ্পাক অন্তর্যামী। শয়তান যে অন্তরে অন্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ছিলো, এই নির্দেশ অমান্য করার পর তার সত্য প্রত্যাখ্যান বা কুফরী সকলের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়লো। অথবা এ রকম হতে পারে, সত্য প্রত্যাখ্যান তার আসল অবস্থা ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশকে অবজ্ঞা করার কারণে সে কুফরী করলো। হয়ে গেলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর সে অহংকারীও। তার অহংকার ছিলো এই– 'আমি তাঁর (আদমের) চেয়ে উত্তম।' অহংকারও কুফরী। কাফেরেরাই অহংকারী হয়ে থাকে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৫

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ ۝

❒ এবং আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে, তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বেহেশতে নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন হজরত আদম। তাঁর কোনো সাথীসহচর ছিলো না। একদিন তিনি যখন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তখন আল্লাহ্পাক তাঁর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করলেন হজরত হাওয়াকে। নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি দেখলেন, তাঁর শিয়রে উপবিষ্ট রয়েছেন এক রূপবতী নারী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? নবাগতা জবাব দিলেন, আমার নাম হাওয়া। আমি আপনার সহধর্মিনী। আল্লাহ্পাক আমাকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেনো আমরা পরস্পরের শান্তির কারণ হই।

আল্লাহ্পাক নতুন নির্দেশ জারি করে বললেন, 'তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো, যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার করো, কিন্তু ওই বৃক্ষটির নিকটে যেয়ো না, যদি যাও তবে তোমরা অন্যায় করবে।' এখানে আদেশের সঙ্গে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। আদেশ ও নিষেধ সংবলিত হুকুমই অধিক শক্তিশালী। ওই বৃক্ষটির ফল ভক্ষণ করা না করার কথা এখানে বলা হয়নি। বৃক্ষটির নিকটবর্তী হওয়ার

বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এখানে শিক্ষণীয় এই যে, নিষিদ্ধতাকে গ্রহণ করা হারাম এবং নিষিদ্ধতার নিকটবর্তী হওয়াও অসমীচীন। নিষিদ্ধ কোনো কিছুর নৈকট্য নিষিদ্ধতা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। আর এই আগ্রহাতিশয্যই মানুষকে শরিয়তের বিধান সম্পর্কে বেখবর করে দেয়। তাই যা গোনাহের নিকটবর্তী করে তা মাকরূহ।

ওই বৃক্ষটি বলতে কোন বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, ওই গাছটি ছিলো গম গাছ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আঙ্গুর গাছ। হজরত ইবনে জুরাইহ বলেছেন, ডুমুর গাছ। হজরত আলী বলেছেন, কর্পুর বৃক্ষ। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞান বৃক্ষ। এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে যে, ওই বৃক্ষটি কি একটিই বৃক্ষ, না ওই প্রজাতির বৃক্ষের মধ্যে একটি।

তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে– এখানে অন্যায়কারী বুঝাতে 'জ্বলেমিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'জ্বলেমিন' শব্দের অর্থ জীবন সংহারক। আর 'জুলুম' শব্দের অর্থ কোনো কিছুকে অপাত্রে স্থাপন করা।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৬

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

❒ কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিলো সেখান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

'ফা আজাল্লা হুমাশ্ শাইত্বনু আনহা' (শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো) – এই বাক্যের 'আনহা' শব্দের 'হা' সর্বনামটি নিষিদ্ধ বৃক্ষটির দিকে সম্পর্কিত হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান ওই বৃক্ষটিকে মনোহররূপে উপস্থাপন করে হজরত আদমের পদস্খলন ঘটালো। সর্বনামটি যদি জান্নাতের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে অর্থ হবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করলো। 'শাতান' শব্দ থেকে শয়তান শব্দটি গঠিত হয়েছে। শাতান অর্থ দূরবর্তী। শয়তানও আল্লাহ্র কল্যাণ ও রহমত থেকে বহু দূরে। শয়তান তো ইতোপূর্বেই বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন পথে সে বেহেশতে পুনঃ প্রবেশ করলো? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাগবী বলেছেন, যখন ইবলিস শয়তান হজরত আদমকে প্রতারণা

করার নিমিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলো, তখন জান্নাতের প্রহরীরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। তখন তার সাহায্যে এগিয়ে এলো সাপ। সাপের সঙ্গে তার পূর্ববন্ধুত্ব ছিলো। সাপও ছিলো জান্নাতের প্রহরী। সাপটি দেখতে ছিলো খুব সুন্দর। উটের মতো তার চারটি পা ছিলো। ইবলিস তাকে বললো, তোমার মুখে করে আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দাও। সাপ রাজি হলো। সে শয়তানকে মুখে করে বেহেশতে নিয়ে গেলো। অন্য প্রহরীরা সাপের এ কারসাজি ধরতে পারলোনা। এভাবে জান্নাতে পৌঁছে গেলো ইবলিস।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীর এবং আবুল আলীয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ্ এবং মোহাম্মদ বিন কায়েসও এরকম বর্ণনা এনেছেন। হাসান বলেছেন, হজরত আদম কোনো কোনো সময় জান্নাতের দরোজায় এসে দাঁড়াতেন। একদিন তিনি যখন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনই তিনি শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হন। বাগবী আরো বলেছেন, হজরত আদম জান্নাত দেখে বলতেন, যে এই জান্নাতে চিরকাল থাকবে সে কতোইনা সৌভাগ্যমন্ডিত। একদিন হজরত আদম ও হজরত হাওয়া যখন জান্নাতে বিচরণ করছিলেন এবং এরকম উক্তি করছিলেন, তখন ইবলিস এসে দাঁড়ালো তাঁদের সামনে। হজরত আদম ও হাওয়া তাকে ইবলিস বলে সনাক্ত করতে পারলেন না। হজরত আদমের কথা শুনে ইবলিস কাঁদতে শুরু করলো। তাকে অঝোর ধারায় রোদন করতে দেখে আদম দম্পতিরও হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। তাঁরা বললেন, তুমি কাঁদছো কেনো? ইবলিস বললো, আমি তোমাদের জন্যই কাঁদছি। সামনে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। তোমরা মারা যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে তোমাদের। শংকিত হলেন আদম দম্পতি। পরিণতির কথা ভেবে মর্মাহত হলেন তাঁরা। ইবলিস ভাবলো, তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর হতে চলেছে। সে বললো, যা হবার তাতো হবেই। তবে আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বাতলে দিতে পারি। ওই যে গাছটি দেখছো। ওই গাছের ফল ভক্ষণ করলে চিরঞ্জীব হওয়া যায়। হজরত আদম শিউরে উঠলেন। বললেন, অসম্ভব! ওই গাছ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ইবলিস বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের শুভাকাংক্ষী। আমার উপদেশের মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই। ইবলিসের কসম শুনে তাঁরা দোদুল্যচিত্ত হলেন। ভাবলেন, আল্লাহ্র কসম করে তো কেউ মিথ্যা বলতে পারে না। হজরত হাওয়া অগ্রবর্তীনি হলেন। মৃত্যু থেকে মুক্তিচিন্তা তখন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, স্বামীকেও খাওয়ালেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন, হজরত হাওয়া তাঁর স্বামীকে শরাব পান করিয়েছিলেন, তখন হজরত আদম ছিলেন নেশাগ্রস্ত। ওই অবস্থায় হজরত হাওয়া তাঁকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দু'জনে মিলে ওই গাছের ফল খেয়েছিলেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হজরত কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে বললেন, আমি জান্নাতের যে সমস্ত নেয়ামত তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিলাম, ওগুলোই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিলো না? নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তোমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট গমন করলে কেনো? হজরত আদম আরজ করলেন, বারে এলাহী। আমি জানতাম না যে, কেউ তোমার নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বর্ণনা করেন, আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! এমন করলে কেনো? তিনি নিবেদন করলেন, হে মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর! আমি হাওয়ার কথায় প্ররোচিত হয়েছিলাম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন, আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করলাম। তাকে গর্ভধারণের কষ্ট পেতে হবে। আর পেতে হবে প্রতি মাসের ঋতুস্রাবের বিড়ম্বনা। নির্দেশ শুনে কাঁদতে শুরু করলেন হজরত হাওয়া। আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার ও তোমার কন্যাদের জন্য কান্নাকেই অবলম্বন করে দেয়া হলো।

এরপর এরশাদ হচ্ছে, 'আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে পৃথিবীতে নেমে যাও। সেখানে তোমাদেরকে কিছুকাল জীবনোপকরণসহ বসবাস করতে হবে।' বাগবী হজরত ইকরামা থেকে এবং তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে— রসুল স. সাপ দেখলেই মেরে ফেলার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, যারা ভীতিপ্রদ হয়ে সাপ মারা থেকে বিরত থাকবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, মদীনাবাসী জ্বিনদের একটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমরা সাপ দেখলে তিনবার সেটিকে পলায়নের সুযোগ দাও (কারণ, ওই সাপ মুসলমান জ্বিনও হতে পারে)। তোমাদের সুযোগ গ্রহণ না করলে তাকে মেরে ফেলো। কেনোনা সে হচ্ছে শয়তান।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৭

فَتَلَقّٰىٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

❑ অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

আল্লামা ইবনে কাসীর 'ফাতালাক্কা আদামা' বাক্যাংশটির আদামা শব্দটিকে মানসুব এবং 'কালিমাতিন' শব্দটিকে মারফু করে পড়েছেন। এভাবে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে— আদমের নিকট তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কতিপয় বাক্য আগমণ করলো। এই বাক্যাবলী ছিলো হজরত আদমের তওবা গৃহিত হওয়ার কারণ।

অন্য ক্বারীগণ আদামাকে মারফু এবং কালিমাতিনকে মানসুব করে পড়েছেন। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে-হজরত আদম আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখে নিলেন। বাক্যসমূহ হচ্ছে– রব্বানা জ্বলামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লামতাগফিরলানা ওয়াতার হামনা লা নাকুনান্না মিনাল খসিরিন' (হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আত্মঅত্যাচারী। আর তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করো, দয়া না করো, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত হবো)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, হজরত আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে নেমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানাহার করেন নি। একশ বছর পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন পরস্পর বিচ্ছিন্নাবস্থায়। আর তাঁরা কেঁদেছিলেন দু'শ' বছর ধরে। ইউনুস বিন হাব্বাব এবং আলকামা বিন মারসাদ বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের চোখের পানি একত্র করলেও হজরত দাউদ আ. এর চোখের পানির সমান হবে না এবং হজরত দাউদ ও পৃথিবীবাসীদের চোখের পানি একত্র করলেও সেই চোখের পানির চেয়ে হজরত আদমের চোখের পানি হবে অধিক। শহর বিন হাউসাব বলেছেন, আমার নিকট এই সংবাদটি পৌছেছে যে, হজরত আদম তার ভ্রান্তির লজ্জায় তিনশ' বছর যাবত মাটি থেকে মস্তক উত্তোলন করেননি।

এরপর বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন'—এর অর্থ তওবা কবুল করলেন। তওবা অর্থ অপরাধের স্বীকারোক্তি, লজ্জা এবং অপরাধের পুনঃসংঘটন না করার দৃঢ়সংকল্প। আয়াতে কেবল হজরত আদমের তওবা গৃহীত হওয়ার বিবরণ দেখা যায়। তবুও স্বাভাবিকভাবে একথা মেনে নেয়াতে কোনো বাধা নেই যে, হজরত হাওয়াও এ সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন মজীদের অন্য সকল স্থানেও এরকম করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে কেবল পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে নারীরাও রয়েছেন সেই সম্বোধনভূতা।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, 'ইন্নাহু হুয়াত্তাউয়াবুর রহীম' অর্থ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু। তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। শব্দটি যদি বান্দার সাথে সম্পর্কিত হয় তবে অর্থ হবে, পাপবিমুখ হওয়া বা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে, পাপ ক্ষমা করা এবং পাপের জন্য শাস্তি নির্ধারণ না করা।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৮

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

❒ আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

নির্দেশ হয়েছে- তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। এরকম নির্দেশ আগেও একবার করা হয়েছে (আয়াত ৩৬)। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ইতোপূর্বের নির্দেশে জান্নাত থেকে আকাশে নেমে আসতে বলা হয়েছিলো। পরের নির্দেশটি ছিলো আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার। কেউ কেউ বলেছেন, একই নির্দেশ ছিলো আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার। কেউ কেউ বলেছেন, একই নির্দেশকে গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য দুইবার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। অথবা এ রকমও হতে পারে যে, প্রথম নির্দেশটি ছিলো শাস্তিমূলক এবং পরের নির্দেশটিতে ছিলো পৃথিবীতে নেমে এসে খেলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব প্রতিপালন করবার তাগিদ।

সকলেই নেমে যাও– একথার অর্থ এই নয় যে, সকলে সম্মিলিত হয়ে নেমে যাও। 'জামিয়া' শব্দ প্রয়োগের অর্থ হবে, নেমে যাওয়ার নির্দেশটি কেবল সকলের উপরে প্রযোজ্য।

'ফাইম্মা ইয়াতিইয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা' (পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে) – এখানে 'ফা' অব্যয়টি সংযোজক হিসেবে এবং 'ইন' অব্যয়টি হরূফে শর্ত হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং 'মা' শব্দটি এসেছে গুরুত্ববাহী হিসেবে। এই নিয়মেই 'ইয়াতি' ক্রিয়ার সঙ্গে নুন সাকিন যোগ করা বিশুদ্ধ হয়েছে। অন্যথায় এতে তলবের অর্থ নাই। ওই সকল ক্রিয়ার সঙ্গে নুন সাকিন যুক্ত হয় যার মধ্যে তলবের অর্থ নিহিত থাকে।

'হুদা' (সৎপথের নির্দেশ) – এর অর্থ, নবী এবং কিতাব। আর 'তোমাদের নিকট' একথা বলে সকল আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা তখন হজরত আদম আ. এর পৃষ্ঠদেশে ছিলেন।

'ফামান তাবিআ হুদাইয়া' (যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে)। এখানে 'মান' শব্দটি শর্তযুক্ত। এই শব্দ প্রয়োগের কারণে বাক্যটির অর্থ হবে-- আগের কথাটি (সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে) সম্ভাব্য অর্থাৎ সৎপথের নির্দেশ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন পূর্বের বাক্যটির অর্থ এভাবেই সুস্পষ্ট হবে যে, রসুল ও কিতাব প্রেরণে তিনি বাধ্য নন। বরং রসুল ও কিতাব প্রেরণ সম্পূর্ণতঃই তাঁর দয়া ও ইচ্ছা নির্ভর।

বায়যাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক 'হুদা' শব্দটি বারবার উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বনামের ব্যবহার করেননি। কারণ, প্রথম হুদা সাধারণ অর্থে এবং পরের হুদা (রসুল ও কিতাব) বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। এই বিশেষ হুদা শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে সম্বন্ধিত।

'তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'— অর্থাৎ যাঁরা সৎপথানুসারী তাঁদের আশংকা বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাই তাঁরা চিন্তাগ্রস্ত হবে না, সন্তপ্তও হবে না। এই অবস্থাটি ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানের কথা নয়। তাই অর্থ হবে এ রকম— পারলৌকিক শাস্তির বিষয়ে তাঁরা হবেন শংকাবিমুক্ত। অথবা প্রিয়বস্তু হারানোর ব্যাপারে তাঁরা থাকবেন সন্তাপহীন। এভাবে সৎপথানুসারীদের সওয়াব প্রাপ্তি এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতির কথাই এখানে বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৯

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারাই অগ্নিবাসী - সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে'— একথার অর্থ, যারা আমার হেদায়েত সম্পর্কে উদাসীন। অথবা হেদায়েতের অস্বীকারকারী। আর 'নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে'— অর্থ যারা আমার অবতীর্ণ আয়াত সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করে। অর্থাৎ কোরআন এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে— তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তাদের এই অধিবাস হবে চিরস্থায়ী। সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসার ক্ষমতাও তাদের থাকবে না।

এ পর্যন্ত আলোচনায় তিনটি বিষয় পরিষ্কাররূপে জানা গেলো। ১. বেহেশত সৃজন করা হয়েছে। ২. বেহেশতের অবস্থান উর্ধ্বস্তরে। ৩. কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিদের শাস্তি চিরস্থায়ী। কস্মিনকালেও তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। এ আলোচনা থেকে হশিভিয়া সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে যে, নবীগণ নিষ্পাপ নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে—হজরত আদম নবী হওয়া সত্ত্বেও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি নিষ্পাপ থাকেন কি করে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিদ্বানগণ তাদের অসৎ অভিমতের মূল্যোৎপাটন করেছেন এভাবে— ১. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিলো বেহেশতে। তিনি তখন নবী ছিলেন না। নবী রসুলদের প্রয়োজন তো হয় পৃথিবীতে, বেহেশতে নয়। ২. নিষিদ্ধকর্মটি ছিলো তানযিহি (অনুত্তম), সম্পূর্ণ হারাম বা দৃঢ়নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু বিনয় ও ভালোবাসা বশতঃ এই অনুত্তম কার্যটিকেই তিনি কবীরা গোনাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই নিজেকে তিনি জালিম (আত্মঅত্যাচারী) এবং খসির (ক্ষতিগ্রস্ত) মনে করেছিলেন। ৩. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল তিনি ভক্ষণ করেছিলেন ভুলবশতঃ, পূর্বসংকল্পবদ্ধ হয়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ

করেছেন, 'অতঃপর আদম ভুলে গিয়েছে। আমি তার ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকর পাইনি।' তাঁর এই ভুলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতটি ছিলো এই–আল্লাহ্‌র নামে কসম দেয়াতে তিনি ইবলিসকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। যদিও এটা দুর্বলতা, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসমের কারণেই এই দুর্বলতাটি প্রশ্রয় পেয়েছিলো। তাই ঘটনা সংঘটনের পরমুহূর্তেই তিনি ক্ষমা প্রার্থী হতে পেরেছিলেন। শরাব পানের ব্যাপারটিও আরেকটি কারণ। শরাবের প্রতিক্রিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই তিনি তখন সচেতন ছিলেন না। অবশ্য এখানে আরেকটি জটিলতা দেখা দিতে পারে। সেটি হচ্ছে - ভুলবশতঃ যদি এরকম হয়ে থাকে, তবে তিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক ভর্ৎসিত হলেন কেনো? জবাবে বলা যায়, ভুলও তাঁর মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় ছিলো না। তাই সতর্ক না থাকার কারণে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। ভুলে যাওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষমার্হ। কিন্তু নবীগণের পক্ষে তা শোভনীয় নয়, যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যভাজন। এমনও হতে পারে যে, ভুলের জন্য অভিযুক্ত না হওয়া কেবল হজরত মোহাম্মদ স. এর উম্মতগণের বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি এই সুরার শেষে সবিস্তারে আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ্‌তায়ালা।
৪. হজরত আদমের ভুলটি ছিলো ইজতিহাদি (বুদ্ধিবৃত্তিক) ভুল, ইমানি বা বিশ্বাসগত ভুল নয়। তিনি হয়তো তাহরিমীকে তানযিহি ভেবে থাকবেন। 'হাজিহিশ্‌শাজারা' বলতে তিনি একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষকেই বুঝেছিলেন। ওই গাছের ফল তিনি খাননি। ওই প্রকৃতির অন্য একটি গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। তিনি একথা বুঝতে পরেননি যে, ওই জাতীয় সকল গাছই এই নিষেধাজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত। হজরত আদমকে অপরাধী হিসেবে তিরস্কার করা হয়নি। তিনি নিজেকে অপরাধের কারণ হতে দিয়েছিলেন বলেই তিরস্কার করা হয়েছিলো। যেমন ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশতঃ যে কোনো উদ্দেশ্যে বিষ পান করা হোক না কেনো, জীবনহানীই হবে তার সাধারণ পরিণতি।

এই সুরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌পাক তাওহীদ ও রেসালতের প্রমাণপঞ্জি বর্ণনা করেছেন। মানুষের বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি সম্বোধন করে কিছু বলা হয়নি। সকল মানুষই এ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সম্বোধনস্থল। মানুষকে সাধারণভাবে যে সকল নেয়ামত দেয়া হয়েছে– এ যাবত সে সম্পর্কে আলোচনা চলে এসেছে। এখন সম্বোধন করা হচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে, যারা আল্লাহ্‌তায়ালার বহু নেয়ামত লাভ করেছে। তাদেরকে সম্বোধন করার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সুরাটি মাদানী (মদীনায় অবতীর্ণ)। ওই সম্প্রদায়ের অনেকেই মদীনাবাসী ছিলো। অনেক বিদ্বানও ছিলো তাদের মধ্যে। মদীনার অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের মতো প্রাধান্যের অধিকারী ছিলোনা। তাদের না ছিলো শিক্ষা। না ছিলো বুদ্ধির দীপ্তি। তাই তাদেরকে লক্ষ্য করা হয়েছে একারণে যে, তারা সম্বোধিত হলে অন্য সম্প্রদায়গুলোও স্বভাবতঃই উৎকর্ণ হয়ে পড়বে। সেই

বনী ইসরাইল বা ইহুদীরা যদি সত্য গ্রহণের দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, তবে অন্যেরাও দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাই এরশাদ হচ্ছে –

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪০

يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

❑ হে বনী ইস্রাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি; এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

বনী ইসরাইলের বনী শব্দটি মূলে ছিলো ইব্নুন্। এর বহুবচন হচ্ছে বানিন। সমার্থক শব্দ হচ্ছে বেনা। ইবন গঠিত হয়েছে বেনা থেকে– যার অর্থ ভিত্তি স্থাপন অথবা নির্মাণ। যেহেতু পিতাই পুত্রের ভিত্তি। সুতরাং বনী ইসরাইল অর্থ ইসরাইলের পুত্র বা পুত্রগণ। হজরত ইয়াকুব আ. এর উপনাম ছিলো ইসরাইল। শব্দটি হিব্রু। এর অর্থ আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র বান্দা। ইসরা অর্থ বান্দা এবং ইল অর্থ আল্লাহ্। কেউ কেউ বলেছেন, ইসরাইল অর্থ আল্লাহ্‌র মনোনীত। ক্বারী আবুজাফর ইসরাইল শব্দটি হামজা ব্যতীতই পাঠ করতেন।

'উয্কুরু' অর্থ স্মরণ করো। স্মরণ বা জিকিরের মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। কিন্তু মুখের উচ্চারণকেও জিকির বলা যেতে পারে একারণে যে, মুখ হচ্ছে মনের মুখপাত্র। মুখের স্মরণ বা উচ্চারণ যদি সত্য হয়, তবে তা মনের স্মরণ বা উচ্চারণকেই প্রতিপন্ন করবে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, উয্কুরু অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রকারান্তরে নেয়ামতেরই স্মরণ। হাসান বলেছেন, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করাই জিকির।

নি'মাতি (অনুকম্পা) শব্দটি একবচন। কিন্তু শব্দটি বহুবচন হিসেবেও ব্যবহারোপযোগী। এই আয়াতে শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত নেয়ামত একটি ছিলো না, ছিলো অজস্র।

সে অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যদ্দারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি– একথা বলে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক অন্য সম্প্রদায়কে প্রদত্ত নেয়ামতের কথা এখানে উল্লেখ করেননি, যাতে করে তারা পরশ্রীকাতরতার দিকে ধাবিত হতে পারে। কারণ, অন্যকে প্রদত্ত নেয়ামত হিংসা দ্বেষ এর উদ্রেক করতে পারে। নিজে প্রাপ্ত নেয়ামতের স্মরণই মানুষের কৃতজ্ঞচিত্ত

হওয়ার প্রধানতম কারণ হতে পারে। বনী ইসরাইলকে কি কি নেয়ামত দেয়া হয়েছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। হজরত কাতাদা বলেছেন, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রদত্ত নেয়ামতগুলো হচ্ছে– ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি ফেরাউনের দলকে সলিল সমাধি দান। সাগরের মধ্য দিয়ে পথযাত্রার সুযোগ করে দেয়া। মরুভূমিতে মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি। অন্য তাফসীরকারক বলেছেন, এখানে সকল নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে– যা তারা ও অন্য সকল সম্প্রদায় লাভ করেছে।

আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো– এখানে অঙ্গীকার পূর্ণ করো অর্থ ইমান গ্রহণ করো ও অনুগত হও। 'আর আমিও তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার পূর্ণ করবো' একথার অর্থ ইমান ও আনুগত্যের বিনিময়ে আমিও তোমাদেরকে অধিক অনুগ্রহ দানে ধন্য করবো। অঙ্গীকার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অঙ্গীকারগ্রহণকারী এবং অঙ্গীকারগ্রহীতা দু'জনেই। এখানে অঙ্গীকার গ্রহণকারী স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক। তিনি বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে প্রতিদান প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি হিসেবে ইবনে জারীর বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেছেন– এই আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। অর্থাৎ হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রতি ইমান আনো। যদি এ রকম করো, তবে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবো। তোমাদের প্রতি আরোপিত কঠিন বিধানগুলো সহজ করে দেবো।

বনী ইসরাইলদের প্রতি আরোপিত বিধানসমূহ ছিলো অত্যন্ত কঠিন। যেমন– শরীরে বা কাপড়ের যে স্থানে নাজাসাত (অপবিত্রতা) লাগবে, সে স্থান কেটে ফেলে দিতে হবে। বাগবী উল্লেখ করেছেন, কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসা আ. এর মাধ্যমে বনী ইসরাইলের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি ইসমাইলের বংশে একজন উম্মী (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী) নবী প্রেরণ করবো। তোমাদের মধ্যে যে তাঁর অনুগামী হবে, তাঁর আনীত জ্যোতিকে স্বীকার করবে, আমি তার সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবো। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দ্বিগুণ প্রতিদান দানে ধন্য করবো।

আল্লাহ্‌পাকের কালামের কোন্ কোন্ স্থানে এই অঙ্গীকারকে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কালাবী আরো বলেছেন, অঙ্গীকার সম্পর্কিত একটি আয়াত হচ্ছে এই– 'ওয়া ইজ আখজাল্লাহু মিছাক্বাল্লাজিনা উতুল কিতাব' (সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্‌পাক আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন)।

আমি বলি, ওই আয়াতটি ছিলো অঙ্গীকার সম্পর্কিত, যা হজরত মুসার জবাবের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক বলেছিলেন। সেটি হচ্ছে–'রব্বি লাও শি'তা আহ্লাকতাহুম মিন ক্বলু' থেকে 'ইনদাহুম ফিত্তাওরাতি ওয়াল ইনজিল..' পর্যন্ত।

মুজাহিদ বলেছেন, অঙ্গীকারের মর্ম বিবৃত হয়েছে সুরা মায়িদার ওই আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্পাক বনীইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা মনোনীত করলাম।' আল্লাহ্পাক বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি– যদি তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো, আমার নবীর উপর ইমান আনো, তাকে সাহায্য করো এবং আল্লাহ্পাককে করজে হাসানা দাও। এ রকম করলে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্ সমূহ মাফ করে দেবো। তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সত্যবিমুখ হয়, তবে সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

হাসান বলেছেন, সুরা বাকারার এই আয়াতটি হচ্ছে অঙ্গীকারের আয়াত–'আর আমি যখন তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। আর তোমাদের উপর উত্তোলন করলাম পাহাড়, (বললাম) তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, আর তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণে রেখো– এ রকম করলে তোমরা নিষ্কৃতি পাবে।

হাসানের অভিমতানুসারে বুঝা যায়, বনী ইসরাইলকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছিলো, তা হচ্ছে হজরত মুসা আ. এর শরিয়ত। আমি বলি, উল্লেখিত মতামত সমূহ প্রকৃত পক্ষে এক। এ প্রসঙ্গে হাসান, কাতাদা, কালাবী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি সমপ্রকৃতির। কাতাদা ও মুজাহিদের বক্তব্যে বলা হয়েছে, আমার নবীগণের উপরে ইমান আনয়ন করো। এ কথার মধ্যে রয়েছে হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনার প্রসঙ্গটিও। কারণ, তিনিও নবীগণের মধ্যে একজন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের অভিমতও এ রকমই। হাসানের বক্তব্য হচ্ছে, অঙ্গীকারের অর্থ তওরাতের বিধান (হজরত মুসার শরিয়ত)। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, তওরাতের বিধানেও হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনতে বলা হয়েছে। অতএব মতামতগুলির মধ্যে আর কোনো ভিন্নতাই রইলো না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো'। এখানে 'ফারহাবুন' শব্দের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আমার সঙ্গে কৃতপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম এবং আমার সকল আদেশ নিষেধ সম্পর্কে ভয় করো। যেখানে বিরত থাকা ও রক্ষা পাওয়ার কথা আছে, যেখানে ভয়কে প্রকাশ করা হয়– সেখানেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভয়কে সুনির্দিষ্টকরণের জন্য এই শব্দটি উপযোগী। তাই অর্থ হয়েছে এ রকম– শুধু আমাকেই ভয় করো (অন্য কাউকে নয়)। 'ইয়্যাকা না'বুদু' (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি) বাক্যটির চেয়েও এখানে ব্যবহৃত বাক্যটি অধিক সুর্নির্দিষ্ট। এই বাকভঙ্গির মাধ্যমে যেনো মূল বক্তব্যটি ছিলো এ রকম– 'যদি তোমরা ভয়ার্ত হও তবে শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো'– অতএব আমাকেই ভয় করো। এই বাক্যটি সুনির্দিষ্টকরণের কল্যাণবহ (উদ্দেশ্য

সংবলিত)। 'ইয়্যাকা না'বুদু' বাক্যে এতোবেশী কর্মের সমাবেশ ঘটেনি। এখানে অঙ্গীকার, তিরষ্কার উভয়টি সম্মিলিত। যেনো বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো। পূণ্য ও প্রতিদান দেবো– এটা হচ্ছে অঙ্গীকার। আর আমাকে ভয় করো–এটা হচ্ছে তিরস্কার। আরো রয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপরিহার্যতা ও অঙ্গীকার পূরণের অনুপ্রেরণা। এ আয়াত দ্বারা একথা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ভয়ে ভীত হবে না।

যে সমস্ত শব্দে 'ইয়া' অক্ষরটি উহ্য থাকে সেগুলোকে ক্বারী ইয়াকুব লেখার সময় স্পষ্ট করে দেখাতেন। কোরআন মজীদে এ ধরনের ইয়া রয়েছে একষট্টিটি। ক্বারী ওয়ারশের বর্ণনায় রয়েছে- নাফে' বলেছেন, সাতচল্লিশটি। কালুনের মতে বিশটি। কালুনের বর্ণনার দু'টি স্থান মতানৈক্যমন্ডিত। সে দু'টি স্থান হচ্ছে আত্তালাক এবং আত্তানাদ। আল্লামা ইবনে কাসীর ওয়াসল (মিলিতাবস্থায়) হোক অথবা ওয়াক্ফ (থেমে যাওয়া অবস্থায়) হোক, উভয় অবস্থায়– এ রকম স্থান নির্ধারণ করেছেন একুশটি। ছয়টি স্থানে অবশ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে ছয়টি স্থান হচ্ছে– ১. সুরা ইব্রাহিমের তাকাব্বাল দোয়ায়ি ২. সুরা ক্বমারের 'ইয়াদ্দায়ি'– এখানে তিনি ইয়াদউ এর ওয়াওকেও বহাল রাখেন ৩. সুরা ফজরের 'আকরামানী' ৪.আহানানী ৫. সুরা ইউসুফের 'ইন্নাহু মাই ইয়াত্তাক্বি' ৬. সুরা ফজরের ইউস্‌রি। ক্বারী বাজা প্রথম পাঁচটি ক্ষেত্রে মিলিতাবস্থায় এবং থেমে গেলে লেখার সময় 'ইয়া' উল্লেখ করেছেন। ক্বারী কানাবাল 'মাইইয়াত্তাক্বি' শব্দে মিলানো ও থেমে যাওয়া উভয়াবস্থায় 'ইয়া'কে উল্লেখ করেছেন। আর 'ইউস্‌রি' শব্দটিতে উল্লেখ করেছেন মিলিতাবস্থায়। এ সম্পর্কে তার বিপরীত মতও দেখা যায়। চৌত্রিশটি স্থলে ক্বারী আবু আমর মিলিতবস্থায় 'ইয়া' উল্লেখ করেছেন। 'আকরামানি' এবং 'আহানানী' শব্দ দু'টিতে 'ইয়া' উল্লেখ করা না করা উভয় প্রকারের সুযোগ রয়েছে। ক্বারী কাসায়ী সুরা হুদের 'ইয়ামা ইয়া'তি' এবং সুরা কাহাফের 'মা কুন্না নাবগি' এর মধ্যে ইয়া উল্লেখ করেছেন। এদু'টি ভিন্ন অন্য স্থানে তিনি 'ইয়া' উল্লেখ করেননি। ক্বারী হামজা 'তাকাব্বাল দোয়ায়ি'তে কেবল মিলিতাবস্থায় এবং সুরা নমলের 'আতুমিদ্দুনানি'তে সম্মিলিত এবং যতি, দুই অবস্থাতেই 'ইয়া' ব্যবহার করেছেন। ক্বারী আসেম সকল ক্ষেত্রেই 'ইয়া'কে লুপ্ত করেছেন। দু'টি ক্ষেত্রে অবশ্য তার সম্পর্কে ভিন্নতর বর্ণনা পাওয়া যায়। ১. 'ফামা আতানিয়াল্লাহু'তে সংযুক্তাবস্থায় (ক্বারী হাফ্স এই 'ইয়া'কে জবরযুক্ত করেছেন এবং যতিপাতের সময় করেছেন সাকিনযুক্ত)। ২. সুরা জুখরুফের 'ইয়া ইবাদি'তে সম্মিলিত অবস্থায়। ক্বারী আবু বকর এই 'ইয়া'কে জবরযুক্ত অবস্থায় পাঠ করতেন এবং সাকিনযুক্ত অবস্থায় পাঠ করতেন থেমে পড়লে। ক্বারী শোবা প্রথমস্থলে অর্থাৎ 'ফামা আতানিয়াল্লাহু'তে 'ইয়া' উল্লেখ করেন। ক্বারী হাফ্স 'ইয়া-ইবাদি'তে 'ইয়াকে' উল্লেখহীন রাখেন। ইবনে আমের হিসামের বর্ণনানুযায়ী সুরা

আরাফের 'ছুম্মা কিদুনি' শব্দে 'ইয়া' উল্লেখ করেন। ইবনে জাকওয়ানের বর্ণনা মোতাবেক সুরা কাহাফের 'ফালা তাসআল্নি' শব্দে ইয়ার উল্লেখ বলবৎ রাখেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪১

وَاٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلۡتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُوۡنُوۡۤا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشۡتَرُوۡا بِاٰيٰتِىۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوۡنِ ○

❒ তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই উহার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিওনা। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

তোমাদের কাছে যা আছে— এ কথার অর্থ তওরাত ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুসারী যদি কেউ হয়, তবে সে কোরআন মজীদেরও অনুসারী হবে। তাই আল্লাহ্পাক কোরআনকে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস করো।' পূর্বের আয়াতে বর্ণিত অঙ্গীকার পূর্ণ করার আহবানের সঙ্গে এই আহবানের সংযোগ রয়েছে। পূর্বের আয়াতে সাধারণভাবে ইমানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিলো। আর এই আয়াতে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে কেবল কোরআনের প্রতি ইমান আনতে বলা হয়েছে। তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সত্য। কোরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহও সত্য। তওরাত ও ইঞ্জিলে ছিলো বিভিন্ন সত্য কাহিনী। হজরত মোহাম্মদ স. এর আগমনের সংবাদ, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ, পুনরুত্থান দিবস প্রসঙ্গ, কল্যাণের প্রতি আহবান, অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কিত সংবাদ, তাওহীদ বিষয়ক আলোচনা, সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ ইত্যাদি। কোরআন মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে, তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত বিষয়াবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে, যেহেতু পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ এবং বর্তমানের কোরআন আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন, তাই তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি কোরো না— তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না। বরং প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। যেমন হয়েছিলেন মক্কার ইহুদী আলেম ওরাকা বিন নাওফেল। তিনি প্রথম অহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মক্কার কাফেররাই তো প্রথমে কোরআন শরীফকে অস্বীকার

করেছে, তবু মদীনার ইহুদীদেরকে প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছে কেনো? জবাবে বলা যায়, মক্কার প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো মুশরিক। তারা গ্রন্থধারী (আহলে কিতাব) ছিলো না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তোমরা তো আহলে কিতাব (গ্রন্থধারী)। তোমরা যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে গ্রন্থধারীদের মধ্যে প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হবে।

আমি বলি, 'প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী'– এ কথার মর্ম হচ্ছে, তোমরাই প্রত্যাখ্যানের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ কোরো না। তোমরা গ্রন্থধারী, নেতৃস্থানীয়। সাধারণ জনেরা তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সত্য থেকে দূরে সরে পড়বে। সুতরাং তোমরা অন্যদের অথবা পরবর্তীদের সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রথম কারণ হয়ো না। জনতা সাধারণত নেতার অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং সত্যানুসরণে প্রথমে তাদেরই এগিয়ে আসা উচিত। আলেমগণ দ্বীনের নেতা, কাজেই প্রথমে তাদেরকেই হতে হবে সৎকর্মপরায়ণ। এ প্রসঙ্গে রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, সাবধান! আমলহীন আলেম নিকৃষ্টতম। হাদিসটি ইমাম দারেমী আহ্ওয়াস বিন হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আহ্ওয়াস বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতার নিকট থেকে। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– তোমরা তোমাদের অনুসারীদের কুফরীর কারণ হয়ো না। অন্যথায় তাদের পুঞ্জীভূত পাপ তোমাদেরই স্কন্ধে এসে পড়বে।

'আউয়ালা কাফিরিন' (প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী) – এ কথায় বহুবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাঁড়াবে, প্রথম প্রত্যাখ্যানকারীদের দল। তখন কথাটির উদ্দেশ্য হবে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ প্রথম কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) হয়ো না। যেমন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে অলংকৃত করেছে। এ কথার ব্যাখ্যা হবে এই যে, আমাদের প্রত্যেককে একেকটি অলংকার বা ভূষণ দ্বারা সজ্জিত করেছে।

'আউয়াল' শব্দটি এমন একটি বিশেষ্য যার ক্রিয়া হয় না। কেউ কেউ বলেন, 'আউয়াল' শব্দটি মূলতঃ আউআলা। 'ওয়াআলা' শব্দটি 'সাআলা' এর ওজনে গঠিত। দ্বিতীয় হামজাটি এখানে রীতিবিরুদ্ধভাবে 'ওয়াও' করা হয়েছে। অথবা মূল শব্দটি ছিলো- আ আউয়ালা। এরপর ওয়াও স্থাপন করে ইদ্গম করা হয়েছে। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি কা'ব বিন আশ্রাফ ও অন্যান্য ইহুদী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ কোরো না– এ কথার অর্থ আমার আয়াতের প্রতি ইমানের বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ গ্রহণ কোরো না। অথবা অর্থ হবে এরকম– তওরাতের ওই সকল আয়াতের বিনিময়ে পার্থিব বৈভব গ্রহণ কোরো না, যেগুলোতে রসুল পাক স. এর গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে।

স্বল্পমূল্য অর্থ পার্থিব সম্পদ। পরিমাণে যতোবেশী হোক না কেনো, আখেরাতের অফুরন্ত বৈভবের তুলনায় পৃথিবীর বৈভবরাশি একেবারেই তুচ্ছ।

আয়াতটির শানে নুজুল হচ্ছে– ইহুদী আলেম ও নেতাদের নিকট অনেক মূর্খ মানুষের সমাগম হতো। আলেম ও নেতাদের বার্ষিক বেতন বা খাজনা হিসেবে তাদেরকে অনেক কিছু দিতে হতো। ফসল, চতুষ্পদ জন্তু, নগদ অর্থ অনেক কিছুই দিতে হতো তাদেরকে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখে আলেম ও নেতারা এই ভেবে শংকিত হলো যে, আমরা যদি তওরাত থেকে প্রাপ্ত মোহাম্মদ স.এর গুণাবলীর বিবরণ প্রকাশ করি এবং তাঁর অনুগত হই, তবে আমাদের এই সহজ অর্থাগম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আশংকায় তারা দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিলো। তওরাতে বর্ণিত রসুল পাক স.এর গুণাবলীর বিবরণ বিকৃত করে ফেললো। মুছে ফেললো তাঁর পবিত্র নাম। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো'– এ কথার অর্থ জাগতিক মোহ পরিত্যাগ করো। যথামূল্য প্রদান করো পারলৌকিতাকে। পূববর্তী আয়াতে সাধারণভাবে সকল ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। তাই আল্লাহ্‌কে ভয় করার কথা বলা হয়েছিলো– 'ফারহাবুন' শব্দের মাধ্যমে। যেহেতু 'রহবাত' হচ্ছে তাকওয়ার প্রাথমিক পর্যায়। এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাত্তাকুন'। বিশেষভাবে আলেমদের প্রতি আহবান করা হয়েছে বলে প্রকৃত ও পরিণত ভয় বা সাবধানতা বুঝাতে এখানে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ

❐ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিওনা এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।

❐ তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং যাহারা অবনত হয় তাহাদের সহিত অবনত হও।

'লিবাস' অর্থ একত্রীকরণ। আয়াতে সত্যের সাথে মিথ্যার একত্রীকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে– এক কথার সঙ্গে অপর কথা এভাবে মিশ্রিত কোরো না, যাতে করে সত্য মিথ্যার পার্থক্যরেখা মুছে যায়। আয়াতের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, হে বনী ইসরাইল! তওরাতে শেষ নবীর বৈশিষ্ট্যাবলীর যে বিবরণ আমি অবতীর্ণ করেছি, তা বাতিলের সাথে মিশিয়ে ফেলো না। নিজ হাতে এর বিকৃতি সাধন থেকে বিরত হও। হজরত মুকাতিল বলেছেন, তওরাতে মহাবিশ্বের গৌরব ও সৌরভ হজরত মোহাম্মদ স. এর সার্বিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া ছিলো। তার

মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিপরীত নয়, এরকম কিছু গুণকে তারা স্বীকার করেছে; যাতে করে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে না হয়। অন্য বিবরণগুলোকে তারা গোপন করেছে, যাতে করে তাদের পার্থিব স্বার্থ বহাল থাকে। 'ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল' এ কথা বলে তাদের এই অসৎ উদ্যোগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, জেনে শুনে সত্য গোপন কোরো না। ওয়া তাকতুমুল হাক্ব (সত্য গোপন কোরো না) – এ কথায় 'লাম' প্রবিষ্ট হওয়াতে জযমযুক্ত হয়েছে। অথবা 'ওয়াও' এর পরে 'আন' উহ্য থাকার কারণে জবর সংযুক্ত হয়েছে। শেষোক্ত নিয়মে অর্থ দাঁড়াবে এরকম– সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ এবং সত্য গোপন, এ দু'টোকে তোমরা একত্র কোরো না। 'জেনে শুনে'– একথার অর্থ, তোমরা এটা ভালো করেই জানো যে, মোহাম্মদ স. সত্য নবী। তবুও সত্য গোপন করছো। এবং বিষয়টিকে উত্তম মনে করছো। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও জঘন্য। তোমরা যদি অজ্ঞ হতে, তবে একটা কথা ছিলো। বলতে পারতে, আমাদের নিকট সত্য মিথ্যা নির্দেশক কোনো সংবাদ পৌঁছেনি। কিন্তু এ রকম কোনো ওজরাপত্তি পেশ করার সুযোগও তোমাদের নেই। সুতরাং দুঃসাহসিকতা পরিত্যাগ করো।

'সালাত কায়েম করো ও জাকাত দাও'– একথার অর্থ, মুসলমানেরা যেভাবে নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয়, তোমরাও সেই নিয়মে নামাজ আদায় করো ও জাকাত দাও। একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, অবিশ্বাসীদেরকে যেমন তাওহীদ, রেসালত ও অন্যান্য বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে; তেমনি বিশ্বাসের শাখাগত নির্দেশসমূহও প্রতিপালন করতে হবে। যেমন, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। জাকাত অর্থ বর্ধনশীল সম্পদ। আরেকটি অর্থ পবিত্রকরণ। জাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়– এবং সম্পদের পবিত্রতাও অর্জিত হয়। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা সুদকে ক্ষয় করেন এবং জাকাতকে বাড়িয়ে দেন।'

যারা অবনত হয় তাদের সঙ্গে অবনত হও– একথার অর্থ নবী মোস্তফা স.এর সহচরবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে নামাজ আদায় করো। তারা যেভাবে রুকু করেন (অবনত হন), তোমরাও সে রকমভাবে রুকু করো। রুকু নামাজের একটি অংশ (স্তম্ভ)। এখানে নামাজ বুঝাতে রুকুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, ইহুদীদের নামাজে রুকু নেই। এই নির্দেশটিতে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মাসআলাঃ ইমাম দাউদ জাহেরী বলেছেন, জামাত নামাজের স্তম্ভ। ইমাম আহমদ বলেছেন, স্তম্ভ নয় বরং ফরজ। অধিকাংশ আলেমগণের মতে জামাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। সুন্নতে মোয়াক্কাদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত। তবে জামাত নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে এই সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শামিল হতে হবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে,

জামাত ওয়াজিবের নিকটতম। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া সাতাশ গুণ উত্তম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪৪

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ কি আশ্চর্য! তোমরা নিজদিগকে বিস্মৃত হইয়া মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?

এই আয়াতে পূর্বোক্ত আয়াতের নির্দেশাদির উপর সবিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেরা কেমন উদাসীন। 'আল বির্‌র' শব্দটি 'বির্‌র' শব্দ থেকে এসেছে। সকল পূণ্যকর্মকে বলে বির্‌র'। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি ইহুদী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর শানে নুজুল এই— ইহুদী সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের অমুসলিম প্রবীণ আত্মীয়দেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মতামত কি? এই দ্বীন (ইসলাম) কি সত্য না অন্য কিছু? তারা জবাব দিয়েছিলো, তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার উপরই অটল থেকো। মোহাম্মদ স. যা কিছু বলেন, তার সব কিছুই সত্য। তাদের এই কথার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ওয়াহেদী এরকম বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ইহুদী আলেমরা সর্বসাধারণকে তওরাতের নির্দেশসমূহ মান্য করতে বলতো, কিন্তু নিজেরা মান্য করতো না। তাদের এই স্বভাবকে লক্ষ্য করে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

'অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো'— এখানে 'কিতাব' অর্থ তওরাত। মর্ম হচ্ছে, কিতাব পাঠের কারণে তোমাদের এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে জানা আছে যে, হজরত মোহাম্মদ স.কে? তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী কি? তোমরা সকল কিছুই জানো বুঝ, তবুও এ কেমন ধারা আচরণ তোমাদের? তবে কি তোমরা বুঝ না?

'তবে কি তোমরা বুঝ না' অর্থ, তবে কি তোমরা তোমাদের বিবেক বুদ্ধি সব খুইয়ে বসে আছো। বিবেক বা আকল মানুষকে অনিষ্টকর বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তোমরা অনিষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে প্রয়াসশীল নও কেনো? তবে কি তোমরা বিবেকবিরোধী? বাগবী বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেন,

মেরাজ রজনীতে আমি কতিপয় মানুষকে অতিক্রম করছিলাম। তাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিলো। আমি হজরত জিব্রাইলকে বললাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের ওয়ায়েজীন। তারা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দেয়, আর নিজেরা থাকে বে খবর। আর তারা আল্লাহ্‌র কালামও পাঠ করে।

হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে– আমি রসুলপাক স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক লোককে হাজির করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনের তাপে তার নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে আসবে। ওই নাড়ীভূঁড়িকে কেন্দ্র করে সে এমনভাবে ঘুরপাক খেতে থাকবে, যেমন করে কলুর বলদ ঘানির চতুর্দিকে ঘোরে। তার ওই অবস্থা দেখে দোজখবাসীরা একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার ব্যাপার কী? তুমি তো আমাদেরকে উত্তম কথা শুনিয়েছিলে। কিন্তু নিজে ছিলে বেআমল। সে জবাব দিবে, আমি তোমাদেরকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু নিজে লিপ্ত থাকতাম অশ্লীলতায়। বায়যাবী বলেছেন, এই আয়াতে আলেম ও বক্তাদের আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা রয়েছে। ওয়াজ নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা মানুষকে সদুপদেশ দান করাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আত্মশুদ্ধি অর্জন ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করাও জরুরী। প্রকৃতাবস্থা এ রকম নয় যে, এক নির্দেশ পালন করতে না পারলে অন্য নির্দেশকে পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যাপারটা এ রকম– যেমন কেউ বললো, আমি পরনিন্দা করি, পরের হক নষ্ট করি, তবে নামাজ পড়ে আর কি হবে?

আমি বলি, অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাকের নিকট জঘন্যতম বিষয় হলো, কেনো ওই কথা বলো, যা করো না। একথায় প্রমাণিত হয় যে, যে অসৎ সে সৎকাজের নির্দেশ দিতে পারে না। কেনোনা আল্লাহ্‌পাকের নিকট বিষয়টি জঘন্যতম বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি এ রকম নয়। মূল তাৎপর্য হচ্ছে, আলেমের অপরাধ জাহেলের অপরাধের তুলনায় আল্লাহ্‌পাকের নিকট অধিক অপছন্দনীয়। তাদের সৎকাজের আদেশ দান কিন্তু অপছন্দনীয় নয়। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশের কারণে ইহুদীদের পার্থিব ক্ষতি হতে লাগলো। অর্থাগমে মন্দা দেখা দিলো। তাদের অবস্থা উঠলো চরমে। ইসলামকে সত্যধর্ম জেনেও নেতৃত্বাকাঙ্খা ও সম্পদবিনষ্টির ভয় তাদের সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইসলাম হলো তাদের নিকট পর্বত সদৃশ বোঝা।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌পাক করুনা করে এমন এক পদ্ধতিতে পথপ্রদর্শন করেছেন, যাতে করে সত্যগ্রহণ আরো সহজতর হয়। এরশাদ হয়েছে–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

❒ তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন-

❒ তাহারাই বিনীত যাহারা বিশ্বাস করে যে তাহাদের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

আয়াতের শুরুতে ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ, তোমাদের প্রতি আপতিত বিপদাপদ অপসারণ করতে যদি চাও, তবে সাহায্য প্রার্থনার অবলম্বন হিসেবে ধৈর্যধারণ করো ও নামাজ প্রতিপালন করো। সবর বা ধৈর্য শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। যেমন, ১. আল্লাহ্‌পাকের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দুঃখমোচন ও মনোবাঞ্ছা পূরণের অপেক্ষায় থাকা। ২. কারো নিকট থেকে কিছু যাঞ্ছা করা এবং পেরেশান হয়ে কান্না-কাটি করা থেকে প্রবৃত্তিকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ এই ধারনায় অটল থাকা যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, কেঁদেকেটে কোনো লাভ নেই। ৩. অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আনুগত্যে মগ্ন থাকা। এ রকম করলে বিপদাপদ কেটে যায়। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'তোমাদের প্রতি আপতিত মুসিবত তোমাদেরই কৃতকর্মের পরিণতি।' মুজাহিদ বলেছেন, সবর অর্থ রোজা। তাই রমজান মাসকে সবরের মাস বলা হয়। নামাজ ও রোজা সম্পদপ্রীতির ব্যাধি নিরাময়কারী। নামাজ মানুষকে পরকালমুখী করে এবং রোজা পার্থিব সম্পদের লোভ নিবারণ করে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'ওয়াস্‌সালাত' শব্দের 'ওয়াও' অব্যয়টির অর্থ হবে 'আলা' (উপরে)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে– নামাজের উপরে ধৈর্যধারণ করে সাহায্য কামনা করো। যেমন অন্যস্থলে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'হে মোহাম্মদ! তোমার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ করো এবং নিজেও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।' কামনা বাসনা, ব্যতিব্যস্ততা অপসারণ করতে এবং দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণ করতে নামাজই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হজরত হুজায়ফার ভ্রাতা হজরত আবদুল আজীজ থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সমস্যার সম্মুখীন হওয়া মাত্র নামাজের প্রতি মনোযোগী হয়ে যেতেন। এই আয়াতে উল্লেখিত সালাত শব্দটির অর্থ দোয়া বা প্রার্থনাও হতে পারে। এটাই সালাতের আভিধানিক অর্থ। দোয়া বা প্রার্থনার মাধ্যমেও জাগতিক উদ্বেগ দূর হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সংকট মোচন

হয়। রসুল মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন, যদি কেউ চায়, তার অপরিহার্য কোনো প্রয়োজন পূর্ণ হোক– তবে সে যেনো ভালোভাবে অজু করে, দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। তারপর রসুলুল্লাহ্ স. –এর উপর আন্তরিকতাপূর্ণ দরূদ পাঠ করে এই প্রার্থনা জানায়– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম। সুব্‌হানাল্লাহি রব্বিল আরশিল আজীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আসআলুকা মুজিবাতি রহমাতিকা ওয়া আযায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গনিমাতি মিন কুল্লি বিররিউ ওয়াস্‌সালামাতি মিন কুল্লি ইসমিন লা-তাদ্‌উলি জাম্বান ইল্লা–গফার্‌তাহু ওয়ালা– হাম্মান্ ইল্লা ফার্‌রজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিদান্ ইল্লা ক্বাদ্বায়তাহা ইয়া আরহামার রহিমীন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আউফা থেকে তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাকেমও তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এরকম লিখেছেন।

'ওয়া ইন্নাহা লা কাবিরাতুন' (ইহা নিশ্চিতভাবে কঠিন) – এখানে ইন্নাহা শব্দের 'হা' সর্বনামটি সম্ভবত 'ইস্‌তায়িনু' (সাহায্য প্রার্থনা করো) এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। এ রকম হলে অর্থ দাঁড়াবে– নামাজ রোজা দ্বারা সাহায্য কামনা বড়ই কঠিন। সর্বনামটি সকল আদেশ নিষেধের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে। অথবা সবর (ধৈর্য) ও সালাত (নামাজ) এর সঙ্গেও সর্বনামটির সম্পর্ক থাকা সিদ্ধ হবে। যদিও সর্বনামটি একবচন বোধক। এমতাবস্থায় 'ইন্ন হা' (নিশ্চয়ই ইহা) প্রতিটি আদেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। কিন্তু এখানে দু'টি আদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নামাজ ও রোজা দু'টোই অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর 'ওয়াও'কে যদি 'আলা' অর্থে ব্যবহার করা যায়, তবে 'হা' সর্বনামটি কেবল নামাজের প্রতি প্রযোজ্য হবে। এই রীতি মেনে নিলে অর্থ দাঁড়াবে, ধৈর্যসহ নামাজের দ্বারা সাহায্য কামনা করো (সম্পদাকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা যদি করো, তবেই কেবল নামাজ সহজতর হবে)। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'হা' সর্বনামটি বিশেষভাবে নামাজের সাথে সম্বন্ধিত। কেনোনা, নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া নামাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সংযম। এর প্রেক্ষিতে কোরআন মজীদের ওই আয়াতটি উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল অধিক হকদার, যে তাকে সন্তুষ্ট রাখে।' আল্লাহ্‌পাককে সন্তুষ্ট রাখাই তাঁর রসুলকে সন্তুষ্ট রাখা। তাই এখানে একবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হবে, ধৈর্য সহকারে সাহায্য কামনা করো। তবে সেটা নিশ্চিতরূপে কঠিন। আর নামাজের মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থী হও। নিঃসন্দেহে সেটাও খুব কষ্টকর। এই বর্ণনাটিকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আয়াতে এইভাবে বলা হয়েছে। 'ইল্লা আ'লাল খশিয়িন' (বিনীতগণ ব্যতীত) – 'খশিয়িন' অর্থ যাঁরা খুশু অবলম্বন করেছেন। 'খুশু' অর্থ নম্রতা বা বিনয়। 'খুশু' থেকে গঠিত হয়েছে 'খশিয়া'– যার অর্থ বালুময় নরম ভূমি। বিনয় প্রকাশ পায় চোখের দৃষ্টিতে

এবং মুখের কথায়। যেমন কালাম পাকে বলা হয়েছে, 'ওয়া খশায়াতিল আস্ওয়াতু লির্রহমান' (রহমানের ভয়ে উচ্চস্বর নিম্নগামী হয়ে যাবে)। আরো বলা হয়েছে, 'ওয়া খশায়াতিল আব্সার' (আর দৃষ্টি অবনমিত হবে)। 'খুজু' শব্দের অর্থ এরকম– নম্র হওয়া, অবনত হওয়া অথবা অনুগত হওয়া। খুশু প্রকাশ পায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। আর খুজু সম্পূর্ণতই অন্তরসংশ্লিষ্ট। এই আয়াতে 'খশিয়িন' (বিনীতগণ) বলতে ওই সকল বিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্পাকের অনুগত, শান্ত বা প্রশান্ত।

'তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে'– এখানে বিশ্বাস বুঝাতে 'জন্ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বাগবী বলেছেন, 'জন্ন' একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। সন্দেহ কিংবা দৃঢ়বিশ্বাস উভয় ক্ষেত্রেই এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে 'জন্ন' বলে দৃঢ়বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক নয়। এর প্রকৃত অর্থ দৃঢ় ধারণা। সে ধারণা সৎও হতে পারে। অসৎও হতে পারে। এখানে অবশ্য সদর্থেই শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

আমি বলি, এই আয়াতে এলেম (জ্ঞান) বা একীন (বিশ্বাস) শব্দগুলো ব্যবহার না করে 'জন্ন' শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা পোষণ করে– সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিফলদাতা আল্লাহ্পাকের নিকট উপস্থিত হতেই হবে সে যদি সত্যিকার বিবেকধারী হয়, তবে স্বভাবতঃই পরিত্রাণ লাভার্থে আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হবে তার প্রতি সহজ। পাত্রের পানি বিষমিশ্রিত–এরকম দৃঢ় ধারণার অধিকারী কখনোই ওই পানি পান করবে না। যদি সে প্রবল তৃষ্ণার্তও হয়– তবুও না। আর পাত্রের পানি স্বাস্থ্যসম্মত জানলে, স্বাদহীন বা তিক্ত পানিও সে গলাধঃকরণ করবে সহজেই। এই যদি মানুষের সাধারণ আচরণ হয়, তবে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনার্থে তাঁর নির্দেশাদি পালনের জন্য এগিয়ে আসবে না কেনো? নির্দেশাদি পালন যদিও কষ্টকর, তবুও এই নির্দেশ যেহেতু প্রিয়তম আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছে, তাই তা কষ্টকর না হয়ে সুখকর হওয়াই সমীচীন। তাই রসুল স. এরশাদ করেছেন, নামাজকে আমার জন্য চক্ষুশীতলকারী করা হয়েছে। হাকেম, নাসাঈ।

'তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাত ঘটবে'–একথার অর্থ তাঁরা পরকালে আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হবেন। নামাজ হচ্ছে মু'মিনদের মে'রাজ; আল্লাহ্পাকের দীদারের মাধ্যম। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আর রাতের কিয়দংশে তাহাজ্জুদের নামাজে মগ্ন হও। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। অচিরেই আল্লাহ্পাক তোমাকে প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত করবেন।' হজরত রবীয়া ইবনে কা'ব বলেছেন, আমি রসুল পাক স. এর পাশে শয়ন করতাম। এক রাতে আমি যখন তাঁর অজুর পানি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপস্থিত করলাম, তখন তিনি বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আমার দয়ার নবী। আমি আপনার সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করতে চাই। তিনি বললেন, আর কিছু? আমি

বললাম, ব্যস। এতোটুকুই। তিনি বললেন, এই যদি তোমার চাওয়া পাওয়া হয়, তবে উদ্যোগ গ্রহণ করো যেনো অধিক পরিমাণে সেজদা করতে পারো। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. এরশাদ করেছেন, সেজদার অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্পাকের সবচেয়ে নিকটতম অবস্থা। মুসলিম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'মুলাক্বু রব্বিহিম' (প্রতিপালকের সঙ্গে তার নিশ্চিত সাক্ষাৎকার ঘটবে) – এ সাক্ষাৎকারের অর্থ, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে হাশরের মাঠে সাক্ষাৎকার।

'ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' (আর আমরা তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী) – বিশ্বাসীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র নিকটে তাদেরকে ফিরে যেতেই হবে। তখন তিনি সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান দিবেন। তখন জুটবে পুরস্কার অথবা তিরস্কার। এই নিশ্চিত ধারণাই বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্যশীল করে তোলে। তাই তারা সংকটাপন্ন অবস্থায় বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮

يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

❒ হে বনী ইস্রাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

❒ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না এবং কাহারও সুপারিশ স্বীকৃত হইবে না এবং কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্য পাইবে না।

এই আয়াতে আল্লাহ্পাক পুনরায় বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে যে অধিক মর্যাদাশালী করা হয়েছিলো- সে কথা বলছেন। এই মর্যাদা তাদের পূর্বপুরুষগণকে দেয়া হয়েছিলো। পূর্বপুরুষ বলতে বুঝানো হয়েছে, হজরত মুসা আ. এর সময়ের বিশ্বাসী সাধু পুরুষগণকে। পরবর্তী যুগের সাধুপুরুষগণও এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁরা সত্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন। তাঁদের জীবনে চক্রান্তপ্রবণতার কোনো প্রশ্রয় ছিলো না। তাঁরা ছিলেন ইমানদার– নবী রসুল ও কিতাবে বিশ্বাসী, ন্যায়নিষ্ঠ, নবীগণের সাহায্যকারী, সৎকর্মপরায়ণ জননেতা ইত্যাদি। পূর্বপুরুষদের মর্যাদার কারণে অধস্তনেরা মর্যাদাশালী হয়ে

থাকে। এ সব কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্পাক আহবান জানাচ্ছেন, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের মতোই সত্যানুসারী হও। আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্মানের প্রবহমানতাকে অক্ষুণ্ন রাখো। এ রকম করতে হলে বর্তমানের নবী হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স.কে মান্য করতে হবে এবং তাঁকে প্রদত্ত কিতাব কোরআন মজীদের অনুসারী হতে হবে। যদি এরূপ করো, তবেই কেবল তোমরা হতে পারবে হজরত মুসা ও তাঁর তওরাতের প্রকৃত অনুসারী। ওহী (প্রত্যাদেশ), নবী-রসুল এবং কিতাবের অনুসরণই তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে মর্যাদামন্ডিত করেছিলো। তোমরাও তাঁদের মতো হও।

বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি– একথার অর্থ, তৎকালীন বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। হজরত মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পর ওই শ্রেষ্ঠত্ব আর বলবৎ নেই। হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর, মুজাহিদ ও আবুল আলীয়া এ রকম বর্ণনা করেছেন।

'তোমরা সেইদিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না'– একথার অর্থ, তোমরা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও শাস্তির কথা মনে করো, যেদিন অবিশ্বাসীদের উপকার করতে কেউই এগিয়ে আসবে না। বিশ্বাসীদের কথা স্বতন্ত্র। বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী রসুলগণ ও আল্লাহ্পাকের অন্য প্রিয়বান্দাগণ পাপী বিশ্বাসীদের পক্ষে সুপারিশ (শাফায়াত) করবেন। সত্যানুসারীগণ এ বিষয়টিতে একমত।

সেদিন কেউ কারো অধিকার স্বীকার করবে না, কোনো বিনিময় দিতে স্বীকৃত হবে না। কিয়ামতের ভয়াবহতা ও শাস্তি দূর করার ব্যাপারে কেউ কারো জন্য যথেষ্ট হবে না। অতএব, কেউ কারো কোনো কাজেই আসবে না। কারো নিকট থেকে ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না।

শেষে বলা হয়েছে, তারা কোনো প্রকার সাহায্য পাবে না। একথার অর্থ তারা আল্লাহ্পাকের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য শাস্তি রহিত করার শক্তি কারো হবে না। কেনোনা, কারো উপর আপতিত শাস্তি দূর করতে হলে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে হয়। ১. অপরাধীকে শাস্তিদাতার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়। একে বলে নুসরত বা সাহায্য। ২. বল প্রয়োগ সম্ভব না হলে সুপারিশ (শাফায়াত) করে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে। অথবা ৩. ক্ষতিপূরণ বা জামানতের মাধ্যমে অপরাধীকে দায়মুক্ত করা যেতে পারে। একে বলে প্রতিদান। এই আয়াতে সাহায্য, বিনিময়, প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ– সবগুলো পন্থাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেনো, সকল পন্থাই সেখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই-বনীইসরাইলেরা (ইহুদীরা) দাবী করতো, তাদের পিতৃপুরুষগণ তাদের পক্ষে শাফায়াত করবেন। তাদের মিথ্যা দাবীর বিরুদ্ধেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

❒ স্মরণ কর, যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে জবাই করিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদিগকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল;

এতোক্ষণ বনীইসরাইলদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখন শুরু হলো তার বিস্তারিত বর্ণনা। প্রথমেই বলা হয়েছে অত্যাচারী ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে (তাদের পিতৃপুরুষদেরকে) নিষ্কৃতি দানের কথা। ফেরাউনী সম্প্রদায় অর্থ, ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ ও তার অন্য অনুচরেরা। 'আলে ফেরাউন' শব্দের 'আল' কথাটি আসলে 'আহাল', যার অর্থ সম্প্রদায়। নবী-রসুল, রাজা-বাদশাহ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আল কথাটি ব্যবহৃত হয়। আমালিকা সম্প্রদায়ের রাজার উপনাম ছিলো ফেরাউন। হজরত মুসার সময়ে যে ফেরাউন রাজত্ব করতো, তার নাম ছিলো, ওলীদ বিন মাসআব বিন রাইয়ান। রাইয়ান ছিলো হজরত ইউসুফ আ. এর যুগের ফেরাউন। মাসআব ও রাইয়ানের রাজত্বকালের ব্যবধান ছিলো চার'শ বছর।

হজরত মুসার সময়ের ফেরাউন ছিলো নিষ্ঠুর। সে বনী ইসরাইলদেরকে বিভিন্নরূপে যন্ত্রণা দিতো। তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে প্রাসাদ তৈরির কাজে নিযুক্ত করতো, মালপত্র বহনের কাজে লাগাতো, তাদেরকে দিয়ে চাষাবাদ করাতো এবং তাদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করতো। মেয়েদেরকে দিতো সুতো কাটার কাজ।

পরবর্তীতে ফেরাউনের অত্যাচার আরো বেড়ে গিয়েছিলো। সে হুকুম দিয়েছিলো, যেনো বনী ইসরাইলদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করা হয় এবং কন্যাসন্তানদেরকে জীবিত রাখা হয়। তার নির্মম নির্দেশ দেয়ার কারণ হচ্ছে এই– ফেরাউন একদিন স্বপ্নে দেখলো, বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে আগুন এসে সমগ্র মিসর রাজ্য ঘিরে ফেললো। এবং কিবতীদেরকে (তার অনুসারীদেরকে) ভস্মীভূত করে ফেললো। ফেরাউন ভীত হলো। গনৎকারদের ডেকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানতে চাইলো। তারা বললো, বনী ইসরাইলদের মধ্যে একটি শিশু জন্ম লাভ করবে– সে আপনাকে ধ্বংস করে ফেলবে এবং আপনার রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এই বিবরণটি দিয়েছেন বাগবী। হজরত সা'দী থেকে ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন। বাগবী আরো বলেছেন, এরপর ফেরাউন এই মর্মে

ফরমান জারি করলো যে, বনী ইসরাইলদের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করামাত্র হত্যা করা হবে। কেবল কন্যা সন্তানদেরকে রেহাই দেয়া হবে। ধাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, বনী ইসরাইলদের সন্তান জন্মলাভের সংবাদ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফেরাউনের এই ফরমান জারির পর বনী ইসরাইলদের বারো হাজার নবজাতককে হত্যা করা হয়েছিলো। হজরত ওয়াহাব বলেছেন, ফেরাউন ইসরাইল বংশের নব্বই হাজার সদ্যজাতককে হত্যা করেছিলো। প্রবীণরাও মৃত্যুবরণ করেছিলো স্বাভাবিক নিয়মে। অবস্থা যখন এরকম শোচনীয় তখন কিবতীদের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেরাউন সমীপে নিবেদন করলো, বনী ইসরাইলের শিশুপুত্ররা নিহত হচ্ছে। বড়রাও ক্রমাগত মৃত্যুবরণ করছে। এভাবে তাদের বংশ উজাড় হয়ে গেলে, আমরা আমাদের কাজ কারবারের জন্য শ্রমিক পাবো কোথা থেকে? ফেরাউন তখন পুনঃ নির্দেশ জারী করলো, এখন থেকে এক বৎসর হত্যাকান্ড চলবে, পরের বছর বন্ধ থাকবে। এই নিয়ম বলবৎ করা হলো। তখন হত্যাকান্ড বন্ধের বছরে জন্মগ্রহণ করলেন হজরত হারুন আ. এবং হত্যাকান্ডের বছরে জন্ম নিলেন হজরত মুসা আ.।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এটা ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা-- পরীক্ষা কার্যকর হয় সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই। দুঃখের অবস্থায় নেয়া হয় ধৈর্যের পরীক্ষা। এবং সুখের অবস্থায় নেয়া হয় কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা। যেমন আল্লাহ্পাক অন্যত্র বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে ভালোমন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি।' ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে নিষ্কৃতিদানকে যদি পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবে তা হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরীক্ষা। আর ফেরাউনের অত্যাচারকে যদি পরীক্ষা হিসেবে ধরা হয়, তবে তা হবে ধৈর্য ধারণের পরীক্ষা। বস্তুতঃ উভয় প্রকার পরীক্ষাই আপতিত হয়েছিলো বনী ইসরাইলদের প্রতি। অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ এবং নিষ্কৃতির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উভয়টিই ছিলো তাদের কর্তব্যকর্ম। হজরত মুসার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫০

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

❐ যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ও ফেরাউনী সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে,

---

সাগর দ্বিধাবিভক্তির ঘটনাটি এরকম— হজরত মুসার আহবানে ফেরাউন সাড়া দেয়নি। তবুও দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে মুসাকে। হয়তো তার

বোধোদয় হবে, হয়তো ফিরে আসবে বিশ্বাসের বেহেশতী বাগানে। কিন্তু না, অসত্যকে আশ্রয় করে সে সময়াতিপাত করতে লাগলো। দীর্ঘ বিশবছর কেটে গেলো এভাবে। তার ধ্বংসের সময় সন্নিকটবর্তী হলো। আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে হজরত মুসার প্রতি নির্দেশ নেমে এলো– বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে মিসর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। হজরত মুসা বনী ইসরাইলদের ঘরে ঘরে অতিসঙ্গোপনে এই নির্দেশ পৌঁছে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, গোপন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ঘোড়ার গদিও গৃহাভ্যন্তরে বেঁধে নিতে হবে। কিবতীরা যেনো কিছুতেই টের না পায়। কিবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যে বনী ইসরাইল সন্তানেরা জড়িত ছিলো, আল্লাহ্পাক তাদেরকে স্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রিত করে দিলেন। আর বনী ইসরাইলদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিবতীদেরকে কিবতীদের সঙ্গেই মিলিয়ে দিলেন। এরপর শুরু হলো মহামারী। অসংখ্য কিবতী মৃত্যুবরণ করলো সেই মহামারীতে। দিনরাত তারা তাদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের কাফনদাফনে ব্যতিব্যস্ত রইলো। ইত্যবসরে হজরত মুসা ছয় লক্ষাধিক বনী ইসরাইল সমভিব্যাহারে মিসর ত্যাগ করলেন। চারশ' বছর আগে হজরত ইউসুফের রাজত্বের সময়ে হজরত ইয়াকুব (ইসরাইল) কেনান থেকে মিসরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাত্র বাহাত্তর জন। মিসর পরিত্যাগকারী ছয় লক্ষাধিক বনীইসরাইল তাদেরই অধস্তন বংশধর। বনীইসরাইল বাহিনী এগিয়ে চললো সম্মুখের দিকে। একস্থানে এসে থেমে গেলো পুরো বাহিনী। সামনে সীমাহীন প্রান্তর। পথচিহ্ন নেই। গন্তব্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। হজরত মুসা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ঠাহর করতে পারলেন না, কীভাবে পথ চলবেন এখন। প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন তিনি। প্রবীণগণ বললেন, হজরত ইউসুফ অন্তিমকালে তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে এই মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, যখন তোমরা মিসর থেকে চলে যাবে, তখন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। মনে হয় সেই অসিয়ত প্রতিপালিত হয়নি বলেই এখনো আমরা পথহারা। তাঁর পবিত্র মরদেহ সঙ্গে না নিলে মনে হয় আমরা কিছুতেই আর পথ খুঁজে পাবো না। হজরত মুসা জানতে চাইলেন, তাঁর কবর কোথায়? তারা বললেন, আমরা জানি না। হজরত মুসা উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, হজরত ইউসুফের কবর কোথায়? যে জানো শীঘ্র বলে দাও। আমার এই আহবান কেবল সেই যেনো শুনতে পায়, যে জানে। সেরকমই হলো। এক বৃদ্ধা কেবল শুনতে পেলেন তাঁর ঘোষণা। বৃদ্ধা বললেন, আমি যা চাই তাই যদি আমাকে দেয়া হয়, তবেই আমি হজরত ইউসুফের কবরের সন্ধান দেবো। হজরত মুসা বললেন, যদি আল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দেন, তবে আমি তোমার দাবী পূরণের ব্যাপারে অঙ্গীকার করতে পারি। আল্লাহ্পাকের এরশাদ ধ্বনিত হলো, হে মুসা! ওই প্রবীণাকে বলো, সে যা চাইবে তাই তাকে দেয়া হবে। হজরত মুসা বললেন, কী চাও তুমি? বৃদ্ধা বললেন,দু'টি জিনিস আমি চাই। একটি পৃথিবীতে। আরেকটি পরবর্তী পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই।

যেখানেই তোমরা যাওনা কেনো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর হে নবী মুসা! বেহেশতের যে প্রাসাদ আপনার আবাসস্থলরূপে নির্ধারিত হবে, আমি তার পাশে অবস্থান করতে চাই। হজরত মুসা বললেন, তথাস্তু। বৃদ্ধা বললেন, হজরত ইউসুফের কবর শরীফ রয়েছে নীল নদের মধ্যস্থলে। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য কামনা করলেন। নীল নদের পানি সরে গিয়ে দৃষ্টিগোচর হলো হজরত ইউসুফের কবর শরীফ। সেখান থেকে কফিন বের করে পুনরায় যাত্রা শুরু করলো বনী ইসরাইল বাহিনী। বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন হজরত হারুন এবং পশ্চাদ্ভাগে ছিলেন হজরত মুসা। মিসর পরিত্যাগের সংবাদ একসময় পৌছে গেলো ফেরাউনের কানে। সে ফরমান জারী করলো, অতিপ্রত্যূষে মোরগ ডাকার পূর্বেই বনী ইসরাইলদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। আল্লাহ্পাকের কি অপার অনুগ্রহ! সে রাতে কোনো মোরগ ডাকলো না। দিবসের সূর্যকিরণ প্রখর হলে জেগে উঠলো তারা। ফেরাউন ও হামান এক কোটি সাত লক্ষ লশকর নিয়ে বনী ইসরাইলদের সন্ধানে বের হলো। তাদের সঙ্গে ছিলো সত্তর হাজার দ্রুতগামী কালো ঘোড়া। ওদিকে বনী ইসরাইলেরা তখন সমুদ্রতীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধতার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তারা। পিছনে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শোরগোল। এগিয়ে আসছে ফেরাউনের দুর্ধর্ষ লশকরেরা। উভয় দল পরস্পরের দৃষ্টিসীমানায় এসে পড়লো। শংকিত বনি ইসরাইলেরা বলাবলি করতে শুরু করলো, আমরা যে পাকড়াও হতে চলেছি। হজরত মুসা বললেন, কখনোই নয়। আল্লাহ্পাক আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, হে মুসা। তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সাগরতীরে আঘাত করো। হজরত মুসা তাই করলেন। সাগর দ্বিধাবিভক্ত হলো। দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইলো পাহাড় সদৃশ বিশাল পানির দেয়াল। এরকম পথ বের হলো মোট বারোটি। বনী ইসরাইলেরা ছিলো বারোটি সম্প্রদায়ভূত। প্রত্যেক সম্প্রদায় একেকটি পথ ধরে এগিয়ে চললো। প্রখর সূর্যতাপের মাধ্যমে প্রতিটি পথকে আল্লাহ্পাক এমতো শুষ্ক করে দিলেন যে, পথ চলতে তাদের কোনোই অসুবিধা হচ্ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি পানির দেয়ালে জানালা করে দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তারা একদল অন্যদলকে দেখে নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে চলছিলেন। বাক্য বিনিময় হচ্ছিলো পরস্পরের মধ্যে।

আয়াতে বলা হয়েছে,'তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউন সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।' ঘটনার বিবরণ এরকম– সাগরতীরে উপস্থিত হলো ফেরাউন বাহিনী। ফেরাউন দর্পভরে তার লোকদেরকে বললো, দেখো আমার ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রসলিলও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অগ্রসর হও। পলায়নপর ক্রীতদাসদেরকে বন্দী করো। একটি কালো অশ্বোপরি আরোহণ করেছিলো ফেরাউন। তার সঙ্গীরাও ছিলো অশ্বারোহী। তাদের সকল ঘোড়াই ছিলো পুরুষ। হজরত জিব্রাইল তখন একটি মাদী ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে

সাগর চেরা পথ বেয়ে এগিয়ে চললেন। মাদী ঘোড়া দেখে ফেরাউন বাহিনীর ঘোড়াগুলো দ্রুতবেগে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। তাদের পশ্চাতে আরেকটি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললেন হজরত মিকাইল। তিনি বলতে শুরু করলেন, চলো, চলো। অগ্রবর্তী সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হও। এভাবে ফেরাউন বাহিনী যখন সাগরভ্যন্তরের পথে এগিয়ে চলছিলো, তখন ভেঙে পড়লো পানির দেয়াল। মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো জলধির উত্তাল তরঙ্গমালা। সলিল সমাধি ঘটলো ফেরাউন সম্প্রদায়ের।

ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় কোন সাগরে ডুবে মরেছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, সে সাগরটি ছিলো পারস্য সাগরের অন্তর্ভূত। হজরত কাতাদা বলেছেন, মিসর রাজ্যের পাশে আসফ নামে একটি সাগর ছিলো। ওই সাগরেই সলিল সমাধির ঘটনাটি ঘটেছে। বনী ইসরাইল বাহিনী তখন সাগরের অপর পারে গিয়ে উঠেছে। তারা স্বচক্ষে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হওয়ার ঘটনাটি দেখছিলো। আয়াত শেষে তাই বলা হয়েছে, তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করছিলে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫১,৫২,৫৩,

وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَ

أَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

☐ – যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম– তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; ইহাতে তোমরা ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলে।

☐ ইহার পরও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

☐ – যখন আমি মুসাকে কিতাব ও 'ফুরকান' দান করিয়াছিলাম– যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।

আল্লাহ্‌পাক ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং হজরত মুসা তুর পর্বতে অবস্থানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এই অবস্থানের সময়সীমা ছিলো চল্লিশ রাত্রি। জিলক্বদ মাসের তিরিশ রাত্রি এবং জিলহজ মাসের দশ রাত্রি। পুরো ঘটনাটা এরকম– ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সলিল সমাধির পর বনী ইসরাইলেরা পুনরায় মিসরে বসতিস্থাপন করলো। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন যে, তুমি তুর পাহাড়ে চল্লিশরাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকবে,

তখন আমি অবতীর্ণ করবো তওরাত। হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে জানালেন, আমি তুর পাহাড়ে ধ্যানমগ্ন হতে যাচ্ছি। হারুন থাকবে তোমাদের সাথে। সে হবে আমার স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি। হজরত জিব্রাইল অশ্বারোহী হয়ে হজরত মুসাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। তাঁর ঘোড়ার পা যে মাটিতে স্পর্শ করছিলো, সেখানে জন্ম নিচ্ছিলো শ্যামল উদ্ভিদ। সামেরী নামের একজন এই আশ্চর্যজনক ব্যাপারটি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো। সে পেশায় ছিলো স্বর্ণকার। বাজরখ অথবা কিরমানের অধিবাসী ছিলো সামেরী। সে আসলে ছিলো গো-পূজক সম্প্রদায়ের লোক। বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো মুনাফিক। সে হজরত জিব্রাইলের ঘোড়ার পদস্পর্শিত মাটি উঠিয়ে গোপনে নিজের কাছে রেখে দিলো। হজরত মুসার তুর পর্বতে গমনের পর, সেই চরম গর্হিত অপকর্মটি করে ফেললো সে। বনী ইসরাইলদের নিকটে ছিলো কিবতীদের নিকট থেকে ধার নেয়া অনেক স্বর্ণালংকার। সে বনী ইসরাইলদেরকে বললো, তোমাদের কাছে যে স্বর্ণালংকারগুলো রয়েছে, ওগুলো আসলে গনিমতের মাল। ওগুলো ভোগ করার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা বরং গর্ত খুঁড়ে অলংকারগুলো পুঁতে রাখো। হজরত মুসা ফিরে এলে তিনি যেমন নির্দেশ দেন, সেরকম ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, বনী ইসরাইলদেরকে এরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন হজরত হারুন। যার পরামর্শেই হোকনা কেনো, বনী ইসরাইলেরা পরামর্শটি গ্রহণ করলো। সমূদয় স্বর্ণালংকার মাটিতে পুঁতে রাখলো তারা। সামেরী তৈরী করলো একটি গো-বৎসমূর্তি। তারপর প্রোথিত অলংকারগুলো তুলে এনে সে গো-বৎসমূর্তিটিকে স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়ে দিলো। মাত্র তিনদিনে কর্মটি সম্পন্ন করলো সে। এরপর হজরত জিব্রাইলের ঘোড়ার ক্ষুর স্পর্শিত মাটি মূর্তিটির মুখে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলো। এই মাটিতে ছিলো সঞ্জীবনী শক্তি। ওই শক্তির প্রভাবে বাছুরের মূর্তিটি জীবিত বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা রব শুরু করে দিলো। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে দৌড়াদৌড়িও শুরু করে দিলো বাছুরটি। সামেরী বললো, এটি হচ্ছে তোমাদের ও মুসার মাবুদ (উপাস্য)। মুসা এর কথা বিস্মৃত হয়েছে। তাই তুর পাহাড়ে চলে গিয়েছে। বনী ইসরাইলেরা একদিন ও একরাত্রিকে দুইদিন গণনা করতো। বিশ দিন বিশ রাত্রি অতিবাহিত হলে তারা ধরলো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। চল্লিশদিন পর হজরত মুসার ফিরে আসার কথা। কিন্তু তিনি এলেন না। তারা ধারণা করলো, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সামেরী ক্রমাগত বাছুর পূজার জন্য সকলকে উৎসাহিত করে যাচ্ছিলো। শেষে সামেরীর ধোঁকায় পড়ে গেলো সকলে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এবং হজরত মুসার সঙ্গে তুর পাহাড়ে তিরিশদিন অবস্থানের অঙ্গীকারনামা ছিলো। পরবর্তী এই তিরিশ দিনের সঙ্গে দশদিন বাড়ানো হয়েছিলো। হজরত মুসা যথাসময়ে ফিরে না আসায় বনী ইসরাইলেরা অধিকাংশই সামেরীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত হারুন। বারো হাজার লোক তাঁর কথা মান্য করলো। অবশিষ্টরা হয়ে গেলো পথভ্রষ্ট। এই পথভ্রষ্টদেরকে লক্ষ্য করে আয়াতে বলা হয়েছে,'তোমরা

তখন গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; ইহাতে তোমরা ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলে।'

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— এরপরও আমি তোমদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। এর অর্থ, যখনই তোমরা এই অপকর্মের দায় স্বীকার করে প্রত্যাবর্তন করেছিলে (তওবা করেছিলে) তখনই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কৃতজ্ঞতা বলতে এখানে 'শোকর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'শোকর' অর্থ আনুগত্য। মন, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শোকরের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়। হাসান বলেছেন, প্রাপ্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অর্থ আল্লাহ্‌পাকের স্মরণলিপ্ত হওয়া (জিকির করা)। হজরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেন, নেয়ামত দাতার প্রসন্নতার অনুকূলে নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করাকে শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) বলে। কেউ কেউ বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে অক্ষমতা বোধই কৃতজ্ঞতা। বাগবী বলেছেন, এই মর্মে বর্ণনা এসেছে যে, হজরত মুসা আল্লাহ্‌পাকের সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া এলাহি! তুমি আমাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছো। নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ দান করেছো। ইয়া বারে এলাহি! তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগও তো একটি নেয়ামত। এরশাদ ধ্বনিত হলো, হে মুসা! তুমি জ্ঞানী। তোমার সমকালে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই। স্মরণে রেখো, আমার বান্দার জন্য এই বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, যা কিছু সে লাভ করেছে, তা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকেই লাভ করেছে। হজরত দাউদ তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, ওই পরম সত্তার জন্যই যাবতীয় পবিত্রতা— যিনি বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অক্ষমতাকে দয়া করে কৃতজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন মারেফাতের (আল্লাহ্‌ পরিচিতির) পথে অক্ষমতার স্বীকৃতিকেই মারেফাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে—যখন আমি মুসাকে 'কিতাব' ও 'ফুরকান' দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও। তওরাতকেই এখানে কিতাব ও ফুরকান নামে অভিহিত করা হয়েছে। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, 'ফুরকান' শব্দটি কিতাব শব্দটির মর্মমূল। এই দুই শব্দের মাঝখানের 'ওয়াও' অব্যয়টি অতিরিক্ত। 'ফুরকান' শব্দটি এসেছে 'ফারক্ব' থেকে— যার অর্থ বিভক্ত বা দ্বিখন্ডিত করা। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যসূচক হিসেবে এখানে ফুরকান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকেও ফুরকান বলে। কারণ, মোজেজা সত্যপন্থী ও অসত্যপন্থীদেরকে চিহ্নিত করে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসার শরিয়তকে ফুরকান বলে। তাঁর শরিয়তের মাধ্যমে হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছিলো। সৎপথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এরকম পার্থক্য নির্ণায়ক প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যের কথাই আয়াত শেষে এভাবে বলা হয়েছে, 'যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।'

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

❒ –যখন মুসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করিয়াছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজদিগকে সংযত কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়ঃ। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।'

'কওম' অর্থ সম্প্রদায়। 'হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন'– একথার অর্থ, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা গরুপূজায় লিপ্ত হয়েছিলো তাদেরকে বললেন, 'জ্বলামতুম আনফুসাকুম।' অর্থাৎ গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছো। একথা বলে তিনি আত্মঅত্যাচারীদেরকে তওবার আহবান জানিয়ে বলছেন, 'ইলা বারিই'কুম।' অর্থাৎ সেই সত্তার প্রতি প্রত্যাবর্তনমুখী হও, যিনি তোমাদেরকে মধ্যপন্থায় সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। পারস্পরিক পরিচিতি চিহ্নিত করার জন্য তোমাদের আকৃতি ও প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যমন্ডিত করেছেন। 'বারিই' শব্দটি তিনটি হরফের সমন্বয়ে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে, এক বস্তু থেকে অপর বস্তুকে ছাঁটাই বা পৃথক করে গ্রহণ করা- এভাবে পৃথককৃত বস্তুকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া। আরবীভাষীগণ বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করে থাকেন। যেমন, বারিআল মারিদু ওয়াল মারিউন (ঋণগ্রস্ত ও রোগী পৃথক হয়েছে)। অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ঋণ থেকে এবং রোগী রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে। এক বস্তু থেকে দ্বিতীয় বস্তুর আবিষ্কার অথবা সৃষ্টিকেও এই শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন, বারিআল্লাহু আদামা মিন তীন (আল্লাহ্‌পাক মাটি থেকে হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন)। অর্থাৎ লবণাক্ত মাটি থেকে তাঁকে পৃথক করে দিয়েছেন। ক্বারী আবু আমর এই আয়াতের দু'টি স্থানে উল্লেখিত বারিই'কুম শব্দটির হরকতকে হালকা করে পাঠ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি 'বারিই'কুম' এর হামজাকে পাঠ করেছেন সাকিন করে। তিনি ছাড়া অন্য ক্বারীগণ হামজার হরকতকে পুরোপুরি আদায় করেছেন।

'ফাকতুলু আনফুসাকুম' অর্থ আত্মবিসর্জন দাও (আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সংযত করো)। হজরত মুসার একথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধমুক্ত, তারা গো-বৎস পূজার অপরাধে অপরাধীদেরকে হত্যা করো। এভাবে তোমরা তোমাদের তওবাকে পূর্ণ ও পরিণত করো। কেবল

মৌখিক বা আন্তরিক তওবা দ্বারা তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। সুতরাং আত্মসংহারের এ বিধানকে তোমরা মেনে নাও।

'তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়ঃ'– একথার অর্থ, আত্মবিসর্জনের বিধান সংবলিত এই তওবাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এই কল্যাণকর তওবাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট গ্রহণীয়। এই হত্যা তোমাদেরকে শিরিকের মলিনতা থেকে মুক্ত করবে। তোমাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরবর্তী পৃথিবীর অনন্ত জীবনকে সফল করে তুলবে।

গো-বৎস পূজারীরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো। বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ কায়মনোবাক্যে মেনে নিলাম। সবাই চাদরাবৃত হয়ে নিজেদের গৃহাঙ্গনে অবনত মস্তকে বসে রইলো। তাদের প্রতি হুকুম জারি করা হলো, কেউ যদি তার অবস্থান পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়, কিংবা মস্তক উত্তোলন করে অথবা হস্তপদ দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তবে সে অভিশপ্ত। তার তওবা গৃহীত হবে না। তওবাকামীরা নির্দেশ মেনে নিলো। অস্ত্রাঘাতকে স্বাগত জানানোর জন্য স্কন্ধদেশ উন্মুক্ত করে দিলো। তাদের অপরাধমুক্ত আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তি এই হত্যাকান্ডের বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তরবারী উত্তোলিত হলো বটে, কিন্তু মায়ামমতার আতিশয্যে তা তাদের হাত থেকে খসে পড়লো। স্বজনহননের এই নির্দেশ তারা কার্যকর করতে পারলো না। শেষে হজরত মুসার নিকট আবেদন জানিয়ে বললো, হে আল্লাহ্র নবী। আমরা তো সম্প্রীতি ও সৌহার্দের প্রভাবে পরাস্ত। এখন উপায় কী? আল্লাহ্পাক তখন কুয়াশা ও কালোমেঘে সকলকে ঢেকে দিলেন। ফলে তারা একে অপরের দৃষ্টি আড়াল হয়ে গেলো। শুরু হয়ে গেলো হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ড চললো কয়েকদিন ধরে। অধিকাংশ বনী ইসরাইল নিহত হলো। হজরত মুসা ও হজরত হারুন নিবেদন করলেন, আয় আল্লাহ্! বনী ইসরাইলের অধিকাংশ সদস্য নিহত হয়েছে। এবার কৃপাবর্ষণ করুন। আল্লাহ্পাক হত্যাকান্ড বন্ধের নির্দেশ দিলেন। সরে গেলো কৃষ্ণমেঘ ও কুয়াশা। দেখা গেলো, হাজার হাজার বনী ইসরাইলের মরদেহ পড়ে রয়েছে। হজরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নিহতদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজার। হজরত মুসা মর্মাহত হলেন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন, হে মুসা! তুমি কি আমার এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নও যে, আমি হন্তারক ও নিহতদেরকে যুগপৎ জান্নাতে দাখিল করবো। নিহতরা হবে শহীদ এবং অবশিষ্টরা হবে ক্ষমাকৃত।

'ফাতাবা আলাইকুম' (তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন)। অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। এ বাক্যটি হজরত মুসার হতে পারে, আল্লাহ্তায়ালারও হতে পারে। যদি এই উক্তি হজরত মুসার হয় তবে একথার অর্থ হবে, হত্যাকান্ডের নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদের তওবা গ্রহণ করবেন।

আর উক্তিটি যদি আল্লাহ্‌তায়ালার হয় তবে বুঝতে হবে, এর মাধ্যমে তওবাকারীদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমা লাভের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

'ইন্নাহু হুয়া ত্তাউয়াবুর রহীম' (নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু)। অর্থাৎ তিনি যেমন তওবা কবুলকারী তেমনি তওবার সুযোগ দাতাও।

তওবার এই মর্মবিদারক অধ্যায় শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ করলেন, হে মুসা! তুমি বনী ইসরাইলের কতিপয় ব্যক্তিসহ তুর পর্বতে এসো। তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের আবেদন জানাও। নির্দেশ মোতাবেক হজরত মুসা সত্তরজন লোক নির্বাচন করলেন। তাদেরকে বললেন, রোজা রাখো। পবিত্র পোশাকে সজ্জিত হও। তারা হজরত মুসার নির্দেশ প্রতিপালন করলো। তারপর আবেদন জানালো, হে নবী মুসা! আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। যেনো আমরা তাঁর বাণী শুনতে পারি। যখন হজরত মুসা তাঁর সত্তরজন সঙ্গীসহ তুর পাহাড়ের পাদদেশে পৌছলেন, তখন দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুঞ্জীভূত মেঘ। সে অলৌকিক মেঘমালায় আবৃত হয়ে আছে সম্পূর্ণ তুর পর্বত। মেঘপুঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলেন হজরত মুসা। সঙ্গীদেরকে বললেন, মেঘমালার সন্নিকটবর্তী হওয়ামাত্র তোমরা সেজদাবনত হয়ো। মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলেন হজরত মুসা। শুরু হলো আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। তাঁর অবয়ব আচ্ছাদিত হলো আল্লাহ্‌পাকের জ্যোতিচ্ছটায়। তাঁর জ্যোতির্দীপ্ত চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করার সাধ্য কারো ছিলো না। তবু রয়ে গেলো অন্তরাল। অন্তরালের ওপার থেকে ধ্বনিত হতে লাগলো আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী। সঙ্গীরা শুনতে পাচ্ছিলো, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসাকে তাঁর আদেশ নিষেধাবলী বিবৃত করছেন। তারা শুনতে পেলো আল্লাহ্‌পাক বলছেন, নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ্। আমি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি পরম পরাক্রমশীল। আমিই আপন ক্ষমতাবলে তোমাদেরকে মিসর থেকে এখানে এনেছি। তোমরা আমারই ইবাদত করো। আমি ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য নির্বাচন কোরো না। কথোপকথন শেষ হলো। অপসারিত হলো অলৌকিক মেঘের বিস্তার। এরপর শুরু হলো হজরত মুসার সঙ্গীদের আলাপচারিতা–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❒ –যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মুসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিবনা।' যখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে তখন তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।

❒ মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিলাম যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

সঙ্গীরা বললো, তোমাকে কখনও বিশ্বাস করবোনা– একথার অর্থ আমরা কখনই একথার স্বীকৃতি দিবো না যে, আল্লাহ্ তোমাকে তওরাত উপহার দিয়েছেন, তোমার সাথে তিনি কথা বলেছেন অথবা তুমি আল্লাহ্‌র নবী।

'হাত্তা নারাল্লাহা জাহারাতান'–একথার অর্থ যতোক্ষণ না আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখি। চাক্ষুষ দর্শন বুঝাতে এখানে 'জাহারন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে– একথার অর্থ বজ্রের আঘাতে যখন তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ছুইক্বা' শব্দের অর্থ আগুন যা আকাশ থেকে অবতরণ করে সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দেয়।

তোমরা নিজেরাই দেখছিলে– একথার অর্থ তোমাদের উপর আপতিত ওই বিপদ তোমরা স্বচোখে অবলোকন করছিলো।

মৃত্যুকে স্বচোখে দেখা না গেলেও মৃত্যু নিশ্চিতকারী বিপদকে দেখা সম্ভব। সঙ্গীরা যখন বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো তখন হজরত মুসা ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ্‌পাকের দরবারে নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! বনীইসরাইলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এখন মৃত। আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে কীভাবে এর জবাবদিহি করবো। হে আমার পরোয়ারদিগার! যদি তুমি ইচ্ছা করতে, তবে আমি সহ আমার সম্প্রদায়ের সকলকেই মৃত্যুদান করতে পারতে। তুমি কি তবে কতিপয় অর্বাচীনের কারণে আমাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবে?' হজরত মুসার রোদন ও প্রার্থনা আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ার সাগরকে তরঙ্গায়িত করে তুললো। একদিন একরাত্রি পর আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসার সঙ্গীদিগকে জীবন দান করলে একে একে তাদের জীবিত ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়া স্বচোখে দেখে যাচ্ছিলো, তাই আয়াতে বলা হয়েছে, তখন তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

'ছুম্‌মা বায়াছনাকুম মিম্ বা'দি মাউতিকুম' অর্থ মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলাম। 'বায়াছ' শব্দের আভিধানিক অর্থ– কোনো বস্তু স্বস্থান থেকে উত্তোলন করা। হজরত কাতাদা বলেছেন, তাদের আয়ু এবং রিজিক তখনও ছিলো। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তাদের মৃত্যু যদি আয়ু শেষের মৃত্যু হতো তবে আল্লাহ্ তাদেরকে আর পুনরুজ্জীবন দান করতেন না। মৃত্যুমুখে পতিত সকল মানুষের মতো পুনরুত্থান ঘটাতেন কিয়ামত দিবসে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো— এ কথার অর্থ পুনরুজ্জীবন লাভের নেয়ামতের জন্য আল্লাহ্পাকের শোকর করো অথবা বজ্রাঘাতের শাস্তির মাধ্যমে তোমাদেরকে যে ক্ষমা করা হয়েছে সে কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ হও।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫৭

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

❒ আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম; তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া প্রেরণ করিলাম। বলিয়াছিলাম, 'তোমাদিগকে যাহা দান করিলাম তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর।' তাহারা আমার প্রতি কোন অন্যায় করে নাই, বরং তাহারা তাহাদেরই প্রতি অন্যায় করিয়াছিল।

'গামামা' শব্দটি এসেছে গাম্ শব্দ থেকে। গাম্ অর্থ লুকিয়ে ফেলা বা গোপন করা। এখানে গামামা শব্দের অর্থ মেঘ। সূর্যকে আড়াল করে দেয় বলেই মেঘকে গামামা বলা হয়। এই আয়াতে যে ঘটনার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনাটি হচ্ছে এই— আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো বনী ইসরাইলদেরকে, কিন্তু এ নির্দেশ পালন করতে তারা গড়িমসি শুরু করলো। তাদের শৈথিল্য ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্পাক তাদেরকে একটি বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে বন্দী করে রাখলেন। চল্লিশ বছর ধরে সেই বৃক্ষছায়াহীন প্রান্তরে বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলো তারা। দিনের শুরুতে কেউ কেউ ওই প্রান্তর থেকে পালাতে চেষ্টা করতো কিন্তু দিনান্তে দেখতো, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। শেষে নিরুপায় হয়ে হজরত মুসা সকাশে তারা তাদের প্রয়োজন সমূহ পুরনের আবেদন জানালো। হজরত মুসার প্রার্থনার বদৌলতে আল্লাহ্পাক তাদের মাথার উপর স্থাপন করলেন শ্বেতশুভ্র মেঘমালা। এভাবে প্রখর সূর্য কিরণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হলো। রাতে সেখানে স্থাপন করা হতো একটি নূরের স্তম্ভ যাতে করে ঘোর অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া প্রেরণ করলাম— একথা বলে প্রান্তরের বন্দী জীবনে বনী ইসরাইলদেরকে প্রদত্ত দু'টি বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটির নাম 'মান্না'। অন্যটির নাম 'সাল্ওয়া'। মান্না অর্থ 'তুবানজবীন'

(এক প্রকার ফল)। কেউ বলেছেন, হালকা চা-পাতি। মুজাহিদ বলেছেন– 'মান্না' গুগ্ন এর মতো আকাশ থেকে পতিত হয়ে পাহাড়ে প্রান্তরে জমাট বেঁধে থাকতো। তার স্বাদ ছিলো মিষ্টতাসম্পন্ন। বর্ণিত হয়েছে, আকাশ থেকে নেমে আসা সুমিষ্ট মান্না খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো বনী ইসরাইলেরা। মিষ্টিতে অরুচি দেখা দিলো তাদের, তারা হজরত মুসার নিকট নিবেদন জানালো, হে মুসা রসুল! আমরা তো একই রকম মিষ্টিদ্রব্য খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আপনি মেহেরবাণী করে আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিবেদন করুন, যেনো তিনি করুণাপরবশ হয়ে আমাদেরকে গোশ্‌ত আহারের বন্দোবস্ত করে দেন।

তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন খাদ্য দান করলেন আল্লাহ্তায়ালা। তার নাম 'সাল্ওয়া'। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, সালওয়া হচ্ছে এক ধরণের পাখি যা দেখতে অনেকটা বটর পাখির মতো। কেউ কেউ বলেছেন, বটর পাখি হচ্ছে 'সাল্ওয়া'। বিশাল মেঘের আকারে অসংখ্য বটর পাখি বনী ইসরাইলদের আওতায় এসে হাজির হতো- তারা একদিন একরাত্রি পরিমান প্রয়োজন পূরণের মতো পাখি ধরে রেখে দিতো। আর শুক্রবারে সংগ্রহ করতো দুই দিন দুই রাত্রির আহার্য। কারণ শনিবারে বটর পাখিরা নেমে আসতো না।

তোমাদেরকে যা দান করলাম তা থেকে ভালো ভালো বস্তু আহার করো– একথার অর্থ তোমাদের জন্য যে পরিমান হালাল কর হয়েছে সেই পরিমাণ আহার্য গ্রহণ করো। হালাল, পবিত্র অথবা ভালো ভালো বুঝাতে এখানে 'তাইয়েবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ছিলো এরকম একদিনে তোমাদের যতোটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার্য সংগ্রহ করো। পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় কোরো না। বনী ইসরাইলেরা এই নির্দেশের অবমাননা করলো। সঞ্চয় করতে শুরু করলো তারা। আল্লাহ্পাক রুষ্ট হলেন। বন্ধ হয়ে গেলো অনায়াসলভ্য খাদ্য সামগ্রী। তাদের সঞ্চয়েও শুরু হলো পচন। শেষে সম্পূর্ণ সঞ্চয়ই তাদের বিনষ্ট হয়ে গেলো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন– রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের নির্দেশের অবমাননা না করলে বনী ইসরাইলদের আহার্যপ্রবাহ কখনই বন্ধ হতো না। আর বিবি হাওয়া যদি প্ররোচনাপ্রবণা না হতেন তবে কোনো নারী স্বামীর অবাধ্য হতো না।

তারা আমার প্রতি কোনো অন্যায় করে নাই বরং তারা তাদের প্রতিই অন্যায় করেছিলো– একথার অর্থ তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তাদের এ ক্ষতি ছিলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের। নির্দেশ অবমাননার কারণে তারা হয়েছে আখেরাতের শাস্তির উপযোগী। দুনিয়াতে হারিয়েছে শ্রমবিহীন রিজিকের নিশ্চয়তা, আখেরাতে যে রিজিকের হিসেব দিতে হতো না।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

❒ স্মরণ কর যখন আমি বলিলাম, 'এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল– 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব।'

❒ কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম; কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল।

যে জনপদে প্রবেশ করার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে সেই জনপদটির নাম আরীহা। ওই জনপদটি অত্যাচারীদের জনপদ বলে অভিহিত হতো। আদ বংশের একাংশ বসবাস করতো সেখানে। তারা পরিচিত ছিলো আমালেকা নামে। এরকম বলেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। আর মুজাহিদ বলেছেন, ওই জনপদটি হচ্ছে বায়তুল মাক্দিস। কেউ কেউ বলেছেন 'ইলইয়া'। কেউ বলেছেন সিরিয়া।

'যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর'– একথার অর্থ ওই জনপদে তোমাদের জন্য অঢেল রিজিক মওজুত রয়েছে।

'উদখুলুল বাব' অর্থ ওই জনপদ বা নগরীর যে কোনো দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো। বর্ণনায় এসেছে, ওই নগরীর প্রবেশ পথের সংখ্যা ছিলো সাতটি।

'সুজ্জাদন' অর্থ নতশিরে। অর্থাৎ বিনয় প্রকাশার্থে মস্তক অবনমিত করতে করতে প্রবেশ করা। ওয়াহাব বলেছেন এর অর্থ- যখন নগরীতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে শুকরিয়ার সেজদা করবে। এর পরের নির্দেশ হচ্ছে– প্রবেশকালে বলতে থাকো হিত্তা (ক্ষমা চাই) অর্থাৎ এরকম বলো যে, হে আল্লাহ্পাক! আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার মর্ম হচ্ছে– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলো যেহেতু এই বাণী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করলে পাপরাশি বিলুপ্ত হয়। এরপর বলা হয়েছে, এরকম

করলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো। 'খতাইয়াকুম' অর্থ অপরাধসমূহ। শেষে বলা হয়েছে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করবো অর্থাৎ তারা বিনিময় লাভ করবে দ্বিগুন। সৎকর্মপরায়ণদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তাদের আনুগত্য নিঃসন্দিগ্ধ, অন্যদের মত টলো-টলায়মান নয়।

বনী ইসরাইলদের মধ্যে যারা অসৎ প্রকৃতির তারা হিত্তা না বলে অন্য কথা বলেছিলো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারীর পদ্ধতিতে বাগবী বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন—বনী ইসরাইলদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যে, দরোজা অতিক্রমকালে সেজদা করতে করতে এবং হিত্তা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। কিন্তু অসৎ প্রকৃতির লোকেরা অধোবদনে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে প্রবেশ করেছিলো এবং 'ক্ষমা চাই' একথা বলার পরিবর্তে 'জবের মধ্যে শস্য' এরকম বলতে বলতে যাচ্ছিলো।

অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম (আল্লাজীনা জ্বলামু) বলে বারংবার বনী ইসরাইলদের প্রতি আরোপিত শাস্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এরকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জঘন্য স্বভাব চরিত্র যেনো পৃথিবীবাসীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের কৃতকর্মের কারণেই যে বার বার শাস্তি আরোপিত হচ্ছে— এ কথাটা বিশেষভাবে প্রচার করে পৃথিবীবাসীদেরকে সতর্ক করে দেয়াও এরকম বাকভঙ্গীর আরেকটি উদ্দেশ্য। আনুগত্যের স্থলে অবাধ্যতা প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে আত্মহননেরই নামান্তর।

আমি বলি, এ রকম বাণীভঙ্গীর কারণ এও হতে পারে যে, যদি 'আলাল্লাজীনা জ্বলামু' এর স্থলে কেবল 'আলাইহিম' বলা হতো, তবে এই সন্দেহটি জেগে উঠতে পারতো যে, ওই শাস্তি ছিলো সমস্ত বনী ইসরাইলের উপরে, আয়াতের বিবরণ ভঙ্গীতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, কেবল অপরাধীদের উপরে শাস্তি নেমে এসেছিলো।

'রিজ্‌ঝা' অর্থ শাস্তি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, কোরআন মজীদের যেখানে যেখানে রিজ্‌ঝা শব্দটি রয়েছে তাদের প্রতিটি স্থানেই এর অর্থ হবে শাস্তি। অভিধানে রিজ্‌ঝা শব্দটি ওই বস্তুকে বুঝায় যা স্বভাবতঃ ঘৃণা উদ্রেককারী অথবা যা রুচিকর নয়।

'মিনাস্‌সামায়ি' অর্থ আকাশ থেকে। আকাশ থেকে প্রেরিত এ শাস্তি সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সেই শাস্তি ছিলো মহামারী প্লেগ। সেই প্লেগের প্রার্দুভাবে এক ঘন্টায় সত্তর হাজার বনী ইসরাইল নিপাত হয়েছিলো। ইবনে জারীর বলেছেন, ইবনে জায়েদের বর্ণনায় এসেছে— মহামারীও একটা শাস্তি যা তোমাদের প্রতি আপতিত হয়েছিলো। এতে করে বুঝা যায় বনী ইসরাইলের উপর প্লেগের প্রার্দুভাব ঘটেছিলো।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

❒ স্মরণ কর, যখন মুসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবন প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম, 'আল্লাহ্ -প্রদত্ত জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং সত্যত্যাগী হইয়া পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

যেদিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই কেবল ধূ ধূ বালুকারাশি, বৃক্ষগুল্মহীন প্রান্তর– পাথুরে পাহাড়; ওই প্রান্তরে বন্দী বনী ইসরাইলীরা হয়ে পড়লো তৃষ্ণার্ত। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার সকাশে পানি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। ওই লাঠিটি ছিলো বেহেশতের একটি যষ্টি। দশ হাত লম্বা ছিলো লাঠিটি। চিহ্নিত ছিলো দু'টি ভাগে। অন্ধকারে আলো ঠিকরে পড়তো লাঠি থেকে। হজরত আদম এই লাঠি বেহেশত থেকে এনেছিলেন পরে বংশানুক্রমে লাঠিটি হজরত শোয়াইব আ. এর হাতে এসে পড়ে। তাঁর মাধ্যমে পান হজরত মুসা।

লাঠি দ্বারা যে পাথরে আঘাত করতে বলা হয়েছে, সে পাথরটি ছিলো চতুষ্কোন বিশিষ্ট। আকারে ছিলো মানুষের মাথার

সমান। হজরত মুসা ওই পাথরটি একটি চামড়ার থলিতে সংরক্ষণ করতেন। এরকম বলেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। আতা খোরাসানী বলেছেন, ওই পাথরটির ছিলো চারটি কোন। প্রতি কোন থেকে তিনটি করে ঝর্ণা প্রবাহিত হতো। এমনিভাবে বারোটি ধারা প্রবাহিত হতো বারোটি গোত্রের জন্যে। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এ পাথরটি ছিলো ওই পাথর, যার উপরে পরিধেয় রেখে হজরত মুসা নদীতে গোসল করতে নেমেছিলেন। ঘটনাটি এরকম– হজরত মুসা তাঁর পবিত্র শরীর প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখতেন। এতে করে কিছু লোক মন্তব্য করেছিলো, তাঁর একশিরা নামক ব্যাধি আছে। এটাই তাঁর অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারের কারণ। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ছিলো তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে অপবাদমুক্ত করবেন। তাই সংঘটিত হলো এ ঘটনাটি। একটি নির্জন স্থানে একটি পাথরের উপরে গাত্রাবরণ রেখে পানিতে

নামলেন হজরত মুসা। ঠিক তখনই গাত্রাবরণ নিয়ে পাথরটি দৌড়াতে শুরু করলো। পাথরের পিছনে দৌড় দিলেন হজরত মুসা। এ অবস্থায় ওই লোকদের সম্মুখীন হলেন যারা অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছিলো। পাথরটি থেমে পড়লো। অতি দ্রুত পাথরের উপরে রাখা কাপড় নিয়ে তিনি তাঁর পবিত্র শরীর আচ্ছাদিত করলেন। হঠাৎ হজরত জিব্‌রাইল আর্বিভূত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ এই যে, পাথরটি আপনি আপনার কাছে রাখুন। ভবিষ্যতে এক সময় আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত এবং আপনার অলৌকিকত্ব এই পাথরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। তখন থেকে ওই পাথরটি একটি চামড়ার থলিতে করে সংরক্ষন করে আসছিলেন হজরত মুসা। বোখারী ও মুসলিমে পাথরের পলায়ন কাহিনী বিবৃত হয়েছে, কিন্তু হজরত জিব্‌রাইলের আগমনের উল্লেখ সেখানে নেই। হজরত কাতাদা থেকে আরদ বিন হামিদ বলেছেন, পাথরটি ছিলো তুর পাহাড়ের। বনী ইসরাইলেরা সেটা সাথে সাথে রাখতো। পাথরের প্রকৃতি নির্ণয়ে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেছেন, সেটি ছিলো মর্মর পাথর, কেউ আবার বলেছেন পাথরটি ছিলো ছঙ্গে কুর্দান। পাথরটিতে ছিলো বারোটি গর্ত। লাঠি দিয়ে আঘাত করলে প্রতিটি গর্ত থেকে একটি করে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতো। প্রতিটি গোত্র পরিতৃপ্ত হলে হজরত মুসা তাঁর লাঠি দিয়ে পাথরটিতে পুনঃ আঘাত করতেন; তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যেতো পানির প্রস্রবণ। তিনি তখন পাথরটি তাঁর চামড়ার থলিতে রেখে দিতেন। ওই পাথরের প্রস্রবণ প্রতিদিন ছয়লক্ষ তৃষ্ণার্তকে পরিতৃপ্ত করতে পারতো।

ওয়াহাব ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেছেন, পানির প্রস্রবণ জারী হওয়ার ব্যাপারটা কোনো নির্দিষ্ট পাথরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো না। বিষয়টি ছিলো হজরত মুসার মোজেজা। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে যে পাথরেই আঘাত করতেন সে পাথর থেকেই পানি প্রবাহিত হতো। আতা বলেছেন, হজরত মুসা পাথরের বারোটির স্থলে, বারো বার লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। সেসব স্থানে রমনী স্তনের মতো একটি করে গোশ্‌ত প্রকাশ পেতো। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে পানি নির্গত হতো এবং পরে তা নদীর আকার ধারণ করতো।

বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিলো। অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রের জন্য ছিলো স্বতন্ত্র পান-ঘাট। তারা তাদের নির্ধারিত পান-ঘাট ছেড়ে অন্য ঘাটে কখনোও যেতো না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের এই নির্দেশ দান করলেন যে, আহার করো মান্না ও সালওয়া এবং পান করো এই অলৌকিক ঝর্ণার পানি। আয়াতে 'রিজক্বিল্লাকুম' শব্দের মাধ্যমে এই সুনিশ্চিত ও অনায়াস লব্ধ রিজিকের কথা বলা হয়েছে। এ রিজিক অবশ্যই বিশেষ ধরণের। এই রিজিক অর্জিত নয়, প্রদত্ত। বিশেষ অনুগ্রহমন্ডিত শ্রমবিহীন জীবনোপকরনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌তায়ালা আয়াতের শেষে এই মর্মে সদুপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সত্য ত্যাগ করে

পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে যেয়ো না। কাযী বায়যাবী বলেছেন, 'মুফসিদিন' অর্থ অনর্থ সৃষ্টি কোরো না। অনর্থ মাত্র কোরো না– এরকম অর্থও হতে পারে। কখনোও আবার কোনো প্রতাপশালী অত্যাচারীর বিরোধীতাকেও এই শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। কখনো আবার শব্দটি সোলেহ্ বা সংশোধনের নিমিত্তে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন হজরত খিজির আ. কর্তৃক একটি নিষ্পাপ শিশুর নিহত হওয়া, নৌকা ফুটো করে দেয়া ইত্যাদি।

আমি বলি, 'আছা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় বা অপব্যয়। হজরত ওমর ফারুক বর্ণিত হাদিসে এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয়, যেখানে বলা হয়েছে– 'ক্বলা রসুলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিসরা ওয়া কাইসার ইয়া আইসানি ফিমা ইয়াইসানি ফিহি ওয়া আনতা হাকাজা।' অর্থাৎ হজরত ওমর রসুল পাক স. এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কেসরা ও কায়সার (রোম ও পারস্যের বাদশাহ্) বিশাল বৈভব অপব্যয় করে চলেছে আর আপনি! (আল্লাহ্‌র রসুল) একি দীন-হীন অবস্থা আপনার? এ হাদিসের বর্ণনার রীতি অনুযায়ী মুফ্‌সিদিন শব্দটি হালে মুয়াক্কাদ না হয়ে হালে মুকাইয়িদ হবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬১

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ
بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا
مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

❒ যখন তোমরা বলিয়াছিলে 'হে মুসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর– তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মুসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যাহা চাও

তাহা সেখানে আছে।' এবং তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্রগ্রস্ত হইল ও তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।

মরু প্রান্তরের বন্দী জীবনে বণী ইসরাইলের প্রতিদিনের পানাহার ছিলো একই রকম। মান্না ও সাল্‌ওয়া এবং সেই অলৌকিক ঝর্ণার পানি। একই রকম পানাহারের পুনরাবৃত্তিতে তারা অপ্রসন্ন হলো। অধৈর্য হয়ে বললো, 'হে নবী মুসা! এরকম একধরণের পানাহার আর আমাদের ভালো লাগে না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। তিনি যেনো আহার্য হিসেবে আমাদেরকে শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর, পেঁয়াজ ইত্যাদি ভূমিজাত আহার্য বস্তু দান করেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফুমিহা' অর্থ রুটি। আতা বলেছেন 'গম।'

বনী ইসরাইলদের ধৈর্যহীনতা ও মূর্খজনোচিত আব্দার শুনে হজরত মুসা বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুর বদলে নিকৃষ্টতর বস্তুর আকাঙ্খা করো? উৎকৃষ্টতর বস্তু বুঝাতে এখানে খয়ের শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– এর মর্ম হচ্ছে মান্না ও সাল্‌ওয়া। এগুলো খয়ের এজন্যই যে, শ্রমের কষ্ট ছাড়াই এগুলো পাওয়া যাচ্ছিলো আর এগুলোর জন্য পরকালে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না, আর এগুলো পার্থিব স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য মহা উপকারী।

হজরত মুসা বললেন, উৎকৃষ্টতার পরিবর্তে যদি নিকৃষ্টতাই তোমাদের কাম্য হয়, তবে এমন কোনো নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হও; যেখানে তোমরা তোমাদের কাম্য বস্তু লাভ করবে। জুহাক বলেছেন, এখানে নগর বলতে ফেরাউন শাসিত নগর বুঝানো হয়েছে। এভাবেই বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধের স্বীকার হলো। ফলে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য হলো তাদের নিত্য সঙ্গী। দারিদ্র্য বুঝাতে এখানে 'মাস্‌কানাহ্' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। দারিদ্র্য মানুষকে অকর্মন্য ও হীনমন্য করে দেয়। আশা ও উদ্দীপনাকে করে তিরোহিত। অর্থশালী ইহুদীদেরকেও সম্পদহীনদের মতো জীবন-উত্তাপ বিবর্জিত পরিদৃষ্ট হয়। কারণ, তাদের অন্তর দরিদ্র। বিরামহীন সম্পদ লিপ্সার কারণে তারা হীনমন্যতার স্বীকার। তাই কেউ কেউ বলেছেন, মাস্‌কানাহ্ শব্দের অর্থ অন্তরের অনুদারতা ও বিত্তলিপ্সা। আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করতো বনী ইসরাইলেরা, তাই তাদের এই করুণ পরিণতি। এখানে আয়াত অস্বীকারের অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের ওই সকল আয়াতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন; যেগুলোতে রয়েছে রসুল মোহাম্মদ স.এর গুণাবলীর বিবরণ। তারা অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নবীহত্যা। নবীহত্যা অন্যায় জেনেও তারা এ জঘন্য অন্যায় কর্মে লিপ্ত হতো। বর্ণিত হয়েছে– ইহুদীরা একদিনেই সত্তরজন নবীকে হত্যা করেছিলো।

ইহুদীরা অবাধ্য। সীমালঙ্ঘনকারী। তাদের উপর আল্লাহ্র গজব নেমে আসার কারণ অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ৬২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

❒ যাহারা বিশ্বাস করে, যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টান ও সাবেঈন– যাহারাই আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোনো ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

যারা বিশ্বাস করে- একথা বলে মুখে ও মনে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং শুধু মৌখিক বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকেও (মুনাফিকদেরকেও) বুঝানো হয়েছে। আর ইহুদী হয়েছে বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ধর্মমত অবলম্বনকারীদেরকে। ইয়াহুদ শব্দটি আরবী হাদ শব্দ থেকে গঠিত যার অর্থ তওবা করলো। গো-বৎস্য পূজা থেকে যারা তওবা করেছিলো তাদের নাম ইহুদী। তারা আরো বলেছিলো, 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবৃত হয়েছি।' একারণেও তাদেরকে ইহুদী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে। হজরত ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিলো ইয়াহুদ। তাঁর নামেই তাঁর পরবর্তী বংশধরদের নাম ইহুদী করা হয়েছে– এভাবেও ইহুদী নামের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। কারণ, পুর্বপুরুদের নামে কোনো গোত্রকে চিহ্নিত করার রীতিটি বহুল প্রচলিত।

'আন্নাসারা' অর্থ খৃষ্টান। শব্দটি নাস্রন শব্দের বহুবচন। শব্দটির অর্থ সাহায্যকারী। তাদেরকে নাসারা বা খৃষ্টান এজন্যই বলা হয় যে, তারা হজরত ঈসা আ.কে সাহায্য করেছিলো। অথবা এরকমও অর্থ হতে পারে যে, হজরত ঈসার সহচরবৃন্দ ছিলেন নাসেরা বা নাসরান নামক স্থানের অধিবাসী। তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়।

'ওয়াস্সাবেঈন' শব্দটি মদীনাবাসীগণ 'হামযা' ব্যতিরেকে পাঠ করেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেন হামযা সহযোগে। সাবিউ শব্দটির মূল অর্থ আল খুরুজ (বের হও)। যখন কেউ ধর্ম থেকে বের হয়ে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন আরবীভাষীগণ

তাদেরকে বলে সাবিউ ফুলানা (অমুক ধর্মান্তরিত হয়েছে) — এভাবে উটের দাঁত গজালে তারা বলে, উটের দাঁত বের হয়েছে। এক্ষেত্রেও তারা সাবিউ শব্দটি ব্যবহার করে। যারা সকল ধর্ম থেকে বহিঃষ্কৃত তাদেরকেই সাবেইন বলা হয়। হজরত ওমর ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, সাবেঈন আহলে কিতাবের একটি উপদলের নাম। তবে তাদের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। হজরত ওমর বলেছেন, তাদের জবেহ্ করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হালাল নয়। মুজাহিদ বলেছেন, সাবেঈন সম্প্রদায় আহলে কিতাবের একটি দল। তাদের ধর্মমত ইহুদী ও অগ্নিপূজকদের মাঝামাঝি। কালাবী বলেছেন, তাদের ধর্মাদর্শ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের মাঝামাঝি। তারা ইহুদীও নয়। খৃষ্টানও নয়। কাতাদা বলেছেন, সাবেঈন ওই সম্প্রদায় যারা যবুর শরীফ পাঠ করে। ফেরেশতাদের উপাসনা করে। কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে। এভাবে তারা বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলো।

ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেঈন– যে সম্প্রদায়ের লোকই হোকনা কেনো, তারা যদি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, শেষ দিবসে আস্থাশীল হয় এবং সৎকাজের ব্রত গ্রহণ করে- একথার অর্থ, আল্লাহ্, রসুল মোহাম্মদ স. এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান আনয়ন করে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, একথার অর্থ, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যাঁরা বিশুদ্ধ মুমিন। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম শ্রেণীর মুমিন। কারো কারো মত হচ্ছে, ওই সকল মুমিন যাঁরা রসুল পাক স. এর আবির্ভাবের পূর্বে ইমান ও সত্যধর্মের সন্ধানে ছিলেন। যেমন, হাবীবে নাজ্জার, কায়েস বিন সায়েদা, যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, ওয়ারাকা বিন নাওফেল, আল বারাউস্ সাত্তা, আবু জর গিফারী, সালমান ফারসী, পাদ্রী বুহাইর এবং নাজ্জাশীর দূত। এদের মধ্যে কয়েকজনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। অর্থাৎ তাদের কয়েকজন রসুল পাক স. এর করুণাস্নাত হয়ে দ্বীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবাগণের দলভূত হতে পেরেছিলেন। বাকীরা এরকম সুযোগ পাননি। খতিব বাগদাদী বলেন, এখানে 'ইন্নাল্লাজিনা আমানু'– একথার অর্থ হচ্ছে, ওই সকল লোক যারা হজরত মুসা আ. এর শরিয়ত রহিত হওয়ার পূর্বে ইমানদার ছিলেন। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণের পর 'মান আমানা মিনহুম' এর অর্থ হবে, ওই সকল মানুষ যাঁরা ইমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি বলি, 'মান আমানা মিনহুম' এর অর্থ, ওই সকল লোক যাঁদের দেহমন শুদ্ধ, পবিত্র, পূর্ণ ও আলোকিত। তাঁরা হচ্ছেন সম্মানিত সুফী সম্প্রদায়। যেহেতু রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ইমানদার নও যতোক্ষন না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল কিছু অপেক্ষা প্রিয় না হই। হজরত আনাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। অপর একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালো- অপরের জন্য তাই ভালো মনে না করবে। এই হাদিসটিও হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম,

আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র বান্দাগণ যতোক্ষণ না নিজের কথার জন্য না হবে- ততোক্ষণ সে ইমানের হকীকতে পৌঁছতে পারবেনা (অর্থাৎ যতোক্ষণ না নিজের মুখনিঃসৃত কটুকথার জন্য ব্যথিত না হবে)। তিবরানী। বাগবী বলেছেন, সম্ভবতঃ 'মান আমানা মিনহুম' এর পূর্বে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি উহ্য রয়েছে। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে এরকম– হে মোহাম্মদ স.! যাঁরা আপনার উপরে ইমান এনেছে।

ইমান এনে যারা সৎকাজে ব্রতী হবে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। 'আজর' অর্থ, প্রতিদান বা পুরস্কার। যে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার আল্লাহ্তায়ালা করেছেন– সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্র নৈকট্য, জান্নাত এবং শান্তি প্রবাহ– যেখান থেকে নৈকট্যভাজনেরা পরিতৃপ্ত হবেন।

শেষে বলা হয়েছে, তখন তাদের আর কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। অর্থাৎ আখেরাতে যখন অবিশ্বাসী সম্প্রদায় শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে, সংকীর্ণচিত্ত অবাধ্যরা যখন অপমান ও সন্তাপে জর্জরিত হতে থাকবে, তখন বিশ্বাসীরা হবে শংকাহীন। তখন তাদেরকে আর দুঃখের ভার বহন করতে হবে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

❒ স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং 'তুর'কে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, 'আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং তাহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার।'

❒ ইহার পরেও তোমরা মুখ ফিরাইলে! আল্লাহের অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে।

আল্লাহ্পাক এখানে কৃত অঙ্গীকারের কথা এবং বনী ইসরাইলদের মাথার উপরে পাহাড় স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অঙ্গীকারটি ছিলো, হজরত মুসার আনুগত্য ও তওরাতের অনুসরণ সংক্রান্ত। সুরইয়ানী ভাষায় পাহাড়কে বলে 'তুর'। এখানে তুর শব্দটির মাধ্যমে কোনো একটি পাহাড়ের কথা বলা

হয়েছে। বাগবী বলেছেন, ঘটনাটি ছিলো এরকম- তওরাত নাজিল হলে হজরত মুসা তওরাতকে মান্য করতে এবং এর বিধানাবলী বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় উপেক্ষা ও অনীহা প্রকাশ করলো। তওরাতের বিধানাবলী ছিলো অত্যন্ত কঠিন। হজরত মুসার শরিয়ত তাই কঠিনতর। হজরত মুসার নির্দেশ উপেক্ষা করলে আল্লাহ্পাকের নির্দেশে হজরত জিবরাইল একটি বিশাল পাহাড় তুলে এনে বনী ইসরাইলদের মাথার উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখলেন। হজরত আদম আ. এর দৈহিক উচ্চতা যতোখানি ছিলো ততোখানি উপরে ছিলো পাহাড়টি। হজরত জিবরাইল বললেন, তওরাতকে অমান্য করলে তোমাদের উপর এই বিশাল পাহাড়টি ছেড়ে দেয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এরকম বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে আতা বর্ণনা করেছেন, তাদের মাথার উপর পাহাড় দাঁড় করানো হলো। আর সামনের দিক থেকে একটি অগ্নিশিখা এবং পিছন দিক থেকে একটি ভয়ংকর গর্জনমুখর আগুনের সাগর তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো। নির্দেশ দেয়া হলো, তওরাতকে গ্রহণ করো। নতুবা পাহাড় ও অগ্নিসাগর এক সঙ্গে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে, আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করো এবং তাতে যা আছে স্মরণ রেখো যাতে তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করে পরিত্রাণ পাও। 'তাকওয়া' অর্থ সাবধানতা। যিনি এই সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনি মুত্তাকী।

মাথার উপর বিশাল পাহাড় দর্শনে উপায়ান্তর না দেখে বনী ইসরাইলেরা তৎক্ষণাৎ নির্দেশ মেনে নিলো এবং সেজদায় পতিত হলো। সেজদাবস্থাতে তারা ঘাড় কাত করে পতনোন্মুখ পাহাড়টি দেখছিলো। এরপর থেকে তাদের মধ্যে কাত হয়ে সেজদার প্রচলন শুরু হয়। তারা বলে, এরকম সেজদাই উত্তম। কারণ, এর মাধ্যমেই আল্লাহ্র আযাব সরে গিয়েছিলো।

কিন্তু বনী ইসরাইলেরা তাদের কথায় শেষ পর্যন্ত অচঞ্চল থাকতে পারেনি। তাই এখানে বলা হয়েছে, এরপরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের প্রতি রয়েছে, যদি না থাকতো তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হতে। শাস্তি বিলম্বিত করাকেই এখানে ফজল বা অনুগ্রহ বলা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরকম হতে পারে যে, হে বনী ইসরাইল! যদি নবী মোহাম্মদ স. এর আগমন না ঘটতো, তবে তোমাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নৈসর্গিক আপদ বিপদ ঘটতেই থাকতো। কিন্তু তা ঘটেনি একারণে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. মহাবিশ্বের রহমত (অনুকম্পা) স্বরূপ। তাঁর কারণেই তোমাদের শাস্তি বিলম্বিত করা হয়েছে। তাই আগের মতো ভূমিধ্বস ও রূপান্তরের শাস্তি স্থগিত রয়েছে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۞ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞

❒ তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃনিত বানর হও।'

❒ আমি ইহা তাহাদের সম-সাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহনের জন্য দৃষ্টান্ত ও সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছি।

'সাব্‌তি' শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা বা পৃথক করা। কিন্তু এই আয়াতে উল্লেখিত 'সাব্‌তি' শব্দের অর্থ হবে শনিবার। কারণ, শনিবারেই আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। ইহুদীদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, শনিবারে পার্থিব সকল কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে হবে। এ কারণেও শনিবারকে সাবতি বলা হয়ে থাকতে পারে। শনিবারের সীমালঙ্ঘন সংক্রান্ত ঘটনাটি এরকম– হজরত দাউদ আ. এর যুগে সাগরতীরের একটি শহরে সত্তর হাজার বনী ইসরাইল বসবাস করতো। তারা ছিলো মৎস্যজীবি। আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ ছিলো শনিবারে তারা মৎস্য শিকার করতে পারবে না। ওই দিন কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে হবে। সপ্তাহের অবশিষ্ট ছয় দিনের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কিন্তু বনী ইসরাইলেরা দেখতে পেতো, শনিবারেই মাছের আনাগোনা বেশী হয়। ওই দিন অসংখ্য মাছের ঝাঁক পানির উপরে ভেসে বেড়াতে থাকে। পানি অপেক্ষা মাছই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য ছয় দিন এতো মাছ নজরে পড়ে না। ইহুদীরা তখন একটি কৌশল বের করলো। তীরভূমিতে তারা খনন করে রাখলো অনেক খাল বা চৌবাচ্চা। জোয়ারের সময় তীরভূমি প্লাবিত হতো। ভাটার সময় পানি সরে গেলে চৌবাচ্চার বদ্ধ পানিতে অনেক মাছ আটকা পড়ে যেতো। শনিবারে এভাবে মাছ আটকে রাখতো তারা। পরদিন সহজেই সেগুলোকে ধরে ফেলতো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা শনিবার দিন তটভূমিতে পেতে রাখতো মাছ ধরার জাল অথবা অন্য কোনো ফাঁদ। শনিবারের জোয়ারে সেগুলোতে অনেক মাছ আটকা পড়ে যেতো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা ছিলো বলে সেদিন তারা সেগুলোকে ধরতো না। পরের দিন রবিবারে তারা সেই মাছ তুলে আনতো। অবশ্য সকলেই এরকম করতো না। তিন ধরনের লোক ছিলো তাদের মধ্যে। এক ধরনের লোক নিজেরা এ কৌশল

অবলম্বন করতোই না। উপরোক্ত অন্যদেরকে নিষেধ করতো। দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা নিজেরা এহেন অপকর্ম করতো না বটে, কিন্তু অন্যদেরকে নিষেধও করতো না। তৃতীয় প্রকার লোকেরা তাদের পুরো কৌশল কাজে লাগাতো। কারো বাধা-নিষেধের প্রতি কর্ণপাত করতো না তারা। যারা এই অপকর্ম থেকে অন্যদেরকে বিরত থাকতে বলতো তাদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার। নিষেধ অমান্যকারীদেরকে অভিশম্পাত দিয়েছিলেন হজরত দাউদ আ.। তাঁর অভিশম্পাতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক কুটকৌশল অবলম্বনকারীদেরকে বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে– 'তোমরা ঘৃনিত বানর হও।'

এ ঘটনাটি ছিলো তৎকালীন এবং তৎপরবর্তিকালীনদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা। 'নাকালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ, নিষেধ করা বা বাধা দেয়া। কিন্তু এখানে এর অর্থ হবে, দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা। কারণ দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাই মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। জেলখানাকেও নাকালা বলা হয় একারণেই। যেহেতু জেলখানা বন্দীকে পলায়ন থেকে বাধা দেয়।

'সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের'– একথা বলে তৎসময়ের এবং তৎপরবর্তি সময়ের মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের জন্য অবাধ্যতার এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটিকে একটি নিদর্শন করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, শাস্তিটি ছিলো সমসাময়িক– যার প্রতিক্রিয়া কিয়ামত দিবসেও পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ এ পাপের জন্য কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। এ ব্যাখ্যাটি অবশ্য অনেকটা কষ্টকল্পনার মতো।

শেষে বলা হয়েছে, 'সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।' এখানে সাবধানীগণ বলতে হজরত মোহাম্মদ স. এর উম্মতদেরকে বুঝতে হবে। তাঁরা সাবধানী। আর সাবধানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ৬৭

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا
أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِينَ ۝

❐ যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়াছেন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ?' মুসা বলিল, 'আল্লাহ্‌র স্মরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অর্ন্তভুক্ত না হই।'

এ আয়াতে বর্ণিত গরু জবাইয়ের পূর্ণ বিবরণ শুরু হয়েছে পরবর্তী রুকু থেকে (৭২ নং আয়াত থেকে)। ঘটনাটি আগাম উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নিছক কাহিনী বর্ণনাই কোরআন মজীদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পৃথক পৃথক ভাবে বনী ইসরাইলদের অপকীর্তিগুলোকে চিহ্নিত করাই উদ্দেশ্য। নেয়ামতের অস্বীকৃতি, অবতীর্ণ বিধানাবলীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, বিধিনিষেধের বিকৃতি, অবাধ্যতা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে তুলে ধরাই আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য। গরু জবাই সংক্রান্ত ঘটনাটি ছিলো এরকম– বনী ইসরাইলদের মধ্যে আমীল নামে এক বিত্তশালী লোক ছিলো। তার স্বজন বলতে ছিলো এক চাচাতো ভাই। সে চাচাতো ভাই ভাবলো, সে ছাড়া আর কোনো অংশীদার যখন নেই, তখন আমীলকে হত্যা করলেই তার পূরো সম্পদ তার অধিকারে এসে পড়বে। সে সুযোগ বুঝে একদিন আমীলকে হত্যা করে ফেললো। তারপর তার লাশ গোপনে অন্য এক গ্রাম সংলগ্ন মাঠে রেখে এলো। পরদিন সে চিৎকার করে লোক জড়ো করে জানিয়ে দিলো, আমীলের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। লাশের সন্ধান যখন পাওয়া গেলো, তখন সে ওই মাঠ সংলগ্ন গ্রামের কয়েকজনকে হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করলো। হজরত মুসা এই ঘটনাটি জানতে পেরে অভিযুক্তদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু তারা কোনোক্রমেই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত নয় বলে জানালো। তখন জনতা হজরত মুসাকে বললো, 'হে নবী মুসা! আপনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করুন যেনো এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান যেনো মিলে। হজরত মুসা দোয়া করলেন। নির্দেশ এলো, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন। লোকেরা বললো, হে মুসা! তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছো? জনতা বুঝতে পারেনি যে, আল্লাহ্তায়ালার সকল নির্দেশই হিকমতময়। তারা হত্যাকারী সনাক্ত করার বিষয়ের সঙ্গে গরু জবাইয়ের বিষয়টিকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলো না। তাই তাদের মনে হচ্ছিলো যেনো হজরত মুসা তাদেরকে উপহাসের পাত্র মনে করেছেন। তাদের হঠকারিতামূলক মন্তব্য শুনে হজরত মুসা বললেন, আমি আল্লাহ্র শরণপ্রার্থী। আল্লাহ্পাক যেনো আমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুত না করেন। লোকেরা বুঝতে পারলো, হুকুমটি অবধারিত। আর হুকুমটিও যেহেতু হত্যাকারী সনাক্ত করার ব্যাপারটার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল মনে হচ্ছে না, তখন যে গরু জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে গরু নিশ্চয়ই সাধারণ গরু হবে না। এ মনে করে তারা জবাইযোগ্য গরুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্নরকম প্রশ্নের অবতারণা করলো। স্বকপোলকল্পিত ধারণার এই জটিলতা মূর্খতার একটি বড় নিদর্শন বটে। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ওই লোকেরা যদি সরল অন্তকরণে আল্লাহ্র নির্দেশকে মান্য করে যে কোনো গরু জবাই করতো, তবে সেটাই যথেষ্ট হতো। তারা কুটতর্কের অবতারণা করলো। সেই সূত্রে আল্লাহ্পাকও তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করলেন। হজরত ইকরামা থেকে এই হাদিসটি মুরসালরূপে

বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন মানসুর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন মওকুফ রূপে। বনী ইসরাইল জনতার অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ প্রকৃতির গাভী জবাই করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আল্লাহ্পাকের এক বিস্ময়কর রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিলো এই ঘটনাটিতে।

বনী ইসরাইলদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ লোক ছিলো। তার ছিলো এক শিশু সন্তান। আর ছিলো একটি গো-শাবক। মৃত্যুর পূর্বে গো-শাবকটি সে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা জানালো, হে দয়াময়! এই বাছুরটি আমি আমার শিশু সন্তান যুবক হওয়া পর্যন্ত গচ্ছিত রাখলাম। তখন থেকে বাছুরটি জঙ্গলে আপনাআপনি চরে বেড়াতে লাগলো। মানুষের পদশব্দ পেলেই সে লোকচক্ষুর অন্তরালে পালিয়ে যেতো। তাই কেউ চেষ্টা করলেও সেটিকে ধরতে পারতো না। ইতোমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলো সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিটি। ক্রমে ক্রমে তার শিশু সন্তানটি যৌবনে পদার্পন করলো। সেও ছিলো সৎ এবং তার বিধবা মায়ের প্রতি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ। রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করতো সে। এক ভাগ নিদ্রার জন্য। এক ভাগ ইবাদতের জন্য এবং আরেক ভাগ মায়ের সেবা শুশ্রুষার জন্য। প্রত্যুষে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রয় করতো। আর এ উপার্জনকেও সে তিন ভাগে ভাগ করে নিতো। এক ভাগ ব্যয় করতো আল্লাহ্র পথে, একভাগ ব্যয় করতো মায়ের জন্য এবং অপরভাগ নিজের জন্য। একদিন মা বললেন, বৎস! তোমার পিতা তোমার জন্য একটি গাভী রেখে গিয়েছেন। ওমুক জঙ্গলে গাভীটি আল্লাহ্পাকের হেফাজতে রয়েছে। তুমি ওই জঙ্গলে যাও এবং বলো, হে ইব্রাহিম ও ইসমাইলের প্রতিপালক! আমার জন্য নির্ধারিত গাভীটি আমাকে দিয়ে দাও। গাভীটির নিদর্শন এরকম– যখনই তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে দেখবে তার চামড়া থেকে যেনো সূর্যকিরণ ঠিকরে পড়ছে। গাভীটি ছিলো দেখতে ভারী সুন্দর। গাত্রবর্ণ হালকা জাফরানী রঙের। তাই মানুষ সেটিকে সোনালী গাভী বলতো। মাতৃ আদেশে যুবকটি সেই জঙ্গলে গিয়ে বললো, হে ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপাস্য! আমার গাভীটি আমাকে দাও। একথা বলার সাথে সাথে গাভীটি তার নিকট এলো। সে তখন গাভীটির গলা ধরে টানতে শুরু করলো। অনন্যসাধারণ গাভীটি কথা বলতে শুরু করলো। বললো, ওহে মাতৃসেবক! আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করো। আরামে গৃহাভিমুখে যেতে পারবে। যুবক বললো, আমার মা এরকম বলেননি। গাভী বললো, ঠিকই বলেছো। যদি তুমি আমার কথা মান্য করতে তবে আমি তোমাকে অমান্য করতাম। মাতৃ আনুগত্য তোমাকে এরকম মর্যাদাশীল করেছে যে, তুমি যদি কোনো পাহাড়কে তোমার সঙ্গে চলতে আদেশ করো, তবে পাহাড়ও স্বস্থান ত্যাগ করে তোমার সহগামী হবে। যুবক গাভীটিকে নিয়ে তার মায়ের কাছে এলো। মা বললেন, কাঠ কাটা এবং ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ তোমার জন্য খুবই কষ্টের

কারণ। তাই আমি বলি, তুমি গাভীটি বেচে দাও। ক্রেতা মূল্য জিজ্ঞেস করলে বোলো, তিন দিনার। তবে বিক্রয়কালে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিন্তু বিক্রয় কোরো না। নতমস্তকে মাতৃ আদেশ পালন করলো যুবক। সে গাভীটি নিয়ে বাজারে গেলো। এদিকে আল্লাহ্পাক তার মাতৃভক্তি যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট ক্রেতারূপে এক ফেরেশ্তাকে পাঠালেন। সেই ক্রেতা বললো, মূল্য কতো? যুবক বললো, মাতৃ অনুমতি সাপেক্ষে তিন দিনার। ফেরেশ্তা বললেন, ছয় দিনার নিয়ে গাভীটি দিয়ে দাও। তোমার মাকে আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। যুবক বললো, গাভীর সমান স্বর্ণ প্রদান করলেও আম্মাজানের অনুমতি ছাড়া আমি একে হস্তান্তর করতে পারবো না। এই বলে সে মায়ের কাছে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বললো। মা জানালেন, যাও ছয় দিনারেই বিক্রি করে দাও। তবে ক্রেতাকে জানিয়ে দিও, এই বিক্রয়ও মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে হবে না। যুবক পুনরায় বাজারে গেলো। অপেক্ষমান সেই ক্রেতা জিজ্ঞেস করলো, মায়ের অনুমতি পেয়েছো কি? যুবক বললো, শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি পেয়েছি। তিনি বলেছেন, এই বিক্রয়ও সংঘঠিত হতে হবে তাঁর সন্তোষ সাপেক্ষে। ক্রেতা বললো, শোনো! মাকে জিজ্ঞেস করে আর কাজ নেই। তুমি বরং বারো হাজার দিনারে বিক্রয়ের কাজটি সম্পন্ন করো। যুবক রাজী হলো না। সে পুনারায় তার মায়ের কাছে গিয়ে সবকথা খুলে বললো। মা বললেন, শোনো পুত্র! ওই ক্রেতা সাধারণ কোনো ক্রেতা নয়। তিনি ফেরেশ্তা। তিনি তোমার মাতৃভক্তির পরীক্ষা নিচ্ছেন। পুনরায় তাঁর সাক্ষাত পেলে বোলো, আমি এখন ওই গাভীটিকে বিক্রয় করতে পারবো কি না? যুবক পুনরায় বাজারে গিয়ে দেখলো ক্রেতা সে স্থানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বললো মা জিজ্ঞেস করেছেন, গাভীটি এখন বিক্রয় করা যাবে কি না? ক্রেতারূপী ফেরেশ্তা বললেন, না এখনো গাভী বিক্রয়ের সময় হয়নি। হজরত মুসা একটি হত্যাকান্ডের ফয়সালা করার জন্য এই গাভীটি কিনবেন। তখন এর চামড়া ভর্তি দিনারের কমে গাভীটি বিক্রয় কোরো না।

বনী ইসরাইলেরা জবাইয়ের নির্দেশপ্রাপ্ত গাভীর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাভীর কথা জানালেন যা ওই যুবকের গাভী ছাড়া অন্য কোনো গাভীর মধ্যে নেই। গাভীর বিনিময়ে অপরিমেয় অর্থপ্রাপ্তি ছিলো মাতৃভক্তির পুরস্কার। বরং মাতৃভক্ত যুবকের প্রতি ওই বিপুল বৈভব ছিলো আল্লাহ্পাকের বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬৮

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ

وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কী?' মুসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নহে, অল্প বয়স্কও নহে– মধ্য বয়সী। সুতরাং যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।'

গরু জবাইয়ের নির্দেশ শুনে ইহুদী জনতা আগে বলেছিলো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো? হজরত মুসা বলেছিলেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র স্মরণ প্রার্থনা করছি। এর পরও ইহুদীরা সরল পথে না গিয়ে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করলো, তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো, উহা কি? তারা সন্দিগ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারছিলোনা বলেই আবার প্রশ্নকন্টকে বিদ্ধ হলো। গরু বলতে কি বোঝায়, তা তারা নিশ্চয়ই জানতো। কিন্তু হত্যাকারী সনাক্ত করতে যে গরু জবাইয়ের প্রয়োজন, সে গরুকে তারা সাধারণ কোনো গরু ভাবতে পারছিলো না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিলো এই যে, গরুটি নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ গরু হবে। এরকমও হতে পারে যে, সেটি হবে কেবল নামেই গরু। প্রকৃতপক্ষে তা অন্য কিছু। তাই প্রশ্ন করে বসলো, উহা কি? হজরত মুসা জানালেন, গরুটি আসলে গরুই। কেউ হয়তো বলতে পারেন, এখানে 'ইন্নাহা' শব্দটির 'হা' (সেই) সর্বনামের মাধ্যমে পূর্বে নির্ধারিত একটি বিশেষ ধরনের গাভীকেই বোঝানো হয়েছে যার বিবরণ পরে দেয়া হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, পূর্বের নির্দেশটি নিরপেক্ষ বা সাধারণ ছিলো না। কিন্তু এই সন্দেহ অমূলক। প্রথমে নির্দেশ এবং পরে তার ব্যাখ্যা প্রদান রীতিবিরুদ্ধ নয়। অবশ্য নির্দেশ এবং নির্দেশের ব্যাখ্যার মধ্যে অধিক দূরত্ব না হওয়া চাই। এখানের 'হা' সর্বনামটি যদি পূর্ব নির্দেশিত গাভীর সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়, তবে প্রথমেই যে বিশেষ গাভীর কথা বলা হয়েছে তা কি করে বলা যেতে পারে। সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু সাধারণভাবে গ্রহণ করাই দস্তুর। বরং 'হা' সর্বনামটির মাধ্যমে যে কোনো একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হাদিস শরীফে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, মহানবী স. এরশাদ করেছেন (প্রথম নির্দেশানুযায়ী) বনী ইসরাইলেরা যে কোনো একটি গাভী জবাই করলে যথেষ্ট হতো। তবে এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম নির্দেশটি শর্তনিরপেক্ষ থাকলেও অযথার্থ প্রশ্নের কারণে পরে তা শর্তসাপেক্ষ হয়েছে। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে, শর্তনিরপেক্ষ নির্দেশটি রহিত হয়ে তদস্থলে শর্তসাপেক্ষ একটি নির্দেশ বলবৎ হয়েছে। মেরাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবায়নের পূর্বেই নির্দেশটি রহিত করে তদস্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ বলবৎ হয়েছিলো। এধরনের দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফা সিয়ামু সালাসাতু আইয়ামা।' (তবে রোজা তিনদিন)। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে এখানে মুতাতাবিয়াত (পরপর) শব্দটি অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে। এভাবে 'সালাসাতু আইয়াম' (তিনদিন) সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এর ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শর্তসাপেক্ষ এবং

শর্তনিরপেক্ষ দু'টি ভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে নিরপেক্ষকে সাপেক্ষের উপর চাপানো যাবেনা। যেমন, জেহারের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে একটি দাস মুক্ত করা। এটি একটি নিরপেক্ষ নির্দেশ। এবং হত্যার প্রায়শ্চিত্ত আরেকটি শর্তসাপেক্ষ নির্দেশ। সুতরাং প্রতিটি প্রায়শ্চিত্ত পৃথক পৃথক ভাবে কার্যকর হবে। ফিতরা সম্পর্কীয় হাদিসও আরেকটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এক হাদিসে এসেছে, প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (ফিতরা) আদায় করো। অন্য একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, মুসলমান দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (ফিতরা) আদায় করো। হানাফী মতাবলম্বীগণ উক্ত দু'টি হাদিস অনুযায়ী আমল করে থাকেন। তাই তারা মুসলমান ক্রীতদাস এবং কাফের ক্রীতদাস উভয়ের জন্য ফিতরা দান করে থাকেন। অবশ্য একই ঘটনা ও একই বিধানে নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ নির্দেশ সংমিশ্রিত থাকলে নিরপেক্ষ নির্দেশ সাপেক্ষ নির্দেশের উপরে আরোপ করা যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে দু'টি একীভূত করা সম্ভব নয়। অপরদিকে নিরপেক্ষ নির্দেশও সাপেক্ষ হবার সম্ভাবনা রাখে। তাই হানাফীগণ রোজাভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ পুনঃরোজা রাখার ক্ষেত্রে পরম্পরা শর্ত আরোপ করেছেন।

গাভীর বিবরণ দেয়া হয়েছে এরকম– বৃদ্ধ নয়, অল্প বয়স্কও নয়-মধ্যবয়সী। বয়স্ক নয় অর্থ এরকম বয়স্ক নয়, যা গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেছে। এরকম গাভীকেই আরববাসীরা বয়স্কা বা বৃদ্ধা বলে থাকে। অল্প বয়স্ক নয় অর্থ যা এখনো গর্ভধারণের বয়সে পৌছেনি। মধ্য বয়সী অর্থ, যা কয়েকবার শাবক প্রসব করেছে এবং এখনো গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেনি। এরকম বলেছেন, আখফাশ। আরববাসীরা তিরিশোত্তর রমণীকে মধ্যবয়সী বলে থাকে।

শেষে বলা হয়েছে, 'যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।' এই নির্দেশের মাধ্যমে প্রশ্নপ্রবণতা থেকে ক্ষান্ত থাকবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬৯,৭০,৭১

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۙ
فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ
الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ
قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহার রং কি? মুসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়।'

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল গরুটি কি? আমাদের নিকট গরুতো একই রকম, এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব।'

❒ মুসা বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই- সুস্থ নিখুঁত।' তাহারা বলিল, 'এখন তুমি সত্য আনিয়াছ।' যদিও তাহারা জবাই করিতে উদ্যত ছিল না তবুও তাহারা উহাকে জবাই করিল।

আবারো প্রশ্ন করে বসলো বনী ইসরাইল জনতা। জানতে চাইলো, গাভীটির রং কি রকম হবে। হজরত মুসা বললেন, গাভীর রং হবে পীত (হলুদ) বর্ণের। গাভীর রং বোঝাতে আয়াতে 'ফাকিউন' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফাকিউন' অর্থ গাঢ় পীতবর্ণ। হাসান বলেছেন, কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ।

আমি বলি, 'ফাকিউন' এর অর্থ কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ নয়। শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে, বিশুদ্ধ পীতবর্ণ। কালো সাপ, উজ্জ্বল লাল, ঘন শ্যামল, খুব শাদা– এরকম বলে যেমন রঙের আধিক্য বা বিশুদ্ধতা বোঝানো হয়, তেমনি 'ফাকিউন' শব্দটির মাধ্যমে পীতবর্ণটি যে বিশুদ্ধ সেকথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পীতবর্ণটি হবে বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল, গাঢ়। এরকম রং দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাসুর্‌রুন নাজিরিন' (যা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়)। অন্তরের আনন্দ বা প্রশান্তিকে বলে 'তাসুর্‌রুন। কল্যাণকর কোনোকিছু অর্জন অথবা অর্জনের আশা অন্তরে যে পুলক সৃষ্টি করে, তাকেই বলা হয় 'তাসুর্‌রুন।

এরপরও প্রশ্ন উত্থাপন করলো বনীইসরাইলেরা। বললো, হে মুসা! তোমার প্রতিপালককে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বলো গরুটি আসলে কিরকম। এ পর্যন্ত যে বর্ণনা আমরা পেলাম তাতে তো মনে হচ্ছে, গাইটি হবে অন্য সাধারণ গাইয়ের মতোই একটি। এরকম সাধারণ গাইয়ের মাধ্যমে হত্যাকারী সনাক্তকরণের অসাধারণ ঘটনাটি কিভাবে ঘটবে তা এখনো আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। তাই গরুটির অসাধারণত্ব কি, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ব্যাপারটা যদি আমাদেরকে আরো একটু খোলাসা করে বলা হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) দিশা খুঁজে পাবো আমরা (অর্থাৎ হত্যাকারীর সন্ধান আমরা পেয়ে যাবো)।

'ওয়া ইন্না ইন্‌শা-আল্লাহ্ লা মুহ্‌তাদুন' (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাবো) – এই বাক্যটি থেকে আমাদের আলেমগণ মাসআলা উদ্ধার করেছেন যে, যে কোনো স্থানে যে কোনো ঘটনা ঘটুক না কেনো, তা আল্লাহ্‌তায়ালার

ইচ্ছাসাপেক্ষেই ঘটে থাকে। মোতাজিলা ও কারামাতিয়া সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা নশ্বর, পরিবর্তনশীল। এর প্রতিবাদে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ্পাকের একটি অপরিবর্তনীয় ও অনশ্বর গুণ। তাঁর ইচ্ছা শক্তি নয় বরং ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বা বস্তু পরিবর্তনশীল। কারণ, যা আল্লাহ্ নয় তা-ই নশ্বরতা ও পরিবর্তনশীলতার অধীন। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাইলেরা যদি তখন ইনশাআল্লাহ্ না বলতো, তবে অনন্তকাল পর্যন্ত চেষ্টা করলেও কাঙ্খিত গাভী তারা পেতো না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী। হাদিসটির সনদকে মো'দাল বলে অভিহিত করেছেন ইবনে জারীর।

তাদের প্রশ্নের উত্তরে হজরত মুসা জানালেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, চাষাবাদ এবং পানিসিঞ্চনের কাজে ব্যবহৃত হয়নি এমন সুস্থ নিখুঁত একটি গরু। বনী ইসরাইলেরা এবার বুঝলো, এমন একটি গরু খুঁজে বের করতে হবে যার মালিক সেটির দ্বারা শ্রমসাধ্য কোনো কাজ করায়নি। কোনো অসুস্থতা যাকে স্পর্শ করেনি এবং যার কোনো অঙ্গে কোনো প্রকার খুঁতই নেই। তাই তারা বললো, এতোক্ষণে তুমি সত্য বিবরণ এনেছো।

এরপর তারা সেই সুস্থ, নিখুঁত এবং চাষাবাদ, পানিসিঞ্চন ইত্যকার সকল শ্রমসাধ্য কর্মে অব্যবহৃত গরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। অনেক অনুসন্ধান শেষে তারা হাজির হলো সেই যুবকের কাছে। যুবক গাভীর চামড়াভর্তি স্বর্ণের বিনিময়ে সেটিকে বিক্রি করতে সম্মত হলো। উপায়ান্তর না দেখে বনী ইসরাইলেরা সেই মূল্যেই কিনে নিলো গাভীটিকে। শেষে তারা নিরুপায় হয়ে উদ্যমহীনভাবে গাভীটিকে জবাই করতে বাধ্য হলো। প্রশ্নদীর্ণ মনোভাব, পারস্পরিক মতানৈক্য, প্রকৃত হত্যাকারী সনাক্ত হওয়ার আশংকা, গাভী অনুসন্ধানের দীর্ঘকষ্ট, অস্বাভাবিক মূল্যমান, এ সমস্তের কারণই তাদেরকে উদ্যমহীন করে ফেলেছিলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে হুকুম প্রতিপালন করলো তারা। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'যদিও তাহারা জবাই করিতে উদ্যত ছিলনা তবুও তাহারা উহাকে জবাই করিল।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭২,৭৩

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

❐ স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে- তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

❐ আমি বলিলাম, 'ইহার কোন অংশ দ্বারা উহাকে আঘাত কর।' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

হত্যাকান্ড এবং হত্যাকারী সনাক্তকরণের কাহিনীটির প্রারম্ভিকা এখানে বিবৃত হয়েছে। নিছক কাহিনী বর্ণনা যেহেতু কালাম মজীদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাই ঘটনাটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আগের আয়াতগুলোতে বর্ণনা করার পর এখানে বলা হয়েছে, স্মরণ করো যখন তোমরা একব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করছিলে। আসলে বিষয়টিকে গোপন করাই ছিলো তোমাদের অভিপ্রায়। আর আল্লাহ্র অভিপ্রায় হচ্ছে প্রকাশ করে দেয়া।

আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন, 'ইহার (জবাইকৃত গরুটির) কোনো একটি অংশ দ্বারা উহাকে (নিহত ব্যক্তিকে) আঘাত করো।' এখানে জবাইকৃত গাভীর যে কোনো একটি অংশের কথা বলা হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিলো তা ছিলো গাভীর নিতম্বসংশ্লিষ্ট একটি অস্থি। কেউ কেউ বলেছেন, লেজের হাড় দিয়ে আঘাত করা হয়েছিলো। কেউ বলেছেন, জিহবার দ্বারা। আবার কেউ বলেছেন, দক্ষিণ রানের অংশ দ্বারা। যে অংশের দ্বারাই আঘাত করা হোকনা কেনো, আঘাত করা মাত্র নিহত ব্যক্তি জীবিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠনালীর রগগুলো ছিলো তখনো রক্তাক্ত। উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে পুনর্জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিটি উচ্চারণ করলো, ওমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। একথা বলার সাথে সাথে সে পুনরায় মৃত্যুবরণ করলো এবং মৃতাবস্থায় পড়ে রইলো। হত্যাকারী চিহ্নিত হলো এবং সে বঞ্চিত হলো উত্তরাধিকারের অংশ থেকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ওই হত্যাকারীর পরে আর কোনো হত্যাকারী উত্তরাধিকারে অংশ লাভ করেনি।

মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'কাজালিকা' যার অর্থ এভাবেই। অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন। আর পুনর্জীবন দানের ঘটনাটি আল্লাহ্পাকের সেই অপার ক্ষমতারই একটি নিদর্শন। এই নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হে অজ্ঞ বনী ইসরাইল জনতা! দেখো এবং বিশ্বাস করো। যেভাবে আল্লাহ্ পাক এই মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করলেন, তিনি সকল মৃতকেও জীবন দান করতে সক্ষম (মৃত্যু ও জীবন তাঁর হুকুমের অধীন)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল হও।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্পাক এখানে সরাসরি মৃতব্যক্তিকে জিন্দা করেননি। গরু জবাইয়ের ঘটনাটিকে তিনি এখানে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এরকম

মাধ্যম বলবৎ করার অর্থ কার্যকারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই কার্যকারণ নীতিই হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের সাধারণ বিধান। এর মাধ্যমে সৃষ্টিকে দেয়া হয় অনেক সুযোগ। যেমন এখানে গরু কোরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। হুকুম প্রতিপালনের মাধ্যমে পূণ্য লাভ। আবার অপরদিকে একটি এতীম বালককে দেয়া হয়েছে প্রভূত অর্থোর্জনের সুবিধা। এই ঘটনায় এই উপদেশ নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যার্জনের সুযোগ অনুসন্ধান করা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। আর যারা নৈকট্যান্বেষী তারা যেনো এ থেকে শিক্ষা নেয় যে, আল্লাহ্‌পাকের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম বস্তু কোরবানী করা উচিত। আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসে এসেছে, হজরত ওমর একবার একটি অত্যুত্তম উট কোরবানী করেছিলেন যার মূল্য ছিলো তিনশত দিনার।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৪

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

❒ ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিনতর। পাথরও কতক এমন যে উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহের ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

এরশাদ হয়েছে, 'এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো, উহা পাথর অথবা তদপেক্ষাও কঠিনতর।' 'ছুম্মা' শব্দটির অর্থ, এর পরেও। এ শব্দটির মাধ্যমে স্থানের দূরত্ব বোঝানো হয়নি, বিষয়গত দূরত্ব বোঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়, জায়েদকে আমি কতোভাবে বুঝালাম, এর পরেও সে মানতে চায় না।

'তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো'– অর্থ তাদের অন্তর হয়ে গেলো দয়ামায়া ও কল্যাণহীন। তার সঙ্গে যুক্ত হলো দীর্ঘ দূরাশা, আল্লাহ্‌র জিকিরবিমুখতা ও কুপ্রবৃত্তির অনড়তা। এসব কিছু মিলিয়ে তাদের অন্তর হয়ে গেলো কঠিন থেকে কঠিনতর। পুনর্জীবন দানের বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করার পর, সত্যের স্পর্শে অন্তর বিগলিত হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে ঘটলো তার

বিপরীত। কালাবী বলেছেন, বিস্ময়কর নিদর্শনটি স্বচক্ষে দেখার পরও হত্যাকারী ব্যক্তিটি বলেছিলো, আমি ওকে হত্যা করিনি।

তাদের অন্তরের উপমা দেয়া হয়েছে পাথরের সঙ্গে। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, পাথর অপেক্ষাও কঠিনতর। 'আও' শব্দটির উল্লেখ করে এখানে সম্বোধিত জনকে (হজরত মুসাকে) হয়তোবা পাথর কিংবা পাথরাপেক্ষা কঠিন এ দু'টোর যে কোনো একটি উপমাকে নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এরকম হতে পারে যে, 'আও' শব্দটি এখানে এক ধরনের প্রতিবাদ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে, যে তাদের অন্তরের খবর রাখে– সে উপরোল্লেখিত উপমা দু'টোর যে কোনো একটিকে নির্বাচন করে নিতে পারে। যদি এরকম করে তবে ক্ষতিবৃদ্ধির কোনো কারণ নেই।

তামা, কাঁসা ইত্যাদি আরো অনেক কঠিন বস্তু থাকা সত্ত্বেও এখানে পাথরের উপমা আনার কারণ এই যে, তপ্ত হলে অন্য সকল কঠিন পদার্থ গলে যায় কিন্তু পাথর গলে না। সব পাথর যে একরকম নয় পরবর্তী বাক্যেই সেকথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এমন অনেক পাথর রয়েছে যেগুলো থেকে নেমে আসে নদী। কোনো কোনো পাথর বিদীর্ণ হলে, তা থেকে বের হয়ে আসে পানির প্রস্রবণ। আবার অনেক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে ফেটে যায়, ধ্বসে পড়ে। অথচ কতোই না কঠিন অন্তরের অধিকারী কাফের সম্প্রদায়। যা পাথরের চেয়ে কঠিন– নম্রতা ও আনুগত্য বিবর্জিত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন। যদি কেউ বলে, পাথর তো নিস্প্রাণ। সুতরাং নিস্প্রাণ বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় কিভাবে কল্পনা করা যায়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'খশিয়া' (ভয়) শব্দের প্রকৃত অর্থ হবে, আল্লাহ্র বিধান। যে বিধানকে মান্য করে সকল সৃষ্টি ধারণ করে আছে তাদের অস্তিত্ব।

আমি বলি, আল্লামা বায়যাবীর জবাবটি যথাযথ নয়। তিনি এখানে যে বিধানের কথা বলেছেন সে বিধান সকল সৃষ্টি মান্য করতে বাধ্য। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'খতামাল্লাহু আলাকুলুবিহিম' আল্লাহ্পাক তাদের (কাফেরদের) অন্তঃকরণের উপর সীলমোহর মেরে দিয়েছেন।' আল্লাহ্তায়ালার এই বিধানই মান্য করে চলেছে কাফেরেরা। অন্য এক স্থানে এরশাদ এসেছে, 'আকাশসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদা করে– সে সেজদা স্বেচ্ছা-আনুগত্যের হোক অথবা বাধ্যতার।' হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে–রসুলপাক স. বলেছেন, আদম সন্তানদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্পাকের অলৌকিক দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। আল্লাহ্পাক যেমন চান, তেমনই সেগুলোকে বিবর্তিত করেন। একথা উল্লেখ করার পর রসুল পাক স. এই বলে প্রার্থনা করতেন, হে আমার আল্লাহ–হৃদয়ের আবর্তনবিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যমুখী করে দাও। মুসলিম। দৃষ্টান্তমূলক আয়াত ও হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব

রক্ষার যে বিধান বলবৎ করা হয়েছে, আল্লাহ্পাকের সেই বিধান মুসলমান কাফের নির্বিশেষে সকলেই মান্য করতে বাধ্য।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আল্লামা বাগবী বলেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত এরকম— জড় অজড় সকল সৃষ্টিকেই এমন একধরনের জ্ঞান ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। পদার্থসমূহ ও প্রাণীকুল আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করে, তাঁর জিকির করে, এবং পবিত্রতা (তসবীহ্) বর্ণনা করে। আল্লাহ্র ভয় রয়েছে তাদের সকলের মধ্যে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'সকল বস্তুই আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে।' অন্যত্র এরশাদ করেছেন, দেখো, কতোসুন্দর সারিবদ্ধ পক্ষীকুল, তারা প্রত্যেকেই আপনাপন ইবাদত ও তসবীহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত। এছাড়া কবরের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতটিও পাঠ করা যেতে পারে। ছুম্মা ইউমিতুকুম ছুম্মা ইউহ্ইকুম আয়াতের তাফসীরে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বাগবী আরো বলেছেন, রসুলপাক স. একদা বাশীর পাহাড়ে উঠেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। পাহাড় তখন বলেছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি মেহেরবানী করে আমার উপর থেকে অবতরণ করুন। আল্লাহ্ না করুন, কাফেররা যদি এখানে এসে আপনাকে বন্দী করে তবে নির্ঘাত আমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হবে। ছওর পাহাড়ও কথা বলেছিলো রসুলপাক স. এর সঙ্গে। বলেছিলো, হে দয়াল নবী! আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমার নিকট চলে আসুন।

স্ব-সনদে বাগবী হজরত জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণনা করেছেন– মহানবী স. এরশাদ করেছেন, আমি সেই পাথরটিকে ভালোভাবে চিনি, নবী হওয়ার পূর্বে যে আমাকে সালাম করতো। হাদিসটি শুদ্ধ। মুসলিমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস বলেছেন, যখনই উহুদ পাহাড় রসুল পাক স. এর দৃষ্টিগোচর হতো তখন তিনি বলতেন, এই পাহাড় আমার প্রিয় আর আমিও তার প্রিয়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষে তিনি আমাদেরকে বললেন, একটি ঘটনা শোনো। এক ব্যক্তি একটি বলদ হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথশ্রান্ত লোকটি যখন বলদের পিঠে আরোহণ করলো, তখন বলদটি বললো, আমাকে কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আরোহনের জন্য নয়। ঘটনা শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বলদও তাহলে কথা বলে। হজরত রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, আমি আবুবকর ও ওমর এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মহানবী স. আরো এরশাদ করেছেন, একব্যক্তি তার ছাগল চরাচ্ছিলো। হঠাৎ এক নেকড়ে এসে ছাগলটিকে আক্রমণ করলো। লোকটি নেকড়ের নিকট থেকে ছাগলটি ছিনিয়ে নিলো। নেকড়েটি বললো, ওহে ছাগলের রাখাল! তুমি আমার শিকার ছিনিয়ে নিলে। যেদিন পশুদের আধিপত্য বিস্তৃত হবে, সেদিনের কথা স্মরণ করো। সেদিন তোমার ছাগলকে কে রক্ষা করবে? তখন আমরাই তো হবো ওর রাখাল। রসুলপাক স. এর পবিত্র মুখে

এ কাহিনী শুনে উপস্থিত লোকজন বললেন, সুবহানাল্লাহ্! নেকড়েও তাহলে কথা বলে! তিনি স. বললেন, আমি আবুবকর ও ওমর ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছি। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন– রসুল স. একবার এক পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হজরত আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা ও জোবায়ের রা.। হঠাৎ একটি পাহাড় দুলে উঠলো। রসুলপাক স. বললেন, তিষ্ঠ হে পর্বত! তোমার উপরে নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। মুসলিম। হজরত আলী থেকে মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, আমরা মক্কা মোয়াজ্জমায় রসুলপাক স. এর সঙ্গে পথপরিক্রমণের সময় পাহাড় পর্বত বৃক্ষলতাকে বলতে শুনতাম, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্। হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে, মদীনার মসজিদের মিম্বর তৈরীর পূর্বে একটি কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসতেন রসুলপাক স.। মিম্বর তৈরীর পর যখন তিনি স. মিম্বরে সমাসীন হলেন, তখন কাঠের খুঁটিটি একটি অসহায় উটনীর মতো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। তিনি মিম্বর থেকে উঠে গিয়ে খুঁটিটির সঙ্গে কণ্ঠলগ্ন হলেন। তৎক্ষণাৎ খুঁটিটি নিঃশব্দ হয়ে গেলো। বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জড়পদার্থের মধ্যেও প্রাণ ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান। বাগবী আরো বলেছেন, মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে যে পাথর, সে আল্লাহ্পাকের ভয়েই গড়িয়ে পড়ে।

সৃষ্টিকুলের সকল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা সম্যক পরিজ্ঞাত ও সদাসতর্ক। তাই আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৫

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

❒ তোমরা কি এই আশা কর যে তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? – যখন তাহাদের একদল আল্লাহের বাণী শ্রবণ করিত ও বুঝিবার পর জানিয়া শুনিয়া উহা বিকৃত করিত!

'তোমরা কি এই আশা করো'– এখানে 'তোমরা' (আফা তাতমাউনা) বলতে বুঝানো হয়েছে রসুলে পাক স. এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে।

'তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে'– এখানে তাহারা বলতে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। 'যখন তাহাদের একদল আল্লাহের বাণী শ্রবণ করিত'– এখানে 'আল্লাহের বাণী' (কালামাল্লাহ্) অর্থ তওরাত। তারা তওরাতের বাণী শুনতো এবং সবকিছু বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই পবিত্র বাণীকে বিকৃত করতো। যেমন মহানবী মোহাম্মদ স.এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা এবং রজমের বিধান তারা পরিবর্তন করেছে। তারা যে পরিবর্তনকারী এবং মিথ্যাবাদী তা তারা নিজেরাই ভালোভাবে জানতো। মুজাহিদ, ইকরামা ও সুদ্দী এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এরকম– এখানে তাদের ওই সকল পূর্বপুরুষদের আচরণের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা তুর পর্বতের পাদদেশে আল্লাহ্র বাণী শুনেছিলো এবং পরে তাদের সম্প্রদায়ের লোকের কাছে এসে সে বাণীকে বিকৃতরূপে পরিবেশন করেছিলো। হজরত মুসা আ. বনী ইসরাইলদের যে সত্তরজন নেতাকে নিয়ে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলো আল্লাহ্র আয়াত বিকৃতকারী। তাদের স্বল্পসংখ্যক সত্যবাদীরা আল্লাহ্র বাণী অবিকৃতভাবে সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলো। সংখ্যাগরিষ্ঠ কুটিলেরা বলেছিলো, হ্যাঁ! আল্লাহ্তায়ালা এরকমই বলেছেন বটে। তবে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি তাঁর বিধান মানতে সক্ষম হও তাহলে মানতে পারো, অন্যথায় না-ও মানতে পারো। এভাবেই তারা আল্লাহ্র বাণীকে বিকৃত করেছিলো।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

❒ তাহারা যখন বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করিয়াছি;' আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সহিত মিলিত হয় তখন বলে 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দাও? ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে, তোমরা কি অনুধাবন কর না?'

❒ তাহারা কি জানে না যে যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাহা জানেন?

এখানে কাব বিন আশরাফ, ওয়াহাব বিন ইহুদ প্রমুখ মুনাফিক ইহুদীদের অসদাচরণের কথা বলা হয়েছে। তারা অন্যদেরকে হিতোপদেশ দিতো। কিন্তু নিজেরা ছিলো উদাসীন। তারা বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মদীনাবাসী মুমিনদের সংস্পর্শে এলে বলতো, আমরা মু'মিন। হজরত মোহাম্মদই সেই নবী তওরাতে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাই তোমাদের উচিৎ তাঁর প্রতি ইমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বিশ্বাসী বলতে ইহুদী মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। একথা গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে এরকম– যখন কপট ইহুদীরা বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হতো, তখন বলতো, আমরাও তোমাদের মতো বিশুদ্ধ ইমান গ্রহণ করেছি। ওই কপটেরা নিভৃতে যখন পরস্পর সম্মিলিত হতো তখন বলতো অন্য কথা। তাদের একদল অপর দলকে বলতো, মোহাম্মদ সত্য নবী– তাঁকে বিশ্বাস করা তোমাদের কর্তব্য। অপর দল বলতো, তোমরা নিতান্তই মূর্খ। মোহাম্মদ সম্পর্কে যা বলেছো, বলেছো– মুসলমানদের কাছে এরকম বোলো না। যদি বলো তবে তারা এটাকে প্রমাণ হিসেবে ধরে নেবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রমাণ পেশ করে বলবে, আয় আল্লাহ্! ওরা রসুল পাক স. সম্পর্কে উত্তম রূপে অবগত ছিলো। তারা আমাদেরকে রসুলানুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করতো অথচ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তারাই ছিলো বিরুদ্ধাচারী। বায়যাবী বলেছেন, আয়াতের এরকম ব্যাখ্যার প্রতি আমার মৃদু আপত্তি রয়েছে। আল্লাহ্‌পাক সকল গোপন বিষয় পরিজ্ঞাত। অন্তর্যামী তিনি। মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো কিছু তাঁর অবিদিত ছিলো না। অবস্থা যখন এই, তখন তাদের কপটতার প্রমাণ পেশ করার বিষয়টিতে কি আর যাবে আসবে।

আমি বলি, ইহুদীদের গোপন করার চেষ্টা আল্লাহ্‌পাকের অসীম জ্ঞানে কোনোই অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না– এ বিষয়টি সন্দেহাতীত। কিন্তু তবু তারা মনে করতো, বিষয়টিকে গোপন করতে চাইলে হয়তো গোপনই থাকবে। তাদের এতাদৃশ অবিমৃশ্যকারিতা ও নির্বুদ্ধিতাকে চিহ্নিত করার জন্যই আয়াতে এরকম বিবরণ এসেছে। তাদের নির্বুদ্ধিতার বিবরণ এসেছে আরো অনেক আয়াতে। যেমন, এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে, '(তারা বলতো) আল্লাহ্‌পাক কোনো মানবের প্রতি কোনোকিছু অবতীর্ণ করেননি।' অথচ তারা ভালোভাবেই জানতো হজরত মুসার প্রতি তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই পারার প্রথম দিকেও এরকম বিবরণ রয়েছে। ইহুদীদের কথা ও কাজ ছিলো অসঙ্গতিতে ভরা। তারা হজরত মুসার অনেক মোজেজা দেখেছে। তবুও তারা তাদের স্বভাবদোষ অতিক্রম করতে পারেনি। তাদের আচরণ সুস্থ ছিলো না, ছিলো উন্মাদ সদৃশ। ভর্ৎসনা, তিরস্কার, লাঞ্ছনা- কোনোকিছুই তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, বজ্রপাতের সময় মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে অঙ্গুলী প্রবেশ করাতো। তারা

ভালোভাবেই জানতো এভাবে মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না। তবুও অজ্ঞের মতো মনে করতো, কানে আঙ্গুল ঢোকালেই যেনো মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আফালা তা'ক্বিলুন' (তোমরা কি অনুধাবন করো না) – একথাটি পূর্বোক্ত কথারই অনুগামী। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, অবিশ্বাসীরা কপট বিশ্বাসীদেরকে বলতো, তোমরা সত্যি সত্যি মূর্খ। মোহাম্মদ স. কে মান্য করা উচিত– এরকম কথা তোমরা কেনো বলো? এরকম বললে মুসলমানেরা তোমাদের কথাকেই তোমাদের বিপক্ষে দাঁড় করাবে (আর সেটা করবে এই পৃথিবীতেই)। 'ইনদা রব্বিকুম' (তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) একথার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র কিতাব। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের নিকটেও তোমাদের এই সাক্ষ্যটি সুসাব্যস্ত হবে। তখন প্রমাণ হিসেবে তারা আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লেখিত তোমাদের এহেন আচরণ সম্পর্কিত বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। অথবা এরকম বলা যায়, 'রব্বিকুম' শব্দটির পূর্বে কিতাব অথবা রসুল শব্দটি উহ্য রয়েছে। এমতাবস্থায় 'ইনদা রব্বিকুম' এর প্রকৃত অর্থ হবে, 'ইনদা কিতাবি রব্বিকুম।' কিংবা 'ইনদা রসুলি রব্বিকুম।' বায়যাবী এই ব্যাখ্যাটিকেই অধিকতর পছন্দ করেছেন। বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত উক্তি মুনাফিকদের (কপট বিশ্বাসীদের)। কাফেরদের (প্রকাশ্যে অস্বীকারকারীদের) নয়। অর্থাৎ যারা অন্যদেরকে ইমান গ্রহণ করতে বলতো কিন্তু নিজেরা করতো না, তারা ছিলো মুনাফিক। কাফের নয়।

আমি বলি, প্রথমোক্ত ভাষ্যটি কষ্টকল্পনার নামান্তর। ওই ভাষ্যটির সঙ্গে আয়াতের অর্থ যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, কপট বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে বিশ্বাসীদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হয়। তাই প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাতে পারে না। যেহেতু তাদের প্রকাশ্য স্বীকৃতি সত্যের অনুকূল। তাদের সঙ্গে কলহবিবাদের ধারণা কেবল আখেরাতেই হওয়া সম্ভব। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, মুনাফিকদের অসদাচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক যখন তাদেরকে শাস্তি দিতেন, তখন মু'মিনদের নিকট 'কখনো কখনো' তার বিবরণ দিতেন। মুনাফিকেরাও বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। বলতো, ওই বিবরণ সমূহ আলোচনাযোগ্য নয়। কারণ, ওই আলোচনাকেই তারা আখেরাতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবে। এভাবে তারা তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল হতে চেষ্টা করবে। অথবা 'তোমরা কি অনুধাবন করো না' একথা বলা হয়েছে ইহুদীদেরকে। অর্থাৎ এরকম বলা হয়েছে, ওহে মূর্খ ইহুদীকুল! একথাটুকু বুঝবার জ্ঞানও কি তোমাদের নেই যে, তোমাদের পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ই কেবল তোমাদের বিরুদ্ধে মুমিনদের একমাত্র দলিল!' তোমরা কি অনুধাবন করো না। একথা মু'মিনদের লক্ষ্য করেও বলা হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে একথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'আফাতাতমাউনা' (তোমরা কি আশা কর) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। তখন

অর্থ দাঁড়াবে এরকম– হে মু'মিনগণ! যাদের প্রকৃত অবস্থা এরকম তাদের নিকট থেকে ইমান আনয়নের আশা কি দূরাশা নয়? এটাকি তোমরা অনুধাবন করো না। অথবা সম্বোধনটি কাফের ও মুনাফিকদের পারস্পরিক বাক্যালাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরকম হলে অর্থ দাঁড়াবে– তোমরা কি বুঝতে পারছো না (অনুধাবন করছো না) যে, এটাই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

পরের আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, তারা কি জানে না তাদের গোপন প্রকাশ সকল কথাই আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে অবগত। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক বলেছেন, ওই সমস্ত লোক যারা অন্যদেরকে তিরস্কার করছে, তাদের নিভৃতি, অনিভৃতি- সকল অবস্থার সংবাদ আল্লাহ্ রাখেন। সুতরাং তওরাতে উল্লেখিত মহানবী মোহাম্মদ স. এর প্রশংসাসংবলিত বাণী গোপন করার চেষ্টা করে কী লাভ? এতে করে কি নিশ্চিত প্রমাণকে আড়াল করা সম্ভব? 'তারা' বলতে এখানে মুনাফিকেরা– একথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। তখন অর্থ হবে– তাদের কপটতার সংবাদ মহানবী স. কিংবা প্রকৃত মু'মিনদের জানা নাও থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ্পাক তো তাদেরকে অবশ্যই জানেন। 'তারা' সর্বনামটির মাধ্যমে গোটা ইহুদী সমাজকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে আয়াতের অর্থ হবে– তাদের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অবিশ্বাস, রসুল পাক স. এর গুণাবলী আড়াল করার প্রচেষ্টা, আল্লাহ্পাকের নিদর্শনাবলীর বিকৃতি সাধন ও সকল অসদাচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের জ্ঞান যে নিশ্চিত, তিনি যে সর্ব পরিজ্ঞাতা– এ কথা কি ইহুদীরা জানে না?

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৮

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

❒ তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই তাহারা শুধু মনগড়া কথা বলিয়া বেড়ায়।

'লা ইয়ায়্লামুনাল কিতাব' (কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই) – এখানে কিতাব বলতে বুঝানো হয়েছে তওরাতকে। 'আমানি ইয়্যা' অর্থ মনগড়া কথা, অলীক ধারণা। এখানেই ইহুদী আলেমদের অলীক কল্পনাগুলোকে 'আমানি ইয়্যা' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও কাতাদা। ক্বারীগণ বলেছেন, আমানি ইয়্যা অর্থ মিথ্যাকথা। যেমন হজরত ওসমান গনী রা. বলেছেন আমি ইসলাম গ্রহণের পর কখনও মিথ্যাকথা বলিনি। তাঁর এই বাক্যটিতে মিথ্যা

কথা বুঝাতে 'আমানিইয়্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরকমও বলা যায় যে, যে সকল অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা ইহুদীরা অন্তরে অন্তরে পোষণ করতো সেগুলোকে আমানিইয়্যা বলা হয়েছে। তাদের অবাস্তব চিন্তাগুলো ছিলো এরকম– ইহুদী এবং খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, জাহান্নামে গেলেও মাত্র কয়েকদিন সেখানে থাকতে হবে তাদেরকে ইত্যাদি। এরকম বর্ণনা করেছেন হাসান এবং আবুল আলীয়া। আয়াতের মর্ম এরকমও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ইহুদীরা কেবল তওরাত উচ্চারণ ও আবৃত্তির মধ্যেই বিচরণ করতো। প্রকৃত অর্থ ও মর্ম পর্যন্ত পৌছতে পারতো না। যেমন অন্য এক স্থানে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'যখন তারা পাঠ করে, তখন শয়তান তাদের পাঠে অতিরিক্ত কথা নিক্ষেপ করে।' এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। ক্বারী আবুজাফর কোরআন মজীদের সকল স্থানে উল্লেখিত 'আমানিইয়্যা' শব্দটি তাশ্‌দীদবিহীন অবস্থায় পাঠ করেছেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন তাশ্‌দীদ সহযোগে।

'তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়'– একথার অর্থ তারা আসলে কল্পনাবিলাসী। কিতাবের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে তারা নিতান্তই অজ্ঞ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৯

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

❒ সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং অল্প মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

'ওয়াইল' শব্দটির অর্থ আক্ষেপ, দুর্ভোগ অথবা ধ্বংস। জুযাজ বলেছেন, ধ্বংসে আপতিত জনকে ওয়াইল বলা হয়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওয়াইল অর্থ গুরুদন্ড। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম ওয়াইল। বাগবী বলেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ওয়াইল হচ্ছে জাহান্নামের একটি অধিত্যকা। কাফেরেরা চল্লিশ বছর ধরে নামতে থাকলেও সেখানে পৌছতে

পারবে না (অধিত্যকাটি এতোই গহীন)। জাহান্নামের আরেকটি পাহাড়ের নাম হচ্ছে সউদ। কাফেরেরা সত্তর বছর ধরে ওই পাহাড়ে আরোহন করতে থাকবে। সেখান থেকে নেমে আসতেও তাদের ওই পরিমান সময় লাগবে।

'নিজ হাতে কিতাব রচনা করে'– একথার অর্থ, বাণী বিকৃত তওরাত– যা ইহুদী আলেমরা স্বহস্তে রচনা করেছে। জাগতিক লাভের জন্য তারা এরকম করতো। জাগতিক সম্পদ যতো বিপুল পরিমাণই হোক না কেনো, আখেরাতের সীমাহীন বৈভবের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য। তাই আয়াতে জাগতিক সম্পদপ্রাপ্তিকে অল্প মূল্য (সামানান ক্বলীলা) বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছে, ঘটনাটি হচ্ছে– ইহুদী আলেমরা এটা ভালো করে জানতো যে, হজরত মোহাম্মদ স. সত্য নবী। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি এই ভেবে ইমান আনতো না যে, এরকম করলে কিতাববিকৃতির মাধ্যমে তাদের অর্থাগমের পথটি রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তওরাতে উল্লেখিত রসুল পাক স. এর গুণাবলীর বর্ণনা তারা গোপন রাখতো অথবা বিকৃত করতো এই ভেবে যে, এই বর্ণনা প্রকাশ হয়ে গেলে সকলেই মুসলমান হয়ে যাবে। তখন তাদের আয়ের পথটি হয়ে যাবে বন্ধ।

তওরাতে বর্ণিত ছিলো, রসুল পাক স. এর স্বভাব চরিত্র হবে অনিন্দ্য সুন্দর। তিনি হবেন অতুলনীয় কেশরাশির অধিকারী। হবেন মধ্যম অবয়ববিশিষ্ট। ইহুদী পন্ডিতেরা এ সমস্ত বিবরণের স্থলে লিখে দিলো- তিনি হবেন দীর্ঘাকৃতির, নীল নয়ন বিশিষ্ট, উস্কখুস্ক চুলের অধিকারী। জনতা যখন তাদের কাছে শেষ নবীর পরিচয় জানতে চাইতো তখন তারা তাদের বিকৃত বিবরণ পাঠ করে শোনাতো। ওই বিবরণের সঙ্গে মিল খুঁজে না পেয়ে জনতা শেষে রসুলপাক স. কে অস্বীকার করে বসতো।

ওই ইহুদী পন্ডিতদের জন্য আক্ষেপ! তারা নিজ হাতে আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিকৃত করেছে- এ ভাবেই তারা আবাহন করেছে শাস্তিকে। তাই শাস্তি তাদের অর্জন বা উপার্জন স্বরূপ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮০

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

❐ তাহারা বলে, 'দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না।' বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ, অতএব আল্লাহ্‌

তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না; কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?

ইহুদীরা ধারণা করতো, মাত্র কয়েক দিন তাদেরকে দোজখের আগুনে থাকতে হবে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরে একদিন করে মোট সাত দিন তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাতাদা ও আতা বলেছেন, ইহুদীরা মনে করতো তাদের পূর্বপুরুষ চল্লিশ দিন গরু পূজা করেছিলো, তাই তাদের শাস্তি হবে মাত্র চল্লিশ দিন। হজরত আবুল আলীয়া ও হাসান বলেছেন, ইহুদীরা ধারণা করতো, কোনো বিষয়ের শাস্তি নির্ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহ্পাক শপথ করে বলেছিলেন, তোমাদেরকে আমি চল্লিশ দিন শাস্তি দিবো, তাই তাদের শাস্তি হবে মাত্র চল্লিশ দিন।

ইহুদীদের এই অলীক কল্পনার প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছো?' -একথার অর্থ, তোমরা যে বল মাত্র কয়েক দিন শাস্তি হবে, এ সম্পর্কে তোমরা কি আল্লাহ্র তরফ থেকে অভয়বাণী লাভ করেছো? এই প্রশ্নের মাধ্যমে কথিত অঙ্গীকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না, কারণ অঙ্গীকার ভঙ্গ একটি চরম অসদাচরণ। এরকম ত্রুটি থেকে আল্লাহ্পাক পবিত্র।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে অঙ্গীকারের মর্ম হবে তওহীদ (আল্লাহ্পাকের এককত্বের স্বীকৃতি)। কোরআন মজীদের অন্য একটি আয়াতে 'আহ্দান' বা অঙ্গীকারের প্রকৃত মর্ম স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে 'ইল্লা মানিত্তাখজা ইন্দার রহমানি আহ্দান।' এখানে 'আহ্দান' শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' আহ্দান বা অঙ্গীকারের বর্ণিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে, ওহে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা তো আল্লাহ্পাকের নিকট 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'– এর অঙ্গীকারই করো নাই। তবে আর অন্য অঙ্গীকারের কথা কেনো উঠবে? তোমরা নিতান্তই মূর্খ ও হতভাগা। তাই যা জানো না তাই বলে যাচ্ছো।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮১,৮২

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

❒ হাঁ, যাহারা পাপকার্য করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে তাহারাই অগ্নিবাসী– সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ আর যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তাহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

'কাছাবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ উপকার বা লাভ অর্জন করা। আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'কাছাবা ছাইয়েয়া' (পাপ অর্জন)। পাপ থেকে উপকার লাভ হয় না, তবুও উপহাস ছলে এরকম শব্দ সন্নিবেশ করা হয়েছে। কাফেরদের প্রতি উপহাস ছলে অন্য আয়াতেও এ ধরণের শব্দব্যবহার ঘটেছে। যেমন 'ফাবাশশিরহুম বি আজা-বিন-আলিম' (তাদের কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও)। কাছাব শব্দটির মতো এখানে বাশারাত (সুসংবাদ) শব্দটিও উপহাসার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (আয়াতের বঙ্গানুবাদে অবশ্য উপহাসের আবহটিকে উপস্থাপন করা হয়নি)।

তাদের অর্জিত পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে— একথার অর্থ তাদের সকল দিকই পাপ পরিবেষ্টিত। কোথাও কোনো ফাঁক নেই। প্রকৃত কাফের যারা তাদের প্রতি এই আয়াতটি প্রযোজ্য, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ইমানও রয়েছে তাঁদের প্রতি এরকম বাক্য প্রযোজ্য হতে পারে না। ওই সামান্য ইমানই তাঁদের এমন এক আশ্রয় যা তাঁদেরকে পূর্ণ পাপ পরিবেষ্টন থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, জুহাক, আবুল আলীয়া ও অন্যান্য বিজ্ঞজনেরা মন্তব্য করেছেন 'খতাইয়াত্' (পাপরাশি) অর্থ ওই শিরিক, যে শিরিক সহ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ব্যাখ্যাসূত্রেই মোতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে, যারা কবীরা গোনাহ্ করেছে তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। তাদের অভিমতটি ভুল, কারণ এ আয়াতটি কবীরা গোনাহ্কারী ইমানদারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। প্রকৃত অবিশ্বাসীরাই এই আয়াতের লক্ষ্য। মদীনাবাসীগণ 'খতাইয়াত' শব্দটি বহুবচনে পাঠ করেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেন একবচনে। ক্বারী হামজা যতিপাতের সময় হামজাকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে ঈদগম অবস্থায় পাঠ করেছেন।

যারা সম্পূর্ণরূপে পাপ পরিবেষ্টিত (পুরোপুরি কাফের) তারাই দোজখবাসী। দোজখই তাদের চিরকালীন আবাস।

আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাঁরাই বেহেশ্তবাসী। সেখানেই তাঁরা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

❒ স্মরণ কর, যখন ইসরাইল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও জাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরূদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে—

'মিছাক' অর্থ বজ্রকঠিন (সুদৃঢ়) অঙ্গীকার। আল্লামা ইবনে কাসীর, হামজা, এবং কাসায়ী, 'লা তা'বুদুনা' শব্দটিকে পড়তেন— লা ইয়া'বুদুনা (তা হরফটির স্থলে ইয়া বসাতেন তাঁরা)। অন্য ক্বারীগণ লা তা'বুদুনাই পড়তেন। লা তা'বুদুনা ইল্লাল্লাহ্' অর্থ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো (গায়ের আল্লাহ্‌র) ইবাদত করবে না। তাই নিষেধাজ্ঞাসূচক নির্দেশটি ছিলো অঙ্গীকারের প্রথম শর্ত। পরের সব কয়টি শর্ত আদেশসূচক।

পরের নির্দেশটি ছিলো পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে তাদের সেবা যত্ন করা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা এবং আল্লাহ্পাকের হুকুমবিরোধী না হলে তাদের নির্দেশ প্রতিপালন করা। এরপর সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে— আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন (এতিম) এবং দরিদ্র (মিসকিন) জনতার সঙ্গে। আয়াতে উল্লেখিত 'মাসাকিন' শব্দটি 'মিসকিন' শব্দের বহুবচন। শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সকুন' শব্দ থেকে। সম্বলহীনদেরকে এ কারণেই মিসকিন বলা হয় যে, অভাব-অনটন তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যেখানে স্বভাবগত আনন্দানুভূতিও অনুপস্থিত। আত্মীয় এতিম ও মিসকিন্‌দের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে-- তাদের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করা।

মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে অর্থ উত্তম কথা বলবে। 'হুসনা' অর্থ উত্তম। ক্বারী হামজা, কাসায়ী এবং ইয়াকুব 'হুসনা' শব্দটিকে পড়েছেন 'হাসানা'। অন্যরা 'হুসনাই' পড়েছেন। বিনয়াতিশয্যে মস্তকাবনত অবস্থায় যে কথা বলা হয়, সে কথাকেই বলে উত্তম বা সুন্দর কথা (ওয়া কুলু লিন্নাসি হুস্‌না)। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেছেন, আয়াতের মর্ম হচ্ছে— রসুলপাক স. এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কালে তোমরা সত্য কথাটিই বলো। হজরত সুফীয়ান সওরী বলেছেন, এই নির্দেশটির প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, মানুষকে সুন্দর কথা বলতে থাকো এবং অসুন্দর কথাকে প্রতিহত করতে থাকো। এরকম মর্ম গ্রহণ করা যেতে পারে যে, পারস্পরিক বাক্যব্যবহারে তোমরা বিনম্র হও। সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো— এরকম ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যেতে পারে। এমনও বলা যায় যে- এমন কথা বলো যাতে সওয়াব হয়।

আয়াতের শেষ নির্দেশ দু'টি হচ্ছে-- সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দিবে। এই নির্দেশ রসুল পাক স. এর সময়ের এবং ইতোপূর্বের সকল ইহুদীদের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু এই নির্দেশ প্রতিপালন করতে এগিয়ে এসেছেন অল্প কতিপয়

লোক, যেমন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী। ইহুদীদের মধ্য থেকে ইমান গ্রহণকারী এই কতিপয় ব্যক্তি বাদে তোমরা বাকী সবাই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। তোমরা বিরূদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে—একথার অর্থ তোমরা অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলে। একথা বলে ইহুদীদের বিভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা যেমন ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তোমরাও তেমনি ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চলেছো।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৪

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

❐ – যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং আপনজনকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না। অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

এখানে অঙ্গীকারের ওই শর্তটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছিলো তোমরা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটাবে না এবং আপনজনদেরকে দেশান্তর করবে না। বনীইসরাইলদের বংশ, ধর্ম ও ভাষা ছিলো এক। তাই পরস্পরে রক্তপাত করবে না- একথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এরকম– তোমরা এমন কর্ম কোরো না যাতে করে তোমাদের রক্তপাত ও দেশান্তর অনিবার্য হয়। কেউ কেউ 'অলা তুখরিজুনা' বাক্যাংশটির অর্থ করেছেন এরকম- তোমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন আচরণ কোরো না যাতে তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা নির্দেশটি স্বীকার করেছিলে। সুতরাং কৃত অঙ্গীকারের সাক্ষীও তোমরা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ওয়া আনতুম তাশহাদুন' (আর এই বিষয়ে তোমরা সাক্ষী) – এই বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের তাগিদ। অথবা এরকমও ব্যাখ্যা হতে পারে যে, ওহে উপস্থিত ইহুদীর দল! তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে অঙ্গীকার করেছিলো সে অঙ্গীকারের সাক্ষী তোমরাই। রসুল পাক স. এর সময়ের ইহুদীদের প্রতি এই বাক্যটি রূপকভাবে প্রযোজ্য হবে।

ثُمَّ اَنۡتُمۡ هٰۤؤُلَآءِ تَقۡتُلُوۡنَ اَنۡفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُوۡنَ فَرِيۡقًا مِّنۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِهِمۡ تَظٰهَرُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ بِالۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ؕ وَاِنۡ يَّاۡتُوۡكُمۡ اُسٰرٰى تُفٰدُوۡهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيۡكُمۡ اِخۡرَاجُهُمۡ ؕ اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَتَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ يَّفۡعَلُ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡىٌ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يُرَدُّوۡنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ○

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اشۡتَرَوُا الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا بِالۡاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ الۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ؏

❐ তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে আপন গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিতেছ, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

❐ তাহারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যও পাইবে না।

'ছুম্মা' অর্থ অতঃপর। শব্দটির মাধ্যমে সময়ের দূরত্ব বুঝানো হয়নি। অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকেই এখানে দূরত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, 'অতঃপর তোমরাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো, একে অন্যকে হত্যা করেছো। তোমাদের একদলকে গৃহছাড়া করেছো। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের পাপ ও সীমালঙ্ঘনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছো। আবার ওই সকল লোকই যদি

বন্দী অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও, অর্থাৎ এক বন্দীর বিনিময়ে অন্য বন্দীকে মুক্ত করো। কেউ কেউ বলেছেন, সম্পদের বিনিময়ে বন্দী মুক্ত কর।

আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্পাক তওরাতে বর্ণিত বনীইসরাইলদের নিকট থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। অঙ্গীকার তিনটি হচ্ছে: ১. পরস্পরে রক্তপাত করবে না। ২. একে অপরকে দেশত্যাগে বাধ্য করবে না। ৩. বনীইসরাইলদের কেউ কোথায়ও বন্দী হয়ে গেলে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করবে। তাদের অঙ্গীকার প্রতিপালনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম- মদীনায় মুশরিকদের দু'টি গোত্র ছিলো– আউস ও খাজরাজ। ইহুদীদেরও ছিলো দু'টি গোত্র– বনী নাজির ও বনী কুরাইজা। বনী কুরাইজার মিত্র ছিলো আউস এবং বনী নাজিরের মিত্র ছিলো খাজরাজ। দু'টি ইহুদী দলই তাদের মিত্রশক্তি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। বিজয়ীদল বিজিতদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করতো এবং তাদেরকে এভাবে ঘরছাড়া করতো। কিন্তু মজার ব্যাপার ছিলো এই যে, তাদের কেউ বন্দী হয়ে গেলে উভয় গোত্রই মিলিতভাবে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনতো। আরববাসীরা তখন তাদেরকে বলতো– এ কিরকম আচরণ তোমাদের! একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো আবার কেউ বন্দী হলে একযোগে তাকে মুক্ত করে আনো। ইহুদীরা তখন বলতো, আমরা আল্লাহ্পাকের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমাদের বংশভূত কেউ বন্দী হলে তাকে আমরা মুক্ত করে আনবো। পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ না করার ব্যাপারেও তো তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ–একথা স্মরণ করিয়ে দিলে ইহুদীরা বলতো, মিত্রের সাহায্যে এগিয়ে না আসা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। এরকম করলে মিত্ররা আমাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করবে। অঙ্গীকারের উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে ইহুদীরা কেবল শেষ শর্তটি পালন করতো। আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে (তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও)।

অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিলো– একথার অর্থ, তোমরা তাদেরকে ঘর ছাড়া করতে বলেই তারা বিপদগ্রস্ত হতো, কখনো কখনো বন্দী হতো। তোমরা তখন মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তও করতে। কিন্তু একবারও ভাবতে না যে, তোমাদের কারণে তারা এরকম বিপদগ্রস্ত হতো। তোমরা তাদেরকে বহিষ্কার করে দিতে বলেই তাদের কপালে জুটতো বন্দীদশা। অথচ এটা ছিলো তোমাদের জন্য অবৈধ।

'ইখরাজুহুম' অর্থ বহিষ্করণ। বহিষ্করণ ছিলো তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করা ছিলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশ। দু'টি নির্দেশের একটি তোমরা মানতে না। অপরটি মানতে। তাই আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে, তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো (বন্দীদেরকে মুক্ত করো) আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো (বহিষ্করণের নির্দেশ মানো না)। এ কী রকম আনুগত্য? এরকম অসম্পূর্ণ আনুগত্য অগ্রহণীয়। এর প্রতিফল অত্যন্ত ভয়াবহ!

পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিনে কঠিনতম শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তোমাদের এই অসদাচরণের জন্য। রসুল পাক স. এর সময়ে তাদের এই পার্থিব লাঞ্ছনা বাস্তবায়িত হয়েছিলো। অঙ্গীকার ভঙ্গের কারনে বনী কুরাইজাদেরকে বন্দী করা হয়েছিলো এবং মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিলো। আর বনী নাজিরেরা অপমান ও লাঞ্ছনার সঙ্গে বিতাড়িত হয়েছিলো। এরপরেও তাদের শাস্তির অবসান হয়নি। কিয়ামতের দিনে আবারো তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। জাহান্নামের অগ্নিবাসই হবে তাদের চিরকালীন আবাস।

এরপর বলা হয়েছে– তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন (ওয়ামাল্লাহু বিগফিলিন য়াম্মা তা'মালুন)। ইবনে কাসীর, নাফে, আবু বকর প্রমুখ বিজ্ঞজনেরা 'তা'মালুনের' স্থলে পড়তেন 'ইয়া'মালুন।' এমতাবস্থায় 'তা'মালুন' শব্দের সর্বনাম 'মাইইয়াফয়ালু' এর 'মান' এর সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে।

তারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। এরকম করা স্পষ্টতঃই কুফরী। তাই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং সেদিন (কিয়ামতের দিন) তারা কোনো সাহায্য পাবে না। আল্লাহ্পাকের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগই তাদের থাকবে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

❐ এবং নিশ্চয় মুসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রসুল এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ?

আল্লাহ্পাক হজরত মুসাকে কিতাব দান করেছেন। তিনি শেষ নবী ছিলেন না। তাঁর পরেও একে একে আরো রসুল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ্পাক। হজরত ইউশা, শামুয়েল, শামাউন, দাউদ, সুলায়মান, আইউব, আরমিয়া, উযায়ের, হিযকীল,

আল ইসায়া, ইউনুস, জাকারিয়া, ইলিয়াস, ইয়াহ্হিয়া এবং আরো অনেক নবী রসুল আলাইহিমুস্সালাম । মরিয়ম তনয় হজরত ঈসাকেও আল্লাহ্পাক রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে দিয়েছেন অনেক স্পষ্ট নিদর্শন (মোজেজা)। নিদর্শন বুঝাতে আয়াতে 'বাইয়েনাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাইয়েনাত অর্থ নবুয়তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতেন, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় দান করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতেন। এগুলোই ছিলো তাঁর নবুয়তের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করেছি– একথার অর্থ, হজরত ঈসাকে হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি। অথবা তাঁকে ওই রূহের মাধ্যমে শক্তিশালী ও পবিত্র করেছি, যে রূহ আমি মরিয়মের উদরে ফুৎকার করেছিলাম। 'আল কুদ্স' অর্থ পবিত্র। এখানে পবিত্রকারী স্বয়ং আল্লাহ্পাক। সম্মান প্রদর্শনার্থে বিষয়টিকে আল্লাহ্পাক নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর) নাক্বতাল্লাহ্ (আল্লাহ্র উষ্ট্রী)। এরকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ওয়া নাফাখনা ফিহি মিররূহি (আর আমি তাতে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করেছি)।

আল্লামা ইবনে কাসীর 'রূহিল কুদুস' শব্দের 'দাল' অক্ষরটিকে পাঠ করতেন সাকিন সহযোগে। অন্য ক্বারীগণ 'দাল'কে পেশ সহযোগে পাঠ করতেন।

'রূহ' এবং 'আল কুদ্স' শব্দ দু'টির সম্বন্ধ খতামুল জুদ (দানশীলতার আংটি) শব্দ দু'টির মতো। একথা মেনে নিলে আল কুদ্স শব্দটি হবে রূহ্ শব্দটির বিশেষণ। হজরত জিবরাইল আ. এবং হজরত ঈসা আ. অবাধ্যতার আবিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই তাঁদেরকে আল কুদ্স বা পবিত্র বলা হয়েছে। হজরত ঈসার জন্মের সময় আল্লাহ্পাক তাঁকে শয়তানের স্পর্শ থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। তাই বিশেষভাবে তাঁকে আল কুদ্স বলা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে-রসুলপাক স. বলেছেন, সকল সদ্যজাত আদম সন্তানকে শয়তান স্পর্শ করে। কিন্তু হজরত মরিয়ম ও তাঁর সন্তান (হজরত ঈসা) এর ব্যতিক্রম। তাঁরা দু'জন শয়তানের স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত ঈসাকে পবিত্র বলার আরেকটি কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন পুরুষবীর্য ও ঋতুবতী জরায়ু থেকে মুক্ত। হজরত জিবরাইল কর্তৃক তাঁকে শক্তিশালী করার পদ্ধতিটি ছিলো এরকম– নির্দেশ ছিলো হজরত ঈসা যেখানেই গমন করুন না কেনো জিবরাইল তাঁর সহগামী হবেন। এই নির্দেশের প্রতি হজরত জিবরাইলের ছিলো যথামান্যতা। তাঁর আকাশারোহণের সময় পর্যন্ত এই নির্দেশকে তিনি মান্য করে চলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, রূহ অর্থ ইসমে আজম, যদ্দারা হজরত ঈসা মৃতকে জীবিত করতেন এবং মানুষের সামনে অলৌকিক বিষয়াবলী প্রদর্শন করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, রূহ অর্থ ইঞ্জিল শরীফ। যেমন এক আয়াতে বলা

হয়েছে, 'আওহাইনা ইলাইকা রূহাম্মিন আমরিনা' (হে মোহাম্মদ স. আমি স্বীয় নির্দেশে আপনার প্রতি রূহ এর প্রত্যাদেশ করেছি)। এখানে রূহ অর্থ হবে কোরআন পাক। আল্লাহ্‌র কিতাবকে রূহ বলার তাৎপর্য হচ্ছে, রূহ যেমন দেহের প্রাণশক্তি তেমনি রূহের প্রাণশক্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। শেষোক্ত ব্যাখ্যা দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে রূহের সম্বন্ধ এবং পবিত্রতার বিশেষণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার রহস্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে। কেনোনা রূহ যদি আল্লাহ্‌র কিতাব হয়, তবে পবিত্রতার ব্যাপাটিও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়া সম্পূর্ণতঃই যুক্তিযুক্ত। বাগবী বলেছেন, ইহুদীরা যখন রসুলপাক স. এর নিকট থেকে হজরত ঈসা বিষয়ক আলোচনা শুনতো, তখন আরজ করতো, আপনি তো হজরত ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেন। আমরা সেগুলোকে সত্য বলে মানি। আপনি তো নিজেকেও নবী বলেন। সুতরাং আপনিও তাদের মতো মোজেজা প্রদর্শন করুন। তাদের এই ধৃষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে বলেছেন, যখনই কোনো রসুল তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে আগমন করেছেন, যা তোমাদের মনঃপূত নয়-----। এই আয়াতটি ইহুদীদের প্রতি কঠোর তিরস্কার ও হুমকি স্বরূপ। হজরত মুসা এবং তৎপরবর্তীতে এতো নবী রসুল প্রেরণ করা সত্ত্বেও তারা তাদের অসৎ স্বভাব ত্যাগ করলো না। উপরোক্ত বিভিন্ন অভিযোগ শুরু করে দিলো (যেমন তারা বলতো, আমরাই তোমাকে লালনপালন করলাম। তারপর তুমি এমন হয়ে গেলে যে, আমাদেরকেই অমান্য করো)। এরকমও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে,'আফাকুল্লামা জাআকুম রসুলুন' (যখন কোনো রসুল এমন কিছু এনেছেন) বাক্যটি এখানে নতুন করে শুরু হয়েছে। যেনো একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে এই বাক্যটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই এ বাক্যের শুরুতে 'ফা আ' (তবে কি) বসানো হয়েছে। পূর্বের বাক্যে নবী রসুল প্রেরণের যে কথা বলা হয়েছে তাতে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, তারা নবীগণের সঙ্গে কী কী আচরণ করেছে? যার জবাব হচ্ছে, তারা তাদের প্রতি কুফরী করেছে। তাই এই বাক্যে তিরস্কারার্থে উল্লেখিত হয়েছে, যখনই কোনো রসুল আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন, তখনই তোমরা অস্বীকার করেছো। তারা তোমাদের নিকট মনঃপূত হয়নি বলে তোমরা অহংকার করেছো। কাউকে কাউকে বলেছো মিথ্যাবাদী। যেমন হজরত ঈসা আ. কে এবং হজরত মোহাম্মদ স. কে। কাউকে কাউকে তোমরা আবার হত্যাও করেছো। যেমন, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহ্‌ইয়া প্রমুখকে। নবী হত্যার ব্যাপারটি ছিলো অতীত কালের। তবুও এখানে তা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের অনুকূল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। কারণ, হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলো অতিপ্রসিদ্ধ। অতিপ্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনারীতি এরকমই (যেমন বলা হয়, আমি দিল্লি গমন করলাম, সেখানে দেখছি এক বিরাট জামে মসজিদ। আরো সামনে দেখছি একটি প্রকান্ড কেল্লা)। এরকম বর্ণনারীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীদের নিকট একথাটি যেনো

দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয় যে, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক নবীকে হত্যা করেছে। ওইরূপ মনোভাব তোমরাও পোষণ করে চলেছো। তোমাদের প্রচেষ্টাও তাদের মতোই। হত্যার অভিপ্রায়েই তোমরা মোহাম্মদ স. কে যাদু করেছো। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছো।

হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে– একবার একজন (ইহুদী) রসুল পাক স. এর উপরে যাদু করেছিলো। যাদুর প্রভাবে তাঁর কখনো কখনো স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিলো। তখন তাঁর মনে হতো, অমুক কাজটি তিনি করেছেন, অথচ সে কাজটি তিনি আদৌ করেননি। এ অবস্থা চললো কিছুদিন ধরে। এরপর তিনি আল্লাহ্‌পাকের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আয়েশা! তুমি তো জানো, একটি বিষয়ে আমি আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম। আল্লাহ্‌পাক সে বিষয়টি আমাকে পরিস্কার করে দিয়েছেন। আমি বললাম, হে রহমতের নবী! সেটা কী? তিনি বললেন, আমি দেখলাম, দু'জন লোক এলো। একজন আমার শিয়রে এবং একজন আমার পিছনের দিকে উপবেশন করলো। একজন বললো, বলো দেখি এর কী রোগ হয়েছে! দ্বিতীয়জন বললো, যাদু। প্রথমজন প্রশ্ন করলো, কে যাদু করেছে? অপরজন বললো, লবীদ বিন আসেম ইহুদী। পুনরায় প্রশ্ন হলো, সে কী যাদু করেছে? জবাব– একটি চিরুনী, একগুচ্ছ চুল এবং খেজুরের খোসা। প্রশ্ন- সেগুলো কোথায়? জবাব– জারওয়ান কূপে। এরপর রসুল পাক স. একদল সহচর সমভিব্যাহারে ওই কূপের নিকট গিয়ে বললেন, এই সেই কূপ, যা আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে।

আমি বলি, 'তাক্বতুলুন' (হত্যা করেছো) একথাটি ভবিষ্যতকালবোধকও হতে পারে। অর্থাৎ তোমরা হত্যা করবে। আর যাঁকে হত্যা করবে তিনি হচ্ছেন রসুল পাক স.। তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টাও ইহুদীরা করেছিলো। খয়বরের এক ইহুদী রমণী রসুলপাক স. কে বিষমিশ্রিত ছাগলের গোশত খাইয়েছিলো। সেই বিষের প্রতিক্রিয়া ছিলো তাঁর অন্তিমকাল পর্যন্ত। এরকম ব্যাখ্যা মেনে নিলে এই হত্যাসম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে পূর্বের নবীগণের হত্যার ব্যাপারটি উহ্য রয়েছে মনে করতে হবে। তখন অর্থ হবে এরকম– নবীগণের একদলকে তোমরা হত্যা করেছো। আরেক দলকে (একজনকে) হত্যা করবে।

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, খয়বরের এক ইহুদী রমণী ছাগলের গোশতে বিষ মিশ্রিত করে হাদীয়া হিসাবে রসুলপাক স. এর খেদমতে পেশ করলো। রসুলপাক স. কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে সে গোশত খেতে বসলেন। সামান্য গোশত খাওয়ার পর তিনি এরশাদ করলেন, খাওয়া বন্ধ করো। ইহুদী রমণীকে পাকড়াও করার জন্য লোক প্রেরণ করা হলো। বন্দীনী ইহুদী রমণীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গোশতে বিষ মিশিয়েছো? রমণী বলল, আপনি কেমন করে জানলেন। তিনি বললেন, আমার হাতের এই ছাগলের রানটি আমাকে সব বলে দিয়েছে। রমণী বললো, হ্যাঁ আমি এরূপ করেছি। করেছি

এজন্য যে, আপনি যদি প্রকৃতই নবী হন, তবে বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া আপনার উপর হবে না। আর যদি প্রকৃত নবী না হন, তবে আমরা আপনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। রসুলপাক স. ওই রমণীর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কোনোরূপ শাস্তি ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাকে। যে কয়জন সাহাবা ওই গোশত খেয়েছিলেন তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রসুলপাক স. তাঁর পবিত্র উরুদেশ থেকে রক্ত বের করে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিষের প্রতিক্রিয়া মুক্ত হয়েছিলেন। আবু দাউদ, দারেমী। জননী আয়েশা বলেছেন অন্তিম সময়ে রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আয়েশা! আমি ইহুদী রমণীর দেয়া বিষমিশ্রিত যে গোশত খেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়া এখনও অনুভব করছি। ওই বিষক্রিয়া আমার প্রাণশক্তির শিকড় কেটে দিচ্ছে। বোখারী।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক ইহুদীদেরকে এখানে দু'টি দলে বিভক্ত করেছেন। এক দলকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে 'ফা ফারিকুন কাজ্জাবতুম' (কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো)। আরেকটি দলকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে 'ফারিকুন তাকৃতুলুন (কতককে হত্যা করেছো)। এভাবে তাদের একদল নবীগণের উপরে অসত্যারোপকারী। আরেকদল নবী হন্তারক। যদি কেউ বলে যারা নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং হত্যাও করেছে সেই দলের কথা তাহলে এখানে বলা হয়নি। এ সন্দেহের উত্তরে বলা যায় যে, যদি দু'টি দলের সংযোজক 'ওয়াও' (এবং) এর স্থলে 'আও' অব্যয়টি সন্নিবেশিত হতো, তবে বিবরণটি সন্দেহবিমুক্ত থাকতো। তখন অর্থ হতো– হয়তো তোমরা নবীগণকে অসত্যারোপ করেছো অথবা হত্যা করেছো। কিন্তু এভাবে নবীগণের উপরে যে কোনো একটি (মিথ্যারোপ অথবা হত্যা) কার্যকর হতো। এক সঙ্গে দু'টোকেই বুঝাতো না। কিন্তু 'ওয়াও' (এবং) বসানো হয়েছে বলে সে সন্দেহের অবকাশ আর নেই।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৮

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ○

❒ তাহারা বলিয়াছিল 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।' হাঁ, সত্য প্রত্যাখানের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে।

'গুলফুন' অর্থ ওই অন্তর যা স্বভাবগত পর্দায় আচ্ছাদিত। ওই রূপ অন্তরের অধিকারীরা সত্যবচন শোনে না ও বুঝে না। অন্য একটি আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'কাফেররা বলতো, আমাদের অন্তকরণ পর্দায় আচ্ছাদিত।'

এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও কাতাদা। অন্য কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, 'গুলফুন' শব্দটির আসল উচ্চারণ হবে 'গুলুফুন'। এরকম উচ্চারণ করতেন হজরত আয়রাজ এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। এই পদ্ধতিতে গুলফুন হচ্ছে গুলুফুন শব্দের বহুবচন। এই নিয়মে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম, আমাদের অন্তরগুলো সর্বপ্রকার জ্ঞানের আধার, জ্ঞানে ভরপুর। সুতরাং তোমাদের দেয়া জ্ঞানের আর কোনো প্রয়োজন নেই। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং আতা এরকম বলেছেন। কালাবী বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমাদের অন্তকরণ সর্বজ্ঞানের আধার– যা কিছু শোনে তার সংরক্ষণ করে। কিন্তু তোমাদের কথা বুঝেও না সংরক্ষণও করে না। তোমাদের কথায় যদি কোনো পুণ্য বা কল্যাণ থাকতো তবে অবশ্যই আমাদের অন্তকরণ তা উপলব্ধি করতো এবং গ্রহণও করতো। তাদের এতাদৃশ ধারণার প্রতিবাদ হিসেবে এই আয়াত এসেছে। আল্লাহ্পাক এখানে বলেছেন, তাদের অন্তকরণ স্বভাবগতভাবে আচ্ছাদিত নয় বরং তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তির কারণেই তারা আল্লাহ্তায়ালার অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। যেমন রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, প্রতিটি শিশুই 'ফিতরাতের' (সত্যগ্রহণ যোগ্যতার) উপরে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক অথবা মুশরিক বানায়। একজন আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যদি সে মারা যায় তবে তার কী অবস্থা হবে, তিনি বললেন, আল্লাহ্পাকই তার প্রকৃত অবস্থা অবগত।

আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন–সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্যই তাদের উপর নেমে এসেছে এই অভিশাপ। তাদের অন্তকরণ জ্ঞানের ভান্ডার, জ্ঞানের আধার– ইহুদী অবিশ্বাসীদের এই দাবী অযৌক্তিক। সত্যগ্রহণে তারা অপারগ এই কারণেও যে, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে ভরা তাদের অন্তকরণ। আর তারা এ কারণেই অভিশপ্ত। কুফরীর কারণেই তাদেরকে এ অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ্। অন্য একটি আয়াতেও আল্লাহ্পাক জানিয়েছেন 'আছাম্মাহুম ওয়া আ'মা আবস্বারাহুম' (আল্লাহ্পাক তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, আর তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন)।

সুতরাং অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে- একথার অর্থ ইহুদীরা অধিকাংশই অবিশ্বাসী। অল্পসংখ্যক ইহুদী ইমানের পথে এগিয়ে এসেছে। মুশরিকরা যেমন অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ করেছে–ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণ সে তুলনায় অপ্রতুল। এরকম বলেছেন কাতাদা। এরকম অর্থও হতে পারে যে, তাদের পরিমাণগত দিকটি অত্যল্প। অথবা এরকমও বলা যায়-ইমানের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে খুবই কম বিষয়ে তারা আস্থাশীল। এভাবে তাদের জন্য ইমানের কতোকাংশ গ্রহণ ও কতোকাংশ বর্জন অবশ্যম্ভাবী হয়। তাই ওয়াকিদী বলেছেন, তারা অল্প বেশি কোনো রকম ইমানেরই অধিকারী নয়। বরং তারা সম্পূর্ণতই ইমানশূন্য। যেমন

বলা হয়, তুমি অমুক কাজটি খুব কমই করো– এরকম কথার প্রকৃত অর্থ হয় অমুক কাজটি তুমি করোই না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৯

وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتٰبٌ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمۡ ۙ وَكَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُوۡنَ عَلَى الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ مَّا عَرَفُوۡا كَفَرُوۡا بِهٖ ۚ فَلَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ○

❒ তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহের নিকট হইতে তাহার সমর্থক কিতাব আসিল; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহের অভিশম্পাত।

তাহাদের নিকট যাহা আছে- একথার অর্থ তওরাত শরীফ। আর সমর্থক কিতাব অর্থ কোরআন শরীফ। আয়াতে বলা হয়েছে, তওরাতের সমর্থক হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ হলো। কোরআন যিনি নিয়ে এলেন, সেই মহানবী মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা তাঁকে অন্তর থেকে মান্য করতো। তখন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য তারা তাঁকে অসিলা করতো। বলতো, যে শেষ নবীর মর্যাদা ও গুণাবলীর বিবরণ আমরা তওরাতে দেখতে পাই– সেই মহাসম্মানিত নবীর বরকতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করো। এভাবে দোয়া করে তারা আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করতো এবং মুশরিকদেরকে এই বলে শাসাতো যে, শেষ নবীর আবির্ভাবকাল সমুপস্থিত। তিনি আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবেন। তারপর আমরা তাঁর সহযোগী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো, ধ্বংস করে ফেলবো যেমন ধ্বংস করা হয়েছে আদ, সামুদ ও এরেম বাসীদেরকে। আয়াতের ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, ইহুদীরা মুশরিকদের নিকট রসুল পাক স. এর আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করতো এবং বলতো,অতিশীঘ্রই তিনি আবির্ভূত হবেন–একথা নিশ্চিত। 'ইয়াস্তাফ্তিহুনা' শব্দের সিন অক্ষরটি মোবালাগা অর্থে ব্যবহৃত। উপরন্তু সিন অক্ষরটিতে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসুল পাক স. এর গুণাবলী বর্ণনাকারী যেনো আপনমনকে একথাই জিজ্ঞেস করে, সে নবী কবে আসবেন?

সেই প্রতিশ্রুত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী এলেন। তওরাত কিতাবে তাঁর পূর্ণ নিদর্শন লিপিবদ্ধ ছিলো। ইহুদীরা তা পাঠ করতো। তাই শেষ রসুলকে তারা সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হলো। কিন্তু জেনে-শুনে-বুঝেও তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। অস্বীকার করলো দু'টি কারণে একটি হচ্ছে – এই নবী কেনো তাদের বংশ থেকে আবির্ভূত হলো না। আরেকটি হচ্ছে–তাঁকে মেনে নিলে নিশ্চিত অর্থাগম ও নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শেষে বলা হয়েছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত–এখানে অবিশ্বাসী ইহুদীদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই আয়াতে 'আলাইহিম' না বলে 'আলাল কাফেরীন' বলা হয়েছে। কারণ ওই সকল ইহুদীই ছিলো আয়াতের লক্ষ্য। তাই অভিশম্পাতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিলো। অন্যভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– আল্লাহ্‌পাকের অভিশম্পাত সাধারণভাবে সকল কাফেরদের প্রতি। আর এই ইহুদীরাও যেহেতু অবিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত,তাই এরাও অভিশপ্ত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯০

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

❒ উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে-উহা এই যে, আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারণে যে আল্লাহ্‌ তাঁহার দাসদের মধ্যে হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে–একথার অর্থ আখেরাতের লাভের তুলনায় পৃথিবীর লাভকেই তারা বড় করে দেখেছে। দ্বীনের বিনিময়ে ক্রয় করেছে দুনিয়াকে। তাই তারা ঈর্ষাপরবশ হয়ে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। 'বাগইয়া' শব্দের অর্থবিদ্রোহাত্মক প্রবৃত্তি বা ঈর্ষা। কুফর বা অবিশ্বাস নয়। 'বাগী', 'ইয়াবগী', 'বাগ ইয়া'– এশব্দগুলো সমার্থক শব্দ। 'বাগী' শব্দের অর্থ কোনো কিছু কামনা করা অথবা বিনষ্ট করা। অত্যাচারীকেও বাগী বলা হয়, কারণ সে অনাচার করে। যে প্রশাসকের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাকেও বলে বাগী। কারণ সেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। হিংসুক বা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকেও বাগী বলা যায়, কারণ সেও অত্যাচারী। যাকে সে হিংসা করে, সে তার প্রতি অত্যাচারপ্রবণ হয়ে থাকে। তাই সে তার জীবন ও সম্পদ বিনষ্টির কামনায় সদাসচেষ্ট থাকে।

ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আয়াত অস্বীকার করে। অবতীর্ণ কোরআন বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'আঁইউনাজজিলাল্লা'। ক্বারী আবু আমর এবং ইবনে কাসীর সকল অবস্থায় 'তুনাজজিলু' শব্দটিকে তাশদীদবিহীন অবস্থায় পাঠ করেছেন। ইবনে কাসীর অবশ্য কয়েক স্থানে এর ব্যতিক্রমও করেছেন। যেমন, 'অমাতুনাজ্‌জিলু' (সুরা হিজর), 'অতুনাজ্‌জিলু মিনাল কোরআন' (সুরা হিজর) এবং 'অনাজ-জিলু আলাইনা' (সুরা ইসরা)। ক্বারী আমরও কয়েকটি স্থানে তাশদীদসহ পাঠ করেছেন। যেমন, 'আই ইয়ান জুলা' (সুরা আনআম) এবং 'ওয়ামা নুনাজ্ জিলুহু' (সুরা হিজর)। সকল ক্বারী অবশ্য 'মা নুনাজ জিলুল মালাইকাতা' আয়াতটি তাশদীদ সহকারে পাঠ করেছেন।

'মিনফাদ্বলিহি' অর্থ তোমার করুণা বা অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকেই এই অনুগ্রহ (ফজল) দান করেন। ইহুদীরা তাঁর এই অনুগ্রহের অবমাননা করেছে। মহানবী মোহাম্মদ স. এবং কোরআন মজীদ– এই মহান অনুগ্রহকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতোপূর্বেও তারা এমন করে বিমুখ হয়েছিলো ইঞ্জিল শরীফের প্রতি। যথাআনুগত্য করেনি তওরাত শরীফেরও। গরু পূজা, শনিবারের মৎস শিকারের নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার– এসমস্ত কারণে তারা আগে থেকেই ছিলো আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র। এখন শেষ নবী ও শেষ কিতাবের প্রতি বিমুখ হয়ে পুনরায় তারা ক্রোধের পাত্র হলো। তাই আয়াতে বলা হয়েছে– সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হলো।

আয়াতের শেষ বাক্যটি হচ্ছে- সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রকৃতপক্ষে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। পাপী মুমিনদের প্রতি যে শাস্তি আরোপ করা হবে, সে শাস্তি লাঞ্ছনাদায়ক হবে না। লাঞ্ছনা বা অপদস্থতা নয়– পাপমুক্ত এবং পবিত্র করাই হবে সে শাস্তির উদ্দেশ্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

❒ এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস কর, তাহারা বলে 'আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।' তাহা ব্যতীত সবকিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে?'

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন– একথার অর্থ আল্লাহ্পাক যে সকল আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। একথার মধ্যে তওরাত শরীফ, যবুর শরীফ, ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআন শরীফ সহ সকল আসমানী কিতাবই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্তায়ালার এই অখণ্ডনীয় নির্দেশকে ইহুদীরা মান্য করে না। তারা বলে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা কেবল তাই বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তওরাত ছাড়া অন্য কোনো আসমানী কিতাব আমরা মানি না। কিন্তু তওরাতই তাদের এই কথার প্রতিবাদ করে। কারণ, কোরআনকে মান্য করার নির্দেশ তওরাত শরীফেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। তওরাতে একথাও বলা হয়েছে, অতঃপর তোমাদের নিকট আসবেন একজন নবী। তিনি হবেন তওরাতের সত্যায়নকারী। তোমরা অবশ্যই তাঁকে মেনে চলবে এবং অবশ্যই তাঁর সাহায্যকারী হবে। অতএব ইহুদীরা তওরাতকে বিশ্বাস করে না, যদি করতো তবে তওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী শেষ রসুল ও শেষ কিতাবকে মেনে নিতো।

শেষ বাক্যটিতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তারা বিশ্বাসী নয়, বরং ঘোর অবিশ্বাসী। তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়েছে– তোমরা যদি বিশ্বাসী, তবে নবীগণকে হত্যা করেছিলে কেনো? লক্ষণীয় যে, মদীনার ইহুদীরা নবী হন্তারক নয়, তবুও তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তবে নবীগণকে হত্যা করেছো কেনো? ইহুদীদের পূর্ব পুরুষেরা নবীহন্তারক ছিলো– সেদিকে লক্ষ্য করেই এরকম প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ অধস্তন ইহুদীরা তাদের উর্ধ্বতন পুরুষদের অপকর্ম সমূহের প্রতি সন্তুষ্ট এবং পূর্ব পুরুষদের একনিষ্ঠ অনুসারীও তারা। তাছাড়া এখনও তারা কোনো নবীকে হত্যা করেনি বটে, কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ স. কে যাদু, যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করতে তারা সদা সচেষ্ট রয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯২

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ أَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

❒ এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছে তাহার পরে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী হইয়া গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে।

'অলাক্বদ্ জাআকুম' অর্থ তোমাদের নিকট এসেছেন। ক্বারী আবু আমর, হামজা, হিশাম ও কাসায়ী সকল ক্ষেত্রে 'ক্বদ জা আকুম' এর 'দালকে' 'জিমের' মধ্যে ইদগম করে পাঠ করেছেন। অনুরূপ 'লাক্বাদ জার্‌না' বাক্যে 'দাল'কে 'জালের' সঙ্গে,'লাক্বদ জাইআন্‌না' বাক্যে 'দালকে 'জ' এর মধ্যে, ক্বদ ছামিয়া তে 'দাল'কে 'সিন' এর সাথে, 'ক্বদ শাগ্‌ফাহা' তে 'দাল' কে 'সিন' এর সাথে, 'ফাক্বদ দ্বললা' তে 'দাল' কে 'ছোয়াদ' এর সাথে এবং 'ফাক্বদ জলামু' তে 'দাল'কে 'জোয়া' এর সাথে ইদগম করে পাঠ করেছেন। কোরআন মজীদে যেসব 'জ' স্থানে 'দাল' এর পরে 'তোয়া' থাকবে সেসকল স্থানেও ইদগম অবশ্যই পড়তে হবে। হিশাম ব্যতীত অন্য ক্বারীগণ 'লাক্বদ ছর্‌রাফনা' বাক্যের 'দালকে' 'ছোয়াদ' এর সাথে ইদগম করেছেন। ইবনে জাকোয়ান চারটি স্থলে হামজা, কাসায়ী ও হিশামের অনুসরণে ইদগম করেছেন। যথা- দাল এর জাল, জোয়া, জোয়াদ, জোয়া। ক্বারী ওয়ারশ ক্বদ এর পরে কেবল দোয়াদ এবং জোয়া এলে ইদগম করেছেন। ইবনে কাসীর এবং আসেম উপরোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে ইদগম সহ পাঠ করেছেন। ক্বদ এর পরে দাল এলে ইদগম হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। যেমন ক্বদ দাখালু। ক্বদ এর পরে 'তা' এলেও সর্বসম্মতভাবে ইদগম হবে, যেমন ক্বদ্‌তা বাইয়ানা। কিন্তু নাফে থেকে হাসীন বর্ণনা করেছেন, ক্বদ এর পরে ইদগম হবে না, ইজহার হবে।

এরশাদ হয়েছে– 'নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন।' তোমরা তাঁকে এবং তাঁর অলৌকিক নিদর্শন সমূহকে প্রত্যক্ষ করেও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গো-বৎস্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে কেনো? সীমালঙ্ঘন বুঝাতে আয়াতে জলিমুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদীরা জালেম (অত্যাচারী)। তারা বলে, আমরা কেবল তওরাতকে বিশ্বাস করি। অথচ বিশ্বাসের কোনো আলামতই তাদের মধ্যে নেই। যদি থাকতো তবে তারা নবীহত্যা, গরু পূজা– এ সমস্ত কখনই করতো না। কারণ, এ সকল বিষয় তওরাত সহ সকল আসমানী কিতাবে নিষিদ্ধ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

❒ স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম, এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম 'যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম।' সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু তাহাদের হৃদয় গো-বৎস্য-প্রীতি-সিঞ্চিত হইয়াছিল। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যাহার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট।'

সেই অঙ্গীকারের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ্পাক, যখন বনীইসরাইল এর নেতাদের মাথার উপরে তুলে ধরা হয়েছিলো তূর পাহাড়। তখন আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করো এবং শোনো। এখানে শোনো শব্দের অর্থ হবে মেনে নাও এবং অনুসরণ করো। কোনো নির্দেশ পালন করতে গেলে তা প্রথমে শুনতে হয়। তাই এখানে পালন করো বা অনুসরণ করো বুঝাতে বলা হয়েছে শোনো। ইহুদীরা তখন জবাব দিয়েছিলো- আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। ভাষ্যকারগণ বলেছেন, অমান্য করলাম শব্দটি তারা মুখে উচ্চারণ করেনি। কথাটি ছিলো তাদের অন্তরের কথা। সহজেই একথা বুঝা যায় যে, মুখে তারা মান্য করলাম এরকম বাক্যই উচ্চারণ করেছিলো। পরবর্তীতে তাদের অবাধ্যতা এতোই প্রকট হয়ে উঠেছিলো যাতে করে মনে হতো তারা বোধ হয় প্রথমেই শুনলাম ও অমান্য করলাম— এরকম কথা সরাসরি মৌখিকভাবে বলে দিয়েছিলো। আমি বলি, ভাষ্যকারগণ যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। কারণ একথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, মৌখিকভাবে অমান্য করলে উত্তোলিত পাহাড় তখনি তাদের উপর ফেলে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো।

ইহুদীরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো বলেই তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো গো-বৎস্য প্রীতি। এটি ছিলো তাদের অবিমৃশ্যকারিতার চরম প্রমাণ। সামেরী বিচিত্র রং দিয়ে গো-বৎস মূর্তিকে করেছিলো মনোহর। ওই মনোহারিত্বের রন্ধ্রপথেই গো-বৎস্যপ্রীতির রং এসে পড়েছিলো তাদের মনে। শাদা কাপড়কে রঙ্গিন করলে যে অবস্থা হয়, গো-বৎস্যপ্রীতির রঙ্গে তেমনি রঞ্জিত হয়ে উঠেছিলো তাদের অন্তরাত্মা।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে— তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে— এ কি রকম বিশ্বাস তোমাদের, যে বিশ্বাস নিকৃষ্টতার প্রতি প্ররোচিত করে। তোমরা বলো, তোমরা তওরাতে বিশ্বাসী। যদি তাই হয়, তবে বলো তোমাদের বিশ্বাসভাজন তওরাতে কোথাও কি গো-বৎস্য পূজার নির্দেশ রয়েছে। ইমান কি কখনো কোনো গর্হিত কাজের নির্দেশ দিতে পারে? সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তোমরা বিশ্বাসীই নও।

ইহুদীরা বলে বেড়াতো— মাত্র কয়েকদিন জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে, ইহুদী ও খৃষ্টান ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না, আমরা আল্লাহ্র সন্তান এবং তাঁর বন্ধু ইত্যাদি। তাদের এ সকল অনর্থক উক্তির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

❒ বল, 'যদি আল্লাহের নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর–যদি সত্যবাদী হও।'

❒ কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না। এবং আল্লাহ্ সীমালজ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত।

এরশাদ হয়েছে, হে ইহুদীরা তোমরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যদি তাই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো না কেনো? মৃত্যুতুখে পতিত হলেই তোমরা তাহলে তোমাদের প্রিয়জন আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। বন্দীদশা সদৃশ এই পৃথিবীবাস থেকে মুক্ত হয়ে চিরসুখময় আবাসে অনন্তকাল ধরে বসবাস করতে পারবে। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, মৃত্যু তোমাদের নিকট চরম অপ্রিয়।

হজরত ইবনে মোবারক জুহুদ অধ্যায়ে এবং বায়হাকী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন- রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, মৃত্যু হচ্ছে মু'মিনের উপহার। হজরত জাবের থেকে দায়লামীও এরকম বর্ণনা কারেছেন। হজরত হোসাইন বিন আলী থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু (প্রকৃত) মানুষের নিকট পুষ্প সদৃশ। হজরত হাব্বান বিন আসওয়াদ বলেছেন, মৃত্যু বন্ধুমিলনের সেতু। কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আখেরাতের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে কবর। হজরত ওসমান থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা মারফু পদ্ধতিতে এরকমই বিবরণ দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্বে মৃতব্যক্তি আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে পার্থিব প্রাপ্তির চেয়ে অধিক কল্যাণ লাভ করবে। অন্যথায় মৃত্যু কাম্য হতো না। আর একে বন্ধুমিলনের সেতুও বলা যেতো না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্য হও, তবে

বিচ্ছেদকন্টকিত এই পৃথিবীবাসের অবসান কামনা করে মৃত্যুকে স্বাগত জানাও। এই ব্যাখ্যাসুত্রে আয়াতটি মুবাহিলার আয়াতের দৃষ্টান্ত হবে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, এই ইহুদীরা যদি মৃত্যু কামনা করতো, তবে ধরাপৃষ্ঠে আর কোনো ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না। সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতো। বায়হাকী তাঁর দালায়েল পুস্তকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন কিছু শব্দ পরিবর্তন সহযোগে। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে জারীর মওকুফ পদ্ধতিতে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'ইনকুনতুম ছুদিক্বিন'— এর অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ তোমরা যদি মনে করো, তোমরা সত্যবাদী তবে মৃত্যু কামরা করো।

জ্ঞাতব্যঃ মৃত্যু কামনা সিদ্ধ না অসিদ্ধ, এই সমস্যাটির নিরসন হওয়া প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, দৈহিক কিংবা আর্থিক বিপদাপদ অথবা সন্তানসন্ততি বা প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণে মৃত্যু কামনা করা সিদ্ধ নয়। হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে- রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, বিপদাপদের কারণে তোমরা কখনো মৃত্যু চেয়ো না। অন্তর যদি অতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে শুধু এতোটুকু বলো, হে আল্লাহ্! যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততোক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো। আর মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তখনই আমাকে মৃত্যু দিও। বোখারী, মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, যে মৃত্যুবরণ করে তার সমুদয় আমল বন্ধ হয়ে যায় (পৃথিবীবাস যদিও অশুভ, তবুও কল্যাণ অর্জনের জন্য আমলের স্থান কিন্তু এই পৃথিবীই)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে- তোমরা কেউ কখনো মৃত্যু কামনা কোরো না। তোমরা সম্ভবত অধিক পরিমানে পুণ্য অর্জন করতে পারবে। অথবা অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার অবকাশ পাবে। বোখারী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- রসুলপাক স. বলেছেন, তোমরা কেউ মৃত্যু যাচনা কোরো না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুপ্রার্থী হয়ো না। কারণ, মৃত্যু মানুষের সকল আমল বন্ধ করে দেয়। মুসলিম। মৃত্যুকামনার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আহমদ, বায্যার ও বায়হাকী হজরত জাবের থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। মারুজীও এরকম বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াবিয়ার গোলাম কাসেম এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। আহমদ, ইয়ালী, হাকেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন উম্মুল ফজল থেকে।

একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন যে, মৃত্যুকামনার মৌখিক উচ্চারণ যে সর্ববাদিসম্মতভাবে নিষিদ্ধ, একথা নিশ্চিত। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলের মৃত্যুপ্রীতি নিষিদ্ধ নয়। কারণ, অন্তরের গভীরতম আকর্ষণ অনিবারণীয়। যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে ফেতনা ফাসাদ দৃষ্টে মৃত্যুপ্রার্থী হয়, তবে তার প্রার্থনা বৈধ হবে।

হজরত সাওবান থেকে ইমাম মালেক এবং বাজাজ বর্ণনা করেছেন–রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, আয় আল্লাহ্! যখন আপনি মানুষের মধ্যে ফেতনার বিস্তার ঘটাবেন, তখন আমাকে ফেতনামুক্ত অবস্থায় আপনার সন্নিধান দানে ধন্য করবেন। ইমাম মালেক বলেছেন, হজরত ওমর তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি এখন শক্তিহীন, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, আর এদিকে আমার দায়িত্বের সীমানা সুবিস্তৃত। হে আমার পরম প্রভু! আমার দ্বারা কারো অধিকার বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে শান্তির সঙ্গে আপন সকাশে টেনে নিও। এই প্রার্থনার একমাস অতীত না হতেই হজরত ওমর ইন্তেকাল করেছিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

হজরত আমর বিন আম্বাসা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা কেউ মৃত্যুপ্রার্থনা কোরো না। তবে যদি আমলে আস্থা না থাকে (অসৎকর্মে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়) তবে মৃত্যুপ্রার্থী হতে দোষ নেই। আর যখন ইসলামের মধ্যে ছয়টি অপকর্মের প্রচলন দেখতে পাবে তখন মৃত্যু কামনা করবে। তখন তোমাদের জীবনের অধিকার তোমরা ছেড়ে দিও (মৃত্যু কামনা করতে দ্বিধান্বিত হয়ো না)। সেই ছয়টি অপকর্ম হচ্ছে– ১. (ব্যাপক) রক্তপাত ২. অপ্রবীণের রাজ্য শাসন ৩. বাধ্যবাধকতার অতিরিক্ততা ৪. মূর্খদের নেতৃত্ব ৫. মামলার রায় ক্রয়বিক্রয় ৬. কোরআন পাঠে সাঙ্গীতিক প্রাধান্য প্রদান। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, হজরত আমর বিন আম্বাসাকে কিছুসংখ্যক লোক জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনি মৃত্যু কামনা করেন কেনো? মৃত্যুকামনা তো নিষিদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, আমি রসুল পাক স. কে বলতে শুনেছি, ছয়টি বস্তু প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ কোরো (মৃত্যুপ্রার্থী হয়ো) – ১. মূর্খের রাজ্যশাসন ২. শর্ত ও বাধ্যবাধকতার ছড়াছড়ি ৩. বিচারের রায় বেচাকেনা ৪. নিঃশংকচিত্ত রক্তপাত ৫. স্বজনবন্ধন ছিন্ন করা ৬. কোরআন মজীদকে সঙ্গীত তুল্য ধারণা করা (ইচ্ছেমতো রাগরাগিনী সহযোগে কোরআন তেলাওয়াত করা)। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাকেম এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে সা'দও এরকম বর্ণনা করেছেন। ফেতনার আশংকায় সলফে সালেহীনদের (পরবর্তী সৎকর্মশীলদের) অনেকেই মৃত্যু কামনা করেছেন। এরকম বর্ণনা করেছেন খালিদ বিন মায়্দান থেকে ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকের, আবু নাঈম এবং হজরত আবু দারদা থেকে মাকহুল, ইবনে আবিদুদ্দুন্ইয়া– হজরত আবু হোজায়ফা থেকে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবিদুদ্দুন্ইয়া–হজরত আবু বকরা থেকে খতীব, আবিদুদ্দুন্ইয়া, ইবনে আসাকের– হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী এবং হজরত ইরবাম বিন সাকিলা থেকে তিবরানী ও ইবনে আসাকের। কেউ যদি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খায় মৃত্যুকে আহবান জানায়, তবে তা উত্তম। জুন্নুনমিসরী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন,

তিনি বলেছেন, আশাধারী হওয়া অন্য সকল অবস্থা থেকে শ্রেয়ঃ, সকল মর্যাদার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। প্রভুমিলনের আশা বিলম্বিত মৃত্যুকে অনুমোদন করে না।

আমি বলি, আয়াতে উল্লেখিত সম্বোধনের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌মিলনের আতিশয্য যেনো সুচিহ্নিত হয়। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্ মিলনের আশায় মৃত্যু কামনা করো।

জননী আয়েশা থেকে ইবনে সা'দ, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন—আমি শুনেছিলাম, সকল নবীকেই মৃত্যুর পূর্বে এই অধিকার দেয়া হতো যে, পৃথিবীতে থাকো অথবা আমার নিকট চলে এসো। অথচ অন্তিম সময়ে যখন রসুলেপাক স. এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম, 'মায়াল্লাজিনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবীয়্যিনা ওয়া সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ি ওয়াস্‌সলিহিনা ওয়া হুসনা উলা-য়িকা রফিক্বা' (তাঁদের সঙ্গে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌পাক অনুগ্রহরাশি বর্ষণ করেছেন। তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল এবং তারাই উত্তম সঙ্গী)। একথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম তাঁকে আল্লাহ্‌পাক পৃথিবীতে থাকা না থাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। জননী আয়েশা থেকে নাসায়ীর বর্ণনা এসেছে- অন্তিমকালে রসুল পাক স. আমার কোলে হেলান দিয়েছিলেন। এক সময় তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আমি তাঁর পবিত্র শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম এবং প্রার্থনা করছিলাম, 'হে মানুষের প্রতিপালক! ব্যাধির যন্ত্রণাধিক্য দূর করে দাও। এমন সময় তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। তার পবিত্র হাত আমার হাত থেকে পৃথক করে নিলেন এবং বললেন, না। আমিতো আল্লাহ্‌পাকের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর কামনা করছি।

আল্লামা তিবরানী থেকে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আজরাইল হজরত ইব্রাহিম আ. এর নিকট রূহ কবজের উদ্দেশ্যে এলেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, এরকম দৃশ্য কি কখনো দেখেছো যে, বন্ধু বন্ধুর প্রাণহরণ করে? হজরত আজরাইল একথা আল্লাহ্‌র সকাশে উপস্থাপন করলেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে বললেন, তুমি ইব্রাহিমকে বলে দাও, এরকম কি কোথাও কখনো হয়েছে যে, বন্ধু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মিলনে অনীহ? হজরত আজরাইলের নিকট থেকে একথা শুনে হজরত ইব্রাহিম বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আমি প্রস্তুত। হজরত ইউসুফ আ. বলেছেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং তোমার সৎ বান্দাদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। হজরত আলী বলতেন, আমার কোনো ভয় নেই— যদি মৃত্যু আমার সঙ্গী হয় অথবা আমি মৃত্যুর সঙ্গী হই। ইবনে আসাকের তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই বিবরণগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত আম্মার সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, আজ আমি বন্ধুদের সঙ্গে, অর্থাৎ হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. ও তাঁর দলের সঙ্গে মিলিত হবো। এই উক্তিটি তিবরানী তাঁর কবীরে এবং আবু নাঈম তাঁর দালায়েলে উল্লেখ করেছেন।

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন-- তিনি (আবু উমামা) বলেছেন, আমি রসুল পাক স. এর পবিত্র সংসর্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি স. বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর পবিত্র বক্তৃতা শুনে আমাদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস অত্যধিক রোদন করলেন এবং বলে উঠলেন, হায়! এখন যদি আমার মৃত্যু হতো। রসুল পাক স. এরশাদ করলেন, আমি তোমার সামনে উপস্থিত অথচ তুমি মৃত্যু কামনা করছো? একথা তিনি তিন বার বললেন। পুনরায় এরশাদ করলেন, যদি তুমি জান্নাতের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকো তবে তোমার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবে এবং আমল উত্তম হবে। তোমার জন্য এটাই হবে মঙ্গলজনক। এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল অবস্থায় মৃত্যু যাচনা করা বৈধ নয়। দৈহিক বা আত্মিক ক্ষতি হলেও নয়। যেমন এ হাদিসের বিবরণে প্রকাশ পায়, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস শারিরীক কিংবা বৈষয়িক বিপদাপদের জন্য নয় বরং আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ রসুল পাক স. এর পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করা চরমতম বরকতের কারণ। তাঁর পবিত্র সাহচর্য যতোই প্রলম্বিত হবে ততোই বরকত লাভ হতে থাকবে। মৃত্যু কামনা কেনো, জান্নাত প্রাপ্তিও তাঁর সাহচর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ, জান্নাতে অধিকতর মর্যাদা প্রাপ্তি তাঁর পবিত্র সংসর্গের উপরই নির্ভরশীল। একারণেই তিনি স. বলেছিলেন, আমি সামনে উপস্থিত অথচ তুমি মৃত্যু কামনা করছো? উর্দু অনুবাদক।

আমি বলি, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু আল্লাহ্র আযাবকে রোধ করতে পারে না। তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন তওবা ইস্তেগফার এবং সৎকর্মের আয়োজন। পাপ বিরতিও অত্যাবশ্যক। একারণেই রসুল পাক স. হজরত সা'দকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, পাপলিপ্ত হওয়ার ভয় এবং আনুগত্যে শৈথিল্যের আশংকা যদি দেখা দেয়, তবে নিঃসন্দেহে মৃত্যু কামনা করা যেতে পারে। তদুপরি অন্তিমকালে প্রিয়মিলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রার্থনা করা সম্পূর্ণতঃই বৈধ। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন রসুলুল্লাহ্ স., হজরত ইব্রাহিম, হজরত আম্মার প্রমুখ অন্তিম সময়ে আল্লাহ্পাকের মিলনাকাঙ্খাকে আয়ুষ্কালের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের মিলন পিয়াসী, আল্লাহ্পাকও তাঁর মিলনাভিলাষী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের মিলনকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্পাকও তার মিলনকে অপছন্দ করেন। একথা শুনে হজরত আয়েশা অথবা অন্য কোনো নবীপত্নী বললেন, আমরাতো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি স. এরশাদ করলেন, বিষয়টি ওরকম নয় বরং এরকম— বিশ্বাসীরা যখন মৃত্যুর

সন্নিকটবর্তী হয়, তখন তাদেরকে আল্লাহ্পাকের সন্তোষ ও সম্মানসূচক সুসংবাদ দেয়া হয়। ফলে তাদের নিকট আখেরাতই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে। তখন তাঁরা আল্লাহ্ মিলনের জন্য আকুল হন। আর আল্লাহ্ও ব্যাকুল হন তাঁদের সঙ্গে মিলনের জন্য। আর অবিশ্বাসীরা মৃত্যুর মুখোমুখি হলে তাদেরকে শাস্তি ও তিক্ত পরিণামের দুঃসংবাদ দেয়া হয়। তখন আখেরাত হয় তাদের কাছে সর্বাধিক অপ্রিয় বস্তু। তখন তারা আল্লাহ্ মিলনকে অপছন্দ করে। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে অপছন্দ করেন। বোখারী ও মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত অলি আল্লাহ্গণ অন্তিম লগ্নে আল্লাহ্পাকের সন্তোষসূচক সংবাদ বোধের আওতায় অথবা কাশ্ফের আওতায় অবগত হন বা তাঁরা সেই বিরল সুসংবাদ ধারণ করেন শ্রুতির আওতায়। অথবা বরকতের অফুরন্ত বর্ষণে স্নাত হয়ে অনুভূতিটি তাঁরা ধারণ করেন আপন সত্তায়। কিংবা হজরত আজরাইল এবং রহমতের ফেরেশতার উল্লসিত উপস্থিতি তাঁদেরকে আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা সম্পর্কে নিশ্চিতি দান করে।

সুস্থ জীবন-যাপন অবস্থায় পূর্ববর্তী সাধুজনদের কারো নিকট থেকেই মৃত্যু কামনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফেৎনা ফাসাদের আশংকা, আমল বিনষ্টির ভয়– এসব কিন্তু সুস্থাবস্থা নয়। তাই এমতাবস্থায় হজরত ওমর ফারুক ও হজরত আলীর মৃত্যু কামনার ব্যাপারটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক অবস্থার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আউলিয়া কেরামদের কেউ কেউ মৃত্যু কামনা করেছেন। কিন্তু নবী, রসুল ও সাহাবায়ে কেরাম এরকম করেননি (কারণ, তাঁরা আধ্যাত্মিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সক্ষম)। তাঁরা আল্লাহ্ বিরহে সারাক্ষণ দগ্ধীভূত হতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানতেন যে, এই পৃথিবীতে রয়েছে সৎকর্ম বৃদ্ধির সুযোগ। জনৈক কবি বলেছেন-

প্রবৃত্তির দাস হই মিলনের কালে
বিরহই আমাকে রাখে দাসত্বের হালে

ইহুদীরা মূর্খ, তাই অবাধ্য। তাদের দাবী ছিলো এরকম– আমরা আল্লাহ্র প্রিয়জন। আমাদের কোনো আমলের প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু কামনা করো।' তাদের দাবী যে সর্বৈব মিথ্যা সেকথাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে এভাবে– তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না। তাদের অসৎ অর্জনই এ কামনার অন্তরায়। তাদের কৃতকর্ম জঘন্য। তারা আল্লাহ্র কালাম অস্বীকার করে, রসুল পাক স.কে অবমাননা করে, তওরাত শরীফকে বিকৃত করে। তাদের সকল অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্যক অবহিত। একথাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতের শেষ

বাক্যে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— 'আল্লাহ্ সীমালজ্ঞনকারীদের (জালেমদের) সম্বন্ধে অবহিত।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯৬

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

❐ তুমি নিশ্চয় তাহাদিগকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখিতে পাইবে। তাহাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর বাঁচিবার আকাঙ্খা করে; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাদিগকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।

ইহুদীরা পার্থিব জীবনের প্রতি অতি আসক্ত। এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও ইহলৌকিক জীবন তাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। পরলোকের প্রতি অংশীবাদীদের বিশ্বাস মাত্রই নেই। পক্ষান্তরে ইহুদীরা পাপের শাস্তি, সৎকর্মের বিনিময় লাভ এবং পারলৌকিক জীবনের অন্য সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তবুও তারা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি মোহগ্রস্ত। এর কারণ এই যে, জাহান্নামের ভয় তাদের নেই। তাদের অলীক বিশ্বাস— জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'সমস্ত মানুষ এমনকি অংশীবাদী অপেক্ষাও তারা দুনিয়ার প্রতি অধিকতর লালসাপরায়ণ।'

ইহুদীরা হজরত উযায়ের আ. কে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে (নাউযুবিল্লাহ্)। নিজেদেরকেও মনে করে অমৃতের সন্তান। 'মিনাল্লাজিনা আশ্‌রাকু' বাক্যের মাধ্যমে ওই সকল ইহুদীদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবুল আলীয়া বলেছেন, এই বাক্যের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে অগ্নিপূজকদিগকে। কারণ, তারা পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়ের সময় বলে, তুমি হাজার বছর আয়ুষ্মান হও। সুতরাং 'মিনাল্লাজিনা আশ্‌রাকু' (অংশীবাদীদের চেয়ে) – একথার অর্থ, ইহুদীরা সকল মানুষের চেয়ে, বিশেষ করে অগ্নিপূজকদের চেয়েও অধিক আয়ুষ্কালাভিলাষি।

কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না— একথার অর্থ, এমন কেউ নেই, যে তাদের আয়ু বাড়িয়ে দেবে এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করবে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, দীর্ঘ আয়ু নিঃসন্দেহে পরজগতের শাস্তি দূর করে (কমপক্ষে বিলম্বিত তো করেই)। তাহলে দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না. আয়াতে একথা বলা হলো কেনো? আমি বলি,

পারলৌকিক জীবন অনন্ত, চিরস্থায়ী। অন্তহীন আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর জীবন যেনো চোখের পলক। সুতরাং পৃথিবীর হাজার বছর অথবা ততোধিক সময়ের কিইবা মূল্য। আল্লাহ্পাকের নিকট তাই পৃথিবীর স্থায়িত্ব গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয়ই নয়। শাস্তি দূর হওয়ার আরেকটি অর্থ, সৎকর্মশীলতার জন্য শাস্তি দূর হওয়া। সৎকর্মবিহীন আয়ু প্রকৃতপক্ষে শাস্তিকে দূর করে না, বরং বৃদ্ধি করে। আয়ু যতো বাড়বে পাপও ততো বাড়বে। তওবাবিহীন পাপাচার অধিক শাস্তিকে অবশ্যম্ভাবী করে দেয়।

আয়াতের শেষ কথাটি হচ্ছে, 'ওয়াল্লাহু বাসিরুম বিমা ইয়া'মালুন (তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা)। ক্বারী ইয়াকুব 'ইয়া'মালুন' শব্দটিকে 'তা'মালুন' পড়েছেন। অন্য ক্বারীগণ ইয়া'মালুনই পড়েছেন। এখানে 'তাহারা' বলতে ইহুদীদেরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ইসাহাক ইবনে রহ্ওয়াইহ্ তাঁর মসনদ গ্রন্থে এবং ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর বিভিন্ন পদ্ধতিতে শা'বীর মাধ্যমে হজরত ওমর ফারুক থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন– হজরত ওমর ইহুদীদের নিকট যেতেন এবং তওরাতের আবৃত্তি শুনতেন। তিনি তখন আনন্দিত এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলতেন, এতো কোরআনপাকেরই সত্যায়ণ। একদিন হজরত ওমর ফারুক এরকম আবৃত্তি শুনছিলেন। তখন রসুল পাক স. সেখানে উপস্থিত হলেন। হজরত ওমর বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তোমরা তো ভালোভাবেই জানো যে, ইনি আল্লাহ্র রসুল! এক প্রবীণ ইহুদী বললো, হ্যাঁ আমরা জানি ইনি আল্লাহ্র রসুল। হজরত ওমর বললেন, তাহলে তোমরা এঁর অনুসারী হচ্ছোনা কেনো? ইহুদী বললো, একারণেই আমরা তাঁর অনুসরণ করিনা– আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) নিয়ে আসেন কে? তিনি বলেছিলেন, হজরত জিব্রাইল। জিব্রাইল আমাদের শত্রু। কারণ, সে নিয়ে আসে প্রলয় ও ধ্বংস! হজরত ওমর বললেন, তবে কোন ফেরেশতার সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব? ইহুদী বললো, হজরত মিকাইলের সঙ্গে। কারণ, তিনি নিয়ে আসেন বৃষ্টি ও রহমত। হজরত ওমর আরো বলেছেন, পরে আমি একদিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্পাকের নিকট তাঁদের মর্যাদা কী ধরনের ? সে বললো, একজন দক্ষিণে এবং একজন বামে অবস্থানকারী।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন– রসুলপাক স. এরশাদ করেন, আসমানবাসীদের মধ্যে আমার দু'জন উযীর রয়েছেন। একজন হজরত জিব্রাইল, অন্যজন হজরত মিকাইল। আর আমার পৃথিবীবাসী উযীর দু'জন হচ্ছেন, আবুবকর ও ওমর। হজরত উম্মে সালমা থেকে হাসান পদ্ধতিতে তিবরানী বর্ণনা করেন- রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আসমানে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন–তাঁদের একজন কঠোরতার নির্দেশ দেন, অন্যজন নির্দেশ দেন নম্রতার। কঠোরতার নির্দেশ দানকারী ফেরেশতা হচ্ছেন, হজরত

জিব্‌রাইল এবং কোমলতার নির্দেশ দানকারী হচ্ছেন, হজরত মিকাইল। দু'জনই সত্যের নির্দেশক। নবীদের মধ্যেও এরকম দু'জন রয়েছেন যাঁদের একজন কঠোর, অন্যজন কোমল। সেই নবী দু'জন হচ্ছেন, রোষতপ্ত হজরত মুসা এবং বিনম্র হজরত নূহ্‌। দু'জনই সত্যাধিষ্ঠিত। আমার সাথীদ্বয়েরও একজন কঠোর, একজন কোমল। জালাল ওমর এবং জামাল আবুবকরও সত্যাধিষ্ঠিত।

হজরত ওমর পুনরায় বললেন, তাঁদের মর্যাদা ও নৈকট্য যদি এমন হয়, তবে জিব্‌রাইলের উচিত হবে না মিকাইলের সঙ্গে শত্রুতা করে। আবার মিকাইলেরও উচিত হবে না জিব্‌রাইলের শত্রু হওয়া। আবার জিব্‌রাইলের শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মিকাইলের জন্য হবে অনুচিত। এবং জিব্‌রাইলেরও উচিত হবেনা মিকাইলের শত্রুর মিত্র হওয়া। জিব্‌রাইলের দুশমন মিকাইলেরও দুশমন। একথা বলে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। এই ঘটনাটি রসুল পাক স. কে জানানোর উদ্দেশ্যে আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আজ যে আয়াত নাজিল হয়েছে তোমাকে কি তা জানাবো? একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

❒ বল, 'যে কেহ জিব্‌রাইলের শত্রু সে জানিয়া রাখুক সে তো আল্লাহের নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুর্‌আন পৌছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ';

❒ 'যে কেহ আল্লাহের, তাঁহার ফেরেশতাগণের, তাঁহার রসুলগণের এবং জিব্‌রাইল ও মিকাইলের শক্র সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শক্র।'

❒ এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি। সত্যত্যাগীগণ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

হজরত ওমর ফারুক বলেছেন– আমি আরজ করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি ইহুদীদের নিকট থেকে এইমাত্র এলাম। এর মধ্যে দেখছি এ বিষয়ে আয়াত নাজিল হয়েছে। আমি আপনাকে বলার পূর্বেই আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সব বলে দিয়েছেন। শা'বী পর্যন্ত হাদিসটির সনদ সহীহ্। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে শা'বীর সঙ্গে হজরত ওমরের সাক্ষাত ঘটেনি। হজরত ওমর থেকে সুদ্দীর মাধ্যমে ইবনে জারীরও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত ওমর থেকে কাতাদার মাধ্যমেও এরকম বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদ দু'টি কর্তিত। আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা থেকে অন্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, জনৈক ইহুদী হজরত ওমরের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, তোমাদের নবী যে জিব্‌রাইলের কথা বলেন, সে আমাদের শক্র। হজরত ওমর তখন পাঠ করলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতা মন্ডলীর, তাঁর রসুলগণের এবং জিব্‌রাইল ও মিকাইলের শক্র সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শক্র। (আয়াত ৯৮)।

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, এই বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায়– আয়াতখানি যেনো হজরত ওমরের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জারীর বলেছেন, ঐকমত্য এই যে, এই ঘটনাটি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। বোখারীর মাধ্যমে হজরত আনাসের উক্তি বর্ণিত হয়েছে এরকম– ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম একদিন তাঁর জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন রসুলুল্লাহ্ স. এদিকে এসেছেন। সংবাদ পেয়েই তিনি তাঁর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করবো, যার জবাব নবী ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে– ১.কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কী? ২. বেহেশতবাসীদের সর্বপ্রথম আহার্য বস্তু কী? ৩. সন্তান কখনো পিতার কখনো মাতার অবয়ব পায়– এর কারণ কী? রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করলেন, এইমাত্র ভ্রাতা জিব্‌রাইল আমাকে প্রশ্ন তিনটির জবাব জানিয়ে দিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, ইহুদীরাতো জিব্‌রাইলকে শক্র মনে করে। রসুল স. তৎক্ষণাৎ 'যে কেহ জিব্‌রাইলের শক্র সে জেনে রাখুক'– এই আয়াত পাঠ করলেন। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, একথাটি সুস্পষ্ট যে, রসুলপাক স. ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনার্থে এই আয়াত পাঠ করেছিলেন। কিন্তু এই আয়াত এই বিশেষ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর এই

মতটি নির্ভরযোগ্য। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ বিন জোবায়ের এবং তাঁর মাধ্যমে বাশির বিন শিহাব বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদী রসুলপাক স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনাকে পাঁচটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সেগুলোর জবাব দিতে পারেন তাহলে বুঝবো আপনি সত্য নবী। প্রশ্নগুলো হচ্ছে– ১. হজরত ইয়াকুব কোন বস্তুটি নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন? ২. নবীর আলামত কী? ৩. বজ্র ও বজ্রধ্বনির প্রকৃতি কী? ৪. রমণীরা কখনো পুত্র কখনো কন্যা প্রসব করে– কারণ কী? ৫. আপনার নিকট আসমানী সংবাদ বহন করে আনে কে? আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার সাথী কে? রসুলপাক স. সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিলেন। শেষে যখন বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার সাথী হজরত জিব্‌রাইল, তখন ইহুদী বলে উঠলো, সে তো যুদ্ধবিগ্রহ এবং শাস্তি নিয়ে আমাদের নিকট আবির্ভূত হতো! আপনি যদি রহমত, সজীবতা ও বৃষ্টিবাহী মিকাইলের কথা বলতেন তবে ভালো হতো।

সনদবিহীন অবস্থায় বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন সুরিয়া ইহুদী ছিলো প্রসিদ্ধ পন্ডিত। সে একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, আকাশ থেকে কোন ফেরেশতা আপনার নিকট আসে? তিনি স. এরশাদ করলেন, হজরত জিব্‌রাইল। ইহুদী বললো, জিব্‌রাইলের বদলে মিকাইল এলে আমরা আপনার উপর ইমান আনতাম। জিব্‌রাইল বার বার আমাদের সাথে দুশমনি করেছে। সে আমাদের নবীকে বলেছে, বাদশাহ্ বখতে নসরের মাধ্যমে বায়তুল মাকদিস ধ্বংস হবে। ধ্বংসের সময়কাল পর্যন্ত সে বলে দিয়েছিলো। সেই ধ্বংস প্রতিরোধের জন্য আমরা একটি উপায় নির্ধারণ করেছিলাম। বখতে নসর যখন বালক, তখন তাকে হত্যা করার জন্য আমরা একজনকে পাঠিয়েছিলাম। জিব্‌রাইল তখন বখতে নসরকে সাহায্য করেছিলো বলে আমাদের লোক তাকে হত্যা করতে পারেনি। সে আমাদের লোককে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলো। বখতে নসর বড় হয়ে যথাসময়ে বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে জিব্‌রাইলের প্রতি নির্দেশ ছিলো, সে আমাদের মধ্য থেকে নবী নির্বাচন করবে। কিন্তু সে নির্দেশ ভঙ্গ করে অন্য গোত্রে নবী নির্বাচন করেছে। আমি বলি, শানে নুজুল সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা দু'টি সম্ভবতঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘটেছিলো। ইহুদীর সঙ্গে হজরত ওমরের বাক্যালাপ এবং রসুল স. এর সঙ্গে তাদের কথোপকথন, দু'টো ঘটনাই সঠিক। ইবনে কাসীর এই দু'ই আয়াতে (৯৭,৯৮) এবং সুরা তাহ্রীমে উল্লেখিত জিব্‌রাইল শব্দটিকে জবর যুক্ত 'জীম', জের যুক্ত 'র' এবং 'হামজা' বিহীন অবস্থায় জাবরীল উচ্চারণ করতেন। আবু বকর পাঠ করতেন 'জীম' ও 'র' তে জবর এবং হামজাতে জের দিয়ে জাব্রাইল। হামজা এবং কাসায়ীও অনুরূপ পাঠ করেছেন। কিন্তু তাঁরা হামজার পরে 'ইয়া' উল্লেখ করেছেন– জাবরাঈল। অন্য

ক্বারীগণ পাঠ করেছেন জিব্‌রাইল (জীম এবং র তে জের দিয়ে এবং হামজা বাদে)।

'ফাইন্নাহু নাজ্জালাহু আলা ক্বলবিকা'— এখানে 'ফাইন্নাহু' শব্দের হু সর্বনামটি হজরত জিব্‌রাইলের সঙ্গে এবং 'নাজ্জালাহু' শব্দের হু সর্বনামটি কোরআন মজীদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কোরআন পৌছে দিয়েছে— একথায় বুঝা যায়, কোরআন অবতরণের প্রকৃত স্থান হচ্ছে রসুলপাক স. এর ক্বলব বা হৃদয়। তাই বলা হয়েছে, 'আলা ক্বলবিকা' (তোমার হৃদয়ে)।

'বিইজনিল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র নির্দেশে) – একথার অর্থ, আল্লাহ্‌র নির্দেশে হজরত জিব্‌রাইল কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ। এমতো ঘোষণার উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীদের সম্মুখে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট করে দেয়া। একথা বলা যে, যে হজরত জিব্‌রাইলের শত্রু সে ন্যায়নিষ্ঠার হন্তারক। হজরত জিব্‌রাইলকে অস্বীকার করার অর্থ, সকল আসমানী কিতাবের প্রতি অস্বীকৃতি। কেনোনা সকল আসমানী কিতাব হজরত জিব্‌রাইলের মাধ্যমেই অবতারিত হয়েছে। আর শেষ অবতারিত কিতাব আল কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থক।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে, হজরত জিব্‌রাইলকে যখন তারা শত্রু মনে করে, তখন তাদের উচিত, ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে মৃত্যুবরণ করা। এরকমও বক্তব্য হতে পারে যে, যেনো আল্লাহ্‌ জানিয়ে দিচ্ছেন, যে জিব্‌রাইলের শত্রু, সে আমারও শত্রু। কিংবা আমি তার শত্রু। ৯৮ নং আয়াতের শেষভাগে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু।

হজরত জিব্‌রাইল ও হজরত মিকাইল যদিও ফেরেশতা, তবুও তাঁদেরকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ফেরেশতামন্ডলীর মধ্যে তাঁদের বিশেষ সম্মান যেনো সুচিহ্নিত হয়। তাছাড়া ইহুদীদের আলোচনা ছিলো এ দু'জনকে ঘিরেই। একথাটিও এখানে পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, যে তাঁদের একজনের শত্রু, সে তাঁদের উভয়েরই শত্রু এবং সে আল্লাহ্‌রও শত্রু। হাফ্‌স্‌, ইয়াকুব এবং আবু আমর মিকাইল শব্দটিকে পড়েছেন, মিকাল (হামজা এবং ইয়া ব্যাতিরেকে)। নাফে পড়েছেন, হামজা সহ এবং ইয়া বিহীন অবস্থায়। অন্য ক্বারীগণ পড়েছেন, মিকাঈল (হামজা ও ইয়া সহযোগে)।

'ফাইন্নাল্লাহা আদুউল্লিল কাফিরিন' (আল্লাহ্‌ নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু) – একথায় বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের শত্রুতার মূল কারণ হচ্ছে কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান)। আর একথাটিও বুঝতে বাকি থাকেনা যে, ফেরেশতামন্ডলী এবং রসুলগণের সঙ্গে শত্রুতা রাখাও কুফরী।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ এবং ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন– ইবনে সুরিয়া ইহুদী রসুল পাক স. কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ এমন কিছু করছেন না কেনো, যাতে আমরা আপনার সঠিক পরিচয় পাই? একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো– এবং আমি নিশ্চয় তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। সত্যত্যাগীগণ (ফাসিক্বিন) ব্যতীত অন্য কেউই তা প্রত্যাখ্যান করেনা–যারা অবাধ্য এবং কুফরীতে অগ্রগামী, তাদেরকে বলা হয় ফাসেক। ইহুদীদেরকেই এই অপবিশেষণে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন– রসুলুল্লাহ্ স. মালিক বিন হানিফ ইহুদীকে একবার বললেন, দ্বীনে মোহাম্মদী সম্পর্কে তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, যখন ওই দ্বীন প্রকাশ পাবে, তখনই তোমরা তার অনুসরণকে স্বাগত জানাবে। একথা শুনে মালিক ইহুদী শপথ করে বললো, কখনোই এমন অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। তার অসত্য ভাষণের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হলো–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০০,১০১

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

❒ যখন আল্লাহের নিকট হইতে কোনো রসুল আসে যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার সমর্থক তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল কিতাবটিকে অগ্রাহ্য করে; যেনো তাহারা জানে না।

'আও আকুল্লামা' শব্দের প্রশ্নবোধক হামজাটি অস্বীকৃতিসূচক। আর 'আও' (এবং) একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে সংযোজিত। সেই উহ্য বাক্যটি এরকম- তারা কি নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে? এবং যখনই তারা অঙ্গীকার করে---।

আয়াতে উল্লেখিত 'তারা' অর্থ ইহুদীরা এবং অঙ্গীকার অর্থ সেই অঙ্গীকার যাতে বলা হয়েছিলো, শেষনবী যখন আবির্ভূত হবেন তখন আমরা তাঁর প্রতি ইমান আনবো। 'আও আকুল্লামা আহাদু' এই বাক্যাংশটিকে ক্বারী আবু রেজা আতারেদী পড়েছেন, 'আও আকুল্লামা উহিদু' (যখন অঙ্গীকার নেয়া হলো)। এই অঙ্গীকারের বিষয়টি অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এরকম 'ওয়া ইজ্ আখাজাল্লাহু মিসাক্বল্লাজিনা লাম্মা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন আও হিক্বমাতিন ছুম্মা জায়াকুমুরসুলুম মুসাদ্দিকুল্লিমা মায়াকুম লা তু'মিনুন্না বিহি লা তানসুরুন্নাহু।' মূল অঙ্গীকার ছিলো তাদের নবীদের সঙ্গে। সঙ্গত কারণেই নবীর উম্মতেরাও এই অঙ্গীকারের অঙ্গীভূত।

হজরত আতা বলেছেন, এখানে অঙ্গীকার বলতে ওই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে, যা রসুলেপাক স. এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো। ইহুদীরা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো যে, যুদ্ধকালে তারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে না। বনী কুরাইজা এবং বনী নাজির তাদের কৃত এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে এরকম– 'তাদের মধ্য থেকে যারা আপনার সাথে অঙ্গীকার করেছে, অতঃপর কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।' আরেক আয়াতে রয়েছে, তাদের একদল (অঙ্গীকার থেকে) পৃথক হয়ে গিয়েছিলো (ফারিকুমমিনহুম)।

তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না– একথার অর্থ, কোনো একটি বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের নিকট মামুলী ব্যাপার। তাদের অধিকাংশই তো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত কিতাব তওরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। সুতরাং যার বিশ্বাসই নেই, সে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপের ভয়াবহতা অনুধাবন করবে কিভাবে?

যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোনো রসুল আসেন– এখানে রসুল বলতে বুঝানো হয়েছে হজরত ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. কে। এঁদেরকে এবং এঁদের উপর অবতীর্ণ কিতাবকে অগ্রাহ্য করেছে ইহুদীরা। আর এঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে অগ্রাহ্য করার অর্থ তওরাতকেও অগ্রাহ্য করা। তওরাতের নির্দেশ যদি তারা মান্য করতো, তবে সকল নবী এবং সকল কিতাবকে মান্য করতো।

'যেনো তারা জানে না'– একথার অর্থ তাদের ভ্রুক্ষেপহীনতায় এ কথাটিই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে তারা কিতাব বলেই গণ্য করে না। তাদের সীমালজ্ঞনকে নির্দেশ করতেই এখানে উল্লেখিত হয়েছে, যেনো তারা জানেই না।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ
الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ
وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ
لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত। সুলাইমান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নাই, কিন্তু শয়তানগণই সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত– যাহা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিওনা'- ইহা না বলিয়া তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না। তাহারা তাহাদের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহের নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত!

'ওয়াত্তাবায়ু' অর্থ, এবং তারা অনুসরণ করলো। অর্থাৎ তারা যাদুবিদ্যার চর্চা শুরু করলো। একে অপরকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগলো। 'ওয়াত্তাবায়ু' বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'নাবাজা' (পশ্চাতে নিক্ষেপ করে বা অগ্রাহ্য করে) কথাটির সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে আয়াতের অর্থ হবে– তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) যাদুর অনুশীলন শুরু করলো। আমি বলি, ব্যাপারটি

এরকম নয়। কেনোনা 'নাবাজা' (অগ্রাহ্য করা) শব্দটি রসুলের আগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এভাবে 'ওয়াত্তাবায়ু' এর অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বরং পূর্ববর্তী আয়াতের 'ওয়া লাম্মা জায়াহুম' (আর যখন তাদের নিকট আসলেন তিনি) এর সঙ্গে 'ওয়াত্তাবায়ু' বাক্যটি সম্বন্ধিত হওয়াই সঙ্গত।

'মা তাত্‌লুশশায়াতিন' (শয়তানেরা যা আবৃত্তি করতো) – এখানে বাকভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান কালের কিন্তু ঘটনাটি অতীত কালের। আরবী ভাষাভাষীদের নিকট এরকম বাকভঙ্গির ব্যবহার সুপ্রচলিত। এখানে আয়াতের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে এই রীতিতেই। যদি বর্তমান কালের বাকভঙ্গিটি গ্রহণ করা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম– হজরত সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান যে বিদ্যার অনুসরণ করতো ইহুদীরা সেই বিদ্যারই অনুসরণ করে (করছে)। 'আলা মুলকি সুলাইমান' (সুলায়মানের রাজত্বকালে) – একথার একটি অর্থ, তারা সেই বিদ্যারই অনুসরণ করতো যার সম্পর্কে শয়তানের ধারণা, হজরত সুলায়মানের রাজত্ব ওই বিদ্যার বলেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এরকম অর্থ করলে পরবর্তী বাক্য (সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি) এর সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। 'আলা' অব্যয়টির অর্থ 'ফী' (মধ্যে) তে– এরকমও গ্রহণ করা যায়। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে 'আলা মুলকি সুলাইমান' বাক্যের অর্থ হবে– হজরত সুলায়মানের রাজত্বে (রাজত্বকালে)। এই পদ্ধতিটি সরল, যা অনুবাদে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাগবী থেকে বর্ণিত হয়েছে– সুদ্দী বলেছেন, অতীতে শয়তানেরা আকাশমার্গে আরোহণ করতো। এবং ফেরেশতামন্ডলীর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কীয় আলোচনা শুনতো। সেসমস্ত আলোচনার সঙ্গে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত করে তারা জ্যোতিষদেরকে জানাতো। জ্যোতিষেরা তা সাধারণ্যে প্রচার করতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেগুলোকে লিখে রাখতো। এভাবে বনী ইসরাইলদের মধ্যে এরকম অপবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে, জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ (গায়েব) জানে। হজরত সুলায়মান বিষয়টি অবগত হলে তাদের নিকট থেকে লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একত্রিত করে একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করেন এবং সেটি পুঁতে রাখেন তাঁর সিংহাসনের নিচে। এরপর হুকুম জারী করেন, জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে– একথা যেনো আর উচ্চারিত না হয়। যদি কেউ এরকম বলে তবে তার শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে।

হজরত সুলায়মান ইন্তেকাল করলেন। তাঁর সমসময়ের ইহুদী পন্ডিতেরাও মৃত্যুবরণ করলো। তাদের অনুসারীদের নিকট মানুষের আকারে শয়তান উপস্থিত হয়ে বললো, আমি তোমাদেরকে একটি গোপন ভান্ডারের সংবাদ বলে দিতে পারি, যা অধিকার করতে পারলে তোমরা সারা জীবন সুখে থাকবে। হজরত সুলায়মানের সিংহাসনের তলদেশ খনন করলে তোমরা ভান্ডারটি পেয়ে যাবে। লোকেরা সিংহাসনের নিচে খুঁড়তে শুরু করে দিলো। শয়তান দাঁড়িয়ে রইলো দূরে। সে সিংহাসনের নিকটবর্তী হতে পারতো না। নিকটবর্তী হওয়ার উদ্যোগ

নিলেই সিংহাসনের নিম্নদেশ থেকে চোখ ধাঁধাঁনো আলোকচ্ছটা বিকিরিত হতো যা সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিলো না। খনন শেষে লোকেরা দেখতে পেলো সেই সিন্দুকটি। শয়তান বললো, ওই সিন্দুকে যা রয়েছে, তার দ্বারাই হজরত সুলায়মান জ্বিন পরী পশুপাখি সবকিছুকে বশীভূত রাখতেন– একথা বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলো শয়তান। চতুর্দিকে একথা প্রচারিত হয়ে গেলো, হজরত সুলায়মান ছিলেন যাদুকর। ইহুদীরা যাদুর কাগজপত্রগুলো পেয়ে যাদুচর্চা শুরু করে দিলো। তাই পরবর্তী ইহুদীদের অধিকাংশই যাদুকর। শেষনবী মোহাম্মদ স. যখন আবির্ভূত হলেন, তখন আল্লাহ্পাক কোরআনপাকের মাধ্যমে হজরত সুলায়মানকে যাদুর অপবাদ থেকে নিষ্কলুষ ঘোষণা করলেন। বললেন, ওয়ামা কাফারা সুলাইমানু (সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি)।

আমি বলি, একথাটি স্পষ্ট যে, হজরত সুলায়মান যা পুঁতে রেখেছিলেন তা ছিলো যাদুর বই। শয়তান আকাশে ওঁৎ পেতে ফেরেশতাদের যে কথোপকথন শুনে এসে জ্যোতিষীদেরকে বলতো—সেগুলো যাদু ছিলো না। বহু বৎসর গত হওয়ার পর সেগুলোর কোনো কার্যকারিতাও অবশিষ্ট ছিলো না। কালাবী বলেছেন, শয়তান যাদু, তেলেসমাতির বইগুলো আসফ বিন বরখিয়ার ভাষায় লিপিবদ্ধ করে হজরত সুলায়মানের জায়নামাজের নিচে পুঁতে রেখেছিলো। হজরত সুলায়মান সে সম্পর্কে জানতেনই না। তাঁর ইন্তেকালের পর শয়তান বইগুলো বের করে মানুষকে বললো, দেখো! সুলায়মান এগুলোর মাধ্যমে তোমাদেরকে বশীভূত করে রাখতো। মানুষের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ ও সৎকর্মশীল, তাঁরা বলে উঠলেন, তওবা-তওবা। হজরত সুলায়মান কিছুতেই এরকম ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শয়তানের প্রতারণায় মুগ্ধ হলো। তারা যাদুর বই গুলোকেই জ্ঞানবিদ্যার ভান্ডার বলে মনে করলো এবং তার ব্যাপক চর্চা শুরু করে দিলো। ছুঁড়ে ফেলে দিলো নবীরসুলগণের আনীত আসমানী কিতাব। তারা বিশ্বাস করতো, হজরত সুলায়মান ছিলেন প্রসিদ্ধ যাদুকর। তাদের অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধেই এই আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে, সুলায়মান সত্যপ্রত্যাখ্যান (কুফরী) করে নাই। সেহের বা যাদুকে এই আয়াতে কুফরী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে যাদু প্রকৃতপক্ষে কুফরী। আর হজরত সুলায়মান সহ সকল নবীগণই কুফরী থেকে পবিত্র। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, কিন্তু শয়তানেরাই সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো (ওয়ালাকিন্নাশ শায়াতিনা কাফারু)। ক্বারী ইবনে আমর, হামজা এবং কাসায়ী 'লা কিন্না' শব্দটি তাশদীদবিহীন অবস্থায় এবং 'শায়াতিন' শব্দের নুন বর্ণে পেশ সহযোগে পাঠ করেছেন। অন্য ক্বারীগণ লাকিন্না এর নুন তাশদীদযুক্ত অবস্থায় এবং শায়াতিন শব্দের নুন হরফে জবর দিয়ে পাঠ করেছেন।

যাদু (সেহের) এমন একটি চর্চিত বিদ্যা যা মানুষকে শয়তানের নিকটবর্তী করে। শয়তান যাদুকরদের বশীভূত হয় এবং তাদেরকে সাহায্য করে। যাদু মানুষের মনে ও শরীরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়,

এমনকি মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। যাদুপ্রভাবিত ব্যক্তি চলে যায় জ্বিনের আওতায়। তার দৃষ্টি ও শ্রুতি হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, বিকৃত, অসংলগ্ন। যেমন ফেরাউনের যাদুকরেরা ফেরাউন ও উপস্থিত সকল দর্শককে লাঠি ও রশিকেই সর্পরূপে দেখিয়েছিলো। যাদু হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহ্পাকের একটি পরীক্ষা।

বাগবী বলেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, যাদুচর্চা কুফরী। তাই নিষিদ্ধ। শায়েখ আবুল মনসুর বলেছেন, এরকম বলা ঠিক নয় যে, যাদুই মূলতঃ কুফরী। আগে দেখতে হবে যাদুর ধরণ ধারণ কী। যদি তাতে শরিয়তবিগর্হিত বিষয় থেকে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে কুফরী; অন্যথায় নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যাদু একটি বিস্ময়কর ব্যাপার– যার প্রভাবে বাস্তব কল্পনায় এবং কল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়। সুস্থ লোক হয়ে পড়ে অসুস্থ। হত্যাকান্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয় যাদুর প্রভাবে এবং তখন কেসাসও (খুনের বদলে খুন) অবধারিত হয়ে পড়ে। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, কিছু কিছু যাদু কুফরী এবং কিছু কিছু যাদু কুফরী নয়। মাদারেক গ্রন্থে রয়েছে, যে যাদু কুফরী তা শিক্ষা করাও কুফরী। যারা এরকম শিক্ষা করবে— হানাফী মাজহাবের মতানুসারে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। যাদুর অনুরাগী যারা তাদের উপর হত্যার বিধান বলবৎ করা যাবে না। বরং তার উপর প্রযোজ্য হবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগীদের) বিধান। যে যাদু মূলতঃ কুফর নয় কিন্তু মানুষের জন্য ক্ষতিকর, সেই যাদুর চর্চায় নিয়োজিত নারী পুরুষের উপর প্রয়োগ করতে হবে রাহাজানির বিধান। যাদুকর তওবা করলে তার তওবা গৃহীত হবে- সে যাদু কুফরী অথবা অকুফরী যাই হোক না কেনো। যারা বিধান দিয়েছেন, যাদুকরের তওবা গৃহীত হবে না—তারা ভুল বলেছেন। কারণ, কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, ফেরাউনের যাদুকরেরা তওবা করে হজরত মুসার একনিষ্ঠ অনুসারী হয়েছিলেন।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক যাদুকে সম্পূর্ণতই কুফরী বলেছেন। এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এসেছে, অবশ্যই তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি যাদু ক্রয় করেছে তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই—সুতরাং একথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, যাদু যে প্রকারেরই হোকনা কেনো তা ইমানের শর্ত বিরোধী। কাজেই যাদু অবিশ্বাস বা কুফর। কুফর ছাড়া শয়তান সন্তুষ্ট হয় না। সন্তুষ্ট না হলে কারো বশীভূতও হয় না। আর শয়তানের প্রভাব ব্যতিরেকে যাদুও কার্যকর হয় না। তাই কিছু যাদু কুফরী, কিছু কুফরী নয় (ইমাম শাফেয়ী এবং আবুল মনসুর যেমন বলেছেন) — এরকম ধারণা সঠিক নয়। তাঁরা হয়তো মনে করেছেন, এরকম যাদু হওয়াও সম্ভব যার শব্দাবলী এবং কর্মকান্ড অবিশ্বাসবিমুক্ত।

জ্ঞাতব্যঃ তন্ত্রমন্ত্র বা ইসমে আজম দ্বারা যদি কেউ কোনো লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, কিংবা দৈহিক অথবা আর্থিক ক্ষতিসাধন করে, সে কাফের না হলেও অবশ্যই ফাসেক। তার উপর রাহাজানির (ছিনতাইকারীর) শাস্তি

কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান নর-নারীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয় সে অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, যার হাত ও রসনা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে, সেই প্রকৃত মুসলমান। বালাম ইবনে বাউর হজরত মুসা আ. এর বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলো। সে তার হাত ও জিহবাকে ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত করেছিলো। বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে সে মুসলমান বলে গণ্য নয়। সুরা আরাফে তার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

যাদুর দৃষ্টান্ত হিসেবে এর পর হারুত ও মারুত নামক ফেরেশতা দ্বয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গান্তর হয়তোবা যাদু বিষয়ক এই আলোচনারই ধারাবাহিকতা অথবা অন্য এক ধরনের অধিকতর শক্তিশালী যাদুর দৃষ্টান্ত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাবেল শহরটি কুফায় অবস্থিত। কেউ কেউ বলেছেন, দেমাউন্দ পাহাড়কে বাবেল বলে। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য আসমানী এলেমের মতো যাদুও আসমানী এলেম। যা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্পাক যেমন হেদায়েতকারী, তেমন গোমরাহ্কারীও। কেউ হয়তো এরকম প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আল্লাহ্পাক যাদু নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে তিনি যাদু অবতীর্ণ করবেন কেনো? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ্র অবতীর্ণ সকল বিষয় শরিয়তের বৈধতার আওতায় নয়। শরিয়তের বিধানই পালনীয়। আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্পাক দুই ফেরেশতার মাধ্যমে যাদুবিষয়ক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তাদের একজন ছিলো হতভাগ্য আর অন্যজন ছিলো সৌভাগ্যবান। যে হতভাগ্য সে যাদু শিক্ষা করেছে এবং আল্লাহ্পাকের সঙ্গে কুফরী করেছে। আর যে সৌভাগ্যবান সে যাদু থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে এবং ইমানের প্রতি অটল থেকেছে। আবার দুজনে একথাও প্রচার করেছে যে, যাদু নিষিদ্ধ এবং যাদু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছে দু'জনই।

'অমা উনজিলা' বাক্যের মা শব্দটি না সূচক। একথার মাধ্যমে ইহুদীদের বাক্য,যাদুবিদ্যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে— এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্পাক ফেরেশতাদের প্রতি যাদু অবতীর্ণ করেননি। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'মা উনজিলা' কথাটি 'মা কাফারা সুলাইমান' (সুলায়মান সত্যপ্রত্যাখ্যান করেনি) এর সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। আর 'বি বাবিলা' (বাবেল শহরে) কথাটি সম্বন্ধিত হবে 'ইউআল্লিমুনান্নাস' (তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতো) এর সঙ্গে।

বাবেল শহরের লোকেরা হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করতো। ফেরেশতাদ্বয় তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতো। বলতো তোমরা যাদু শিখো না, শিখলে কাফের হয়ে যাবে। কারণ যাদু কুফরী অথবা যাদুর পরিণতি কুফরী। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ফেরেশতাদ্বয়

যাদু শিক্ষার্থীদেরকে সদুপদেশ দিতো। আতা এবং সুদ্দী বলেছেন, যে সকল লোক তাঁদের সদুপদেশ মানতো না, ফেরেশতারা তাদেরকে বলতো, ঠিক আছে যাও। অমুক স্থানে বালুর উপরে প্রস্রাব করে দাও। নির্দেশমতো তারা সেখানে প্রস্রাব করতো, সাথে সাথে একটি উজ্জ্বল আভা সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেতো। এই আলোকচ্ছটাই ইমান ও মারেফাত। এ আলো আকাশে উঠে যাওয়ার পর একটি ধুম্রাচ্ছন্ন কৃষ্ণ বস্তু অবতরণ করতো সেখানে। তারপর ওই বস্তুটি সেই ব্যক্তির কর্নবিবরের মধ্য দিয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতো। ওই কৃষ্ণ বস্তুটি ছিলো আল্লাহ্‌র গজব ও কুফরী। আমরা আল্লাহ্‌পাকের আশ্রয়প্রার্থী। আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা এরকমও হতে পারে যে, ফেরেশতাদ্বয় ওই সব শিক্ষার্থীদেরকে বলতো আমরা তো পরীক্ষায় অবতীর্ণ। কাজেই তোমরা আমাদের মতো হয়ো না। যারা এ সদুপদেশ শুনতো না তাদেরকেই যাদু শিক্ষা দিতো ফেরেশতাদ্বয়। আমি বলি, পরের ব্যাখ্যাটি যুক্তিসম্মত নয়। কারণ শয়তান কখনও সদুপদেশ দেয় না।

লোকেরা হারুত ও মারুতের মাধ্যমে এমন যাদু শিক্ষা করতো যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হতো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত কোনো কার্যই সংঘঠিত হয় না। একথাটিই স্বতঃসিদ্ধ। যাদু ক্রিয়ার ব্যাপারটাও তাই। সে কথাটিই এখানে এভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারতো না। আল্লাহ্‌পাকই স্রষ্টা—ভালোমন্দ সকল বস্তুর এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার। তাঁর অভিপ্রায় ও শক্তির আনুকুল্য না পেলে কোনো কারণ, নীতি কিংবা প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। কার্যকারণ নীতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান। এই বিধান বাস্তবায়ন হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় ও নির্দেশের প্রতি নির্ভরশীল।

তারা যা শিক্ষা করতো তা তাদের ক্ষতি সাধন করতো এবং কোনো উপকারে আসতো না- একথার মাধ্যমে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে সকল বিদ্যা উপকারী নয় সে সকল বিদ্যা শিক্ষা করা মাকরুহ্। একারণেই রসুল পাক স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ! আমি উপকারশূণ্য জ্ঞান থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।

জ্ঞাতব্যঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র অথবা দর্শন যে বিদ্যাই হোক না কেনো উপকারবিহীন হলে তা অর্জনীয় হতে পারে না। যে বিদ্যা ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে ইসলামের বিশ্বাস ও বিধানের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়, সে সকল বিদ্যা হারাম। তবে ইসলামী চিন্তা ও ইসলামের বিধান প্রবিধানের সমর্থক, সহায়তাকারী হিসাবে যে সকল বিদ্যা রয়েছে সেগুলো শিক্ষা করা মোস্তাহাব। বরং কখনো কখনো ওয়াজিব। যে কোনো শিক্ষা হোকনা কেনো তার বৈধাবৈধতা নির্ভর করবে উদ্দেশ্য ও পরিণতির উপর। দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিও দৃঢ়নিবদ্ধ নয়। দর্শনচর্চাকে যতো গভীরই মনে করা হোকনা কেনো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অন্ধকারে ঢিল

ছোঁড়ার মতোই অনুপকারী ও অনিশ্চিত এবং কখনো কখনো ক্ষতিকারক। তবে ইসলাম অস্বীকারকারীদেরকে প্রতিহত করার উদ্দশ্যে কেউ যদি অনৈসলামিক দর্শন শিক্ষা করে তবে তা মাকরুহ হবে না, বরং বিষয়টি তখন হবে প্রশংসনীয়। একারণেই ইসলামী দার্শনিকগণ, গ্রীক দর্শন ও প্রাচ্যদর্শন শিক্ষা করেছিলেন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে তার চিন্তা, আচরণ ও গতিবিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা অপরিহার্য।

উপকারশূন্য জ্ঞান দুই প্রকার ১. প্রকৃতিতত্ত্ব বা এ ধরনের কোনো জ্ঞান নিছক কৌতুহল নিবারণ ছাড়া যার অন্য কোনো উপকার নেই। ২. ওই জ্ঞান যা আমল না করলে নিরর্থক বলে গণ্য হয়। আল্লাহ্‌পাক সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে যাদুমন্ত্র, নাস্তিক্য দর্শন এ সকল বিদ্যা যে সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহ নেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী এবং হজরত কাতাদা থেকে কালাবী হারুত ও মারুত ফেরেশ্‌তাদ্বয় সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন এরকম— পৃথিবীবাসীদের রাশি রাশি পাপ আকাশে উত্থিত হচ্ছিলো। ফেরেশ্‌তারা সেসব দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হতো। বলতো, মানুষ কতো অবাধ্য! কী অবলীলায় তারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অবাধ্যতা প্রদর্শন করে চলেছে। আল্লাহ্‌পাক তখন বললেন, তোমরা যদি মানুষরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করতে তবে তোমরাও গড়ে তুলতে পাপের পাহাড়। ফেরেশ্‌তারা বললো, ইয়া এলাহী, তুমি মহান, তুমি পবিত্র। তোমার বিরুদ্ধাচরণ প্রদর্শন করতে আমরা অসমর্থ। আল্লাহ্ বললেন, তোমরা যাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম মনে করো, তাদেরকে নির্বাচন করো। ফেরেশ্‌তারা নির্বাচন করলেন হজরত হারুত, মারুত এবং আজরাঈলকে। আল্লাহ্‌পাক তাদের সত্ত্বাভ্যন্তরে জ্বালিয়ে দিলেন কামতাড়নার অগ্নি। তারপর নির্দেশ দিলেন, পৃথিবীতে বসবাস শুরু করো। মানুষের সমস্যাবলী সমাধানে দায়িত্বনিষ্ঠ হও। মনে রেখো অংশীবাদীতা, অবৈধ শোণিতপাত, ব্যভিচার এবং মদ্যপান তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। নির্দেশিত ফেরেশ্‌তাত্রয় নেমে এলেন পৃথিবীতে। যথাকর্তব্য সম্পাদনে মনোযোগী হলেন তাঁরা।

হজরত আজরাঈল একদিন অনুভব করলেন তাঁর দেহাভ্যন্তর দগ্ধীভূত হচ্ছে কামাগ্নির উত্তাপে। তিনি তৎক্ষণাৎ তওবা করলেন আল্লাহ্‌পাকের দরবারে। ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি দয়া করে আমাকে আকাশে উঠিয়ে নাও। আল্লাহ্‌পাক তার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। হজরত আজরাঈল কামদহনের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশটি বছর সেজদাবনত হয়ে রইলেন। এখন পর্যন্ত তিনি অনুতাপ জর্জরিত এবং নতশির।

হারুত ও মারুত সারাদিন মানুষের প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। রাতে চলে যেতেন আকাশে। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিলো। এক মাস যেতে না যেতেই বিপদগ্রস্থ হয়ে গেলো তারা। পড়ে গেলো আল্লাহ্ পাকের মহা পরীক্ষায়।

একদিন জোহরা নাম্নী এক রূপসী রমণী তাদের নিকট এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। পারস্য অধিবাসী জোহরার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলো হারুত ও মারুত। তার রূপাগ্নিতে আত্মাহুতি দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো তারা। কিন্তু জোহরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, তোমরা প্রতিমা পূজা, মদ্যপান এবং আমার স্বামীকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমাকে পাবে না। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তখন উন্মত্ত। তারা মদ্যপান, বিগ্রহবন্দনা, হত্যা, সবই করলো। তারপর লিপ্ত হলো ব্যভিচারে। আল্লাহ্‌পাক ব্যভিচারিনী জোহরাকে উল্কাপিন্ডে রূপান্তরিত করে দিলেন। হারুত ও মারুত দিনান্তে আকাশের দিকে উড়াল দিতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। স্বভয়ে দেখলো তারা উড্ডয়ন ক্ষমতারহিত। তখন পৃথিবীতে ছিলেন হজরত ইদ্রিস আ.। হারুত মারুত তাঁর সুপারিশ প্রার্থী হলো। আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ ঘোষিত হলো—শাস্তি অবধারিত, তবে এতোটুকু তোমাদের নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে যে, শাস্তি ভোগ করবে কোথায়? পৃথিবীতে না পরবর্তী পৃথিবীতে। হারুত মারুত পৃথিবীর শাস্তিকেই মেনে নিলো। কারণ, এ শাস্তি একদিন শেষ হবে। কিন্তু আখেরাতের শাস্তি অনিঃশেষ। হারুত মারুতের শাস্তি এখনো চলছে। বাবেল শহরের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত একটি কুপে তারা ঝুলন্ত অবস্থায় আগুনের আযাব ভোগ করে চলেছে।

হজরত আলী থেকে ইবনে রওয়াহা ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাক জোহরার প্রতি অভিশম্পাত অবতীর্ণ করেছিলেন। তাই সে ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে পরীক্ষায় ফেলেছিলো। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

আমি বলি, এ বিবরণটি খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনা)। কোরআন পাকে এর সমর্থনসূচক ইঙ্গিত নেই। আর এসম্পর্কে যখন কিছু অসংলগ্ন বিবরণও রয়েছে তখন সুস্থ বিবেক সেগুলোকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করে না। যেমন রবিয়া বিন আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক জোহরাকে নক্ষত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন, সে ইসমে আজম শিক্ষা করতো এবং আকাশে উড়তে পারতো। ওদিকে আবার হারুত মারুত ইসমে আজম জানা সত্ত্বেও জোহরার শিক্ষক হয়েও নেমে এসেছিলো জোহরার সমান্তরালে। আবার এমনও বলা হয়েছে, জোহরা আকাশে উড়তে পারতো অথচ ফেরেশ্‌তাগণ হয়ে পড়লো উড্ডয়নক্ষমতারহিত ইত্যাদি।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী, তার 'সাবীলুল রাশাদ্' গ্রন্থে শেখ কামাল উদ্দীনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন, আলেমগন ঘটনাটিকে বিশুদ্ধ মনে করেন না। ওদিকে আবার তাঁরা হজরত আলী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনাকেও সঠিক মনে করেন। শেখ কামাল উদ্দীন আরও বলেছেন, এ বিষয়ের সকল বর্ণনাগুলোই স্বকপোলকল্পিত বলেই মনে হয়। রসুলপাক স. এর বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ কোনো হাদিসের সঙ্গেই এগুলোর সম্পর্ক নেই। বরং তিনি স. এরশাদ

করেছেন, এগুলো ইহুদীদের কল্পিত কাহিনী মাত্র। এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে কেবল তাদেরই পুস্তকে। সালেহী বলেছেন, ঘটনাটি যখন ভিত্তিহীন, তখন আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু হেরফের ঘটবে। আর তা ঘটেছেও। তাই আলেমগণ এর বিশদ ব্যাখ্যার সূত্রে বলেছেন, যখন মোজেজা, কারামত ও যাদুর মধ্যে পার্থক্যরেখা নির্ণয় করার ব্যাপারটি দুরূহ হয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্পাক মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন—যেনো তারা মানুষকে প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করায়; যার ফলে যাদু, কারামত ও মোজেজার পার্থক্য রেখা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। যারা যাদু, মোজেজা ও কারামতের পার্থক্য নির্ণয়ার্থে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে অবহিত হতে চাইতো, তারাই হতো আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয়। আর যাদের উদ্দেশ্য ছিলো এর বিপরীত, তারা পতিত হয়েছিলো কুফরীতে। ফেরেশ্তাদ্বয় অপরিণামদর্শীতার বিষয়ে তাই প্রথমেই এভাবে সচেতন করে দিতেন যে, 'ইন্নামা নাহ্নু ফিত্নাতুন' (আমরা পরীক্ষা স্বরূপ)। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) কোরো না। তারা আরও বলতেন, যাদুকর অমুক কর্ম করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশ্তারা সর্বাবস্থায় আনুগত্যশীল। ফেরেশ্তাগণ যে নিষ্পাপ সে কথাও এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। বায়যাবী বলেছেন, জোহরা সম্পর্কে কিংবদন্তীটি ইহুদী সম্প্রদায়ের একটি কল্পকাহিনী। এই ইসরাইলী বিবরণটি হয়তো সলফে সালেহীনের জামানায় অনুপ্রবেশ করে থাকবে।

আমি বলি, 'মালাকাইনি' (ফেরেশ্তাদ্বয়) এর প্রকৃত অর্থ রূহ্ এবং কল্ব সহ আধ্যাত্মিক জগতের অন্যান্য লতিফা সমূহ। এখানে সেগুলোর মধ্যে মাত্র দু'টির উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সংখ্যা বর্ণনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের (সালেকগণের) নিকট এ দু'টি লতিফাই অধিক অনুধাবণীয়। এ অধিক অনুধাবনীয় লতিফা দু'টিকেই আত্মিক জগতের প্রতীক হিসেবে এ পথের পথিকরা গ্রহণ করবে। এভাবে জোহরা নাম্নী রমণীকে চিহ্নিত করতে হবে নফস্ হিসেবে, যা ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে সৃজিত। নারী যেভাবে ফেরেশ্তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, ঠিক তেমনি নফসে আম্মারাও অসৎ কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে, পদস্খলন ঘটায়। আল্লাহ্পাক অনুপম প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মিকজগতের লতিফা সমূহকে নফ্সের সাথে মিলিত করে দিয়েছেন। দিয়েছেন পরস্পরের প্রতি প্রেম ও আসক্তি। তাই নফ্সের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় লতিফাগুলো তমসাবৃত হয়েছে। বিস্মৃতি প্রবল হয়েছে। ছিন্ন হয়েছে আল্লাহ্পাকের স্মরণের সূত্র। প্রজ্বলিত হয়েছে কামনা, বাসনার লেলিহান শিখা। এই অগ্নিকুন্ডকেই মনে করতে হবে বাবেলের সেই অগ্নিকূপ। এরপর মৃত্যু। মৃত্যুর পর কিয়ামত। তখন যদি তার মধ্যে সামান্য ইমানের নূরও থাকে, তবে অন্ধকারের বন্দীদশা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর তার নফ্স যদি পৃথিবীতেই

পরিচ্ছন্নতা লাভ করে, তবে তা লতিফা সমূহের নূরে রঞ্জিত থাকবে। কৃচ্ছসাধন ও ইসমে আজমের বদৌলতে অন্তিম সময়ে সে এমনভাবে আকাশে উড়াল দেবে যেনো মনে হবে একটি আলোকোজ্জ্বল শুভ্র তারকা অনন্তে উধাও হয়ে গেলো। তখন তাকে লক্ষ্য করে এ সম্বোধনটি বিঘোষিত হবে, 'ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না তুরজিই ইলা রব্বিকি রদ্বিয়াতাম্মারদিয়্যা ফাদ্বখুলি ফী ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি' (হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি, পারস্পরিক প্রসন্নতার প্রেক্ষিতে তোমার প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হও এবং আমার বিশেষ বান্দাদের পর্যায়ভূত হয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করো)। নফসের প্রাথামিক পর্যায়টি ছিলো অপরিচ্ছন্ন। সেই প্রবৃত্তি আধ্যাত্মিকতার রঞ্জনস্পর্শে লাভ করে পবিত্রতার উত্থান। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, মূর্খতা বা কুফরীতে যে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম গ্রহণের পরে সেই শ্রেষ্ঠ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইহুদীরা যদি জানতো! কতো নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে।' আগের বাক্যটিতে বলা হয়েছে, 'আর তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, যে কেউ তা ক্রয় করে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই।' পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'যদি তারা জানতো?' প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে এরকম পরস্পরবিরোধী বাক্য ব্যবহৃত হলো কেনো? এর জবাবে কেউ কেউ বলেছেন, তারা আমল করতো নিজ জ্ঞানানুসারে। ওই জ্ঞান ছিলো তাদের স্বভাবজ বুদ্ধি নির্ভর। আর যেটা তারা জানেনা সেটা হচ্ছে, আখেরাতের প্রকৃত বাস্তবতা। আমার জবাবটি এরকম— জ্ঞান দু'রকম— ১. অস্থিরতাতাড়িত জ্ঞান, অন্তরের বহিরাবরনের সঙ্গে যা সম্পর্কিত থাকে। এরকম জ্ঞান বাস্তবে বা বিশ্বাসে পরিণত হয় না। যেমন, ইহুদীরা রসুল পাক স. কে আপন সন্তানাপেক্ষা অধিক জানতো। অথচ ছিলো আনুগত্যবিমুখ। ব্যাপারটা যেনো পৃষ্ঠদেশে জ্ঞানভান্ডারবাহী গর্দভ। ২. যে জ্ঞানের অবস্থান অন্তরের অন্তস্থলে—এই জ্ঞান অন্তরকে তমসাবিমুক্ত করে, অন্তরকে ভরে তোলে আলোকিত প্রশান্তিতে। আল্লাহ্র কালামে এসম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, 'তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।' আয়াতের শেষ বাক্যে এই জ্ঞানকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে 'যদি তারা জানতো!' মহানবী মোহাম্মদ স. বলেছেন, আলেম সম্প্রদায় নবীকূলের উত্তরাধিকারী। তাঁরা নভোবাসীদের সুহৃদ। জীবনাবসানের পর কিয়ামত পর্যন্ত জলধির মৎস্যকূলও তাঁদের জন্য প্রার্থনারত থাকে। বর্ণিত দুই প্রকার জ্ঞানের অধিকারীদেরকে রসুলপাক স. চিহ্নিত করেছেন এভাবে— সৎ আলেমগণ আল্লাহ্পাকের উত্তম বান্দা। আর অসৎ আলেমরা তাঁর নিকৃষ্ট দাস। হজরত হাসান বসরী বলেছেন, এলেম (জ্ঞান) দু'ধরণের। এক ধরণের জ্ঞান থাকে অন্তরে। এজ্ঞানই কল্যাণবাহী। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান হচ্ছে মৌখিক (জবানী) জ্ঞান। এজ্ঞান মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ্পাকের দলিল। হাদিস দু'টি আহওয়াজ বিন হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন দারেমী।

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

❐ যদি তাহারা বিশ্বাস করিত ও সাবধান হইয়া চলিত তবে নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিফল আল্লাহের নিকট অধিক কল্যাণকর হইত, যদি তাহারা জানিত!

যদি তারা বিশ্বাস করতো ও সাবধান হয়ে চলতো— একথার অর্থ যদি তারা রসুলপাক স.এর প্রতি ইমান আনতো এবং অবাধ্যতা ও যাদু পরিত্যাগ করতো। এরকম করলে তারা লাভ করতো তাদের উত্তম কর্মের বিনিময় বা সওয়াব। আয়াতে উল্লেখিত 'মাসুবা' শব্দটির অর্থ প্রত্যাবর্তন। সৎকর্মপরায়ণেরা সৎকর্মের বিনিময়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। তাই ওই বিনিময়কে সওয়াব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

তবে নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিফল আল্লাহ্‌র নিকট অধিক কল্যাণকর হতো— একথার অর্থ আত্মাকে বিক্রয় করে যে যাদু বা কুফ্‌রীকে তারা ক্রয় করেছে, তার চেয়ে বিশ্বাস এবং সাবধানতা (ইমান ও তাকওয়া) অধিক কল্যাণকর। আল্লাহ্‌পাকই কল্যাণদাতা। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'মিন ইনদিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণ)। কল্যাণের নিরঙ্কুশতা প্রকাশের জন্যই এখানে কল্যাণবিরোধী বস্তু বা যাদুর কথা উল্লেখ করা হয়নি। যাদুর বিপরীতার্থক রূপে নয়, ইমান ও তাকওয়ার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য।

শেষে বলা হয়েছে, 'লাও কানু ইয়া'লামুন' (যদি তারা জানতো)। একথার অর্থ, যদি তাদের এই জ্ঞান থাকতো যে, আল্লাহ্‌পাকের দেয়া পুণ্যফলই সর্বোৎকৃষ্ট, তবে তারা ইমান গ্রহণ করতো। সাবধানতা অবলম্বন করতো।

ইবনে মুনজির বলেছেন, রয়েনা অর্থ, মনোযোগ আকর্ষণ করা। সাহাবায়ে কেরাম এই শব্দটির মাধ্যমে রসুলপাক স. এর মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। 'রয়েনা' বলে তারা বুঝাতে চাইতেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন। অথবা আমাদের আবেদন দয়া করে গ্রহণ করুন। কিংবা আপনি আমাদের শিক্ষা ও সংশোধনের নিমিত্তে যা আজ্ঞা করেছেন, তা অধিকতর সহজবোধ্য করে দিন। বা বিষয়টি আমাদেরকে বুঝবার অবকাশ দিন।

আরবী অভিধানানুসারে 'রয়ি' শব্দের অর্থ, অন্যের কল্যাণ রক্ষণাবেক্ষণ করা। অপর পক্ষে ইহুদীদের ভাষায় রয়েনা একটি জঘন্য গালি। তাদের কাছে শব্দটির প্রকৃত অর্থ, 'ইসমা লিমা লা সামিয়তা'। অর্থাৎ শোনো—আল্লাহ্ করুন তুমি শুনতে না পাও (অর্থাৎ তোমার শ্রুতি অকার্যকর হোক)। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি সম্ভবত 'রওয়ানাত' থেকে এসেছে। যার অর্থ, নির্বোধ। ইহুদীরা যখন শুনলো মুসলমানেরা রসুলপাক স. এর উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তারা

একটি সুযোগ পেয়ে গেলো। তারাও তখন কদর্থে রসুলপাক স. এর প্রতি শব্দটি প্রয়োগ করতে শুরু করলো। এই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতো (তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশম্পাত)। একবার হজরত সা'দ বিন মুআজ তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যের বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি তখন ইহুদীদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, আর যদি কখনো রসুলপাক স. এর উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এই শব্দটি প্রয়োগ করতে শুনি, তবে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো। তারা বললো, তোমরা যে বলো! এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উন্‌জুরনা' বলিও, ও শুনিয়া রাখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

আল্লাহ্‌পাক ইমানদারদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা এখন থেকে 'রয়েনা' বোলো না, বোলো 'উন্‌জুরনা'। উন্‌জুরনা অর্থ, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দয়া করে আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন অথবা একটু অপেক্ষা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষণিক অবকাশ দিন, যেনো আমরা আপনার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। 'ওয়াসমায়ু' অর্থ শুনে রাখো। অর্থাৎ রসুলপাক স. এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যে নির্দেশ জারী করা হয়, তা শ্রবণ করো ও অনুগত হও। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, তাঁর স. পবিত্র সংসর্গে উপবেশন করে এমনভাবে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করো যেনো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার প্রয়োজন অবশিষ্ট না থাকে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়ালিল কাফিরিনা আজাবুন আলীম' (সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি) এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে বিশেষভাবে ওই সকল ইহুদীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যারা রসুলপাক স. কে অপসম্বোধন করতো।

ইহুদীদের একদল ছিলো মুসলমানদের মিত্র। তারা মুসলমানদেরকে বলতো, তোমরা মহানবী স. এর প্রতি আস্থাশীল হও। তোমাদের মঙ্গল হবে। প্রত্যুত্তরে মুসলমানেরা বলতো, তবে তোমরা অনাস্থা স্থাপন করে বসে আছো কেনো?

ইহুদীরা বলতো, তোমাদের ধর্ম যদি আমাদের ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতো, তবে অবশ্যই আমরা তা মেনে নিতাম। তাদের ভুল ধারণার অপনোদনার্থে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০৫

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

❒ কিতাবীদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা এবং অংশীবাদিগণ ইহা চাহে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক। অথচ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

নন্দিত অভিলাষ প্রকাশার্থে আরবীতে 'ওয়াদ্দু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আয়াতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের মধ্যে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী তারা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। এখানে খইর (কল্যাণ) শব্দের মর্ম হবে ওহী (প্রত্যাদেশ)। এভাবে আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে, হে বিশ্বাসীরা! কাফের ও মুশরিকেরা তোমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। আর তারা এটাও চায়না যে তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হোক।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা আপন অনুকম্পার জন্যে বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। এখানে রহমত (অনুকম্পা) শব্দটির মর্ম হবে নবুয়ত। এই নবুয়ত আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাঁকেই দান করে থাকেন। এই বিশেষ দানকে এখানে 'ফজল' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ওই অনুগ্রহ বা দানের নাম 'ফজল' যা বিনা কারণে প্রদান করা হয়।

অংশীবাদীরা বলতো, মোহাম্মদ স. তাঁর সাথীদেরকে এককে বার এককে রকম নির্দেশ দেন। একবার আদেশ দেন, পরমুহূর্তে জারী করেন নিষেধাজ্ঞা। এতে প্রমাণিত হয় প্রত্যাদিষ্ট কোনো কিছু নয় বরং তিনি নিজের মনগড়া কথাই বলে থাকেন। মুশরিকদের এই অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলো—

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

❒ আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

❒ তুমি কি জান না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহেরই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই।

'নাস্খুন' শব্দের অর্থ দু'রকমের—একটি অর্থ হচ্ছে অনুলিপি করা বা নকল করা। যেমন, 'নাস্খুল কিতাব' অর্থ পুস্তকের অনুলিপি। নাস্খুন এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মুছে ফেলা, অপসারণ করা বা রহিত করা। যেমন বলা হয় 'নাসাখাত শাম্সুজ্জিল্লা' (সূর্যকিরণ ছায়াকে অপসারণ করেছে)। এই আয়াতে নাস্খুন শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আভিধানিক ব্যাখ্যা এরকমই। কিন্তু আল্লাহ্পাকের কালামে নাস্খুন (রহিতকরণ) সাধিত হয় কয়েকটি পদ্ধতিতে— ১. কোনো আয়াতের তেলাওয়াত রহিত অথচ বিধান বলবৎ আছে, যেমন ব্যভিচারের শাস্তির বিধান জারি আছে অথচ সে আয়াতের পাঠ রহিত হয়েছে। ২. বিধান রহিত হয়েছে অথচ তেলাওয়াত চালু আছে। যেমন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অসিয়ত করার আয়াত এবং সেই আয়াত যেখানে নারীদের ইদ্দত পালনের সময়সীমা এক বছর বলা হয়েছে। ৩. যে আয়াতের তেলাওয়াত ও বিধান দুটিকেই মুছে ফেলা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে সুরা আহ্যাব সুরা বাকারার মতোই দীর্ঘ ছিল। কিন্তু পরে তার অধিকাংশ আয়াতের পাঠ ও বিধান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

একথাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সকল আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে তা দু'ধরণের। ১.উচ্ছেদকৃত বিধানের স্থলে অন্য বিধান কার্যকর করা—যেমন মিরাসের বিধানের দ্বারা অসিয়তের বিধান অবলোপন করা হয়েছে। অন্য স্থানে স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালনের এক বছর সময়সীমা মুছে ফেলে তদস্থলে চার মাসের মেয়াদ কার্যকর করা হয়েছে। ২. পূর্ববর্তী বিধান রহিত হওয়ার পর নতুন কোনো বিধান জারী না হওয়া। যেমন ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েদেরকে পরীক্ষা করে মুসলমান করা হতো। পরে এই বিধান রহিত করা হয়। রহিতকরণ

প্রধানত আদেশ বা নিষেধ সূচক বিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। বিজ্ঞপ্তিমূলক কোনোকিছুর ক্ষেত্রে রহিত করনের বিধান প্রযোজ্য নয়।

অধিকাংশ আলেম 'নান্‌সাখ' শব্দের 'নুন' এবং 'সিন' অক্ষরে জবর দিয়ে পাঠ করেছেন। ইহার অর্থ— উচ্ছেদ করা বা রহিত করণ। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আমি কোনো আয়াত উচ্ছেদ করি। ক্বারী ইবনে আমর শব্দটির 'নুন' অক্ষরে পেশ এবং 'সিন' অক্ষরে জের সহযোগে পাঠ করেছেন। তার পাঠানুযায়ী আয়াতের অর্থ দাড়াবে এরকম—আমি আপনাকে (রসুল মোহাম্মদ স. কে অথবা হজরত জিব্‌রাইলকে) কোনো আয়াত মনসুখ (রহিত) করার নির্দেশ দান করেছি।

'আও নুনসিহা' অর্থ মিশ্রিত হতে দিলে। আল্লামা ইবনে কাসীর এবং আবু আমর শব্দটির প্রথম 'নুন' অক্ষরে ও 'সিন' এ জবর সহযোগে পাঠ করেছেন। তাঁদের পাঠভঙ্গী অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—কোনো আয়াতের বিধান আমি নেপথ্যে স্থিত করি, কিন্তু তার আবৃত্তি অবশিষ্ট রাখি। এভাবে 'নাসেখ' শব্দটির অর্থ হবে উঠিয়ে নেয়া অথবা আমি সেই আয়াত লওহে মাহ্‌ফুজের আড়ালে রেখে দিই (পরিত্যাগ করি) অর্থাৎ আপনার প্রতি অবতীর্ণই করি না। এমতাবস্থায় 'নান্‌সাখ' অর্থ হবে অবতীর্ণ করার পর রহিত করা বা উঠিয়ে নেয়া এবং 'নুনসিহা' শব্দটির অর্থ হবে অবতীর্ণই না করা। অন্য ক্বারীগণ 'নুনসিহা' শব্দটির প্রথম নুন অক্ষরে পেশ এবং সিন অক্ষরে যের সহযোগে পাঠ করেছেন। এই উচ্চারণভঙ্গী অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হবে অপসৃতি বা বিস্মৃতি। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে আমি কোনো আয়াতকে আপনার মন থেকে মুছে দিই।

হজরত আবু উমামা বিন সহল বিন হানিফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কতিপয় সাহাবী একরাতে নামাজ পাঠ করছিলেন। তাঁরা একটা সুরা তেলাওয়াত করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। প্রভাতে তাঁরা রসুল পাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনাটি জানালেন। তিনি স. এরশাদ করলেন, ওই আয়াতগুলোর আবৃত্তি এবং বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

'তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি'— একথার অর্থ আমি যখন কোনো আয়াতের বিধান রহিত বা বিলোপ করি, অথচ তার চেয়ে সহজসাধ্য কল্যাণকর কিংবা অধিক পূর্ণতামন্ডিত আয়াত অবতীর্ণ করি। আবার কখনও রহিত আয়াতের অনুরূপ অন্য আয়াত প্রতিষ্ঠিত করি।

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান— এই প্রশ্নটির অর্থ— হে নবী! আপনিতো অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সম্বোধিত ব্যক্তির জ্ঞানকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলাই এরকম প্রশ্নরীতির উদ্দেশ্য।

এই আয়াত থেকে কোনো কোনো আলেম কতিপয় সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ১. স্থলাভিষিক্তকরণ ব্যতিরেকে মনসুখ (রহিত) হয় না। ২. রহিত বিধান অপেক্ষা অধিকতর কঠোর বিধান পুনঃ স্থাপিত হয় না। ৩. হাদিস দ্বারা

কোরআন রহিত হওয়া সিদ্ধ নয়। তাদের উদ্ভাবনের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, বিধান বলবৎ না হওয়াই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আর কঠোর বিধান অধিক পূণ্য লাভের সুযোগ দান করে এবং হাদিসতো আল্লাহ্পাকেরই শিক্ষা, যা তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে বলতে অনুমতি দিয়েছেন (সুতরাং হাদিস দ্বারা কোরআনের আয়াত মনসুখ হতে পারবে না কেনো?)

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। —এই ঘোষণার মাধ্যমে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এভাবে—আল্লাহ্ যেহেতু সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আকাশপৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী— সেহেতু রহিতকরণ, পরিবর্তন অথবা বিস্মৃতি সাধনের উপরে রয়েছে তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার। অবিশ্বাসীরা যেনো একথাও জেনে রাখে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অভিভাবক ও সাহায্যকারী কেউ নেই। সুতরাং অবিশ্বাসের শাস্তি অবধারিত। 'ওলী' অর্থ অভিভাবক এবং 'নাসির' অর্থ সাহায্যকারী। কাফেররা আল্লাহ্র অবাধ্য—তাই তাদের দুর্বল বা সবল কোনো বন্ধুই নেই এবং পরিচিত অথবা অপরিচিত কোনো সাহায্যকারীও নেই।

ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ এবং ইকরামার ধারাক্রমানুসারে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাফে বিন হেরিকেলা এবং ওয়াহাব বিন জাহেদ ইহুদী— রসুল করীম স. এর সমীপবর্তী হয়ে বললো, আপনি যদি প্রকৃত রসুল হয়ে থাকেন তবে আসমান থেকে কিতাব আনুন—আমরা তা পাঠ করবো অথবা মাটিতে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিন। যদি আপনি এমন করেন তবে আমরা আপনার অনুসারী হবো। তাদের কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০৮

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

❐ তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও যেইরূপ পূর্বে মুসাকে করা হইয়াছিল? এবং যে কেহ বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বাগবী বলেছেন, ইহুদীরা রসুল পাক স. কে বললো, হজরত মুসার প্রতি যেভাবে সম্পূর্ণ তওরাত একবারে অবতীর্ণ হয়েছিলো—আপনিও সেভাবে সম্পূর্ণ কোরআন একসঙ্গে আনুন। তাদের এই

গর্হিত উক্তির প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো ভাষ্যকার এর শানে নুজুল সম্পর্কে বলেছেন, অংশীবাদিরা বললো আমরা তো আপনার প্রতি প্রত্যয়শীল হবোই না, যতোক্ষণ না আপনি আকাশে আরোহন করবেন আর আপনার আকাশারোহনও আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে না যদি না আপনি সেখান থেকে একটি কিতাব আমাদের জন্য নিয়ে আসেন। সেই কিতাব আমরা অধ্যয়ন করবো। মুশরিকদের এই উক্তির প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। মুজাহিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, কোরাইশরা একবার রসুল পাক স. এর নিকট বললো, আপনি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে রূপান্তিত করে যদি দেন, তবে আমরা ইমান আনবো। রসুল পাক স. এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে একাজ তো অবশ্যই সম্ভব কিন্তু মনে রেখো এর পরেও যদি তোমরা ইমান গ্রহণে অস্বীকৃত হও, তবে তোমাদের অবস্থা হবে বনীইসরাইলদের আসমানী খাদ্য অবমাননা করার মতো। (আকাশ থেকে খাদ্যরূপী 'মান্না' 'সালওয়া' অবতীর্ণ হতো তাদের প্রতি, সে খাদ্যকে অবজ্ঞা করে শুকরে পরিণত হয়েছিলো তারা)। মুশরিকদের এই ঘটনাটি এই আয়াত নাজিলের কারণ। সুদ্দী বলেছেন, অবিশ্বাসীরা রসুল স. কে বলেছিলো, আপনি আল্লাহ্ পাককে ডেকে আনুন আমরা তাকে নিজ চোখে দেখে ইমান গ্রহণ করবো। অবিশ্বাসীদের একথার প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বাগবী আরও বলেছেন, অবিশ্বাসীরা রসুল পাক স. কে বলেছিলো, আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান, না হলে আমরা ইমান আনবো না। আবুল আলীয়া থেকে সুদ্দী আরও বর্ণনা করেছেন——এক ব্যক্তি রসুল পাক স. কে উদ্দেশ্য করে বললো, বনী ইসরাইলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেরকম নির্ধারিত রয়েছে, আমাদের পাপের বেলায় সেরকম নির্ধারণ থাকলে ভালো হতো। রসুল পাক স. বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেটাই উত্তম। বনী ইসরাইলদের বিধান ছিলো—কেউ পাপে লিপ্ত হলে, সে কথা তার ঘরের দরোজায় লিপিবদ্ধ হয়ে যেতো। তখন ওই ব্যক্তিকে তার পাপের কাফ্ফারা দিতে হতো। এভাবে সে আখেরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যেতো। কিন্তু তার জাগতিক লাঞ্ছনা কখনোই ঘুচতো না। আর কাফ্ফারা না দিলে আখেরাতের শাস্তি হতো আরও বেশী কঠোর। আল্লাহ্পাক তাদের চেয়ে তোমাদেরকে অধিক করুণাভাজন করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, 'কেউ যদি গোনাহ্ করে অথবা তার নফ্সের প্রতি জুলুম করে—অতঃপর আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে তারা আল্লাহ্পাককে পাবে ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু রূপে।' পাঁচ ওয়াক্ত

নামাজের ও দুই জুম্মার মধ্যবর্তী সময় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গণ্য। -এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের অন্তর্নিহিত উপদেশ হচ্ছে এই— অনর্থক প্রশ্নপ্রবণতা থেকে সংযত হও।

পূর্ববর্তী আয়াতে রসুলপাক স.কে সম্বোধন করা হয়েছিলো এভাবে— 'আলাম তা'আলাম' (তুমি কি জানো না?) এই আয়াতে সম্বোধন করা হচ্ছে সাধারণভাবে সকলকে। বলা যেতে পারে যে, রসুলপাক স. এর প্রতি সম্বোধনটির ব্যাপ্তিও সর্ব সাধারণকে একীভূত করেছে। তাঁর উম্মত—'উম্মতে এজাবত' (বিশ্বাসী উম্মত) এবং 'উম্মতে দাওয়াত' (যাদের প্রতি রয়েছে সত্য গ্রহণের আহবান) —উভয় উম্মতই এই ব্যাপকার্থক সম্বোধনের আওতাভুক্ত। পরবর্তি আয়াতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিলো 'মিঁউ ওয়ালিএঁও অলা নাসির'— সেখানেও একবচন ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সম্বোধিত হয়েছেন রসুলপাক স.। কারণ তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী, সকল জ্ঞানের আধার। তাই তাঁকে লক্ষ্য করে সকল মানুষের প্রতি বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্র অমোঘ ঘোষণা। এভাবে আয়াতের ধারাবাহিকতার সঙ্গত অর্থ হবে এরকম—হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কি জানো না যে, ভূমন্ডল ও নভোঃমন্ডলের এক ◌ আধিপত্য আল্লাহ্র। তিনি সকলকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি যেমন অভিপ্রায় করেন, তেমনিই নির্দেশ দান করেন। এসব জেনে শুনেও তোমরা কি অবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে? ওই সমস্ত অভিশপ্তদের মতো আচরণ করবে—যারা তাদের নবী হজরত মুসাকে এমনও বলেছিলো, হে মুসা! তোমার আল্লাহ্কে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করাও।

শেষ বাক্যে জানানো হচ্ছে— বিশ্বাসের বদলে অবিশ্বাসকে যে স্বাগত জানায়, সে হারিয়ে ফেলে সরল পথ। সুতরাং ভীত হও। এই নসীহতটি গ্রহণ করো এবং এমন প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়ো না, যাতে করে সরল পথ থেকে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

বাগবী বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের অবসান হলো—মুসলমানেরা তখনও বহন করে চলেছেন পরাজয়ের তাজা গ্লানি। তখন কতিপয় ইহুদী হজরত হোজায়ফা এবং হজরত আম্মারকে ডেকে বললো, যদি তোমরা সত্য পথে থাকতে তবে কখনই পরাজয় হতো না। তোমাদের এখন উচিৎ আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করা। কারণ আমাদের পথই সঠিক পথ। তাদের এই চরম হঠকারী উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى
يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ
تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

❒ ঈর্ষামূলক মনোভাববশতঃ, তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদিগকে সত্যপ্রত্যাখানকারীরূপে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্খা করে। তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষন না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন— আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও। এই উত্তম কাজের যাহা কিছু পূর্বে প্রেরণ করিবে আল্লাহের নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

❒ এবং তাহারা বলে, 'ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল, —'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হুয়াই এবং আবুল ইয়াসির ইহুদী তাদের গোত্রের বাইরে আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে নবী আর্বিভূত হয়েছেন বলে আরববাসীদের প্রতি অত্যধিক ঈর্ষা পোষন করতো। তারা দিন-রাত্রি চেষ্টা করতো, কিভাবে এ নতুন ধর্মের অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এ আয়াতে তাদের কথাই এভাবে বলা হয়েছে। কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদেরকে

সত্যপ্রত্যাখানকারীরূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা করে। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও ইহুদীদের এ হঠকারিতা অবাঞ্ছিত ও নিন্দনীয়। তারা তাদের কিতাবে রসুল পাক স. সম্পর্কিত স্পষ্ট বিবরণ পাঠ করেছে, সেই বিবরণের প্রতিভূরূপে তাঁকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে—তবুও তাঁকে স্বীকার করছে না। এর কারণ তাদের অন্তরে রয়েছে অপবিত্রতা এবং ঈর্ষাগ্নির অনিঃশেষ দহন। আয়াতে তাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে তা আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষন না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন।' আল্লাহ্পাকের সেই নির্দেশ ছিলো জেহাদ ও জিজিয়া সম্পর্কিত যা পরবর্তিতে বলবৎ করা হয়েছিলো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সেই নির্দেশ ছিলো বনী কুরাইজার নিধন ও বনী নাজিরের দেশত্যাগ সম্পর্কিত বিধান।

আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান—এখানে এ কথার অর্থ তাৎক্ষণিক শাস্তি আপতিত না হওয়ার কারণে কেউ যেনো মনে না করে, তাদের শাস্তি শিথিল করা হয়েছে অথবা তারা আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তভুত অবাধ্যদেরকে যে কোনো সময় আযাব দিতে সক্ষম।

এরপর এরশাদ হয়েছে, 'সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও'—এর অর্থ ইহুদীদের বিরোধিতাকে আমলে না এনে ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করো। নামাজ, জাকাত ও সৎকর্মই মূল বিষয়। এগুলো ক্রমাগত উপস্থিত করতে থাকো আল্লাহ্ পাকের পবিত্র দরবারে। এটা নিশ্চিত যে, তোমাদের সকল উপাসনা ও শুভকর্মের বিনিময় তাঁর নিকট রয়েছে। আর তোমরা যা করো সেগুলোসহ সকল কিছুরই তিনি দ্রষ্টা।

তারা বলে, ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ বেহেশ্তে যেতে পারবে না। আল্লাহ্পাক এখানে জানাচ্ছেন, মিথ্যা আশাবাদী তারা। তাদের দাবী সর্বৈব মিথ্যা। ইহুদীরা নিজেদেরকে বেহেশ্তী বলতো। খৃষ্টানরাও বলতো এরকম। নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকেই তারা সত্য বলে জানতো না। আয়াতে ওই দুই দলের দাবীকেই সম্পূর্ণ অসত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা তাদের মিথ্যা আশা। তারপর বলা হয়েছে তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করো।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১২

❐ হাঁ, যে-কেহ সৎকর্ম-পরায়ণ হইয়া আল্লাহের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাহার ফল প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

কাফেররা কস্মিনকালেও তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, তাই আল্লাহ্ এখানে সমর্পনের আহবান জানাচ্ছেন। বলছেন, ওহে ইহুদীরা! কল্পিত বিশ্বাস থেকে পশ্চাদাপসরণ করো। উত্তমরূপে অবগত হও যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করবে, সে লাভ করবে উত্তম বিনিময়—যা জমা রয়েছে তাঁর প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না।

সৎকর্মশীলদেরকে আয়াতে বলা হয়েছে 'মুহসীনুন'—মুহসীন অর্থ ইহ্সানের অধিকারী। 'ইহ্সান' অর্থ এমনভাবে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া, যেনো তুমি তাঁকে দেখছো অন্যথায় তিনি তোমাকে দেখছেন। হাদিসে জিব্রাইলে ইহ্সান সম্পর্কে এরকম ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ ও ইকরামা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যখন রসুল পাক স. এর দরবারে হাজির হলো, তখন ইহুদীরাও সদলবলে এসে পড়লো সেখানে। এরপর তারা তর্কবিতর্ক শুরু করে দিলো। রাফে বিন হারবিলা ইহুদী বললো, তোমরা খৃষ্টানেরা কোনো পথেই নেই। আর ঈসা এবং ইঞ্জিল অসত্য। নাজরানবাসীরা বললো, তোমরাই পথ-বিচ্যুত। মুসা এবং তওরাতও অসত্য। তাদের এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৩

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

❐ ইহুদীরা বলে 'খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নাই' এবং খৃষ্টানগণ বলে 'ইহুদীদের কোন ভিত্তি নাই; 'অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন।

ইহুদীরা খৃষ্টানদেরকে বলে তোমরা ভিত্তিহীন। খৃষ্টানরাও ইহুদীদেরকে বলে তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই। অথচ দু'দলই গ্রন্থধারী (আহলে কিতাব)। তারা তাদের আপনাপন গ্রন্থ পাঠ করে, তবু সত্যকে স্বীকার করে না। তওরাত যেমন হজরত ঈসা এবং ইঞ্জিল শরীফের সত্যায়নকারী, ইঞ্জিলও তেমনি হজরত মুসা ও তওরাতের প্রত্যয়নকারী। এতদসত্ত্বেও তারা কুটিল বাকবিতন্ডাকে আশ্রয় করে বসে আছে।

যারা কিছুই জানেনা, তারাও অনুরূপ কথা বলে—একথার দ্বারা আরববাসী মুশরিক, অন্যান্য পৌত্তলিক ও অগ্নি উপাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অবিশ্বাসীদের অন্যান্য দল উপদলও এই সম্বোধনের লক্ষ্য। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে ছাড়া অন্যকে মিথ্যাবাদী বলে থাকে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সকল বাক-বিতন্ডার অবসান ঘটাবেন। সেদিন মিথ্যাবাদীদেরকে সুচিহ্নিত করা হবে। তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে নরকাগ্নির দিকে। সত্যপন্থীদেরকেও সেদিন স্বীকৃতি দেয়া হবে। তাদেরকে জানানো হবে স্বর্গীয় সম্ভাষণ।

আব্দুর রহমান ইবনে এজিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় যখন মক্কার মুশরিকেরা রসুলপাক স. কে মক্কা মোয়াজ্জেমায় প্রবেশ করতে দেয়নি, তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৪

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

❒ যে-কেহ আল্লাহের মস্জিদে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে ও উহার ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় সীমালংঘনকারী কে হইতে পারে? অথচ ভয়-বিহবল না হইয়া তাহাদের জন্য মস্জিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

যে আল্লাহ্র মস্জিদ সমূহে গমনকারীদের বাধা দেয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নয়। মক্কার মুশরিকেরা কাবার মসজিদে গমন করতে বাধা দিয়েছিলো।

কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে বহুবচন (মস্‌জিদ সমূহ)। এর কারণ হচ্ছে, এর প্রেক্ষিত একটি মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও ঘোষণাটি সাধারণ। আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং মসজিদের ধ্বংস সাধনে উদ্যত হয়। আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন হতে না দেয়াও মসজিদ ধ্বংসের নামান্তর। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আতা থেকে এরকমই বলা হয়েছে। কাতাদা এবং সুদ্দী থেকে অবশ্য অন্য একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ঘটনাটি হচ্ছে—তীতিউস বিন এসিসিয়ানুস রুমী ও তার সঙ্গী সাথীরা ছিলো চরম ইহুদী বিদ্বেষী। সে বাবেলের বখতে নসরকে সাহায্য করেছিলো। বখতে নসরের দল একযোগে আক্রমণ করে বসলো ইহুদীদেরকে। তাদেরকে এবং তাদের পশুপালকে হত্যা করলো। তাদের সন্তানদেরকে করলো বন্দী। এরপর ধ্বংস করলো বায়তুল মাকদিস মস্‌জিদ ও তওরাত শরীফ। মসজিদের অভ্যন্তরে মৃতদেহ স্তূপীকৃত করলো এবং সেখানে জবাই করলো শুকর। এভাবে গ্রন্থধারীদের হজ ও জিয়ারতের কেন্দ্রকে অপবিত্র করলো সে।

আমি বলি, এই স্থানে পূর্বপুরুষদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে খৃষ্টানদেরকে ভর্ৎসনা করাই সম্ভবত এই আয়াতের উদ্দেশ্য। ইতোপূর্বে গরু পূজার বিষয় উল্লেখ করে ইহুদীদেরকেও এরকম ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশাধিকার নেই—এটাই আল্লাহ্‌পাকের সিদ্ধান্ত। তবে তারা যদি ভয়বিহ্বল অবস্থায় মসজিদে প্রবেশপ্রার্থী হয়, তবে অসংগত হবে না। আয়াতের এই বিবরণটির মধ্যে মসজিদে হারাম ও বায়তুল মাকদিস যে মুসলমানদের অধিকারে আসবে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। অল্প কিছুদিন পরেই আল্লাহ্‌পাকের অঙ্গীকার বাস্তবরূপ লাভ করেছে। মক্কা বিজয়ের পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের পরিপূর্ণ অধিকার যখন রসুল স. এর আওতাভূত হলো, তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, হুঁশিয়ার! এরপর থেকে কোনো মুশরিক বায়তুল্লাহ্‌র হজ করতে পারবে না। বায়তুল মাকদিস অধিকারের অঙ্গীকারও পরবর্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছিলো হজরত ওমর ফারুক রা. এর কালে। তাঁর মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলেন আল্লাহ্‌পাক। বিধ্বস্ত বায়তুল মাকদিসকে পুনর্গঠিত করেছিলেন মুসলমানেরা। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আয়াতের অর্থ হবে এরকম—আল্লাহ্‌পাক অবিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে এমনভাবে পর্যুদস্ত করে দিবেন যে, তারা আর মসজিদের কাছে ঘেঁষতেই পারবে না। যদি তখন তারা মসজিদমুখী হয়, তবে তাদেরকে হতে হবে ভীত, সন্ত্রস্ত। হত্যা অথবা বন্দীত্বের ভয়ে-বিহ্বল। কিংবা এরকমও অর্থ হতে পারে যে, ওরা যেনো মসজিদে প্রবেশ করার সাহসই না পায়। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদি প্রবেশ করতে চায়, তবে তাদেরকে বিনয় ও ভীতির সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং পরবর্তি পৃথিবীতে মহা শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। পৃথিবীর শাস্তি হচ্ছে, হত্যা, বন্দীত্ব অথবা জিজিয়া প্রদান। আর পরকালের মহা শাস্তি হচ্ছে সার্বক্ষণিক নরকানল।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৫

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

❒ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহেরই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহের দিক। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র ভূভাগের অধিপতি তিনি। সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন ও বিকাশ। সর্বত্রই তাঁর জ্যোতির বিস্তার। আর তিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের নূর (আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ্ব)। প্রতিটি বস্তুই তাঁর আবেষ্টনাধীন। তাই তিনি কোনো স্থান অথবা কালে সীমাবদ্ধ নন। কেবলার বিধান নির্ধারিত হয়েছে অনেক পরে। নির্দেশ প্রতিপালনের ভার যোগ্যতানুসারেই দেয়া হয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি শত্রুর প্রতিবন্ধকতার কারণে ফরজ নামাজে কেবলামুখী হতে অসমর্থ হও; অথবা যথাচেষ্টার পরেও কেবলা নির্বাচনে ভুল করে ফেলো, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেনো, সবদিকই তো আল্লাহ্রই দিক। নফল নামাজের জন্য এই নির্দেশনাটি অধিকতর শিথিল। বিশেষ করে সফরের সময়, যদি বাহন থেকে অবতরণ কষ্টকর হয় তবে বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় যেদিকেই তোমরা মুখ করে থাকো না কেনো, তোমাদের নফল নামাজ গ্রহণ করা হবে।

সেদিকই আল্লাহ্র দিক—একথার অর্থ, প্রতিটি দিকই কেবলা। হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ এরকম বলেছেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, প্রতিটি দিকের প্রতিই আল্লাহ্তায়ালা প্রসন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি মোতাশাবেহ্। এই হিসেবে আয়াতটি অন্যান্য মোতাশাবেহ্ আয়াতের সমপর্যায়ভূত। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন—রসুলপাক স. মক্কা থেকে মদীনা গমণের প্রাক্কালে বাহন যেদিকে চলছিলো সেদিকেই মুখ করে নফল নামাজ আদায় করেছিলেন। একথা বলে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর দলিল হিসেবে এই আয়াতটি পাঠ করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতের মর্ম হচ্ছে, সফরের বাহনোপরি উপবিষ্ট অবস্থায় বাহনের গতি যেদিকে, সেদিকেই মুখ করে নফল নামাজ পাঠ করো। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে

আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন—কেবলা পরিবর্তনের আয়াত অবতীর্ণ হলে ইহুদীরা যখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলো, তখন এই প্রতিবাদের জবাবে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এই হাদিসটির সনদও যথেষ্ট শক্তিশালী।

আমি বলি, শানে নুজুল সম্পর্কিত প্রথম বর্ণনাটিই সনদ এবং অর্থের দিক দিয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ। এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বর্ণনাসূত্রগুলো দুর্বল। তাছাড়া তিরমিজি, ইবনে মাজা ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত রবীয়া বলেছেন, আমরা একবার রসুলপাক স. এর অন্ধকার রাতের সফরসঙ্গী ছিলাম। নামাজের সময় হলো। আমরা দিক ঠাহর করতে পারলাম না কেবলা কোনদিকে। আমরা সকলে নিজ নিজ অনুমাননির্ভর কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলাম। সকালে রসুলপাক স. কে আমরা একথা জানালাম। তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়। বায়হাকী এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন—হজরত জাবের বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. একটি ক্ষুদ্র সেনাদলকে একবার কোথাও পাঠিয়েছিলেন। আমিও ওই সেনাদলে ছিলাম। যখন রাত হলো, তখন আমরা আর কেবলার পরিচয় উদ্ধার করতে পারলাম না। সবাই আপন ধারনানুসারে কেবলা নির্ধারণ করে নামাজ আদায় করলাম। সকলেই কেবলার দিকে মাটিতে একটি রেখা টেনে রেখেছিলেন। ভোরে দেখা গেলো, প্রতিটি রেখাই কেবলামুখী। মদীনায় ফিরে এসে এই ঘটনাটি আমরা রসুল পাক স. এর সামনে বর্ণনা করলাম। তিনি নিশ্চুপ রইলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটি রয়েছে- মেঘাচ্ছন্নতার কারণে কেবলা নির্ণয় করা যাচ্ছিলো না। মুজাহিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন—যখন 'আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো'—এই আয়াতটি নাজিল হয়, তখন আরববাসীরা প্রশ্ন করেছিলো, আল্লাহ্ কোনদিকে? কোথায় অবস্থান করেন? তাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ—একথার অর্থ, আল্লাহ্পাকের প্রকারবিহীন নূর প্রাচ্য প্রতীচ্যসহ সৃষ্টির সকল পরিসরেই পরিব্যাপ্ত। যা অনির্ণেয়, অননুধাবনীয়; নিগুঢ় তত্ত্ব। ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. নামাজের নিগুঢ় তত্ত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ সর্বব্যাপী—একথার অর্থ, তাঁর অনির্বচনীয় সত্তার পরিব্যাপ্তি পার্থিব পরিবেশ বিমুক্ত । এ অবস্থা জ্ঞানের অতীত। মানুষের আপত্তি, উদ্দেশ্য, সামঞ্জস্য, অসামঞ্জস্য- সকল কিছু সম্পর্কে রয়েছে তাঁর সম্যক অবহিতি।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ

❒ এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি মহান, পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই। সব কিছু তাঁহারই একান্ত অনুগত।

মদীনার ইহুদীরা বলতো, হজরত উযায়ের আল্লাহ্র সন্তান। নাজরানের খৃষ্টানেরা বলতো, হজরত ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। আর আরবের মূর্তিপূজকেরা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। এসকল অপবিশ্বাসের প্রতিবাদে এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

'সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ্ পবিত্র)' এই বাক্যটি প্রয়োগের অর্থ হচ্ছে, অপবিশ্বাস সমূহের প্রতি বিস্ময় ও অস্বীকৃতি প্রদর্শন করা। জন্মদাতা ও জাতক একই প্রকৃতির হয়। তারা একে অপরের অংশ বটে। কিন্তু সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক তো এরকম নয়। আল্লাহ্তায়ালা প্রজনন প্রক্রিয়া থেকে পবিত্র। জন্মদাতা ও স্রষ্টা কখনো এক নয়। কখনোই নয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানেরা আমার প্রতি অপবাদারোপ করেছে। এটা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। আর তারা আল্লাহ্তায়ালাকে গালি দিয়েছে। এই আচরণটিও যুক্তিহীন। অপবাদারোপ বা অসত্যারোপ করেছে এভাবে- তারা বলেছে, আল্লাহ্পাক মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না। আর গালি দিয়েছে এভাবে— তারা বলে, আল্লাহ্র পরিবার পরিজন ও সন্তানসন্ততি রয়েছে। অথচ আমি এ সকলকিছু থেকে পবিত্র। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমার বান্দারা আমার প্রতি একথার মাধ্যমে অসত্যারোপ করে—আল্লাহ্ আমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন না, যেমন আমরা এখন আছি। তাদের কথার অর্থ দাঁড়ায়, দ্বিতীয় সৃষ্টি যেনো প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা কঠিন। অথচ তারা জানে না আমি একক সত্তা। আমি অমুখাপেক্ষী। আমি কারো জাত নই। কারো জন্মদাতাও নই। আমার সমতুল্যও কেউ নেই।

আকাশ পৃথিবীর সকলকিছুই আল্লাহ্র। সবকিছুর উপরে রয়েছে তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার। তিনিই সকলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বময়তায় এনেছেন। সমুদয় সৃষ্টির একক স্রষ্টা তিনিই। সবকিছুই তাঁর আজ্ঞাধীন, অনুগত। সুতরাং পিতা পুত্রের সম্পর্কের আর অবকাশ কোথায়? মুখাপেক্ষির সঙ্গে অমুখাপেক্ষির কীইবা সম্পর্ক? সম্ভাব্য এবং অবশ্যম্ভাবী কি কখনো সমান্তরাল হয়? নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সকলকিছুই তাঁর নিরঙ্কুশ এককত্বের সাক্ষ্যদাতা এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য বলে সাক্ষ্যদানকারী। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, 'আর এমন কোনো বস্তুই

নেই যা তাঁর স্তবস্তুতি (তাসবীহ্) পাঠ না করে। কিন্তু তোমরা বুঝ না।' সাধারণ বিধান হিসেবে এই ঘোষণাটি দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নরা এর ব্যতিক্রম। তাঁরা এই বিশাল সৃষ্টির তাসবীহ্ পাঠের বিষয়টি অনুভব করে থাকেন। জ্ঞানে যারা মধ্যমপ্রকৃতির—তারা লক্ষণ, গুণ ও নিদর্শন দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ করে থাকেন।

'ক্বনিতুন' অর্থ একান্ত অনুগত। কুনুত শব্দের আভিধানিক অর্থ দন্ডায়মান হওয়া। রসুলপাক স. বলেছেন, দীর্ঘ দন্ডায়মান বিশিষ্ট নামাজই উত্তম নামাজ। মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি। ক্বনিতিন শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, একান্ত আজ্ঞাবহ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে উত্তম সূত্রে আহমদ বর্ণনা করেছেন, কোরআন মজীদে উল্লেখিত প্রতিটি কুনুত শব্দের অর্থ হবে, আনুগত্য। এভাবে 'কুল্লুল্লাহ্ ক্বনিতুন' এর অর্থ হবে, কোনোকিছুই তাঁর অভিপ্রায় ও সৃজনবিন্যাসের বাইরে নয়। সুতরাং কোনোকিছু তাঁর সমকক্ষ নয়। 'সবকিছু তাঁর একান্ত অনুগত' বলতে এখানে চেতনাহীন সকল বস্তু এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন সমস্ত সচেতন সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। প্রজ্ঞাধারীদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কুনুত বা দাঁড়ানো। তাই তাদেরকে বহুবচনে ক্বনিতুন বলা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরকম—ওই সমস্ত অংশীবাদিরা যাঁদেরকে (হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের ও ফেরেশতামন্ডলীকে) আল্লাহ্র পুত্রপরিজন মনে করে, তাঁরাও আল্লাহ্র একান্ত অনুগত দাস হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং অবিশ্বাসীদের অপবিশ্বাস তাঁদের মর্যাদার প্রতিও একটি জঘন্যতম কটাক্ষ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৭

بَدِيۡعُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمۡرًا فَاِنَّمَا يَقُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ ○

❐ আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও', আর উহা হইয়া যায়।

আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা—এই আয়াতটির অর্থ দু'টি। ১. তিনি যেমন আকাশ পৃথিবীস্থিত সকল বস্তুর স্রষ্টা। তেমনি আকাশ পৃথিবীরও স্রষ্টা। ২. আকাশ ও পৃথিবী তাঁর দু'টি পৃথক সৃষ্টি। 'ক্বদ্বা' অর্থ—যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যখন কোনোকিছুকে পূর্ণত্ব প্রদানের ইচ্ছা করেন। শব্দটির নিবিড় সম্পর্ক পূর্ণত্ব প্রদানের সঙ্গেই। বিষয়টি বর্ণনামূলক হতে পারে। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আর তোমার প্রতিপালক সন্দেহাতীতরূপে (পরিপূর্ণরূপে) নির্দেশ দিয়েছেন যে, শুধু তাঁরই ইবাদত করো।' আবার বিষয়টি ক্রিয়া সম্পর্কিতও হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'ফাক্বদ্বাহুন্না সাবয়া সামাওয়াত'

(অতঃপর তিনি সপ্ত আকাশের পূর্ণত্ব প্রদান করলেন)। কখনো আবার 'কৃদ্বা' শব্দটি কোনো বস্তুর অস্তিত্বে আসা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে শব্দটি শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'কুন' অর্থ হও। কাকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশ, তার উল্লেখ এখানে নেই। বরং বলা হয়েছে, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।' জমহুর আলেমগণ 'ফাইয়াকুন' শব্দটি একটি পৃথক বাক্য অথবা 'ইয়াকুলু' (বলেন) এর সঙ্গে সংযুক্ত করে সকল ক্ষেত্রেই পেশযুক্ত অবস্থায় পাঠ করেছেন। ক্বারী কাসায়ী ক্বারী ইবনে আমেরের অনুকরণে সুরা নহ্ল ও সুরা ইয়াসীনে উল্লেখিত এই শব্দটিকে জবর সহযোগে পাঠ করেছেন। কিন্তু সুরা আলে ইমরানে এবং সুরা আনআমে পাঠ করেছেন পেশ সহযোগে। জবর সহকারে পাঠ করার কারণ হচ্ছে, নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে 'ফা' এর পরে 'আন' শব্দটি উহ্য থাকে। এমতো ক্ষেত্রে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় এসে সামনে দাঁড়ায়। ১. অনুপস্থিত কোনোকিছুকে সম্বোধন করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, অস্তিত্বপূর্ব অবস্থার প্রতি 'হও' নির্দেশটি প্রয়োগ হয় কিভাবে? কোনো কোনো আলেম এরকম সমাধান দিয়েছেন—বস্তুটির অস্তিত্বপ্রাপ্তি সুনির্ধারিত ছিলো। তাই মনে করতে হবে সম্বোধনের সময় যেনো বস্তুটি বিদ্যমান ছিলো। কাজেই এরকম সম্বোধন অসিদ্ধ নয়। ইবনে আমবারী বলেছেন,'ইয়াকুলু' (বলেন) অর্থ, সৃষ্টি করার জন্য তাকে এরূপ বলেন।

বস্তুটিকে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন, এরকম নয়। সুতরাং নির্দেশটি দৃশ্যতঃ সম্বোধন হলেও মূলত তা সম্বোধন নয়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে নির্দেশ প্রদান ও তা মান্য করার ব্যাপার নেই। বরং এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টিকৌশলের একটি উপমা প্রদান করেছেন মাত্র। যেনো এখানে বলা হয়েছে, যেমন কেউ কাউকে নির্দেশ দান করলে, নির্দেশিতজন তা অবনত মস্তকে মেনে নেয়। তেমনি আমি কোনোকিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। ২. জবরযুক্ত অবস্থায় শব্দটিকে প্রকৃত নির্দেশ বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপত্তি এই যে, নির্দেশটি প্রকৃতই কোনো নির্দেশ (আমরে হাকিকি) নয়। বরং বিষয়টি তরিৎ কর্মকুশলতার একটি উপমা। সুতরাং সমস্যাটির সমাধান করতে হবে এভাবে— প্রকাশ্য শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে জবর সংযোগ করা হয়েছে। ৩. 'ফা' এর পূর্বোক্ত বিষয় (আমরান) পরের বিষয়টির (ইয়াকুলু) কারণ। এমতোক্ষেত্রে একটি সৃষ্টির জন্য দু'টি 'কুন' (হও) অনিবার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এহেন জটিলতার সমাধানে বলা যেতে পারে যে, প্রথম 'কুন' (হও) দ্বারা রূপকভাবে বস্তুর সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব নির্ণীত হয়েছে। কারণ, বস্তুর সুনির্দিষ্টকরণ ব্যতিরেকে তার বিদ্যমানতা অচিন্ত্যনীয়। পরের 'কুন' দ্বারা বস্তুটির বিদ্যমানতা অস্তিত্বশীল হয়েছে।

আমি বলি, বিষয়টি এভাবে সমাধান করা যেতে পারে যে, প্রথম 'কুন' দ্বারা কর্মজগতের উপকরণ এবং দ্বিতীয় 'কুন' দ্বারা প্রতিফলজগতের পরিণাম নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু এই সমাধানের দ্বারা কেবল দায়িত্বশীলগণ চিহ্নিত হয়ে পড়ছেন।

অথচ সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টি আয়াতের লক্ষ্যস্থল। কাজেই এরকম ধারণা করাই উত্তম যে, প্রথম 'কুন' দ্বারা জ্ঞানজগতের বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় 'কুন' দ্বারা প্রতিবিম্ব সহ লক্ষ্যগোচর হওয়া বুঝানো হয়ে থাকবে। সুফী দার্শনিকগণ এরকমই বলেছেন। অবশ্য আল্লাহ্পাকের এই সৃজনশীলতা কাললগ্ন নয়। তাঁর সৃজনক্ষমতাকে পরিবর্তনশীল ভাবা অসম্ভব। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আয়াতটি তাওহীদে শুহুদীর প্রমাণপঞ্জি। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এরকমই অভিমত প্রকাশ করেছেন। শায়েখে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেছেন, সম্ভাব্য জগত তার বৃত্তের বাইরে বিদ্যমানতার গন্ধও পায়নি। তাওহীদে অজুদী আশ্রিত তাঁর এই মতামত এই আয়াতের অনুকূল নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৮

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

❒ এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসেনা কেন?' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি।

ইহুদী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে, যারা কিছু জানে না। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন—রাফে বিন হারমিলা ইহুদী রসুলপাক স. কে বলেছিলো, যদি তুমি আল্লাহ্র রসুল হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ্কে বলো, তিনি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা তাঁর কথা স্বকর্ণে শুনি। মুজাহিদ বলেছেন, যারা কিছু জানে না— একথা বলা হয়েছে খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যদিও আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করতো, তবু তাদেরকে 'যারা কিছু জানে না' একথা বলে মূর্খ প্রতিপন্ন করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা কিতাব অনুযায়ী আমল করতো না। কাতাদা বলেছেন, আরবের পৌত্তলিকদের লক্ষ্য করে এরকম বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেনো? —একথার অর্থ, আল্লাহ্ তো ফেরেশতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, তবে আমাদের সঙ্গে কেনো করবেন না। হজরত মুসার সঙ্গে এরূপ করেছেন। তবে আমাদেরকে কেনো বলে দিবেন না যে, ইনি আমার রসুল। অবিশ্বাসীদের এহেন উক্তি দম্ভপূর্ণ। স্পষ্টতঃই অহংকারাচ্ছন্ন।

কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট আসেনা কেনো? তাদের এই উক্তিটিও দর্পপ্রকাশক ও বিধানবিরোধী—যা সত্যের প্রতি অস্বীকৃতিরই নামান্তর।

অতীতের ইহুদী খৃষ্টানেরাও এমন বলতো। যেমন, ইহুদীরা হজরত মুসাকে বলেছিলো, আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রকাশ্যে সাক্ষাত দান করুন। খৃষ্টনেরা বলেছিলো, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হোক। এরকম দম্ভোক্তি ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের সকল ইহুদী খৃষ্টানেরাই সমস্বভাববিশিষ্ট। তাই বলা হয়েছে, তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলতো। তাদের অন্তরও ছিলো একই রকম।

আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি—একথায় বুঝা যায়, যাঁরা বিশ্বাসী কেবল তাঁদের জন্যই আল্লাহ্পাক নিদর্শনাবলীকে স্পষ্ট করেছেন—যদিও নিদর্শনাবলী সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা বিতন্ডাপ্রেমী ও অসাধুদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। কল্যাণবঞ্চিত হওয়ার কারণেই তাদেরকে এখানে অনুল্লেখ্য রাখা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৯,১২০,১২১

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ۝ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ۝

❒ আমি তোমাকে সত্য-সহ শুভ-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

❒ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষন না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহের পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ-নির্দেশ।' জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে

আল্লাহের বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।

❐ যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহাদের যাহারা যথাযথভাবে ইহা আবৃত্তি করে তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে, আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

সত্যসহ শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি—এখানে সত্য (হক) অর্থ হবে কোরআন পাক। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস একথা বলেছেন। শুভসংবাদদাতা অর্থ, অনুগতদের প্রতি সুসংবাদদাতা। আর সতর্ককারী অর্থ, অবিশ্বাসীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী।

'আসহাবিল জাহিম' অর্থ, জাহান্নামী। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না—একথার অর্থ, হে মোহাম্মদ স. নরকবাসীদের সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কেনোনা তারা বিশ্বাসবিচ্যুত। আপনার দায়িত্ব কেবল সংবাদ পৌঁছানো। আর হিসাব গ্রহণ করবো আমি।

বাগবী বলেছেন, হজরত আতার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—একবার রসুলপাক স. বললেন, হায়! আমি যদি জানতে পারতাম, আমার মাতা-পিতা কী অবস্থায় আছেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সওরী মুসা বিন উবাদা থেকে, তিনি মোহাম্মদ বিন কাসাব কুরজী থেকে এবং তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর ইবনে জুরাইজের পদ্ধতিতে বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে দাউদ বিন আসেমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বাগবী ও অন্যান্যদের বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটি আমার কাছে পছন্দসই নয়। শক্তিশালীও নয়। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হলেও একে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের একটি ধারণা মনে করতে হবে। শানে নুজুল সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক বলে মেনে নিলেও একথা প্রমাণিত হয় না যে, জাহান্নামী শব্দটি রসুলুল্লাহ্ স. এর মাতাপিতার প্রতি প্রযোজ্য হবে। যদি প্রযোজ্য হয়ও, তবুও একথা বলা যাবে না যে, রসুল পাক স. এর মাতা-পিতা অবিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, পাপের কারণে বিশ্বাসীরাও সাময়িকভাবে দোজখবাসী হতে পারে। শাফায়াত বা অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও শাস্তিমুক্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণিত ওই হাদিসটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে—রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, আদম সন্তানগণের উপর অতিবাহিত যুগের মধ্যে অতিউত্তম যুগে বরং সর্বোত্তম যুগে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরো বলেছেন, দল দ্বিধাবিভক্তির পর উত্তম দলে আল্লাহ্পাক আমার জন্ম নিশ্চিত করেছেন। আর আমি খাঁটি মাতাপিতার বিশুদ্ধ সন্তান। মূর্খতার অপবিত্রতা থেকে আমি মুক্ত। হজরত আদম

থেকে আমার মাতাপিতা পর্যন্ত পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আমার জন্ম—যে জন্মধারা ব্যভিচারকলুষিত নয়। এ কারণেই আমি স্বীয় সত্তা এবং পিতৃপুরুষের ক্রমপ্রবাহের দিক থেকে তোমাদের চেয়ে উত্তম। হাদিসটি হজরত আনাস থেকে বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলে নবুয়ত' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থভূত করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। আর শায়েখ জালালুদ্দিন সুয়ুতী রসুলুল্লাহ্ স. এর পিতামাতার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কতিপয় পুস্তিকাও রচনা করেছেন। ওই পুস্তিকা সমূহের একটিতে আমি প্রমাণপঞ্জিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নোত্তর সন্নিবেশিত করেছি। সকল প্রশস্তি কেবল আল্লাহ্র জন্যই।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, গ্রন্থধারীরা (খৃষ্টান ও ইহুদীরা) একবার রসুলপাক স. কে বললো, আপনি যদি আমাদেরকে কিছু সুযোগসুবিধা দেন, তাহলে আমরা ইমান গ্রহণ করবো। তখন পরবর্তী আয়াতটি (১২০) নাজিল হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন—প্রথম দিকে রসুল পাক স. গ্রন্থধারীদের কেবলার দিকে (বায়তুল মাকদিসের দিকে) মুখ করে নামাজ পড়ে যাচ্ছিলেন। এ দেখে মদীনার ইহুদী ও নাজরানের খৃষ্টানেরা ধারণা করতো, অবশেষে তিনি স. তাদের ধর্মে গিয়ে মিলিত হবেন। কিন্তু যখন তিনি স. কাবাশরীফের দিকে মুখ করে নামাজ শুরু করলেন, তখন তারা নিরাশ হয়ে গেলো। ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো—ইহুদী খৃষ্টনেরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতোক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো—একথা বলে তাদের নৈরাশ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্পাকের পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' এই পথনির্দেশের নাম ইসলাম। ইসলাম সত্য। আর অবিশ্বাসীদের পথ ভ্রান্ত—এই জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে 'জ্ঞান' (এলেম) অর্থ, ওহী (প্রত্যাদেশ)। এখানে রসুলপাক স. কে লক্ষ্য করে অন্যদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করলে আল্লাহ্র বিপক্ষে কোনো অভিভাবক, সাহায্যকারী থাকবে না।

যাদেরকে কিতাব দিয়েছি—এখানে যাদেরকে বলে সাহাবা কেরামগণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হজরত কাতাদা ও হজরত ইকরামা একথা বলেছেন। অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, যাদেরকে অর্থ, সাধারণ মু'মিনদেরকে। গ্রন্থধারীগণের অন্তর্ভূত মু'মিনগণও এই সম্বোধনের অন্তর্ভূত হতে পারেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতটির শানে নুজুল এরকম— হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের সহযাত্রী হিসেবে হাবশার হিজরত শেষে চল্লিশজন লোক এসেছিলেন। ওই চল্লিশজনের বত্রিশজন ছিলেন হাবশার এবং আটজন সিরিয়ার। তাদের মধ্যে বহিরা নামক এক পাদ্রীও ছিলেন। তাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি নাজিল হয়। জুহাক বলেছেন, ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান

হয়েছিলেন তাঁরাই এই আয়াতের লক্ষ্য। তাঁদের সম্মানিত নাম হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম, সাঈদ বিন আমর, উসায়েদ ও আসাদ ভ্রাতৃদ্বয়, আব্দুল্লাহ্ ইবনে সুরিয়া প্রমুখ।

খতীব একটি মাজহুল সূত্রের মাধ্যমে ইমাম মালেক থেকে, তিনি নাফে থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে এবং তিনি রসুলুল্লাহ্ স. থেকে বর্ণনা করেন— 'যথাযথভাবে ইহা আবৃত্তি করে' একথার অর্থ, কিতাবের পুরোপুরি অনুসরণ করে। যথাযথ আবৃত্তি প্রসঙ্গে হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, যাঁরা বেহেশতের আলোচনাকালে বেহেশতকামী হয় এবং দোজখের আলোচনাকালে হয় দোজখ থেকে পরিত্রাণাভিলাষি। 'হা' (ইহা) সর্বনামটি কিতাবের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—যাঁরা কিতাবকে পরিবর্তনমুক্ত অবস্থায় জ্ঞানাহরণ ও আমলের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করে। কালাবী বলেছেন, 'হা' সর্বনামটি আয়াতের দু'টি স্থলে উল্লেখিত হয়েছে। দু'টি সর্বনামই রসুলে পাক স. এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম—গ্রন্থধারীদের অন্তর্ভূত বিশ্বাসীদের নিকট মহানবী স. সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চায়, তবে তাঁরা তাঁদের কিতাবে যেমন পাঠ করেছেন হুবহু তেমনই বর্ণনা দিবেন।

শেষে বলা হয়েছে, 'যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত'—একথার অর্থ, যারা তওরাতকে বিকৃত করে, কোরআনকে অস্বীকার করে অথবা মহানবী স. কে অবিশ্বাস করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২২, ১২৩

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

❒ হে ইসরাইল—সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

❒ এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবেনা এবং কাহারও নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হইবেনা এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবেনা এবং তাহারা কোন সাহায্যও পাইবে না।

এই সুরার শুরু থেকে বনী ইসরাইলদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানেও তেমনি বলা হচ্ছে, হে ইসরাইল সন্তানেরা! তোমাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহ সমূহের কথা স্মরণ করো। তোমাদেরকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিলো। কিয়ামত দিবসের কথাও বিস্মৃত হয়ো না। সেই ভয়াবহ দিবসে বিনিময়, সুপারিশ, সাহায্য—সবকিছুই হবে অচল। এই সতর্কবাণী সমূহের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হিতোপদেশগুলোকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলাই উদ্দেশ্য। বক্তব্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পৌনঃপুনিকতার রীতিটি এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৪

وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

❒ এবং যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিতেছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও?' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।'

ক্বারী হাশমী 'ইব্রাহিম' শব্দটিকে 'আব্রাহাম' পাঠ করতেন। কোরআন মজীদে হজরত ইব্রাহিমের পবিত্র নাম রয়েছে উনসত্তরটি স্থলে। তার মধ্যে তিনি তেত্রিশ স্থলে আব্রাহাম পাঠ করেছেন। যেমন, সুরা বাকারায় পনেরোটি, সুরা নিসায় তিনটি, সুরা আনআমে একটি, সুরা তওবাতে দু'টি, সুরা ইব্রাহিমে একটি, সুরা নহলে দু'টি, সুরা মরিয়মে তিনটি, সুরা আনকাবুতে একটি, সুরা শুয়ারাতে একটি, সুরা জাছিয়াতে একটি, সুরা নজমে একটি, সুরা হাদীদে একটি এবং সুরা মুমতাহিনাতে একটি। ক্বারী ইবনে জাকওয়ান শুধু সুরা বাকারায় ইব্রাহিম শব্দটিকে 'আব্রাম' এবং 'আব্রাহাম' এই দুই উচ্চারণে পাঠ করেছেন। অন্য সকলে পড়েছেন ইব্রাহিম।

'ইব্তালা' শব্দের আসল অর্থ, কঠিন কোনো কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা। 'বালা' থেকে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে দায়িত্ব অর্পণ করার অর্থ পরীক্ষা করা। ভাষাবিদগণ মনে করেন, ইব্তিলা এবং ইখতিবার সমার্থক।

'কালিমাত' অর্থ বাক্যাবলী। এখানে এ শব্দটির অর্থ, বিষয়বস্তু। নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞাই এখানে বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, কালিমাত শব্দের অর্থ, শরিয়তের শাখাগত ত্রিশটি সুস্বভাব। হজরত

ইব্রাহিমই কেবল ওই সুস্বভাবগুলো আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নরকাগ্নিমুক্ত। তিনি যে আল্লাহ্পাকের সকল পরীক্ষাতীর্ণ— কোরআন মজীদই সে সাক্ষ্য দিয়েছে। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে—সেগুলো সে পূর্ণ করেছিলো। ওই ত্রিশটি সুস্বভাবের কথা বিভিন্ন সুরায় বর্ণিত হয়েছে। সুরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে দশটি। যেমন, ১. তওবাকারী ২. ইবাদতকারী ৩. প্রশংসাকারী ৪. আল্লাহ্র পথে প্রবাসী ৫. রুকুকারী ৬. সেজদাকারী ৭. সৎকাজে আদেশ দানকারী ৮. অসৎকাজে নিষেধকারী ৯. আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া সীমা রক্ষাকারী ১০.বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দানকারী। দশটি সুস্বভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে সুরা আহযাবে। যেমন, মুসলমান নরনারী, মু'মিন নরনারী, অনুগত নরনারী, সত্যবাহী রমণী পুরুষ, ধৈর্যধারণকারী ও কারিনী, বিনয়ী ও বিনয়িনী, দানশীল ও দানশীলা, রোজা পালনকারী ও কারিনী, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী ও কারিনী, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র স্মরণকারী ও কারিনী।

অন্য দশটি শুভস্বভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে সুরা মু'মিনুনে। বলা হয়েছে, 'মুমিনগণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা তাদের নামাজে বিনম্র, অনর্থক কর্ম থেকে বিমুখ। যারা জাকাত প্রদান করে, স্ত্রী ও অধিনস্থ ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে লজ্জাস্থান হেফাজত করে। বৈধ স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ছাড়া যারা অন্যদেরকে কামনা করে—তারা সীমালংঘনকারী। আর যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষণাবেক্ষণকারী, নামাজের হেফাজতকারী, যারা যাঞ্চায় অনভ্যস্ত এবং যারা যাঞ্চাপ্রবণ নয়। তাদের অধিকার স্বীকৃত হয়, যারা প্রতিফল দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং যারা আপন প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।

তাউস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম দশটি বিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। বিষয়গুলো শুভ স্বভাবের অনুকূলে। গলদেশ থেকে মস্তক পর্যন্ত পাঁচটি। যেমন— ১. গোঁফকর্তন ২. কুলি করা ৩. নাকে পানি দেয়া ৪. মেসওয়াক করা ৫. মস্তকের কেশকর্তন। অবশিষ্ট শরীরের সঙ্গে আর পাঁচটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। যেমন— ১. নখ কাটা ২. বগলের চুল উপড়ে ফেলা ৩. নাভির নিম্নদেশের চুল কামিয়ে ফেলা ৪. খতনা করা ৫. পানি দ্বারা শৌচকার্য সমাধা করা। বর্ণনাকারী তাউস এবং কাতাদা বলেছেন, কালিমাত অর্থ, হজের অনুষ্ঠানসমূহ। হাসান বলেছেন, কালিমাতের উদ্দেশ্য সাতটি বস্তু। যেগুলোর মাধ্যমে তিনি পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে তিনটি হচ্ছে—চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র—যেগুলোর প্রতি তিনি গভীর অভিনিবেশের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আমার প্রতিপালক অক্ষয় ও চিরভাস্বর। ৪. নমরুদের অগ্নিকুন্ডবাসে তিনি ছিলেন চরম ধৈর্যশীল। ৫. হিজরত ৬. পুত্র কোরবানী ৭. খতনা।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, কালিমাত অর্থ—হজরত ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের দোয়া (রব্বানা তাক্বাবাল মিন্না.......)। কাবা গৃহ নির্মাণের প্রাক্কালে পিতা পুত্র আল্লাহ্পাকের সমীপে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন। ইয়ামান বিন রুবাব

বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের যে বাদানুবাদ হয়েছিলো, তাকে এখানে কালিমাত বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু কালিমাত।

আমি বলি, এখানে এমতোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত যাতে উপরোক্ত সকল বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়। মোটকথা, কালিমাত অর্থ যাবতীয় আদেশ নিষেধ। ত্রিশ, দশ, সাত, সকল বর্ণনাই এর অন্তর্ভূক্ত।

পরীক্ষাসমূহ পূর্ণ করার পর আল্লাহ্পাক ঘোষণা করলেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা (ইমাম) মনোনীত করলাম। কালিমাত থেকে ইমামাত (নেতৃত্ব) এবং কাবা শরীফের পবিত্রতার অর্থ গ্রহণ করা যায়। কাবা শরীফের নির্মাণ, ইসলামের সকল আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদিও কালিমাত এর পর্যায়ভূত। এখানে ইমামাত অর্থ নবুয়ত অথবা সাধারণ নেতৃত্ব। তিনিই ইমাম যিনি অনুসরণীয়। যার আনুগত্য অপরিহার্য। অবশ্য রাজত্ব বা নেতৃত্ব কোনো নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহারযোগ্য নয়, যেমন ইমামিয়ারা করেছে। শরিয়ত এবং ইমামতের বিধান তাদের ধারণাকে সমর্থন করে না। আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে বিশ্ববিশ্রুত সাধারণ ইমামত দান করেছেন। নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. কেও আল্লাহ্পাক এরকম নির্দেশ করেছেন।

'ইত্তাবিয়ু মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানিফা' (আপনি ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুসরণ করুন––যা হানীফ)। হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্পাকের সমীপে নিবেদন জানিয়েছিলেন, আয় আল্লাহ্! আমার অধঃস্তন বংশধরদের মধ্য থেকেও ইমাম মনোনীত করুন। আল্লাহ্পাক শর্ত সাপেক্ষে সেই নিবেদন গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, ইমামত হবে কেবল মুত্তাকীদের জন্য। যারা সীমালংঘনকারী তাদের প্রতি আমার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

যদি ইমাম অর্থ নবী গ্রহণ করা হয়, তবে জালেম (সীমালংঘনকারী) অর্থ হবে ফাসেক। কেনোনা এটা ঐকমত্য যে, নবীগণ নিষ্পাপ। আর যদি ইমামত অর্থ ধরা হয় সাধারণ নেতৃত্ব —তা'হলে জালেম শব্দটির অর্থ হবে কাফের (অবিশ্বাসী)। কারণ কাফেরকে নেতা বা আমীর নির্ধারণ করা সিদ্ধ নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ফাসেক নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তবে জুলুম ও পাপের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য অসিদ্ধ। কেনোনা রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। হজরত ইমরান ও হজরত হাকেম বিন ইমরান গিফারী থেকে মালেক ও আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী থেকে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে অন্য কারো আনুগত্যই কাম্য নয়। অনুগত হতে হবে কেবল সৎকাজের বেলায়। কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহ্র অনুসরণ করো, রসুলের অনুসরণ করো আর অনুসরণ করো তার, যিনি তোমাদের আমীর। রসুল পাক স. বলেছেন, হাবসী দাসও যদি তোমাদের আমীর হয়, তবুও

তার অনুগত হও এবং তার কথা মান্য করো। এসকল বিবরণের মর্ম হচ্ছে, শরিয়ত বিরুদ্ধ আনুগত্য সম্পূর্ণ অবৈধ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরলোকের প্রতি প্রত্যয়শীল হও, তবে তোমাদের পারস্পরিক বিরোধ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি সমর্পণ করো। এসকল ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ইমাম অথবা আমীরের নিষ্পাপ হওয়া অনিবার্য নয়; যেমন ধারণা রাখে রাফেজীরা। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৫

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○

❑ এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির তীর্থ ক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইব্রাহীম ও ইস্মাইলকে আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, এতেক্বাফকারী, রুকু ও সেজ্দাকারীদের জন্য পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম।

'আল বাইত' অর্থ গৃহ কিন্তু এখানে অর্থ হবে কাবা গৃহ—যেমন 'আন্নুজুম' অর্থ তারকা হলেও আসল অর্থ সপ্তর্ষিমন্ডল। কাবাগৃহ একটি সম্মেলনস্থল। মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র। সকল স্থানের মানুষ এখানে পুণ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয়। হজ, ওমরাহ্, নামাজ ইত্যাকার নানাবিধ ইবাদত সম্পাদন করে। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, মসজিদে হারামের এক রাকাত নামাজ অন্যত্র সম্পাদিত একলক্ষ রাকাত নামাজের সমান। আয়াতে কাবা গৃহকে তীর্থস্থান বলার পর নিরাপত্তাস্থানও বলা হয়েছে। এখানকার সকল অধিবাসীরাই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। ইসলাম প্রচারের পূর্বেও মক্কার পৌত্তলিকেরা সেখানকার সকল মানুষকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করতো। বলতো, এরা আল্লাহ্র পরিবার। কাজেই এদের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন রাখতে হবে। তারা অবশ্য মক্কা শরীফের বাইরের লোকদের প্রতি ছিলো আক্রমণপ্রবণ। অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তারা কি দেখে নাই আমি হেরেমকে শান্তিধাম করেছি। অথচ তারা চর্তুপার্শ্বস্থ লোকদেরকে আক্রমণ করে।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, 'যখন আল্লাহ্পাক আকাশ ও পৃথিবী সৃজন করেছেন তখন থেকেই মক্কা নগরী হারাম (মর্যাদাশালী) রূপে বিভূষিত।' কিয়ামত

পর্যন্ত এই মর্যাদা থাকবে অটুট। সেখানে কারো জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সিদ্ধ নয়। শুধু আমার জন্য দিনের কিছুক্ষণ যুদ্ধ করা সিদ্ধ ছিলো, এরপর কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে। সেখানকার কাঁটাও অপসারণ করা যাবে না, শিকার তাড়ানো যাবে না। সেখানকার কোনো পরিত্যক্ত বস্তু হস্তগত করা যাবে না, তবে সেই হারানো বস্তু প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরৎ দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যাবে। সেখানকার তৃণও কর্তন করা যবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! দয়া করে আজখার নামক ঘাস এই নিদের্শের বাইরে রাখুন। কারণ, তা কর্মকারদের প্রয়োজনে আসে এবং বহুবিধ সাংসারিক কর্মে ব্যবহৃত হয়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরূপ বিবরণ এসেছে।

নির্দেশ হয়েছে—'তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ করো'। হজরত ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থানের নাম 'মাকামে ইব্রাহিম'। তাওয়াফ শেষে যে নামাজ পাঠ করতে হয়, সেই নামাজ পড়তে বলা হয়েছে মাকামে ইব্রাহিমে। হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, আমরা একবার রসুল স. এর সহগামী হয়ে কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। তিনি স. রোকনে চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করলেন। দ্রুত পদক্ষেপে তিনবার এবং শ্লথ পদক্ষেপে চারবার কাবা প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফ শেষ করলেন। তারপর মাকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন 'ওয়াত্তাখিজু মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসাল্লা (তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো)। এরপর তিনি সেখানে নামাজ পাঠ করলেন। সে সময়ে মাকামে ইব্রাহিম ছিলো কাবা গৃহ ও তাঁর মাঝখানে। ইমাম নাখ্ঈ বলেছেন, সমগ্র হেরেম শরীফই মাকামে ইব্রাহিম। আয়াতে বলা হয়েছে 'মীম মাকাম', মাকামের সঙ্গে মিম সংযুক্ত হওয়ায় এর অর্থ হবে আংশিক মাকাম (স্থান), অথবা মাকামে ইব্রাহিম অর্থ মসজিদে হারাম (মসজিদ চত্ত্বর)। ইবনে ইয়ামানী একথা বলেছেন। হজ প্রতিপালনের স্থানসমূহকেও মাকামে ইব্রাহিম বলা যেতে পারে। যেমন আরাফাহ্, মুজদালিফা ইত্যাদি। যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহিম কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন ওই পাথরটিকেও মাকামে ইব্রাহিম বলা যায়। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসে একথা প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—মাকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে নামাজের স্থান নির্ধারণ করো।

কোরআন মজীদের আদেশসূচক বাক্যসমূহের লক্ষ্য উম্মতে মোহাম্মদী। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্রে আমার ধারণা আল্লাহ্পাকের বিধানের অনুরূপ হয়েছে। একটি হচ্ছে— আমি নবীপাক স. এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি যদি মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান নির্ধারণ করতে পারতাম তবে কতই না উত্তম হতো। সেই মুহূর্তেই অবতীর্ণ

হলো 'মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসাল্লা'। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—আমি একবার আরজ করলাম, হে আমার প্রিয়তম নবী, আপনার নিকট বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সমাগম হয়, কতই না সুন্দর হতো যদি আপনি উম্মতের জননীগণকে পর্দার নির্দেশ দিতেন। একথা বলার পরক্ষণে অবতীর্ণ হলো পর্দার নির্দেশসম্বলিত আয়াত। তৃতীয়টি হচ্ছে আমি একবার বুঝলাম, রসুলপাক স. তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি রুষ্ট। আমি তখন তাঁর সহধর্মিণীগনের নিকটে যেয়ে বললাম, আপনারা আপনাদের আচরণ সম্পর্কে সংযমী হোন। অন্যথায় আল্লাহ্পাক রসুলুল্লাহ্কে আপনাদের চেয়েও উত্তম সহধর্মিণী দান করবেন। আমার একথার পর অবতীর্ণ হলো—'আর নবী যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে অনতিবিলম্বে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম সঙ্গিনী দান করবেন। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াত থেকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক উদ্ভাবন করেছেন—প্রতি তাওয়াফের পর দু'রাকাত নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। হুকুমটি ফরজ হওয়ারই কথা। যেহেতু কোরআনে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বলে এবং খবরে ওয়াহিদ (এককবর্ণিত হাদিস) কর্তৃক এ সম্পর্কে বিবরণ এসেছে বলে এই দু'রাকাত নামাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে ওয়াজিব বলে। রসুলপাক স. এর আমল দ্বারা এই দু'রাকাত নামাজ ওয়াজিব বলেই প্রতিপন্ন হয়। তাওয়াফের পর তিনি এই দু'রাকাত নামাজ পড়তেনই। এ নামাজ তাঁকে কখনোই পরিত্যাগ করতে দেখা যায়নি। আর নবীপাক স. এর অপরিহার্য আমল উম্মতের জন্য ওয়াজিব। তাছাড়া তিনি হজের প্রাক্কালে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি কীভাবে হজ করি তা লক্ষ্য করো এবং হজের পদ্ধতি শিখে নাও। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন—রসুলপাক স. হজ এবং ওমরার সময়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করতেন (সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করতেন)। দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করতেন তিনবার এবং ধীরলয়ে চারবার। এরপর দু'রাকাত নামাজ পড়ে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতেন। বোখারী, মুসলিম। বোখারী শরীফে সনদবিহীন একটি হাদীসে বলা হয়েছে, ইসমাইল বিন উমাইয়া বলেন, আমি জুহ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আতা বলে থাকেন তাওয়াফের দু'রাকাত নামাজের পরিবর্তে ফরজ নামাজই যথেষ্ট, তবে সুন্নতের অনুসারী হওয়া উত্তম। রসুলপাক স. তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামাজ অবশ্যই আদায় করতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত নামাজ পাঠের নির্দেশটি মোস্তাহাব প্রকৃতির। এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম মালেকেরও অভিমত এরকম। ইমাম শাফেয়ী থেকেও দু'টি অভিমতের বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও নির্দেশটি যে ওয়াজিব প্রকৃতির—একথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আদেশসূচক বাক্যের মাধ্যমে ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। যদি এক্ষেত্রে কখনো কোনো প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হয় তবে মোস্তাহাব হিসেবে মেনে নেয়া যেতে পারে। তাওয়াফের পরের এই দু'রাকাত

নামাজ অন্যান্য মসজিদে অথবা মসজিদ ছাড়া যে কোনো স্থানে পাঠ করা যাবে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ এর বিরোধিতাও করেছেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুলপাক স. একবার হজরত উম্মে সালমাকে বললেন, যখন ফজরের জামাত সমাপ্ত হয় এবং পরে আগমনকারীরা নামাজরত থাকে, তখন তুমি উষ্ট্রারোহিনী হয়ে তাওয়াফ সেরে নিও। হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি সেরূপই করেছি। তাওয়াফ শেষে সেখানে নামাজ পড়িনি—সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। সনদ ব্যতিরেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন—হজরত ওমর তাওয়াফের দু'রাকাত নামাজ হেরেম শরীফের বাইরে জী তুয়াতে আদায় করেছেন।

আমি বলি, আচার অনুষ্ঠান সহজসাধ্য করার জন্য সরলতর পরিবেশ সৃষ্টি করাই বাঞ্ছনীয়। নামাজের জন্য যদি কোনো স্থানকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়, তবে সংকীর্ণতার কারণে নামাজীরা সেখানে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন। এ রকম প্রতিবন্ধকতা সহজসাধ্যতার নিবারণকারী। আল্লাহ্পাকের বিধানের সঙ্গে সংকীর্ণতার সংশ্রব পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন বলা হয়েছে, তোমরা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদত করো। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন—নিয়তই প্রতিটি কর্মের ভিত্তি। বর্ণিত আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে—নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সকল ইবাদতই বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পাদিত হতে হবে। নামাজ এবং হজের নিয়ত করতে হবে আমলের প্রারম্ভে। জাকাতের ক্ষেত্রে দেয় জাকাত পৃথক করার পর নিয়ত করতে হবে। রোজার নিয়ত করতে হবে সেহেরীর সময়। ইমাম আবু হানিফার মতে প্রাতঃরাশের সময় পর্যন্ত। লক্ষ্যণীয় যে, কোনো ক্ষেত্রেই সময় বা স্থানের সীমাবদ্ধতাকে অপরিহার্য করা হয়নি। তাওয়াফের নামাজও এমনি সংকীর্ণ অর্থে না ধরে এরকম ধরা উচিৎ যে, ওই নামাজের স্থান মাকামে ইব্রাহিম ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ। কোরআনের দাবীও এ রকম। এই নামাজ মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়া যেতে পারে। কারণ, সমগ্র মসজিদ চত্বরই মাকামে ইব্রাহিম সন্নিহিত। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'মসজিদে হারামকে আমি অবস্থানকারী (এত্তেক্বাফকারী) ও দূরবর্তীদের জন্য সমান করে দিয়েছি।' আরো এরশাদ করেছেন, 'এ বিধান তাদের জন্য, যারা মসজিদে হারামের অধিবাসী নয়।' আর হজরত ওমর জী তুয়াতে যে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন, সম্ভবত তা ছিলো কোনো জরুরী প্রেক্ষিতে।

'নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ করো' (ওয়াত্তাখিজু)—এই বাক্যটির ব্যাখ্যা এরকম করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মাকামে ইব্রাহিমের উল্লেখ স্থান নির্দিষ্টকরণের জন্য নয়- বরং সাধারণ অর্থে অনুকূল পরিবেশ সাপেক্ষে এরকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন ভীড় থাকতো না এবং মাকামে ইব্রাহিমে নামাজ পাঠ প্রতিবন্ধকতাহীন ছিলো, তখনকার পরিস্থিতি ছিলো আয়াতের লক্ষ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের পালক সন্তান যা তোমাদের ক্রোড়ে বিদ্যমান'—

এখানে ক্রোড়ে বিদ্যমান অর্থ, সার্বক্ষণিক ক্রোড়ে অবস্থান নয়, বরং সন্তান সাধারণত ক্রোড়ে অবস্থান করে বলেই এরকম বাকভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বর্ণনা করেছেন- হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী এবং প্রিয় পুত্রকে জনশূন্য মক্কায় রেখে চলে গেলেন। কিছুদিন পর বনী জুরহাম গোত্রের লোকেরা সেখানে এসে বসবাস শুরু করলো। যৌবনপ্রাপ্তির পর হজরত ইসমাইল বনী জুরহাম গোত্রের এক রমণীর পানি গ্রহণ করলেন। তখন হজরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরা ও হজরত ইসমাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিবি সারার অনুমতি চাইলেন। বিবি সারা অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলেন যে, তিনি (হজরত ইব্রাহিম) তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করতে পারবেন না। হজরত ইব্রাহিম মক্কা শরীফে পৌঁছে শুনলেন, হজরত হাজেরা ইন্তেকাল করেছেন। তিনি তখন হজরত ইসমাইলের গৃহে পদার্পণ করলেন। কিন্তু তাঁকে পেলেন না। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাইল কোথায়? বধূ বললেন, শিকারে গিয়েছেন। হজরত ইসমাইল হেরেম শরীফের বাইরে মাঝে মাঝে মৃগয়ায় যেতেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, পানাহারের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? বধূ বললেন, না। ঘরে কিছুই নেই। সংসারে খুব অনটন। অতি কষ্টে দিন যাপন করতে হয় আমাদেরকে। হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমার স্বামী মৃগয়া থেকে ফিরে এলে তাঁকে আমার সালাম জানিও এবং বোলো সে যেনো তাঁর দরোজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে। একথা বলে বিদায় নিলেন হজরত ইব্রাহিম। হজরত ইসমাইল মৃগয়া থেকে ফিরে এসে টের পেলেন সমস্ত গৃহ সুবাসিত। বুঝলেন, তাঁর মহান পিতার শুভাগমন ঘটেছিলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে কে এসেছিলেন? স্ত্রী তিক্ত স্বরে বলে উঠলো, এক অচেনা বৃদ্ধ। হজরত ইসমাইল বললেন, তিনি কিছু বলেছেন কি? স্ত্রী বললো, হ্যাঁ! ঘরের চৌকাঠ বদলে ফেলতে বলেছেন। হজরত ইসমাইল বললেন, তিনি আমার মহানুভব জনক। তিনি আমাকে তোমার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আমি তোমাকে তালাক দিলাম। এবার তুমি পিতৃগৃহে গমন করো। এরপর হজরত ইসমাইল ওই গোত্রেরই অন্য এক রমণীকে বিয়ে করলেন। কিছু দিন পর বিবি সারার অনুমতি নিয়ে হজরত ইব্রাহিম পুনরায় হজরত ইসমাইলের গৃহে উপস্থিত হলেন। সে দিনও হজরত ইসমাইল গৃহে ছিলেন না। হজরত ইব্রাহিম নববধূকে বললেন, তোমার স্বামী কোথায়? বধূ বললেন, মৃগয়ায়। মনে হয় তিনি এক্ষুণি এসে পড়বেন। আল্লাহ্ যেনো তাই করেন। আপনি বরং নেমে এসে উপবেশন করুন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আহারের আয়োজন আছে কি? বধূ বললেন, হ্যাঁ। অনেক কিছু আছে। বলেই তিনি দুধ এবং গোশ্‌ত নিয়ে এলেন। সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞেস করাতে বললেন, আল্লাহ্ পাকের কৃপায় আমরা স্বচ্ছন্দ। হজরত ইব্রাহিম সংসারে অধিকতর বরকত বর্ষণের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া

করলেন। সে সময় যদি তাঁর সামনে গম বা যবের রুটি বা খেজুর উপস্থিত থাকতো, তবে প্রার্থনার বদৌলতে মক্কায় অত্যধিক গম, যব বা খেজুর উৎপাদিত হতো। নববধূ নিবেদন করলেন, বাহন থেকে অবতরণ করুন। আমি আপনার মস্তক ধৌত করে দেই। হজরত ইব্রাহিম অবতরণ করলেন না। তখন বধূ নিয়ে এলেন মাকামে ইব্রাহিম নামে খ্যাত সেই পাথর। ডান পাশে রাখলে হজরত ইব্রাহিম সে পাথরে ডান পা স্থাপন করে মস্তক হেলিয়ে দিলেন। বধূটি তাঁর পবিত্র মস্তকের ডানদিক ধুইয়ে দিলেন। এরপর পাথর নিয়ে এসে রাখলেন বাম পাশে। হজরত ইব্রাহিম তার উপর বাম পা রেখে সেদিকে মাথা ঝুঁকালেন। বধূটি তখন মস্তকের বাম পাশ ধুইয়ে দিলেন। তখন পাথরে অংকিত হলো তাঁর পবিত্র পদচ্ছাপ। বিদায়ের প্রাক্কালে হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমার স্বামী গৃহে এলে আমার সালাম জানিয়ে বোলো দরোজার চৌকাঠটি উপযুক্ত। এটি যেনো সে না বদলায়। হজরত ইসমাইল ফিরে এসে পিতৃ শুভাগনের সুবাসে বিমোহিত হলেন। স্ত্রীকে বললেন, বাড়িতে কোনো মহান অতিথি এসেছিলেন কি? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। এক সৌম্যদর্শন প্রবীণ অতিথি শুভাগমন করেছিলেন। এরপর সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে পাথরটির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, দেখুন। প্রস্তরোপরি অংকিত রয়েছে তাঁর পবিত্র পদচিহ্ন। হজরত ইসমাইল বললেন, ওই মহামান্য অতিথি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা হজরত ইব্রাহিম। যে চৌকাঠটি তিনি বদলে ফেলতে নিষেধ করেছেন, সেই চৌকাঠটি হচ্ছো তুমি। তিনি আজ্ঞা করেছেন, আমি যেনো তোমাকে ধরে রাখি।

কিছুদিন পর হজরত ইব্রাহিম মক্কায় পুনরাগমন করলেন। হজরত ইসমাইল তখন যমযম কূপের পাশে বসে তীর প্রস্তুত করছিলেন। পিতাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সালাম বিনিময় হলো। হজরত ইব্রাহিম প্রিয় পুত্রের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন, বৎস! আল্লাহ্‌পাক আমার প্রতি নির্দেশ করেছেন, যেনো তুমি আমার সহায়তাকারী হও। হজরত ইসমাইল বললেন, হে আমার মহান পিতা! আজ্ঞা করুন। পিতা বললেন, আল্লাহ্‌পাক একটি গৃহ প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুত্র বললেন, আলহামদু লিল্লাহ্‌। এরপর পিতা-পুত্র মিলে কাবাগৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। পাথর এনে দিতে লাগলেন পুত্র। গাঁথুনী নির্মাণ করতে থাকলেন পিতা। যখন দেয়াল উঁচু হলো, তখন পুত্র এনে স্থাপন করলেন ওই পাথরটি, যার নাম 'মাকামে ইব্রাহিম।' পিতাপুত্রের যৌথ উদ্যোগে এভাবে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো কাবা শরীফের দেয়াল। তাঁরা দু'জনে প্রার্থনা জানালেন, 'রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম।' হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, রোকন এবং মাকামে ইব্রাহিম জান্নাতের একটি ইয়াকুত পাথর। হজরত আনাস থেকে ইমাম মালেক মারফু পদ্ধতিতে এই বিবরণটি দিয়েছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, রোকন এবং মাকামে ইব্রাহিম জান্নাতের ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ্পাক পাথর দু'টির জ্যোতি নিষ্প্রভ করে রেখেছেন। যদি এরূপ না করা হতো তবে পূর্ব পশ্চিম উভয় দিগন্ত আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। বর্ণিত আয়াত থেকে মহান ব্যক্তিবর্গ এমতো ধারণা পোষণ করেন যে, আল্লাহ্র অলিগণ যে স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন, সে স্থানের নিসর্গে বরকত ও সাকিনা (শান্তি) অবতীর্ণ হয়। যদ্দরুণ অন্তঃকরণ আল্লাহ্পাকের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। সে স্থানে সৎকর্ম করলে দ্বিগুণ পুণ্য অর্জিত হয় এবং পাপকর্মের ফলে জমা হয় দ্বিগুণ শাস্তি।

'পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম'—এই বাক্যটি পবিত্র-পিতা পুত্রের প্রতি আল্লাহ্পাকের একটি অনুগ্রহরঞ্জিত নির্দেশ। কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর) বলার উদ্দেশ্য, গৃহটিকে অধিকতর মর্যাদামন্ডিত করা। আল্লাহ্পাক স্থানাতীত, কালাতীত। তাই বায়তুল্লাহকে পবিত্র রাখার আদেশ দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাওহীদ ও পবিত্রতার উপর যেনো নিশ্চিত করা হয় এর নির্মিতি। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের ও আতা বলেছেন, নির্দেশটির অর্থ হচ্ছে, মিথ্যাচার, বিগ্রহবন্দনা ও অশ্লীলতা থেকে গৃহটি মুক্ত রাখো। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, সুগন্ধিদ্রব্য প্রজ্বলিত করো এবং বেশী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখো।

যাদের জন্য কাবা গৃহকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা হচ্ছেন—তাওয়াফকারী, রুকু ও সেজদাকারী (নামাজ পাঠকারী) এবং এতেক্বাফকারী (অবস্থানকারী)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৬

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

❐ স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! ইহাকে নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করিবে তাহাদিগকে ফলাহার করিতে দিও।' তিনি বলিলেন, 'যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিব। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।'

নিরাপদ শহর অর্থ শান্তির ঘর, শান্তির আলয় বা শান্তিধাম। এই শান্তির শহর মক্কায় যারা বস বাস করবে তারা নিরাপদ। মক্কা ছিলো পাহাড়বেষ্টিত, সন্নিহিত ভূমি ছিল ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী মরুভূমি—তাই হজরত ইব্রাহিম আহার্য বস্তুরূপে ফলমূল প্রার্থনা করেছিলেন। একটি অসমর্থিত উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বে তায়েফ নগরী ছিল সিরিয়ায়। হজরত জিব্রাইল সেখান থেকে নগরীটি নিয়ে এসে মক্কার অনতিদূরে স্থাপন করেন। তায়েফে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল উৎপাদিত হয় এবং সেগুলো বাজারজাত হয় মক্কায়। হজরত ইব্রাহিমের প্রার্থনার বদৌলতে মক্কা শান্তির শহর হয়েছে এবং আজও সেখানে আহার্যরূপে প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়। তাঁর দোয়ার অন্তর্ভূত ছিলেন কেবল বিশ্বাসীরা। তাদের শান্তি ও রিজিকের জন্য ছিলো তাঁর প্রার্থনা। উদ্দেশ্য ছিলো মক্কাবাসীরা যেনো কাফের বা অবিশ্বাসী না হয়। প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্য থেকে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মক্কাবাসী নিরাপত্তা লাভ করবে ও রিজিকপ্রাপ্ত হবে। এতে বুঝা যায়, পার্থিব সুযোগ সুবিধা মুমিন ও কাফের উভয়েরই জন্য। আল্লাহ্পাকের এক নাম 'রহমান'। পৃথিবীবাসী সকলের জন্যই তিনি রহমান (দয়ালু)। রহীম শব্দের অর্থও দয়ালু। কিন্তু এই দয়া বন্টিত হবে আখেরাতে এবং তা পাবে কেবল বিশ্বাসীরা। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের মতো পার্থিব সকল সুবিধা পেলেও তারা কখনো নবুয়ত ও ইমামত লাভ করবে না। এই অনুগ্রহ কেবলই বিশ্বাসীদের জন্য।

'যে সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব'—এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায় পারলৌকিক অর্জনের তুলনায় পার্থিব অর্জন অত্যন্ত অপ্রতুল। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্পাকের নিকট পার্থিব সাফল্য মূল্যহীন। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন– যদি আল্লাহ্পাক এ বিশ্বজগতকে মাছির ডানার মতো মূল্যবানও মনে করতেন তবে তিনি অবিশ্বাসীদিগকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না। হজরত সহল বিন সাদ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসের কারণে পার্থিব জীবনে অধিক নেয়ামত ভোগ করে, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। পার্থিব ভোগোন্মত্ততা আল্লাহ্পাকের নিকট ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত। সম্ভবত সে কারণেই অবিশ্বাসীরা বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকার পায়। আল্লাহ্পাক তাই ঘোষণা করেছেন, যদি মানব সম্প্রদায় একই বংশভূত না হতো, তবে যারা নিরেট অবিশ্বাসী তাদের গৃহের ছাদ ও সিঁড়ি হতো রৌপ্যনির্মিত। দরোজাগুলোও হতো সেরকম। তারা তাদের মূল্যবান গৃহে তখতে হেলান দিয়ে থাকতো। এ সমস্ত হচ্ছে পার্থিব ভোগলালসার উপকরণ। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবী অভিশপ্ত। আল্লাহ্পাকের জিকির বা জিকির সম্পর্কিত জ্ঞান—এ জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতিরেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইব্নে

মাজা। তিবরানী তাঁর আওসাত এবং কবীরে বিশুদ্ধ সনদে হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। পুস্তকদ্বয়ে এরকম বলা হয়েছে, যে সকল উপকরণ দ্বারা আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ অর্জন করা যায়, সেগুলো ছাড়া অন্য সকলকিছুই অভিশপ্ত। অবিশ্বাসীদেরকে জোর করে দোজখের দিকে ঠেলে দেয়া হবে। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো। মুজাহিদ বলেছেন, মাকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ ছিলো যে, 'আমি আল্লাহ্ মক্কার মালিক। যে দিন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছি, সেদিন আমি মক্কাকেও সৃষ্টি করেছি। পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকেই আমি মক্কাকে করে রেখেছি মর্যাদামন্ডিত। সাতজন ফেরেশতার মাধ্যমে আমি মক্কার রক্ষণাবেক্ষণ করি। তিনটি পথে এখানে রিজিক উপস্থিত হয়। এখানকার পানি ও গোশ্‌ত বরকতময়।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৭, ১২৮

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

❒ যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।'

❒ 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের উভয়কে একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত এক উম্মত করিও। আমাদিগকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

হজরত ইব্রাহিম ছিলেন কাবা নির্মাতা এবং তার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল ছিলেন নির্মাণসহকারী। এ কারণেই আয়াতে তাঁদের নাম পাশাপাশি উল্লেখিত না হয়ে কিঞ্চিত ব্যবধানে উল্লেখিত হয়েছে। নির্মাতাকে প্রাধ্যান্য দেয়াই এ রকম বাক ভঙ্গির উদ্দেশ্য। বিবরণভঙ্গিটি এখানে নিত্যবৃত্ত অতীতের।

বাগবী বলেছেন, জগত সৃষ্টির দু'হাজার বৎসর পূর্বে কাবা গৃহের নির্ধারিত স্থান সৃজিত হয়েছে। স্থানটি শুভ্র ফেনপুঞ্জরূপে পানিতে ভাসমান ছিলো। ওই

ফেনপুঞ্জের তলদেশে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় মাটি। হজরত আদম পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করে বিজন জঙ্গলবেষ্টিত পরিবেশ দেখে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য কামনা করলেন। আল্লাহ্‌পাক তখন ইয়াকুত মর্মর নির্মিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমমুখী জমরূদ নির্মিত দরোজাবিশিষ্ট বায়তুল মামুরকে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়ে দেন। এবং তা স্থাপন করেন বায়তুল্লাহ্‌র স্থানে। নির্দেশ জারী করেন, 'হে আদম। জান্নাতে যেমন তুমি এই ঘরের তাওয়াফ করতে তেমনি এখানেও তাওয়াফ করো, সেখানে যেমন নামাজ আদায় করতে এখানেও তেমনি নামাজ আদায় করো।' বায়তুল মামুরের সাথে সাথে হাজারে আস্‌ওয়াদকেও পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়। সে সময়ে পাথরটি ছিলো শুভ্র ও জ্যোতির্ময়। অন্ধকার যুগের অপবিত্রা এক নারীর স্পর্শে পাথরটি হয়ে পড়ে জ্যোতিহীন, কৃষ্ণ।

আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ পেয়ে হজরত আদম হিন্দুস্থান থেকে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। এক ফেরেশ্‌তা ছিলেন তাঁর পথ প্রদর্শক। মক্কায় পৌঁছে তিনি প্রথমে হজ সমাধা করলেন। ফেরেশতারা বললেন, আপনার হজ কবুল হয়েছে। আমরা দু'হাজার বৎসর আগেই এ গৃহে হজ সমাধা করেছি।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন– হজরত আদম ভারত থেকে পদব্রজে চল্লিশবার হজ আদায় করেছেন। হজরত নুহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত বায়তুল মামুর কাবা শরীফের স্থলেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। প্লাবনলগ্নে তাঁকে চতুর্থ আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এখনো সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা আগমন করে এবং জিয়ারত শেষে ফিরে যায়। পুনঃ জিয়ারতের সুযোগ তাদের আর কোনো দিনও আসে না। মহাপ্লাবন শুরু হলে আল্লাহ্‌পাক হজরত জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন, হাজরে আসওয়াদকে প্লাবন থেকে রক্ষা করো। আবু কুবাইস পাহাড়ে পাথরটিকে প্লাবনস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখো। বায়তুল মামুরের শূন্যস্থানটি হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক কাবা নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত শূন্যই ছিলো। হজরত ইব্রাহিমের গৃহে যখন হজরত ইসমাইল এবং হজরত ইসহাক জন্মগ্রহন করলেন, তখন আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিমকে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। হজরত ইব্রাহিম জানতে চাইলেন– কোথায় হবে সেই মহান কাবার অবস্থান? আল্লাহ্‌পাক তখন অবতীর্ণ করলেন একটি সাকীনা-দ্বি-মস্তকবিশিষ্ট সর্পাকৃতির একটি তীব্র ঘূর্ণিবাত্যা। আল্লাহ্‌পাক জানালেন, এই সাকীনা যেখানে গিয়ে স্থির হবে সেই স্থানটিই কাবার স্থান। ঘূর্ণিবাত্যা চলতে চলতে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে স্থির হলো। সেখানেই হজরত ইব্রাহিম কাবা নির্মাণ শুরু করলেন। হজরত আলী এবং হাসানের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন– আল্লাহ্‌পাক অবতীর্ণ করেন একটি চলন্ত মেঘ। মেঘখন্ডটি নির্ধারিত স্থানের দিকে ভেসে চলছিলো। আর হজরত ইব্রাহিমও তাঁর ছায়ায় পথ চলছিলেন। মেঘখন্ডটি একস্থানে এসে স্থির হলো। হজরত ইব্রাহিম সেখানে দাঁড়ালেন। নির্দেশ এলো এখানেই গৃহ নির্মাণ করো।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নির্দেশে হজরত জিব্রাইল হজরত ইব্রাহিমকে কাবা শরীফের স্থান দেখিয়ে দিয়েছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস বলেছেন– হজরত ইব্রাহিম পাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবা নির্মাণ করেছিলেন। পাহাড়গুলো হচ্ছে- ১. হেরা, ২. সিনাই, ৩. সিরিয়ায় অবস্থিত লুবনান, ৪.জুদী এবং ৫.জায়তা। ভিত্তিস্থাপন হয়েছিলো হেরা পর্বতের পাথর দ্বারা। দেয়ালের গাঁথুনি যখন বর্তমানে রক্ষিত হাজরে আসওয়াদের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছলো তখন হজরত ইব্রাহিম বললেন, ইসমাইল! এখানে সুন্দর একটি পাথর স্থাপন করো, যাতে এদিকে তাওয়াফকারীদের অন্তর আকৃষ্ট হয়। হজরত ইসমাইল অনেক অনুসন্ধান করে একটি পাথর নিয়ে এলেন, কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের তা মনঃপুত হলো না। তিনি এর চেয়ে সুন্দর পাথর সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিলেন। পুনরায় অন্বেষণে লিপ্ত হলেন হজরত ইসমাইল। পাহাড়ে পাহাড়ে সুন্দর পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় আবু কুবাইস পাহাড় থেকে উচ্চারিত হলো- হে ইসমাইল! আপনার একটি গচ্ছিত সম্পদ রয়েছে আমার জিম্মায়। সম্পদটি নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন। হজরত ইসমাইল পর্বতাভ্যন্তর হতে পাথরটি নিয়ে কাবা শরীফের দেয়ালে রাখলেন। এভাবেই হাজরে আসওয়াদ পেলো তার যথা অবস্থান।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্পাক আকাশে একটি ঘর তৈরী করেছিলেন, তার নাম 'বায়তুল মামুর'। ফেরেশতাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, বায়তুল মামুরের ছায়া অবলম্বনে জমিনে একটি ঘর প্রস্তুত করো। কেউ বলেছেন, হজরত আদমই সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। মহাপ্লাবনের সময় সে ঘরের চিহ্ন মুছে গেলে হজরত ইব্রাহিম তা পুনঃনির্মাণ করেন।

কাবা নির্মাণকালে পিতা-পুত্র মিলে প্রার্থনা করেছিলেন– হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। অর্থাৎ হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি সর্বশ্রোতা তাই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো এবং সর্বজ্ঞাতা তাই আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তুমি সবিশেষ অবহিত। হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি তোমার সকল নির্দেশের প্রতি আমাদেরকে বিশুদ্ধ সংকল্পবিশিষ্ট ও পূর্ণসমর্পিত করে দাও। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, সেই প্রকৃত মুসলমান যার বাক ও রসনা থেকে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদ। একথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রকৃত মুসলমান সেই, যে পাপমুক্ত। যার দ্বারা অন্য মানুষের কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। ইসলামের প্রকৃত রূপ এরকমই। প্রবৃত্তি প্রশান্ত (মোতমাইন্না) হলেই কেবল এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।

আমার বংশধর থেকে তোমার অনুগত এক উম্মত সৃষ্টি করো– একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাঁর স্নেহসিক্ত প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে– কিন্তু সে প্রার্থনা সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য নয়। তাই 'মিন জুররিয়্যাতিনা

(আমার বংশধর থেকে) এরকম বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের সবাই বিশ্বাসী হবেন না। কেউ কেউ হবে কাফের।

'মানাসিকানা' অর্থ ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি। প্রধানতঃ হজের নিয়ম পদ্ধতি। 'নুছক্' শব্দের প্রকৃত অর্থ কঠোর উপাসনা। হজ শ্রমসাধ্য ইবাদত বলেই 'মানাসিক' শব্দের মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে হজ রূপে। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক পিতাপুত্রের এই প্রার্থনাও কবুল করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আরাফার দিনে হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমে হজের সকল অনুষ্ঠান শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরাফার মাঠে হজের নিয়মপদ্ধতি শিক্ষাদানের পর হজরত জিব্রাইল, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- আপনারা কি হজ অনুষ্ঠানের পরিচয় লাভ করেছেন। তাঁরা জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। সেদিন থেকে ওই স্থানের নাম হয় আরাফাহ্। যার অর্থ পরিচয় বা পরিচিতি।

আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও (ওয়াতুব আলাইনা) —এ কথার অর্থ আমাদের তওবা কবুল করো। নবী রসুলগণের এরকম প্রার্থনা পাপ থেকে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে নয়, কারণ তাঁরা পাপহীন। প্রার্থনার এরকম বাকভঙ্গির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ পাকের সকাশে চরমতম বিনয় প্রকাশ করা, উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং এ কথার সত্য সাক্ষ্য ঘোষণা করা যে— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু (তাওয়াবুর রহীম)।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১২৯

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিবে; তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াতটিও একটি পবিত্র প্রার্থনা। বলা বাহুল্য, এই প্রার্থনাও আল্লাহ্পাক মঞ্জুর করেছিলেন। যে মহান রসুলের জন্য ছিলো হজরত ইব্রাহিম আ.– এর আর্তি; সেই রসুল অবশেষে এসেছিলেন। তিনি হচ্ছেন–রহ্মাতুল্লিল আলামিন– হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ সাল্লাম।

তিনি এরশাদ করেছেন, হজরত আদম যখন মাটি ও পানিতে, আমি তখনও নবী। আমি হজরত ইব্রাহিমের প্রার্থনা, হজরত ঈসার ভবিষ্যত বাণী আর আমার সম্মানিতা মায়ের স্বপ্নফল। আমার জন্মের সময়ে আমার মা দেখেছিলেন আমার মধ্য থেকে এমন একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে; যার আলোকচ্ছটায় সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ এসে পড়েছে দৃষ্টিসীমানায়। শরহে সুন্নাহ্ গ্রন্থে বাগবী এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু উমামা থেকে ইমাম আহমদও এরূপ বলেছেন।

আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবেন– এখানে আয়াত অর্থ তওহীদ (এককত্ব) ও নবুয়তের নিদর্শনাবলী। হিকমত শিক্ষা দিবেন– এ কথার অর্থ মারেফাতে ইলাহী (আল্লাহ্ পরিচিতি) এবং শরিয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দিবেন। হিকমতের আরেক অর্থ সুন্নতে রসুল (রসুলের আদর্শ)। আরেক অর্থ তকদীর অথবা ইলমে ফিকাহ্ হওয়াও সম্ভব। তাদেরকে পবিত্র করবেন–এ কথার অর্থ মানুষকে শিরিক ও পাপ থেকে পবিত্র রাখবেন। কেউ কেউ বলেছেন, জাকাত আদায় করবেন। ইবনে ফিসল বলেছেন, তিনি কিয়ামতের দিন মানুষের ফাসেক হওয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে 'ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম।' হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আযীয অর্থ সমকক্ষতাহীন। কালাবী বলেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। কেউ কেউ বলেছেন, যিনি অজেয় তিনিই আযীয। কেউ আবার বলেছেন, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই যিনি বিজয়ী তিনিই আযীয। 'হাকীম' শব্দের অর্থ কুশলী। চরম কুশলী। সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানী। আল্লাহপাকই সমধিক অবগত।

হজরত ইবনে আসাকের বলেছেন–একবার হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালমা এবং মুহাজিরকে বললেন, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তোমরা তো জানোই তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমি ইসমাইলের বংশে একজন নবী প্রেরণ করবো যার নাম হবে আহ্মদ। সেই নবীকে যে বিশ্বাস করবে সে পথপ্রাপ্ত হবে। যে বিশ্বাস করবে না সে হবে অভিশপ্ত। পিতৃব্যের কথা শুনে সালমা মুসলমান হয়ে গেলেন। আর মুহাজির করলো অস্বীকার। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো–

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৩০, ১৩১, ১৩২

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَصّٰى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

❒ যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে। পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্যতম।

❒ তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বলিয়াছিল 'বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

❒ এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাঁহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, 'হে পুত্রগণ। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং, আত্মসমর্পণকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।'

মিল্লাতে ইব্রাহিম বা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত। এই অনন্যসাধারণ ধর্মমত অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, ইহুদী, খৃষ্টান সকলের নিকট সমাদৃত। যারা প্রকৃতার্থে নির্বোধ তারাই এই ধর্মমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে নির্বোধ সে ছাড়া কে এমন আছে, যে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ থেকে বিমুখ!'

'সাফিহা নাফ্সাহু' অর্থ, যে নিজেকে নির্বোধ করেছে। 'সাফিহা' শব্দের প্রকৃত অর্থ– চঞ্চল, অপরিণামদর্শী। লাভক্ষতির চিন্তা না করেই যে কর্মসম্পাদন করে, তাকেই বলে নির্বোধ (সাফিহা)। এই নির্বুদ্ধিতা কখনো সত্তাগত, কখনও মতাদর্শগত। যখন নির্বুদ্ধিতার কারণে অপমান, লাঞ্ছনা বা ধ্বংস অবধারিত হয়, অথবা আদর্শগত চাঞ্চল্য মূর্খতাকে প্রকট করে দেয়, তখন চঞ্চলমতি সেই ব্যক্তিকে রূপক অর্থে সাফিহা বা নির্বোধ বলা হয়। নির্বোধ ওই ব্যক্তি যে লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের মুখে নিজেকে ঠেলে দেয়। এজন্যে কোনো কোনো ভাষ্যকার এমতো অর্থ করেছেন যে, যে নিজের সত্তাকে লাঞ্ছিত করেছে সেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে। সে তখন প্রকৃত স্রষ্টাকে ছেড়ে তারই অনুরূপ অন্য কোনো সৃষ্টির উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। ইবনে কিসান এবং জুযাজ বলেছেন, 'সাফিহা নাফসাহু' এর অর্থ, স্বীয় সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ। যারা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করে তারা আপন অস্তিত্বের পরিচয় রাখে না। তাই বলা হয়েছে, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বদ আরাফা রব্বাহু (যে নিজেকে জানে সে তার প্রভূ প্রতিপালককে জানে)।

আমি বলি, 'মান আরাফা নাফসাহু' অর্থ, যে নিজে এই সত্য অবহিত হয়েছে যে, সে সম্ভাব্যের বৃত্তবাসী— সে তার অস্তিত্বের সংরক্ষক নয়। অস্তিত্ব, স্থিতি ও স্থায়ীত্ব – সকল কিছুই তার চিন্তার অতীত। আপন সত্তার প্রতি তার কোনো নির্ভরতা নেই। আল্লাহ্পাক যতোক্ষণ তাকে সংরক্ষণ করেন, ততোক্ষণই তার বিদ্যমানতা। আর সেই পরম সত্তা সম্ভাব্য জগতের আয়নায় প্রতিফলিত। প্রতিবিম্বরূপে বিরাজমান তিনিই গগনমন্ডল ও মেদিনীমন্ডলের নূর। সৃষ্টি তাঁর সত্তার যতোটুকু নিকটে, তিনি তদপেক্ষা অধিক সন্নিকটবর্তী। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। যিনি এই জ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনি মারেফাত (পরিচিতি) লাভ করেছেন। যে ব্যক্তি স্বীয় সত্তার এই অসহায়ত্বের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত সে তার পরমপ্রতিপালকের মারেফাত থেকে বঞ্চিত।

আল্লাহ্পাক একবার দাউদ আ. – কে বললেন, হে দাউদ! তুমি তোমার সত্তার অনুসন্ধান করো, তাহলে আমার পরিচয় লাভ করবে। হজরত দাউদ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আমার সত্তা ও আপনার পরিচয় লাভ করবো? আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার অক্ষমতা, দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে চিন্তা করো। সেই সাথে চিন্তা নিবদ্ধ করো আমার ক্ষমতা, স্থায়ীত্ব ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয় নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস- শরিয়তের পরিভাষায় সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অজ্ঞতা ও মূর্খতা এর বিপরীতার্থক বস্তু। জ্ঞান লাভ করার কয়েকটি উপায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দর্শন নির্ভর, আরেকটি দলিল প্রমাণ নির্ভর এবং আরেকটি ওহী (প্রত্যাদেশ) নির্ভর। এলহাম বা ওহীর প্রতিবিম্ব দ্বারাও কখনো কখনো জ্ঞান অর্জিত হয়। মারেফাত হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। মারেফাতবিদগণের কৃপাদৃষ্টিও মারেফাত লাভের মাধ্যম। মূর্খতা যেমন জ্ঞানের বিপরীত, তেমনি মারেফাত বা পরিচয়েরও পরিপন্থী। আলোচ্য আয়াতে সাফিহা শব্দের মাধ্যমে যে নির্বুদ্ধিতার কথা বলা হয়েছে, সেই মূর্খতা বা অজ্ঞতা মারেফাতের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় যে নির্বোধ বা নিজেকে নির্বোধ করেছে, একথার অর্থ দাঁড়াবে এরকম— যে দিব্যদৃষ্টিতে স্বীয় সত্তাকে চিনেনি।

পৃথিবীতে আমি তাঁকে মনোনীত করেছি— একথার অর্থ হবে, আমি তাঁকে (হজরত ইব্রাহিমকে) খলিল বা বন্ধু বলে সম্বোধন করেছি। আর তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত, বরং অন্যতম। 'সলিহিন' অর্থ সৎকর্মশীল হওয়া। সলেহ শব্দটি ফাসাদ শব্দের বিপরীত শব্দ। সলেহ শব্দের প্রকৃত অর্থ, অপরাধমুক্ত। হৃদয় অথবা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংক্রান্ত সকল অপরাধ থেকে মুক্ত। এই বিশুদ্ধতা নিষ্পাপ অবস্থাজাত। পাপ থেকে দূরত্ব যতো বাড়বে বিশুদ্ধতাও ততো অর্জিত হবে। বর্ণিত আয়াতে সলেহ অর্থ হবে, সলেহে কামেল বা পূর্ণ বিশুদ্ধতা। এই আয়াতটি যেনো পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতিধ্বনি বা প্রমাণ। সার বক্তব্য হচ্ছে এই

যে, যে ব্যক্তির মধ্যে এতাদৃশ গুণাবলী বিদ্যমান-- একমাত্র চঞ্চলমতি, নির্বোধ ও মূর্খ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর আনুগত্যবিমুখ হবে না।

আল্লাহ্‌পাক যখন তাঁকে (হজরত ইব্রাহিমকে) বলেছিলেন, 'আসলিম' (আত্মসমর্পণ করো)। তখন তিনি বলেছিলেন, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আতা বলেছেন, আসলিম অর্থ, সত্তা ও সত্তাজাত সকল ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করা। কালাবী বলেছেন, ধর্ম ও উপাসনারীতিকে বিশুদ্ধতার অলংকারে অলংকৃত করা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন পর্বত গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন আল্লাহ্‌পাক তাঁকে 'আত্মসমর্পণ করো' কথাটি বলেছিলেন। তাই আয়াতের মর্ম হবে– সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্‌পাক তাঁকে এমতো সম্বোধন করেছিলেন এবং তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর প্রতিপালকের নিকট সমর্পণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদি তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হও, তবে বুঝবে ইব্রাহিম আমার কতো প্রিয়।

হজরত ইব্রাহিমের সমর্পণের ঘোষণার প্রতিদান নির্ধারিত হলো এভাবে--নমরুদ তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চড়কের সাহায্যে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাৎ হজরত জিব্‌রাইল এসে বললেন, আমি কি আপনার প্রয়োজনে আসতে পারি? হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই। তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ্‌পাকের নিকট প্রার্থনা করুন। নবী ইব্রাহিম বললেন, তিনি আমাকে দেখছেন। সুতরাং প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্‌পাকের প্রতি তাঁর এই নির্ভরতা ও সমর্পণের বরকতে আল্লাহ্‌পাক অগ্নিকুন্ডকে তাঁর জন্য শান্তিদায়ক কুঞ্জে পরিণত করে দিলেন। দীর্ঘদিনের প্রজ্বলিত লেলিহান অগ্নি তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না।

হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইয়াকুব এই মর্মে তাঁদের পুত্রগণকে নির্দেশ (অসিয়ত) করেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ো না। শুভকর্মের নির্দেশ দানকে বলে অসিয়ত। অসিয়ত শব্দের প্রকৃত অর্থ মিলন। অসিয়তকারী তাঁর অসিয়তকে অসিয়তকৃতের সঙ্গে মিলিয়ে দেন বলে এ রকম নির্দেশ-উপদেশকে বলে অসিয়ত।

হজরত ইব্রাহিমের সন্তান ছিলেন আটজন। হজরত ইসমাইল ছিলেন হজরত হাজেরা কিবতীয়ার গর্ভজাত। হজরত ইসহাক ছিলেন হজরত সারার পুত্র। অবশিষ্ট ছয় সন্তানের জননী ছিলেন কেনানবাসী ইয়াকতিনের কন্যা কানতুরা। হজরত সারার মৃত্যুর পর হজরত ইব্রাহিম তাঁর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এই আট সন্তানকে অসিয়ত করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আর হজরত ইয়াকুব অসিয়ত করেছিলেন তাঁর দ্বাদশ পুত্রকে।

যে দ্বীনকে মনোনীত করার কথা আয়াতে বলা হয়েছে, সে দ্বীন হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। আর সেই পরিস্থিতিতেই মৃত্যু কামনা করা উচিত, যখন বিশুদ্ধ বিশ্বাস অটুট থাকে এবং সকল কার্যকলাপ সমর্পিত হয় আল্লাহর সমীপে। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবেই। সুতরাং মৃত্যুবরণ করা না করা কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। তাই আয়াতের মর্ম হবে এরকম– সদাসতর্ক হও! সমর্পিতপ্রাণ এবং ইসলাম যেনো কোনো অবস্থাতেই আয়ত্তচ্যুত না হয়। সমর্পণ ও ইসলামবিহীন অবস্থায় যদি মৃত্যু সমুপস্থিত হয়– তবে পরিণামে কল্যাণের বদলে আসবে অকল্যাণ। তাই 'মৃত্যুবরণ কোরো না'– একথায় মৃত্যুর প্রতি নয়, ইসলামবিচ্যুতির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

অভিশপ্ত ইহুদীরা মহানবী স. এর সকাশে একবার নিবেদন করলো, আপনার কি জানা নেই যে, হজরত ইয়াকুব তাঁর অন্তিম সময়ে সন্তানদের প্রতি এই মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁরা যেনো ইহুদী ধর্মের প্রতি অটল থাকে। এখন দেখি আপনি আমাদেরকে ইহুদীবাদ থেকে পৃথক করতে চাইছেন। তাদের এহেন অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৩, ১৩৪

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

❐ ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে?' তাহারা তখন বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার এক আল্লাহের ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইস্হাকের আল্লাহেরেই ইবাদত করিব। এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

❒ এই উম্মত অতীত হইয়াছে– তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের; তোমরা যাহা অর্জন করিবে তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

ইহুদীদের মিথ্যাচারের জবাবে আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, হে ইহুদীরা– তোমরা হজরত ইয়াকুব সম্পর্কে অযথা অপবাদ দিচ্ছো কেনো? তিনি যখন অসিয়ত করছিলেন, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? ছিলে না। তবে কেনো তোমরা এমতো দাবি পেশ করছো যে, হজরত ইয়াকুব তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদীবাদের উপর স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে– এই প্রশ্নটি মুমিনদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– হে বিশ্বাসীরা! হজরত ইয়াকুব যখন অসিয়ত করেছিলো তোমরা কি তখন সেখানে ছিলে? ছিলে না। বরং আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে সে সময়ের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানাচ্ছেন। প্রকৃত ঘটনা হলো হজরত ইয়াকুব তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামের উপরে স্থির থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আতা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিয়ম এই যে, অন্তিম সময়ে নবী ও রসুলগণকে পৃথিবীতে থাকা না থাকা– উভয়টির অধিকার দান করেন। এই নিয়ম অনুসারে হজরত ইয়াকুবের অন্তিম সময়ে জানিয়ে দেয়া হলো, মৃত্যু সমুপস্থিত, এখন আপনার ইচ্ছা– আপনি এখুনি যাবেন, যাত্রা বিলম্বিত করবেন; না কি যাবেনই না। হজরত ইয়াকুব অসিয়ত সম্পাদন পর্যন্ত থাকতে সম্মত হলেন এবং তাঁর সন্তানদেরকে আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ দানের পর যাত্রা করলেন পরপারে।

হজরত ইয়াকুব বলেছিলেন, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? পুত্রগণ বলেছিলেন, আমরা আপনার এক আল্লাহর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহ্র ইবাদত করবো। এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। এখানে তাঁদের আসল পিতৃপুরুষ হচ্ছেন– হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসহাক এবং হজরত ইয়াকুব। হজরত ইসমাইল ছিলেন হজরত ইসহাকের ভ্রাতা। তাঁর বংশধারা ভিন্ন। তবুও পিতৃব্য হওয়ার সূত্রে তিনিও এখানে বনী ইসরাইলদের পিতৃপুরুষ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছেন। আরববাসীদের নিয়ম হচ্ছে– তাঁরা পিতৃব্যকে পিতা বলে সম্বোধন করেন। আবার খালাকেও আম্মা বলে ডাকেন। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, পিতৃব্য পিতা সদৃশ। হজরত আলী থেকে তিরমিজি এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। একবার রসুল পাক স. তাঁর চাচা হজরত আব্বাস সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার আব্বাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমার আশংকা হচ্ছে কুরাইশরা তাঁর সাথে ওই আচরণই করবে যেমন ওরওয়া বিন মাসুদের সাথে করেছিলো সকিফ (সকিফ তাঁকে হত্যা করেছিলো)।

'ইলাহা ও ওয়াহিদা' অর্থ এক আল্লাহ্। শুধু আল্লাহ্ বললেই তৌহিদ বা একত্ববাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। তবুও ইলাহা ও ওয়াহিদা বলা হয়েছে এই কারণে যে, আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় এককত্ব যেনো অধিকতর বিশ্বাস্য বলে প্রতিভাত হয়। এক আল্লাহ্ বলে আরেকটি সন্দেহের সুযোগ রুদ্ধ করা হয়েছে। তা হচ্ছে কেউ হয়তো এমনও কুধারণা করতে পারতো যে, হজরত ইয়াকুব এবং তাঁর পিতৃপুরুষের উপাস্য এক ছিলো না। ইলাহা ও ওয়াহিদা বলে ওই সন্দেহের সুযোগটি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, এই উম্মত অতীত হয়েছে— এখানে উম্মত অর্থ হজরত ইয়াকুব ও তাঁর সন্তান-সন্ততি। উম্মত শব্দটির আসল অর্থ উদ্দেশ্য। দল বা সম্প্রদায়কে এ কারণেই উম্মত বলা হয় যে, সাধারণত মানুষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পথ নির্দেশকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়।

তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের— একথার অর্থ প্রত্যেককে তার নিজ কার্যের জন্য প্রশ্ন করা হবে। অন্যের কৃতকর্ম সম্পর্কে তার কোনো দায় নেই। আয়াতের শেষে সে কথাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা এবং সাঈদের পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন— ইহুদী ইবনে সুরিয়া একবার রসুলপাক স.-কে বললো, এটাই প্রকৃত হেদায়েত যার উপর আমরা রয়েছি। আপনি যদি আমাদের অনুসরণ করেন, তবে আপনিও হেদায়েত পাবেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মদীনার কতিপয় বিশিষ্ট ইহুদী কাব বিন আশরাফ, মালিক বিন হানিফ, ওয়াহাব বিন ইয়াহুদ, আবু ইয়াসির বিন আফতাব এবং নাজরানের খৃষ্টানেরা মিলে একবার মুসলমানদের সঙ্গে তুমুল বচসায় লিপ্ত হয়েছিলো। খুব হৈ চৈ বাঁধিয়েছিলো তারা। ইহুদীরা বলেছিলো, আমাদের নবী হজরত মুসা সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের কিতাবও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আর আমাদের ধর্মও সকল ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। খৃষ্টানেরা বলেছিলো, আমাদের নবীর কিতাব ও ধর্ম সকল নবী, কিতাব ও ধর্মের চেয়ে মহান। এভাবে কথা বলে ইহুদীরা এবং খৃষ্টানেরা তারস্বরে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের প্রতি আহবান জানাতে শুরু করলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৫, ১৩৬

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى

اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ

عِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

❒ তাহারা বলে, 'ইহুদী বা খৃষ্টান হও' ঠিক পথ পাইবে। বল, 'বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব।' এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

❒ তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণকারী।'

ইহুদী ও খৃষ্টানদের আহবানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদেরকে একথা বলার শিক্ষা দিচ্ছেন যে, বরং আমরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শকেই আশ্রয় করবো। তিনি কখনোই অংশীবাদী ছিলেন না। ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অর্থ দ্বীনে হানিফ। 'হানিফ' শব্দটি উদগত হয়েছে 'হানফুন' শব্দ থেকে– যার অর্থ কোনো বিশেষ পদ্ধতি থেকে বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন হওয়া। এখানে একথাটির অর্থ দাঁড়াবে– এই সকল বিকৃত ধর্মমত থেকে পৃথক হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করবো একথাটি প্রকারান্তরে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি সত্যের আহবান। প্রচ্ছন্ন অর্থ হচ্ছে আমরা ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী। সুতরাং তোমরাও তার ধর্মমতাদর্শের দিকে এসো। তিনি যেমন সকল বিকৃত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, আমরাও সেইরূপ করেছি। তোমরাও সেরূপ করবে।

তিনি অংশীবাদী ছিলেন না। – এ বাক্যটিও ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মমতের প্রতি চরম প্রতিবাদ। একথার মাধ্যমে যেনো বলা হচ্ছে, তোমরা যেমন অংশীবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছো, হজরত ইব্রাহিম কিছুতেই সেরকম ছিলেন না।

আল্লাহ্‌পাক আরো শিক্ষা দিয়েছেন, হে মুসলমানেরা– তোমরা একথাও বলো, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসী কিতাব সমূহের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল এবং ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের উপর এবং ঈসা, মুসা ও অন্য নবীগণের উপর– এখানে এ বক্তব্যে অবতারিত কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন মজীদের কথা। এই বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাই বুঝতে হবে যে, কোরআন মজীদই অন্য সকল আসমানী কিতাব বিশ্বাসের শুরু, শিরোনাম বা কারণ।

ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব হচ্ছে ওই দশটি সহিফা– যা প্রকৃত পক্ষে হজরত ইব্রাহিমের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাঁর সন্তানদের জন্যই ওই সহিফা নাজিল হয়েছিলো বলেই বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ– এরকম বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে রসুলপাক স. এর উপর। এতদসত্ত্বেও যদি এরূপ বলা হয় যে, আমাদের প্রতি অথবা শেষ উম্মতের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তবুও তা রীতিবিরুদ্ধ হবে না।

বংশধর বুঝাতে এখানে 'আসবাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাইলের গোত্রগুলোকে আসবাত বলে। তাদের গোত্রসংখ্যা ছিলো বারোটি। হজরত ইয়াকুব ছিলেন দ্বাদশ সন্তানের পিতা। তাঁর প্রতিটি সন্তানের বংশধারা পৃথক পৃথক গোত্র হিসেবে পরিচিত। কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত এই যে, হজরত ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্র নিজেরাই আসবাত। তাদেরকে একারণেই আসবাত বলা হয় যে, তাদের সন্তানেরা ছিলো পৃথক পৃথক বারোটি দলে বিভক্ত। এরকমও বলা যায় যে, তাদের মধ্যে সন্তানের সন্তানকে সাবত্ বলার রেওয়াজ ছিলো। রসুলপাক স. হজরত হাসান ও হজরত হোসাইনকে সাব্তাঈন বলে সম্বোধন করেছেন। আর হজরত ইয়াকুবের সন্তানেরা ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রপৌত্র। এদিক দিয়ে তাঁরা হজরত ইব্রাহিমের আসবাত।

'আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না'– একথার অর্থ, আমরা সকল নবীকেই নবী বলে মান্য করি। খৃষ্টান এবং ইহুদীরা কাউকে মানে এবং কাউকে মানে না। আমরা সেরূপ নই। কাউকে বিশ্বাস করবো কাউকে করবো না– এরকম বিশ্বাস– অপবিশ্বাস বরং অবিশ্বাস। আমরা স্বীকার করি, আল্লাহ্পাকের সকল নবী ও রসুলই সত্য।

আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী– একথার অর্থ, আমাদের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে হজরত ইব্রাহিম আ. এর-ই ধর্ম। হজরত ইব্রাহিম ছিলেন আত্মসমর্পণকারী। আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ স.ও আত্মসমর্পিত। সকল নবী রসুলও তাই। তাঁদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই, আমরাও সেরকম পার্থক্যরহিত আত্মসমর্পনকারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, ইহ-পরকাল উভয়স্থানে হজরত ঈসা আমার নিকটতর। তাঁর নবুয়তের সময়ও আমার সময়ের সর্বাপেক্ষা নিকটে। সকল নবী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ যদিও তাঁরা পৃথক মায়ের সন্তান। তাঁদের সকলের দ্বীন এক। আমার ও হজরত ঈসার মাঝখানে আর কোনো নবীর আগমন ঘটেনি। বোখারী ও মুসলিম।

আমি বলি, নবীগণের ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং মাতৃত্বের পৃথকতা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীগণের মূল এক। আর তা হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ– যদ্দারা নবীগণ নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আর মাতৃত্ব পৃথক বলার কারণ এই যে, শরিয়তের শাখা প্রশাখায় তাঁরা

ছিলেন ভিন্ন। দ্বীন এক হওয়ার মর্ম হচ্ছে সকল নবীর মূল শিক্ষা এই– আল্লাহ্‌র আদেশকে শিরোধার্য করো, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকো। প্রবৃত্তির কামনামুক্ত হও। আল্লাহ্‌পাকের পরম সত্ত্বা, গুণাবলীর প্রতি এবং শুরু ও শেষ অবস্থার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ইহুদীরা হিব্রু ভাষায় তওরাত পাঠ করতো এবং তা আরবীতে মুসলমানদের সামনে ব্যাখ্যা করতো। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি রসুলপাক স. এর নির্দেশ ছিলো যে, তোমরা তাদের কথায় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই কোরো না। বরং বলো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বোখারী।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৭,১৩৮

فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

❒ তোমরা যাহাতে বিশ্বাস করিয়াছ, তাহারা যদি সেইরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তাহারা পথ পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহের রং; রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।

'ফাইন আমানু মিসলি মা আমানতুম বিহি' (তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছো তারা যদি সেররম বিশ্বাস করে) এই বাক্যের 'মিসাল' শব্দটি অতিরিক্ত। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এই শব্দটি ছাড়াই এ আয়াত পাঠ করতেন। তিনি পাঠ করতেন, 'ফাইন আমানু বিমা আমানতু বিহি।' অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাসকে যদি তারা বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথপ্রাপ্ত হবে।

'আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয়ই তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন।' বিরুদ্ধভাবাপন্ন বুঝাতে আয়াতে 'শিক্বাক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যা সত্যের বিপরীত তাই শিক্বাক্ব। অনেকে বলেছেন, শিক্বাক্ব মানে শত্রুতা। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের শত্রু।

'তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট'— এই বাক্যটির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের জন্য সংরক্ষণ ও সাহায্যের অঙ্গীকার প্রদত্ত হয়েছে। আল্লাহ্পাক এই অঙ্গীকার এভাবে পূরণ করেছেন যে, কিছুকাল পরেই বনী নাজির গোত্র দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। সমাপ্ত হয়েছে বনী কুরাইজার নিধনপর্ব এবং অন্য ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি আরোপিত হয়েছে জিজিয়া।

'তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'— একথার অর্থ, আল্লাহ্ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের কথোপকথন শোনেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ও অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ বলেই একথা ভালোভাবে জানেন যে, প্রত্যেকে অবশেষে কী প্রতিফল প্রাপ্ত হবে?

জ্ঞাতব্যঃ অসংখ্য সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের বিদ্রোহীরা হজরত ওসমানের গৃহ অবরোধ করে রেখেছিলো। কিছুকাল অবরোধের পর তারা একদিন তাঁর বাড়ির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে বসে। হজরত ওসমান তখন কোরআন মজীদ পাঠরত ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে তলোয়ারের আঘাত করলো। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটলো রক্ত। সে রক্ত গিয়ে পড়লো উন্মুক্ত কোরআন মজীদের পাতায়— যেখানে লেখা ছিলো, 'ফাসাইয়াক ফিকাহুমুল্লাহ্' (তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট)। হজরত ওসমান তখন তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম হস্ত, যা বিনা দোষে রক্তরঞ্জিত হলো। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ওই পাষন্ড হন্তারকেরা পরবর্তীতে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, খৃষ্টানদের ঘরে কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হলে সাতদিন পর তাকে মামুদিয়া নামক রঙিন পানিতে চুবিয়ে দেয়া হতো। তারা ধারণা করতো, এতে শিশু পবিত্র হয়ে যায় এবং তার সমস্ত ক্লেদ দূরীভূত হয়। একর্মটি তারা করতো খতনার বদলে। ওই জলরঞ্জনের সময় তারা বলতো, শিশুটি এবার খাঁটি খৃষ্টান হয়ে গেলো। তাদের এই অলীক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে- 'রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর?' এখানে রঙ অর্থ হবে আল্লাহ্র দ্বীন, ফিতরত বা প্রকৃতি। অর্থাৎ শিশুকে রঞ্জিত করার বিধান অপেক্ষা আল্লাহ্র বিধানই শ্রেয়তর। তাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে— বরং তোমরা এরকম বলো, আমরা আল্লাহ্র ইবাদতকারী।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৯,১৪০,১৪১

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ

لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ
الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

❒ বল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; এবং আমরা তাঁহার প্রতি অকপট।

❒ তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইস্মাইল, ইস্হাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলো? বল, ' তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্? আল্লাহের নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর সীমালংঘনকারী আর কেহ হইতে পারে? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

❒ এই উম্মত অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ তাহা তোমাদের, তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

আল্লাহ্পাক এখানে মুসলমানদেরকে একথা বলার শিক্ষা দিচ্ছেন যে– বলো, আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমরা আমাদের সঙ্গে কি বিতর্ক করতে চাও? একথার অর্থ, আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কি প্রতর্কে লিপ্ত হতে চাও? তিনি যেমন তোমাদের প্রতিপালক তেমনি আমাদেরও। বনী ইসমাইল গোত্রে কেনো নবী আর্বিভূত হলেন আর বনী ইসরাইল গোত্রে কেনো হলেন না– এমতো কুটতর্কে লিপ্ত হয়ে কী লাভ? আসলে কোনো গোত্রেরই বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্পাক নবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি যে কোনো গোত্রভূতকে নবুয়তের সম্পদ প্রদানের জন্য মনোনীত করতে পারেন। এতে তোমাদের, আমাদের কারো

কিছু বলার নেই। তোমরা যদি না মানো তবে নাই বা মানলে, কিন্তু আমরা তো মানি। তোমরা মুশরিক আর আমরা মুখলিস (অকপট)।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এখলাস (অকপটতা) অর্থ, কেবল আল্লাহ্পাকের প্রসন্নতা প্রাপ্তির জন্য কর্ম সম্পাদন। লোক দেখানো মনোভাবের সেখানে কোনোই প্রশ্রয় নেই। ফজল বলেছেন, লোকনিন্দার কারণে মন্দকর্ম পরিত্যাগ করা রিয়া। আর মানুষের প্রশংসা অর্জনার্থে সৎকর্ম সম্পাদন করা শিরিক। এখলাস এই রিয়া এবং শিরিক থেকে মুক্ত থাকার নাম।

তোমরা কেনো এরকম বলো যে, হজরত ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরেরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান। তোমরা তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টান বলছো আর আমি (আল্লাহ্) বলছি, তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ মুসলমান। তাঁরা সকলেই ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী। তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের পরে। সুতরাং তিনি কীভাবে ইহুদী খৃষ্টান হতে পারেন? তওরাত নাজিলের পূর্বে হজরত মুসা ছিলেন হজরত ইব্রাহিমেরই একনিষ্ঠ অনুসারী। তোমরাও একথা জানো। জেনে শুনে তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত বিষয়াবলী গোপন করে যাচ্ছো। সুতরাং তোমাদের চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? এ প্রশ্নের আগেই আল্লাহ্তায়ালা যে মোক্ষম প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তার জবাব ইহুদী খৃষ্টান সম্প্রদায় দিতে অক্ষম। প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা কি বেশী জানো, না আল্লাহ্পাক? যারা সাক্ষ্য গোপন করে তারা জালেম (সীমালংঘনকারী)। তওরাতে এই সাক্ষ্যটি লিপিবদ্ধ ছিলো যে, হজরত ইব্রাহিম মুশরিক ছিলেন না, ছিলেন মুখলিস (বিশুদ্ধাচারী)। ছিলেন ইহুদীবাদ ও খৃষ্টানবাদের অপবিত্রতা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তদুপরি রসুলপাক স.ও তাঁর বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এর পরেও যারা প্রমাণকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, তারা যে আল্লাহ্র ভাষায় অধিকতর সীমালংঘনকারী সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্পাক অবিশ্বাসী ইহুদী ও খৃষ্টানদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাই সতর্ক করে দিয়েছেন একথা বলে যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

শেষ আয়াতটি পূর্বোল্লিখিত একটি আয়াতের (১৩৪) পুনরালোচনা। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের মতো এই আয়াতেও অতীত উম্মতের (পূর্ব পুরুষদের) বিকৃত আমলের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের অর্জন সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। পূর্বপুরুষদের কর্মকান্ড সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনোই প্রশ্ন করা হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বের আয়াতটির (১৩৪) লক্ষ্য ছিলো গ্রন্থধারীরা (ইহুদী খৃষ্টানেরা)। আর এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। যাতে করে মুসলমানেরাও পূর্বপুরুষদের বিকৃত আমলের দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্ববর্তী আলোচনাটি ছিলো নবীদের সম্পর্কে, আর এই আয়াতে অতীত উম্মত বলতে বুঝানো হয়েছে যারা নবী নন এরকম পিতৃপুরুষদেরকে। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

২য় পারা

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪২

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

❐ নির্বোধ লোকেরা বলিবে যে, তাহারা এযাবৎ যে ক্বিবলা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে কিসে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহেরই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

রসুল পাক স. হিজরতের পর মদীনায় এসে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে যাচ্ছিলেন। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্পাকের নির্দেশে কেবলা পরিবর্তিত হয়। নতুন নির্দেশ অনুসারে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে থাকেন তিনি। এতে করে মদীনার ইহুদী ও মুশরিকরা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হলো। ইব্নে জারীর আল্লামা সুদ্দীর পদ্ধতিতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক যখন তাঁর প্রিয় নবীকে বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিলেন, তখন মক্কার মুশরিকেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ তার ধর্ম সম্পর্কে নিজেই সংশয়াচ্ছন্ন। তারা ভাবতে শুরু করলো আমরাই ঠিক আছি, তাই মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত আমাদের কেবলাই গ্রহণ করেছে। এভাবে আস্তে আস্তে সে আমাদের ধর্মকে গ্রহণ করতে থাকবে। বাগবী বলেছেন, মদীনার ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ হিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের কেবলা পরিত্যাগ করেছে।

আয়াতে বলা হয়েছে— নির্বোধ লোকেরা বলবে তারা এযাবৎ যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিলো, কি কারণে তা পরিত্যাগ করলো? এখানে নির্বোধ লোক বলতে 'সুফাহা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির উৎপত্তি 'সাফাহাত' থেকে। 'সাফাহাত' এর আভিধানিক অর্থ চঞ্চলতা, চটুলতা, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। এখানে 'সুফাহা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকদেরকে। নির্বুদ্ধিতার

আগমন ঘটে তিনটি পথে— ১.পূর্বসুরীদের অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি ২. ঐতিহ্যঅন্ধতা, প্রবৃত্তির তাড়না, গোত্রাভিমান এবং ৩. অনুসন্ধিৎসাহীনতা, চিন্তাবদ্ধতা।

কোনোকিছুর সম্মুখে অবস্থান নেয়াকে বলে কেবলা। যেমন বসার অবস্থাকে বলে উপবেশন। কিন্তু কেবলার প্রকৃত অর্থ ওই দিক যেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা হয়। এখানে 'কিবলাতিহিম' অর্থ বায়তুল মাকদিস। এই কেবলার পরিবর্তন একটি মহান বিপ্লব। ইহুদী এবং মুশরিকদের স্থবির চিন্তায় এটি একটি প্রচন্ড প্রত্যাদেশাঘাত।

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই'— একথার অর্থ, সকল দিক, সকল স্থান, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্রই অধিকারাধীন। কেবলামুখী হওয়া ইবাদত। কিন্তু দিকের অনুগমণের কারণে নয়। আল্লাহ্র নির্দেশের কারণেই ইবাদত। নির্দেশবিহীন দিক ও স্থানের কোনোই মাহাত্ম্য নেই।

শেষে বলা হয়েছে, 'তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন'। অর্থাৎ প্রকৃত কেবলার দিকে তিনি তাদেরকেই পরিচালিত করেন, যাদেরকে ইচ্ছা করেন। প্রকৃত সরল পথ, প্রকৃত কেবলা মূলতঃ আল্লাহ্পাকের বিধানের অনুসরণ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৩

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

❒ এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হইতে পার এবং রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হইবে। তুমি এযাবৎ যে ক্বিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যাহাতে জানিতে পারি কে রসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়? আল্লাহ্ যাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ্ এইরূপ নহেন যে তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

'কাজালিকা' (এভাবে) — একথার অর্থ, আল্লাহ্পাকের কার্যক্রমের যে চিরন্তন ধারাটি বয়ে চলেছে সেভাবে। অথবা এরকম অর্থ হতে পারে, পূর্বের আয়াতে যে

বিধান বর্ণিত হয়েছে সেভাবে। অথবা সেই সূত্র ধরে অর্থাৎ সরল পথ প্রদর্শনের সূত্রে। ইতোপূর্বে বর্ণিত 'আমি ইব্রাহিমকে পৃথিবীর জন্য মনোনীত করেছি'— আয়াতটির সঙ্গেও এই আয়াতের 'এভাবে' কথাটি সংযোগ সাধন হওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে— ১. যেভাবে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান বহমান ২. যেভাবে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করি অথবা ৩. যেভাবে আমি ইব্রাহিমকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি, সেভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি; যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো এবং রসুল স. তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন।

'তোমরা মধ্যপন্থী জাতি বা উম্মত' একথার অর্থ—ন্যায়নিষ্ঠতা, প্রজ্ঞা ও মারেফাতে এলাহীতে তোমরা পূর্ববর্তী উম্মত অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মারফু পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সূত্রে আহ্‌মদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, 'ওয়াসাত' শব্দের অর্থ মধ্যপন্থা। যে স্থলের চতুষ্পার্শ্ব সমদূরত্বসম্পন্ন সেই স্থানের কেন্দ্রকে বলে 'ওয়াসাত'। রূপক অর্থে সুন্দর স্বভাবকেও 'ওয়াসাত' বলা হয়। নূন্যতা ও অতিরিক্ততাবর্জিত স্বভাবই হচ্ছে উত্তম বা মধ্যবর্তী স্বভাব। যেমন অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী পন্থা দানশীলতা। কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যবর্তী অবস্থা বীরত্ব ইত্যাদি। অতঃপর 'ওয়াসাত' শব্দটি ওই ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য- যার স্বভাব সৌন্দর্যমন্ডিত ও প্রশংসনীয়। উম্মতে মোহাম্মদীকে তাই 'উম্মাতাঁও ওয়াসাতান' (মধ্যমপন্থী বা উত্তম) বলা হয়েছে।

কালাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সম্বন্ধ পদ উহ্য আছে। তদস্থলে সম্বন্ধকৃতকে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিপাদ্য বক্তব্য হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী ধর্মাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ইসলামের শরিয়তে কোনো ঘাটতি নেই। আবার বাড়তিও নেই। তাই এই ধর্মকে বলা হয়েছে মধ্যম পন্থার ধর্ম।

মাসআলাঃ আলেম সম্প্রদায় আলোচ্য আয়াতটিকে ঐকমত্যের (এজমার) দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেনোনা উম্মতে মোহাম্মদীর ঐকমত্যকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না করা হলে উম্মতের ন্যায়পরায়ণতাকে উপেক্ষা করা হয়। যদি প্রশ্ন করা হয়— মুজ্‌তাহিদ (বিধানোদ্ধারকারী) যদি ভুল বিধান উদ্ধার করে বসেন, তবে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা কি হ্রাস পায় না? এভাবে উম্মতেরা যদি কোনো ভুল বিধানের প্রতি একমত হয় তবে তাদের ন্যায়পরায়ণতার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে কিভাবে? জবাবস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমরা প্রথমে বলেছি 'ওয়াসাত' শব্দটি প্রশংসিত স্বভাবের প্রতি রূপক অর্থে প্রযোজ্য। এই অর্থটি আমরা প্রয়োগ করেছি ব্যক্তিত্বের উপর। কালাবীর মতানুসারে মধ্যম পন্থার এ সৌন্দর্য দ্বীন বা শরিয়তের প্রতি প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত ভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল উম্মতের প্রতি কিংবা শরিয়তের প্রতি 'ওয়াসাত' শব্দটি যেভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেনো

মূল কথা হচ্ছে- এ উম্মতের সকল কিছুই প্রশংসিত। বিস্মৃতি বা অক্ষমতাজনিত ত্রুটি সেই সৌন্দর্যকে কখনো ম্লান করতে পারে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. একবার আসর নামাজ শেষে মিম্বরে দন্ডায়মান হলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, একটি একটি করে সেগুলোর বিবরণ দিলেন। তখন পড়ন্ত বেলার রোদ বৃক্ষরাজিতে এবং প্রাচীর সমূহের শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছিলো। তিনি স. এরশাদ করলেন— সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতোটুকু সময় বাকী পৃথিবীর আয়ু ততোটুকু। আর অতীত অতিক্রান্ত দিবসের মতো। স্মরণ রেখো! আমার উম্মত অন্য নবীর সত্তর জন উম্মতের সমপর্যায়ের। আল্লাহ্পাকের নিকট সকল উম্মতের চেয়ে আমার উম্মতেরাই অধিকতর উত্তম ও মর্যাদাশীল। বাগবী, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং দারেমীও এরকম বর্ণনা এনেছেন বাহাজ বিন হাকেম থেকে। দারেমী আরও বর্ণনা করেছেন— হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস একবার হজরত কাব ইব্‌নে আহবারের নিকট জানতে চাইলেন, তওরাত কিতাবে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে কি কি লেখা আছে? সে বললো, তওরাতে রয়েছে— তাঁর নাম মোহাম্মদ, তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। হিজরতের পর মদীনাবাসী হবেন। সিরিয়া হবে তাঁর করতলগত। তিনি কটুভাষী হবেন না। বাজারের অসৎ ব্যক্তিদের মতোও হবেন না। তিনি মন্দের মাধ্যমে মন্দের প্রতিবিধান করবেন না। কারণ, তিনি হবেন ক্ষমাপরবশ। তাঁর উম্মতগণ আল্লাহ্পাকের অত্যধিক গুণকীর্তন করবে। সুখ-দুঃখ আনন্দ-নিরানন্দ— সকল অবস্থায় তাঁরা হবেন আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ। উচ্চভূমিতে আরোহনের সময় তাঁরা তকবীর উচ্চারণ করবেন। তাঁদের যুগল হস্ত এবং যুগল চরণ হবে অজুর উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট। পরিধেয় হবে লুঙ্গি। যুদ্ধের মাঠে সারিবদ্ধ সেনাদলের মতো তাঁরা নামাজে সারিবদ্ধরূপে দন্ডায়মান হবেন। মৌমাছির গুঞ্জরনের মতো মসজিদ সমূহে তাঁদের তাসবীহ্ ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকবে। তাঁরা অতি উচ্চকিত হবেন না। আবার এ রকম প্রচ্ছন্নতাপ্রবনও হবেন না যাতে পার্শ্ববর্তীরা কথা না শুনতে পায়।

উম্মতে মোহাম্মদী অন্য নবীর উম্মতগণ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাঁরা আল্লাহপাক সকাশে এই মর্মে সাক্ষ্য দিবেন যে- নবীগণ তাঁদের উম্মতের নিকট আল্লাহ্পাকের বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছেন। আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো'। সাক্ষ্য-প্রদানের যোগ্যতার কারণে এ কথাটিই প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মোহাম্মাদী ন্যায়পরায়ণ। আরো প্রমাণিত হয়— সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ন্যায়পরায়ণতা অপরিহার্য।

'রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবেন'— এ কথার অর্থ, তিনি উম্মতে মোহাম্মদী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। অর্থাৎ উম্মতের সাক্ষ্যের সমর্থনে বা পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন।

বাগবী বলেছেন— আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। পূর্ববর্তী উম্মতের অবিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন— তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী গমন করেন নি? তারা বলবে, না। আমাদের কাছে তো সে রকম কেউ আসেনি। আল্লাহ্পাক তখন নবীগণকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। তাঁরা বলবেন— হে বিচার দিবসের মালিক! এরা মিথ্যাবাদী। আমরা তাদের নিকট আপনার বিধান প্রচার করেছি। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ, তবুও তিনি সর্বসমক্ষে বিষয়টি স্পষ্ট করার নিমিত্তে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি তখন নবীগণকে সাক্ষ্য দিতে বলবেন। তখন সেখানে উপস্থিত হবেন উম্মতে মোহাম্মদী। তাঁরা বলবেন, নবীগণ তাঁদের উম্মতের নিকট আল্লাহ্পাকের সকল বিধান পৌঁছে দিয়েছেন। অবিশ্বাসীরা বলবে, নবীরা যে বিধান পৌঁছে দিয়েছেন তা তোমরা কি করে জানলে। তোমরা তো পৃথিবীতে আমাদের অনেক পরে এসেছিলে। উম্মতে মোহাম্মদী জবাবে বলবেন, আল্লাহ্পাক আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন একজন মহান রসুলকে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন কোরআন। আমরা সেই কোরআনে নবীগণের আবির্ভাব ও তাঁদের বিধানাবলী প্রচারের বিবরণ পেয়েছি। আল্লাহ্পাক সত্য। অতুলণীয়। মহাসত্য। এর পর রসুল স. কে আহবান করা হবে। তাঁকে তাঁর উম্মতগণের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি তাদের সত্যবাদিতা ও ন্যায়ানুগতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন– – কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক হজরত নুহ্ আ. কে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন— তুমি কীভাবে ধর্ম প্রচার করেছো? হজরত নুহ্ নিবেদন করবেন, হে আমার দয়াময় প্রভূ! আমি যথারীতি আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহ্পাক তখন হজরত নুহের উম্মতদের জিজ্ঞেস করবেন— নুহ্ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছায়নি? তারা বলবে, না। আমাদের নিকট কেউ আসেনি। আল্লাহ্পাক তখন হজরত নুহ্কে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষী পেশ করো। হজরত নুহ বলবেন, আমার সাক্ষী মোহাম্মদ স.এর উম্মতগণ। তখন উম্মতে মোহাম্মদী সেখানে উপস্থিত হয়ে হজরত নুহের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এরপর রসুল পাক স. আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করলেন। পুনরায় বললেন- তোমরা নুহের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে আর আমি সাক্ষ্য দিবো তোমাদের পক্ষে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, নাসাঈ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন– – রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন্ এমন একজন নবী উপস্থিত হবেন যাঁর সাথে থাকবে একজন মাত্র উম্মত। আরেকজন নবীর উম্মত থাকবেন দু'জন মাত্র। আল্লাহ্ পাক তাঁদের উম্মতদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এরা তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়েছিলো কি? উম্মতেরা বলবে, না। আল্লাহ্পাক তখন নবীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার বিধান পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছিলে?

নবীদ্বয় বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, তবে সাক্ষ্য পেশ করো। নবীদ্বয় তখন সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করবেন উম্মতে মোহাম্মদীকে। উম্মতে মোহাম্মদী তখন নবীদ্বয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করবেন। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কীভাবে জানলে? তাঁরা বলবেন, আমাদের নবীর উপরে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো আমরা সে কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ দেখেছি যে, সকল নবী তাঁদের উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র বিধান পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তাঁদের জানানো হবে, তোমরা সত্য বলেছো।

কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি ছিলো একটি পরীক্ষা। রসুলের অনুসারী এবং পশ্চাদাপসরণকারীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ই ছিলো কেবলা পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য। আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করার পর আল্লাহ্ পাক একথা জানাচ্ছেন যে, তিনি যাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমতো নির্দেশ পালন নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন।

'তুমি এযাবত যে কেবলার অনুসারী ছিলে'— এই উক্তিটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন— ১. এখানে ওই কেবলার কথা বলা হয়েছে, যেদিকে মুখ করে আপনি এতো দিন নামাজ পাঠ করে আসছিলেন। সেই কেবলা হচ্ছে বায়তুল মাকদিস। ২. আপনি সর্বপ্রথমে যে কেবলামুখী ছিলেন, অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে যে কেবলাকে (কাবা শরীফকে) আপনি আশ্রয় করেছিলেন- আমি তা রহিত করিনি। হিজরতের পরে বায়তুল মাকদিসকে কেবলা বানানো ছিলো একটি সাময়িক ব্যবস্থা। ৩. প্রকৃত কেবলাকে পুনরায় আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম। এর কারণ হচ্ছে, এ বিষয়টি পরীক্ষা করে নেয়া যে, কে আপনার প্রকৃত অনুসারী এবং কে নয়। কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাটি সুস্পষ্ট হয় যে, হিজরতের পূর্বে রসুলুল্লাহ স. কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনানুযায়ী বুঝা যায়, বায়তুল মাকদিসই ছিলো রসুল স. এর প্রথম কেবলা। আসল কথা হচ্ছে, বর্ণনাভঙ্গি যে রকমই হোক না কেনো— কাবা শরীফের পর বায়তুল মাকদিস পুনরায় কাবা শরীফ কিংবা প্রথমে বায়তুল মাকদিস পরে কাবা শরীফ– এমতো কেবলা পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রসুল পাক স. এর প্রকৃত অনুসারীগণকে সুচিহ্নিত করা। আল্লাহ্পাকের বক্তব্য যেনো এ রকম যে, আমি সর্বসমক্ষে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চাই— কোন্ কোন্ ব্যক্তি নামাজের মধ্যে রসুলুল্লাহ্ স. এর আনুগত্য করেন। আর কোন্ কোন্ হতভাগ্যরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কিংবা বিরোধিতা করে। এভাবে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য সুসাব্যস্ত হয়ে যাক।

কেবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলো। তারা হয়ে পড়েছিলো বিশ্বাসবিচ্যুত। তাই আয়াতে তাদের উল্লেখ মাত্র না করে, বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক এরূপ নন যে, বিশ্বাসীদের

বিশ্বাসকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়াপরবশ, পরম দয়ালু (রউফুর রহীম)।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— কেবলা পরিবর্তনের পর মুসলমান নামধারী একদল দুর্বলচিত্ত লোক ইহুদীদের অনুসারী হয়েছিলো। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে গিয়েছে। আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ। কেবলা পরিবর্তনের ফলে কি হবে না হবে তা তিনি অবশ্যই জানেন। তবুও আয়াতে— যাতে জানতে পারি কে রসুলের অনুসরণ করে, কে করে না- এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে। ভাষ্যকারগণ এর জবাবে বলেছেন, ১. ইল্লা লিনা'লামা (যেনো জানতে পারি) বাক্যে ব্যবহৃত লাম অক্ষরটি পরিণতিপ্রকাশক নয়, বরং উদ্দেশ্যপ্রকাশক। সুতরাং এই জানার সম্পর্কটি অতীত কালের সঙ্গে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম— একথা তো আমি জানতামই যে, কে রসুল পাক স. এর প্রকৃত অনুসারী এবং কে নয়। তবুও এই উদ্দেশ্যে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দান করেছি যাতে করে সত্যমিথ্যার পার্থক্যরেখা সর্বসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাতে জানতে পারি— একথার আসল অর্থ এ রকমই। ২. কেউ কেউ বলেছেন, যাতে জানতে পারি— একথার অর্থ যাতে পার্থক্য করতে পারি বা পার্থক্য করে ফেলি, কে প্রকৃত অনুসারী এবং কে কপট। ৩. কেউ আবার বলেছেন, এখানে সম্বন্ধপদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ পদসহযোগে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— যেনো আমার প্রিয় রসুল এবং প্রকৃত বিশ্বাসীরা জেনে নিতে পারে। এভাবে জানার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে রসুল এবং প্রকৃত বিশ্বাসীদের সঙ্গে। আল্লাহ্পাক এখানে তাঁর প্রিয় রসুল ও প্রিয় বিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্বন্ধিত পদটি উহ্য রেখে বিষয়টি রূপকভাবে স্বীয় সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। প্রিয় রসুল ও তাঁর প্রিয়ভাজন অনুসারীদের মর্যাদা প্রকাশই এরকম বর্ণনাভঙ্গির উদ্দেশ্য। হাদিসে কুদসীতে এ রকম বর্ণনাভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক এক বান্দাকে বলবেন, আমি অসুস্থ ছিলাম— তুমি সেবা করোনি। এই হাদিসে আল্লাহ্পাক বান্দার অসুস্থতাকে নিজের অসুস্থ হওয়া হিসেবে প্রকাশ করেছেন। এই আয়াতেও তেমনি রসুল ও তাঁর প্রিয়ভাজনদের জেনে নেয়ার বিষয়টিকে, 'যাতে জানতে পারি'— এরকম বর্ণনারীতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

শায়েখ আবুল মানসুর মাতুরিদি বলেছেন, আয়াতের মর্ম হলো— যা অস্তিত্বশীল হয়নি, তা আমি পূর্ব থেকে জানতাম— অস্তিত্বশীলতার পরেও জানি (জেনে নিতে পারি)। অস্তিত্ববিহীনতা এবং অস্তিত্বশীলতা উভয়টি আমার জানার আওতায়। অস্তিত্বহীনকে জানি অস্তিত্বহীন অবস্থায় এবং অস্তিত্বশীলকে জানি অস্তিত্বশীল অবস্থায়। সুতরাং অনস্তিত্বের জানা এবং অস্তিত্বের জানা নিশ্চয়ই এক নয়। আয়াতে ঘটনাটি অস্তিত্বশীল হিসেবে জানার কথাই বলা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। জ্ঞাত বস্তু অনস্তিত্বতা পরিত্যাগ করে বা পরিবর্তন করে অস্তিত্বশীলতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তর ঘটে তাঁর অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের

আওতায়। বান্দাদের পুরস্কার তিরস্কার নির্ভর করে অস্তিত্বশীলতার উপর। এখানে সেই অস্তিত্বশীলতার কথাই বলা হয়েছে— যা আল্লাহ্পাক জানেন বা জেনে নিতে পারেন।

'আল্লাহ্ পাক বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ব্যর্থ করেন না'— আলোচ্য আয়াতে বিশ্বাস বা ইমান বলতে 'সুদৃঢ় বিশ্বাস' মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা কেবলা পরিবর্তনের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত বিশ্বাস অর্থ নামাজ। যেহেতু হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— ইহুদী হুয়াই বিন আখতাব ও তার সাথীরা সাহাবাগণকে প্রশ্ন করেছিলো, তোমরা যে এতো দিন বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছো, সেটা সত্য ছিলো না মিথ্যা? যদি সত্য হয়, তবে তোমরা এখন সত্যবিচ্যুত। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তোমরা এতোদিন মিথ্যা ইবাদতে লিপ্ত ছিলে। সাহাবাগণ জবাব দিয়েছিলেন, প্রকৃত সত্য হচ্ছে-আল্লাহ্পাকের বিধান। আর আল্লাহ্পাকের বিধানবিরোধী যা কিছু সেগুলো হচ্ছে মিথ্যা। যতোদিন কেবলা হিসেবে বায়তুল মাকদিস আল্লাহ্পাকের বিধানাবদ্ধ ছিলো, ততোদিন সেটাই ছিলো হেদায়েত। এখন সেই বিধান পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই এখন তা গোমরাহী।

কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে বনী নাজ্জার গোত্রের আসাদ বিন জুরাহ্ এবং বনী সালমা গোত্রের বারাহ্ বিন মারুর ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমাজপতি। আরো কতিপয় মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছিলেন কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে। তাঁদের প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনেরা রসুল পাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আল্লাহ্পাক আপনাকে এখন হজরত ইব্রাহিমের কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের ভাইয়েরা বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ আদায়ের সময়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের কি অবস্থা হবে? আল্লাহ্পাক তখন নাজিল করলেন, 'ওয়ামা কানাল্লাহু লি ইউদ্বিয়া ইমানাকুম।' (আল্লাহ্পাক এমন নন যে, তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন)। তাই বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত ইমান অর্থ হবে নামাজ, যে নামাজ পাঠ করা হয়েছিলো বায়তুল মাকদিস মুখী হয়ে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত বারা বিন আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে— কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে কেউ কেউ শহীদ অবস্থায় এবং কেউ কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দানের পর বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হচ্ছিলো না যে, তাঁদের নামাজের কি অবস্থা হবে। তাঁরা কি সওয়াব পাবেন, নাকি বঞ্চিত হবেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৪

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

❐ আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

এই আয়াতটি কেবলা পরিবর্তনের প্রারম্ভিকা, যদিও এটি পরে সন্নিবেশিত হয়েছে। আসল ঘটনাটি হলো এই, রসুল পাক স. হিজরতের পরে মদীনায় এসে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে যাচ্ছিলেন। ইহুদীরা এতে করে বেশ প্রসন্নই ছিলো। তারা বলতো, মোহাম্মদ আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু আমাদের কেবলাকে মান্য করে। রসুল পাক স. এর ঐকান্তিক বাসনা ছিলো এই যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেনো কেবলা হিসাবে নির্ধারিত হয়। একবার তিনি হজরত জিব্‌রাইলকে একথা বলেও ছিলেন। হজরত জিব্‌রাইল জবাব দিয়েছিলেন— ভ্রাতঃ! আমিও আপনার মতোই আল্লাহ্‌পাকের এক দাস। আপনি আমা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল। আপনি বরং আল্লাহ্‌পাক সকাশে প্রার্থনা পেশ করুন। একথা শুনে তিনি স. তাঁর প্রার্থনা পেশ করলেন। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাতেন। এভাবে প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। তাঁর প্রতীক্ষার অবসান হলো। অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

প্রথম কেবলা বায়তুল্লাহ্ না বায়তুল মাকদিস এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মক্কাবাসের সময় রসুল পাক স. কাবা শরীফকে সামনে রেখে বায়তুল মাকদিস অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। হাদিসটি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ উত্তম। আবার কেউ বলেছেন, মক্কায় অবস্থানের সময় তিনি বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ পাঠ করতেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সামনে রাখতেন— একথা তাঁরা বলেন নি।

বাগবী বলেছেন, রসুলে আকরম স. হিজরতের পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌মুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর নামাজ পড়তেন বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. যখন মদীনায় এলেন তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, প্রথম দিকে বায়তুল্লাহ শরীফমুখী হয়ে রসুল স. নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তাঁর মক্কাবাসের সময়ই বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ পাঠের বিধান বলবৎ হয়। প্রায় তিন বৎসর তিনি এভাবে নামাজ আদায় করেছিলেন। এমতাবস্থায় হিজরত সম্পাদিত হয়। বর্ণনাগুলো পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, বাগবী বর্ণিত বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক ও শক্তিশালী। অন্য বর্ণনাগুলোও প্রায় সেরকমই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মদীনার জীবনে তিনি স. বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে কতোদিন নামাজ আদায় করেছিলেন সে বিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুসারে ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, সতেরো মাস। আমর বিন আউফ এবং ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে তিবরানি ও বায্‌যার বলেছেন ষোলো মাস। হজরত আব্দুল্লাহর অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী এবং হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব এর মাধ্যমে ইমাম মালেকও বলেছেন ষোলো মাস। হজরত বারা বিন আজিব থেকে বোখারীর বর্ণনাতেও ষোলো অথবা সতেরো মাসের কথা রয়েছে। আসল সময়সীমা হচ্ছে ষোলো মাস কয়েকদিন। রসুল পাক স. মক্কা থেকে পাঁচই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে বারোই রবিউল আউয়াল মদীনায় উপনীত হয়েছিলেন। আর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে পনেরোই রজব দ্বিপ্রহরের পর কেবলা পরিবর্তিত হয়। ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের দুই মাস আগে। এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। আর যাঁরা সতেরো মাসের কথা বলেছেন— তাঁরা মাসের খন্ড অংশকেও পুরো মাস ধরে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় বর্ণনা রয়েছে— যেগুলোতে বলা হয়েছে আঠারো বা উনিশ মাস— দুই মাস— দুই বৎসর ইত্যাদি। বর্ণনাগুলো দুর্বল তাই অগ্রহণীয়।

'তোমাকে এমন কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো'— কয়েক রকম অর্থ হতে পারে এই বাক্যটির। যেমন- ১. আমি আপনাকে আপনার পছন্দসই কেবলা গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করলাম। ২. আপনার প্রিয় কেবলা বায়তুল্লাহর সঙ্গে আমি আপনাকে মিলিয়ে দিলাম এবং ৩. আপনি যে কেবলার অভিলাষী সেই কেবলার দিকেই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। 'তারদ্বহা' বাক্যটির মর্ম হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের লক্ষ্যে আপনি কেবলার পরিবর্তন প্রত্যাশী ছিলেন, সেই কেবলার প্রতি আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। (পরিবর্তনপূর্ব কেবলার প্রতি রসুল পাক স. অপ্রসন্ন ছিলেন এরকম কথা কিছুতেই বলা যাবে না। কারণ, আগের নির্দেশটিও ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালারই নির্দেশ। আর

তিনি আল্লাহ্তায়ালার সকল নির্দেশের প্রতি সদাসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে ধর্মের কতিপয় মহান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তিনি কেবলা পরিবর্তনকামী হয়েছিলেন)।

'শতর' ওই বস্তুকে বলে যা অন্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আরবী বাকভঙ্গি অনুযায়ী 'দারুশ্ শুতুর' অর্থ একটি পৃথক ঘর। শব্দটি এখানে পৃথক দিক নির্ধারণসূচক হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও একদিক কখনো অন্যদিক থেকে পৃথক নয়।

কাবা শরীফকে বলা হয় মসজিদে হারাম। মসজিদে হারাম বলার হেতু এই যে- এই মসজিদের এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহ, শিকার, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেবলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যতঃ মসজিদুল হারাম না বলে কাবা বলাই সঙ্গত ছিলো। কিন্তু এখানে স্থান নির্ধারণই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। তাই মসজিদে হারাম উল্লেখিত হয়েছে। গৃহের অবস্থান নির্ধারণ করলে দুরবর্তীদের জন্য কাবাগৃহমুখী হওয়া অসম্ভব হতো। তাই কাবা নয়, কাবা গৃহের দিকে মুখ করাই উদ্দেশ্য বলে মসজিদে হারাম উল্লেখিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন- রসুল পাক স. বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কেবলা। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দূরবর্তীদের জন্য কাবার দিকই কেবলা।

আমি বলি, হাদিসে উল্লেখিত পূর্ব বলতে সংক্ষিপ্ততম দিনের পূর্ব দিক ও পশ্চিম বলতে সংক্ষিপ্ততম দিনের পশ্চিম দিক বুঝতে হবে। এর মাঝামাঝি দিক হলো দক্ষিণ। আর সেটাই মদীনাবাসীদের কেবলা। এই নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন দেশের কেবলা বিভিন্ন রকম হবে। যেমন বাংলাদেশ ও ভারতের কেবলা হবে দুই পশ্চিমের মাঝামাঝি। অর্থাৎ শীতে ও গ্রীষ্মে সূর্য যে স্থলে অস্ত যায় ওই দুই অস্তস্থলের মাঝামাঝি। মাওয়াহেব এবং ছাবিলুর রাশাদ কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে–
– রসুল পাক স. বারা বিন মা'রূর এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য কবিলায়ে বনী সালমাতে গমন করলেন। হজরত বারার পুত্রের নাম ছিলো বাশার। তাঁর মাতা রসুল পাক স.এর জন্য আহার্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে জোহরের নামাজের সময় হলো। উপস্থিত সাহাবাগণকে নিয়ে তিনি মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে শুরু করলেন। দু'রাকাত নামাজ শেষ হতেই হজরত জিব্রাইল এই মর্মে প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, এখন বায়তুল্লাহ্ই কেবলা। তিনি স. তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ জামা'ত সহ কাবা শরীফের দিকে মুখ করে অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। এই পরিবর্তনের সময় পুরুষদের স্থানে রমণীদেরকে এবং রমনীদের স্থানে পুরুষদেরকে দাঁড়াতে হলো। তখন থেকে বনী সালমার ওই মসজিদকে জু কেবলাতাইন (দু'কেবলা বিশিষ্ট) বলা হয়। ওয়াহিদী বলেছেন, এ ঘটনাটি আমার নিকট অত্যন্ত শক্তিশালী বর্ণনাসূত্রে সুসাব্যস্ত। আসল কথা হচ্ছে, রসুল পাক স. ওই মসজিদে জোহরের নামাজের প্রথম দুই রাকাত বায়তুল মাকদিসের দিকে এবং অবশিষ্ট দুই রাকাত মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে পাঠ

করেছিলেন। ওই নামাজে সাহাবী ইবাদ বিন বাশার শরীক ছিলেন। নামাজ শেষে তিনি গৃহগমনের পর একস্থানে দেখলেন, বনী হারিছার লোকেরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে আসরের নামাজ আদায় করেছেন। তিনি তখন চিৎকার করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জোহরের নামাজ রসুল স. এর সঙ্গে কাবামুখী হয়ে পাঠ করেছি। তাঁর কথা শুনে নামাজীরা তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করলেন। হজরত বারা বিন আজিব থেকে সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে— পরিবর্তিত কেবলার প্রথম নামাজ ছিলো আসরের নামাজ। আরেক সূত্রে বলা হয়েছে জোহরের নামাজ। এই দন্দ্ব নিরসনার্থে তিনটি জবাব উপস্থাপন করা যাবে। ১. সম্ভবত হজরত বারা বিন আজিবের নিকট মসজিদে বনী সালমায় রসুল স. যে জোহরের নামাজ আদায় করেছিলেন সে সংবাদটি পৌছেনি। ২. কেবলা পরিবর্তনের পর পূর্ণাঙ্গ নামাজ ছিলো আসরেরই নামাজ। জোহর নামাজের অর্ধাংশ কেবল কাবামুখী হয়ে পাঠ করা হয়েছিলো। ৩. হজরত বারা বিন আজিব রসুল পাক স. এর সঙ্গে কাবামুখী হয়ে সর্বপ্রথম যে নামাজ পড়েছিলেন তা ছিলো আসরের নামাজ।

কোবা এলাকার মুসলমানদের নিকট কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌছেছিলো পরদিন ফজরের সময়। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোবাবাসীরা ফজরের নামাজ পাঠ করছিলেন, এমন সময় একজন এসে জানালেন, কেবলা পরিবর্তিত হয়েছে। এখনকার কেবলা বায়তুল্লাহ। এই কথা শুনে নামাজিরা তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। হজরত রাফে বিন খাদিজ বর্ণনা করেছেন, আমরা বনি আবদুল আসহাল গোত্রের মসজিদে নামাজ আদায় করছিলাম— এক লোক এসে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ পাক এখন থেকে রসুল স. কে কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইমাম কেবলা পরিবর্তন করলেন। আমরাও কেবলা পরিবর্তন করলাম।

'তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো উহার দিকে মুখ ফিরাও'— এই নির্দেশটি ঘোষিত হয়েছে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি। রসুল পাক স.কে সম্বোধন করা হলেও সেই সম্বোধনের অন্তর্ভূক্ত হতেন তাঁর সকল উম্মত কিন্তু উম্মতকে অধিকতর সতর্ককরণের উদ্দেশ্যে এমতোন সম্বোধন উচ্চারিত হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে নামাজ পাঠ করেননি। গৃহের প্রতিটি কোণে দাঁড়িয়ে কেবল দোয়া করেছিলেন। এরপর বাইরে এসে কাবার দিকে মুখ করে তিনি নামাজ আদায় করলেন এবং এরশাদ করলেন, এটাই হচ্ছে কেবলা। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ স. হজরত ওসামা, হজরত বেলাল এবং হজরত ওসমান বিন তালহাকে সঙ্গে নিয়ে কাবা শরীফের ভিতর প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যখন তাঁরা বাইরে এলেন তখন আমি হজরত বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম— রসুল স. গৃহাভ্যন্তরে কি করলেন? হজরত বেলাল বললেন, গৃহের দু'টি স্তম্ভকে বাঁয়ে, একটিকে ডানে এবং তিনটিকে পিছনে রেখে তিনি নামাজ আদায় করলেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট জানা যায় যে, ওই সময়ে কাবা শরীফ ছিলো ছয় স্তম্ভ বিশিষ্ট। বর্ণিত হাদিস দু'টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। ব্যাপারটা এরকম হওয়াই যুক্তিযুক্ত যে— একবার তিনি কাবাগৃহে প্রবেশ করার পর বাইরে এসে নামাজ আদায় করেছেন। আর একবার নামাজ পড়েছেন কাবাভ্যন্তরে।

গ্রন্থধারীগণ ভালোভাবে জানতো যে, কেবলা পরিবর্তন একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। কারণ, তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সর্বশেষ নবী দুই কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন। একথা জানা সত্ত্বেও ক্ষোভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছিলো। আয়াতে তাই বলা হয়েছে- যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এই নির্দেশটি তাদের প্রতিপালক প্রেরিত একটি সত্য নির্দেশ। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অনবহিত নন। আয়াতের সর্বশেষে উল্লেখিত 'ইয়া'মালুন' শব্দটিকে ক্বারী আবু জাফর, ইবনে আমের, হামজা এবং কাসায়ী পড়তেন 'তা'মালুন'। এরকম পড়লে 'তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন'— একথাটি সম্বন্ধিত হবে মুমিনদের সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে এরকম— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা করছো আল্লাহ্পাক সে সম্পর্কে বেখবর নন, অবশ্য তার প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। শেষ বাক্যটি মূলতঃ অঙ্গীকার। 'ইয়া' মালুন' শব্দ সহযোগে এই অঙ্গীকারের স্বরূপ হবে এ রকম- হে ইহুদীরা! তোমরা যে অপকর্মসমূহ করে যাচ্ছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক উদাসীন নন। কর্মফলের শাস্তি অবধারিতই রয়েছে।

ইহুদী— খৃষ্টানেরা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে কেবলা পরিবর্তনের প্রমাণ জানতে চাইলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

❒ যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর তবুও তাহারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করিবে না; এবং তুমিও তাহাদের ক্বিবলার অনুসারী নও, এবং তাহাদের কতক পরস্পরের ক্বিবলার অনুসারী নহে। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি সীমালঙ্ঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

❒ আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহা সেইরূপ জানে; যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাহাদের একদল জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে।

❒ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা।

যতোই দলিল প্রমাণ পেশ করা হোক না কেনো— ইহুদীদের সন্দেহ ঘুচবে না। তারা প্রকৃতপক্ষে প্রমাণপ্রত্যাশী নয়। চরম হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই তারা বার বার সত্যের বিরোধিতা করে চলেছে। আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'আপনি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ করেন, তবুও তারা আপনার কেবলার অনুসারী হবে না।'

'তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও'— একথার অর্থ, এখন থেকে বায়তুল্লাহ শরীফই স্থায়ী কেবলা—যা আর কস্মিনকালেও রহিত হবে না। এরকম বলার উদ্দেশ্য এই— রসুল স. পুনরায় আবার কখনো বায়তুল মাকদিসমুখী হবেন- ইহুদীদের এরূপ অপআকাঙ্খা যেনো আর অবশিষ্ট না থাকে।

'তাদের কেবলার অনুসারী নও'— এখানে তাদের বলতে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের কেবলা বুঝানো হয়েছে। যদিও তাদের কেবলা পৃথক। কিন্তু আয়াতে তাদের কেবলাকে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যবিমুখতা ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে যেহেতু তারা এক, তাই এখানে তাদের কেবলাকে প্রকাশ করা হয়েছে একবচনে। ইহুদীদের কেবলা বায়তুল মাকদিসের পশ্চিম দিকে এবং খৃষ্টানদের কেবলা পূর্ব দিকে। এ জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে- তাদের কেউ একে অপরের কেবলার অনুসারী নয়।

'তোমার নিকট জ্ঞান আগমণের পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তবে নিশ্চয়ই তুমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'— এখানে তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো- বাক্যটি শর্তসম্বলিত। এরকম শর্ত সম্বলিত

বাক্যের দু'টি দিক থাকে। একটি বাস্তব। অপরটি অবাস্তব। যেমন কোনো বৃদ্ধ লোক বললো, আমি যদি যুবক হয়ে যাই তবে তিনটি বিয়ে করবো। এখানে বৃদ্ধটির যুবক হওয়া অসম্ভব— কাজেই তার বক্তব্যের একটি দিক বাস্তবায়নও অসম্ভব। আলোচ্য বাক্যটিও তেমনি, যার একটি দিকের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণতই অসম্ভব। সেদিকটি হচ্ছে— 'যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর'। দৃষ্টান্ত হিসাবে কোরআন মজীদের ওই আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হয়েছে, 'আপনি বলুন! যদি আল্লাহ্পাকের সন্তান থাকতো তবে আমি তার প্রথম উপাসক হতাম।' এই বাক্যটিও একটি এমন শর্তসম্বলিত বাক্য যার একটি দিক অসম্ভব। সেদিকটি হচ্ছে- যদি আল্লাহপাকের সন্তান থাকতো। এমতাবস্থায় অপর দিকটি সঙ্গত কারণেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। আল্লাহ্পাকের সন্তান থাকা যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু তার উপাসক হওয়াও অসম্ভব। তেমনি এই আয়াতের বর্ণনায় রসুল পাক স. এর পক্ষে যেহেতু ইহুদীদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা অসম্ভব, সেহেতু তার পক্ষে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও অসম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে— যদি অসম্ভবই হয়, তবে এ ধরনের বর্ণনায় কি লাভ? প্রথম জবাব হচ্ছে— বর্ণিত আয়াত উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। যার মর্ম হচ্ছে— সাবধান! নবীর পক্ষে যে কাজ সম্ভব নয়, তোমরা তাঁর উম্মত হয়ে কস্মিনকালেও আল্লাহ্পাকের বিধানের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃষ্টানদের বাসনার অনুবর্তী হয়ো না। এ রকম সাবধানবাণীর আরো কিছু কারণ রয়েছে- যেমন, ১. বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করা, ২. শপথের পর্যায়ভূক্ত করা, ৩. ন্যুনতম অনুসরণকেও নিষিদ্ধ করা, ৪. প্রিয়জনের প্রতি একটি অনুসরণীয় সতর্কবাণীর রূপ নির্ণয় করা। ৫. 'মা জা'আকা'- এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর পরই 'মিনাল ইলমি'- এই রীতির সংযুক্তি দ্বারা বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা। ৬. এলেম বা জ্ঞানকে সুনির্দিষ্ট করা, ৭. 'জাযা' শব্দটিকে লামে তাকীদ এবং 'জুমলা'ই ইছমিয়া' দ্বারা মুয়াক্কাদ করা। ৮. 'ইজা' শব্দটিও মুবালিগার অর্থবহ, ৯. 'মীন' অব্যয়টি আংশিক অর্থবহ যদ্দারা অধিক মুবালিগা ধর্তব্য, ১০. 'আজ্জোয়ালিমীন' শব্দে আল যুক্ত করে জুলুমকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ১১. জুলুমকে কোনো শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়নি। যারা জুলুম করে তারা সাধারণ্যে জালেম হিসেবেই পরিচিত।

'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপ চিনে, যেমন চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে'— এখানে তাকে চেনে অর্থ, রসুলুল্লাহ স. কে চেনে। চেনে এই কারণেই যে, তওরাতে তাঁর সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তওরাতে তাঁর প্রতি ইমান আনার জন্য তারা নির্দেশিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'ইয়া'রিফুনাহু' শব্দের 'হু' (তাঁকে) সর্বনামটি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর প্রতি সম্বন্ধিত। কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, সর্বনামটি কোরআন পাকের সঙ্গে অথবা কেবলা পরিবর্তনের বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে সম্বন্ধ রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কোরআন অথবা কেবলা পরিবর্তনের বিধানের

সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে, পরবর্তী বাক্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্য বজায় থাকে না। কারণ পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে।' এরকম উপমা প্রদর্শনের কারণ এই যে, সন্তানেরা স্বগৃহে লালিত পালিত হয় বলে তাদের আকার আকৃতি অবয়ব কোনোকিছুই অবিদিত থাকে না। রসুল পাক স. সম্পর্কেও তেমনি তারা অনবগত নয়। তাঁর আকার, অবয়ব ও পরিচিতি স্পষ্টাক্ষরে তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি যে প্রকৃতই নবী— তা তারা ভালোভাবেই জানে। হিংসা, হঠকারিতা ও জাত্যাভিমানের কারণেই তারা তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। যদি 'ইয়া'রিফুনাহু' শব্দের 'হু' সর্বনামটি কোরআন পাকের সঙ্গে সম্বন্ধিত হতো, তবে ' যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে' একথা না বলে ' যেরূপ তারা তওরাতকে জানে বা চিনে' এরূপ বলা হতো।

হজরত ওমর একবার হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী করে আপন সন্তানদের মতো রসুলে পাক স. কে চিনেন? তিনি বললেন, যখন আমি সর্বপ্রথম রসুলপাক স. কে দেখেছি তখন আমি তেমনিভাবে চিনেছি যেমন চিনি আপন সন্তানদের। হজরত ওমর বললেন, কিন্তু তা কিভাবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাদের কিতাবে তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। সে কারণেই তাঁকে চিনতে আমার কোনোই অসুবিধা হয়নি। বরং আপন সন্তান সম্পর্কেও সংশয় থেকে যেতে পারে। কারণ, সন্তানের মা হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে (অন্যের সন্তানকেও তার স্বামীর সন্তান বলে ঘোষণা দিতে পারে)। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনোপ্রকার সংশয়েরই অবকাশ নেই। যেহেতু এখানে সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্পাক। হজরত ওমর বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আল্লাহ্ পাক আপনার কল্যাণ করুন।

'তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে'— একথার অর্থ অবিশ্বাসী ইহুদীরা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর গুণাবলী, নবুয়ত, দুই কেবলার বিধান— এ সকল কিছুই তওরাতের মাধ্যমে জানা সত্ত্বেও প্রকাশ করে না।

'সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত'- একথার অর্থ, হে নবী! সত্য সেটাই যা আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত এবং যার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। গ্রন্থধারীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত তা সত্য নয়। কিছুতেই নয়। সুতরাং হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে সন্দিহানদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। শেষ ব্যাক্যটির কয়েক রকম অর্থ হতে পারে। যেমন, ১. আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না, যারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। ২. সত্য সম্পর্কে জেনেও যারা সত্য গোপন করে, আপনি তাদের দলভুক্ত হবেন না। ৩. অথবা রসুল পাক স.কে সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে এখানে এই মর্মে শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, তারা যেনো আরেফ বিল্লাহ (আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) গণের সঙ্গে থেকে মারেফাত অর্জন করে এবং এভাবে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। সন্দেহবাদীদের সংসর্গ মানুষকে বিশ্বাসচ্যুত করে। তাই

এখানে এই চিরন্তন সদুপদেশটি দেয়া হয়েছে এভাবে— সন্দিহানদের অন্তর্ভূত হয়ো না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৮,১৪৯,১৫০

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ
جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ○ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ
حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

❐ প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে, যে দিকে সে মুখ করিয়া দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❐ যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নহেন।

❐ এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে সীমালংঘণকারীগণ ব্যতীত অপর কোন লোক তোমাদের সহিত বিতর্ক না করে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর যাহাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদিগকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি ও যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার।

প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক কেবলা। আল্লাহ্ পাকের বিধান এরকমই। আল্লাহ্ পাক হজরত মুসার জন্য যেমন কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তেমনি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর জন্যও স্বতন্ত্র কেবলা বিধিবদ্ধ করেছেন। কেবলা নির্ধারণ হচ্ছে ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপার, যে সম্পর্কে কারো মতামত প্রদানের অধিকার নেই। সুতরাং, এ বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের কোনো অবকাশ নেই। তাই বলা হয়েছে, 'অতএব তোমরা সৎ কর্মে প্রতিযোগীতা করো।' অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান পালনের দিকে অগ্রসর হও। যখন তিনি বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার বিধান জারি করেন, তখন সেই দিকে মুখ করো। আবার যখন বায়তুল্লাহ মুখী হতে বলেন, তখন নির্বিবাদে বায়তুল্লাহ্কে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করো। বিনাবাক্যে আল্লাহ্র বিধানকে মেনে নেয়াই ইমান এবং এই বিধান অনুযায়ী আমল করার নামই ইবাদত। যদি বিধান অমান্য করো তবে মনে রেখো- সম্মুখে রয়েছে মৃত্যু, মৃত্যুত্তর জীবন, হাশর। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেনই। অতএব তাঁর আজ্ঞাবহ হও। পরিবর্তিত কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করো।

বায়তুল্লাহ্ শরীফই হচ্ছে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত কেবলা। কিছুতেই কেবলা স্থির করা যাচ্ছে না- এমন অবস্থায় পড়লে, অন্তরের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যেদিককে কেবলা মনে হবে সেদিকে মুখ করেই নামাজ আদায় করতে হবে। ভ্রাম্যমান অবস্থায় বাহন যেদিকে চলবে সেদিকেই কেবলা ধরে নিয়ে নফল নামাজ আদায় করা যাবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে এবং তা আদায় করতে হবে কেবলামুখী হয়ে। সেই কেবলা পশ্চিমে হোক বা পূর্বে। গৃহে, প্রবাসে, সকল অবস্থায় নামাজের সময় কেবলামুখী হওয়া ফরজ। আয়াতে তাই বলা হয়েছে, ' যেখান থেকেই তুমি বের হওনা কেনো— মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।' এই বিধানটি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হচ্ছে এ কারণে যে— গৃহে, প্রবাসে সকল অবস্থায় কেবলার হুকুম একই। হজরত হুজায়ফা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, আমাকে এবং আমার উম্মতবর্গকে তিনটি বিশেষত্বের মাধ্যমে মর্যাদামন্ডিত করা হয়েছে। ১. আমাদের নামাজের জামাতগুলো ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ জামাতের অনুরূপ। ২. আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ। যেখানে খুশী সেখানে আমরা নামাজ আদায় করতে পারবো। ৩. মাটির মাধ্যমে আমাদেরকে পবিত্র হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আংশকা থাকলে আমরা মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' করে পবিত্র হতে পারি।

কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত এই যে, কেবলা পরিবর্তনের মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। ১. রসুলুল্লাহ্ স. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। কারণ, তাঁর বাসনানুযায়ী কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছে। ২. আল্লাহ্ পাকের স্বাভাবিক সাধারণ

বিধান হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ নবীগণের জন্য স্বতন্ত্র কেবলা নির্ধারণ। তাই তাকেও হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুসার মতো স্বতন্ত্র কেবলা দেয়া হয়েছে। ৩. বিরুদ্ধবাদীদেরকে নির্বাক করে দেয়াও কেবলা পরিবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে, বিষয়টি বার বার উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু এর প্রতি গভীর অভিনিবেশ নিবদ্ধ করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কেবলা পরিবর্তন একটি বহুল আলোচিত, আলোড়িত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক বিধান রহিত করে তদস্থলে অন্য বিধান বলবৎ করলে স্বভাবতই বিশৃংখলা মাথা তুলে দাঁড়াবার অবকাশ পায়। তাই সন্দেহের মূলোৎপাটনকল্পে বিষয়টিকে বার বার উল্লেখের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যৌক্তিকতাবিরোধী নয়। আয়াতে তাই বলা হয়েছে, সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীত অপর কেউ যেনো তোমাদের সাথে বিতর্ক না করে। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছে এই কারণে যে, ইহুদীরা যেনো তোমাদের প্রতি দোষারোপ করার সুযোগ না পায়। কারণ তাদের কিতাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে, ইব্রাহিমের কেবলা বায়তুল্লাহ, শেষ নবীর কেবলাও বায়তুল্লাহ্। এখন কেবলা পরিবর্তন না করা হলে তারাই আপত্তি উত্থাপন করে বলবে, দেখো! ইনি শেষ নবী নন— যদি হতেন, তবে তওরাতের বর্ণনানুযায়ী তিনি বায়তুল্লাহকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করতেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কেবলা করার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে এখন থেকে মুশরিকেরাও তোমাদের প্রতি দোষারোপ করতে পারবে না। কারণ, তারা জানে, কাবা শরীফ হচ্ছে হজরত ইব্রাহিমের কেবলা আর রসুল পাক স. ইব্রাহিমী মিল্লাতের দাবীদার। সুতরাং এখন থেকে তাদের একথা বলার অধিকারও রহিত হয়ে গেলো যে, রসুলুল্লাহ স. ইব্রাহিমী মিল্লাতের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কেবলাকে গ্রহণ করেননি।

'সীমালংঘনকারীগণ বা জালেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ বির্তকে লিপ্ত হবে না'— — এ কথার অর্থ, যারা সচেতন ও বুদ্ধিমান তারা একথা সহজেই বুঝে নিতে পারবে যে, কেবলা পরিবর্তনের এই বিধানের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তি প্রমাণই দাঁড় করানো যাবে না। কিন্তু সীমালংঘনকারীরা সত্তাগতভাবে হিংসা ও বিদ্বেষভাবাপন্ন। তারা তো বিভিন্ন রকম কথা বলবেই। বাস্তবেও তাই দেখা গেলো— কোরাইশদের দলপতিরা বলতে শুরু করলো, এতোদিনে মোহাম্মদের হুঁশ হলো। সে আমাদেরকে বলতো, পথচ্যুত। শেষ পর্যন্ত আমাদের কেবলাকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হলো সে। ওদিকে ধূর্ত ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ ভালো করেই জানে যে, বায়তুল মাকদিসই হচ্ছে প্রকৃত কেবলা। তবুও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এবং জাতিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে সে কেবলা পরিবর্তন করে ফেললো। যারা সত্য বিদ্বেষী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তারা দলিল প্রমাণের কোনো ধার ধারে না। তারা অবিশ্বাসী। বিদ্রোহী। সুতরাং তারা অনর্থক বাক বিতন্ডা করতেই থাকবে। এ বিষয়ে শংকাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে ভয় কোরো না, শুধু আমাকেই ভয় করো- যাতে

আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পারো।'

'যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি'—এ কথার অর্থ, আমাকে ভয় করো আমি তোমাদেরকে রক্ষা করবো এবং যে অক্ষয় বৈভব তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি, তা দান করবো। এই অক্ষয় বৈভব আর নেয়ামত সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ এসেছে এরকম- রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, নেয়ামতের পূর্ণত্ব হচ্ছে- জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি ও বেহেশতে বসবাসের অধিকার। হজরত মুআজ থেকে বোখারী ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী বলেছেন, নেয়ামতের পূর্ণত্ব অর্থ, ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করা।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫১, ১৫২

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○

❒ যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করিয়াছি যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়।

❒ সুতরাং তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না।

'যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করেছি'— এখানে তোমাদের বলতে বুঝানো হয়েছে কোরাইশ এবং তাদের অনুসারীদেরকে। আল্লাহ্ পাক হজরত ইব্রাহিমকে জানিয়েছিলেন, আমি তোমাকে ইমাম মনোনীত করবো। তিনি বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ! আমার বংশধরকেও ইমাম বানিয়ে দিও। তাঁর এই প্রার্থনা কবুল হয়েছিলো– তাই কোরাইশরা অন্যদের নেতা। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, অন্যান্য মানুষ কোরাইশদের অনুসারী।

মোহাম্মদ ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম কয়েকটি প্রার্থনা করেছিলেন- তার মধ্যে একটি এই— 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার আনুগত্য দান করো। আমার সন্তানদের এক দলকেও তোমার অনুগত করে নিও।'

আরেকটি প্রার্থনা ছিলো— 'আয় আল্লাহ! তাদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করো।' এই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম–এখন আমি ইব্রাহিমের প্রার্থনা বাস্তবায়ন করবো। তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবো। মুসলমান বানিয়ে দেবো এবং আমার নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণরূপে দান করবো। এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি। এই রসুল প্রেরণের সঙ্গে পরবর্তী আয়াতের সংযোগ সাধিত হয়েছে এভাবে— রসুল প্রেরণ করে আমি তোমাদের স্মরণ করেছি, কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো। যদি স্মরণ করো, তবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্পাককে স্মরণ করে, তবে সেই স্মরণের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে স্মরণ করেন। আল্লাহপাকের প্রথম স্মরণ করার অর্থ হলো— তিনিই বান্দাকে স্মরণ করার তৌফিক দেন। পরে স্মরণ করার অর্থ হলো— সেই স্মরণের প্রতিদান দেন।

এখানে রসুল অর্থ মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম। তিনি আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন। মানুষকে পবিত্র করবেন। কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং মানুষ যা জানেনা সেই জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এখানে দু'বার শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে কিতাব ও হিকমত এবং অন্যটি হচ্ছে এলমে লাদুন্নী। এই এল্মে লাদুন্নী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তোমরা জানতে না। এই অজানা জ্ঞান কোরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান। রসুলুল্লাহ স.এর পবিত্র বক্ষাধার সেই জ্ঞানের আধার। এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের উর্ধ্বে।

জ্ঞাতব্য ঃ জ্ঞান দু'ধরনের। ১. অর্জিত জ্ঞান (এলমে হুছুলী), ২. আত্মজ্ঞান (এলমে হুজুরী)। অর্জিত জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত। নবী রসুলগণ এই আত্মজ্ঞানের অধিকারী। তাই তাঁদের অন্তর— দর্পণে মারেফাতের সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃত বিশ্বাসীরা নিজেদের অন্তরের আয়নায় সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করে আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে থাকেন। ওই আয়নার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন দুরূহ। এই জ্ঞান সত্তাসন্নিহিত, সত্তাস্থিত। সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে যেমন কোনো দলিল প্রমাণের আবশ্যক করে না। আমিই যে আমি— একথা সহজেই বুঝা যায়। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানীরাও তেমনি সহজেই বুঝেন যে, আল্লাহ্ই আল্লাহ্। সন্দেহ প্রমাণ কোনোকিছুরই প্রবেশাধিকার নেই সে অতুলনীয় বিশ্বাসে। কোরআন মজীদের প্রকাশ্য বর্ণনা দলিল প্রমাণ অর্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মজ্ঞান যেহেতু সত্ত্বানির্ভর তাই এই জ্ঞান মানুষ তার

অস্তিত্বের আধারেই বহন করে চলেছে। সত্তা থেকে সত্তায় বয়ে চলেছে এই জ্ঞানপ্রবাহ। সেই প্রবাহের শিক্ষক ও পরিচালক হচ্ছেন মহান সুফী সম্প্রদায়।

হজরত হানজালা বিন রবীয় উসাইয়েদী থেকে মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে (হজরত হানজালা বলেন) —একবার হজরত আবু বকরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? আমি বললাম, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সোবহানাল্লাহ্! সে কি কথা। আমি বললাম, যতোক্ষণ আমি রসুলের দরবারে অবস্থান করি ততোক্ষণ তাঁর পবিত্র সংসর্গে নিজেও পবিত্র হয়ে যাই। তিনি যখন বেহেশত্ ও দোজখের বিবরণ দেন তখন মনে হয় বেহেশ্ত দোজখ সব কিছুই প্রত্যক্ষ করি। যখন গৃহে ফিরে আসি তখন সেই পবিত্র অবস্থা আর থাকে না। স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যাই বলেই আমার এই অধঃপতন। হজরত আবু বকর বললেন, আমারওতো ওই একই অবস্থা। দু'জনে তখন একত্রে রসুলে পাক স.এর দরবারে গমন করলেন। হজরত হানজালা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। যতোক্ষণ আমরা আপনার পবিত্র সাহচর্যে অবস্থান করি ততোক্ষণ আমাদের এমতোন অবস্থা থাকে যে, আপনার বর্ণিত বেহেশ্ত দোজখ যেনো আমাদের নিকট প্রত্যক্ষগোচর থাকে। আর যখন নিজেদের সংসারে ফিরে যাই তখন এই অবস্থা আর থাকে না। রসুলপাক স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন সেই পরম সত্তার শপথ, আমার সংসর্গে তোমাদের যে অবস্থা হয় তা যদি স্থায়ী হতো তবে তোমাদের চলাফেরার সময়, শয়নকক্ষে— সকল অবস্থায় ফেরেশতারা তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতো। এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে সার্বক্ষণিক পবিত্রাবস্থা যা ফেরেশ্তা জগতের জন্য শোভনীয়। ফেরেশ্তা জগত প্রতিষ্ঠিত হলে জড়জগতের অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই এই পবিত্রাবস্থা হবে সাময়িক, সার্বক্ষণিক নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন— আমি হজরত রসুল স. থেকে জ্ঞানের দু'টি পাত্র অর্জন করেছি। একটি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করেছি। অন্যটি করিনি। যদি করতাম, তবে আমার কণ্ঠদেশ কর্তিত হতো। বোখারী। হাদিসের ভাষ্যকারগণ বলেন— দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান ছিলো অত্যাচারী সম্রাট ও শাসকদের পরিচিতিসম্ভূত জ্ঞান। যেমন, অপর একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, আয় আল্লাহ! আমি ষাট হিজরীর প্রারম্ভে ওই সকল অপ্রবীনদের যে রাজত্ব শুরু হবে তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। একথার মধ্যে এজিদের রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস থেকে ভাষ্যকারগণ যে মর্ম উদ্ধার করেছেন, তা হাদিসের প্রকৃত মর্ম নয়। কারণ আংশিক কতকগুলো ঘটনাপঞ্জিকে জ্ঞানের পাত্র বলা এবং শরিয়ত সম্পর্কিত বিদ্যার পাত্র স্থির করা কোনোক্রমেই হাদিসের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। প্রচারযোগ্য জ্ঞানকে যেমন একটি পাত্র বলা

হয়েছে। তেমনি অপ্রচারযোগ্য জ্ঞানকেও আরেকটি পাত্র বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝে নিতে হবে যে, প্রকাশ্য জ্ঞানের পাত্র গোপন জ্ঞানের পাত্রের সমান্তরাল অর্থাৎ সমগুরুত্ব সম্পন্ন। তাই আমি বলি, সেই গোপন জ্ঞান হচ্ছে এল্মে লাদুন্নী। এবার কেউ যদি প্রশ্ন করে, যদি তাই হয় তবে কণ্ঠচ্ছেদনের প্রশ্ন আসে কেনো? জবাবে বলতে হয়, হাদিসের প্রকৃত বক্তব্য এরকম— আমি সেই জ্ঞানের কথা ভাষায় প্রকাশ করলে লোকে আমার গলা কেটে দেবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, এলমে লাদুন্নীর অধিকারী ব্যক্তি তার ওই বিদ্যাকে ভাষায় রূপ দিতে অপারগ। ভাষার মৌখিক ও লিখিত রূপের মাধ্যমে এ বিদ্যা শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। এই বিদ্যা গ্রহণ করতে হয় অন্তর থেকে অন্তরে, আত্মা থেকে আত্মায়। মৌখিক বা লিখিত জ্ঞানকে বলে এল্মে হুছুলী বা অর্জিত জ্ঞান। বিষয়বস্তু, শব্দসম্ভার, শ্রুতি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি— এ সকল কিছুর সহযোগে যে বিদ্যা অর্জিত হয় তাকেই বলে অর্জিত বিদ্যা। পক্ষান্তরে এল্মে লাদুন্নী হচ্ছে— আত্মসমাহিতিসম্ভূত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে এলমে হুজুরী বলা যেতে পারে। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত। এই জ্ঞানের বিবরণ দিতে গেলে বক্তাকে রূপক ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ ভাষাবিদগণের নিকট রূপক অর্থ গ্রহণের শর্ত হচ্ছে— প্রকৃত ও রূপকের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক থাকতে হবে। কোরআন মজীদে অনেক স্থানে রূপক অর্থের ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়। সে সকল রূপক অর্থ প্রকাশ্য অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও দিব্যজ্ঞান শুধু আরবী কেনো, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কথক অথবা লেখকের রূপক ভাষা অযোগ্য শ্রোতা ও পাঠকের চিন্তায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এরকম অযোগ্য ব্যক্তিরা রূপক বিষয়কে তাদের অপবিত্র ও অপরিণত ধারণায় আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারা তখন বক্তাকে কাফের ফাসেক ইত্যাদি বলতে শুরু করে। শায়েখ মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবীর তত্ত্বকথা পাঠ করে এবং তাঁর রূপক বর্ণনা সমূহের মর্ম বুঝতে সক্ষম না হয়ে অনেক আলেম শিরক প্রভাবিত তৌহিদকে আশ্রয় করেছিলো। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া জারী করেছিলো। তবে ওই সকল আলেম এই ফেতনা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন যাঁরা শায়েখ আরাবীর বক্তব্যকে এল্হাম অথবা আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তার অভিমত সমূহকে তারা রূপক অর্থে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে তাদের নিকট উম্মোচিত হয়েছিলো এল্মে লাদুন্নীর অলৌকিক তোরণ। সেই সূত্রে তাঁরা তখন সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এলমে হুছুলী ও এলমে হুজুরীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সমূহকে।

যে জ্ঞানের শব্দায়ন অসম্ভব, সে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করতে গেলে বিশৃংখলা অনিবার্য; এরকম যদি কেউ করে, তবে তাকে কাফের ফাসেক ইত্যাকার নানা বিশেষণে নিন্দিত হতে হয়। হজরত আবু হোরায়রা এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই বলেছিলেন— দ্বিতীয় পাত্রটি প্রকাশ করলে আমার

কণ্ঠচ্ছেদ করা হবে। অর্থাৎ জনসাধারণ যেহেতু অজ্ঞ, অযোগ্য— তাই কেউ আমার বক্তব্যভঙ্গিমা বুঝবে না এবং আমাকে ধর্মত্যাগী মনে করে হত্যা করে বসবে।

প্রশ্ন হতে পারে, যে জ্ঞানের ভাষা নেই এবং যে জ্ঞান প্রকাশোদ্যত হলে রক্তপাত অনিবার্য হয়, সে জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় কি লাভ? অথচ আমরা দেখছি, আধ্যাত্মিক সাধকগণ এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, ফুসুসুল হিকাম, ফতুহাতে মাক্কিয়া ইত্যাদি। এ প্রশ্নের জবাব এই— ওই সকল গ্রন্থ প্রনয়নের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, ওগুলো পাঠ করে কারো এল্‌মে লাদুন্নী লাভ হবে অথবা ওগুলো অধ্যায়ন করে কেউ হয়তো কিছুটা নৈকট্য বা বেলায়েত লাভ করবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, আধ্যাত্মিক পথে যে পথিক চলমান অথবা প্রেমাপ্লুত (সালেক ও মজ্জুব বা জজ্‌বা প্রাপ্ত) সে তার সংক্ষিপ্ত আত্মিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ লাভ করবে। এভাবে পূর্বসূরীগণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার সমন্বয় সাধন করবে। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, ওই মহাত্মাগণ ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রন্থাবলী সংকলন করেননি। আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রাবল্যের প্রেক্ষিতে তাঁরা কখনো কখনো রহস্যপূর্ণ কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁদের অনুসারীরা সেকথা লিপিবদ্ধ করে প্রচার করেছেন। ওই সকল কিতাবকে অস্বীকার না করাই সমীচীন। শরিয়তের সমান্তরালে সেগুলো বুঝা সম্ভব হলে বুঝতে হবে অথবা এরূপ বলতে হবে— আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত। ওই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণই রূপক। তাদের কোনো কথাই শরিয়ত বিরুদ্ধ নয় বরং প্রকৃত অর্থে সেগুলো কিতাব ও সুন্নাহ্‌রই নিগুঢ় তত্ত্ব। আল্লাহ্‌পাক তাঁর আপন মহিমায় আমাকেও ওই নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ মহান সুফীগণ নিমগ্নতা, বিভোরতা ও অবস্থার প্রাবল্যে (গালবায়ে হালের সময়ে) তাঁদের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করেন। সেগুলো প্রকাশ্যত শরিয়ত বিরোধী মনে হলেও মূলতঃ দূষনীয় নয়। যখন বাহ্যিক জ্ঞান লুপ্ত হয় তখন মানুষের পাপ পুণ্য লিখন কার্য্যও স্থগিত থাকে। সুফী সম্প্রদায়ের বাণীগুলো ওই অবস্থার বিবরণ যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। শরিয়তবিরুদ্ধ কোনো তরিকত প্রতিষ্ঠা সেগুলোর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। অবশ্যই ছিলো না।

পরম তত্ত্বের পরিচিতি লাভ হয় অন্তরের বিবর্তন এবং অলৌকিক প্রাপ্তির মাধ্যমে। অধিক জিকির ও মোরাকাবা ওই প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। সেই জিকির ও মোরাকাবা সম্মিলিতভাবে হোক অথবা এককভাবে। আল্লাহ্‌পাক সেই জিকিরের প্রতি আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন এভাবে- 'ফাজকুরুনী' (তোমরা আমার স্মরণ কর)। এরপর বলেছেন, 'আজকুরকুম' (আমি তোমাদের স্মরণ করবো)। আবু শাইখ এবং দায়লামী মস্‌নদে ফিরদাউস গ্রন্থে জোবায়েরের মাধ্যমে, তিনি জুহাকের মাধ্যমে এবং তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে

করীম স. 'ফাজকুরুনী আজকুরকুম' আয়াতের শানে এরশাদ করেছেন— আল্লাহ্ পাক বলেন, হে বান্দাসকল তোমরা আমাকে ইবাদতের মাধ্যমে স্মরণ করো। আমি মাগফিরাত সহ তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত করো আমি তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন— আমার বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সেই ধারণার অনুকূল। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে স্মরণ করি। সে যদি কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে স্মরণ করে, তবে অধিকতর উত্তম অনুষ্ঠানে আমি তার স্মরণ করি। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তবে আমি অগ্রসর হই এক হাত। সে যদি এক হাত আসে তবে আমি গমন করি দুই হাত। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে অগ্রসর হই দৌড়ে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকে বাগবীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সাথে একথাটিও রয়েছে যে, হজরত আনাস বলেছেন, নিজের পাঁচটি আঙ্গুল গণনা করার মতো স্পষ্টরূপে এই হাদিসটি আমি রসুলপাক স. এর নিকট থেকে শুনেছি।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাকীক থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স.এরশাদ করেছেন, মানুষের অন্তর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। একটি কক্ষে ফেরেশ্তা ও অপর কক্ষে শয়তানের অবস্থান। যখন মানুষ আল্লাহ্ পাকের জিকির করে তখন শয়তান তার কুঠুরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর যখন জিকির থেকে অমনোযোগী হয়, তখন শয়তান তার ঠোঁট অন্তরে প্রবেশ করিয়ে কুমন্ত্রনা দেয়। ইবনে আবি শায়বা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল আকরম স. বলেছেন, মুফ্‌রিদিন অতীত হয়েছেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মুফরিদ কারা? তিনি বললেন— অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র জিকিরে রত পুরুষ ও রমণীরা। মুসলিম।

অমনোযোগীতা বা ঔদাসীন্য বিদূরিত করাই জিকিরের মূল উদ্দেশ্য। অমনোযোগীতার কারণেই অন্তর কঠিন হয়। শরিয়ত সমর্থিত কথা কর্ম চিন্তা গবেষণা— এসব কিছুই জিকিরের অন্তর্গত। তবে শর্ত হচ্ছে এসকল কিছুই হতে হবে বিশুদ্ধ অন্তর সহযোগে। অসৎ উদ্দেশ্য ও অমনোযোগিতার সাথে সম্পাদিত আমল আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— যারা স্বীয় নামাজে বিনয়ী প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম। আরো এরশাদ করেছেন, ওই সকল নামাজী ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নামাজে অমনোযোগী থাকে।

হজরত জাবের থেকে নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান এবং মালেক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. বলেছেন, উত্তম জিকির হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আর উত্তম দোয়া হচ্ছে 'আল হামদুলিল্লাহ্।' হজরত সামুরা বিনতে জুন্দুব থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. এরশাদ করেন, চারটি বাক্য অতি

উত্তম ১. সোবহানাল্লাহ্ ২. আলহামদুলিল্লাহ্ ৩. লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং ৪. আল্লাহু আক্‌বার। মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কালাম পাকের পরে এই বাক্যগুলোই সর্বোত্তম। প্রকৃতপক্ষে বাক্যগুলো কোরআন মজীদ থেকেই সংগৃহীত। আহমদ। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন— যে ব্যক্তি কোরআন মজীদে বিভোর সে যদি প্রয়োজন পূরণের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করার অবকাশ না পায় তবে আমি প্রার্থনাকারীদের চেয়েও অধিক তাকে দান করবো। আল্লাহ্পাক আরও বলেন, সকল বাণীর চেয়ে আল্লাহ্র বাণী ওইরূপ মর্যাদাশীল যেমন আল্লাহ্পাক মর্যাদাশীল সকল সৃষ্টির তুলনায়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও দারেমী।

উপরোক্ত হাদিসগুলোর বর্ণনানুসারে মহান সুফী সাধকগণ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে 'লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার জিকিরকেই প্রধান আমল বলে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এর নিকট কোরআন মজীদ তেলাওয়াত অধিক পছন্দনীয়। কারণ কোরআন পাক—কালাম সিফাতেরই গুঢ়তত্ত্ব। তাঁর পবিত্র বাণীর মর্যাদা অবিসংবাদিত, অতুলনীয়। আল্লাহ্পাক ও তাঁর বান্দার মধ্যে এই কালাম এক অতুলনীয় সেতুবন্ধন। এই অতুলনীয় জ্যোতিচ্ছটায় যে আলোকিত হয়েছে, সে ইহ ও পরকালের নেয়ামত লাভ করতে পেরেছে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী অধিক পরিমানে নফল নামাজ আদায় করতেন। যেহেতু নামাজ হচ্ছে মুমিনদের মিরাজ। এভাবে নফল নামাজে অধিক কোরআন তেলাওয়াত ছাড়াও আত্মবিনাশনের (ফানায়ে নফ্সের) প্রতি তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফানার পূর্বক্ষণেও নফী এসবাত এর জিকির আবৃত্তি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। কারণ ফানা বা বিনাশনের পূর্বে কালাম পাকে নিমগ্ন হওয়া সঙ্গত নয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— পবিত্র জন ব্যতীত কেউ এই কোরআন স্পর্শ করতে পারে না। একথার অর্থ হচ্ছে, যে সকল লোক এখনো অন্তরের পাপপঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হতে পারেনি, তাদের জন্য কোরআন শরীফ পাঠ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জিকির করাই বাঞ্ছনীয়।

'তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কৃতঘ্ন হইওনা'— একথার অর্থ তোমরা আমার দানকে গ্রহণ করে আমার প্রতি কৃতজ্ঞভাজন হও। রসুল প্রেরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে পথপ্রদর্শনের যে ব্যবস্থা আমি করেছি সেই করুনাসিক্ত ব্যবস্থাকে মেনে নাও।

শেষে বলা হয়েছে 'কৃতঘ্ন হইও না'—একথার অর্থ নবী প্রেরণের যে নেয়ামত তোমাদেরকে দান করেছি, তাকে অস্বীকার কোরো না। তাঁর সত্য প্রচারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি কোরো না। সময় অপচয় করে আল্লাহ্র জিকির থেকে বিমুখ হয়ো না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।

❒ আল্লাহ্র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না, তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পার না।

'ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো'—একথার অর্থ, দ্বীন দুনিয়ার সকল প্রয়োজন মিটাতে, বিশেষ করে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও মারেফাত অর্জনের লক্ষ্যে সবর ও নামাজের সাহায্য গ্রহণ করো। 'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া। অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তিকে বাধা দেয়া। রোজাকেও সবর বলা যায়। নামাজকেও। কারণ নামাজ, রোজা কুপ্রবৃত্তিকে বাধা প্রদান করে। নির্জন ইবাদতও আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। নির্জনবাস সম্পর্কে রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, ফেৎনার সময় মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে তাঁর ছাগল। ফেৎনামুক্ত থাকার মানসে ছাগল নিয়ে পর্বতশিখরে আত্মগোপন করাই বাঞ্ছনীয়। নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। নামাজ ইবাদতের মূল ও মুমিনগণের মেরাজ। হজরত আলী থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, নামাজ ধৈর্যের খুঁটি। মসনদে ফেরদৌস প্রণেতা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—নামাজ মু'মিনগণের নূর। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. বলেছেন, ইবাদতকারীর সর্বোচ্চ মর্যাদাই নামাজের গুঢ় তত্ত্ব।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন'—তাফসীরকারকগণ বলেছেন, একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সাহায্য সহানুভূতি ও প্রার্থনা গ্রহণের শুভেচ্ছা নিয়ে ধৈর্যশীলগণের সাহচর্যে থাকেন। আমি বলি, এই সাহচর্য এক অতুলনীয় নৈকট্যের নাম। আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্তগণ এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম। অবশ্য এর অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব আল্লাহ্ আলিমুল গায়েবই জানেন।

'আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বোলো না, তারা জীবিত'—এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে। বদর যুদ্ধে শহীদগণের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মোহাজির আর আটজন ছিলেন আনসার। তাঁদের সম্বন্ধে লোকজন বলাবলি করতো, হায়! অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। দুনিয়ার নেয়ামত তার হাতছাড়া হয়ে গেলো ইত্যাদি। তাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনার্থে আল্লাহ্ পাক অবতীর্ণ করলেন এই আয়াত। জানালেন, তারা মৃত নয় বরং

জীবিত। শহীদগণকে জীবিত বলার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্পাক তাঁদের রূহ্ সমূহকে শরীর বিশিষ্ট মানুষের মতোই শক্তি দান করেছেন। তাঁরা আকাশ, পৃথিবী, বেহেশত—সকল স্থানে পরিভ্রমণ করতে সক্ষম। বন্ধুর সাহায্য, শত্রুর ধ্বংসসাধনও তাদের ক্ষমতাভূত। আর তাঁরা এমতো মাহাত্মের অধিকারী যে, মাটি তাঁদের দেহ ও কাফন ভক্ষণ করতে পারে না।

বাগবী বলেছেন, বদর যুদ্ধের শহীদগণের রূহসমূহ প্রতি রাতে আরশের নিচে সেজদাবনত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা এ রকমই করতে থাকবেন। অন্য একটি হাদিসে এসেছে—রসুল পাক স, এরশাদ করেছেন, শাহাদত লাভের পর শহীদদেরকে আল্লাহ্পাক অনিন্দ্য সুন্দর দেহ দান করেন। নির্দেশ দেয়া হয়, এই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করো। রূহ তখন সেই সুন্দর শরীরে প্রবেশ করে, অনুভব করে এ যেনো তাঁর আগেরই শরীর। তাঁরা তখন বলেন ও উপলব্ধি করেন, মানুষ আমাদের কথা শুনছে ও দেখছে। তখন বেহেশতের হুর এসে তাঁদেরকে নিয়ে যায়। ইবনে মান্দা মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. এরশাদ করেন, শহীদগণের রূহ্ সবুজ পাখি হয়ে যায়। পাখিরা জান্নাতে যত্রতত্র উড়াল দিয়ে বেড়ায়। আবার কখনো আরশের নিম্নে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে বসে বিশ্রাম নেয়। বর্ণিত হাদিসগুলোর প্রেক্ষিতে কতিপয় বিদ্বানের অভিমত এই যে, বর্ণিত মর্যাদা কেবল শহীদগণের জন্যই নির্দিষ্ট। আমি বলি, এই অনন্যসাধারণ জীবন লাভ কেবল শহীদগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নবীগণও এ রকম জীবনের অধিকারী। তাঁদের জীবন পার্থিব জীবনের মতোই প্রভাবশীল। রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য এই অনন্য মর্যাদা অধিকতর শক্তিশালী। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র সহধর্মীনীগণের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। শহীদগণের স্ত্রীদের প্রতি এ রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। আবার সিদ্দিকগণের মর্যাদা শহীদগণেরও উর্ধ্বে। সলেহীন, অর্থাৎ আউলিয়া-ই- কেরামের মর্যাদা শহীদগণের নিম্নে—কিন্তু তাঁরাও এই মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন, এরা তাঁরাই যাঁদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহভাজন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সলেহীন। এই আয়াতে তাঁদের মর্যাদার ক্রমধারা সূচিত হয়েছে। এ কারণেই সুফী সাধকগণ বলেছেন, আমাদের আত্মাগুলি আমাদের দেহ এবং আমাদের দেহগুলি আমাদের আত্মা। শতসহস্র নির্ভরযোগ্য ঘটনাপঞ্জীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অলি আল্লাহ্গণ তাঁদের বন্ধুদেরকে সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে নিপাত করেন। তাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী পথপ্রদর্শনও করেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র.বলেছেন, কামালাতে নবুয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। যাঁরা কামালাতে নবুয়তের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমন্ডিত, শরিয়তের পরিভাষায় তাঁরাই সিদ্দিক। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অনশ্বর জীবন প্রাপ্ত। নিম্নোক্ত হাদিস সমূহের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নবী,

সিদ্দিক, শহীদ ও সলেহ্গণের দেহ মৃত্তিকা ভক্ষণ করতে পারে না। হজরত আউস বিন আউস থেকে বর্ণিত হয়েছে- মহানবী স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক নবীগণের দেহ মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। হজরত আবু দারদা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। হজরত আবদুর রহমান ইবনে মায়সারা থেকে ইমাম মালেক বলেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট এ বিষয়টি পৌছেছে যে, আমি এ কথা জানতে পেরেছি, হজরত আমর বিন জামুহ্ ও হজরত আবদুর রহমান ইবনে জোবায়েরের কবর বন্যার তোড়ে ধ্বসে পড়েছিলো। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন উহুদ যুদ্ধের শহীদ। তাঁরা দু'জনেই একই কবরে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের কবর উন্মোচিত হলে দেখা গেলো, তাঁদের শরীর ও কাফন সতেজ এবং স্বচ্ছ। মনে হচ্ছিলো, যেনো গতকালই তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অথচ তাঁরা সমাধিস্থ হয়েছিলেন ছেচল্লিশ বছর আগে। তিবরানী থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. বলেছেন, কবর যেনো খনন করা না হয়। খনন করলে কবরবাসীদের গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কেনোনা তাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটি গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি আরো বলেছেন, মৃতকে সমাহিত করার পর কবর থেকে বের করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, নিম্নবর্ণিত অবস্থায় কবরবাসীদের মরদেহ বের করা যেতে পারে। যেমন, কবরস্থানের জমি যদি কেউ জবর দখল করে, কবরের জমি যদি অংশীদারদের প্রাপ্য হয়, জলাশয় বা নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, শত্রুর দেশে যদি সমাধিস্থ করা হয় অথবা জনবসতি সংলগ্ন হওয়ার কারণে যদি কবরের প্রতি সমীহবোধ উঠে যাবার আশংকা থাকে কিংবা কেউ যদি কবরের স্থানে উট বা অন্য কোনো জন্তুর বসবাস নির্ধারণ করে– এসমস্ত ক্ষেত্রে কবর স্থানান্তর করা যাবে বলে আলেমগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিরমিজি বলেছেন, মৃতকে কবর থেকে বের করা উচিত নয়, যদি না কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়। এখানে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার অর্থ, যদি উপরোক্ত কারণগুলো দেখা দেয়। মৃতকে তাঁর সমাধিস্থ স্থানেই থাকতে দেয়া মোস্তাহাব। অনেক সাহাবীকে শত্রুদেশে সমাধিস্থ করা হয়েছিলো। কিন্তু তাঁদেরকে মুসলমানদের এলাকায় স্থানান্তর করা হয়নি। স্থানান্তর করার কারণ দেখা দিলে অবশ্য এরূপ করাতে দোষ নেই। ফতোয়ায়ে খানিয়াতে উল্লেখ রয়েছে, কোনো লোক যদি দূরের কোনো শহরে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে সেখানেই কবরস্থ করা মোস্তাহাব। শহরান্তরিত করা হলেও দোষ নেই। হজরত ইয়াকুব মিশরে পরলোকগমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো সিরিয়ায়। হজরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ইন্তেকাল করেছিলেন মদীনা থেকে বারো মাইল দূরের একস্থানে। সেখানেই সমাহিত হয়েছিলেন তিনি। পরে তাঁর পবিত্র মরদেহ উঠিয়ে এনে মদীনায় দাফন করা হয়। মরদেহ স্থানান্তরের এ রকম আরো অনেক বিবরণ রয়েছে।

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আমীর মোয়াবিয়া নহরে কুজামা খনন করলেন। সেই নহরের প্রবাহ-পথে পড়লো উহুদের শহীদগণের কবর। তিনি ঘোষণা দিলেন, শহীদগণের ওয়ারিশেরা যেনো তাঁদের পবিত্র লাশ অন্যত্র সরিয়ে নেয়। ঘোষণা শুনে নিকটজনেরা উহুদ প্রান্তরে একত্রিত হলেন। কবর খনন করা হলো। দেখা গেলো, শহীদগণের পবিত্র মরদেহসমূহ সম্পূর্ণ সতেজ। মনে হচ্ছিলো, তাঁদের কেশগুচ্ছ এখনো বর্ধনশীল। খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ একজন শহীদের পায়ে কোদালের আঘাত লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো রক্তপ্রবাহ। শহীদগণের কবরগুলো ছিলো মেশ্‌ক আম্বরের সুবাসে ভরপুর। ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন ইবনে আবী শায়বা। বায়হাকী ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন হজরত জাবের থেকে। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটি রয়েছে যে, কোদালের আঘাতটি লেগেছিলো শহীদসমাজের নেতা হজরত হামজার পায়ে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন— রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন, কোরআন অন্তরে ধারণকারী কেউ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আল্লাহ্‌পাক মাটিকে এই মর্মে নির্দেশ দেন, যেনো সে ওই ব্যক্তির লাশ ভক্ষণ না করে। মৃত্তিকা তখন আল্লাহ্‌পাকের দরবারে নিবেদন জানায়, বারে এলাহী। আমি তার লাশ ভক্ষণ করি কীরূপে! সে যে আপনার কালামের ধারক।

ইবনে মান্দা বলেছেন, এ বিষয়টির উপর হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এর বহুসংখ্যক বর্ণনা রয়েছে। আমি বলি, কোরআন পাকের ধারক বলতে সম্ভবতঃ সিদ্দিকগণকে বুঝায় এবং কোরআন পাকের বরকত বিশেষভাবে তাঁদের সাথে জড়িত। আল্লাহ্ পাকের এরশাদ এরকম, 'পবিত্র লোক ব্যতীত কেউ কালাম পাক স্পর্শ করতে পারে না।' অর্থাৎ যাঁরা অসৎ স্বভাব থেকে পবিত্র, তাদেরই রয়েছে কোরআন স্পর্শ করার প্রকৃত অধিকার। আর তাঁরা হচ্ছেন সিদ্দিক। মারুজী বর্ণনা করেছেন— হজরত কাতাদা বলেছেন, এই কথাটি আমার উত্তমরূপে জানা আছে যে, যিনি পাপমুক্ত, মাটি তার লাশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আমি বলি, তাঁরাই আল্লাহ্‌পাকের অলী। তাঁরা গোনাহ্ থেকে সুসংরক্ষিত। তাঁদের দেহ মন এমন এক যোগ্যতা লাভ করে যাতে করে তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হয় না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

শেষ বাক্যটি এই—'ওয়া লা কিল্লা তাশউরুন'—একথার অর্থ, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না। অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকৃত অর্থে রহস্যাচ্ছন্ন। বিষয়টি সর্বজনবোধ্য নয়। প্রত্যাদেশ অথবা দিব্যদৃষ্টি ব্যতিরেকে জীবনের নিগুঢ় তত্ত্ব অননুভব্য। তাই এখানে সাধারণ বিধানটি ঘোষিত হয়েছে এই বলে যে, তোমরা (এই গুঢ়তত্ত্ব) উপলব্ধি করতে সক্ষম নও।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

❐ আমি তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের স্বল্পতার দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করিব। তুমি ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও;

❐ তাহারাই ধৈর্যশীল যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে 'আমরা তো আল্লাহেরই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'

❐ ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আশীস ও দয়া বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত।

আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো—একথার অর্থ, হে উম্মতে মোহাম্মদী! আমি তোমাদের প্রতি কিছু লঘু বিপদ অবতীর্ণ করবো। যে বিপদের সঙ্গে থাকবে বেহেশতি বরকত। বিপদের মাধ্যমে এই মর্মে পরীক্ষা নেয়া হবে যে, তোমরা আমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট কিনা। আমার বিধানে অবিচল কিনা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তোমাদের প্রতি আপতিত হতো বহুসংখ্যক বিপদ। আল্লাহ্পাক সেগুলোকে দয়া করে স্থগিত রেখেছেন। অল্প কিছু বিপদ দিয়েছেন কেবল পরীক্ষার জন্য, যাতে করে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়—তোমরা সকল অবস্থায় যেনো আল্লাহ্মুখী হয়ে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারো। মনে রেখো, সুখ-দুঃখ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হয় না। ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের স্বল্পতা— সম্পর্কে তাফসীরবিদশ্রেষ্ঠ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভয় অর্থ শত্রুভীতি। ক্ষুধা অর্থ দুর্ভিক্ষ। ধনসম্পদের স্বল্পতা অর্থ সম্পদহানি। জীবনের স্বল্পতা অর্থ নিহত হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ করা কিংবা রোগব্যাধি বা বার্ধক্য। ফল-ফসলের স্বল্পতা অর্থ বিপদগ্রস্ততার দরুন রিজিকের স্বল্পতা। ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত রয়েছে, ভয় অর্থ আল্লাহ্র ভয়, ক্ষুধা অর্থ রমজানের রোজা, সম্পদের স্বল্পতা অর্থ

জাকাত—সদকা, জীবনের স্বল্পতা অর্থ রোগব্যাধি এবং ফল-ফসলের স্বল্পতা অর্থ সন্তান সন্ততির মৃত্যু।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন— যখন কোনো শিশু মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্পাক তখন ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছো? ফেরেশতাগণ বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক বলেন, এ চরম বিপদের সময় সে কি বলে? ফেরেশতাগণ বলেন, আপনার বান্দা উচ্চারণ করে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ্র প্রতিই আমাদের প্রত্যাবর্তন)। আর আপনার বান্দা আপনার প্রশংসাও বর্ণনা করে। আল্লাহ পাক তখন বলেন— আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ প্রস্তুত করো এবং তার নাম রাখো 'বায়তুল হামদ'। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

'ধৈর্যশীলগনের জন্য শুভসংবাদ'—তাঁরাই ধৈর্যশীল যাঁরা বিপদগ্রস্ত হলে উচ্চারণ করে আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। – একথার অর্থ, আমরা আল্লাহর বান্দা। আমরা সম্পূর্ণতই তাঁর অধীন। তাঁর নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্ট। সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় আমরা তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করি। পৃথিবীর এই জীবন সাময়িক। একথায় কোনো সন্দেহই নেই যে, আমরা সকলে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। যখন সকল অবস্থায় তিনিই আমাদের নির্ভরতা ও প্রকৃত আশ্রয়, তখন তাঁর সকল দানেরই আমরা সম্মান করি। সে দান আনন্দ রূপে আসুক অথবা বেদনারূপে। আমরা তাই সুখে কৃতজ্ঞতাকে আশ্রয় করেছি এবং বিপদে আশ্রয় করেছি ধৈর্যকে। কারণ, তিনি বলেছেন, ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও। আয়াতে উল্লেখিত 'মুসিবাত' শব্দটির অর্থ ওই অশুভ বিষয় যা মানুষের কষ্টের কারণ হয়। একবার রসুল পাক স. এর পবিত্র পাদুকার ফিতা ছিঁড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি উচ্চারণ করলেন—'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আমাদের প্রিয় নবী! এটাও কি বিপদ। তিনি এরশাদ করলেন, মুমিনরা যা অপছন্দ করে, তাই বিপদ। হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলপাক স. বলেছেন—কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সে যেনো বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।' কেনোনা এটাও একটা বিপদ।

ইবনে আবি হাতেম, তিবরানী এবং বায়হাকী শো'বুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন–যে ব্যক্তি বিপদের সময় 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করে আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করেন। সে দানের পরিমাণ এমন যাতে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যায়। হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বলেছেন, উম্মতে

মোহাম্মদীকে বিপদের সময় পঠিতব্য যে দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে রকম দোয়া অন্য উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়নি। হজরত ইউসুফ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাঁর পিতা হজরত ইয়াকুব বলেছিলেন 'হায়' ইউসুফের জন্য আক্ষেপ। যদি আগের নবী এবং উম্মতকে বিপদাপন্ন অবস্থায় পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া শিক্ষা দেয়া হতো, তবে হজরত ইয়াকুব অবশ্যই তা পাঠ করতেন।

'তাদের প্রতি আল্লাহ্পাকের আশীস (সালাওয়াত)'—এখানে তাদের বলতে নির্দেশ করা হয়েছে ওই সকল ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে যারা বিপদকালে প্রসন্নচিত্তে 'ইন্না লিল্লাহ' দোয়াটি পাঠ করে। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ আশীর্বাদ। শব্দটি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে অর্থ হবে রহমত বা অনুগ্রহ। আর বান্দার সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে অর্থ হবে আশীর্বাদ বা দোয়া এবং দোয়ার বিনিময় হিসেবে ক্ষমা অনুগ্রহ ইত্যাদি। ক্ষমা ও রহমতের রয়েছে অনেক স্তর। তাই সালাত শব্দটি এখানে বহুবচন হিসেবে সালাওয়াত হয়েছে। তদুপরি রহমত শব্দটি পুনঃসংযোজিত হয়ে বিষয়টিকে করে তুলেছে আরো অধিক গুরুত্ববহ।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়া উলাইকা হুমুল মুহ্তাদুন'—তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।' বিপদে ধৈর্যাবলম্বনকারীদের সম্পর্কে এই ঘোষণাটি একটি অনন্যসাধারণ সম্মাননা। বর্ণিত হয়েছে—একবার হজরত মুআজের এক পুত্র ইন্তেকাল করলেন। রসুল পাক স. স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে একটি শোকগাথা রচনা করলেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিলো, হে মুআজ! মহান বিচারক আল্লাহ্ অশেষ পুণ্যের বিনিময়ে তোমার সন্তানকে গ্রহণ করেছেন। সেই পুণ্য হচ্ছে সালাত, রহমত ও হেদায়েত। কাজেই এই অমূল্য সম্পদগুলোর প্রতি তুমি দৃষ্টিনিবদ্ধ করো। বিরত থাকো বিলাপ থেকে। হজরত ওমর বলেছেন, দুটি বিষয় পরস্পর সম্পৃক্ত। এদের সঙ্গে রয়েছে আর একটি শুভ সম্পদ। পরস্পরসম্পৃক্ত বিষয় দু'টি হচ্ছে সালাত ও রহমত আর শুভ সম্পদটি হচ্ছে হেদায়েত (সৎপথপ্রাপ্তি)। বিপদে ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে বহু হাদিস রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সেগুলো থেকে নিম্নে কতিপয় হাদিস উপস্থাপন করা হলো।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন—মহানবী স. বলেন হাশরের দিন পৃথিবীতে বিপদাপদ ভোগকারীরা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবেন, তখন পৃথিবীর বিপদমুক্তরা বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কেটে ফেলা হতো তাহলে আমরাও আজ পুরস্কৃত হতাম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেন, যদি কোনো মুসলমান দুঃখযাতনাক্লিষ্ট হয়, এমন কি যদি তার পায়ে কাঁটাও বিদ্ধ হয়, তবু আল্লাহ্পাক তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুল পাক স.কে বলতে শুনেছি- যদি আল্লাহর কোনো বিপদগ্রস্ত বান্দা পাঠ করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' এবং 'আল্লাহুমা আজিরনী ফী মুসীবাতি ওয়াখলুফনী খাইরুম মিনহু'—তবে আল্লাহ তাকে অশেষ পুণ্য দান করেন এবং

উৎকৃষ্টতর বিনিময় প্রদানে ধন্য করেন। মোহাম্মদ বিন খালেদ সালামী তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন—যদি কোনো বান্দার অদৃষ্টে কোনো বিশেষ মর্যাদা লিপিবদ্ধ থাকে আর সেই বান্দা যদি আমলের মাধ্যমে সে মর্যাদায় উন্নীত হতে না পারে, তবে আল্লাহ্পাক তাকে শারীরিক ও বৈষয়িক বিপদের মাধ্যমে অথবা সন্তান-শোকের কারণে কথিত মর্যাদা দান করবেন। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত মুআজ বর্ণনা করেছেন, এক বার এক লোক মহানবী স.কে জিজ্ঞেস করলেন—কোন ব্যক্তি সর্বাধিক বিপর্যস্ত? তিনি স. জবাব দিলেন, নবীগণ। এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমর্যাদাধারীগণ। তৎপর পরবর্তী মর্যাদাধারীগণ—এভাবে। ধর্মের ধারক বাহক ও প্রচারকেরা সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা অবশেষে পাপমুক্ত হয়ে যান।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৮

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

❒ 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহের নির্দশন-সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কাবা গৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে, এই দুইটি প্রদক্ষিণ করিলে তাহার কোন পাপ নাই, এবং কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করিলে আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সাফা ও মারওয়া মক্কা মোয়াজ্জামার দু'টি পাহাড়ের নাম। 'শায়াইর' শব্দটি শাইরাহ্ শব্দের বহুবচন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। এখানে অর্থ হবে, ইবাদত পদ্ধতি। পাহাড় দু'টিকে শায়াইর বলার কারণ হচ্ছে, ওগুলো আল্লাহ্র আনুগত্যের নিদর্শন। সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ী (দৌড়াদৌড়ি) করা সুন্নত—একথা বলেছেন ইমাম আহমদ। অন্য ইমামেরা বলেছেন ওয়াজিব। ইমাম আহমদ তাঁর অভিমতের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন ওই আয়াতটি, যেখানে বলা হয়েছে—কেউ কাবা গৃহে হজ করে বা ওমরা করে তার জন্য পাহাড় দু'টির তাওয়াফ করাতে কোনো দোষ নেই। এই আয়াত অনুসারে বুঝা যায়, সায়ী করা মোবাহ্। এ ছাড়া এই আয়াতে বলা হয়েছে 'কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে'। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সৎকর্ম করা হয় তা নফলের পর্যায়ভুক্ত। ওয়াজিব

হচ্ছে সুনির্ধারিত ইবাদত; আর মোবাহ ও নফল হচ্ছে সাধারণ ইবাদত। একথাও ঠিক যে, ওয়াজিব সম্পন্ন করলে নফল ও মোবাহ আপনা আপনিই সম্পাদিত হয়।

'হজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা অভিলাষ। ওমরা অর্থ পরিদর্শন। আলোচ্য আয়াতে হজ ও ওমরাকে দু'টি পৃথক ইবাদত হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি বিগ্রহ-মূর্তি ছিলো। মূর্তি দু'টির নাম ছিলো আসফ ও নায়লা। আসফ ছিলো সাফা পাহাড়ে এবং নায়লা মারওয়ায়। মূর্খতার যুগে প্রতিমা দু'টির সম্মানে পাহাড় দু'টি প্রদক্ষিণ করা হতো। প্রদক্ষিণকারীরা তখন মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করতো। ইসলামের আর্বিভাবের পর মুসলমানেরা আর সে রকম ভাবে প্রদক্ষিণ করতো না। ওদিকে মদীনাবাসীদের পুজনীয় প্রতিমা ছিলো মানাত। মানাতের কাছেই তারা চিৎকার করে প্রার্থনা জানাতো। আসফ ও নায়লা মূর্তিদ্বয়ের প্রতি তারাও ছিলো বীতশ্রদ্ধ। তাই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মোহাজির ও আনসারদের স্বভাবের অনুকূলে। নিম্নোক্ত হাদিসগুলো থেকে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

হাকেম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে শয়তান সারারাত সাফা মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী করতো। মুসলমানেরা রসুল পাক স. এর খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা মূর্খতার যুগে সেখানে সায়ী করতাম—এখন করি না। তাদের এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আসেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বোখারী বর্ণনা করেছেন—আমি হজরত আনাসের নিকট সাফা মারওয়ার দৌড় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন—আমরা ইসলামপূর্ব যুগের এই সায়ীকে মূর্খতার সংস্কৃতি বলে ধারণা করতাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমরা একে পরিত্যাগ করেছিলাম। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মাসআলাঃ বোখারী ও মুসলিমে হজরত ওরওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—আমি জননী আয়েশার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কালাম মজীদে বলা হয়েছে—'ওই দু'টি (সাফা ও মারওয়া) প্রদক্ষিণ করলে তার কোনো পাপ নেই'—একথায় সায়ী যে ওয়াজিব তা বুঝা যায় না। হজরত আয়েশা বললেন, হে ভাগিনেয়! তুমি একথা কিরূপে অবগত হলে? তোমার ধারণা অনুযায়ী সায়ী যদি ওয়াজিব না হয়, তবে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী হতো এ রকম—যদি তারা সাফা মারওয়ার মধ্যে না দৌড়াতো তবে কোনো গোনাহ হতো না। আসলে আয়াতটি নাজিল হয়েছে আনসারদের সম্পর্কে। ইসলাম পূর্ব সময়ে তারা ছিলো মানাত প্রতিমার উপাসক—— ইসলাম কবুলের পর তাঁরা সাফা মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ানো পছন্দ করলেন না। রসুলে পাক স. এর নিকট আবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা মূর্খতার যুগে সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতাম। তাই এখন সায়ী করতে মন

চায় না। তাঁদের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। হাবীবা বিনতে আবি তাজারাত থেকে সাফীয়া বিনতে আবী শায়বার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস দ্বারাও সাফা মারওয়ার সায়ী ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই—হজরত হাবীবা বলেন, আমি রসুলপাক স. কে দেখলাম, তিনি সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করেছেন। তাঁর অগ্রে ছিলেন আরো অনেকে। তিনি ছিলেন পশ্চাতে। তখন আবহাওয়া ছিলো তপ্ত। তাঁর পরিধেয় আন্দোলিত হচ্ছিলো। তিনি তখন এরশাদ করেছিলেন, হে মানব মন্ডলী! শুনে নাও, —আল্লাহপাক তোমাদের উপর সায়ীর বিধান বলবৎ করেছেন। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে মুয়ামিল। দারা কুতনী এবং বহুসংখ্যক আলেম তাকে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল বলেছেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুয়ামিলের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। দারা কুতনী এই হাদিসটি অন্য একটি পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূতদের একজনের নাম মনসুর বিন আব্দুর রহমান। আবু হাতেম বলেছেন, তাঁর বর্ণনা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, যায়। প্রসিদ্ধ পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ থেকে জাহাবীও তাই বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, তিবরানীর মতে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটির আরো অনেক সনদ রয়েছে। সেগুলোকে প্রথমোক্ত সনদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে বর্ণনাটি অধিকতর শক্তিশালী হয়। হজরত আবু মুসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে— তোমরা কাবা গৃহের তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করবে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়— সাফা মারওয়ার সায়ী ওয়াজিব। এইরূপ নির্দেশ ওয়াজিব হওয়াকেই সাব্যস্ত করে।

যাঁরা বলেন সায়ী ওয়াজিব, তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সায়ী ফরজ। কারণ, তাঁর মতে ওয়াজিব অর্থ ফরজই।

এটা ঐকমত্য যে, সাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়াতে হবে সাতবার। দৌড় শুরু হবে সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার। মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত হলে দুই. এভাবে সাতবার। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মধ্যে ইবনে জারীর, আবু বকর, সুদ্দী এবং হানাফীগণের মধ্যে তাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা একবার। যেমন কাবা গৃহের তাওয়াফ যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে গিয়েই শেষ হয়। তাই সাফা থেকে মারওয়ায় গিয়ে পুনরায় সাফায় ফিরলে একবার ধরতে হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সায়ী শেষ করতেন মারওয়ায়। তাছাড়া জমহুর ওলামার সুবিদিত আমলই আমাদের প্রমাণ। ওলামায়ে কেরাম একবার সায়ীর জন্য কয়েকটি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

১. সায়ী হবে সাফা থেকে এবং শেষ হবে মারওয়ায়। রসুল পাক স. এরূপই করতেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. বলেছেন—আল্লাহ্পাক প্রথমে যে পাহাড়ের নাম উল্লেখ করেছেন আমি সেখান থেকেই শুরু করছি বলেই তিনি সাফা পাহাড়ে অবস্থান নিলেন। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, আহমদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান এবং নাসাঈ। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি নির্দেশসূচক। ইবনে হাজম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। নির্দেশ সূচক বর্ণনা নির্ভরযোগ্যতায় পৌছলে নির্দেশটি স্পষ্টতই ওয়াজিব হিসেবে পরিগণিত হয়। নির্ভরযোগ্যতায় না পৌছালেও ওয়াজিব না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেনোনা রসুল স. বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের পদ্ধতি শিখে নাও। সম্ভবতঃ আমি আর কখনো হজ করবো না। আর একথা সর্ববাদীসম্মত যে, রসুল স. সাফা থেকে সায়ী শুরু করেছিলেন।

২. কোনো কোনো তাওয়াফের পর সায়ী করা শর্ত। সেটা আগমনী তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম) হোক অথবা বিদায়ী তাওয়াফ কিংবা তাওয়াফে জিয়ারত হোক। কিন্তু তাওয়াফ এবং সায়ীর মধ্যবর্তীতে আরাফায় অবস্থান করা যাবে না। যদি কেউ আগমনী তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করে তবে গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু হজরত আতা থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আতা বলেছেন, যদি সায়ী করার পর তাওয়াফ করে তবে তা সিদ্ধ হবে। প্রমাণ হিসেবে তিনি উসামা বিন শরীফের হাদিসটি পেশ করেন—যেখানে বলা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি নবী পাক স. এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি তাওয়াফের আগেই সায়ী করেছি। তিনি স. বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে: রসুলের উম্মতগণ এই আমলটি পরিত্যাগ করেছেন। হাদীসটি 'শাজ' (বিরল) প্রকৃতির বলে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা আরো বলি, সায়ী করা কিয়াস বিরুদ্ধ ইবাদত। যে পদ্ধতিতে এটার সুচনা হয়েছে সেই পদ্ধতিটিই জারী রাখা কর্তব্য। প্রথম থেকেই তাওয়াফের পর সায়ীর বিধান চালু রয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধবাদী হওয়া সঙ্গত নয়। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেছেন, আমি একবার মক্কা মোকাররমায় আগমন করলাম, সে সময়ে আমি ছিলাম ঋতুবতী; তাই আমি তাওয়াফ এবং সায়ী কোনোটিই করতে পারছিলাম না। রসুলুল্লাহ স.কে আমি একথা জানালাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, তুমি তাওয়াফ ব্যতিরেকে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করো—যা অন্যান্য হাজীগণ করে চলেছেন। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহ স. হজরত আয়েশাকে কেবল তাওয়াফ ছাড়া হজের সকল অনুষ্ঠানগুলো পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই হজরত আয়েশা তখন তাওয়াফ ও সায়ী করেননি, করেছিলেন পবিত্রতা লাভের পর।

উল্লেখিত ঘটনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সাফা মারওয়ার সায়ী তাওয়াফের অনুষঙ্গ। এই ঘটনা থেকে আরও একটি বিধানের উৎপত্তি হয়েছে। তা হচ্ছে— কেউ যদি তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে জিয়ারতের পর সায়ী না করে তবে তার প্রতি একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ দিকে সায়ী যেহেতু তাওয়াফের অনুষঙ্গ—কোনো স্বতন্ত্র ইবাদত নয়, তাই সায়ীর কোনো কাজা হয় না। সে কারণেই ছাগল কোরবানী ওয়াজিব হবে। তাওয়াফ ও সায়ী দু'টিই যদি বাদ পড়ে যায়, তবে দুটিরই কাজা আদায় করতে হবে। সায়ী করার সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে— সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনবার তকবীর উচ্চারণ করবে। তারপর পাঠ করবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর।' এরপর দোয়া করবে। এভাবে তিনবার করবে। মারওয়া পাহাড়েও দোয়া করতে হবে একই নিয়মে। সাফা পাহাড় থেকে অবতরণের সময় দৌড়ে নয়, স্বাভাবিকভাবে অবতরণ করবে। এরপর শুরু করবে দৌড়। মারওয়া পাহাড়েও উঠানামা করতে হবে স্বাভাবিকভাবে। বোখারী ও মুসলিমের মাধ্যমে হজরত জাবের থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

'ওয়ামান তাত্বাওয়া খইরান' অর্থ, কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে। তাত্বাওয়া শব্দের অর্থ আনুগত্য- ফরজ নফল সকল রকমের আনুগত্য। এই শব্দটি সহযোগে বাক্যাংশটির অর্থ হচ্ছে—যারা স্বেচ্ছায় সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে দৌড়াদৌড়ি করে—এরকম করা সুন্নত। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, বাক্যাংশটির অর্থ যারা ওয়াজিব তাওয়াফের অতিরিক্ত (নফল) তাওয়াফ করে। কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, যারা ফরজ হজের পর পুনরায় হজ ও ওমরা করে। হামাস বলেছেন, কেবল হজের ক্ষেত্রে নয়, অন্য আমলের ক্ষেত্রেও 'স্বতস্ফুর্ত সৎ কাজ করলে' কথাটি প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—এরকম স্বতস্ফুর্তভাবে বা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত ইবাদত (নামাজ, জাকাত, তাওয়াফ ইত্যাদি) উত্তম।

'আল্লাহ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ'—একথার অর্থ আল্লাহ্পাক মর্যাদাশীলদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। অর্থাৎ তিনি গুণগ্রাহী ও পুরস্কারদাতা। এবং সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—সাহাবী হজরত মুআজ বিন জাবাল, সাদ বিন মুআজ এবং খারীজ বিন জায়েদ ইহুদী আলেমদের নিকট তওরাতের একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন; কিন্তু ইহুদী আলেমরা জানাতে অস্বীকার করলো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো— নিম্নের আয়াত।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ
تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ إِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِيْنَ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○
وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

❒ আমি যে সব স্পষ্ট নির্দশন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহাদিগকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়।

❒ কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজ-দিগকে সংশোধন করে আর আল্লাহের আয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি আমি ক্ষমা-পরবশ হই; কারণ আমি ক্ষমা-পরবশ, পরম দয়ালু।

❒ এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদিগকে আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই অভিশাপ দেয়।

❒ উহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে। তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

❒ এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদের ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালূ।

স্পষ্ট নিদর্শন বুঝাতে আয়াতে 'আল বায়্যিনাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রসুলুল্লাহ স. এর নবুয়তের সাক্ষ্য প্রমাণকেই এখানে 'আল বায়্যিনাত' বলা হয়েছে। আর পথনির্দেশ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আল হুদা' শব্দটি। এখানে 'আল-হুদা' বা পথনির্দেশ অর্থ হজরত মোহাম্মদ স. এর অনুসরণের পথনির্দেশ।

'মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদের অভিশাপ দেয়'— এখানে কিতাব অর্থ তওরাত। 'লা আনুন' অর্থ অভিশাপ দেয়া। 'লায়ীনুন' অর্থ অভিশাপ দেয়ার যোগ্যতাধারী। এই অভিশাপ দাতারা—ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ

এমনকি অন্য সকল প্রাণীরাও। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অভিশাপ দাতারা– আল্লাহ্পাকের নিকট অভিশাপ প্রদানের আবেদন করে। হজরত বারা বিন আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে–তিনি বলেছেন, আমি রসুলপাক স. এর সঙ্গে একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, অবিশ্বাসীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের গন্ডদেশে প্রহার করা হয়। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণী তাদের আর্তচিৎকার শুনতে পায় এবং তাদেরকে অভিশম্পাত দেয়। সেই অভিশম্পাত দানের কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে জারীর। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অভিশাপদানকারিগণ অর্থ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণী। হজরত কাতাদা বলেছেন, অভিশাপদানকারিগণ অর্থ ফেরেশতামন্ডলী। হজরত আতা বলেছেন, জ্বিন ও ইনসান। হজরত হাসানও তাই বলেছেন। হজরত মুজাহিদ বলেছেন, যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ আসে তখন প্রাণীকুল পাপীষ্ঠদেরকে অভিশাপ দেয় এবং বলে এই হতভাগ্যদের জন্যই এতো বালামুসিবত।

কিন্তু যারা তওবা করে ও সংযত হয়, আল্লাহ্র আয়াতকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে; তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাপরবশ। — তওবা অর্থ বিরত থাকা। শব্দটি বান্দার সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে পাপ থেকে বিরতি। এবং আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে, শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি।

হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবীপাক স. বলেছেন, বান্দা পাপ স্বীকার করলে এবং তওবা করলে আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, বান্দা তওবা করলে আল্লাহ্পাক ওই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যার উট বিজন বনে হারিয়ে যায়, যার পিঠে ছিলো পানাহারের সামগ্রী। লোকটি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে থাকে। তারপর চেতনাশূন্য হয়ে যায়। চেতনা ফিরে পেতেই দেখে হারানো উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। তখন লোকটি উটের লাগাম ধরে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, 'আল্লাহ তোমার কতো রহমত! তুমি আমার বান্দা আমি তোমার প্রভু'– অতি আনন্দিত হওয়ার কারণেই সে এরকম বলতে থাকে। পাপীরা তওবা করলে আল্লাহ্পাক ওই আত্মহারা ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান (কুফ্রী) করে এবং কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদেরকে আল্লাহ, ফেরেশতা, ও মানুষ সকলেই অভিশাপ দেয়।'—এখানে কুফ্রী করার অর্থ আল্লাহ্র কালাম গোপন করা এবং কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অর্থ, তওবা ব্যতিরেকে মারা যাওয়া। আবুল আলীয়া বলেছেন—আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষের যে অভিশাপের কথা এখানে বলা হয়েছে; তা দেয়া হবে হাশরের দিন। সেদিন কাফেরদেরকে একত্রিত করে আল্লাহ্ পাক অভিশম্পাত দিবেন। মানুষ ও ফেরেশতারা অভিশম্পাত করবেন। যারা অভিশাপগ্রস্ত তারাও অভিশাপ করবে। তাই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—'তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিবে।' কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন মানুষেরা বলবে জালেমদের প্রতি অভিশাপ। এভাবে যারা জালেম তাদের অভিশাপও তাদের নিজেদের উপরেই বর্তাবে।

'কাফেরদের শাস্তি লঘু করা হবে না। শাস্তি হবে বিরামহীন।'—বাগবী বলেছেন, কাফের কুরাইশরা একবার বললো, মোহাম্মদ! তুমি তোমার প্রতিপালকের গুণাবলী এবং বংশপরম্পরা বর্ণনা করো। তাদের এই অবিমৃশ্যকারিতার জবাবেই অবতীর্ণ হলো—এক ইলাহ্। তিনি তোমাদের ইলাহ্। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু'— এ কথার অর্থ, হে জগতবাসী! তোমাদের উপাসনার অধিকারী সেই পরমতম সত্ত্বা যিনি একক; যার কোনো অংশী নেই তিনি ব্যতীত উপাসনা গ্রহণকারী কেউ নেই, থাকা সম্ভবও নয়। এরূপ সম্বোধন পূর্বের আয়াতে বর্ণিত ইহুদীদের প্রতি হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে রসুল পাক স. এর গুণাবলী গোপন করায় ইতোপূর্বে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছিলো। তেমনি এখানে তিরস্কার করা হয়েছে তৌহিদের মূলতত্ত্ব গোপন করার জন্য। গ্রন্থধারীরা আল্লাহ্ পাকের এককত্বের ধারণাটিও বিকৃতকারী। তাই তারা হজরত উযায়ের ও হজরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি রসুলপাক স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—'ইলাহুকুম্ ইলাহুঁ ওয়াহিদ' এবং 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম'—আয়াত দু'টিতে ইসমে আজম রয়েছে। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত আবি সাখার থেকে ইবনে মানসুর ও বায়হাকী বলেছেন, 'ইলাহুকুম ইলাহুঁ ওয়াহিদ, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রহীম'—আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মুশরিকেরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছিলো, উপাস্য যদি একজনই হন তবে তার প্রমাণ কী? তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নোক্ত আয়াতটি।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৬৪

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ○

❒ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিতসাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযান সমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বিশাল সৃষ্টি তাঁর এককত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বহুবিচিত্র সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর কথা। পরক্ষণেই বলা হয়েছে এতদুভয়ের মধ্যে বিরাজমান চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলধি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, জলবতী নদী, প্রাণীকুল, অনুপরমাণু এবং বহুবিচিত্র মৃত্তিকার কথা— কোথাও হিমশীতল বরফাচ্ছাদন। কোথাও খরতপ্ত মরুভূ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন—অবিশ্বাসী কোরাইশরা একবার নবী পাক স.কে বললো, আপনি আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করুন—তিনি যেনো সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড়ে রূপান্তরিত করে দেন। যেনো আমরা শত্রুর উপরে বিত্তবিজয়ী হতে পারি। আল্লাহ্ পাক তখন নবী পাক স.কে জানিয়ে দিলেন, একটি শর্তে তাদের আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে। যদি তারা স্বর্ণপাহাড় লাভের পর পুনরায় কুফ্রীকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদেরকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো যা কাউকে কখনো দেয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতেও দেয়া হবে না। দয়াল নবী স. তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার মহান প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে বর্তমান অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন। আমি ক্রমাগত তাদেরকে সত্যপথের দিকে আহবান জানাতেই থাকবো। আল্লাহ্ পাক তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতটির মর্ম হচ্ছে—সোনার পাহাড় প্রত্যাশীদের সম্মুখে এর চেয়ে অনেক বিচিত্র বিস্ময়কর প্রমাণপঞ্জি রয়েছে। যাঁরা জ্ঞানবান তাঁরা এ সকল নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না কেনো?

আলোচ্য আয়াতে আকাশকে বহুবচনে এবং পৃথিবীকে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। কাফেরেরা ধারণা করতো অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রমুদ্রিত আকাশ অনেক আর পৃথিবী একটি। তাই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি তাদের ধারণার অনুকূলে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রতিটি আকাশ যেহেতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, তাই আকাশের উল্লেখ করা হয়েছে বহুবচনে; এবং জমিনের মৌল উপাদান যেহেতু এক, তাই পৃথিবীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে একবচন। আবার কেউ বলেছেন, আকাশের স্তর সমুহ পৃথক। তাই আকাশকে বহুবচনে এবং পৃথিবীর স্তর যেহেতু সম্মিলিত— তাই

পৃথিবীকে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি বলি, এ সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যাই সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করে না। এ যেনো জলগাত্রে চিত্রাংকন সদৃশ।

আকাশ পৃথিবীর উল্লেখের পর বলা হয়েছে, দিবস রাত্রির আবর্তনের কথা। সময়ের এই বহমান বিভঙ্গতা আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ঋতুবৈচিত্র, আলো অন্ধকারের হ্রাস বৃদ্ধি এবং শীতগ্রীষ্মের অবস্থান্তরতা।

সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহ আরেকটি রহস্যময় নিদর্শন। মানুষের হিতসাধনার্থে সেগুলোর মাধ্যমে আবহমানকাল ধরে বয়ে চলেছে মুখরিত বেসাতি। বিশাল জলধিতরঙ্গে ভাসমান নিরাপদ এই বাণিজ্যবহর সমূহ এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

ভাসমান মেঘমালা, পরিমিত বৃষ্টিবর্ষণ এবং বর্ষণসিক্ত মৃত ধরিত্রীর বুকে তৃণরাজি ও বৃক্ষের লীলারহস্য নিরন্তর বিস্ময়কর নিদর্শন হয়ে রয়েছে। ফল ও ফসলের অফুরন্ত সমাহার, প্রাণীকুলের অস্তিত্ব ও বিস্তারণে স্থবিরতাহীনতাকে সুনিশ্চিত করেছে। প্রাণীকূলেও সঞ্চারিত রয়েছে কত সহস্র বিস্ময়। এমন অসংখ্য প্রাণী রয়েছে, যা অবলোকনের অতীত। আরো রয়েছে শান্ত হিংস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ কতো অগণিত জীবন। তৃণ-উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল পশুকুল ও মানুষ। আবার প্রতিবেশের সজীবতা নির্ভর করে পানির উপর। বায়ুর দিক পরিবর্তনও আরেক রহস্য। কখনো দক্ষিণে, কখনো উত্তরে, কখনো পূবে, কখনো পশ্চিমে, কখনো বিচিত্র কৌণিক গতিতে বয়ে চলেছে, ক্ষিপ্র অথবা শ্লথ গতিসম্পন্ন সমীরণ। এই প্রবাহ কখনো আনে উপকার, কখনো ক্ষতি। মন্দ মলয় সৃষ্টিকুলে আনে প্রসন্নতা। ঝঞ্জাবায়ুতে বিধ্বস্ত হয় শহর, নগর, জনপদ। কখনো তপ্ত, কখনো শীতল বায়ু পরিবর্তনের এই বহুধা বৈচিত্র বিস্ময়কর নিদর্শন ব্যতীত আর কী হতে পারে!

শেষে বলা হয়েছে, সুনিয়ন্ত্রিত মেঘমালার কথা যা পৃথিবীর উপরে এবং আকাশের নিম্নে শত সহস্র রঙে ও রহস্যে ভাসমান। এ নিয়ন্ত্রণ কার? জ্ঞানবানরা কি এই রহস্যের প্রতি তাদের চিন্তাকে সংবদ্ধ করবে না। হজরত আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, তিনটি বস্তুর উৎস কোথায় তা কেউ জানে না। সেই তিনটি বস্তু হচ্ছে— বজ্র, বিদ্যুৎ ও মেঘ।

জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে— একথার মাধ্যমে সৃষ্টির নিত্যনতুন রূপ ও আয়োজনের প্রতি চিন্তাশীলদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সত্যান্বেষণের প্রতি এই মর্মে আহবান জানানো হয়েছে যে, নিশ্চয় সৃষ্টির এই রহস্যাভিসারের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক কেউ রয়েছেন। কে তিনি? তিনি নিশ্চয়ই একক,চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ, কুশলী ও অপার ক্ষমতাধর। তিনি নিশ্চয়ই ত্রুটি ও ঔদাসীন্যমুক্ত। কেউ তাঁর সমতুল নয়। সকল গুণের অধিকারী তিনি। তাই সৃষ্টির বহমানতায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এমন শৃংখলা। তাঁর সমান্তরাল কেউ থাকলে নিশ্চয়ই এই সৌন্দর্যমন্ডিত শৃংখলায় দেখা দিতো বিপত্তি। শুরু হতো অনাসৃষ্টি। অতএব তিনি এক, একক এবং অংশীহীন।

হজরত আয়েশা থেকে ইবনে আবিদুদ্দুনইয়া তাঁর আত্তাফাক্কুর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন— এই আয়াত পাঠ করে রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আক্ষেপ ওই সকল লোকের জন্য! যারা এই আয়াত আবৃত্তি করে অথচ এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬৫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

❒ তথাপি কেহ কেহ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহের সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে আল্লাহের প্রতি তাহাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। সীমালংঘনকারীগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত যে সমস্ত শক্তি আল্লাহেরই এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর!

'অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে'—এখানে অপরকে অর্থ, মুশরিকদের পূজ্য প্রতিমাসমূহকে। এই প্রতিমাগুলোকে তারা ভালোবাসতো। এই ভালোবাসাই আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতাকে আয়াতে 'আন্দাদ' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্বাসীরা যেমন আল্লাহ্কে ভালোবাসে, পৌত্তলিকেরা তেমনি ভালোবাসে তাদের বিগ্রহগুলোকে। জুযাজ বলেছেন, মনের টানকে ভালোবাসা বা মহব্বত বলে।

বিগ্রহপূজকদের বিগ্রহপ্রেম এবং বিশ্বাসীদের আল্লাহ্প্রেম বাহ্যতঃ এক রকম মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা এক নয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা বিশ্বাস করেছে আল্লাহ্র প্রতি, তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তম।' বিশ্বাসীরা আনন্দের সময় কৃতজ্ঞতাকে আশ্রয় করে এবং বিপদের সময় অবলম্বন করে ধৈর্যকে । আল্লাহ্ প্রেমে অটল থাকে। আনন্দের উদ্বেলতা এবং বিপদের বিস্বাদ তাঁদেরকে আল্লাহ্ প্রেম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। কাফেরদের প্রতিমাপ্রেম কিন্তু এ রকম নয়। তাদের ভালোবাসা ভঙ্গুর। কোনোনা কোনো আকাঙ্খা পূরণের জন্য তারা বিগ্রহবন্দনায় লিপ্ত হয়। আকাঙ্খা পূরণ না হলে ভালোবাসা উবে যায়। তখন তারা এক বিগ্রহ ছেড়ে অন্য বিগ্রহের উপাসনার প্রতি ধাবিত হয়।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হাশরের দিন ওই সকল প্রতিমাসমর্পিতদের বলবেন, তোমরা এই প্রতিমাগুলোকে মনে প্রাণে ভালোবাসতে। এবার তবে তাদের সঙ্গে নরকাগ্নিতে প্রবিষ্ট হও। বিগ্রহপূজকেরা তখন এই সিদ্ধান্তকে কিছুতেই পছন্দ করবে না। তাদের উপস্থিতিতেই আল্লাহ্ পাক তখন তাঁর প্রেমিক বান্দাদেরকে বলবেন, যদি তোমরা সত্যিই আমাকে ভালোবাসো তবে দোজখে চলে যাও। এই নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দোজখের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবেন। তখন নেপথ্য থেকে উচ্চারিত হবে, 'ওয়াল্লাজিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ্' (যাঁরা ইমানদার তাঁরা নিজের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভালোবাসে)।

আমি বলি, উদ্ধৃত বাক্যের আরেকটি অর্থ হতে পারে- পৃথিবীতে যার সঙ্গেই মহব্বত থাকুক না কেনো, মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভালোবাসাই হবে দৃঢ়তম। পার্থিব ভালোবাসার প্রকৃতি এরকম—মানুষ অন্যকে ভালোবাসে হয়তো কিছু উপকার অর্জনের জন্য অথবা তার ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার নিমিত্তে। অথবা পার্থিব ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সৌন্দর্য সম্ভোগের উপর।

ভালোবাসার বন্ধন বংশগত সম্পর্কের উপরেও নির্ভরশীল থাকে। পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা ইত্যাদি এ ধরনের মহব্বতের প্রমাণ। মোট কথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভালোবাসার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য চরিতার্থতার লক্ষ্যই থাকে প্রধান। উদ্দেশ্য অচরিতার্থ হলে ভালোবাসায় ধরে ফাটল। আর আল্লাহ্ পাকের ভালোবাসা এ ধরনের উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র। তাই তা চিরন্তন। স্মরণ রাখা প্রযোজন যে, অবিশ্বাসীদের মূল উদ্দেশ্য জাগতিক কল্যাণ এবং ভোগ লিপ্সা । তারা কেবল নামেই জানে যে, সকল কিছুর স্রষ্টা একজনই। কিন্তু বাস্তবে মানুষ, গ্রহ নক্ষত্র অথবা কল্পিত দেবদেবীর সঙ্গেই থাকে তাদের কামনাবাসনাকন্টকিত ভালোবাসা। তাৎক্ষণিক অর্জনই তাদের কাছে বড়ো। তাই তারা গায়রুল্লাহ্র উপাসক। যুক্তিবিদ মোতাজিলা, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়গুলোও আল্লাহ্পাকের ভালোবাসার দাবীদার। প্রকৃত সত্যানুরাগীদের মতো তারাও বলে, চিরস্থায়ী কল্যাণ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহনির্ভর। পার্থিব ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত তাঁর । আর তিনি শেষ বিচার দিনের মালিক। বিশুদ্ধ ধর্মানুরাগীদের বিশ্বাস এরকমই। সুতরাং যারা পার্থিব বিত্তবিলাসমগ্ন, তারা ইসলাম বহির্ভূত। কারণ, তারা আলাহ্পাকের ভালোবাসার সঙ্গে পার্থিব ভালোবাসাকেও অংশীদার করেছে। ভালোবাসাই সকল লাভ লোকসানের নিয়ামক। আর লাভ লোকসানের নিরংকুশ অধিকার কেবল আল্লাহ্র। যারা বান্দাকে তার আপন কর্মের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে (যেমন মোতাজিলারা), তারা কি আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করলো না? যতোই শাণিত যুক্তি তারা প্রদর্শন করুক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে তারা কি মুশরিক নয়?

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতই হচ্ছে প্রকৃত সত্যানুরাগী। এদের মধ্যে একদল হচ্ছে সাধারণ জন। আরেক দল হচ্ছেন দৃঢ়চিত্ত সুফী সম্প্রদায়। সাধারণ জনেরা প্রকাশ্যতঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না। তাদের সকলের বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ পাক যেমন সকল কিছুর স্রষ্টা তেমনি বান্দার সকল কাজেরও স্রষ্টা। আর তিনিই হলেন সকল লাভলোকসানের নিয়ামক। তারা গায়রুল্লাহ্‌র অনুরাগী হলেও একথা নিশ্চিত জানেন যে, আল্লাহ্‌ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের বেহেশতে এবং যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন। মহান সুফীগণের বিশ্বাস এই সর্বসাধারণের বিশ্বাস অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। তাঁদের অন্তরের প্রজ্বলিত প্রেমের আগুন একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সকল কিছুকেই ভস্মীভূত করে দিয়েছে। ভস্মীভূত করে দিয়েছে বেহেশতের লোভ ও দোজখের ভীতিকেও। তাঁরা স্বীয় সত্তা অপেক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর নিকটে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যখন প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, 'মানুষের প্রতি কি এমন একটি সময় সমাগত হয় যখন সে আর স্মরণের যোগ্যই থাকে না।' তখন এই প্রকৃত প্রেমিকেরা আত্মহারা হয়ে অন্তরের ভাষায় জবাব দেন, হ্যাঁ। হে আমার আল্লাহ! মানুষের নিকট এমন সময় এসেছে। বরং এমন সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে স্মরণের যোগ্য নয়। অধিকন্তু তখন তার সত্তার অনুভূতিও অবলুপ্ত।

সাধারণ মানুষের নিকটতম লক্ষ্যবস্তু হলো তার আপন সত্তা। সে যখন কাউকে ভালোবাসে তখন নিজের কারণেই ভালোবাসে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসাও তার নিজের কারণেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপাসনা সে এজন্যই করে যে, এতে করে তার শান্তিদায়ক আবাস নিশ্চিত হবে এবং সে নরকানল থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু সুফী সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় সত্তাপেক্ষাও প্রিয়। অস্তিত্বাপেক্ষাও নিকটতর। তাদের অবস্থা সম্পর্কে কালামে মজীদে এমর্মে উল্লেখিত হয়েছে, 'তিনি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও অধিকতর নিকটে।' এই পুণ্যাত্মাগণের ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌছে যায়, যখন তাঁরা অন্যকে ভালোবাসেন বটে, তবে সে ভালোবাসা হয় আল্লাহ্‌র জন্যই। আল্লাহ্‌ পাক তখন যদি তাঁদেরকে দুঃখ কষ্ট দান করেন তখন তাঁরা সেটাকে মনে করেন, প্রেমাস্পদ প্রদত্ত স্বর্গীয় দান। প্রিয়তম যেহেতু প্রাণাধিক প্রিয়। তাই তাঁর আনন্দ বেদনা সকল প্রকার দানই স্বর্গীয় সুধায় ভরপুর। বরং আনন্দাপেক্ষা বিষাদই তখন অধিক আস্বাদ্য হয়। কারণ, আনন্দ আস্বাদনে থাকে প্রবৃত্তির অংশগ্রহণ, সে আনন্দ স্বর্গীয় হলেও। কিন্তু যন্ত্রণা ও তিক্ততায় প্রবৃত্তির কোনো অংশগ্রহণ নেই। প্রবৃত্তি প্রশান্ত হলেও তিক্ততা আস্বাদনে অপারগ। এই মহান ব্যক্তিবর্গকেই হাশরের দিন আল্লাহ্‌পাক অবিশ্বাসীদের উপস্থিতিতে বলবেন, 'যদি তোমরা আমার বন্ধু হও, তবে জাহান্নামে গমন করো।' তাঁরা তৎক্ষণাৎ জাহান্নামের দিকে পথ চলতে শুরু করবেন। ঠিক তখনই আওয়াজ আসবে, 'আল্লাহ্‌র প্রতি এঁদের ভালোবাসা দৃঢ়তম।' তাঁদের

মর্যাদা অননুধাবনীয়। যারা বেহেশতের সুখসন্দর্শনের আশায় এবং দোজখের অনলাশংকায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তারা নিশ্চয়ই দোজখ প্রবেশের নির্দেশ পেয়ে অবলীলায় মান্য করতে পারবে না।

যখন সীমালংঘনকারীগণ শাস্তির সম্মুখীন হবে, তখনই হবে তাদের প্রকৃত জ্ঞানোদয়। তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টিকে 'ইয়ারা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। নাফে, ইবনে আমর এবং ইয়াকুব 'ইয়ারা' শব্দটিকে পড়েছেন 'তারা'। অন্যেরা ইয়ারা-ই পড়েছেন। 'তারা' পড়লে শব্দটি সম্বন্ধিত হবে নবীপাক স. এর সঙ্গে। অর্থ হবে, হে নবী! আপনি তখন প্রত্যক্ষ করবেন। অথবা সাধারণভাবে ধরলে অর্থ হবে, সকলেই প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু এখানে 'তারা' নয় ইয়ারা' শব্দটি বসানো হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে, সীমালংঘনকারীরা দেখবে। সেই জ্ঞানোদয় যদি পৃথিবীতে হতো তবে তা তাদের জন্য কতোই না উত্তম হতো। সেই প্রকৃত জ্ঞানটি হচ্ছে এই—সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলেই বান্দার সমস্ত কিছু সম্পাদিত হয়। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় যা ঘটবার, তা ঘটবেই। কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর তিনি যা ঘটাবেন না, তা ঘটাবার হিম্মতও কারো নেই। বিশ্বাসীরা এ বিষয়ে সম্যক অবগত। তাই তাঁরা তাঁর সঙ্গে অংশী সাব্যস্ত করে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। আয়াতের এ রকম মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, জালেমরা হাশর প্রান্তরে যখন আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করবে তখন বুঝতে পারবে সকল ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধীশ্বর একমাত্র আল্লাহ্। তখন তাদের লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকবে না। হায়! সেই বোধোদয় যদি তাদের এখন হতো তাহলে বিশ্বাসীদের মতো তারা বুঝতো, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬৬, ১৬৭

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

❒ যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীগণ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করিবে এবং অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে,

❒ এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম; যেমন তাহারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিল। এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনো অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

হাশরের দিন অবিশ্বাসীদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে অনুসারীদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন শয়তান তখন তার অনুসারীদের নিকট থেকে সম্পর্কচ্যুত হতে চাইবে। যে সব কারণের জন্য পৃথিবীতে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয় সেই কারণগুলো সেখানে থাকবে না। যেমন প্রতিমা পূজার মাধ্যমে কোনো আকাঙখা পূরণের প্রত্যাশা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, আপনজনের সাহায্য লাভ। এ ধরনের কোনো প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা সেই দিন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। অবিশ্বাসী নেতা, প্রতিমা কিংবা শয়তানের অনুসারীরা চরম অসহায়ত্বের মধ্যে সেই দিন বলতে শুরু করবে হায় একবার যদি আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম, তবে আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতাম; যেমন তারা আজ আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে।

নবী রসুলগণের অনুসরণ পরিত্যাগ করে দুষ্কর্ম ও অনাসৃষ্টিতে সময় ব্যয় করার জন্য কাফেরদের তখন অনুশোচনার সীমা পরিসীমা থাকবে না। আত্মধিক্কারে জর্জরিত হতে থাকবে তারা। দ্বীনের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য দেয়ার কারণে তাদের সামনে থাকবে শুধু পরিতাপ ও আক্ষেপ। সুদ্দী বলেছেন, অবিশ্বাসীরা ইমান আনলে আখেরাতে যে সকল পুরস্কার পেতো হাশরের দিন আল্লাহ্তায়ালা সে সকল পুরস্কার তাদেরকে দেখাবেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে— দেখো! এসকল ছিলো তোমাদের জন্যই—যদি তোমরা পৃথিবীতে বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে। তাদের সামনে তখন বিভিন্ন পুরস্কার ও মর্যাদা বিশ্বাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। বিষয়টির চাক্ষুষ অবলোকন করে তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে, আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে কাঁদতে শুরু করবে। আর যখন শুনবে তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী, নরকাগ্নি থেকে তারা আর কোনো দিন মুক্ত হতে পারবে না; তখন তাদের সামনে থাকবে শুধু নিরাশার অন্তহীন অন্ধকার। তাদের চিরকালীন অগ্নিবাসের বিষয়টিই আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে এভাবে— তারা কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

❐ হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

❐ সে তো কেবল তোমাদিগকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

'হালালান ত্বইয়্যেবা'—অর্থ বৈধ ও পবিত্র। আয়াতে মানুষকে কেবল বৈধ এবং পবিত্র খাদ্য বস্তু আহার করতে বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'জগতে যা কিছু বর্তমান, সবই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' এ কথায় বুঝা যায়, সকল কিছুই বৈধ। কেবল ওই সকল বিষয় বৈধ নয় যেগুলো অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না—একথার অর্থ, রিপুর তাড়ণায় হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বোলো না। ক্বারী আবু জাফর, ইবনে আমের, কাসায়ী, হাফ্স এবং ইয়াকুব 'খুতুয়াত' শব্দটির 'তোয়া' বর্ণকে পেশ যুক্ত অবস্থায় পাঠ করেছেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন সাকিন যুক্ত অবস্থায়। যে অবস্থায়ই পাঠ করা হোক না কেনো 'খুতুওয়াত' এবং 'খুত্ওয়াত'— দুটি শব্দই খুতুয়া শব্দের বহুবচন। পদবিক্ষেপকালে দুই পায়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আরবী ভাষায় বলে খুতাওয়াত্। এই আয়াতে 'খুতুয়াতুশ শয়তান' বলে শয়তান যে পথে পদচারণা করে সেই পথকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, শয়তানের পদাংক অনুসরণ কোরো না।

'নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'—'মুবীন' অর্থ প্রকাশ্য। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন খাঁটি ইমানদারদের নিকট শয়তানের শত্রুতা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। তাই এখানে তাকে প্রকাশ্য শত্রু বলা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ জনেরা তার শত্রুতা উপলব্ধি করতে পারে না। শয়তান যাকে প্রবঞ্চনা দেয়, তার সাথে সে বন্ধুত্ব রক্ষা করে। তার এই আচরণ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'আউলিয়াউ হুমুত্তাগুত'। প্রকাশ্য শত্রু অর্থ শত্রুতা প্রকাশকারীও হতে পারে।

যেমন সে হজরত আদমকে সেজ্দা করতে প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরকে প্রবঞ্চিত করার অঙ্গীকার করেছিলো। পরের আয়াতে শয়তানের এই শত্রুতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—'সে তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সমন্ধে তোমরা যা জানো না এমন সব বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়।'

'সু' অর্থ মন্দ। 'ফাহ্শা' অর্থ অশ্লীলতা। মন্দ ও অশ্লীলতা উভয়টিই পাপ। পাপের প্রকারভিন্নতা বুঝাতে এখানে শব্দটি 'এবং' অব্যয়ের মাধ্যমে পাশাপাশি ব্যক্ত করা হয়েছে। যাঁরা বিবেকবান তাঁরা মন্দকাজে অনুতপ্ত হন এবং অশ্লীলতাকে সকল সময়েই দূষণীয় মনে করেন। তাঁরা সাধারণ পাপকে মন্দ এবং অশ্লীলতাকে কবীরা গোনাহ্ মনে করেন। কেউ কেউ বলেছেন, যে পাপের কারণে শরিয়তে 'হদ' বা প্রাণসংহারের বিধান প্রয়োগ করা হয়—এখানে ওই পাপের কথাই বলা হয়েছে। শয়তান পাপের কুমন্ত্রণা দেয় কিন্তু তার কুমন্ত্রণা যে সব সময় বাস্তবায়িত হয়—একথা ঠিক নয়। যাঁরা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁদের প্রতি তার কুমন্ত্রণার কোনোই প্রতিক্রিয়া নেই। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন—অভিশপ্ত শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে তার অনুসারীদেরকে প্রবঞ্চনা দানের জন্য পৃথিবীর মানুষের নিকট প্রেরণ করে। তারা পৃথিবীতে অনেক অনাসৃষ্টি ঘটায়। বিভিন্ন অপকর্ম সম্পাদনের পর তারা শয়তানের সকাশে প্রতিবেদন পেশ করে। একজন বলে, আজ আমি একটি বিরাট দুষ্কর্ম ঘটিয়েছি। ইবলিস তার কথা শুনে বলে, নাহ্। তুমি তেমন কিছু করতে পারোনি। এভাবে একেক শয়তান একেক অপকর্মের ফিরিস্তি পেশ করবে। সেগুলোর কোনোটাই শয়তানের সম্পূর্ণ মনঃপুত হবে না। একজন বলবে, আমি আজ এক দম্পতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। শয়তান তখন বলবে, তুমিই একমাত্র কাজের মতো কাজ করেছো। একথা বলে ইবলিস তাকে প্রধান সহচর হিসেবে গ্রহণ করবে। মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন—মানুষের প্রতি দু'টি প্রভাব কার্যকরী। একটি শয়তানের আর একটি ফেরেশতার। শয়তানের প্রভাব অশ্লীলতাকে অঙ্গীকার করে এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর ফেরেশতার প্রভাব করে সত্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং স্বীকৃতি দান করে সত্যের। যাঁরা শুভচিন্তা এবং সৎকর্মের প্রতি ধাবিত, নিঃসন্দেহে তাঁরা আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহভাজন। তাঁদের উচিৎ তাঁরা যেনো আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হন। আর যারা অশুভচিন্তা ও কর্মের প্রতি আকৃষ্ট তাঁদের উচিৎ তরিৎ তওবা করা এবং শয়তানের চক্রান্তমুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয়প্রার্থী হওয়া। এরপর নবী পাক স. পাঠ করলেন—'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং লজ্জাজনক কাজের আদেশ দেয়।' হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স, বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের

শোকর, তিনি দয়া করে প্রবঞ্চনা পর্যন্তই শয়তানের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আবু দাউদ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭০,১৭১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

❒ যখন তাহাদিগকে বলা হয় 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর,' তাহারা বলে, 'না, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব।' এমন কি, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও?

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমনকিছুকে ডাকে যাহা ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না— বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা বুঝিবে না।

এখান থেকে নতুন প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, রসুল পাক স. ইহুদীদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন, জান্নাতের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করলেন এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি যে অবধারিত সে কথাও বললেন। তখন রাফে বিন হারমিলা এবং মালেক বিন আউফ ইহুদী বললো, হে মোহাম্মদ! আমরা আপনার অনুসরণ করবো না, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে চলতে দেখেছি সে পথে চলবো। কারণ, তারা ছিলো আমাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ও উত্তম। তখন এই আয়াত (১৭০) অবতীর্ণ হয়।

'মা আনযালাল্লাহু' (আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন) — একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তওরাত শরীফকে। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মুশরিক ও কোরাইশ কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে। যদি তাই হয় তবে আয়াতটি সম্পর্কিত হবে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ১৬৮নং আয়াতের সঙ্গে— যেখানে সম্বোধন করা হয়েছে, 'হে মানবজাতি' (ইয়া আইয়্যুহান্নাস)। এরকম হলে মুশরিক ইহুদীসহ সকল অবিশ্বাসীরা হবে এই আয়াতের লক্ষ্য। সকল অবিশ্বাসীদেরকে বিশেষ করে ইহুদীদেরকে এখানে মধ্যম পুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এর

কারণ হচ্ছে, তাদের নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি যেনো দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেনো সকলের প্রতি বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য এই মর্মে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে, ওই নির্বোধগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করার পরেও তারা কি রকম মূর্খজনোচিত কথা বলছে।

সত্যের আহবান পেয়েও ইহুদীরা বলে বসলো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছি সে পথের অনুসারী হবো। আল্লাহ্পাক তাদের একথার জবাবে বলেছেন, তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথের পথিকও ছিলো না। তথাপিও কি তারা তাদের বিভ্রান্ত পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে মেনে নিবে? 'তাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুই বুঝতো না'— একথার অর্থ, তারা ছিলো ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত, যদিও পার্থিব ব্যাপারে তারা ছিলো যথেষ্ট প্রাজ্ঞ। যদি প্রশ্ন করা যায়— তাদের পিতৃপুরুষতো ছিলো তওরাতের অনুসারী। যদি তাই হয়, তবে তারা যে ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত তা কি করে বলা যায়? এর জবাব হচ্ছে— তারা তওরাতধারী বলে দাবী করলেও প্রকৃতার্থে তওরাতের অনুসারী ছিলো না। তওরাতের অনুসারী হলে তারা হজরত ঈসার উপর ইমান আনতো এবং ইসলামও গ্রহণ করতো। কারণ, তওরাতে এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

পরের আয়াতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ইহুদী ও মুশরিকদের উপমা দেয়া হয়েছে এরকম- যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কেবল তাদের চিৎকারই শ্রবণ করে। প্রকৃতার্থে তারা মূক, বধির ও অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবে না। মুশরিকেরা তাদের পূজণীয় প্রতিমাগুলোকে ডাকে। কিন্তু সেগুলো মূক, বধির ও অন্ধ। ইহুদীরাও তাদের বিকৃত বিশ্বাসের প্রতি মনোযোগী। তাদের আহবান প্রান্তরে বিচরণরত পশুপালকে আহবানকারী রাখালের মতো। পশুগুলো রাখালের ডাক শুনে বটে কিন্তু সে ডাকের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। চিৎকার শোনা এবং আহবানের মর্মোপলব্ধি করা এক কথা নয়। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তারা বুঝবে না।' প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে এরকম— হে আমার রসুল। আপনি যেনো মানবতার মরমী রাখাল আর অবিশ্বাসীরা চতুষ্পদ জন্তু তুল্য। আপনার আহবানের আওয়াজ কেবল তারা শুনতে পায়, কিন্তু মর্ম বুঝে না। চিরাচরিত অর্থে স্থিত করলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— সত্যের প্রতি আহবানপ্রাপ্তরা জন্তুজানোয়ার সদৃশ। আর অবিশ্বাসীদের প্রতি আহবানকারী হচ্ছেন ওই সংবেদী রাখাল, অবিশ্বাসীরা যার আওয়াজ মাত্র শোনে কিন্তু অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

রসুলুল্লাহ্ স. এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা তওরাতের কোনো কোনো বিধান প্রতিপালন করতো। তারা তওরাতে বর্ণিত শেষ নবীর জন্য প্রতীক্ষারতও ছিলো। কিন্তু তিনি যখন এলেন, তখন তারাই হয়ে গেলো প্রধান প্রতিপক্ষ। তাদের এই

প্রতিপক্ষতা তওরাতের বিরুদ্ধাচরণেরই নামান্তর। কারণ, তওরাতের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. এবং শেষ অবতারিত গ্রন্থ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।

'মূক, বধির, অন্ধ'— একথার পূর্বে অবিশ্বাসীদের প্রতি একটি সম্বোধন উহ্য রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে-নির্বোধেরা বধির, মূক ও অন্ধ। তারা কোরআনের আয়াত শ্রবণে অমনোযোগী, তাই বধির। সত্যের স্বীকৃতি তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, তাই তারা মূক। আর হেদায়েতের পথের দিকে তাদের দৃষ্টিপাত মাত্র নেই, তাই তারা অন্ধ। 'সুতরাং তারা বুঝবে না'- একথার অর্থ, সত্য কী, তা তারা বুঝবে না। পূর্বপুরুষদের অসুন্দর আদর্শের প্রতি তারা মোহাচ্ছন্ন। তাই তাদের শ্রুতি, রসনা ও দৃষ্টি স্থবির, অকর্মন্য।

ইতোপূর্বে আল্লাহ্ পাক বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তুকে আহার্যরূপে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিলেন (আয়াত ১৬৮)। এখন বিবৃত হচ্ছে, হালাল বা পবিত্র খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। পবিত্র রিজিক গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, রিজিকদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। নিম্নের আয়াতে রয়েছে এ বিষয়টিরই বিবরণ। আর অবিশ্বাসীরা নয়, বিশ্বাসীরাই কৃতজ্ঞ। তাই তাদেরকে সম্বোধন করেই অবতীর্ণ হয়েছে—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭২, ১৭৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁহারই ইবাদত কর।

❒ নিশ্চয় আল্লাহ্ মরা, শূকর রক্ত-মাংস এবং যাহা জবাই কালে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের জন্য অবৈধ করিয়াছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন। তাই তিনি বিশ্বাসীদেরকেও পবিত্র (হালাল) বস্তু ভক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। নবীগণকেও বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহার্‌রসুলু কুলু মিনাত্ তাইয়্যেবাত' (হে রসুলগণ! পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করুন)। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, অবিন্যস্ত কেশরাজি এবং ধূলিধূসরিত বেশবাস নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও যদি কেউ আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করে, তবুও তার প্রার্থনা আল্লাহ্ পাকের সকাশে গৃহীত হবে না; যদি তার পানাহার ও পরিধেয় হারাম উপার্জন থেকে হয়।

আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো- একথার অর্থ, যদি তোমরা বিশেষভাবে আল্লাহ্ পাকের উপাসনা প্রত্যাশী হও এবং তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করো, তবে তাঁর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করো। কারণ, কৃতজ্ঞচিত্ততা ছাড়া পরিণত উপাসনা হয় না। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক বলেন, মানব দানবের সঙ্গে আমার অতি গুরুত্ববহ সম্পর্ক নির্ধারিত রয়েছে— তা হচ্ছে, আমিই তাদের স্রষ্টা। অথচ তারা অন্যের উপাসক। আমি তাদেরকে রিজিক দান করি, আর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যের। তিবরানী ও শামী তাঁদের গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, এবং বায়হাকী উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে; আর দায়লামী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু দারদা থেকে।

আল্লাহ্পাক মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশুকে খাদ্যবস্তু রূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, 'ইন্নামা হার্‌রামা'। 'ইন্না' অর্থ নিশ্চয়। কোনোকিছুকে সীমাবদ্ধ করাই এ শব্দটির উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানে হারাম হিসেবে যে বস্তুগুলোকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া আরো অনেক হারাম বস্তু রয়েছে। এই জটিলতা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণের সিদ্ধান্তকে পছন্দ করেন এবং গ্রহণযোগ্য বলে মানেন। তাঁদের মতে 'ইন্না' শব্দটি সুনিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত। কোনোকিছুকে সীমাবদ্ধ করা এর উদ্দেশ্য নয়। যদি সীমাবদ্ধ বলে মেনে নেয়াও যায়, তবে মনে করতে হবে, এই সীমাবদ্ধতা চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা নয়। অবিশ্বাসীরা যে সকল বস্তুকে নিজেদের ধারণার বশবর্তীতানুযায়ী হারাম করে নিয়েছিলো, সেই সকল হারামের প্রাসঙ্গিকতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই আয়াতে। সেগুলো হচ্ছে-১.'মাইতাত' অর্থাৎ মৃতপশু, যেগুলো জবেহ্ করার আগেই মরেছে। তবে দেখতে হবে শরিয়তের বিধান মতে সেগুলো জবেহ্যোগ্য কি না। পানির মাছ ও মৃত টিড্ডি কিন্তু হারাম নয়। কারণ, ওগুলোকে শরিয়তে জবেহ্যোগ্য মনে করা হয়নি। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মৃত মাছ ও মৃত টিড্ডিও মৃত পশু ও প্রাণীর

অন্তর্ভূত। কিন্তু রসুল পাক স. এর একটি হাদিস অনুসারে এ দু'টোকে হারাম বহির্ভূত মনে করতে হবে। হাদিসটি হচ্ছে— হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেছেন, আমাদের জন্য দু'টো মৃত বস্তুকে এবং দু'টো রক্তপিন্ডকে হালাল করা হয়েছে। মৃতবস্তু দু'টো হচ্ছে, মাছ ও টিড্ডি এবং রক্তপিন্ড দু'টো হচ্ছে, যকৃৎ ও পিত্ত। জীবিত কোনো পশুপ্রাণী থেকে পৃথক করে নেয়া গোশ্তও মৃত পশুতুল্য, তাই হারাম। এ প্রসঙ্গে রসুল পাক স. বলেছেন, যে গোশ্ত কোনো জীবন্ত পশু থেকে কেটে নেয়া হয়, সেটা মৃত তুল্য। হজরত আবু ওয়াকেদ লাইসী থেকে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন আবু দাউদ ও তিরমিজি।

আলেমগণ বলেছেন, মৃত প্রাণীর ক্রয়বিক্রয় হারাম। বিক্রয়লব্ধ অর্থও হারাম। মৃতপ্রাণীর চর্বি ও অপক্ক চামড়া ব্যবহার করাও অবৈধ। হজরত জাবের থেকে বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে— তিনি মক্কা বিজয়ের বছরে রসুলে পাক স. থেকে একথা শুনেছেন যে, আল্লাহ্পাক— মদ, মৃতপশু, শূকর এবং বিগ্রহ বিক্রয় হারাম করেছেন। তখন কেউ একজন আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মৃত পশুর চর্বির বিধান কী? যেগুলোকে লোকে নৌকায় লাগায়, তেল হিসেবে গায়ে মাখে এবং আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করে? তিনি এরশাদ করলেন, সব হারাম। পুনঃ এরশাদ করলেন, ইহুদীরা নিপাত যাক। আল্লাহ্ পাক তাদের উপর এই মর্মে বিধান জারী করেছিলেন যে, মৃত পশুর চর্বি ব্যবহার হারাম। কিন্তু তারা এই বিধান মানতো না। অবলীলায় মৃতের চর্বি কেনাবেচা করতো এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করতো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। মৃতের চর্বি ব্যবহারে নিষিদ্ধতা ছিলো তাদের উপর। কিন্তু তারা গলিত চর্বি ক্রয়বিক্রয় করতো। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেম থেকে শাফেয়ী, আহমদ এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের নিকট রসুলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই মর্মে পত্র পৌঁছেছিলো যে, হুঁশিয়ার! মৃতের অপক্ক চামড়া এবং তার নিতম্ব থেকে উপকৃত হতে চেয়ো না। আবু দাউদের বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে — ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর মহাতিরোধানের এক মাস আগে। আহমদের বর্ণনায় রয়েছে এক মাস অথবা দু'মাসের কথা। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলে করীম স. বলেছেন, মৃতের কোনো অংশ থেকে উপকার গ্রহণ কোরো না। আবু বকর, শাফেয়ী এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম।

হজরত উসামা থেকে হাকেম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ বর্ণনা করেছেন- রসুলুল্লাহ্ স. মাংসভুক প্রাণীর চামড়া নিষিদ্ধ করেছেন। হাকেম এর সঙ্গে অতিরিক্ত যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে, মাংসাশী প্রাণীর চামড়া শয্যারূপে ব্যবহার করা

নিষিদ্ধ। হজরত মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. চিতাবাঘের চামড়ায় বসতে নিষেধ করেছেন। হজরত মেকদাম বিন মাদী কারাব থেকে আহমদ ও নাসাঈ বলেছেন— রসুল স. রেশম, সোনা এবং চিতার চামড়া দ্বারা বালিশ ইত্যাদি তৈরী করা নিষেধ করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, চিতার চামড়াযুক্ত পোশাক থেকে ফেরেশতারা দূরে থাকেন।

মৃতের চামড়া পাকা (দাবাগত) করার পরে তার ব্যবহার বিধানসম্মত কি না, সে সম্পর্কে ওলামাগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, চামড়া পাকা করলে তা পবিত্র হয়ে যায়, তাই তার ব্যবহার এবং ক্রয় বিক্রয় বৈধ। তাদের দলিল এই— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— একবার রসুলপাক স. একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাচ্ছো না কেনো? লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এটা যে মৃত। তিনি বললেন, এটা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু পানি এবং করত দ্বারা এটিকে বিশুদ্ধ করা যায় নাকি? (করত একটি রাসায়নিক পদার্থ যদ্দারা চামড়া পাকা করা হয়)। অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে, মৃতের গোশত হারাম কিন্তু তার চামড়া ব্যবহার বৈধ। ইমাম দারা কুতনী বলেছেন, এই হাদিসের সবগুলো সনদ বিশুদ্ধ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, দাবাগত করা চামড়া পবিত্র। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন, জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, দাবাগত সব ধরনের চামড়াকে পবিত্র করে দেয়। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, দাবাগত করা চামড়া থেকে তোমরা উপকার গ্রহণ করতে পারো। জননী সাওদা বলেছেন, আমার একটি ছাগল মারা গিয়েছিলো। আমি তার চামড়া দাবাগত করে নিয়েছিলাম।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে মৃতের কোনোকিছুই বৈধ নয়। দলিল হিসেবে তাঁরা ওই হাদিসটিকে পেশ করেন যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, মৃতের অংশ বিশেষ থেকে উপকার গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। তাঁরা আরো বলেছেন, এটাই রসুল স. এর শেষ নির্দেশ। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেমের নিকট রসুল স. এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, মৃতের অপক্ক চামড়া এবং নিতম্ব থেকে উপকৃত হতে চেয়ো না। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর মহাতিরোধানের এক অথবা দুই মাস আগে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে বলা যায় যে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেমের সনদ ও বর্ণনাভঙ্গি উভয়টি সমালোচনাযোগ্য। তাই আমরা বিশুদ্ধ হাদিসগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করেছি। আরেকটি কথা এই— হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেম বর্ণিত হাদিসে 'ইহাব' শব্দটি রয়েছে। ইহাব বলে অপক্ব

চামড়াকে। অপক্ক বা কাঁচা চামড়া তো আমাদের নিকটও অসিদ্ধ। কেউ যদি একথা বলেন, তিবরানী ও ইবনে আদী আওসাত গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেমের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— আমরা সে সময় জুহ্নিয়া অধ্যুষিত এলাকায় ছিলাম। তখন রসুল স. আমাদেরকে লিখে জানালেন, ইতোপূর্বে আমি তোমাদেরকে মৃতের চামড়া ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ নির্দেশ দিচ্ছি, মৃতের চামড়া ও নিতম্ব ব্যবহার কোরো না। এই হাদিস থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, মৃতের চামড়া ব্যবহার সকলাবস্থায় অসিদ্ধ। এটাও জানা যায় যে, এটাই ছিলো রসুল পাক স, এর শেষ নির্দেশ— এই আপত্তির প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, হাদিসটি বর্ণনাকারীদের একজন হলো, ফুজালা বিন মোফাজ্জল। ইমাম আবু হাতেম রাজী বলেছেন, সে হাদিস বর্ণনার অযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণনা গ্রহণ করেননি।

মৃতের পশম, হাড়, নিতম্ব, শিং এবং বিষ ব্যবহার করা না করা সম্পর্কে আলেমগণ একমত হতে পারেননি। ইমাম শাফেয়ীর মতে, বর্ণিত সকল অঙ্গই অপবিত্র। ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেকের মতে কেবল পশম পবিত্র, অন্যগুলো নয়। তাদের দলিল হচ্ছে এই— রসুল স. বলেছেন, মৃতের কোনো অংশ থেকেই উপকার গ্রহণ করা যাবে না। পশম অপবিত্র হওয়ার দলিল হচ্ছে এই— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, নখ, রক্ত এবং চুল পুঁতে রাখো, এগুলো মৃত।

ইমাম আবু হানিফা দলিল পেশ করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিস থেকে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মৃত প্রাণীর কেবল গোশ্ত ভক্ষণ করা হারাম। দ্বিতীয় দলিল হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. কেবল মৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হারাম বলেছেন। চামড়া ও চুল ব্যবহার অবৈধ বলেননি। এই হাদিসটি অবশ্য বিপর্যস্ত সনদবিশিষ্ট। কারণ, এর বর্ণনাকারীদের একজন দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। তার নাম আবদুল জাব্বার। ইবনে হাব্বান অবশ্য তাঁকে দুর্বল বলেননি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— আমি রসুল পাক স.কে বলতে শুনেছি, মৃতের সেই অংশটি হারাম যা ভক্ষণযোগ্য। সেক্ষেত্রে অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ চামড়া, চুল, পশম, দাঁত, হাড় হালাল। এ হাদিসটির সনদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কারণ, এর সূত্রসংযুক্ত বর্ণনাকারী আবু বকর হাজালী পরিত্যক্ত। গুনদার তাকে মিথ্যাবাদি বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া বিন নাঈম এবং আদী বলেছেন, আবু বকর হাজালী হাদিস শাস্ত্রের কেউ নয়। হজরত সাওবান থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. তাঁর কন্যা হজরত ফাতেমার জন্য একটি আসবের হার এবং একটি হাতির দাঁতের চিরুনী ক্রয় করেছিলেন। এই হাদিসটির সনদও নিষ্কন্টক নয়। কেনোনা এর দুই বর্ণনাকারী হুমাইদ এবং সুলায়মান অখ্যাত।

আমাদের শেষ দলিল হচ্ছে নিম্নের বিবরণটি। বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী। এই বিবরণে লিখিত হয়েছে, ইমাম জুহরী বলেছেন, আমি পরবর্তী আলেমগণকে হাতির দাঁতের চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়াতে দেখেছি। তাঁরা হাতির দাঁতের পেয়ালায় রক্ষিত তেলও ব্যবহার করতেন। এ রকম করাকে তাঁরা দূষণীয় মনে করতেন না। আমি বলি, ইমাম জুহরী যাদের কথা বলেছেন, তাঁরা হয় সাহাবা নয় তো তাবেঈন— একথা জানার পর আমাদের আর অতিরিক্ত বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ কোথায়? হাম্মাদ বিন সালমা বলেছেন, মৃত জীবের পশম দ্বারা উপকার লাভ করায় কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে সিরিন এবং ইব্রাহিম বলেছেন, হাতির দাঁতের ব্যবসায় ক্ষতি নেই।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেক বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের প্রথমে বর্ণিত হাদিসগুলোর সকল সনদই অগ্রহণীয় (মুনকার)। পরে বর্ণিত হাদিসের এক রাবির নাম আবদুল্লাহ্ বিন আজীজ। তার বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আবু হাতেম রাজী বলেছেন, তার হাদিসগুলো মুনকার। আর আমার বিবেচনায় সে সত্যের মাপকাঠি নয়। হজরত আলী ইবনে হোসাইন বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আজীজ অপদার্থ। তার মিথ্যা বর্ণনা আমি গ্রহণ করি না। যদি ধরে নেয়া যায়, প্রথমোক্ত হাদিসটি শুদ্ধ তবুও তা এ কারণে পরিত্যাজ্য হবে যে, বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদিসের প্রতিকূল।

রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম। রক্ত অর্থ, প্রবাহিত রক্ত। প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র। আর শুকরের সবকিছুই অপবিত্র। আলোচ্য আয়াতে কেবল গোশ্তের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গোশ্ত বলতে এখানে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ গোশ্ত যখন হারাম তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হারাম। এমন কি চুল ও পশমও হারাম। শুকর এমন একটি প্রাণী যা মূলতঃই অপবিত্র (আঈনি নাজাসাত)। ইনশাআল্লাহ্ সুরা আনআমে বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হবে।

শুকরের পশম ব্যবহার সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের মতে, শুকরের পশম দ্বারা জুতা বা মশক তৈরী করা যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যায় না। আর ইমাম মালেক বলেছেন, এরকম করলে মাকরূহ হবে। এভাবে বিষয়টির উপর জায়েয, হারাম, এবং মাকরূহ হওয়ার ফতোয়া এসেছে।

অল্প পানিতে শুকরের চুল পড়ে গেলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হবে না। ইমাম ইউসুফ বলেছেন, প্রয়োজন পূরণের জন্য শুকরের চুল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন নির্ণীত হবে ব্যবহারের দিক থেকে। কাজেই পানিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এক কথা আর ব্যবহার অন্য ব্যাপার। এখানে প্রয়োজনের কোনো দিক নির্দেশনা নেই। হেদায়া গ্রন্থে এ রকমই বলা হয়েছে। ফকীহ্ আবুল লাইস বলেছেন, ক্রয়যোগ্য হলেও শুকরের চুল ক্রয় করা বৈধ নয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, চুলের দ্বারা সেলাই করা প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে

না। কারণ অন্য বস্তু দ্বারাও সেলাই করা যায়। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে সিরীন শুকরের চুল দ্বারা সেলাইকৃত মোজা ব্যবহার করতেন। তিনি এরপর বলেছেন, কিন্তু তাই বলে চুলের ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। এভাবে উপকার বা লাভ গ্রহণ করাও তাই বৈধ নয়।

'যা জবাই কালে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম নেয়া হয়েছে'— এ প্রসঙ্গে রবী বিন আনাস বলেছেন, যে পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর নামোচ্চারণ করা হয়। 'ইহলাল' শব্দের অর্থ, সজোরে চিৎকার করা। আরববাসীরা নতুন চাঁদ দেখলে উল্লসিত হয়ে সজোরে তকবীর ধ্বনি দিতো। অবিশ্বাসীরা পশু জবাই করার সময় চিৎকার করে তাদের দেবতাদের নাম উচ্চারণ করতো। এরকম উচ্চস্বরে চিৎকারের নামই ইহলাল। যারা এরকম করতো তারা 'মুহিল'। এভাবে গায়রুল্লাহ্র জন্য উৎসর্গীকৃত (জবাইকৃত) পশু হারাম।

যারা ক্ষুধার্তাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে (সীমালংঘন না করে) হারাম বস্তু ভক্ষণ করে তাদের কোনো পাপ হবে না। কেনোনা তারা অন্যায়কারী নয়। আর এমতাবস্থায় খাদ্য আস্বাদনও তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে কেবল জীবন ধারণের অমোঘ প্রয়োজন। এ রকম নিরুপায় অবস্থায় যতোটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে মৃত্যুর আশংকা রোধ হয়, ততোটুকুই কেবল গ্রহণ করা বৈধ। এর অতিরিক্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পরিতৃপ্ত আহারেরও অনুমতি রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদও এরকম বলেছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এই যে, ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, শীঘ্রই হালাল খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকলে অতিরিক্ত ভক্ষণ করা সিদ্ধ হবে না। আর নিশ্চয়তা মাত্র না থাকলে পেট পুরে খেতে পারবে। বরং কিছু কিছু সংরক্ষণও করে রাখতে পারবে।

বায়হাকী বলেছেন, ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মত হচ্ছে, অবৈধ উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীরা প্রয়োজনের সময়েও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতে পারবে না। বৈধ উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীদের জন্য জীবন রক্ষার্থে হারাম গ্রহণের যে শিথিলতা দেয়া হয়েছে— তাদের জন্যও তওবা জরুরী। অর্থাৎ তওবা ব্যতিরেকে তাদের অনন্যোপায়তা ক্ষমার্হ হবে না। বাগবী বলেছেন, এই বিধানের প্রবক্তা হচ্ছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং সাঈদ বিন জোবায়ের। আমি বলি, খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন বিধান মান্য করতে হবে তেমনি সীমারেখাও বজায় রেখে চলতে হবে (শিথিলতাকে আশ্রয় করতে হবে এবং অতিরিক্ত ভোজন থেকেও বেঁচে থাকতে হবে)। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, পবিত্রতা ও বৈধতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং শিথিলতার বিধানকেও বিধান হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'— এখানে একথার অর্থ, উপায়বিহীন অবস্থায় হারাম ভক্ষণের অনুমতি দান আল্লাহ্ পাকের দয়ার একটি অনন্য নিদর্শন। এ ধরনের অনন্যোপায়তাকে তিনি ক্ষমা করবেন। এখানে আরো একটি কথা স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে যে, কেউ যদি অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার আত্মহননের পাপ হবে না। কারণ, এখানে জীবন রক্ষার্থে হারামের অনুমতি দেয়া হয়েছে— আদেশ দেয়া হয়নি। অর্থাৎ বর্ণিত নিরুপায়তা ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়, বরং মোবাহ্ (বৈধ)। ইমাম শাফেয়ী এ রকম বলেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপায়বিহীন অবস্থায় হারাম ভক্ষণ করা ওয়াজিব। শিথিলতার এই বিধান মান্য না করার কারণে যদি কারো মৃত্যু হয়, তবে সে গোনাহ্গার হবে। তার দলিল হচ্ছে এই আয়াত— 'আর বিস্তারিত রূপে তিনি বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের উপর যা হারাম করে দিয়েছেন, হ্যাঁ যে সময় নিরুপায় হয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হও'— এই আয়াতে নিরুপায় অবস্থাকে আল্লাহ্ তায়ালা আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তুগুলো মোবাহ সমতুল্য। আর ওই মোবাহ্ বস্তুগুলোর মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা (ভক্ষণ করা) ওয়াজিব। বলাই বাহুল্য যে, এই শিথিলতা সাধারণ কোনো বিধান নয়। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে দান করা হয়েছে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র অনুগ্রহ (শিথিলতার বিধান)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

❑ আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পূরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না—তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

❒ তাহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে; আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল!

❒ ইহা এই হেতু যে আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা অশেষ মতভেদে রহিয়াছে।

'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'— অর্থ, যে তওরাত শরীফ তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। 'যারা তা গোপন রাখে' —একথার মাধ্যমে ওই সকল লোককে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা তওরাতে বর্ণিত রসুল পাক স. সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে গোপন করে।

ইহুদী নেতা ও আলেমেরা দরিদ্র লোকদের নিকট থেকে উপঢৌকন, পানাহারের সামগ্রী ইত্যাদি গ্রহণ করতো। তারা ধারণা করতো, শেষ যুগের রসুল তাদেরই গোত্রভূত হবেন। কিন্তু তা যখন হলো না তখন তাদের আশাভঙ্গের জ্বালা পরিণত হলো বিদ্বেষে। তারা তখন তওরাতে উল্লেখিত রসুলে পাক স. সম্পর্কিত বিবরণগুলো বিকৃত করে ফেললো। সাধারণ জনতা বিভ্রান্ত হলো। তারা বিকৃত বর্ণনার সঙ্গে রসুল স. এর বাস্তব অবস্থার মিল খুঁজে পেলো না। সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের মতো তারাও তখন আশ্রয় নিলো বিরোধী শিবিরে। এরকম পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতগুলো। বাগবী বলেছেন, এটাই শানে নুজুল। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ্ এর মাধ্যমে ছা'লাবীও এ রকম বলেছেন। ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো এবং সুরা আলে ইমরানের কতিপয় আয়াত ইহুদীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে।

'বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে'- একথার অর্থ, পরকালের তুলনায় পৃথিবীকে প্রাধান্য দেয়। পৃথিবীর বিপুল বৈভব আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়। তাই পৃথিবীপ্রাপ্তিকে এখানে স্বল্পমূল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই প্রবেশ করায় না— একথার অর্থ, তারা ঘুষ গ্রহণকারী এবং হারাম বস্তু ভক্ষণকারী। এই হারাম তাদেরকে আগুনের সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেবে। অথবা আখেরাতে ওই নিষিদ্ধ বস্তুগুলোই আগুনে রূপান্তরিত হবে। কিংবা হারাম ভক্ষণকারীরা তখন আগুন দ্বারা উদরপূর্তি করবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না—একথার অর্থ, তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবেন না। দয়ার্দ্রচিত্ততা প্রকাশ পায়— এ মতোন বাক্যালাপও করবেন না। যারা অবিশ্বাসের কারণে শাস্তির উপযোগী তারা সমাদর ও শুভ সম্বোধনের উপযোগী নয়। কিছুতেই নয়।

'তাদেরকে পবিত্র করবেন না'—এর অর্থ, শাস্তি তাদের পাপপ্রক্ষালনের কারণ হবে না। অর্থাৎ পাপী বিশ্বাসীরা যেমন পাপের শাস্তি ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে যাবে, তারা সে রকম হবে না। তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন মর্মন্তুদ শাস্তি।

'তারা সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে'—একথার অর্থ তওরাতের বিবরণবিকৃতির মাধ্যমে তারা সত্যপথ ত্যাগ করেছে। গ্রহণ করেছে ভ্রান্ত পথ। উপনীত হয়েছে ধ্বংসের মুখোমুখি।

ক্ষমার পরিবর্তে ক্রয় করেছে শাস্তি— একথার অর্থ মাগফিরাত ও মুক্তি ছেড়ে দিয়ে শাস্তিকে আবাহন করেছে তারা।

'আগুন সহ্য করতে তারা কতোই না ধৈর্যশীল'— এ বাক্যটির অর্থ, হে বিশ্বাসীরা! দেখো কী অবাক ব্যাপার! তারা জেনে শুনে জাহান্নামের পাথেয় সংগ্রহে কতোই না একাগ্রচিত্ত। মনে হয়, দোজখের আগুনে বসেও তারা কেমন নির্বিকার ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী। কী হেতু এই নির্বুদ্ধিতার? শেষ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

'হেতু এই যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'—এখানে কিতাব অর্থ, তওরাত অথবা অন্য সকল আসমানী কিতাব। মানবতা দ্বিখন্ডিত হয়েছে এই কিতাব নাজিলের কারণেই। স্পষ্ট হয়েছে সত্য এবং মিথ্যা। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কারা বিশ্বাসী— কারাই বা অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীরাই শাস্তির উপযোগী—যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে সকল আসমানী কিতাবে। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে কিতাব অর্থ,ওই আয়াত যেখানে বলা হয়েছে- তাদের ভীতি প্রদর্শন করা না করা সমান। তারা ইমান গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম হবে, ইহুদীদের পাপানুবর্তন ও দৌরাত্ম্য অনড়- অনপসারণীয়। তাই আল্লাহ্ তাদের এই অনড়তা লক্ষ্য করেই সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তারা ইমানই গ্রহণ করবে না। আর ইহুদীরাও তেমনি, ভয়ভাবনার লেশমাত্রও তাদের নেই। অমোঘ ধ্বংস তাদের একগুঁয়েমিকে টলাতে পারেনি। 'যারা কিতাব সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করেছে'- এর অর্থ, তারা আসমানী কিতাবেও ঘটিয়েছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তর। কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করেছে, আবার কিছু অংশ করেছে পরিত্যাগ। তারা যেমন তওরাতের নির্দেশ অমান্য করেছে, তেমনি অমান্য করেছে কোরআনেরও নির্দেশ। তওরাত ও কোরআন উভয় কিতাবের নির্দেশ এই যে, শেষ নবীর উপর ইমান আনতে হবে। এই নির্দেশ তারা মানেনি। তওরাত মেনেছে আংশিকভাবে, যা না মানারই নামান্তর। আর কোরআন মজীদ সম্পর্কে কখনো বলেছে—এটা যাদু। কখনো বলেছে, আল্লাহ্ নয় মানুষই এর রচয়িতা। আবার কখনো বলেছে এ সব তো প্রাচীন কাহিনীর সমাহার মাত্র।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই তারা অশেষ মতভেদে রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতবিরোধ অন্তহীন। তাই তারা সত্যচ্যুত, বুদ্ধিরহিত।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

❑ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও জাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-দারিদ্রে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই সাবধানী।

হজরত কাতাদা থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন— ইহুদীরা পশ্চিমমুখী হয়ে এবং খৃষ্টানেরা পূর্বমুখী হয়ে বায়তুল মাকদিসকে কেবলা করে উপাসনা করতো। এই আয়াতের শুরুতেই এই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, পূর্ব পশ্চিম মুখী হওয়াতে কোনো লাভ নেই। কারণ শেষ কিতাবের মাধ্যমে তাদের কেবলা রহিত হয়েছে। তাই রহিত কেবলার দিকে মুখ করাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর আল্লাহ্র নির্দেশবিরোধী কাজ কস্মিনকালেও কোনো পুণ্যের কাজ নয়। এ রকম বলেছেন আবী হাতেম আবুল আলীয়া থেকে। বাগবী বলেছেন, হজরত কাতাদা এবং মুকাতিলও এই অভিমত পোষণ করেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে। তাঁরা আরো বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে শরিয়তের বিধানাবলী সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়নি। তখন কেবল তওহীদ ও রেসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হতো। বিশ্বাসীরা তখন যে দিকে ইচ্ছা মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। নামাজ ছাড়া অন্য আমলের হুকুম তখনো আসেনি। রসুল পাক স. এর হিজরতের পর শরিয়তের সকল বিধান অবতীর্ণ হলো। এভাবে শরিয়তের পরিপূর্ণতা সাধনের পর এই

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে এরকম— দেখো, শুধু পূর্বে অথবা পশ্চিমে মুখ ফেরানোর মধ্যে পূর্ণ সফলতা নেই। সৎআমল রয়েছে আরো অনেক প্রকারের। পরক্ষণেই সেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। বাগবী বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং জুহাকও এই অভিমতের সমর্থক। এর পোষকতা রয়েছে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং হজরত কাতাদা থেকে। আমি বলি, আল্লাহ্ পাক এখানে কেবল মুখ ফেরানোর কথা বলেছেন, নামাজ আদায়ের কথা উল্লেখ করেন নি। এতে করে প্রমাণিত হয়, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে, বিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে নয়। কেননা আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, তিনি তোমাদের নামাজ অসফল করেন না। পুবে ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই— একথা বলার পর পুণ্য লাভের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাস্য বিষয়গুলো হচ্ছে- আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতামন্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ এবং প্রেরিত পুরুষগণ। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ, তাঁর মহান সত্তার অতুলনীয় এককত্বকে মেনে নেয়া। সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী সকল কিছুতেই তিনি এক, একক। তিনি নশ্বরতার স্পর্শমুক্ত। সমকক্ষতা ও সমান্তরালতা থেকে পবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে তিনি নিজে যেমনটি বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক তেমনটিই বিশ্বাস করতে হবে।

পরকাল অর্থ, কিয়ামত দিবস থেকে পরবর্তী জীবন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর সেই অন্তহীন ও চিরস্থায়ী অধ্যায়। আমলের হিসাব, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, শাফায়াত, মাগফিরাত, চিরস্থায়ী পুরস্কার ও শাস্তি— এ সকলই পরকালের অধ্যায়ভূত।

ফেরেশতামন্ডলীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এরকম— তারা আল্লাহ্ পাকের বান্দা। আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা অনেকেই চারটি, ছয়টি কিংবা আটটি ডানা বিশিষ্ট। রসুল পাক স. তাঁদের নেতা হজরত জিব্রাইলের ছয়শত ডানা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফেরেশতারা পানাহার করেন না। আল্লাহ্পাকের জিকিরই তাঁদের পানাহার। তাঁরা না নারী না পুরুষ। তাই তাঁরা বিবাহের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ পালনে তাঁরা নিখুঁত। তবুও তাঁদের মৃত্যু আছে। সকল সৃষ্টির মতো তাঁরাও মৃত্যুর পর পুনরোত্থিত হবেন। তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্ পাকের দূত। আল্লাহ্পাক এবং রসুলের সঙ্গে চলে তাঁদের এই দৌতকর্ম। আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও সন্তোষই তাঁদের ইবাদতের প্রতিফল। তাঁদের জন্যে না বেহেশত রয়েছে না দোজখ। বরং তাঁদের অনেকেই বেহেশতের প্রহরী। দোজখের রক্ষক। এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ বিশ্বাসীরা ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম নয়। বিশ্বাসীদের কেউ পাপী, কেউ পুণ্যবান। পাপী পুণ্যবান সকলেই আবার শাস্তির মাধ্যমে অথবা শাস্তি ব্যতিরেকে লাভ করবেন

বেহেশতের অধিকার। ফেরেশতাদের এই অধিকার নেই। কিন্তু তাঁরা পবিত্র। তাই সাধারণ বিশ্বাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ বিশ্বাসীরা ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁরা জাতী তাজাল্লী (মহান সত্তার জ্যোতিচ্ছটা) লাভ করেছেন, যা কেবল মৃত্তিকাজাত সৃষ্টির পক্ষেই লাভ করা সম্ভব। ফেরেশতারা নূর থেকে জাত। মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উপাদান নয়। তাই জাতী তাজাল্লী ধারণের যোগ্যতাও তাদের নেই। এটাও জেনে নিতে হবে যে, পুণ্যকর্মের বিনিময়েও ফেরেশতারা যেমন জান্নাতের অধিকারী হবেন না, তেমনি প্রেরিত পুরুষগণ আবার জান্নাতে গমনের পূর্বেই (পৃথিবীতেই) জান্নাতের উপকরণসমূহ প্রাপ্ত হন। তাই আল্লাহ্ পাক হজরত ইব্রাহিমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি ইব্রাহিমকে তাঁর প্রতিদান এজগতেই প্রদান করেছিলাম। আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূত থাকবে।

কিতাবসমূহ অর্থ, কোরআন মজীদসহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব। কোরআন মজীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সর্বশেষে অবতীর্ণ এই গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই কিতাবের বিশ্বাস পূর্ণ হবে। অর্থাৎ সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হবে। সকল কিতাবই আল্লাহ্ পাকের বাণী। আল্লাহ্পাকের বাণীও তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর মতো চিরন্তন– সৃষ্ট নয়। এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, কোনটা কোরআন, মর্ম না শব্দসমাহার? বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, শব্দ ও মর্ম উভয়ের মিলিত নামই কোরআন। শুধু শব্দ যেমন কোরআন নয়, তেমনি শুধু মর্মও কোরআন নামে অভিহিত হতে পারে না। শব্দ যদিও নশ্বর বলে মনে হয় এবং শ্রুতির গোচরে আসে– তবু তা কেবল নশ্বর শব্দ নয়, বরং আল্লাহ্পাকের চিরন্তন ও অতুলনীয় বাণীসম্ভার।

নবী হিসেবে সকল নবী এক। তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সর্বপ্রথম নবী হজরত আদম আ. আর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নবী হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স.। নবীগণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় ও নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং তাঁদের সংখ্যা নির্ণয়ে প্রতর্ক পরিহার করতে হবে। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'তাদের কিছু সংখ্যকের কাহিনী আপনাকে জানিয়েছি, আর কিছু সংখ্যকের কথা জানাইনি।' যে সকল হাদিসে তাঁদের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো কিন্তু খবরে ওয়াহেদ (এককবর্ণিত)। খবরে ওয়াহেদ থেকে অকাট্য বিশ্বাস অর্জিত হয় না। সুতরাং সংখ্যা নিরুপণে গলদঘর্ম হওয়া নিরর্থক। নবীগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পাপ থেকে পবিত্র। তাঁদের সকলের বিশ্বাস এক। বিধানগত শাখা প্রশাখায় অবশ্যই ভিন্নতা রয়েছে। বিধানাবলীর ক্ষেত্রে রহিতকরণ নীতি (নাসেখ মনসুখের নিয়ম) প্রচলিত বলেই এরকম পার্থক্য ঘটেছে।

রাফেজী সম্প্রদায় বলে, নবীগণের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে ইমামগণের প্রতি বিশ্বাসের কথাও রয়েছে। আমি বলি, এখানে বরং নবীগণ ছাড়া অন্য সকলের প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি ইমামগণ বিশ্বাস্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভূত হতেন, তবে

নবী ও ফেরেশতার মতো ইমাম প্রসঙ্গটিও পাশাপাশি উল্লেখিত হতো। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

কল্যাণকর বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ বর্ণনার পর পুণ্য কর্মসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমেই এসেছে দানের কথা। আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে দান করা হয়, তিনি তার যথাপুরস্কার দিবেন। আর যে দানের সঙ্গে আল্লাহ্ প্রেমের সংশ্রব নেই সে দান পুণ্যবিহীন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেন, হাশরের প্রান্তরে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে তাতে জড়িত থাকবে তিন প্রকারের মানুষ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হবে এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ পাক এক বিত্তশালীকে তখন জিজ্ঞেস করবেন, পৃথিবীতে আমি তোমাকে বিপুল বিত্তের অধিকারী করেছিলাম, সেকথা কি তোমার মনে আছে? লোকটি বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক বলবেন, তোমার বিত্তরাশি দিয়ে তুমি আমার কোন কর্ম সম্পাদন করেছো? সে বলবে, হে আমার প্রভুপালয়িতা! তুমি দানের যতোগুলো পথ খুলে দিয়েছিলে, সে সকল পথেই আমি আমার সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি আমার উদ্দেশ্যে দান করোনি। তোমার দানের উদ্দেশ্য ছিলো দানবীর নামে খ্যাত হওয়া। পৃথিবীতে সেই খ্যাতি তুমি পেয়েছো। এরপর আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন একে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের অবস্থা ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। মুসলিম। আরো বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্ বলেন, আমি সকল মুশরিকের শিরিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি শিরিককারীকে এবং তার কর্মকান্ডকে পরিত্যাগ করি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে- আমি তাদের প্রতি বিমুখ এবং যার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত তাদের থেকে বিমুখ।

'আলা হুব্বিহি' অর্থ, আল্লাহ্ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। সম্পদের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরকম অর্থ করা যেতে পারে। সম্পদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থ, সম্পদ নিমজ্জিত অবস্থায়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এরকম বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক ব্যক্তি রসুল পাক স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অধিক পুণ্যার্জন করা যায় কীরূপ দানের মাধ্যমে? তিনি স. বললেন, সম্পদ হতে হবে ত্রুটিমুক্ত, আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। সম্পদ হ্রাসের ভয় এবং ধনী হওয়ার লালসা থাকা সত্ত্বেও যে দান করা হয়, সেই দানেই রয়েছে অধিকতর পুণ্য। দানের সময় টালবাহানা করা চলবে না। প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার সময় দানের অঙ্গীকার করাতে কোনো লাভ নেই। কারণ, তখন ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের অধিকারে প্রায়। বোখারী। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেছেন, প্রিয় সামগ্রী দান না করা পর্যন্ত পুণ্য অর্জিত হবে না। এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতের 'আলা হুব্বিহি' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ

হয়ে, সম্পদপ্রিয়তায় উজ্জীবিত হয়ে নয়। এখানে 'হা' সর্বনামটি সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে আরেকটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, এমন সম্পদ দান করতে হবে, যে সম্পদ সর্বাধিক প্রিয়। এই মতের পোষকতায় রয়েছে ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অর্জিত সম্পদ থেকে পবিত্র বস্তু দান করো। আর আমি যা উদগত করি ভূমি থেকে এবং দূষণীয় বস্তু দান করার অভিপ্রায় কোরো না। 'আল্লাহ্‌র প্রেমে অথবা সম্পদের প্রেমে ছাড়াও দানের প্রেমে— এ রকম অর্থও করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে দানে অন্তর প্রসন্ন হয়— অন্তরের উদগ্র আকর্ষণে যে দান সম্পাদিত হয়।

দান করতে হবে আত্মীয়স্বজনকে। 'আত্মীয়স্বজন' অর্থ, সকল আত্মীয়। রক্ত সম্পর্কধারী অথবা রক্তসম্পর্কবহির্ভূত। তবে নিকটাত্মীয়দের দান করাই অধিকতর উত্তম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেছেন, যদি তুমি এক দিনার আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো, এক দিনার দাও অভাবগ্রস্তকে এবং আরেক দিনার ব্যয় করো পরিবার পরিজনের জন্য— তবে জেনো, শেষোক্ত ব্যয়ে রয়েছে অধিকতর পুণ্য। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সহধর্মিণী হজরত জয়নাব থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. বলেছেন, হে রমণীকুল! দান খয়রাত করো, অলংকার থেকে হলেও। হজরত জয়নাব এবং অন্য এক রমণী তখন বললেন, হে দয়াল নবী! স্বামী এবং পোষ্য এতিমদের যদি দান করা হয়, তবে কি তা দান বলে গণ্য হবে? তিনি স. বললেন, এরকম দানে রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি সওয়াব আত্মীয়তার অধিকারকে সম্মান জানানোর জন্য এবং আরেকটি কেবল দানের জন্য। হজরত সুলায়মান বিন আমের থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি স. এরশাদ করেছেন, দরিদ্রকে দান করার জন্য রয়েছে একটি পুন্য। আত্মীয়দের দান করলে রয়েছে দু'টি— একটি আত্মীয়তার হক প্রতিপালন, অন্যটি নিছক দান। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

'পিতৃহীন' একথার অর্থ, ওই সকল এতিম বালক অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় যাদের পিতৃবিয়োগ ঘটেছে অথবা পিতা নিরুদ্দেশ হয়েছে। বায়যাবী বলেছেন, 'ইয়াতামা' অর্থ ইয়াতিম এবং 'জাবিল কুরবা' অর্থ, অভাবী আত্মীয়বর্গ। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে দানের নির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করেননি। আমি বলি, সীমা নির্দেশের প্রয়োজনও নেই। সকল প্রকার দানই এই আয়াতে উল্লেখিত দানের অন্তর্ভুক্ত। সে দান ফরজ হোক অথবা নফল। এখানে যদি কেবল ফরজ দানের কথা বলা হতো তবে তার স্পষ্ট সীমা রেখাও চিহ্নিত করে দেয়া হতো। আর নফল দান যে কেবল অভাবীকে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নফল দান কেবল মনোরঞ্জনের কারণেও হতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে যে অভাবী হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আর আত্মীয় বলতে কেবল মুসলমান আত্মীয়ই বুঝায় না।

মুসলমানদের অমুসলমান আত্মীয় থাকাও সম্ভব। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'এজগতে তাদেরকে (অমুসলমান পিতা মাতাকে) উত্তম সঙ্গ দিবে।'

হজরত আবু বকরের কন্যা হজরত আসমা বলেছেন, আমার মা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখনো তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। একদিন তিনি আমার কাছে এলেন। আমি রসুলে আকরম স.কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার মূর্তিপূজারিণী মায়ের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবো। তিনি স. এরশাদ করলেন, আপনজনোচিত ব্যবহার কোরো।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, আমি মহানবী স.কে বলতে শুনেছি, ওমুক গোত্রের লোক আমার বন্ধু নয়। আল্লাহ্ পাক ও বিশ্বাসীরাই আমার বন্ধু। তবে অবিশ্বাসী ওই গোত্রের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। সে সম্পর্ক আমি অবশ্যই সংরক্ষণ করবো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ আত্মীয়দের সঙ্গে সমান্তরাল আচরণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সে-ই যে ছিন্ন সম্পর্কের একত্রীকরণে সচেষ্ট হয়। বোখারী।

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতে এতিমের প্রতিপালনকারী ও আমার মধ্যে নৈকট্য থাকবে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর নৈকট্যাপেক্ষা অধিক। বোখারী, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

পর্যটক অর্থ মুসাফির, পথিক। যারা প্রবাসী, পরিবার পরিজন থেকে পৃথক তারাই পর্যটক বা পথিক। কেউ কেউ বলেছেন, পর্যটক অর্থ অতিথি। হজরত আবু শোরাইহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরলোকে বিশ্বাসী, সে যেনো অতিথিবৎসল হয়। বোখারী, মুসলিম।

সাহায্যপ্রার্থীগণকেও দান করার কথা এসেছে। হজরত উম্মে বুজাইদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, যাঞ্চাকারীকে কিছু না কিছু দিও। ছাগলের পোড়া খুর হলেও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, হে উম্মে বুজাইদ! ছাগলের পোড়া খুর ছাড়া আর অন্য কিছু যদি তোমার না থাকে, তবে তাই দিও প্রার্থীকে। আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজি।

হজরত হোসাইন বিন আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, যাঞ্চাকারীদের অধিকার রয়েছে— যদিও তারা অশ্বারোহী হয়ে আগমণ করে। হজরত আলী থেকে আবু দাউদ, হজরত ফাতেমা থেকে রাহ্ওয়াইহ্, হজরত হারমাস বিন মিয়াদ থেকে তিবরানী এবং আয্যোহদ গ্রন্থে ইমাম আহমদ, সালাম বিন আবীল জা'য়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন—হজরত ঈসা বলেছেন, যাঞ্চাকারীর একটি হক রয়েছে—যদিও সে তোমাদের নিকট রৌপ্যের কণ্ঠহার শোভিত অশ্বারোহী হয়ে আসে। আমি বলি, এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

সম্পদশালীর জন্য যাঞ্চা করা হারাম। তবু যদি সে যাঞ্চা করে তবে তাকে কিছু দান করা অত্যাবশ্যক।

সবশেষে দাসমুক্তির জন্য অর্থদানের কথা বলা হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত 'রিকাব' শব্দটির অর্থ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস)। মুকাতাব ওই ক্রীতদাসকে বলা হয়, যে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এখানে এরকম ক্রীতদাসদেরকে অর্থ দানের কথা বলা হয়েছে। যে দাস চুক্তিবদ্ধ নয়, তাকে মুক্ত করার জন্য অর্থ দানও এই বাক্যটির অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের সরল নির্দেশ হলো, মুক্তিপণ প্রদান করে দাস মুক্ত করো।

এরপর দেয়া হয়েছে নামাজ পাঠের নির্দেশ। তারপর জাকাত প্রদানের। নামাজ পাঠ অর্থ ফরজ নফল সুন্নত মোস্তাহাব— সকল বিধানসহ নামাজ পাঠ করা। নামাজের মতো জাকাত আদায় করাও ফরজ। আর 'আতাল মালা' বলে বুঝানো হয়েছে, নফল সদকাকে অথবা সাধারণ দান খয়রাতকে। সাধারণ দান খয়রাতের মধ্যে ফরজ, নফল সকল প্রকার দানই অন্তর্ভূত। কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, প্রথমে বর্ণিত 'আতাল মালা' এবং পরে বর্ণিত 'আতাজ জাকাত' বলতে ফরজ জাকাতকেই বুঝানো হয়েছে। প্রথম বর্ণনাটির উদ্দেশ্য ছিলো জাকাতের খাত নির্ণয় করা এবং পরের বর্ণনাটি হচ্ছে, জাকাত প্রদানে উৎসাহিত করা। আমি বলি, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিকতর যুক্তিসংগত। পুণ্যকর্মসমূহের বিবরণ প্রদান করাই এই আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে পুণ্যকর্ম ফরজ হোক অথবা নফল। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, পুণ্যকর্ম। এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি হাদিস রয়েছে। যেমন, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, সম্পদে জাকাত ব্যতীত আরো হক রয়েছে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা ও দারেমী। হক অর্থ দাবী বা অধিকার। ফরজ, ওয়াজিব, মোস্তাহাব সকল দাবীই হক। হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এর খেদমতে এক ব্যক্তির আগমন ঘটলো। সে ইসলামের বিশেষত্বসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলো। তার প্রশ্নের উত্তরে রসুল পাক স. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজান মাসের রোজা এবং জাকাতের কথা। লোকটি আরজ করলো, অতিরিক্ত আরো কিছু আছে কি? তিনি স. বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে অতিরিক্ত (নফল) কোরো।

'প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে'— একথার অর্থ, আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করলে। যেমন রূহের জগতে সকল রূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো। এখন সেই অঙ্গীকার পূরণের সময়। এছাড়া পৃথিবীতে কৃত সকল বৈধ অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে। মানত করলে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারও পূর্ণ করতে হবে। সদা সত্য কথা বলতে হবে। সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়লে সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- মুনাফিকদের নিদর্শন তিনটি। ১. মিথ্যা বলা। ২. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ৩. গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা। বোখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় একথাটিও রয়েছে, যদিও সে (মুনাফিক) নামাজ রোজা সম্পাদনকারী হয় এবং নিজেকে মুসলমান

বলে দাবী করে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্‌র রসুল স. এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব রয়েছে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। একটি স্বভাব থাকলে বুঝতে হবে সে একটি মুনাফিকির অধিকারী। সেই চারটি স্বভাব হচ্ছে-১. আমানতের খেয়ানত। ২. মিথ্যাচারীতা। ৩. অঙ্গীকার ভঙ্গ। ৪. বাদানুবাদের সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার।

সবশেষে বলা হয়েছে, ধৈর্যধারণের কথা। ধৈর্যশীলদেরকে আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়াস সবিরিন।' ধৈর্যের সম্পর্ক বিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এখানে বিশ্বাস ও ধৈর্যের মধ্যে আরো অনেক পুণ্য কর্মের কথা বলা হয়েছে। ধৈর্যধারণ অন্য সকল আমল থেকে উত্তম। ধৈর্য সংরক্ষণ একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার। তাই অন্য পুণ্যকর্ম থেকে এ আমলটি অধিক উত্তম। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আয়াতের মর্ম হবে, আমি ধৈর্যশীলদেরকে অধিক পুণ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট করি অথবা অধিক পুণ্যের কারণে আমি ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করি। এমতাবস্থায় একটি বাক্য অপর বাক্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, 'ওয়াস সবিরিন' এর সম্পৃক্তি জাবিল কুরবা'র (আত্মীয়স্বজনের) সঙ্গে। এমতাবস্থায় প্রতিপাদ্য বাক্য দাঁড়াবে এ রকম— আর ধৈর্যশীল (আত্মীয়) দেরকে দান করে। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আলোচ্য আয়াতটি ওই আয়াতের সমার্থসম্পন্ন যেখানে বলা হয়েছে,'দান করো অভাবীদেরকে যারা আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত। স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম নয়; প্রার্থী না হওয়ার কারণে মূর্খ লোকেরা যাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।' আলোচ্য আয়াতে বিভিন্ন পর্যায়ের ধৈর্য সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অর্থ সংকটে, দুঃখ দারিদ্রে এবং সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণের কথা।

বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্মের যে বিবরণসমূহ দেয়া হলো, সেগুলো আয়ত্তকারী যারা তারাই সত্যপরায়ন এবং সাবধানী। তাই সবশেষে ঘোষিত হয়েছে, 'উলা-ইকাল্লাজিনা সদাকু ওয়া উলাইকা হুমুল মুত্তাকুন।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৮,১৭৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তাহার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ইহার পরও যে সীমালংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

❐ হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে— যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।

হজরত কাতাদা, শা'বী এবং কালাবী বলেছেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্বে দু'টি বিবদমান গোত্রের মধ্যে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ি সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে সংগ্রামে নিহত হয়েছিলো উভয় পক্ষের অনেক লোক। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, ওই সংগ্রাম ঘটেছিলো বনী কুরাইজা এবং বনী নাজিরের মধ্যে। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, আউস এবং খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো ওই যুদ্ধ। সাঈদ এবং মুকাতিল উভয়ের বর্ণনায় রয়েছে—এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিক প্রভাবশালী। প্রভাবশালী গোত্র অপর গোত্রের রমণীদেরকে মোহর নির্ধারন ব্যতিরেকেই বলপূর্বক বিবাহ করতো। আরও অনেক প্রকারের জুলুম করতো তারা। অত্যাচারিত গোত্র এক সময় রুখে দাঁড়ালো। তারা এই মর্মে শপথ করে বসলো যে, আমরা দাসের পরিবর্তে স্বাধীন লোককে, নারীর পরিবর্তে পুরুষকে এবং একজনের পরিবর্তে দুইজনকে হত্যা করবো। একটি আঘাতের পরিবর্তে হানবো দু'টি আঘাত। তাদের এই ক্ষিপ্ত শপথের সংবাদ রসুলেপাক স. এর গোচরীভূত হলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে রয়েছে সমতার নির্দেশনা। তাই সকলেই এই নির্দেশনাকে সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থন করলো। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। আমি বলি, 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আ'মানু' বলে এখানে কেবল ইমানদারদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য ছিলো, আউস ও খাজরাজ সম্প্রদায়। কারণ, তাঁরা ছিলেন ইমানদার এবং দ্বীনের সাহায্যকারী। বনী নাজির এবং বনী কুরাইজা এই আয়াতের লক্ষ্য নয়।

হত্যাকান্ডের দন্ডঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের দন্ড হচ্ছে কিসাস (খুনের বদলে খুন)। অপরিকল্পিত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দন্ড কিসাস নয়। ইমাম আজমের মতে এই আয়াতে উল্লেখিত কিসাসের বিধান কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কিসাস। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— ইমাম শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং নাসাঈ। হাদিসটি

মুত্তাসিল না মুরসাল সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট দলিল হিসাবে গণ্য। দারা কুতনী কর্তৃক এই হাদিসটি আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন হাজম থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটিতে রয়েছে ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কিসাস আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য দিয়ত (রক্তপণ)। এই হাদিসটির সূত্রপরম্পরাতেও দুর্বলতা দৃষ্ট হয়।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ থেকে এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে— কিসাস ওয়াজিব। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রতি এই বিধানটি প্রযোজ্য যে, তারা যেনো হত্যাকারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করে। অপর অভিমতটি হচ্ছে কিসাস ও রক্তপণ— এর যে কোনো একটি ওয়াজিব। যে কোনো একটি বিধান কার্যকর করতে হবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি রক্তপণের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে বলে, আমরা কিসাস ক্ষমা করে দিলাম; তবে প্রথমোক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে কিসাস স্থগিত হবে। কিন্তু রক্তপণ স্থগিত হবে না। আর শেষোক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে কিসাস স্থগিত হওয়ার সাথে সাথে রক্তপণ প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্ণিত তিন ইমাম উত্তরাধিকারের সম্মতি ব্যতীতও রক্তপণ গ্রহণের দলিল হিসাবে নিম্নে বর্ণিত হাদিসগুলি উপস্থাপন করেছেন।

হজরত আবু শুরাইহ্ কারাবী বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী স. এক নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, কিসাস এবং রক্তপণ —এ দু'টির যে কোনো একটিকে তারা গ্রহণ করতে পারে। তিরমিজি, শাফেয়ী। হজরত আবু শুরাইহ্ খাজাঈ থেকে ইবনে জাওজী এবং দারেমী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল পাক স.কে বলতে শুনেছি যদি কারো প্রিয়জনকে হত্যা করা হয় কিংবা তাকে আঘাত করা হয়, তাহলে সে তিনটি বিধানের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারে। ১. কিসাস ২. ক্ষমা ৩. রক্তপণ। এই তিন বিধানের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার পর যদি সে সীমালংঘন করে তবে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী নরক। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেন— যে ব্যক্তির আপনজন নিহত হয় সে কিসাস অথবা দিয়ত— যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারবে। আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. বলেছেন, পরিকল্পিত হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বে ছেড়ে দাও। তারা তাকে হত্যা করুক অথবা রক্তপণ গ্রহণ করুক। আর রক্তপণের পরিমাণ হলো তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জাম'আ এবং চল্লিশটি খালফা। আহমদ তিরমিজি, ইবনে মাজা। ইমামত্রয়ের বর্ণিত দলিল প্রমাণ সমূহের প্রেক্ষিতে হানাফীগণ মন্তব্য করেছেন তারা হাদিসগুলোর প্রকৃত মর্ম বুঝতে অপারগ হয়েছেন। বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে মহানবী স. এর প্রকৃত বক্তব্য ছিলো এই—

উত্তরাধিকারীদের সামনে দু'টি পথ খোলা— হয় তারা কিসাস গ্রহণ করবে অথবা হত্যাকারীর সঙ্গে একটি সমাধানে উপনীত হবে। বলা বাহুল্য, হত্যাকারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ব্যতিরেকে সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথাটিও সুস্পষ্ট যে, হত্যাকারী তার জীবন বাঁচাতে চাইবে। তাই রসুল পাক স. হত্যাকারীর সম্মতির উল্লেখ করেননি। আল্লাহপাকই সমধিক জ্ঞাত।

'স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি। দাসের পরিবর্তে দাস ও নারীর বদলে নারী'— একথার অর্থ স্বাধীন ব্যক্তি নিহত হলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। ক্রীতদাস নিহত হলে ক্রীতদাসকে এবং নারী নিহত হলে নারীকে হত্যা করাই আল্লাহ্তায়ালার বিধান। তবে একথা বলা যাবে না যে, স্বাধীন ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসকে হত্যা করলে সে স্বাধীন হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। কিংবা নারী যদি কোনো পুরুষকে হত্যা করে, তবে সেই নারীকে হত্যা করা যাবে না। বরং আয়াতের অর্থ সাবলীল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করতে হবে। কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে একের প্রভাব প্রতিপত্তি অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না। হত্যাকারী প্রভাবশালী হলেও বিধান নড়চড় হবে না। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী স্বাধীন, ক্রীতদাস বা নারী যেই হোক না কেনো সকলের প্রতি কিসাস প্রযোজ্য।

হত্যার বিনিময়ে হত্যাঃ স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসকে হত্যা করলে, ক্রীতদাস স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে কিংবা রমণী কোনো পুরুষকে হত্যা করলে কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একটি প্রাণের বিনিময়ে একটি প্রাণ সংহার করা হবে। সে স্বাধীন, ক্রীতদাস, নর কিংবা নারী, মুসলমান কিংবা কাফের যেই হোক না কেনো। কারণ, আল্লাহ্ পাকের বিধানে এ সম্পর্কে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সাধারণভাবে বলা হয়েছে, আমি (বনী ইসরাইলদের সম্পর্কে তাদের তওরাতে) লিখে দিয়েছি, অবশ্যই একটি জীবনের বিনিময়ে একটি জীবন সংহার করা হবে। সুতরাং দেখা যায় কিসাসের বিধান সব সময় ছিলো একই। আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসুল এই বিধানেরই বর্ণনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিচারক এক। বিধানও একটি। তাই এই বিধানের আনুগত্য অপরিহার্য। এমতো ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের এরশাদ এরকম, 'আপনি তাদের পদ্ধতির অনুসরণ করুন।' আরো এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য সেই পথ নির্ধারণ করেছেন, যে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যে প্রত্যাদেশ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। আর সেই নির্দেশনাও, যা অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসার প্রতি।' পূর্ববর্তী কিতাবের কোনো বিধান রহিত করা না হলে, সেই বিধানটি কার্যকর অবস্থায় রয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। এই কার্যকারিতা সম্পর্কে এখানে দু'টি হাদিস উপস্থাপন করা যেতে পারে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের এককত্ব এবং রেসালাতকে স্বীকার করে ও এই

মর্মে সাক্ষ্য দেয়— তিনটি কারণ ব্যতীত তার রক্তপাত ঘটানো অবৈধ হবে। ১. হত্যা। ২. বিবাহিতাবস্থায় ব্যভিচার। ৩. ধর্মত্যাগ। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে—অবরুদ্ধ হজরত ওসমান তাঁর গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের শপথ সহযোগে জিজ্ঞেস করছি তোমরা কি জানো— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তিনটি কারণ ব্যতীত মুসলমানের রক্ত নির্গত করা যায় না? যাদেরকে হত্যা করা যায় তারা হচ্ছে— ১. বিবাহিত ব্যভিচারী ২. ধর্মত্যাগী (মোরতাদ) ৩. হন্তারক। শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত আয়েশা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্যরাও এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এই কথাটি জোর দিয়ে বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি আপন ক্রীতদাস, মালিকের মৃত্যুর পরে মুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ ক্রীতদাস, মুক্তিপণের চুক্তিতে আবদ্ধ ক্রীতদাস, আংশিক মালিকানাধীন ক্রীতদাস অথবা আপন পুত্রের ক্রীতদাসকে হত্যা করে, তবে তার উপর কিসাস প্রযোজ্য হবে না। শেষোক্ত অবস্থায় পুত্র পিতার নিকট রক্তপণও গ্রহণ করতে পারবে না। দাউদ জাহেরী বলেছেন, বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতেও কিসাস প্রযোজ্য। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হজরত সামুরা থেকে হাসান বলেছেন, মহানবী স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে, আমি তাকে হত্যা করবো। যে তার ক্রীতদাসের নাসিকা কর্তন করে আমি তার নাসিকা কর্তন করবো। সাধারণ আলেমগণ এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল ও প্রশাসন সংক্রান্ত। মুরসাল এই কারণে যে, হজরত সামুরার সঙ্গে হাসানের সাক্ষাত হয়েছিলো- এমতো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে হজরত আমর বিন শুয়াইব থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে দারা কুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি জেনেশুনে তার ক্রীতদাসকে হত্যা করেছিলো। রসুল স. সেই হত্যাকারীর জন্য একশত দোররা, দেশান্তর এবং গনিমতের অধিকার হরণের শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন-কিসাস কার্যকর করেননি। উপরন্তু তাকে বলেছিলেন, একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও। অবশ্য এই হাদিসটির এক বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে আয়াশ দুর্বলতার দোষে দুষ্ট। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইমাম আবু হানিফা ছাড়াও ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আহমদের অভিমত হচ্ছে, কিসাসের বিধানে স্বাধীন লোকের বদলে ক্রীতদাসকে এবং পুরুষের বিনিময়ে স্ত্রীলোককে হত্যা করা যাবে। এভাবে কাফেরের পরিবর্তে মুসলমানকেও হত্যা করা যাবে। এই নিয়মে উর্ধ্বস্তরধারীর বিনিময়ে নিম্নস্তরের লোককে হত্যা করা যায়। কিন্তু এর বিপরীত করা যাবে না। অর্থাৎ নিম্নস্তরের নিহতদের জন্য উর্ধ্বস্তরের লোকদের হত্যা করা যাবে না। তবে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত

যে, একজন নারীর বিনিময়ে একজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে। যেহেতু আমর বিন হিশাম থেকে বর্ণিত হয়েছে—মহানবী স. ইয়ামেনবাসীদের নিকট প্রেরিত একটি ফরমানে লিখেছিলেন, নারীর বিনিময়ে পুরুষ হত্যা বৈধ। একথাটি ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের অংশ বিশেষ। হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। ইবনে হাজম বলেছেন, আমর বিন হাজমের যে পুস্তিকাতে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, ওই পুস্তকটি প্রামান্য নয়। উপরন্তু ওই হাদিসের এক বর্ণনাকারী সুলায়মান বিন দাউদ, বর্ণনাকারী হিসেবে সকলের নিকট পরিত্যক্ত। আবু দাউদ বলেছেন, কেউ হয়তো ভুলবশতঃ সুলায়মান বিন দাউদের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার নাম হবে সুলায়মান বিন আরকাম। ইমাম হাকেম, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদও এই মত ব্যক্ত করেছেন। আবার আবু জারয়া, আবু হাতেম এবং একদল হাদিসের হাফেজ সুলায়মান বিন দাউদ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেছেন। ইমামগণের একটি বিরাট দল এই হাদিসটির ব্যাপক বিদিতির দিকে লক্ষ্য করে শুদ্ধ হাদিস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যদিও তাঁরা হাদিসটির সনদের ব্যাপারে বিশুদ্ধতার মত ব্যক্ত করেননি। ইমাম শাফেয়ী তাঁর পুস্তিকায় বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত পত্রটি রসুল পাক স. এর বলে প্রমাণিত না হবে, ততোক্ষণ এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, পত্রটি ঐতিহাসিকগণের নিকট সুপরিচিত এবং বিদ্বানদের নিকট দিবালোকের মতো সত্য ও সমাদৃত।

অন্যের ক্রীতদাসকে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে কি না— সে বিষয়ে ইমামগণ একমত হতে পারেননি। মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মত হচ্ছে, হত্যা করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যাবে। ইমামত্রয়ের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে- রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ক্রীতদাসের বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। দারা কুতনী, বায়হাকী। হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদিসটির উপর এমতো মন্তব্য করা হয় যে, এর সূত্রসংযুক্ত জোবায়ের এবং উসমান বিন বাজা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ও পরিত্যক্ত। ইবনে জাওজী এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও এ রকম বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আলী থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী জাবির জু'ফীকে হাদিস বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাবাদী বলেছেন।

হত্যাকারী যে বস্তু দ্বারা হত্যাকান্ড সমাধা করেছে সেই বস্তু দ্বারা কিসাস বিধান কার্যকারী করা হবে, না তলোয়ার দ্বারা? ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন তলোয়ার দ্বারা। দলিল পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের দ্বিতীয় অভিমতে— ওই বস্তু দ্বারা কিসাসের বিধান কার্যকারী হবে; যদ্দারা হন্তারক আঘাত এনেছে। কারণ, কোরআনে উল্লেখ হয়েছে কিসাস শব্দ।

যার অর্থ সমতুল্য। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে— এক ইহুদী কোনো এক রমণীর মস্তক গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো প্রস্তর দ্বারা। রসুল স. ও প্রস্তর দ্বারা তার মস্তক গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকারীর ব্যবহৃত অস্ত্র দ্বারাই কিসাস বিধান তার উপর কার্যকর করতে হবে। তিরমিজির হাদিসে আরও বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, কেউ যদি কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারে তবে তাকেও ডুবিয়ে মারতে হবে। আর আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করার অপরাধের ক্ষেত্রে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করাই হবে কিসাস। হাদিসটি ইমাম বায়হাকী মায়'রিফা বিন আমর বিন নওফেল বিন এজিদ বিন বারা থেকে আমর তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

কাফেরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে কি না সে সম্পার্কেও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী এবং আহমদ বলেছেন, হত্যা করা যাবে না। কেনোনা আবু জুহাইফা বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আলীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার নিকট কোরআন পাক ব্যতীত আরো কিছু আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌পাকের শপথ! আর কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, একটি জ্ঞান এমন রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র কালাম হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আরেকটি বিষয়ও পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি বললাম, কী? তিনি বললেন, রক্তপণ ও বন্দীর মুক্তিপণ। আর সেখানে এই বিধানটিও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, কাফেরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। বোখারী, আহমদ। আহমদের বর্ণনায় একথাটিও রয়েছে- আশ্রিতকে আশ্রয়কালীন অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। বর্ণিত ইমামদ্বয় প্রমাণ হিসেবে হজরত আমর বিন শোয়াইব থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে, মুসলমানকে কাফেরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। ইমাম আহমদ এবং নাসাঈ ব্যতীত অন্যান্য সুনান রচয়িতাগণও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে। হজরত আতা, তাউস, হামাস এবং মুজাহিদ থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. মক্কাবিজয়ের দিন বলেছেন, অবিশ্বাসীর পরিবর্তে বিশ্বাসীকে হত্যা করা যাবে না। এই হাদিসটি ইমরান থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলপাক স. বলেছেন, তিনটি অপরাধে অপরাধী না হওয়া পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কিছুতেই হত্যা করা যাবে না। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী। ২. পরিকল্পিতভাবে মুসলমানকে হত্যাকারী। ৩. ইসলাম পরিত্যাগকারী। রসুল পাক স. এর বিরুদ্ধাচরণ করলে কার্যকর করতে হবে হত্যা, শূলদন্ড অথবা দেশান্তর। আবু দাউদ, নাসাঈ। আবদুর রাজ্জাক মুয়াম্মার থেকে, তিনি জুহুরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন— একবার এক মুসলমান

এক জিম্মিকে (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফেরকে) হত্যা করলো। বিষয়টি হজরত ওসমানের সামনে পেশ করা হলো। তিনি ওই মুসলমানকে হত্যা করেননি। বরং রক্তপণের বিধান প্রয়োগ করেছিলেন। অবশ্য ওই রক্তপণের বিধান ছিলো অত্যন্ত কঠোর। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ইবনে হাজমের মতে হাদিসটি শুদ্ধ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— এমতাবস্থায় কিসাস প্রয়োগযোগ্য। তৎপর বর্ণিত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর না করে রক্তপণের বিধানকে গ্রহণ করো। বর্ণিত হাদিসগুলো সম্পর্কে এরকম বলা যায়, হাদিসগুলোয় বিবৃত কাফের বলতে শত্রুদেশের কাফের বুঝতে হবে। তারা জিম্মি নয়। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, নিরাপত্তাপ্রাপ্তদেরকে হত্যা করা যাবে না। এ সমস্ত বিবরণের মাধ্যমে বুঝা যায়, নিরাপত্তার অধিকার বহাল থাকাবস্থায় কাফেরের বিনিময়ে জিম্মিকে হত্যা করা যাবে না। আবার এখানে একথাটিও স্পষ্ট যে, কাফেরের বিনিময়ে জিম্মিকে হত্যা করা যাবে না। এভাবে সহজেই প্রতীয়মান হয়, হাদিসে উল্লেখিত কাফের অর্থ শত্রুদেশের কাফের। হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায়, তাঁদের মন্তব্য ছিলো ইজতেহাদ (গবেষণা) লব্ধ। তাই হজরত ওমরের মন্তব্যে দ্ব্যর্থবোধকতা লক্ষণীয় আর হজরত আয়েশার হাদিসে 'ইসলাম' শব্দটি সম্ভবত অসাবধানতাবশতঃ সংযুক্ত হয়েছে।

জিম্মির বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে— এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে হেদায়া প্রণেতা একটি হাদিস সংগ্রহ করেছেন, যেখানে রসুল পাক স. এর বাচনিক বর্ণনায় এসেছে, মুসলমানকে জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. বলেছেন, জিম্মির হত্যাকারী হিসেবে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে। আরো বলেছেন, আমি জিম্মাদারী পূর্ণকারী, আমি অত্যন্ত দয়ালু। দারা কুতনী বলেছেন, এই হাদিসটি ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর হাদিসশাস্ত্রবিদগণের নিকট ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া পরিত্যক্ত। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, বর্ণনাটির সনদ ইবনে সুলায়মান পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। কাজেই হাদিসটি মুরসাল। হাদিসটি যদি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হতো, তবুও তা দুর্বলতামুক্ত হতে পারতো না।

আমি বলি, সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, 'ইন্নানাফসা বিন্নাফসি'— এই আয়াত দৃষ্টে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হজরত ওসমান এবং হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসগুলোকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। অন্য হাদিসগুলো পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।

এখানে আরেকটি বিষয় সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। সমস্যাটি হচ্ছে, পুত্রের বিনিময়ে পিতাকে হত্যা করা যাবে কি না? এ বিষয়টিও মতানৈক্যমন্ডিত। ইমাম মালেক বলেছেন, পিতা যদি পুত্রকে শায়িত অবস্থায় জবাই করে তবে পিতাকে

হত্যা করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা, দাউদ জাহেরী, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই পিতাকে হত্যা করা যাবে না। হানাফীদের দলিল হজরত ওমর বিন খাত্তাব বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, আমি রসুল পাক স. থেকে শুনেছি, পুত্র হন্তারক পিতার উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তিরমিজি। হাদিসটির এক বর্ণনাকারীর নাম হাজ্জাজ বিন আরতাত। ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অন্য সূত্রে— যে সূত্রটি অধিকতর বিশুদ্ধ। বায়হাকীও এর বিশুদ্ধতার সমর্থক। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সুরাকা থেকে। কিন্তু তাঁর সনদ দুর্বলতাদুষ্ট। উপরন্তু বর্ণনাকারী আমর বিন শুয়াইবের নিকটে এসে সূত্রটি জটিলতাক্রান্ত হয়েছে। ফলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন আমর থেকে। আবার কেউ করেছেন, সুরাকা থেকে। মাধ্যম ব্যতিরেকে আমর বিন শুয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ। কিন্তু তাঁর উর্ধ্ব সূত্রভূত ইবনে লেহিয়া দুর্বল বর্ণনাকারী। এই হাদিসটি আবার তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। কিন্তু এই সূত্রসংযুক্ত ইসমাইল বিন মুসলিমও দুর্বল। অথচ বায়হাকী বলেছেন, হাসান বিন আবদুল্লাহ্ আমবরী তার অনুসরণ করেছেন আমর বিন দিনারের সূত্রে। শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, এ সকল বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত নয়। শাফেয়ী বলেছেন, আমি অনেক বিজ্ঞজন থেকে এই সিদ্ধান্তটি সংরক্ষণ করেছি যে, পুত্রহন্তারক পিতাকে হত্যা করা যাবে না। এটাই আমার মত।

কয়েকজন মিলে একজনকে হত্যা করলে তার বিধান কী? এই প্রশ্নটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বলা যেতে পারে সকলে যদি একযোগে আঘাত করে, তবে সকলের উপর কিসাস কার্যকর করতে হবে। কিন্তু ছিনতাইকারীর বিধান স্বতন্ত্র। কেনোনা ছিনতাইকারীকে হত্যা করতে একে অপরাপেক্ষা অগ্রগামী হয়। সকলেরই উদ্দেশ্য থাকে হত্যাকান্ড ঘটানো। মসনদ এবং চলপিতে উল্লেখিত হয়েছে—হত্যাকারীদের সকলের উপর কিসাস প্রয়োগ করতে হবে। তবে দলভূতদের কেউ কেউ যদি আঘাত করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের উপর কিসাস প্রযোজ্য হবে না, যদিও তারা হত্যাকারীদের সহচর ও সাহায্যকারী হয়। কিসাসের বিধান কেবল আঘাতকারীদের উপর।

ছিনতাইকারীর সকল হন্তারকের উপর কিসাস ওয়াজিব। সকলকে হত্যা করতে হবে। আবু দাউদ বলেছেন, ইমাম আহমদের একটি বর্ণনায় দেখা যায়—তাদেরকে কতল করা যাবে না। বরং রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে—সাময়াতে একজনকে হত্যা করা হয়েছিলো। হজরত ওমর তার বিনিময়ে সাতজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই হত্যাকান্ডে যদি সাময়াবাসীরা সকলে জড়িত থাকতো, তবে আমি সবাইকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। মালেক, শাফেয়ী এবং ভিন্ন সনদে বোখারী।

এক ব্যক্তি যদি একটি দলের সকলকে হত্যা করে— এ ব্যাপারেও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং মালেক বলেছেন, তার উপর কেবল কিসাস প্রযোজ্য হবে। শাফেয়ী বলেছেন, হন্তারক যদি তাদেরকে একজন একজন করে হত্যা করে, তবে প্রথম জনের জন্য কিসাস এবং পরবর্তীদের জন্য দিয়ত কার্যকর হবে। আর যদি সে একযোগে সকলকে হত্যা করে, তবে নিহতদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে লটারী করতে হবে। যার নাম প্রথমে উঠবে তার জন্য হবে কিসাস এবং অবশিষ্টদের জন্য দিয়ত। ইমাম আহমদ বলেছেন, উত্তরাধিকারীদের সকলকে আহবান করলে সকলেই যদি কিসাসের দাবীদার হয়, তবে সকলের পক্ষ থেকে কিসাস কার্যকর হবে। রক্তপণ কার্যকর হবে না। আর যদি কিছু সংখ্যক কিসাসের দাবী তোলে এবং কিছু সংখ্যক যদি দাবীদার হয় রক্তপণের, তবে কিসাসের দাবীদারদের জন্য কিসাস এবং রক্তপণের দাবী উত্থাপণকারীদের জন্য রক্তপণ ওয়াজিব হবে। সবাই যদি রক্তপণের দাবীদার হয়, তবে একটি রক্তপণের পরিমাণ অর্থ সকলের মধ্যে বন্টন করা হবে।

এ ব্যাপারে সকল ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কিসাসের বিধান পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের জন্য। ভুলক্রমে হত্যাকারীর জন্য নয়। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অস্ত্র বা ধারালো কাষ্ঠখন্ড কিংবা পাথর বা অগ্নি দ্বারা হত্যাকান্ড ঘটানো হলে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে। ইমাম শা'বী, নাখয়ী ও হাসান বসরী বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যা হলো লোহার অস্ত্র দ্বারা হত্যা। লৌহনির্মিত অস্ত্র কিংবা ধারালো কোনো বস্তু ছাড়া জেনেশুনে হত্যা করলেও তা প্রকৃত ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে না। এরকম হত্যাকান্ডকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের অনুরূপ হত্যাকান্ড বলে অভিহিত করতে হবে। এমতো ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না। রক্তপণ ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ বলেছেন, যদি বিশাল পাথর কিংবা ভারী কাষ্ঠখন্ড দ্বারা আঘাতকালে মৃত্যু অবধারিত এরকম দৃঢ় ধারণা থাকে, তবে এ অবস্থাটিও ইচ্ছাকৃত হত্যা। এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে। যদি পানিতে কাউকে ডুবিয়ে দেয়া হয় অথবা কয়েকদিন যাবত কারো পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়, আর এ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত যদি কেউ হয়— তবে এ অবস্থাটিও কিসাসের আওতায় এসে যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন, যদি লাঠি, ছড়ি অথবা ছোট পাথর দ্বারা আঘাত করা হয়, যাতে করে মৃত্যুর আশংকা থাকে না, তবু যদি আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যায়— তবে এটিও হবে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং কিসাসও ওয়াজিব হবে। সাধারণ আলেমগণের মত হচ্ছে, এরকম অবস্থাকে ইচ্ছাকৃত ভুল হত্যা বলা যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে কিসাস নয়, বরং রক্তপণ ওয়াজিব হবে। মোদ্দা কথা, ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্য সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ধারবিহীন ভারী বস্তু দ্বারা আঘাত হেনে হত্যাকান্ড ঘটালে কিসাস ওয়াজিব। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে হজরত আনাস বিন মালেক থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত ওই

হাদিসটি উপস্থাপন করেন, যেখানে বলা হয়েছে— এক ইহুদী এক রমণীর মস্তক দুই পাথরের মাঝে রেখে পিষে ফেলে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিলো। ঘটনাটি যখন রসুল পাক স. এর গোচরীভূত হলো, তখন তিনিও হত্যাকারীর মস্তক দুই পাথরের মধ্যে রেখে পিষে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম— যখন রসুল পাক স. গর্ভস্থিত সন্তান সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করছিলেন। ঘটনাটি ছিলো এই- ইবনে মালিক এলেন। তিনি রসুল পাক স. সকাশে আরজ পেশ করলেন, আমাদের ওখানে দুই রমণী মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলো। তখন একজন অপরজনকে তাবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্তা সে আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। নিহত রমণী ছিলো গর্ভবতী; এ আঘাতে তার গর্ভস্থিত সন্তানও মৃত্যুবরণ করেছে। রসুল পাক স. গর্ভস্থিত সন্তানের বিনিময়ে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন এবং নিহত রমণীর বিনিময়ে প্রয়োগ করলেন কিসাস। আহমদ।

জমহুর ওলামা বলেছেন, ছড়ি বা লাঠির আঘাতে মারা গেলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তাদের প্রমাণ হচ্ছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন— ভুল এবং ভুলের অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যা হচ্ছে, ছড়ি বা লাঠির আঘাতে হত্যা। এরকম হত্যার রক্তপণ একশত উট, যেগুলোর মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবতী। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা। ইবনে হাব্বান হাদিসটির শুদ্ধতার সমর্থক। হজরত আবু হোরায়রা বলেন, হুজাইল গোত্রের দুই নারী মারামারি করার সময় একে অন্যকে পাথর ছুঁড়ে মারে। আঘাতপ্রাপ্তা রমণীটি তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পেটের সন্তানটিও মারা যায়। রসুল পাক স. তখন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, গর্ভের নিহত সন্তানের জন্য একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিতে হবে। আর মৃতার জন্য রক্তপণ দিতে হবে। হজরত মু'গীরা বিন শো'বা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—অসতর্ক ও বিচলিত অবস্থায় ছুঁড়ে মারা পাথরের কিংবা ছড়ির বা লাঠির আঘাতে যদি কেউ মারা যায়, তবে হত্যাকারীর উপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বিধান প্রযোজ্য হবে। তার রক্তপণও ভুলের রক্তপণ সদৃশ। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে হত্যা করেছে, তার উপর কিসাস ওয়াজিব। আবু দাউদ ও নাসাঈ। ইমাম আবু হানিফার মতে, ভারী ভোঁতা বস্তু দ্বারা হত্যা করলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। প্রমাণ এই— হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, লোহা নয় এমন বস্তুর আঘাতে নিহত হলে কিসাস প্রযোজ্য নয়। দারা কুতনী। কিন্তু এই হাদিসের সূত্রসংযুক্ত মুয়াল্লা বিন জালাল সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, সে নিজে হাদিস প্রস্তুতকারী। জমহুর আলেমগণ বলেছেন, যদি ধরে নেয়া যায় যে, হাদিসটি শুদ্ধ নয়, তবু ওই হাদিসটি তো

নির্ভরযোগ্য যেখানে বলা হয়েছে—তলোয়ার ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হলে কিসাস ওয়াজিব নয়। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। কিন্তু এর সূত্রসংশ্লিষ্ট আবু মুয়াজ সুলায়মান বিন আরকাম পরিত্যক্ত বলে চিহ্নিত। অন্য সূত্রে হজরত আবু বকরা ও হজরত নোমান বিন বশীর থেকেও বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটি। কিন্তু এই সূত্রের বর্ণনাকারী মুবারক বিন ফুজালা ইমাম আহমদের নিকট অনির্ভরযোগ্য। আবার হজরত নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তলোয়ার ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা হত্যা ভ্রমাত্মক হত্যা। এমতো ক্ষেত্রে রক্তপণ ওয়াজিব। অন্য বর্ণনায় এসেছে- লোহা ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা হত্যা বিভ্রমজনিত হত্যা। কিন্তু এই বর্ণনাসূত্রভূত জাবির জু'ফী মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত।

কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমাপ্রদর্শন করা হলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা কর্তব্য। এখানে ক্ষমা করা বুঝাতে 'উফিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'উফিয়া' বা 'আফউন' শব্দটির অর্থ ক্ষমা করা বা শাস্তিযোগ্য কাউকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া। কামুস অভিধান প্রণেতা এরকম বলেছেন। তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো— একথা বুঝাতে আরবীভাষীগণ বলে থাকেন 'উফিয়ালাহু জামবুহু' অথবা 'আফালাহু জামবাহু'। কামুস অভিধান রচয়িতার অভিমত এই যে, জাম্বুন (পাপ) শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও পাপের ক্ষমা বুঝাতে আফউন উল্লেখই যথেষ্ট। এখানে তার ভাই বলতে বুঝানো হয়েছে— নিহত ব্যক্তির ভাই, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী। এর পরে উল্লেখিত 'শাইয়ুন' শব্দটির অর্থ হবে অপরাধ। 'মিন আখিহি শাইয়ুন' অর্থ হত্যাকারীকে কিছুটা ক্ষমাপ্রদর্শন (রক্তের দাবীর আংশিক ক্ষমা)। অর্থাৎ এভাবে ক্ষমা করলে হত্যাকারীর কিছুটা অপরাধ মাফ হবে— পুরোটা নয়। তাই সে কিসাস থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু তাকে দিয়ত বা রক্তপণ পরিশোধ করতেই হবে। আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে হত্যাকারীর পুরো অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায়। কিন্তু রক্তপণ পরিশোধ ওয়াজিব হয়। এরকম ব্যাখ্যাই ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের দলিল।

আজহারী বলেছেন, 'আফু' শব্দটি মূলতঃ উত্তরসূরী বা অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- 'হে নবী! তারা আপনার নিকট জানতে চায়, কোন বস্তু ব্যয় করা হবে। আপনি বলে দিন, 'আফু' (যা অবশিষ্ট থাকে)। (ইয়াস আলু নাকা মাজা ইউনফিকুন কুলিল আফু)। এখানে আফু শব্দটি অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাউকে অবশিষ্ট কোনো কিছু দান করলে আরববাসীরা বলে থাকে আফাউতু ফুলানা বি মালী। এই বিশ্লেষণসূত্রে আয়াতে উল্লেখিত ভাই-এর অর্থ হবে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশকে তার মুসলমান ভাই (হত্যাকারী) তার সম্পদ থেকে

মীমাংসা স্বরূপ কিছু দেয়া। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তি ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) সকলকেই আল্লাহ্পাক 'ভাই' উল্লেখের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। জাহেলিয়াত (মূর্খতা) এবং ইসলামের মধ্যে এভাবেই পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। ভাই শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমার্হ দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। কারণ, সে তোমার ভাই। এখানে একথাটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হত্যাকান্ড গুরুতর পাপ এবং হত্যাকারী পাপী হলেও মুসলমানই থাকে, কাফের হয়ে যায় না। যদি কাফের হতো তবে 'ভাই' শব্দটির উল্লেখ থাকতো না। তাছাড়া আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে 'হে ইমানদারগণ'— এই সম্বোধনটিও প্রমাণ করে যে, লঘু বা গুরু যে পাপই সংঘটিত হোক না কেনো— পাপ সংঘটনকারী ইমানদার নামেই অভিহিত হন।

'প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করার বিধান তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘবের নিমিত্তে করা হয়েছে। আর এটা আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহ'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীগণের এই সহজ বিধানকে মেনে নেয়া উচিত। প্রতিশোধস্পৃহার উপরে অনড় থাকা শোভনীয় নয়। শিষ্টাচার, সম্প্রীতি ও সৌজন্যমনস্কতাকে মান্য করা বাঞ্ছনীয়। এখানে একথাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হত্যাকারীকে অবকাশ দেয়া না দেয়া নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীদের অধিকারভূত। হত্যাকারী যেনো একথাটি উত্তমরূপে অবগত হয় এবং টালবাহানা না করে দেয় রক্তপণ পরিশোধে ব্রতী হয়। রক্তপণের পরিমাণ নিয়ে দরকষাকষি যেনো না করে এবং সময়মতো তা পরিশোধ করে। সে যেনো স্মরণ করে, ভার লাঘবের এই অবকাশ আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়।

ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্পাকের মহান মেহেরবানী এই যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য রক্তপণ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ হালাল। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য এরকম সহজ বিধান ছিলো না। ইহুদীদের প্রতি বিধান ছিলো, কিসাস অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা। রক্তপণের কোনো কথা ছিলোই না। আর খৃষ্টানদের প্রতি বিধান ছিলো, কেবলই ক্ষমা। কিসাসের কোনো উল্লেখ ছিলো না। আর শেষ নবীর উম্মতের জন্য কতোই না সুন্দর ও সহজ বিধান। কিসাস, ক্ষমা অথবা রক্তপণ।

'এরপরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' —একথার অর্থ, ক্ষমা করে দেয়া অথবা রক্তপণ গ্রহণের পরও যদি কেউ হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলে, তবে আখেরাতে তার উপর আপতিত হবে কঠোর শাস্তি। তার জাহান্নামবাস হবে সার্বক্ষণিক। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এরকম সীমালংঘনকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। সে ক্ষমার অযোগ্য। যেহেতু হাদিস

শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত সামুরা বলেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ করার পর রক্তপণ প্রদানকারীকে হত্যা করে তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না।

'আর কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন। ওহে বিবেচকগণ'—একথার অর্থ কিসাসের মধ্যেই রয়েছে মহাজীবনের মহাসাফল্য। একথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলে কিসাসের ভয়াবহ রূপ অন্তরাত্মায় আমূল চিহ্নিত থাকবে। এতে করে কেউ আর হত্যাকান্ডে উৎসাহ বোধ করবে না। অন্যকে হত্যা করলে নিজেকেও নিহত হতে হবে— এ বিশ্বাসের কারণে সম্ভাব্য নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের জীবন রক্ষা পাবে। ইসলামপূর্ব যুগের অধিবাসীরা একজন নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অনেক লোককে হত্যা করতো। এতে করে প্রজ্বলিত হতো অন্তহীন জিঘাংসার অনল। কিসাসের দন্ডাদেশ প্রবার্তিত করে সে অনলকে নির্বাপিত করা হয়েছে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কিসাস বিধিবদ্ধ হওয়াতে তোমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যানুসারে অর্থ হবে, কিসাসের বিধি প্রবর্তন করাতে হত্যাকারী ব্যতীত অন্যদেরও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে, কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের পারলৌকিক জীবনের স্বচ্ছতা। যে হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে, সে হয়ে যাবে অপরাধমুক্ত। আখেরাতে তার এই অপরাধের বিচার আর হবে না। বরং সে লাভ করবে পবিত্র চিরস্থায়ী জীবন।

'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ'— এই সম্বোধনটির মাধ্যমে একথাটি বুঝানো হয়েছে যে, যারা বিবেচক এবং জ্ঞানী তাঁরাই কেবল শরিয়তের বিধানের রহস্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম। যেহেতু তাঁরা জ্ঞানী তাই কেবল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সর্বসাধারণকে আয়াত শেষে এই মর্মে সদুপদেশ দেয়া হয়েছে, 'যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮০, ১৮১, ১৮২

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○ فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

❒ তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় তবে প্রচলিত প্রথামত তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ৎ করার বিধান তোমাদিগকে দেওয়া হইল। ইহা সাবধানীদের জন্য একটি কর্তব্য।

❒ উহা শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ তবে যদি কেহ অসিয়ৎকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার কোন অপরাধ নাই। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ,পরম দয়ালু।

মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী— এরকম নিশ্চিত হলে অসিয়ত করার নিয়ম। বিপুল বিত্তাধিকারীরা কেবল অসিয়ত করার যোগ্য। আয়াতে উল্লেখিত 'খইর' শব্দটির অর্থ, অধিক সম্পদ। কতিপয় ভাষ্যকার এরকম বলেছেন। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে— তাঁর এক মুক্ত ক্রীতদাস অসিয়ত করতে মনস্থ করলেন। তাঁর অধিকারে ছিলো মাত্র নয়শত দিরহাম। হজরত আলী তাঁকে অসিয়ত করতে নিষেধ করে বললেন, অসিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ইনতারাকা খইর।' 'খইর' অর্থ অধিক সম্পদ। অতএব তুমি অসিয়ত কোরো না। ইবনে আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। জননী আয়েশা বলেছেন, এক লোক অসিয়তের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। আমি তাঁকে বললাম, তোমার সম্পদের পরিমাণ কতো? সে বললো, তিন হাজার দিরহাম। আমি বললাম, পোষ্য কতজন? সে বললো, চারজন। আমি তখন তাকে বললাম, যারা অধিক সম্পদের অধিকারী তারাই অসিয়ত করার যোগ্য। আল্লাহ্পাকের বিধান এরকমই। সুতরাং তুমি তোমার সম্পদ পরিবার পরিজনের জন্য রেখে যাও। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অসিয়ত সম্পর্কিত এই আয়াতের বিধান ফরজ ছিলো। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। আলেমগণ বলেছেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হয়, তখন এই আয়াতটি রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক সকল দাবীদারের দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও। অংশীদারদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই।

আমি বলি, বিষয়টি চিন্তাভাবনা সাপেক্ষ। আসলে উত্তরাধিকার ও অসিয়তের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং অসিয়ত উত্তরাধিকারের বিধানকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলেছে। তবে একথা ঠিক যে, অসিয়তের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে আগে এবং মিরাসের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে পরে। এই দুই বিধানের মধ্যে যেহেতু বিরোধ নেই, সেহেতু রহিত করা বা হওয়ারও অবকাশ এখানে নেই। আর এ সম্পর্কিত হাদিস সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, হাদিসগুলো খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণিত)। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনের আয়াত রহিত হয় না।

সমাধানঃ আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে এজমার দ্বারা। এজমা বা ঐকমত্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীত অসিয়ত সিদ্ধ নয়। উপরন্তু ইমাম চতুষ্টয় ও বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে এসেছেন যে, যারা অংশীদার নয় তাদের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব নয়। আবার ইমাম জুহুরী, আবু বকর হাম্বলী এবং আসহাবে জাওয়াহির মন্তব্য করেছেন, আত্মীয়দের মধ্যে যারা ওয়ারিশ নয়, তাদের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব। এই উক্তিটি জমহুরের মতের বিপরীত। এ বিষয়ে এজমা যখন হয়েছে, তখন এটা মানতেই হবে, নিশ্চয়ই পূর্বসূরীদের নিকট কোনো অকাট্য দলিল ছিলো। তাই তাঁরা কোরআনের বিবরণকে পরিত্যাগ করেছেন, যদিও সে দলিল প্রামাণ্যসূত্রে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেনি। পরিশেষে ওই ঐকমত্যের সমর্থনে এখানে কিছুসংখ্যক হাদিস উপস্থাপন করা হলো।

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ্পাক নিশ্চিতরূপে প্রত্যেক দাবীদারের দাবী পূরণ করে দিয়েছেন। তাই এখন থেকে অংশীদারদের কোনো অসিয়ত নেই। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও নাসাঈ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। আমর বিন খারেজা থেকে, ইবনে মাজা, তিনি সাঈদ বিন আবু সাঈদ থেকে, তিনি হজরত আনাস থেকে এবং বায়হাকী ইমাম শাফেয়ী পদ্ধতিতে ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি সুলায়মান আহওয়াল থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন— অংশীদারদের জন্য অসিয়ত নেই। হজরত জাবের থেকে দারা কুতনীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। হজরত আলী থেকেও দারাকুতনী দুর্বল সনদ সহযোগে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন উত্তম সনদে। আমর বিন শোয়াইব থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে দারা কুতনী আরো বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীত অংশীদারদের জন্য অসিয়ত করা বিধেয় নয়। অবিকল এই শব্দ সমূহের মাধ্যমে হজরত আতা খোরাসানী থেকে আবু দাউদও মুরসাল রূপে এ বিবরণটি উল্লেখ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে মুত্তাসিল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন ইকরামা, আতা, ইউনুস বিন রাশেদ। বর্ণিত হাদিস সমূহ দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অসিয়তের এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। কিন্তু যে সকল নিকটাত্মীয় অংশীদার নয়, তাদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে অসিয়ত ওয়াজিব না হওয়া সম্পর্কে ইবনে জাওজী একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার বিষয়বস্তু এরকম— হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তির উপর দুই অথবা তিনরাত অতিবাহিত হলো; তার নিকট কিছু সম্পদ সঞ্চিত হলো। সে যদি এমতাবস্থায় অসিয়ত করে তবে তার

অসিয়ত লিপিবদ্ধ হবে (সে অসিয়তের পুণ্য অর্জন করবে)। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়— অসিয়ত ওয়াজিব নয়। কারণ, এখানে 'সে যদি অসিয়ত করতে ইচ্ছা করে' এরকম কথা বলা হয়েছে। এরকম ইচ্ছানির্ভর কর্মকে ওয়াজিব বলা যায় না। তবে অংশীদার নয় এমন নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত বৈধ, এটা ঐকমত্য। এরকম অসিয়ত উত্তম এবং পুণ্যার্জনের সহায়ক। কেনোনা এধরনের অসিয়তের মাধ্যমে দান বা অনুদান কার্যকর হয় এবং আত্মীয়তার হকও আদায় হয়ে যায়।

এটাও ঐকমত্য যে, অংশীদারদের সম্মতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অসিয়ত করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমত হচ্ছে, অংশীদারেরা সম্মত হলেও এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত সিদ্ধ নয়। এসম্পর্কে হাদিসে এসেছে, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। রসুল পাক স. আমাকে দেখতে এলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো দেখছেন, আমি মৃত্যুপথযাত্রী। এমতাবস্থায় আমি আমার সকল সম্পদ অসিয়ত করে মরতে চাই। তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেকের জন্য অসিয়ত করে মরতে চাই। তিনি স. এবারও বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; এক তৃতীয়াংশ। এক তৃতীয়াংশই অনেক। সন্তান-সন্ততিকে সম্বলহীন করে যাওয়ার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখে যাওয়া উত্তম। বোখারী, মুসলিম। দারা কুতনী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. বলেছেন, হে মানব সন্তান! আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে মৃত্যুর প্রাক্কালে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা পুণ্যার্জনের সুযোগ দান করেছেন, যেনো তা জাকাত হিসেবে গণ্য হয়। এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইসমাইল বিন আয়াশ এবং তার ওস্তাদ— দু'জনই দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনাসূত্রও দুর্বল। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবুবকর সিদ্দিক থেকে হাফস বিন আমরের পদ্ধতিতে উকাইলী। কিন্তু হাফস বিন আমর পরিত্যক্ত বলে পরিগণিত।

'ইহা সাবধানীদের জন্য একটি কর্তব্য'— একথার অর্থ, ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে অসিয়ত করা অত্যাবশ্যক। আত্মীয়ের একজনকে অন্যজনাপেক্ষা প্রাধান্য দেয়া অনুচিত। এরকমও যেনো না হয় যে, সম্পদশালীরা অসিয়তের লক্ষ্য হয়, আর সম্পদহীনেরা থেকে যায় বঞ্চিত।

অসিয়তের পরিবর্তন সাধন করা অন্যায়। অংশীদার, সাক্ষ্যদাতা এবং অসিয়তপ্রাপ্তদের কেউই কৃত অসিয়তকে রূপান্তরিত করতে পারবে না। যে এ রকম করবে, সে বিধান রূপান্তরের অপরাধে অপরাধী হবে। তাই বলা হয়েছে, 'উহা (অসিয়ত) শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ ইহার পরিবর্তন সাধন করে তবে

যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' (অতএব তিনি পরিবর্তন সাধনকারীদের সম্পর্কে অনবহিত নন)।

অসিয়তকারীকে পক্ষপাতিত্ব করতে দেখলে কিংবা অন্যায় অসিয়ত করতে দেখলে কেউ যদি মীমাংসাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়, তবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। ব্যাপারটা এরকম— কেউ দেখলো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার বহির্ভূত অসিয়ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে। তখন সে তাকে ন্যায়ানুগতার দিকে পথ প্রদর্শন করবে। যেমন রসুল পাক স. হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করতে নিষেধ করেছিলেন। স্বল্প সম্পদের অধিকারীকে একারণে হজরত আলী এবং হজরত আয়েশা অসিয়ত থেকে বিরত রেখেছিলেন। হজরত হাসান বিন বশীর বলেছেন, আমার পিতা আমাকে রসুলপাক স. এর সকাশে হাজির করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্ রসুল! আমি আমার এই সন্তানকে কিছু দিয়েছি। তিনি স. জানতে চাইলেন, তুমি তোমার এই পুত্রকে যা দিয়েছো, অন্য পুত্রদেরকেও কি সে রকম দিয়েছো? পিতা বললেন, না। তাদেরকে কিছু দেয়া হয়নি। তিনি বললেন, তবে একে যা দিয়েছো তা ফিরিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে- রসুল স. শেষে বলেছিলেন, আমি অন্যায়ের সাক্ষী হতে পারি না। বোখারী, মুসলিম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতটির (১৮২) মর্ম হচ্ছে, অসিয়তকারী অন্যায় অসিয়ত করলে অভিভাবক অথবা মুসলমান বিচারক অসিয়ত বাতিল করে দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

আমি বলি, আয়াতের ব্যাখ্যা এরকম হওয়া উচিত, যাতে দু'রকম অর্থই অন্তর্ভূত থাকে। 'তবে তার কোনো অপরাধ নেই'— একথার অর্থ, অন্যায় অসিয়ত রহিতকারী গোনাহ্গার হবে না। বরং গোনাহ্ হবে তার যে অন্যায় অসিয়ত করবে। আর মীমাংসাকারী বা সংশোধনকারী হবে পুণ্যের অধিকারী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. এরশাদ করেছেন, দীর্ঘ ষাট বৎসর আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যশীল থাকার পরও যদি কেউ মৃত্যুকালে অন্যায় অসিয়ত করে তবে সে হয়ে যায় জাহান্নামের যোগ্য। আবু দাউদ, তিরমিজি।

অসিয়তের রূপান্তর করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্যায় অসিয়তের সংশোধন নিষিদ্ধ নয় বরং কল্যাণকর। তাই সংশোধনকারীকে এই বলে অভয় দেয়া হয়েছে যে, তার কোনো অপরাধ নেই। 'আল্লাহ্ পাক ক্ষমাপরায়ণ পরম দয়ালু'—একথার মাধ্যমে সংশোধনকারীকে ক্ষমালাভের সুসংবাদসহ আয়াতের ইতি টানা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৩, ১৮৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার—

❐ নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা ভ্রমণে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদিগকে সাতিশয় কষ্ট দেয় ইহার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা তাহাদের কর্তব্য। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে তবে বুঝিতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ।

'সওম' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা বা থেমে থাকা। ঠিক দুপুর বেলাকে আরববাসীরা বলে থাকে 'সামান্ নাহার'—এ কথার অর্থ দিবস থেমে আছে। সূর্য যখন মধ্যগগণে অবস্থান করে তখন সূর্যকে অসচল বলেই মনে হয়। শরিয়তের পরিভাষায় সওম এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সহকারে পানাহার ও রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।

এই আয়াতের মাধ্যমে সিয়ামের (রোজার) বিধান দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পূর্ববর্তীদের উপরও এই বিধান বলবৎ ছিলো। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের উপর যেমন রোজা ফরজ ছিলো তেমনই ফরজ করা হলো এখন। পূর্ববর্তীদের রোজার সংখ্যা, নিয়ম বা অবস্থা পুনরায় বলবৎ করা হলো একথা এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল ফরজ হুকুমের কথা।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী রাত পর্যন্ত রোজা রাখতে হতো। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ও এরকম বিধান ছিলো। আলেমগণের একটি দল বলেছেন, আমাদের মতো খৃষ্টানদের প্রতিও রমজানের রোজা ফরজ ছিলো। গ্রীষ্মকালে রমজান মাস পড়লে তারা পিপাসায় কষ্ট পেতো। আবার শীত মৌসুমে পড়লে কষ্ট পেতো ক্ষুধায়। এ কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্তে তাদের আলেম ও নেতৃস্থানীয়রা স্থির করলো, এখন থেকে বসন্তকালে রোজা রাখা হবে। এই

পরিবর্তনের জন্য তারা রোজার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলো আরো দশদিন। এভাবে রোজার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশে। একবার তাদের রাজা রোগাক্রান্ত হলো। সে তখন মানত করলো, আরোগ্য লাভ করলে রোজা আরো সাতদিন বাড়িয়ে দেয়া হবে। আরোগ্য লাভের পর সেই রাজা রোজা বৃদ্ধি করলো আরো সাতদিন। পরবর্তী রাজা রোজার সংখ্যা নির্ধারণ করলো পঞ্চাশ দিন। মুজাহিদ বলেছেন, একবার মহামারীতে তাদের অনেক লোক মৃত্যুবরণ করলো। তখন সকলে মিলে পরামর্শ করে আরো দশদিন রোজা বাড়িয়ে দিলো। কিছুদিন পর বাড়ালো আরো দশদিন।

শা'বী বলেছেন, আমি যদি সারাবছর রোজা রাখি তবুও সন্দেহের দিন, অর্থাৎ যেদিন শাবান না রমজান ঠিক করা যায় না, সেদিন রোজা ভঙ্গ করি। কারণ, খৃষ্টানদের প্রতি যখন রোজা ফরজ করে দেয়া হয়েছিলো, তখন তারা রমজানের পূর্বে ও পরে একদিন করে রোজা বাড়িয়ে নিয়েছিলো। এভাবে প্রতি বছর তারা রোজার সংখ্যা বাড়িয়ে দিতো। এরকম করতে করতে তাদের রোজার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পঞ্চাশে। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। সুদ্দী থেকে ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন।

'যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো'— এ কথার অর্থ, যেনো তোমরা অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাও। কারণ, রোজা প্রবৃত্তির অবাধ্যতাকে খর্ব করে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, হে যুবকেরা! তোমরা যারা সমর্থ তারা বিয়ে করো। বিবাহ দৃষ্টিকে আনত করে এবং গুপ্তাঙ্গকে নিষিদ্ধতা থেকে বিরত রাখে। আর যারা বিঁয়ে করতে সমর্থ নয়, তারা যেনো রোজা রাখে। বোখারী, মুসলিম। 'সাবধান হয়ে চলতে পারো'— এ কথার অর্থ এরকম হতে পারে যে, তোমরা যাতে রোজার ব্যাপারে শৈথিল্য থেকে বেঁচে থাকতে পারো। শৈথিল্যের ব্যাপারটি ছিলো এরকম— লোকেরা কখনো রোজা রাখতো, কখনো রাখতো না। আর যেহেতু এখন রোজা ফরজ করা হলো যাতে তোমরা শিথিলতা থেকে সাবধান হয়ে চলতে পারো।

'নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য'— এ কথার মাধ্যমে রমজান শরীফের রোজাকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে ওই স্বল্প সংখ্যক রোজা কয়টির কথা—যেগুলো রমজান শরীফের রোজার বিধানের পূর্বে পালিত হতো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'আইয়ামাম মা'দুদাত (নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য)' অর্থ প্রতিমাসের তিনদিন এবং আশুরার রোজা। এই রোজাগুলো ছিলো ওয়াজিব। এরপর রমজানের ফরজ বিধান অবতীর্ণ হলে, ওয়াজিব রোজাগুলো রহিত হয়ে যায়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হিজরতের পর পূর্বের কেবলা ও রোজার বিধান রহিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, রমজানের রোজা ফরজ হয়

বদর যুদ্ধের একমাস আগে। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, দ্বিতীয় হিজরী রমজানের সতেরো তারিখে।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা রাখার জরুরী নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো, তখন আশুরার রোজা হয়ে গেলো ইচ্ছাধীন। যে ইচ্ছা করতো, রাখতো। যে ইচ্ছা করতো না, ছেড়ে দিতো। বোখারী, মুসলিম। হজরত সালমা বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. একজন ঘোষণাকারীকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বলতেন— আজ আশুরার দিন। যারা পানাহার করেছে, তারা যেনো সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকে। আর যারা পানাহার করেনি, তারাও যেনো আর পানাহার না করে— রোজার নিয়ত করে। কারণ, আজ আশুরা। বোখারী ও মুসলিম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই আয়াত রমজানের রোজা সম্পর্কিত। পূর্বের ওয়াজিব রোজা সম্পর্কে নয়। তাই এই আয়াতটি রহিত হয়েছে— একথা বলা যায় না। হজরত ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, আশুরার রোজা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়নি। রসুলপাক স.-ই আশুরার রোজাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এরকমও হতে পারে যে, রসুলপাক স. আশুরার রোজা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পালন করতেন। তাই অন্যদেরও এই নির্দেশ দিতেন। আর তিনি চাইতেন, রোজা সম্পর্কিত কোনো ফরজ হুকুম অবতীর্ণ হোক। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহানবী স. যখন মদীনা শরীফে এলেন, তখন দেখলেন, ইহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তিনি ইহুদীদের নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন। তারা বললো, আশুরা একটি মহান দিবস। এই দিনে আল্লাহ্ পাক বনীইসরাইলদেরকে শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হজরত মুসা এই দিনে রোজা প্রতিপালন করতেন। তাই আমরাও রোজা রাখি। রসুল পাক স. বললেন, যদি তাই হয়, তবে আমি তো তোমাদের চেয়ে মুসার অধিক অনুসরণের দাবীদার। একথার পর থেকে তিনি আশুরার রোজা ছাড়েননি। নিজে রাখতেন এবং অপরকেও রাখতে বলতেন। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মূর্খতার যুগে কোরাইশরা আশুরার রোজা রাখতো। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব থেকে রসুল পাক স.ও আশুরার রোজা পালন করতেন। মদীনা শরীফে এসেও তিনি আশুরার রোজা ছাড়েননি। নিজে রাখতেন এবং অপরকেও রাখতে বলতেন। এরপর যখন রমজান শরীফের ফরজ বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি আশুরার রোজা ছেড়ে দিলেন। বোখারী, মুসলিম। জালালুদ্দিন সুয়ুতী বলেছেন, হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে আহমদ, আবু দাউদ এবং হাকেম আশুরা এবং প্রতিমাসের তিনদিনের রোজা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। ওই রোজাগুলো রমজান শরীফের ফরজ বিধান জারী

হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব ছিলো। রমজানের ফরজ বিধানের মাধ্যমে ওই রোজাগুলোর ওয়াজিব হুকুম রহিত হয়ে যায়। উপরোক্ত বিবরণগুলোর মাধ্যমে এখন একথা পরিষ্কার যে, 'আইয়ামাম মা'দুদাত' অর্থ রমজান মাসের রোজা।

কেউ পীড়িত হলে তার উপরে রোজার ফরজ হুকুম আর বলবৎ থাকে না। এই অব্যাহতি ওই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য, রোজা রাখলে যার রোগ বৃদ্ধি পায় অথবা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে। অথবা বর্তমানে সুস্থ কিন্তু রোজা রাখলে যার অসুস্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ওই গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদাত্রী মাতাও অব্যাহতির আওতায় পড়বে— যে রোজা রাখলে শিশুর প্রাণনাশের আশংকা থাকে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য রোজা রাখার অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তি যদি রোজা না রাখে, পানাহার করতে পারবে, তবে রোজাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। তাঁর মতে রোজা ভঙ্গকারী মুসাফিরের জন্য একই বিধান। যদি তারা ওরকম করে, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর প্রথমে পানাহার এবং পরে সহবাস করলে কাফ্ফারাও দিতে হবে না। রোগ বৃদ্ধি অথবা উপশম বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকলে রোজা না রাখার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। ইবনে সিরীন বলেছেন, রোগ সামান্য হলেও রোজা পরিত্যাগ করতে পারবে। কারণ, আয়াতে রোগের কোনো সীমাচিহ্ন নেই। হাসান এবং ইব্রাহিম বলেছেন, ওই ব্যক্তিকে রুগ্ন বলা যাবে, উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ আদায় করা যার জন্য জায়েয।

ভ্রমণে থাকলে রোজা পরিত্যাগ করা বৈধ। এখানে 'আলা' অব্যয়টি এই ইঙ্গিত বহন করে যে, রোজাদার অবস্থায় কেউ ভ্রমণে বহির্গত হলে, সে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে না। এটা ঐকমত্য। দাউদ জাহেরী বলেছেন, দীর্ঘ অথবা নাতিদীর্ঘ সকল অবস্থার মুসাফির ইচ্ছা করলে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে।

কতো দূরে গেলে নামাজ কসর করা যাবে বা রোজা ভঙ্গ করা যাবে— এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, সফরের নিম্নতম দূরত্ব হতে হবে আটচল্লিশ মাইলের সামান্য ঊর্ধ্বে। কেনোনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. বলেছেন, হে মক্কাবাসী। তোমরা চার বুরিদ এর কম দূরত্বে নামাজে কসর কোরো না। চার বুরিদের পরিমাণ হচ্ছে, মক্কা থেকে আসফান পর্যন্ত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্রভূত ইসমাইল বিন আয়াশ অত্যধিক দুর্বল বলে চিহ্নিত। আরেক বর্ণনাকারী আবদুল ওয়াহাবও অত্যন্ত দুর্বল। আহমদ এবং ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, আবদুল ওয়াহাব অপদার্থ। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। আর নাসাঈ বলেছেন, মাতরুকুল হাদিস। স্বাভাবিক গতিতে উট অথবা মানুষ একদিনে যতোটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম, ততোটুকু দূরত্বকে একদিনের দূরত্ব বলে। এভাবে অতিক্রান্ত তিনদিনের

পথকে বলে তিনদিনের দূরত্ব। আলেমগণ এই দূরত্বকে কেউ আটচল্লিশ মাইল আবার কেউ বায়ান্ন মাইল বলে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, একদিনের দূরত্ব সম্পন্ন সফরেও নামাজে কসর করা যাবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তিনদিনের দূরত্ব অতিক্রম করলে নামাজে কসর সিদ্ধ হবে এবং রোজা রাখা না রাখার অনুমতি লাভ করতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ এই অব্যাহতির দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন, পূর্ণ দুইদিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি, যাতে মৌজার উপর মসেহ করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। হজরত আলী একবার মোজার উপর মসেহ করার সময়কাল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি স. তখন বললেন, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত এবং গৃহবাসীর জন্য একদিন একরাত। মুসলিম। হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এর থেকে দলিল গ্রহণ দুর্বলতামুক্ত নয়।

আলোচ্য আয়াত থেকে সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গোনাহের কাজে বহির্গত মুসাফিরও রোজার অব্যাহতি লাভ করবে। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, পাপকাজে ভ্রমণকারীর জন্য রোজা পরিত্যাগের অনুমতি নেই। কেনোনা আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'বিদ্রোহী হয়ে নয় এবং সীমালংঘন করেও নয়।' এব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি এই— — বিদ্রোহ ও সীমালংঘন সফরের আওতায় পড়ে না।

'অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।' অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি বা মুসাফির যদি রোজা পরিত্যাগ করে, তবে পরিত্যক্ত রোজা রোগমুক্তির পর কিংবা সফর শেষে আদায় করতে হবে। তবে পরিত্যক্ত রোজা ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, এমন কথা বলা নেই। বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, পরিত্যক্ত রোজা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা জরুরী। আয়াতে যদিও সেরকম কথা নেই। কিন্তু হাদিস শরীফে একথার সমর্থন রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—মহানবী স. রমজানের কাজা রোজা সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, ধারাবাহিক অথবা ধারাবাহিকতারহিত— যেভাবে ইচ্ছা কাজা রোজা আদায় করতে পারো। দারা কুতনী হাদিসটি মুত্তাসিল ও মুরসাল— উভয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে— মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে, কেউ একজন রসুল পাক স. কে কাজা রোজা একাদিকক্রমে আদায় করা যাবে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, সেটা তোমার ইচ্ছা। যেভাবে পারো আদায় করো। মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। কিন্তু এর সনদভূত বর্ণনাকারী ওয়াকেদী এবং লেহিয়া দুর্বল হিসেবে গণ্য। সাঈদ বিন মানসুরও হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন আবু উবাইদ, হজরত মুআজ বিন জাবাল, হজরত

আনাস, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত রাফে বিন খাদিজ থেকে। রমজানের কাজা রোজা ধারাবাহিক নিয়মে রাখার প্রবক্তা দাউদ জাহেরী হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত একটি হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, কাজা রোজা আদায় করতে হবে বিরতিহীনভাবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী— যার সূত্রভূত আবদুর রহমান বিন ইব্রাহিম বিন আস সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়। দারা কুতনী বলেছেন, সে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয় বরং সে দুর্বল।

জেনে রাখা প্রয়োজন, দুগ্ধদাত্রী ও গর্ভবতী নারী সন্তানের অনিষ্টের আশংকায় যদি রোজা রাখতে না পারে তবে পরে সুবিধামতো বাদ পড়ে যাওয়া রোজাগুলো কাজা করতে হবে এবং ফিদিয়াও দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শুধু কাজা আদায় করতে হবে। ফিদিয়া দিতে হবে না। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম মালেকও এই অভিমত পোষণ করেন বলে জানা যায়। অপর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, কেবল দুগ্ধদাত্রী রোজার সাথে ফিদিয়াও আদায় করবে। গর্ভবতীরা আদায় করবে শুধুই রোজা। ফিদিয়া নয়। ইমাম আহমদ এবং শাফেয়ী বলেছেন, কাজার সঙ্গে ফিদিয়া ওয়াজিব। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মতে কাফফারা ওয়াজিব। কাজা ওয়াজিব নয়।

কাজা রোজা আদায় করতে যদি খুব বেশী বিলম্ব হয়, যদি পরবর্তী রমজান অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে তবে কী করতে হবে সে সম্পর্কে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী বলেছেন, কাজা এবং ফিদিয়া উভয়টি ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যতোই বিলম্ব ঘটুক না কেনো কেবল কাজাই ওয়াজিব। ফিদিয়া নয়। যদি ফিদিয়া ওয়াজিব বলা হয়, তবে কোরআনের বিধান লংঘন করা হবে। পুনরায় পীড়িত হওয়ার কারণে কিংবা সফররত থাকার কারণে যদি পরবর্তী রমজানও অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে কাজা ব্যতীত অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। এই সিদ্ধান্তে ইমামগণ একমত। আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে মুনজির বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নাফে থেকে, তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, অসুস্থতার কারণে যদি পর পর দুই রমজান অতীত হয়ে যায় তবে তার উপর দ্বিতীয় রমজানের কাজা এবং প্রথম রমজানের কাফফারা ওয়াজিব। তাহাবী বলেছেন, এ অভিমতটি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের। হাফেজে হাদিস ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ থেকে ইবনে জুরাইজের মাধ্যমে আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এটাই হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের অভিমত। কিন্তু হজরত ওমরের প্রসিদ্ধ মতটি এর বিপরীত।

ফিদিয়াসহ কাজা ওয়াজিবের দলিল হচ্ছে এই— হজরত আবু হোরায়রা বলেন, এক ব্যক্তি রমজান মাসে রোগগ্রস্ত হলো। সুস্থ হওয়ার পরও কাজা আদায় করলো না। এসে পড়লো পরবর্তী রমজান। রসুল পাক স. ওই লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, সে যেনো বর্তমান রমজানের রোজা রাখে। এরপর বাদ পড়ে যাওয়া

রমজানের রোজা রাখতে হবে এবং প্রতিটি রোজার বিনিময়ে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দিতে হবে। দারা কুতনী। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ নয়। কারণ ইব্রাহিম ইবনে নাফে সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। আরেক বর্ণনাকারী আমর বিন মুসা সম্পর্কে বলেছেন, সে নিজে নিজে হাদিস তৈরী করে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো মারফু হাদিস নেই। অবশ্য সাহাবাগণের বক্তব্য রয়েছে এ সম্পর্কে। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্যরা বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী, হজরত জাবের এবং হজরত হোসাইন বিন আলী থেকে। আমি বলি, আমার নিকট হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বক্তব্য (আসার) ব্যতীত আর কোনো বক্তব্যই বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। যদি এ সম্পর্কে কোনো একটি মারফু হাদিস থেকেও থাকে তবুও তা দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণিত হাদিস) দ্বারা কোরআনের বিধান অপসারণ করা যায় না।

'ইহা (রোজা) যাহাদিগকে সাতিশয় কষ্ট দেয়, ইহার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে অন্ন দান করা তাহাদের কর্তব্য'— বাগবী বলেছেন এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, আয়াতটি রহিত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত সালমা বিন আক্ওয়া বলেছেন, আয়াতটির বিধান রহিত।

শানে নুজুল ঃ প্রথম দিকে এই অবকাশ দেয়া ছিলো— যারা সক্ষম তারা রোজা রাখবে আর রোজা রাখতে না পারলে ফিদিয়া দেবে। রোজায় অভ্যস্ত করার জন্য দেয়া হয়েছিলো এরকম শিথিল বিধান। পরে এই শিথিলতা রহিত করা হয়।

আমি বলি, রোজা সম্পর্কে মুসাফিরদের জন্য তিনটি বিষয়ে অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১. রোজা ২. কাজা করার উদ্দেশ্যে বিরতি ৩. ফিদিয়া। ফিদিয়া রহিত হওয়ার পর অবকাশ থাকে দু'টি। রোজা রাখবে অথবা পরে কাজা করার উদ্দেশ্যে ভঙ্গ করবে। হজরত কাতাদা বলেছেন, অতিবার্ধক্যের কারণে রোজা রাখতে অসমর্থ ব্যক্তির উপর রোজা রাখা অথবা ফিদিয়া দেয়ার প্রাথমিক বিধানটি রহিত হয়ে যায়। হজরত হাসান বলেছেন, এ আয়াত ওই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যে রোজা রাখতে সক্ষম। এখানে তার জন্য এই অবকাশ রয়েছে যে, সে রোজা রাখবে অথবা ফিদিয়া দেবে। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। রহিত স্থলে আর নূতন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধদের জন্য নূতন কোনো নির্দেশনা আর নেই। একারণেই ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর একটি মতে নিতান্ত অক্ষম বৃদ্ধের জন্য রোজা না রাখাই সমীচীন। কারণ, সে সম্পূর্ণতই অসমর্থ। আর আল্লাহ্ পাক কাউকে সামর্থের অধিক ভার বহনের নির্দেশ দেন না। তাদের জন্য ফিদিয়া প্রদান অপরিহার্য নয়, কারণ এরকম কোনো দলিল নেই। আর বিষয়টি

বিবেচনাবিরোধীও। একদল আলেম বলেছেন, যে ব্যক্তি যৌবন কালে রোজা রাখতে সক্ষম ছিলো সে যদি বৃদ্ধ বয়সে রোজা রাখতে অসমর্থ হয় তবে তার জন্য রোজার স্থলে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু কোরআন মজীদে এই মতটির স্বীকৃতি নেই। জালালউদ্দিন সুয়ূতী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে 'ইউতিকুনা' শব্দটির পূর্বে 'লা' শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। এভাবে 'লা' ইউতিকুনা' বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে রোজা রাখতে সক্ষম নয়— তাদের দায়িত্বে ফিদিয়া। যেমন, ইয়ু বায়্যিনুল্লাহু লাকুম আন তাদ্বিল্লু —এই আয়াতটির 'আনতাদ্বিল্লু' এর 'লা' যুক্ত না করলে অর্থ বিকৃতি ঘটে। আমি বলি, এখানে 'লা' উহ্য আছে এরকম মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, এরকম মন্তব্য কোরআনের বাকভঙ্গির অনুকূল নয়। প্রথমে ইতিবাচক এবং পরক্ষণেই নেতিবাচক—এরকম বাকভঙ্গি অচল। কেউ যদি বলেন ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, শাফেয়ী এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের মত প্রকাশ করেছেন, অসমর্থ বৃদ্ধকে রোজার বদলে ফিদিয়া দিতে হবে। তদুত্তরে আমি বলবো, এ আয়াতটি তাঁদের বক্তব্যের দলিল। আর এখানে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অতিবৃদ্ধদের করণীয় সম্পর্কে এখানে নির্দেশ মাত্র নেই। তবে দলিল আর রইলো কোথায়?

আমি পুনরায় বলি, প্রথমে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সমালোচনার উর্ধ্বে যার সার কথা হচ্ছে এই—ইসলামের প্রাথমিক যুগে সক্ষম লোকেরাও রোজা অথবা ফিদিয়ার যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারতো; অক্ষম লোকের প্রসঙ্গ সেখানে টানা হয়নি। এতেই বুঝা যায় অতি বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তিরা প্রথম থেকেই আলোচনার বাইরে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই তাঁরা রোজা এবং ফিদিয়া উভয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য যখন রোজা অথবা ফিদিয়া—এই অবকাশ দেয়া হয়েছে তখন অক্ষমেরা তো অধিকতর সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য। একারণেই প্রথম ব্যাখ্যাতেই আমি বলেছিলাম, পীড়িত এবং মুসাফিরদের জন্য রয়েছে তিনটি অবকাশ। এর পর যখন 'ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা' (আয়াত ১৮৫) — এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রোজার বিধানভূত হয়ে পড়ে তিন ধরনের লোক। ১. যারা রোজা রাখতে সম্পূর্ণ সক্ষম তাদেরকে রোজা রাখতেই হবে। ২. গ্রহণযোগ্য আপত্তির কারণে যাদের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয় যেমন পীড়িত ব্যক্তি ও মুসাফির। পীড়িত ব্যক্তি রোগ মুক্তির পর এবং মুসাফির সফর শেষে কাজা আদায় করবে। ফিদিয়া চলবে না। ৩. ওই বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি যার সক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা নেই এবং ওই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যার রোগমুক্তি সুদূর পরাহত— তারা বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কখনই রোজা রাখতে সক্ষম হবে না। তারা পড়ে যায় বিধানের বাইরে। তারা 'ফামান শাহিদা মিন কুমুশ শাহরা' এই বিধানের আওতাবহির্ভূত। এই বিধানে কেবল সক্ষম ব্যক্তিরাই অন্তর্ভূত। আলোচ্য আয়াতে 'ফামান কানা মিনকুম মারিদ্বা' (কেউ পীড়িত হলে) একথার মাধ্যমে

বুঝানো হচ্ছে ওই সমস্ত রোগগ্রস্তদেরকে যাদের নিরাময়ের সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণতই অক্ষমদের জন্য কোনো বিধানই নেই। কাজার নির্দেশ তাদের প্রতি বলবৎ হতেই পারে না, কারণ তারা যোগ্যতারহিত। তাই দায়িত্ব বহির্ভূত। মোদ্দা কথা তারা রোজার দায়িত্ব মুক্ত। তাই তাদেরকে কেবল ফিদিয়া দিতে হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সমধিক জ্ঞাত।

ফিদিয়া অর্থ বিনিময়। ইমাম আবু হানিফার মতে ফিদিয়ার পরিমাণ ফিতরার মতো। অর্থাৎ গম অর্ধ 'সা' এবং যব বা খেজুর পূর্ণ 'সা'। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একজন মিসকিনকে এক মুদ বা দুই রতল প্রচলিত খাদ্য দান করতে হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন যবের অর্ধ সা এবং গমের এক মুদ দেয়া ওয়াজিব। কোনো কোনো ফকীহ্ বলেছেন, প্রাত্যহিক প্রস্তুতকৃত খাদ্য থেকে ফিদিয়া দিবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একজন মিসকিনকে প্রথম রাত্রির ও সেহরীর আহার্য দান করবে।

'যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার জন্য অধিক কল্যাণকর'— এখানে স্বতঃস্ফূর্ত সৎকর্ম বলতে ওয়াজিব ফিদিয়ার অতিরিক্ত দানকে বোঝানো হয়েছে। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা উপলব্ধি করতে, তবে বুঝতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। একথার অর্থ, ফিদিয়া প্রদান অপেক্ষা রোজা রাখা কষ্টকর না হলে মুসাফিরের জন্য রোজা পালন করাই উত্তম। এটাই জমহুর ওলামার অভিমত।

ইমাম আহমদ, আওজায়ী ও সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, কষ্ট হোক বা না হোক মুসাফিরের জন্য সর্বাবস্থায় রোজা না রাখাই শ্রেয়। তাঁদের দলিল হচ্ছে, হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে— রসুল পাক স. তখন প্রবাসে। দেখলেন, একব্যক্তিকে ঘিরে লোকেরা জটলা করছে। তিনি বললেন, কী ব্যাপার? তারা বললো, লোকটি রোজাদার। তিনি বললেন, সফরে রোজা রাখা কোনো সৎকর্ম নয়। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসুল পাক স. অভিযান করেছিলেন রমজান মাসে। তিনি তখন রোজাদার ছিলেন। তাঁর সহচরবৃন্দও ছিলেন রোজাদার। তিনি 'কিরায়ে গমীম' নামক স্থানে পৌছে একপাত্র পানি চাইলেন। একটি পানিপূর্ণ পানপাত্র দেয়া হলো তাঁকে। তিনি পাত্রটি উঁচু করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তারপর পানি পান করলেন। কেউ কেউ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখনো অনেকে রোজাদার। তিনি বললেন, এমন করা অনুচিত। মুসলিম। হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, সফরে রোজা পালনকারী স্বগৃহে অবস্থানকারী রোজাবিহীন লোকের মতো। ইবনে মাজা। এসকল হাদিস সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন এই যে, হাদিসগুলো ওই সকল লোকের উদ্দেশ্যে বর্ণিত, যাদের পক্ষে রোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁদের পক্ষে রোজা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। তারা মুসাফির হোক অথবা রোগগ্রস্ত। আর জেহাদে

গমনকারীদের জন্য উত্তম হলো রোজা পরিত্যাগ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, হে সেনাদল! তোমরা শত্রুর নিকটবর্তী হয়েছো। কাজেই এখন সামর্থ অনুযায়ী ইফতার করা উচিত। হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, ইফতারের ওই নির্দেশ ছিলো আমাদের জন্য অবকাশ (রুখসত)। আগাদের কেউ কেউ তখন রোজা ভেঙে ফেলেছিলেন এবং কেউ কেউ রেখেছিলেন। আমরা চলতে চলতে পরবর্তী মঞ্জিলে পৌছলাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, হে জনতা। প্রভাতে তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে। কাজেই তোমরা সাধ্যমতো ইফতার করে নাও। এই নির্দেশটি ছিলো আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয় (আজিমত)। মুসলিম। এ হাদিসটিই কতিপয় সাহাবী থেকে ইমাম মালেক, হজরত আবু সাঈদ থেকে ইমাম শাফেয়ী এবং আবু দাউদ, হাকেম ও ইবনে বারও বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি ছিলাম রসুল পাক স. এর এক সফরের সহযাত্রী। প্রচন্ড গরম ছিলো তখন। খররৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা মাথায় হাত রেখে পথ চলছিলাম। আমাদের মধ্যে রসুল পাক স. এবং আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ব্যতীত আর কেউ রোজা ছিলেন না।

আমি বলি, কেবল সফরই মুসাফিরদের অবকাশ প্রাপ্তির কারণ। কষ্ট হওয়া না হওয়া কোনো কারণ নয়। আর বয়ঃবৃদ্ধ পীড়াগ্রস্ত, দুর্বল, গর্ভবতী ও দুগ্ধধাত্রীদের জন্য অবকাশ লাভের কারণ হচ্ছে— রোজাজনিত ক্লেশ। কষ্ট না হলে এদেরকে অবকাশ দেয়া হতো না।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'ইন কুনতুম তা'লামুন' (যদি তোমরা উপলব্ধি করতে) — একথার অর্থ, যদি তোমরা রোজার মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হতে, তবে রোজা ভঙ্গ অথবা ফিদিয়ার উপরে রোজাকে প্রাধান্য দিতে। মনে রাখা উচিত, রোজা রাখা অথবা ফিদিয়া প্রদান করার অবকাশ সম্বলিত বিধান এখন রহিত। তাই এখন কেউ যদি শরিয়ত সমর্থিত আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও রোজা পরিত্যাগকে বৈধ মনে করে, তবে সে হবে অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যদি বৈধ মনে না করে রোজা পরিত্যাগ করে তবে সে হবে ফাসেক। তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে যারা রোজা পরিত্যাগ করে তাদের উপরে যদি কাজা ওয়াজিব হয় তবে বিনা ওজরে রোজা পরিত্যাগকারীদের উপরে কাজা ওয়াজিব হবে না কেনো? প্রকৃত কথা এই যে, তাদের জন্য কাজা এবং ইসতেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) দু'টোই ওয়াজিব। ইমামগণ এব্যাপারে একমত। ইমাম নাখয়ী বলেছেন, ওজর ব্যতীত কেউ যদি রোজা ছেড়ে দেয় তবে এর পরিবর্তে হাজার বছর রোজা রাখলেও তার সমান্তরাল মর্যাদা লাভ হবে না। হজরত আলী ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, সারাজীবন রোজা রাখলেও ক্ষতির পরিপূরণ হবে না।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

❐ রমজান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত হইলে কিংবা ভ্রমণে থাকিলে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চাহেন না, এই জন্য যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য তোমরা আল্লাহের মহিমা কীর্তন করিবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

'শাহরু রমাদ্বান' বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। রমজানের মাস অথবা একথা বুঝানো যে, তোমাদের জন্য রমজানের রোজা বিধিবদ্ধ করা হলো। আয়াতটি যদি পূর্বোক্ত আয়াত, 'কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম' আয়াতের সঙ্গে একযোগে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে বর্ণিত অর্থ প্রণিধানযোগ্য হবে। আর আয়াতটি যদি পূর্বোক্ত আয়াতের রহিতকারী (নাসিখ) হয়, তবে এর মর্ম হবে অন্যরকম। 'শাহ্র' অর্থ প্রসিদ্ধি। রমজান শব্দটি রমজ ধাতু থেকে উৎপন্ন যার অর্থ নির্বাপিত হওয়া অথবা ভস্মীভূত হওয়া। রমজানের সঙ্গে শাহার শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে বলে রমজানের পরিচিতি ঘটেছে প্রসিদ্ধ মাস হিসেবে। হজরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলুল্লাহ্ স. বলেন, পাপরাশিকে ভস্মীভূত করে দেয় বলে এই মাসের নাম রমজান। হাদিসটি ইস্ফাহানী তাঁর তারগিব গ্রন্থে লিখেছেন।

এই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা। আয়াতের বাণীবৈভব, নির্দেশ নিষেধাজ্ঞা এবং পুরস্কার তিরস্কারের সমাহার এই কোরআন। এভাবে বিভিন্ন বিষয় একত্রিত করা হয়েছে এখানে। কোরআন শব্দটি ক্বিরআত শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এমতাবস্থায়, কোরআন শব্দটির অর্থ হবে পঠিত। ইবনে কাসির আল কোরআন এবং কোরআনাহু— যেখানেই থাকুক না কেনো, শব্দটিকে তিনি 'হামজাকে' বিলুপ্ত করে তার হরকত 'র' বর্ণের সঙ্গে যুক্ত করে পাঠ করেছেন। ক্বারী হামজা যতিপাতের সময় অনুসারী হয়েছেন ইবনে কাসিরের। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন হামজা সহযোগে। বাগবী বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী কোরআন শব্দটি পাঠ করতেন হামজাবিহীন অবস্থায় এবং বলতেন, 'ক্বিরআত' শব্দটির উৎপত্তিস্থল নয়। বরং

তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থের মতো এটিও একটি মহাগ্রন্থের নাম। বাগবী আরো বলেছেন, মুকাদ্দিস বলেন, জনৈক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্পাক বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআন নাজিল করেছেন। যেমন কখনো বলেছেন, 'আমি রমজান মাসের ক্বদর রাত্রিতে কোরআন নাজিল করেছি।' আবার কখনো বলেছেন, 'আমি পবিত্র রজনীতে কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' কখনো আবার এরশাদ করেছেন, 'আমি বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরআন নাজিল করেছি।' এ সকল বর্ণনার তাৎপর্য কী?

এই জটিল প্রশ্নটির জবাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, সম্পূর্ণ কোরআন পাক রমজান মাসে ক্বদর রাত্রিতে লওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশের বাইতুল ইজ্জতে অবতীর্ণ হয়। তারপর সেখান থেকে হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে রসুল পাক স. এর উপরে অবতীর্ণ হয়। 'বি মাওয়াকিইন নুযুম' আয়াতের অর্থ এরকমই। দাউদ ইবনে হিন্দ বলেছেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্পাকের বানী অনুসারে কোরআন পাক রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে কি বৎসরের অন্য মাসগুলোতে অবতীর্ণ হয়নি? তিনি জবাব্ দিলেন, তা হবে না কেনো। তবে রমজান মাসে অবতীর্ণ হওয়ার কথা একারণেই বলা হয়েছে যে, সারা বছর ধরে যে পরিমাণ আয়াত নাজিল হতো, সে সমস্ত আয়াত হজরত জিব্রাইল এ মাসে পুনরাবৃত্তি করতেন। তন্মধ্যে আল্লাহ্ পাকের যতোটুকু ইচ্ছা ততোটুকু প্রতিষ্ঠিত রাখতেন আর যতোটুকুর ইচ্ছা নয় ততোটুকু ভুলিয়ে দিতেন। হজরত আবু জর গিফারী থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সহিফা প্রথম অথবা তৃতীয় রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ষষ্ঠ রমজানে। হজরত ঈসার উপর ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে ত্রয়োদশ রমজানে। অষ্টাদশ রমজানে হজরত দাউদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যবুর। আর সর্বশেষ কিতাব কোরআন মজীদ শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে রমজানের শেষ ছয়টি রাতে। ওয়াসিলা বিন আসকায়া থেকে আহমদ এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সহিফাগুলো রমজানের প্রথম রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। রমজানের ছয় তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে তওরাত এবং ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে রমজানের তেরো তারিখে। 'ওয়াল্লাহু আ'লাম'।

পূর্ববর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছিলো রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার বিধান। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে— রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা। এবং বলা হয়েছে— কোরআন মানুষের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। কোরআন পাক আপন মহিমা বলে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়। কোরআনে রয়েছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যেগুলো মানুষকে হালাল, হারাম এবং শরিয়তের সীমারেখার প্রতি পথপ্রদর্শন করে। সত্য ও

অসত্যকে পৃথক করে দেয়। বৈধ ও অবৈধকে সুস্পষ্ট করে তোলে। দিশারী (হুদা) এবং পার্থক্যকারী (ফুরকান) শব্দ দু'টি কোরআন এর সমার্থক।

'যারা এই মাস পাবে তারা যেনো রোজা পালন করে'— একথার অর্থ তোমাদের মধ্যে যারা রমজানে উপনীত হবে, তারা যদি সুস্থ, সক্ষম ও স্বগৃহবাসী (মুকিম) হয়, হায়েজ নেফাস্ থেকে পবিত্র থাকে, তবে অবশ্যই রোজা পালন করবে। পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, মুসাফির এবং পীড়িত ব্যক্তিরা রোজা না রাখার অনুমতিপ্রাপ্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্থ ও স্বগৃহবাসীদের আলাদা করা হয়েছে। হায়েজ নেফাস গ্রস্তারা যে রোজা রাখতে পারবে না সে কথা প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর এ ব্যাপারে ঐকমত্যও রয়েছে।

হাদিস শরীফে এসেছে—এক মহিলা সাহাবী রসুল পাক স. এর নিকট নিবেদন জানালেন, হে দয়াল নবী স.! রমণীদের ধর্ম প্রতিপালন অপূর্ণ হলো কিভাবে? তিনি স. বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করো না, তোমরা যখন ঋতুবতী হও তখন নামাজ-রোজা কিছুই করতে পারো না। বোখারী, মুসলিম। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋতুবতীদের জন্য রোজা হারাম। ঋতুবতী নারী রোজা রাখলে তা শুদ্ধ হবে না। কাজা অপরিহার্য হবে।

রমজান পেলে রোজা রাখবে— এ কথার অর্থ প্রথম দিকে রোজা অথবা ফিদিয়া যে কোনো একটির যে অবকাশ ছিলো এখন সে অবকাশ আর নেই। এখন রমজানের রোজা রাখতেই হবে। বাগবী বলেছেন, রমজান এসে পড়ার পর কোনো মুকিম যদি সফর শুরু করে তবে সে রোজা প্রতিপালন করবে কি করবে না সে ব্যাপারে বিদ্বানেরা মতানৈক্য করেছেন। হজরত আলী বলেছেন, তার পক্ষে রোজা ভঙ্গ করা সঙ্গত নয়। উবায়দা সালমানও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে রমজান মাস প্রত্যক্ষ করবে সে (যদি সুস্থ ও মুকিম হয়) রোজা রাখবে। অর্থাৎ সারা মাসের রোজা রাখবে। তাই এ রকম বলা হয়েছে যে, মুকিম অবস্থায় রমজান পেলে রোজা ভঙ্গ করা সংগত নয়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা এবং ফকীহ্গণ বলেছেন, রমজান মাসে সফর শুরুর দিনে রোজা ভঙ্গ করা সিদ্ধ হবে না। পর দিন থেকে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে। সুতরাং রমজান পেলে রোজা রাখবে— এ কথার প্রকৃত অর্থ এই—রমজানের যে কয়দিন সুস্থ ও মুকিম থাকে সেই কয়দিন রোজা রাখবে। যদি এই অবস্থায় সারা মাস পায় তবে সারা মাসই রোজা রাখবে। আর যে কয়দিন সফরে থাকে অথবা পীড়িত হয় সে কয়দিন রোজা ভঙ্গ করতে পারবে। এ কথার প্রমাণ হিসাবে হজরত জাবের এবং হজরত আবদুল্লাহ্র বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. মক্কাবিজয়ের বছরে অভিযান শুরু করেছিলেন রমজান মাসে। তখন তিনি ছিলেন রোজাদার। কাদিদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি রোজা ভঙ্গ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও এরকম করেছিলেন।

মাসআলাঃ দিবসের প্রথম ভাগে যে মুকিম রোজাদার ছিলো সে যদি ওইদিন সফর শুরু করে, তবে রোজা ভাঙতে পারবে না। কেনোনা সে ওই রোজাটি পেয়েছে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত। আর ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরীর অভিমত হচ্ছে, ওই দিন রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে জাওজী ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসটি পেশ করেছেন— যেখানে বলা হয়েছে, সাহাবাগণকে নিয়ে রসুল পাক স. গামীম নামক স্থানে পৌঁছে রোজা ভেঙে ফেললেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স, একবার রমজান মাসের সফরে আসফান নামক স্থানে পৌঁছে এক পেয়ালা পানি চাইলেন। পানি দেয়া হলে তিনি সেই পানি পান করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি এরকম রোজাবিহীন অবস্থায় ছিলেন (হাদিস দু'টির মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মুকিম ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় সফর শুরু করলেও ওই দিন রোজা ভঙ্গ করতে পারবে)। আমরা বলি, হাদিস দু'টিতে উল্লেখিত গামীম এবং আসফান মদীনা মনওয়ারার পথে প্রথম মঞ্জিলে অবস্থিত।

মাসআলাঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় এবং মুসাফির সফররত অবস্থায় রোজা রাখার পরও রোজা ভেঙে ফেলতে পারবে। ইমাম আহমদ একথা বলেছেন। মিনহাজ রচয়িতা বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীও এই মতের প্রবক্তা। ফতহুল কাদির প্রণেতা ইমাম ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, রোজার নিয়ত না করে থাকলে রোজা ভঙ্গ করা সিদ্ধ। যদি রাত্রিভাগে রোজার নিয়ত ক'রে প্রত্যূষের পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন না করে, তবে রোজা ভঙ্গ করা তার জন্য সিদ্ধ নয়। এতদসত্ত্বেও রোজা ভেঙে ফেললে কেবল কাজা ওয়াজিব হবে. কাফফারা নয়।

'কেউ পীড়িত হলে কিংবা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করতে হবে'— পূর্বের আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। বার বার এরকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এতে করে যেনো এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, রোজা অথবা ফিদিয়া—এই বিধানটি রহিত। আর অক্ষমতার কারণে রোজা ভঙ্গ করলে তার কাজা আদায় করতে হবে— এই বিধানটি রহিত নয়। যদি এ রকম না হতো তবে পীড়িত ও মুসাফির ব্যক্তির বিধানের পুনরালোচনা আসতো না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এজমা ও হাদিসের ভিত্তিতে ঋতুবতী মহিলার বিধান, পীড়িত ও মুসাফিরের বিধানের মতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হজরত মায়াজা আদুবিয়া হজরত আয়েশার নিকট জানতে চাইলেন, ঋতুবতী রমণী রোজার কাজা আদায় করে অথচ নামাজের কাজা আদায় করে না— এর কারণ কী? হজরত আয়েশা বললেন, রসুল পাক স. এর পৃথিবীবাসের সময় আমরা ঋতু অবস্থায় ছেড়ে দেয়া রোজার কাজা আদায় করতাম। কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করতাম না।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রমজানের পরে সফর শেষে মুসাফির যে কয়দিন মুকিম এবং সুস্থ থাকবে সে কয়দিনের রোজা তাকে কাজা করতে হবে। পীড়িত ব্যক্তিও তেমনি নিরাময়ের পর যে কয়দিন সুস্থ থাকবে সে কয়দিনের কাজাই তাকে আদায় করতে হবে।

রমজান অতীত হওয়ার পর কাজা আদায়ের অবকাশ পেয়েও কাজা আদায় না করে কেউ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার রোজার কাজা অথবা ফিদিয়া ওয়ারিশগণের উপর ন্যস্ত হবে কি না— সে বিষয়ে আলেমগণ একমত হতে পারেন নি। ইমাম আবু হানিফা ও মালেকের মতে ওয়ারিশদের উপর কাজা আদায় কিংবা ফিদিয়া প্রদান কোনোটাই ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি এই মর্মে অসিয়ত করে যেয়ে থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পালন করা ওয়াজিব। উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ব্যতিরেকে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ থেকে অসিয়ত পূরণ করা যাবে না। অনুরূপ মানত অথবা কাফফারা আদায় না করে কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে মানত ও কাফফারা পরিশোধ করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। একটি হচ্ছে, মানতের রোজা অথবা রমজানের রোজার কাজা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারীরা আদায় করবে। অন্যটি হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারীগণ মিসকিনকে আহার করাবে। কেবল রোজা রাখলে যথেষ্ট হবে না। তবে তারা মানতের রোজা আদায় করতে পারবে। এই মতের সমর্থনে রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসুল আকরম স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এক মাসের রোজা রাখতে পারেননি। তাঁর পক্ষ থেকে ওই রোজাগুলো আমি পালন করতে চাই। তিনি বললেন, বেশ তো। তোমার মায়ের ঋণ থাকলে কি তুমি আদায় করতে না? মহিলা আরজ করলেন, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, তবে তো আল্লাহ্ পাকের ফরজ আদায় করাই সমীচীন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন- এক রমণী নবী করীম স. কে বললেন, হে অনুগ্রহের নবী! আমার জননীর দায়িত্বে একমাস রোজা কাজা রয়েছে। আমি যদি সেগুলো আদায় করে দেই তবে কি তা বিধানসম্মত হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আহমদ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক মহিলা সাহাবী সমুদ্রবক্ষে ভ্রমণরত ছিলেন। তিনি মানত করলেন, আল্লাহ্পাক যদি তাঁকে সমুদ্রের বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেন তবে তিনি কৃতজ্ঞতা পালনার্থে একমাস রোজা রাখবেন। মহিলা নির্বিঘ্নে সফর সম্পন্ন করলেন। কিন্তু মানত পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর এক নিকটাত্মীয় বিষয়টি রসুল পাক স. কে জানালেন। তিনি স.বললেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে রোজা রাখো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত সা'দ বিন উবাদা মহানবী স. সকাশে নিবেদন

জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার আম্মার দায়িত্বে একটি মানত ছিলো। তিনি তা আদায় না করেই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন। তিনি স. বললেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত আদায় করো। বর্ণিত হাদিসগুলোর কয়েকটিতে মানতের উল্লেখ রয়েছে, কয়েকটিতে নেই। তাই ইমাম আহমদ বলেছেন, মানতের কথা সুস্পষ্ট জানা গেলে উত্তরাধিকারীর উপর মানত পূরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলোতে মানতের কথা নেই সেগুলো রোজা সম্পর্কিত বলে ধরে নিতে হবে।

আমি বলি, হাদিসগুলোতে যখন শর্তসীমা ব্যতিরেকে মানতের কথা বলা হয়েছে তখন সেগুলোকে মানত হিসেবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। বরং হাদিসের বর্ণনানুসারে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃতের পক্ষ থেকে ওলীর রোজা রাখা সাধারণভাবে জায়েয। সে রোজা মানতের হোক অথবা রমজানের। কিন্তু হাদিসগুলোতে এমন প্রমাণ নেই যে, ওলীগনের উপরে কাজা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্তানুসারে বর্ণনাগুলো আপত্তিজনকও নয়। উপরন্তু আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং বলেছেন, 'কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।' এ ক্ষেত্রে রোজা রাখা যদি ওয়াজিব বলা হয়, তবে রোজা না রাখলে ওয়াজিব লংঘন করার দায়ে শাস্তিযোগ্য হতে হবে। আর সে শাস্তি হবে অপরের আমলের জন্য। অথচ এরশাদ হয়েছে, 'বোঝাবহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।' সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, মৃতের কোনো পরিত্যক্ত আমলের কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

যারা পরিত্যক্ত রোজার বিনিময়ে দরিদ্রকে আহার করাতে হবে— এই মতের পক্ষপাতি তাঁদের সমর্থন রয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর বর্ণিত ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে- রসুল আকরম স. বলেছেন, একমাসের পরিত্যক্ত রোজার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, তার পক্ষ থেকে প্রতি রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে আহার করানো উচিত। তিরমিজি। তিরমিজি আবার নিজেই হাদিসটির সনদের সমালোচনা করে বলেছেন, বর্ণনাটি সম্ভবত হজরত ইবনে ওমরের নিজস্ব উক্তি।

ইমাম আবু হানিফার মতে রোজা রাখা অথবা আহার করানো কোনোটাই যথেষ্ট নয়। কারণ একথা সর্বজনবিদিত যে, আনুগত্যের বেলায় স্থলবর্তিতার অবকাশ নেই। আনুগত্যের বেলায় নিয়ত ও মান্যতার যোগ্যতা বিচার্য। নিয়ত ও মান্যতার যোগ্যতার উপর পুরস্কার ও তিরস্কার নির্ভর করে। তাই উত্তরসূরীদের জন্য রোজা পালন অথবা সম্পদ ব্যয় ওয়াজিব নয়। তবে অসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, 'অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর মিরাস।' অতএব অসিয়তকৃত রোজা আদায় করলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌ পাক সমধিক জ্ঞাত।

আমি বলি, একথা বিচার্য যে, মৃতের পক্ষ থেকে দয়াদক্ষিণা প্রদর্শন করে কেউ যদি রোজা রাখে বা দান করে (মিসকিনকে আহার্য দেয়) তবে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর

অশেষ করুণার কারণে তা কবুল করে নেবেন। হাদিসের প্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এরকম করা ওয়ারিশগণের নিকট ওয়াজিব নয়। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বায্যারের বর্ণনায় রয়েছে-ওলী যদি মনে করে মৃতের পক্ষ থেকে সে রোজা রাখবে— একথার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মৃতের পরিত্যক্ত রোজা পালন ওলীর দায়িত্বভূত নয়। হাদিসটির সনদ অবশ্য দুর্বল।

'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান। তোমাদের জন্য যা ক্লেশদায়ক তা চান না'— একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য সহজসাধ্যটি পছন্দ করেছেন বলেই রোগগ্রস্ত ও মুসাফিরদের ছেড়ে দেয়া রোজার কাজা করার বিধান দিয়েছেন। এটা তাদের জন্য অবকাশ (রুখসত) — আজিমত (শ্রমসাধ্য) নয়। সুতরাং কষ্ট সত্ত্বেও পীড়িত ব্যক্তি ও ভ্রমনকারী যদি রোজা রাখে, তবে তা প্রতিপালিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা, উরওয়া বিন জোবায়ের এবং আলী বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে— সফররত অবস্থায় রোজা রাখা সিদ্ধ নয়। যদি কেউ রাখে, তবে কাজা ওয়াজিব হবে। তাঁদের অভিমতের স্বপক্ষে রয়েছে এই আয়াতের, 'তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে' এই বাক্যটি। এই বাক্যটির মাধ্যমে বুঝা যায়, মুসাফিরের জন্য রমজান মাসের রোজা রাখা ফরজ থাকে না। যদি কেউ রাখে তবে তা শরিয়তের বিধান বহির্ভূত বলে গণ্য হবে।

আমি বলি, রোজা ফরজ হওয়ার মূল উপলক্ষ্য হলো, রমজান মাস। আর ভ্রমণ হচ্ছে সেই ফরজ আদায়ের প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধক বটে, তবে মূল ফরজ উচ্ছেদকারী নয়। তাই কেউ যদি সফররত অবস্থায় রোজা রাখে তবে ফরজ হিসেবেই রাখবে। আর তার রোজা শুদ্ধও হবে। দৃষ্টান্তটি এরকম- যেনো কেউ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই জাকাত আদায় করলো। জমহুর ওলামার এই মতটির পক্ষে রয়েছে হজরত আবু সাঈদ বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে ষোলোই রমজান এক যুদ্ধযাত্রা করলাম। আমাদের মধ্যে কেউ রোজা ভাঙলেন, কেউ রাখলেন। ভঙ্গকারীরা রোজাদারদেরকে এবং রোজাদারেরা ভঙ্গকারীদেরকে তখন কিছুই বলেননি। মুসলিম। এপ্রসঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে মুসলিম এবং হজরত আনাস থেকে আহমদ।

এই জন্য যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে— এ কথার অর্থ, যে কয়টি রোজা বাদ পড়েছিলো সেই কয়টি রোজার কাজা আদায় করে রমজান মাসের সকল রোজার হিসাব পুরা করবে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, চান্দ্র মাস ঊনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। কাজেই চাঁদ না দেখে রোজা শুরু কোরো না ও চাঁদ না দেখে রোজাও ছেড়ে দিও না। যদি ঊনত্রিশ তারিখে চাঁদ না দেখা যায় তবে তিরিশটি রোজা পূর্ণ করো। বোখারী ও মুসলিম।

তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে একথা বলা হয়েছে রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে যাতে রোজা পালন তাদের জন্য সহজতর হয়। ছেড়ে দেয়া রোজার কাজা পরে আদায় করে রমজানের সংখ্যা যেনো পূর্ণ করা যায়। পাঠভিন্নতার কারণে আয়াতের এরকম অর্থও গ্রহণ করা যায় যে, আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি সহজতর পন্থার ইচ্ছে রাখেন যেনো তোমরা গণনাকৃত কাজা রোজা আদায় করে রমজান মাস পূর্ণ করো ও আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করো।

এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালনা করবার জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহিমাকীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে— এ কথার অর্থ তোমরা হেদায়েতের (পথপ্রদর্শনের) জন্য আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের ওই সকল বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো যার প্রতি তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শনের কারণেই তোমরা আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অর্জনের সুযোগ পেয়েছো— নিষ্কৃতির নিয়ম কানুন জেনেছো এবং পুণ্য লাভের অধিকারী হয়েছো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ আয়াতে 'ওয়া লিতুকাব্বেরুল্লাহ্' শব্দটির অর্থ হবে ঈদুল ফিতরের তকবীর সমূহ। হজরত ইবনে মুসাইয়েব, ওরওয়া এবং আবী সালমা থেকে শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, তখনকার জনতা ঈদুল ফিতরের রাতের তকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে যে তকবীরের কথা বলা হলো তা ঈদুল ফিতরের রাতের নয়, দিনের তকবীর মনে করতে হবে।

আমি বলি, এখানে তকবীর অর্থ সম্ভবত ঈদের নামাজ অথবা নামাজের অন্তর্ভূত তকবীর সমূহ। এ মর্মটি গ্রহণ করলে একটি শরিয়তের বিধানের উদ্ভব হয়। বিধানটি হচ্ছে, ঈদের তকবীর ওয়াজিব এবং ঈদের নামাজও ওয়াজিব। যেহেতু নামাজ ব্যতীত দিবা রাত্রির তকবীর সমূহ কারুর নিকট ওয়াজিব নয়; তাই নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তকবীরগুলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে 'অংশও মূলের সঙ্গে'— এ নিয়মে ঈদের নামাজও ওয়াজিব বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের যেহেতু কয়েকরকম ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব তাই ঈদের নামাজকে ফরজ বলা যায় না। মহানবী স. ঈদের নামাজের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, তাই এই নামাজ ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

রমজান মাস ও রোজার মাহাত্ম্যঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন— রমজান মাসের শুভাগমন ঘটলে শয়তান ও বিদ্রোহী জ্বিনগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। দোজখের সবগুলো দরোজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং উম্মোচিত করে দেয়া হয় জান্নাতের সকল তোরণ। নেপথ্যের ঘোষক এই মর্মে ঘোষণা দেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী, হে পরিত্রাণকামী— জাহান্নামের পথযাত্রা বন্ধ করো। এই ঘোষণা দেয়া হয় রমজানের প্রতিটি রাতে।

তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হজরত ওমরের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যারা রমজান মাসে আল্লাহ্ পাকের জিকির করে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। যারা প্রার্থনা করে তারা বঞ্চিত হয় না। আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন, যারা বিশুদ্ধ নিয়তে পুণ্য লাভের আশায় রমজানের রোজা পালন করে তাদের অতীতের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। ক্ষমা করে দেয়া হয় ওই ব্যক্তির সকল গোনাহ্ও যে বিশুদ্ধচিত্তে পুণ্যপ্রাপ্তির অভিলাষে ক্বদরের রাত্রিতে নামাজরত থাকে। বোখারী, মুসলিম। হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. শাবানের ত্রিশ তারিখে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, উপস্থিত জনমন্ডলী! এক মহামর্যাদাশালী মাসের শুভাগমন ঘটেছে। এ মাস অত্যন্ত বরকত পূর্ণ। এ মাসের মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল ক্বদর যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্পাক এ মাসের রোজা ফরজ করে দিয়েছেন আর রাতের নামাজকে করেছেন নফল। এমাসে কোনো উত্তম কর্ম সম্পাদন করলে ফরজ আমল প্রতিপালনতুল্য সওয়াব দেয়া হয়। এই মাসে একটি ফরজ সত্তরটি ফরজতুল্য। এ মাস সবরের মাস। আর সবরের প্রতিদান হচ্ছে বেহেশ্ত। এ মাস (আল্লাহ্র ভয়ে বা মহব্বতে) ক্রন্দনের মাস। এ মাসে রিজিক বৃদ্ধি পায়। যে একজন রোজাদারকে ইফতার করায় তার পাপ মোচন হয় এবং সে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়ার প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। নিজের রোজার পুণ্য তো সে পাবেই তদুপরি পাবে আরেক রোজাদারের সমান সওয়াব। এই ভাষণ শুনে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সকলের তো আর ইফতার করানোর সামর্থ নেই। রসুল পাক স. বললেন, এক চুমুক দুধ অথবা একটি খেজুর কিংবা এক কোষ পানি দ্বারা কাউকে ইফতার করালেও সে বর্ণিত প্রতিদানসমূহ পাবে। আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করাবে আল্লাহ্ পাক আমার হাউজে কাউসার থেকে তাকে এমন পরিতৃপ্ত করাবেন যে, জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সে আর পিপাসিত হবে না। এ মাসের প্রথম ভাগে রহমত, মধ্যভাগে মাগফেরাত এবং শেষ ভাগে (দোজখ থেকে) পরিত্রাণ। চারটি অভ্যাস তোমাদের আয়ত্তে রাখা উচিৎ। দু'টি অভ্যাস তাঁর সন্তোষ লাভের উপায়। ১. এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। ২. কেবল তাঁর নিকটই ক্ষমা ভিক্ষা করা।

অপর দু'টি আমল হচ্ছে। ১. জান্নাত যাঞ্চা করতে থাকা। ২. জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি চাওয়া। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেন— আদম সন্তানেরা প্রতিটি পুণ্য কর্মের জন্য দশ থেকে সাতশ গুণ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। রোজা ওই পুণ্য কর্ম সমূহের মধ্যে পড়ে না। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, রোজা আমার জন্য (করা হয়) তাই আমি রোজার প্রতিদান (দাতা)। তারা আমার উদ্দেশ্যেই পানাহার, রতিক্রিয়া পরিত্যাগ করে।

রোজাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের আর অন্যটি আল্লাহ্ সন্দর্শনের, যা জান্নাতে সংঘটিত হবে। আল্লাহ্ পাকের নিকট রোজাদারের মুখের

গন্ধ মেশ্‌ক আম্বরের চেয়েও প্রিয়। শুনে রাখো, রোজা হচ্ছে ঢাল (রক্ষাকবচ)। রোজাদারদের উচিৎ তারা যেনো অনাবশ্যক বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকে। কেউ যদি রোজাদারকে অন্যায় কথা বলে বচসায় লিপ্ত হতে চায় তবে তাকে বিনয়ের সঙ্গে বলো, আমি রোজাদার। বোখারী, মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. বলেছেন— রোজা এবং কোরআন পাক কিয়ামতের দিন বান্দাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে পরোয়ারদিগার! আমি এই ব্যক্তিকে রমজান মাসের দিবাভাগে পানাহার ও রতিকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম; কাজেই তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, হে বিশ্বসমূহের প্রতিপালক! আমি এই ব্যক্তির নিশিথের নিদ্রা হরণ করেছিলাম; কাজেই তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. বলেছেন— রমজানের শেষ রাতে আমার উম্মত ক্ষমা লাভ করে। একজন বললো, হে প্রিয়তম নবী! সে রাত কি ক্বদরের রাত? তিনি স. বললেন, না (বরং রমজান মাসের সকল রাত)। শ্রম শেষে শ্রমিক তার মুজুরী পায়। বান্দাও তার ফরজ রোজা আদায়ের বিনিময়ে শেষ রাতে মাগফেরাত লাভ করে। আহমদ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবুশ শাইখ ও অন্যান্যরা জারীর বিন আব্দুল হামিদ সিজিস্তানীর পদ্ধতিতে, তিনি সুল্লাত বিন হাকেম বিন জোবায়ের বিন জোবাইর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন— এক বেদুঈন রসুল পাক স. এর নিকটে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের মহান প্রতিপালকের অবস্থান কতোদূরে। যদি তিনি নিকটে থাকেন তবে আমরা অনুচ্চস্বরে প্রার্থনা জানাবো। আর যদি তিনি দূরবর্তী হন তবে আমরা উচ্চস্বরে আমাদের প্রার্থনা পেশ করবো। বেদুঈনের কথা শুনে রসুলপাক স. নীরব হয়ে গেলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

❒ আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে আমি তো নিকটেই থাকি। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে তাহার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।

হাসান থেকে আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট আরজ জানালেন, হে অনুগ্রহের নবী! আমাদের প্রতিপালকের অবস্থান কোথায়? এই প্রশ্নটির প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আমি বলি, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইতোপূর্বে বলা হয়েছে এরকম প্রশ্ন করেছিলো এক বেদুঈন। হজরত আলী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, তোমরা দোয়ার ব্যাপারে স্বল্পতাকে প্রশ্রয় দিওনা, কেনোনা 'তোমরা আমার নিকট দোয়া করো আমি কবুল করবো'— আল্লাহ্পাক এ আয়াত আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আমাদের প্রিয়তম নবী! আমরা কি করে বুঝবো কখন দোয়া করতে হবে। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এর শানে নুজুল সম্পর্কে বাগবী বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ্র মাধ্যমে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মদীনার ইহুদীরা রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট জানতে চাইলো, হে মোহাম্মদ! আমাদেরকে বলে দিন আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রার্থনা কিরূপে শ্রবণ করেন। আপনি বলে থাকেন, প্রথম আসমানের দূরত্বই পাঁচ শত বছরের পথের দূরত্বের সমান আর প্রতিটি আসমান একে অপরের নিকট থেকে পাঁচ শত বছর পথের দূরত্বে অবস্থিত। তাহলে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন কিভাবে? আয়াতটি নাজিল হয় এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে।

আমি বলি, আয়াতে বলা হয়েছে 'আমার দাসগণ'— এরকম মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন ইহুদীদের সঙ্গে সম্বোধিত হতেই পারে না। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে প্রশ্নটি ছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মহান প্রতিপালক কতোদূরে? তিনি যদি নিকটে হন তবে আমরা অনুচ্চস্বরে দোয়া করবো, আর দূরে হলে উচ্চস্বরে দোয়া করবো। এই ঘটনাটি যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়, তবে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জিকির গোপনেই করা উচিৎ। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, খায়বার যুদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে সাহাবাগণ একটি উপত্যকায় বিচরণ করছিলেন এবং উচ্চস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার' পাঠ করছিলেন। রসুল পাক স. তাঁদেরকে ডেকে বললেন, হে জনতা! তোমরা আপন সত্তার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হও। তোমরা কোনো বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে আহবান করছো না, বরং এমন পরম সত্তাকে ডাকছো যিনি অত্যধিক শ্রবণকারী এবং অতিনিকটে এবং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। বোখারী। কোরআন মজীদের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, 'ইন্নি ক্বরীব' বাক্যটির মর্ম হলো জ্ঞানের দিক থেকে আমি তোমাদের নিকটে, কোনো

বস্তুই আমার জ্ঞান বহির্ভূত নয়। বায়যাবী বলেছেন, 'ইন্নি ক্বরীব' বাক্যটি মানুষের বোধের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থায় উচ্চারিত হয়েছে। নতুবা তিনিতো শ্রুতির রীতিনীতি ছাড়াই মানুষের কর্ম, কথোপকথন ও অবস্থা সম্পর্কে সতত জ্ঞাত।

আমি বলি, কোনো কোনো ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় বর্ণিত সন্নিকটবর্তীতা স্থানগত অর্থরূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো স্থান, কাল ও পাত্রের অতীত। উপমা ও সাদৃশ্য থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর কোনো উপমা হয় না। নিকট বা দূর শব্দ দু'টির প্রয়োগ ঘটতে পারে কেবল আকার বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে। বস্তুনিচয় একে অপরের নিকটে দূরে কিংবা উপরে নিচে বামে দক্ষিণে অবস্থান করে। এ ধরনের নৈকট্যচিন্তাও আল্লাহ্ পাকের জন্য অচল। প্রত্যাদেশজাত বাণী কেবল তাঁর অবস্থান নির্ণায়ক ধারণা দিতে সক্ষম। বিষয়টি এভাবে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে— যেমন একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। তার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় সকল বস্তু আলোকিত। এখন প্রশ্ন, ওই আলোচ্ছটা এবং অগ্নিশিখা কি অভিন্ন না ভিন্ন? যদি বলা যায় অভিন্ন তবে প্রশ্ন উঠবে অগ্নিশিখায় রয়েছে দহনক্রিয়া। কিন্তু আলোকচ্ছটায় তা নেই। অগ্নিশিখা পোড়ায়। কিন্তু আলোকচ্ছটা পোড়ানোর ক্ষমতা রহিত। পুনশ্চ যদি প্রশ্ন করা হয়, অভিন্ন যদি না হবে তবে অগ্নিশিখা নিভিয়ে দেয়া হলে আলোকচ্ছটাও অপসৃত হয় কেনো? অতএব সিদ্ধান্তে আসতে হবে— আলো ও অগ্নিশিখা অভিন্ন নয়। আবার ভিন্নও নয়। আবার একথাটিও ভালো করে বুঝে নিতে হবে, আলোর সূচনা অগ্নিশিখার সন্নিকটেই, কিন্তু তার বিস্তার দূরবর্তী। আবার আলোকচ্ছটার অন্তিমে রয়েছে অন্ধকার। মানুষের অজ্ঞতার ওই অন্ধকার, আলোকচ্ছটার স্পর্শ না পেলে নিকট ও দূরের রহস্য সমুদ্ভাসিত হয় না। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

'তারা আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক'—একথার অর্থ, তারা যেনো দৃঢ় ধারণা রাখে যে, আমি একমাত্র দোয়া কবুলকারী (তাদের ডাকে আমি সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেনো আমার ডাকে সাড়া দেয়)। দোয়া হচ্ছে ইবাদত। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফাল ইয়াসতাজিবু লি (তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক)' এই বাক্যটির অর্থ, আমি যখন তাদের দোয়া কবুল করি, তখন তাদেরও উচিত আমার আনুগত্যের নির্দেশ অবতীর্ণ হলে তারা যেনো তা সাথে সাথে মেনে নেয়। 'ওয়াল ইউ'মিনুবি' বাক্যটির অর্থ ইমানের উপর দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা। তাই বলা হয়েছে, 'আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক।' একথার মাধ্যমে আরো বুঝা যায় যে, সম্বোধনকৃতরা অবিশ্বাসী নয়, বরং বিশ্বাসী। পূর্ব থেকেই তাঁরা ইমানদার ছিলেন। সেই ইমানকেই এখানে জোরদার করতে বলা হয়েছে। বাক্যটির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হবে এই- সাধারণ ইমান গ্রহণের পর তারা যেনো তাদের কুপ্রবৃত্তিকে বিলোপ করে প্রকৃত ইমান (ইমানে হাকিকি) অর্জন করে।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে (লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন)। এখানে 'রুশদ' শব্দটির অর্থ, গন্তব্যে পৌছানো। শব্দটি 'গাই' (ভ্রষ্টতা শব্দের বিপরীতার্থক)।

'আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই'— — এ বাক্যটি সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, আল্লাহ্ পাক এখানে দোয়া কবুলের অঙ্গীকার করেছেন। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেকে দোয়া করে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল হয় না। বাগবী বলেছেন, বিষয়টির বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। ১. কারো কারো মত হচ্ছে, এখানে দোয়ার অর্থ, আনুগত্য এবং কবুল করার অর্থ সওয়াব প্রদান করা। এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে প্রশ্নের অবকাশ আর থাকে না। ২. কেউ কেউ বলেছেন, বাক্যটির মর্ম হচ্ছে, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করি। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'ফাইয়াকশিফু মা তাদউনা ইলাইহি ইনশাআ।' অর্থাৎ বিপদমুক্তির জন্য তোমরা যে প্রার্থনা করছো, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সে বিপদ বিদূরিত করতে সক্ষম। একথার মাধ্যমে 'আল্লাহ্ পাক আমাদের ডাক শোনেন না'— অবিশ্বাসীদের এই অপবিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে। ৩. এরকম অর্থ করা যেতে পারে যে, হ্যাঁ আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো বটে, যদি তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণবহ হয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. এরশাদ করেছেন, যদি তোমরা পাপাভিলাষী না হয়ে অথবা আত্মীয়তার সূত্র ছিন্ন করার লক্ষ্যে দোয়া না করে এবং তাড়াহুড়া না করে দোয়া করো, তবে আল্লাহ্ পাক দোয়া কবুল করবেন। সাহাবাগণ বললেন, তাড়াহুড়া না করে দোয়া করা আবার কী রকম? তিনি স. বললেন, তোমরা বলে থাকো, আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এতো দোয়া করলাম, তবু তুমি কবুল করলে না! এরকম মনোভাব নিয়ে তোমরা দোয়া করা ছেড়ে দাও। মুসলিম। ৪. এরকম ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, বান্দা যদি কোনো বিষয় কামনা না করে, তবে আমি তার দোয়া কবুল করি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে দোয়া কবুল করার অর্থ হবে, আমি তার ডাক শুনি। ৫. কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রার্থনাকারীর সকল প্রার্থনা কবুল করেন। তকদীরের অনুকূল হলে প্রার্থনাকারীর কাঙ্খিত প্রাপ্তি ঘটে। আর তকদীরের প্রতিকুল হলে সেই দোয়ার বদৌলতে সে পৃথিবীতে কোনো অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ পায়। অথবা পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে পাক স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বিষয় দান করেন, অথবা কোনো অমঙ্গল তার উপর থেকে সরিয়ে দেন— যদি সে নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য প্রার্থনাকারী না হয়, অথবা স্বজন বিচ্ছিন্নতাকামী না হয়। বাগবী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেছেন, যে

মুসলমান তার প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনোযোগী হয়, আল্লাহ্ পাক তার প্রয়োজন পূরণ করেন অথবা পরজগতের জন্য সংরক্ষণ করেন। কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ হজরত জাবের থেকে তিরমিজিও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৬. কেউ কেউ আবার এরকম মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক সাড়া দেন। তবে প্রার্থনা পূরণ করেন বিলম্বে। কারণ আল্লাহ্ পাক তার আর্তি ও মিনতি শুনতে বড়োই ভালোবাসেন। আল্লাহ্ পাকের প্রিয়ভাজন যাঁরা তাঁদের কারো কারো সঙ্গেই করেন আল্লাহ্ পাক এই আচরণ। আর যারা নৈকট্যরহিত, তাদের আকাঙ্খা পূরণ করে দেন সঙ্গে সঙ্গে। কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত হচ্ছে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কতকগুলো সীমারেখা ও শর্ত রয়েছে। ওগুলো দোয়ার বাহন স্বরূপ। সীমা ও শর্ত বজায় রেখে দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে সে প্রার্থনা গৃহীত হয়। নতুবা তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল করীম স. বলেছেন, অবিন্যস্ত কেশাধিকারী বেদনাহত হয়ে আকাশের দিকে তার হস্ত প্রসারিত করলো, তবুও তার প্রার্থনা গৃহীত হলো না। কী করে হবে? তার আহার এবং পরিচ্ছদ ছিলো অবৈধ উপার্জনের। মুসলিম।

আমি বলি, দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হলো তার সবগুলোই সঠিক। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, দোয়ার উদ্দেশ্য আসলে কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে, কবুল হওয়া। আল্লাহ্ পাক পরম দাতা। দয়া তাঁর অন্তহীন, ক্ষমতা অপার। এরকম পবিত্র সত্তা কখনো যাঞ্চাকারীকে বিমুখ করতে পারেন না। হজরত সালমান থেকে তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন- রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং করুণাপরবশ। তাই যখন তাঁর বান্দা তাঁর নিকট হস্ত প্রসারিত করে, তখন আত্মমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে তিনি সেই হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।

পরিশেষে দোয়া মঞ্জুর না হওয়া অথবা মঞ্জুর হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো প্রচ্ছন্ন রহস্য রয়েছে। অজানা কোনো বাধা বিঘ্নও বর্তমান থাকা সম্ভব। হয়তো কোনো প্রায়শ্চিত্ত কিংবা সীমারেখা ও নিয়মের অনুপস্থিতি প্রার্থনা পূরণকে বিলম্বিত করে দেয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا

عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

❒ সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানিতেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সহিত সঙ্গত হও এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সঙ্গত হইওনা। এইগুলি আল্লাহের সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইওনা। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া চলিতে পারে।

রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে— এখানে 'রফ্স' শব্দটির অর্থ স্ত্রীসম্ভোগ। জুযাজ বলেছেন, 'রফ্স' বলতে আদর, উপভোগ, সম্ভোগ— সবকিছুকেই বুঝায়। আলোচ্য আয়াতে 'রফ্স' শব্দটি 'ইলা' শব্দটির মাধ্যমে বিশেষিত হয়েছে। তাই এখানে 'রফ্স' এর সুনির্দিষ্ট অর্থ হবে স্ত্রীসম্ভোগ। আহমদ, আবু দাউদ এবং হাকেম আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা থেকে এবং তিনি হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে বর্ণনা করেছেন— ইসলামের প্রথমাবস্থায় মুসলমানেরা রাতের প্রথমভাগে পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করতেন। শয্যাগ্রহণের পর সকাল পর্যন্ত পানাহার ও সম্ভোগ বন্ধ থাকতো। ফলে রোজা রাখতে হতো ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট, অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করে। হিরসা নামের এক আনসারী একদিন পানাহার না করেই এশার নামাজ অন্তেই শুয়ে পড়লেন। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন পানাহারের সময় শেষ। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়লেন। আরেক ঘটনা ঘটালেন হজরত ওমর। শয়নের পর তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন। রসুল আকদাস স. এর নিকট যখন এসকল সংবাদ পৌছলো তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি। এই হাদিসটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইবনে আবী লায়লার মাধ্যমে।

যদিও তিনি হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে সরাসরি হাদিসটি শোনেননি। কিন্তু হাদিসটির স্বপক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে অনেক।

হজরত বারা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন— সাহাবাগণের অভ্যাস ছিলো, রাতের আহারের আগেই তাঁরা শয্যা গ্রহণ করতেন। এভাবে ভোর হতো। তাঁরা পানাহারের সুযোগ পেতেন না। ফলে তাঁদের রোজা প্রতিপালিত হতো অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে। একবার এরকম ঘটলো, হজরত কায়েস বিন সারমা আনসারী ইফতারের সময় তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, ঘরে তো কিছুই নেই। আপনিও কর্মক্লান্ত। দেখি কিছু সংগ্রহ করতে পারি কি না। স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন কায়েস। খাদ্য সংগ্রহ করে তাঁর স্ত্রী ঘরে ফিরে দেখলেন, তাঁর স্বামী গভীর ঘুমে অচেতন। ভোর হলো। ঘুম ভাঙতেই তিনি দুর্বলতা অনুভব করলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। ঘটনাটি রসুল স. কে জানানোর পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ— আভিধানিক দৃষ্টিতে এই বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। সম্ভাব্য প্রশ্নটি ছিলো, রোজার রাতে স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ হওয়ার কী কারণ? জবাবে বলা হচ্ছে, এ বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা সুকঠিন। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই অতিনৈকট্যের কারণে মনে হয় যেনো তারা একে অপরের পরিচ্ছদ। সম্ভোগবিরতি অত্যন্ত কঠিন বলেই একে বৈধতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরের আবরণ (লেবাস)।' অথবা এরকম অর্থ হতে পারে- পরিধেয় বস্ত্র যেমন শরীরাচ্ছাদনকে নিশ্চিত করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পরগামীতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, যে বিয়ে করলো, সে ইমানের দুই তৃতীয়াংশ অর্জন করলো।

আল্লাহ্ পাক জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে— একথার অর্থ, তোমাদের শয়নের পরের স্ত্রীসম্ভোগ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। এহেন ধৈর্যচ্যুতি আত্মঅত্যাচারের নামান্তর। এতে করে তোমাদের পুণ্যার্জনে লঘুতাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছিলো।

হজরত জাবের থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন- যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হলো, তখন সাহাবাগণ সারা রমজান মাস স্ত্রীগ্রহণ করতেন না। এতদসত্ত্বেও কোনো না কোনো বিচ্যুতি ঘটে যাচ্ছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম আব্দুল্লাহ্ ইবনে কা'বের পদ্ধতিতে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—তখনকার নিয়ম ছিলো, শয্যাগ্রহণের আগেই পানাহার এবং স্ত্রীগমণ সম্পন্ন করা। শয়নের পর আর এ দু'টি কর্ম বৈধ নয়। একবার রসুল পাক স. এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বিলম্বে গৃহে ফিরে এলেন হজরত ওমর। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সহবাসের আকাঙ্খা জানালেন। স্ত্রী বললেন, আমি তো শয়ন করেছিলাম। হজরত ওমর বললেন, আমি তো আর শয়ন

করিনি। এরপর তিনি স্ত্রীগমন করলেন। ওদিকে হজরত কা'ব বিন মালেকও এরকম করলেন। সকালে বিষয়টি রসুলে করীম স. এর গোচরীভূত করা হলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বাগবী বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে এশার নামাজের আগে যদি কেউ শুয়ে পড়তো তবে অবশিষ্ট রাতের জন্য পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। হজরত ওমর একদিন এই নিষিদ্ধতা ভেঙে ফেললেন। পরদিন তিনি রসুল আকদাস স. এর নিকট ঘটনাটি জানালেন। তিনি স. বললেন, ওমর। তোমার পক্ষে এমতো আচরণ শোভনীয় হয়নি। তখন আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী দাঁড়িয়ে স্বীকার করলেন যে, এরকম ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তখনই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এরপরের বাক্যে এমর্মে সাক্ষ্য এসেছে, তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়ে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে রাতের যে কোনো অংশে সঙ্গত হওয়া বৈধ।

আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো— একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তোমাদের ভাগ্যে যে সন্তান-সন্ততি নির্ধারণ করেছেন, স্ত্রীসম্ভোগের মাধ্যমে সেই নির্ধারণের অন্বেষী হও। একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সন্তান কামনাই স্ত্রীসম্ভোগের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা পূরণই যেনো প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। রসুলে আকদাস স. এরশাদ করেছেন, তোমরা এমন রমণীকে বিবাহবদ্ধ করো, যে তার স্বামীকে ভালোবাসে এবং অধিক সন্তান প্রসবের যোগ্যা হয়। কেনোনা তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্য নবীদের উম্মতের সংখ্যা অতিক্রম করার গর্ব অনুভব করবো। হজরত মা'কাল বিন ইয়াসের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ। আয়াতের এই বাক্যটি দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়- সহবাসের সময় আজল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে শুক্রপাত করা) মাকরূহ (অনভিপ্রেত)। বাক্যটির মাধ্যমে একথাও বোঝা যায় যে, যথাঅঙ্গের মাধ্যমে সম্ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করা মোবাহ্ (বৈধ)। বাগবী বলেছেন, হজরত মুআজ বিন জাবালের মতে 'মা কাতাবাল্লাহু লাকুম' বাক্যটির মর্ম লাইলাতুল ক্বদর। আমি বলি, বাক্যটির বাকভঙ্গিমা অভিমতটিকে সমর্থন করে না।

'আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়'— এই বাক্যে উল্লেখিত 'খাইতে আব্ইয়াদ' অর্থ দিবসের আলো এবং 'খাইতি আসওয়াদ' অর্থ রাত্রির কৃষ্ণতা। ফজরের সূচনায় পুবের আকাশে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত দীর্ঘ একটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়। ওই রেখাকে নির্দেশ করতেই এখানে 'খাইত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'খাইতিল আবইয়াদ' ফজর (দিন) হলে 'খাইতিল আসওয়াদ' অর্থ রাত্রি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। 'মিনাল ফাজরি' বাক্যাংশটির মিন অব্যয়টি আংশিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। আর 'খাইতিল আবইয়াদ' ফজরের অবস্থা প্রকাশক। এখানে ফজর অর্থ ফজরের কিয়দাংশ। ফজর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত— এরকম কথা এখানে বলা

হয়নি। কারণ, ফজরের ন্যূনতম চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথে পানাহার হারাম হয়ে যায়। এই ন্যূনতম চিহ্নকে বলে সুবহে কাজেব (বঙ্গানুবাদে যদিও সরাসরি বলা হয়েছে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্ট হওয়ার কথা। সে অবস্থার নাম আসলে সুবহে সাদেক)। সুবহে কাজেব এবং সুবহে সাদেকের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এরকম বাকভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে পশ্চিমাকাশে দৃষ্ট হয় কৃষ্ণরেখা। তারপর পুবাকাশে দৃষ্ট হয় উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত একটি দীর্ঘ শুভ্ররেখা। ওই শুভ্ররেখাটি ফজরে কাজেব। আর কৃষ্ণরেখাটি সুবহে কাজেব। তারপর যে শুভ্ররেখাটি প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে সুবহে সাদেক। এজন্য ফজরের কৃষ্ণরেখা ও শুভ্ররেখা দু'টিকেই পানাহারের শেষসীমানা নির্দেশ করা যায়। শেষ সীমানাটি স্পষ্ট হওয়া অর্থ— সীমাচিহ্নটি দৃষ্টিগোচর হওয়া। পূর্ণ উদ্ভাসিত হওয়া নয়। পূর্ণ উদ্ভাসিত বা স্পষ্ট কথাটির উপর জোর দিলে সীমাচিহ্নটি আর থাকে না।

হজরত সামুরা বিন জুন্দুব থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা বেলালের আজান এবং সুবহে কাজেবের কারণে পানাহার বন্ধ কোরো না। ওই সময় বন্ধ কোরো যখন সুবহে সাদেক হয়। তিরমিজি। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসুলুল্লাহ্ স. বলেন, বেলাল রাত থাকতেই আজান দেয়। তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেছেন, হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। সুবেহ সাদেক হয়েছে- একথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি আজান দিতেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি আসার (সাহাবাগণের উক্তি) জটিলতার অবতারণা করেছে। যেমন, হজরত আলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ফজরের নামাজ সমাপ্ত করার পর বলতেন, এখন শুভ্ররেখা ও কৃষ্ণরেখার পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এই বর্ণনাটি করেছেন ইবনে মুনজির। তিনি বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবু বকরের উক্তি হিসেবে আরো বর্ণনা করেছেন, যদি পানাহারের আগ্রহ অনুভব না হতো তবে আমি সেহরী করতাম ফজরের নামাজের পর। ইবনে মুনজির, ইবনে আবী শাইবা হজরত আবুবকর থেকে আরো একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি (হজরত আবুবকর) ফজর সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত গৃহের দরোজা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত আসারগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সুবহে সাদেক হওয়ার পরও পানাহার করা যায়। এ জটিলতা নিরসনের উপায় কী? আমি বলি, অদৃশ্যের সংবাদ আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন। তবে আমার মতে, এসকল আসার দ্বারা বোঝা যায়— মিনাল ফাজরি কথাটির মিন অব্যয়টির অর্থ, হজরত আবু বকর ও হজরত আলীর নিকট সববীয়া বা কারণ সঙ্গত। আর 'খাইত' অর্থ প্রকৃত রেখা। অথচ হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে— মিন অব্যয়টির অর্থ বর্ণনামূলক বা বয়ানিয়া। আর 'খাইতিল আবইয়াদ' অর্থ সুবহে সাদেক। এই সমাধানটি ঐকমত্যাগত। হজরত আদী বিন হাতেম থেকে বর্ণিত হয়েছে— 'যখন কৃষ্ণরেখা থেকে ঊষার

শুভ্ররেখা স্পষ্টভাবে...' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন আমি একটি কালো এবং একটি শাদা সুতা বালিশের নিচে রেখে দিলাম। কিন্তু রাতে আমি সুতা দু'টির বর্ণনির্ণয় করতে পারলাম না। সকালে রসুল আকরম স. এর নিকট আমি বিষয়টি নিবেদন করলে তিনি বললেন, আয়াতে এ কথার দ্বারা রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলোকে বুঝানো হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, তোমরা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। এখানে বিষয়টি হচ্ছে, দিবসের আলো ও নিশীথের আঁধার।

হজরত সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে- এই আয়াতটির সঙ্গে প্রথমে মিনাল ফাজরি কথাটি ছিলো না। তাই কতিপয় সাহাবী তাঁদের পায়ে শাদা ও কালো সুতা বেঁধে রাখতেন। সুতা দু'টি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পানাহার করতেন। তারপর যখন মিনাল ফাজরি বাক্যাংশটি অবতীর্ণ হয়ে মূল বাক্যের সঙ্গে সংযোজিত হলো, তখন সকলে বুঝতে পারলেন, এখানে কৃষ্ণরেখা ও শুভ্ররেখা কথা দু'টোর অর্থ হবে রাত ও দিন। বোখারী, মুসলিম। প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্ণিত হাদিসানুযায়ী মিনাল ফাজরি কথাটি অবতীর্ণ হয়েছে কিছুদিন পরে। যদি তাই হয়, তবে বাক্যাংশের (মিনাল ফাজরি) এমতো সংযোজন ভাষাবিদগণের নিকট সুসঙ্গত বলে গৃহীত হয় না। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের সময় কথাটি মূল বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়নি। আমি বলি, শাদা ও কালো রেখা বলতে দিন ও রাতকেই বুঝায়—এরকম ধারণা সুপ্রচলিত। কোনো বর্ণনাবিশ্লেষণের আবশ্যকীয়তা এখানে নেই। কতিপয় ব্যক্তি যদি স্বল্পবুদ্ধির কারণে ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ করে তবে তা অবোধ্য বা দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে এটি একটি সমস্যা বটে। মানতে হবে বক্তব্যের পূর্ণ উন্মোচন এখানে ঘটেনি। তাই পরবর্তীতে মিনাল ফাজরি কথাটি সংযুক্ত করে বক্তব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো হয়েছে। এতে করে স্বল্পবুদ্ধিজাত সমস্যা আর সৃষ্টি হবে না। বিষয়টি হবে তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট ও সহজ। বিষয়টিকে যদি দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করা হয়ও, তবুও জটিলতার প্রশ্ন এখানে নেই। কারণ, বিধানদাতার (আল্লাহ্‌র) প্রত্যাদেশের ধরণ দু'টি। একটি হচ্ছে, ওহীয়ে মাতলু। আরেকটি হচ্ছে, ওহীয়ে গায়ের মাতলু। কোরআন হচ্ছে, ওহীয়ে মাতলু আর হাদিসকে বলা হয় ওহীয়ে গায়ের মাতলু। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত আদী বিন হাতেমের হাদিস (ওহীয়ে গায়ের মাতলু দ্বারা) বিষয়টির ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে।

তাহাবী বলেছেন, খাইতিল আবইয়াদ ও খাইতি আসওয়াদ দু'টি শব্দের অর্থই স্পষ্ট। 'মিনাল ফাজরি' কথাটি তার নাসেখ বা রহিতকারী। তাহাবীর সমর্থনে রয়েছে হজরত হুজায়ফা বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে- আমরা মহানবী স. এর সঙ্গে এমন সময় সেহেরী করেছি, যখন দিনের আলো প্রস্ফুটিত ছিলো। শুধু সূর্য ওঠা বাকি ছিলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন মানসুর। এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, মিনাল ফাজরি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হজরত

হুজায়ফা রসুল পাক স. এর সঙ্গে সেহেরী করেছেন। একথা মেনে নিলেও সমস্যা থেকে যায়। সেগুলো হচ্ছে— ১.'মিনাল ফাজরি' কথাটি পূর্ণ বাক্য নয়। অথচ রহিতকারী বাক্যটি একটি পূর্ণ বাক্য হওয়াই যুক্তিগ্রাহ্য। ২. যদি ধরে নেয়া যায় মিনাল ফাজরি পরে অবতীর্ণ হয়েছে তবে তা পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে মিলিতরূপ নিলো কী করে? (মিলিত হলে তো একযোগেই অবতীর্ণ হতো)। সুতরাং সমস্যাটি এখানে এই যে, মিনাল ফাজরি কথাটি এখানে রহিতকারী নয় এবং মিলিতও নয়। এই জটিলতার নিরসনে স্বয়ং ভাষ্যকার বলেছেন, বাক্যটি প্রথমে মিনাল ফাজরি ব্যতিরেকেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছে মিনাল ফাজরি সহযোগে। তাই পরের মিনাল ফাজরি সংযুক্ত পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের মিনাল ফাজরি বিহীন বাক্যটিকে রহিত করে দিয়েছে।

বিঃ দ্রঃ হজরত আদী বিন হাতেমের ঘটনাটি ঘটেছিলো পূর্ণ বাক্যটি অবতীর্ণ হওয়ার পর। তার কারণ হচ্ছে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নবম হিজরীতে। আর রোজার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীতে। আনুমানিক একবছর পর অবতীর্ণ হয়েছে মিনাল ফাজরি সংবলিত বাক্যটি। সুতরাং তিনি বালিশের নিচে সুতা রেখেছিলেন মিনাল ফাজরি এর মিন অব্যয়টির কারণগত অর্থ গ্রহণ করার জন্য। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

বিঃ দ্রঃ ফজর পর্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগ সিদ্ধ— একথা বুঝা যায়, ফজরের পরে গোসল করা যাবে এবং সূর্যোদয় ঘটার পর নাপাক অবস্থায় থাকলেও রোজা শুদ্ধ হবে। এটা ঐকমত্য। 'অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর'— এ কথার মাধ্যমে রোজার শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যখন সূর্য্য অস্তমিত হয়—দিন শেষে শুরু হয় রাতের অন্ধকার- তখন ইফতারের সময়। বোখারী। সুবহে সাদেক থেকে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার ও রতিকর্ম থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। এখানে রোজার এই সংজ্ঞাটি স্পষ্টরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। 'সুম্মা আতিম্মু' অর্থ অতঃপর (রোজা) পূর্ণ কর— একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রোজার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (নিয়ত) থাকতে হবে। পূর্ণকরণ কার্য্যটি আমরে এখতেয়ারী (ইচ্ছামূলক কর্ম)। আর ইচ্ছামূলক কর্ম কখনও নিয়ত ছাড়া পূর্ণ হয় না। প্রতিটি ইবাদতের জন্য নিয়ত থাকা ফরজ। রোজাও ইবাদত। তাই রোজার নিয়তও ফরজ। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন 'ওয়ামা উমিরু ইল্লালিয়া বুদুল্লাহা মুখ্‌লিসিনা লাহুদ্দিন (আর তাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে— শুধু তাঁর ইবাদত মনে করে তারা যেনো তাদের উপাসনা সম্পন্ন করে) রসুল স. বলেছেন প্রতিটি কর্মের ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত। নিয়তের প্রতি নির্ভর করে কর্মফল। তাই কেউ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য হিজরত করে তবে সে তার নিয়তের প্রতিফল পাবে। পার্থিব উদ্দেশ্যে যে হিজরত করবে, পার্থিবতাই হবে তার অর্জন। আবার রমণী লাভের

উদ্দেশ্য যার থাকবে, রমণীপ্রাপ্তিই হবে তার প্রতিফল। এই হাদিসটি ইমাম মালেক ব্যতীত সকল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী অবশ্য বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেকের মাধ্যমেই। হাদিসটি সর্বজনবিদিত। আর এই বিষয়ে ওলামা সম্প্রদায় একমত যে, উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। নিয়তের ভিত্তিতে ইবাদত সুসম্পন্ন হতে হবে। ইবাদতের সম্পূর্ণ পরিসরে থাকতে হবে নিয়তের উপস্থিতি। এরকম সার্বক্ষণিক নিয়ত রক্ষা করা একটি দূরূহ ব্যাপার। তাই বিষয়টি সুরাহা করা হয়েছে এভাবে। নামাজের জন্য নিয়ত করতে হবে তকবীরে তাহরীমার সময়। এই নিয়তই নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে বলে গণ্য করা হবে। রোজার নিয়ত করতে হবে সেহেরীর সময়। এই নিয়তই সন্ধ্যা পর্যন্ত (শেষ পর্যন্ত) রয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে, যদি রোজা ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ না ঘটে। নিদ্রাবস্থায় রোজা থাকা না থাকা কোনটিই স্মরণে রাখা সম্ভব নয়। আবার সর্বক্ষন রোজার কথা মনে রাখাও দূরূহ ব্যাপার। তাই রোজার সূচনালগ্নের নিয়তকেই সার্বক্ষণিক নিয়ত বলে ধরে নেয়া হয়।

সুবহে সাদেক হয়ে গেলে কিংবা সূর্যোদয়ের পর রোজার নিয়ত করলে রোজা সিদ্ধ হবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শরিয়ত সমর্থিত দিবসের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রমজানের রোজা, মানতের রোজা ও নফল রোজা শুদ্ধ হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, মধ্যাহ্নের পূর্বে নিয়ত করলে কেবল নফল রোজা শুদ্ধ হবে। অন্য কোনো রোজা শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, দিনে নিয়ত করলে কোনো রোজাই শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেকের দলিল হজরত হাফসা বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোজার নিয়ত না করবে তার রোজা হবে না। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে মাজা, দারা কুতনী, দারেমী। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে- যে ব্যক্তি রাত থেকেই রোজার দৃঢ় বাসনা না রাখে, তার রোজা হয় না। অন্য আরেক বর্ণনায় রয়েছে— যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোজা নির্ধারণ করলো না, তার রোজা হলো না। কেউ যদি এ বিষয়ে আপত্তি তুলে বলে যে, ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে মারফু প্রমাণিত হয়নি। আবার ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি মওকুফ হওয়াই সমধিক শুদ্ধ— এই আপত্তির প্রেক্ষিতে আমাদের জবাব হচ্ছে, ইবনে জুরাইজ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুবকর বলেছেন, হাদিসটি মারফু (সরাসরি রসুল পাক স. এর উক্তি)। দু'জন বর্ণনাকারীই এই হাদিসটি ইমাম জুহুরী থেকে, তিনি সালেম থেকে, সালেম তাঁর পিতা থেকে তিনি জননী হাফসা থেকে এবং তিনি মহানবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ এবং ইবনে আবুবকর দুজনই সেকাহ্। হাদিসটিকে মারফু বললে অতিরিক্ত বলা হয়। কিন্তু যাঁরা সেকাহ্, তাদের অতিরিক্ত কথনও গ্রহণযোগ্য। আর মুহাদ্দিসগণের রীতি হচ্ছে, তাঁরা মুরসাল হাদিসগুলোকে মওকুফ বলেন। আর মওকুফ হাদিসের অধিক

বিশুদ্ধতা মারফু হওয়ার অন্তরায় নয়। ইমাম হাকেম হাদিসটিকে বলেছেন, মারফু প্রকৃতির। তারপর বলেছেন, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের নীতিমালা অনুযায়ী হাদিসটি শুদ্ধ। মুস্তাদরাক গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম বোখারীর নীতিমালা অনুযায়ী হাদিসটি শুদ্ধ। ইমাম বায়হাকী ও দারেমী বলেছেন, হাদিসটির সকল বর্ণনাকারী সেকাহ্ (বলিষ্ঠ)।

এ বিষয়টির উপর জননী আয়েশা থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোজা নির্ধারণ করলো না, তার রোজাই হলো না। দারা কুতনী। তিনি বলেছেন, হাদিসটির সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ। কিন্তু এই সূত্র শৃঙ্খলের এক বর্ণনাকারীকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইবনে হাব্বান। অন্য এক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুবও তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। মায়মুনা বিনতে সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত থাকতেই দৃঢ় বাসনা করলো যে, আগামীকাল রোজা রাখবো— তার রোজা শুদ্ধ হবে। আর ফজরের আগে যে এরকম দৃঢ় ইচ্ছা করলো না, তার রোজাই হবে না। এই হাদিসটি বর্ণনাকারীদের একজন ওয়াকেদী। তার সম্পর্কে দারা কুতনীর মন্তব্য হচ্ছে, সে কিছুই নয়।

যারা নফল রোজার জন্য দিবাভাগে নিয়ত করা যথেষ্ট মনে করেন, তাদের সমর্থনে রয়েছে হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. আমার নিকটে এলে বলতেন, আহারের ব্যবস্থা আছে কি? আমি যদি বলতাম, না। তবে তিনি বলতেন, তাহলে আমি রোজা রাখলাম। একবারের ঘটনা— তিনি আমার গৃহে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার নিকট কিছু হায়স (মধু ও ঘি সহযোগে প্রস্তুত আহার্য বিশেষ) আছে যা হাদিয়া হিসেবে এসেছে। তিনি স. বললেন, নিয়ে এসো, আমি তো সকাল থেকে রোজাদার ছিলাম। মুসলিম। ঘটনাটি আসলে এরকম— রসুল স. বললেন, খাবার আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। আমি তাহলে রোজাদার। এরপর তিনি বাইরে গেলেন। তখন আমার কাছে হাদিয়া হিসেবে হায়স উপস্থিত হলো। রসুল স. যখন পুনরায় ঘরে এলেন, তখন আমি বললাম, হাদিয়া এসেছে। তিনি স. বললেন, কী বস্তু? আমি বললাম, হায়স। তিনি স. বললেন, নিয়ে এসো। আমি নিয়ে এলাম। তিনি স. হায়স খেয়ে বললেন, সকাল থেকে তো আমি রোজাদার ছিলাম।

ইমাম মালেক হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তিনি স. দিবাভাগে নফল রোজার নিয়ত করেছিলেন- একথা ঠিক নয়। বরং নিয়ত তিনি করেছিলেন রাতেই, দিনে সেকথা বলেছিলেন মাত্র। পরে হাদিয়া গ্রহণ করে রোজা ভেঙে ফেলেছিলেন। রোজাটি ছিলো নফল। আর নফল রোজা রেখেও ভাঙা যায়। সকাল

থেকে আমি রোজাদার— একথাটি প্রমাণ করে যে, তিনি রোজার নিয়ত করেছিলেন রাত থাকতেই।

'তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গত হয়ো না'— এখানে এতেকাফ বলতে 'উকুফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে— যার আভিধানিক অর্থ কোনোকিছুর উপর অবস্থান করা, স্থির থাকা। শরিয়তবেত্তাগণের ভাষায়, সুনির্দিষ্ট সংকল্প (নিয়ত) সহকারে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করার নাম এতেকাফ। বাগবী বলেছেন, কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমণ করতেন— তারপর গোসল সেরে এসে পুনরায় মসজিদে অবস্থান নিতেন। আয়াতের এই বাক্যটি দ্বারা এতেকাফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গত হলে এতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেবল ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলক্রমে স্ত্রী সহবাস করলে যেমন রোজা ভঙ্গ হয় না, তেমনি এতেকাফও ভঙ্গ হয় না।

আমরা বলি, এতেকাফ ও রোজা এক প্রকৃতির ইবাদত নয়। এতেকাফকারীদের অবস্থান প্রকাশ্য। আর রোজা প্রকাশ্যে পরিদৃষ্ট হয় না।

ইমাম হাসান বসরী ও জুহুরী বলেছেন, এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ করলে শপথের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু এটা ঐকমত্য যে, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি কামোত্তেজনার বশে স্ত্রীকে স্পর্শ করে কিংবা স্ত্রীকে চুম্বন দেয়— আর তাতে করে যদি রেতপাত হয়ে যায়, তবে এতেকাফ ভেঙে যাবে। রেতপাত না হলে কাজটি হারাম হবে, কিন্তু এতেকাফ ভাঙবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, ভাঙবে। আর যদি স্ত্রী স্পর্শের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা না হয়, তবে তাতে দোষ নেই। যেমন হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এতেকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর পবিত্র মস্তক প্রসারিত করে দিতেন। আমি তাঁর পবিত্র কেশ চিরুনী করে দিতাম। বোখারী, মুসলিম।

মুসলিমের বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে— রসুল স. কেবল প্রকৃতিগত প্রয়োজনে অন্দর মহলে আসতেন।

'মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায়'— একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে এতেকাফ সিদ্ধ নয়। আর মসজিদ অর্থ জামে মসজিদ, ওয়াক্তিয়া মসজিদ নয়। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী—— এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের বিশেষত্ব প্রকাশও এখানে উদ্দেশ্য নয়। হজরত হুজায়ফা বলেছেন, ওই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে এতেকাফ শুদ্ধ হবে না। আতা বলেছেন, কেবল মসজিদে হারামেই এতেকাফ শুদ্ধ। ইবনে মুসাইয়েব বলেছেন, এতেকাফ কেবল মদীনার মসজিদের জন্যই সীমাবদ্ধ। ইমাম মালেক বলেছেন, জামে মসজিদে এতেকাফ জায়েয। ইমাম

শাফেয়ীর একটি মতও অনুরূপ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও শত্রুতামূলক কাজ হচ্ছে, বেদাত। আর ওয়াক্তিয়া মসজিদের এতেকাফও বেদাত। বায়হাকী। হজরত আলী বলেছেন, জামে মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে এতেকাফ শুদ্ধ হবে না। এই উক্তিটি ইবনে আবী শায়বা এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত হুজায়ফা বলেছেন, হে জনতা! জেনে রাখো, আমি এ বিষয়টি উত্তমরূপে অবগত যে, জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে এতেকাফ সিদ্ধ নয়। তিবরানী। ইবনে জাওজী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি, যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্ধারিত রয়েছে, সেই মসজিদে এতেকাফ শুদ্ধ হবে। ইবনে জাওজীর মন্তব্য হচ্ছে, হাদিসটি নিতান্ত দুর্বল। জননী আয়েশা বলেছেন, এতেকাফকারীর জন্য রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অংশগ্রহণ, স্ত্রীস্পর্শ ও সহবাস নিষিদ্ধ। এতেকাফ হতে হবে রোজাবস্থায়। রোজা ব্যতীত এতেকাফ শুদ্ধ নয়। জামে মসজিদ ব্যতীত অন্যত্রও শুদ্ধ নয়। অন্য একটি বর্ণনাতেও রয়েছে একথা।

মাসআলাঃ রমজান মাসের শেষ দশদিন এতেকাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন। পৃথিবী পরিত্যাগ পর্যন্ত তিনি এই আমল করে গিয়েছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীগণও এতেকাফ করতেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, মহানবী স. রমজান মাসের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাসও বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশরাতে এতেকাফ করতেন। কোনো রমজানে করতে না পারলে, পরবর্তী রমজানে করতেন শেষ কুড়ি দিন। তিরমিজি। উবাই বিন কা'ব থেকে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাও এরকম বলেছেন।

আমি বলি, রসুল স. ও তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মাধ্যমে এতেকাফের বিষয়টি অবশ্যই সুসাব্যস্ত। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা তা পরিত্যাগ করেছেন।

নাফে বলেছেন, এতেকাফ সওমে বেসালের (পরস্পরমিলিত রোজার) মতো। তিনি স. এতেকাফ করেছেন। কিন্তু অন্যান্যদের করতে নিষেধ করেছেন। আমার ধারণা এতেকাফ অত্যন্ত কঠিন বলে অধিকাংশ সাহাবা এতেকাফে আগ্রহী হননি। তিনি আরো বলেছেন, আবুবকর বিন আব্দুর রহমান ব্যতীত পূর্ববর্তীদের অন্য কারো কাছ থেকে এতেকাফের প্রমাণ নেই। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, অধিকাংশ সাহাবীর এতেকাফ পরিত্যাগের বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আমি বলি, অধিকাংশ সাহাবী যেহেতু এতেকাফ পরিত্যাগ করেছেন, তাই হানাফীগণের মত হচ্ছে এতেকাফ সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া।

'এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা, সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না'— এখানে 'তিলকা' শব্দটি একটি ইঙ্গিতসূচক শব্দ। শব্দটির মাধ্যমে বর্ণিত বিধানাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— রোজার নিয়ম, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, এতেকাফ ইত্যাদি যা

এতোক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হলো। 'হুদুদুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র সীমারেখা— যে সীমারেখার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। হদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া— নিষেধাজ্ঞার সীমারেখার মাধ্যমে যে বাধা আরোপিত হয়েছে সেই বাধাকে এখানে বলা হয়েছে হুদুদুল্লাহ্।

'এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না'— এ কথার অর্থ, ওই সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের ধারে কাছে যেও না। এরকম বাকভঙ্গি অধিক গুরুত্ববহতাকে প্রকাশ করে (যেমন বলা হয়ে থাকে ওই সব কাজের ফাঁদে পড়ো না)। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এতোদুভয়ের মধ্যবর্তীতে রয়েছে সন্দেহ ও প্রতারণা। অনেকে তা উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ওই সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তাঁরা স্বীয় সম্মান ও ধর্মকে রক্ষা করেছে। আর যারা সন্দিগ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে, তারা নিপতিত হয়েছে নিষিদ্ধতায়। যেমন, যে রাখাল সরকারী চারণ ক্ষেত্রের নিকটে পশুপাল চরায়, সরকারী চারণ ক্ষেত্রে ঢুকে পড়া তার জন্য বিচিত্র কিছু নয়। সাবধান হয়ে যাও। রাজার জন্য নির্দিষ্ট চারণ ক্ষেত্র থাকতেই পারে। সর্বসাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। মনে রেখো, হারাম বিষয়গুলো হচ্ছে আল্লাহ্পাকের সংরক্ষিত চারণ ক্ষেত্র। কাজেই যারা সেই সংরক্ষিত চারণ ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করবে তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে। হারাম কার্য্যের নিকটবর্তী হওয়াও হারাম। তাই আমাদের ইমামগণ বলেছেন, যে সকল কাজ রোজাদারদেরকে সম্ভোগের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে সে সকল কাজ হারাম। যেমন স্ত্রীকে চুম্বন করা, কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা— ইত্যাদি। এসকল কাজ এতেকাফকারীদের জন্যও হারাম। স্পর্শ ও চুম্বনের কারণে যদি রেতপাত হয় তবে রোজা ও এতেকাফ ভেঙে যাবে।

প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনসমূহ মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। মানুষ যাতে সাবধান হয়ে চলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই সুস্পষ্ট বর্ণনা করা আল্লাহ্পাকের রীতি। এরকম কথা বলেই এই আয়াতের ইতি টানা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৮

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

❑ তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায় রূপে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না।

অন্যায়রূপে অর্থ সম্পদ গ্রাস করা অনেক প্রকারে হতে পারে। যেমন ১. কারো সম্পদের উপর মিথ্যা মালিকানা উপস্থাপন করা। ২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। ৩. কারো ন্যায্য দাবী অস্বীকার করে শপথ করা। ৪. অন্যের সম্পদ ছিনতাই, লুট, চুরি বা আত্মসাৎ করা। ৫. নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ যেমন, ব্যভিচারের বিনিময়, সঙ্গীতের বিনিময়, ভাগ্যগণনার পারিশ্রমিক, পশুপ্রজননের বিনিময়, শরিয়তবিরোধী চুক্তির মাধ্যমে উপার্জন, ঘুষ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস তুল্য।

শানে নুজুলঃ একবার রবীয়া বিন আবদান হাজরামী রসুল স. নিকট ইমরাউল কায়েসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। অভিযোগটি হচ্ছে, ইমরাউল কায়েস হাজরামীর একটি জমিন জোর পূর্বক দখল করেছে। রসুল স. হাজরামীকে বললেন, তোমার পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কী? হাজরামী বললেন, না। রসুল স. বললেন, তাহলে ইমরাউল কায়েসের শপথের উপর মীমাংসা হবে। এ কথা শুনে ইমরাউল কায়েস শপথ করতে প্রস্তুত হলো। তিনি স. বললেন, যদি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের লক্ষ্যে মিথ্যা শপথ করো, তবে জেনে রেখো কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উপনিত হবে তাঁর অপ্রসন্ন অবস্থায়। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম।

'বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না' অর্থ, শাসকদের হাতে তুলে দিও না। মুজাহিদ বলেছেন একথার অর্থ, তোমরা পরস্পরের প্রতি অত্যাচারীরূপ ধারণ করে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ো না। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ওই সকল লোক যারা সাক্ষীবিহীন গচ্ছিত সম্পদ মূল মালিককে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হয়। শেষে বিষয়টি বিচারক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানেও তারা মিথ্যা শপথ করে। কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাদের সম্পর্কে। আমি বলি, বর্ণিত সকল ব্যাখ্যাই এই আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। সাধারণভাবে সবগুলো ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

যারা অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করতে চায় তারা জেনে শুনেই এরকম করে। আর বিষয়টি প্রশাসক পর্যন্ত গড়ালে তাঁরা প্রকৃত অবস্থা না জেনেই সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হন। এরকম সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া সম্ভব। এই আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, বিচারক কর্তৃক হারাম বস্তু হালাল হয় না। যেমন হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত হয়েছে-রসুল স. বলেছেন, হে জনতা! আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমরা বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করার জন্য আমার শরণাপন্ন হও। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ চতুর ও বাক্যবাগীশ, উপস্থাপনা-চাতুর্যে অন্যাপেক্ষা অগ্রগামী। আর আমি তো উপস্থাপিত বিবরণের উপরই মীমাংসা করি। কিন্তু তোমাদের উচিত তোমাদের মুসলমান ভাইয়ের ন্যায্য প্রাপ্য যদি তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তবে সেটাকে গ্রহণ না করা। মনে করো, এমতাবস্থায় আমি যেনো তোমাদেরকে এক অগ্নিপিন্ড দিলাম। শাফেয়ী ও মালেক।

বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম সম্পদ অবৈধ ও অপবিত্র। তাঁর এই অভিমতটি অন্য আলেমগণের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আরো বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও বিবাহের চুক্তি অথবা চুক্তিভঙ্গের মীমাংসা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই হয়। জমহুর আলেমগণ ইমামে আজমের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে, একবার দু'জন সাক্ষী হজরত আলীর সম্মুখে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলো যে, এই লোকটির সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। তখন সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যের উপর হজরত আলী বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিলেন এবং মেয়েটিকে তার কথিত স্বামীর হাওয়ালা করে দিলেন। মেয়েটি বললো, আমাদের তো বিয়েই হয়নি। আপনি যদি মনে করেন হয়েছে তবে বিয়ে পড়িয়ে দিন। হজরত আলী বললেন, সাক্ষীগণ তোমাদের বিয়ে সম্পন্ন করেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই বিচারককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এরকম সাক্ষ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত ভুল হলেও বিচারক আল্লাহ্তায়ালার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হবেন না। আর তার সিদ্ধান্ত কার্যকরও হবে। এরকম অবস্থায় অপরাধী হবে মিথ্যা দাবীদার ও মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। ইমাম আবু হানিফার উদ্দেশ্য এটাই। হজরত আলী সাক্ষ্যদাতাগণের সাক্ষ্যের উপরই রায় দিয়েছিলেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৯

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

❐ লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, উহা মানুষ এবং হজ্বের জন্য সময়-নির্দেশক। পশ্চাৎ দিক দিয়া তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই কিন্তু পুণ্য আছে কেহ সাবধান হইয়া চলিলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহ-প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

হজরত মুআজ বিন জাবাল আনসারী ও হজরত সায়লাবা বিন গানাম আনসারী রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এ বিষয়টি আবার কী রকম? একটি ক্ষীণকায় নতুন চাঁদ বাড়তে বাড়তে পূর্ণ চন্দ্র হয়ে যায়। পুনরায় ক্ষয় হতে হতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এরকম হ্রাস বৃদ্ধির কারণ কী? এরকম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বাগবী। আবু নাঈম ও ইবনে

আসাকের সুদ্দীর পদ্ধতিতে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারিখে দামিস্ক। ইবনে আবী হাতেম আওফার সনদে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে রসুল স. এর নিকট জানতে চাইলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে আবী হাতেম আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন— তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রসুল স. এর নিকট চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধির রহস্য জানতে চাইলে আয়াতটি নাজিল হয়।

মানুষ এবং হজের জন্য সময় নির্দেশক— একথার মাধ্যমে প্রশ্নের যথাউত্তর দেয়া হয়েছে। এই জবাবে চাঁদের সৃষ্টিরহস্যের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির কল্যাণকর দিকটির কথা। এরকম জবাব দানের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয়, নিছক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা মানুষের জন্য কল্যাণজনক কিছু নয়। দিন, মাস, বছর গণনা, রোজা ও রমজানের সময় নির্ধারণ এবং হজের মাস চিহ্নিত করার সুবিধার্থে চাঁদের এই বৃদ্ধি ও ক্ষয় ঘটানো হয়। এভাবে ইবাদতের সময় নির্ণয় করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ। তাই কল্যাণদাতা আল্লাহ্ এই জবাবের মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। আয়াতে উল্লেখিত 'মাওয়াকিত' শব্দটি 'মিকৃত' শব্দের বহুবচন। মাওয়াকিত বলে বোঝানো হয়েছে হজ, রোজা, ইদ্দত, ঋণের সময়সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি।

'পশ্চাৎদিক দিয়ে গৃহ-প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই'— এসম্পর্কে হজরত বারা বিন আমের থেকে বোখারী লিখেছেন, মূর্খতার যুগের মানুষেরা হজের এহরাম বেঁধে পিছনের দরোজা দিয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করতো। সাধারণভাবে সারা বছর অপবিত্র শরীরে তারা সদর দরোজা দিয়ে গমনাগমন করতো— তাই মনে করতো, এহরাম অবস্থায় সেই দরোজা দিয়ে যাওয়া আসা অনুচিত। হজরত জাবের থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন— বিশেষ মর্যাদাশীল হওয়ার কারণে কোরাইশদেরকে বলা হতো খুসুস। তারা ছাড়া আরবের অন্যস্থানের লোকেরা প্রধান দরোজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারতো না। এই শ্রেণীবিভাজনের বিরুদ্ধে আয়াতে প্রতিবাদ এসেছে।

একবার রসুল স. এক বাগানে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখান থেকে তিনি সদর দরোজা দিয়ে বের হয়ে আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুতবা বিন আসির আনসারী। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! কুতবা অভিজাত শ্রেণীর নয় অথচ সে আপনার সাথে সদর দরোজা দিয়ে বের হলো। তিনি স. কুতবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন করলে কেনো? কুতবা বললেন, হে অনুকম্পার নবী! আমি আপনাকে যেমন করতে দেখেছি, তেমনই করেছি। তিনি স. বললেন, আমি তো বাতিল দ্বীন থেকে পৃথক। কুতবা বললেন, আপনার ধর্মই আমার ধর্ম। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম জুহুরী এই আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনা করেছেন এরকম— ওমরা পালনকারীরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে এহ্‌রাম বাঁধতেন। তাঁরা মনে করতেন, এহ্‌রাম বাঁধার সময় গৃহের ছাদ বা বৃক্ষের আড়াল থাকা উচিত নয়। এহ্‌রাম বাঁধার পর হঠাৎ যদি গৃহগমনের প্রয়োজন পড়তো তবে তাঁরা গৃহের বহির্দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেন না। ছাদের আড়াল থেকে বেঁচে থাকার জন্যই ছিলো এই চেষ্টা। তাঁরা তখন পেছনের প্রাচীর ভেঙে গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করে গৃহবাসীদের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা সেরে নিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রসুল পাক স. যখন এহ্‌রাম বাঁধলেন তখন তাঁর সাথে সাথে কিছুসংখ্যক আনসারীও এহ্‌রাম বাঁধলেন। এরপর রসুল স. তাঁর হুজরায় প্রবেশ করলেন সদর দরোজা দিয়ে। একজন আনসারীও তাঁর অনুগমন করলেন। তখন অন্য সাহাবীরা আপত্তি তুললেন। এরপর রসুল স. এর প্রশ্নের উত্তরে ওই সাহাবী বললেন, যেটা আপনার দ্বীন, সেটা আমারও দ্বীন। আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই।

'লাইসাল বির্‌রু'(কোনো পুণ্য নাই) — একথাটির সম্পর্ক 'লোকে আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে' এর সঙ্গে। সম্পর্কটি এরকম— সম্ভবতঃ লোকেরা একই সময়ে দু'টি বিষয়ে জানতে চেয়েছিলো। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, জানতে চেয়েছিলো কেবল নতুন চাঁদ সম্পর্কে। তাদের ওই কৌতূহলে কল্যাণ ছিলো না এবং কৌতূহলোদ্দীপনাও ছিলোনা নবুয়তের জ্ঞানের অনুকূল। তাই তাঁদের প্রশ্নের সঙ্গে 'কোনো পুণ্য নেই' বাক্যটি সম্বন্ধিত হয়েছে। আর এভাবে যেনো বলা হয়েছে, নবীর সকাশে যথাযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করা সমীচীন। অযথার্থ বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া গৃহের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার মতোই অযৌক্তিক। জ্ঞানগৃহে প্রবেশের জন্য রয়েছে উন্মুক্ত বহির্দরোজা। আর দরোজা কেবল মাধ্যম বা কারণ মাত্র; মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই কারণের প্রতি মনোনিবদ্ধ না করে মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, যাতে রয়েছে অক্ষয় কল্যাণ। সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে, পশ্চাদ্দিক দিয়ে গৃহপ্রবেশ করাতে পুণ্য নেই। পুণ্য রয়েছে সাবধানতায়। অতএব, স্রষ্টার নৈকট্যার্জনের উপায় সম্পর্কে জানতে চাওয়া উচিত। তাঁর সৃষ্ট কারণ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় আগ্রহকে প্রশ্রয়দান করা অর্বাচীন- জনোচিত। সুতরাং সাবধান।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি ওয়াহেদীর মাধ্যমে আবু সালেহের বর্ণনায় এসেছে এরকম— হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে লিখিত ছিলো, এবার নয় আগামীবারে রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দকে নিয়ে হজ করতে পারবেন। তাই রসুল স.কে ফিরে যেতে হলো। দেখতে দেখতে কেটে গেলো একটি বছর। এসে পড়লো হজের মরশুম। তিনি স. তাঁর সহচরগণকে নিয়ে মক্কাভিমুখে চললেন। সকলে এহ্‌রাম বেঁধে নিলেন। অবিশ্বাসীরা এবারও বাধা সৃষ্টি করবে— এরকম আশংকা তখন পর্যন্ত সকলের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো। যদি সেরকম কিছু হয়, তবে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এহ্‌রাম অবস্থায় যুদ্ধ হবে কী করে? এসকল

চিন্তা সকলের অন্তরকে অশান্ত করে তুলছিলো। তাঁদের এই অস্বস্তি দূর করার উদ্দেশ্যে তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ○

❒ যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহের পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিও না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।

❒ যেখানে তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বহিস্কার করিবে। ফিত্না হত্যা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে, ইহাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

❒ যদি তাহারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিত্না দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে সীমালঙ্ঘনকারীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না।

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে'— একথার অর্থ যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'সীমালঙ্ঘন কোরো না' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, ধর্মযাজক এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধদের বিরুদ্ধে লড়াই কোরো না। অভিযানে প্রেরিত সেনাদলকে রসুল পাক স. এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করতেন,

আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করো। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি অবিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু সীমাতিক্রম কোরো না, অঙ্গিকার ভঙ্গ কোরো না। রমণী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা কোরো না। বাগবী। মুসলিমের বর্ণনায় এই হাদিসটির সঙ্গে সংযোজিত রয়েছে একথাগুলো— নাক কান কেটো না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হত্যা কোরো না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. সৈন্য প্রেরণকালে বলতেন, আল্লাহ্‌র নামের উপর এবং আল্লাহ্‌র রসুলের দ্বীনের উপর যুদ্ধযাত্রা করো। বৃদ্ধ, শিশু ও ললনাকুলকে হত্যা কোরো না। গণিমত আত্মসাৎ কোরো না। গণিমতকে একত্রিত কোরো। সংযমী হয়ো। অনুকম্পাশীল হয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ্ পুণ্যবানদের বন্ধু। আবু দাউদ। বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে বুঝা যায়, আয়াতটি রহিতও নয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদেরও এই মত। কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্ পাক তাঁর রসুলকে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর হিজরতের পর এ আয়াতটির মাধ্যমে। হজরত রবী বলেছেন, এ আয়াতটি প্রথম জেহাদ সম্পর্কিত আয়াত। এরপর নাজিল হয়েছে, 'মুশরিকদেরকে হত্যা করো।' তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করুক বা না করুক।' এ নির্দেশের প্রেক্ষাপটে 'সীমালঙ্ঘন কোরো না' কথাটির অর্থ হবে, তোমরা লড়াইয়ের সূচনা কোরো না। এমতাবস্থায় 'আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না'— একথার অর্থ হবে সীমাতিক্রমের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের সমর্থন নেই। 'তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো'— এ সম্পর্কে হজরত মুকাতিল এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, এ আয়াতটি রহিত হয়েছে ওই আয়াত দ্বারা যেখানে বলা হয়েছে, মসজিদে হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কোরো না।

আমি বলি, এ নির্দেশটি রহিত হয়নি। বরং সুনির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ রহিতকারী বাক্যটি এ বাক্যটির সঙ্গে সম্মিলিত। এরকম সম্মিলিত বাক্য একে অপরকে রহিত করে না। যেমন একস্থানে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ পাক ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' এখানে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ দু'টি বিষয়ই সুস্পষ্ট এবং একটি অপরটিকে রহিত করেনি। রহিতকারী আয়াত সবসময় পৃথক রূপে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং 'যেখানে পাবে হত্যা করবে'— একথাটির অর্থ যেখানে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। এ সক্ষমতাকে এখানে 'সাক্বিফতুম' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সক্বফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হবে কোনো বস্তু অতিদ্রুত ও উত্তমরূপে অর্জন করা- জ্ঞানগত কিংবা কর্মগত যে বিষয়ই হোক না কেনো।

'যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে, সেস্থান থেকে তোমরা তাদেরকে বহিষ্কার করো'-একথার অর্থ, তারা তোমাদেরকে মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে বহিষ্কার করেছিলো সেই মক্কা আজ বিজিত। সুতরাং তোমরাও এখন তাদেরকে

বহিষ্কার করো। এরকমই করা হয়েছিলো। মক্কাবিজয়ের পরও যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি কার্যকর করা হয়েছিলো এই নির্দেশ।

'ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর'— এখানে ফেৎনা অর্থ আল্লাহ্‌পাকের অংশী নির্ধারণ, বিশ্বাসীদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা প্রদান। ফেৎনা আল্লাহ্‌পাকের বিবেচনায় মহা অপরাধ। এই মহাঅপরাধটিকে এখানে 'আশাদ্দু' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আর এখানে হত্যা অর্থ হচ্ছে, মুসলমানেরা যে হত্যা করে। অবিশ্বাসীদেরকে হত্যার এই নির্দেশ মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে কিছুক্ষণের জন্য বৈধ করা হয়েছিলো। ইবনে জারীর, মুজাহিদ, জুহাক, কাতাদা, রবী এবং ইবনে জায়েদ এরকম বলেছেন।

'মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে। যদি তারা এরকম করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে।' একথার অর্থ অবিশ্বাসীরা যদি হেরেম শরীফে যুদ্ধের সূচনা করে তবে তোমরাও যুদ্ধ কোরো। ক্বারী হামজা ও কাসায়ীর উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে এখানে যুদ্ধের স্থলে হত্যা শব্দটি বলবৎ হবে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— — তোমরা অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা কোরো না যদি না তারা তোমাদেরকে হত্যা করে। আরববাসীরা বলে থাকে, 'ক্বতল্‌না বনু ফুলান' (আমাদেরকে ওমুক গোত্র হত্যা করেছে)। একথার প্রকৃত অর্থ, অমুক গোত্রের লোক আমাদের কতিপয় লোককে হত্যা করেছে।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, বিধানটি ছিলো ইসলামের প্রাথমিক সময়ের। তখন মক্কা নগরীতে যুদ্ধের অনুমতি ছিলো না। পরে এই বিধানটি রহিত হয়। রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে, এমনভাবে যুদ্ধ করো যেনো ফেৎনা উচ্ছেদ হয়। কাতাদা এরকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, বিধানটি সুরা তওবার আয়াতে সাইফ বা তরবারীর আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। বরং বিধানটি অদ্যাবধি কার্যকর। হেরেম শরীফে যুদ্ধ করা এখনো হারাম। মুজাহিদ এবং আরো অনেক আলেম এই মতের প্রবক্তা। আর এই মতের সমর্থনে রয়েছে বোখারী, মুসলিম বর্ণিত হাদিস। যেমন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এই নগরীকে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মর্যাদামন্ডিত করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। আমার পূর্বে কাউকে এখানে যুদ্ধ বিগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়নি। আমার জন্য অনুমতি রয়েছে কেবল দিবসের একঘন্টাকাল। পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। এখানকার ঘাস পাতা গুল্মলতা কর্তন করা যাবে না। আশ্রিত শিকারকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, মক্কা শরীফে অস্ত্র উত্তোলন হালাল নয়।

'এটাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম'— একথার অর্থ হত্যাই অবিশ্বাসীদের প্রকৃষ্ট শাস্তি।

'যদি তারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'— এই বাক্যটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, যদি অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে এবং সমরপ্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ্পাক তাদের অতীতের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি প্রদর্শন করবেন অশেষ করুণা।

'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতোক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়'। ফেৎনা অর্থ শিরক ও ফাসাদ। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ, অংশীবাদীতাহীন ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আমাকে ওই সময় পর্যন্ত সমরাভিযান চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না মানুষ বলে, আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ স. তাঁর রসুল এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয়। যখন মানুষ এরকম করবে তখন তাঁদের জীবন ও সম্পদ থাকবে আমার তত্ত্বাবধানে। আর তার হিসাবের দায়িত্ব থাকবে আল্লাহ্পাকের অধিকারে। বাগবী বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পৌত্তলিকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে হবে। যদি তারা এই আহবানে সাড়া না দেয় তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আমি বলি, একথা ঠিক নয়। কারণ, পৌত্তলিকতা, অগ্নিউপাসনা, ইহুদীবাদ— এসকলকিছুই কুফরীর অন্তর্ভূত। আল্লাহ্পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। পৌত্তলিকতা থেকে যেমন ফেতনার উদ্ভব হয় তেমনই ফেৎনা উদ্ভাবিত হয় ইহুদীবাদ ও অগ্নিউপাসনা থেকে। তারা সকলেই অবিশ্বাসী। তারা যদি ইমান গ্রহণ করে ও অনুগত হয়, তবে ফেৎনা দূর হয়ে যাবে। যদি না হয়, তবে তাদেরকে জিজিয়া দিতে সম্মত হতে হবে। জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হলেও ফেৎনা উচ্ছেদ হয়ে যায়। তাই অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'হাত্তা ইয়া'তুল জিজিয়াতা' (যতক্ষণ না তারা জিজিয়া প্রদান করে)। এই আয়াত দ্বারা জিজিয়ার বিধান বলবৎ হয়েছে ইহুদী, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিক— সকলের উপর। ইমাম আবু হানিফা একথা বলেছেন। অন্য ইমামগণ এই অভিমতটির পোষণকারী নন। আল্লাহ্ চান তো সুরা তওবার ব্যাখ্যায় জিজিয়ার আলোচনা করা হবে। যদি তারা বিরত হয়-একথার অর্থ যদি তারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে, অংশীবাদীতা ছেড়ে ইমানকে আশ্রয় করে, অথবা জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হয়। এরকম করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, তাদেরকে বন্দী করা যাবে না, তাদের সম্পদও ছিনিয়ে নেয়া যাবে না।

'সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না'— একথার অর্থ, যারা ইমান, আনুগত্য কিংবা জিজিয়া— কোনোটাতেই সম্মত হবে না— তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ হবে। তাদেরকে বন্দী করা যাবে, হত্যা করা যাবে এবং তাদের সম্পদও ছিনিয়ে নেয়া যাবে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্

ইবনে আব্বাস। অথবা বলা যায় যে, যারা আক্রমণকারী তাদেরকে আক্রমণ করা বৈধ। তাই নির্দেশ করা হয়েছে, তারা যেমন তোমাদের উপর সীমাতিক্রম করেছে তোমরাও তেমনি করো।

আমি বলি, আয়াতের এরকম অর্থ হতে পারে যে, সীমালংঘনকারীরাই সীমাতিক্রমের অপরাধে অপরাধী। অবিশ্বাসী ও যুদ্ধ থেকে বিরতদেরকে যারা আক্রমণ করবে তারাও সীমালংঘনকারী। এই ব্যাখ্যাটি পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত। হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ বলেছেন, একবার আমি রসুল আকদাস স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যদি এরকম হয়, আমি কোনো কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধরত- সে তার তরবারীর আঘাতে আমার একটি হস্ত ছেদনের পর কোনো বৃক্ষের আড়ালে আত্মরক্ষা করলো। আমি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম। সে চিৎকার করে বললো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এমতাবস্থায় আমি কি তাকে হত্যা করতে পারবো? তিনি স. বললেন, না। ধরো তুমি ওকে হত্যাই করলে। হত্যার পূর্বে তুমি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলে তখন সে-ই ওই মর্যাদার অধিকারী। আর হত্যার পরে তোমার অবস্থা হবে ওরকম, যেরকম অবস্থায় সে ছিলো (কলেমা পাঠের পূর্বে)। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন— রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কাভিমুখে চললেন। সঙ্গে ছিলো তাঁদের অনেক কোরবানীর পশু। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। সেখানে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলো। চুক্তির শর্ত অনুসারে তাঁকে স. মদীনায় ফিরে যেতে হলো। পরের বছর (হিজরী সপ্তম বর্ষে) তিনি স. ওমরা আদায় করতে সক্ষম হলেন। মক্কায় অবস্থান করলেন তিন দিন। আগের বছর রসুল স. কে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিলো মুশরিকেরা। সেই ঘটনাটি নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। এই প্রসঙ্গটি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৪

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

❒ পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যাহার অবমাননা নিষিদ্ধ তাহার জন্য কিসাস। সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সহিত থাকেন।

'শাহ্রুল হারাম' অর্থ পবিত্র বা সম্মানিত মাস। কথাটি এখানে দু'বার উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম উল্লেখের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সপ্তম হিজরীর জিলক্বদ মাসকে। এবং দ্বিতীয় উল্লেখের মাধ্যমে বলা হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসের কথা যে মাসে মুশরিকেরা তাঁর স. এবং তাঁর বাহিনীর পথরোধ করেছিলো। এখানে 'কিসাস' শব্দটির অর্থ সমতা। কথাটির উদ্দেশ্য সম্মানিত বিষয়ের উভয়দিকের সাম্য রক্ষা করতে হবে। ষষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তির শর্তানুযায়ী রসুল স. মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন। পরের বৎসর ওমরা করতে কোনো বাধা ছিলো না। তাই তিনি ওমরা সম্পাদনার্থে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তখন তাঁর সহচরবৃন্দ আশংকা করলেন মুশরিকেরা যদি আবার পথরোধ করে দাঁড়ায়; কৃত অঙ্গীকার যদি ভঙ্গ করে, তখন যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু এহ্রাম অবস্থায় যুদ্ধ করা হারাম। আর এই জিলক্বদ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহও হারাম। তদুপরি মসজিদে হারামের দিকেই চলেছে এই অভিযাত্রা। যুদ্ধ যদি বেঁধেই যায় তবে কী উপায় হবে, তাঁদের এই চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁর স্বতঃসিদ্ধ বিধান প্রকাশ করে দিচ্ছেন এভাবে—'আশ্শাহ্রুল হারাম বিশ্ শাহ্রিল হারাম।' অর্থাৎ 'হে মুসলিম বাহিনী! মুশরিকেরা যদি সম্মানিত মাসের সম্মান রক্ষা না করে যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে তোমরাও যুদ্ধ শুরু করো। এটাই সমতা। এটাই তাদের অপকর্মের উপযুক্ত জবাব।

'যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে'- একথার অর্থ, তারা যতোটুকু সীমাতিক্রম করবে ততোটুকু সীমাতিক্রমের অধিকার রয়েছে তোমাদেরও। সম্মানিত মাস, সম্মানিত স্থান এবং এহ্রামের তোয়াক্কা যদি তারা না করে; তবে তোমরাও তাদের তোয়াক্কা না করে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিও।

'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো'- এ কথার অর্থ যে বিষয়ে তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি সে বিষয়ে লিপ্ত হয়ো না। তোমাদের সীমতিক্রম যেনো তাদের সীমাতিক্রম অপেক্ষা অতিরিক্ত না হয়। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো। অতিরিক্ততায় লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক হও।

'আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে'- একথার অর্থ, আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য মুত্তাকী বা সাবধানীদের সঙ্গে রয়েছে (আল্লাহ্পাক স্বয়ং কারো সঙ্গী নন। এরকম হওয়া অসম্ভবও। কারণ তিনি আকার ও প্রকার বিহীন)।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

❒ এবং আল্লাহের পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না। তোমরা সৎকার্য কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।

'সাবিলিল্লাহ্' অর্থ জেহাদ। এখানে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো, একথা বলে জেহাদের জন্য সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখিত 'বি আইদিকুম' শব্দের 'বা' অব্যয়টি অতিরিক্ত। অনেকে বলেছেন, এখানে প্রকৃত কথাটি হবে এরকম— 'ওয়ালা তুলক্কু আনফুসাকুম বি আইদিকুম।' অর্থাৎ নিজের প্রাণকে নিজ হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না। এখানে 'ইলক্বা' শব্দটিকে 'ইলা' অব্যয় দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। ইলক্বা হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের নিক্ষেপণ। আরববাসীরা নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকারক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে পড়লে বলে, 'উলকিয়া বি ইয়াদিহ্।' ধ্বংস বোঝাতে এখানে 'তাহ্লুকাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাহ্লুকাত ও হালাক সমার্থক। কেউ কেউ বলেছেন, যে কাজের পরিণতি অত্যন্ত ক্ষতিকর তাকে বলে তাহ্লুকাত। আবার কেউ বলেছেন, যে ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব সেটাই তাহলুকাত। এবং যে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় সেটা হালাক।

হজরত হুজায়ফা থেকে বোখারী বর্ণনা করেন- এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জেহাদে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের(আনসারীদের) উদ্দেশ্যে। ঘটনাটি হলো- আল্লাহ্পাক যখন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন সত্য ধর্মের শক্তিমত্তাকে। তখন আমাদের মধ্যে এরকম বলাবলি হতে লাগলো যে, ইসলাম এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই জেহাদ নিষ্প্রয়োজন। জেহাদের জন্য এতোদিনে আমাদের অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। এখন সময় এসেছে ঘাটতি পূরণের। পরিবার পরিজনের জন্য কিছু সঞ্চয়েরও তো প্রয়োজন। এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি। এখানে তাহ্লুকাত অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ, ঘাটতি পূরণ এবং জেহাদে অর্থ ব্যয়ে অনিচ্ছা।

আমি বলি, আয়াতটির মর্ম এরকম— হে মুসলিমবৃন্দ! জেহাদ পরিত্যাগ করলে শত্রুরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠবে। পুনরাক্রমণ করতে সচেষ্ট হবে। তখন

তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু আইয়ুব আনসারী পুনরায় জেহাদে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। পরিশেষে এক জেহাদের প্রান্তরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সমাহিত হলেন ইস্তাম্বুলে। ইস্তাম্বুলবাসীরা তাঁর অসিলা ধরে আল্লাহ্পাকের নিকট বৃষ্টিপ্রার্থী হতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ ছাড়া অথবা অন্তরে জেহাদের স্পৃহা না নিয়েই মৃত্যুবরণ করলো, মনে করতে হবে তার মৃত্যু হলো নিফাকের (কপটতার) একটি শাখায়।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, আয়াতটি কৃপণ ও জেহাদে ব্যয় করতে অনীহদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই মতের সমর্থনে রয়েছেন- হজরত হুজায়ফা, হাসান, ইকরামা, আতা এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। আবু জুরায়রা বিন জুহাক এর বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন,সাহাবাগণ আল্লাহ্র পথে যথেষ্ট ব্যয় করতেন। ফকির মিসকিনদের দান করতেন। হঠাৎ দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। তখন তাঁদের দানের হাত সংকুচিত হলো। আর ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো এ আয়াত। মোহাম্মদ বিন সিরিন এবং উবাইদা সালমানী বলেছেন, ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ আল্লাহ্ পাকের করুণা থেকে নিরাশ হওয়া। আবু কেলাবা বলেছেন, হজরত নোমান বিন বশীরের বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— মানুষের অবস্থা এরকম হলো, কোনো পাপকার্য অকস্মাৎ সংঘটিত হলেই সকলে বলাবলি করতেন, আল্লাহ্পাক আমাকে আর ক্ষমা করবেন না। তখনই এই আয়াতটি নাজিল হয়। হজরত বারা বিন আজিব থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

'সৎকাজ করো, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন'- একথার অর্থ, তোমরা কর্ম ও স্বভাবের সংস্কার করো। সৎকর্মে সমর্পিত হও। অভাবীদের অভাব মেটাও। ইবাদতের মধ্যেও রয়েছে সৌন্দর্য। আবার সৌন্দর্য রয়েছে ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনেও। ইবাদতের সৌন্দর্য সম্পর্কে রয়েছে দীর্ঘ একটি হাদিস, যা হাদিসে জিব্রাইল নামে খ্যাত। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত ওই হাদিসের একাংশে রয়েছে, হজরত জিব্রাইল রসুল স. এর নিকট জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সৌন্দর্য (এহসান) কী? তিনি স. বললেন, এমনভাবে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করো যেনো তোমরা তাঁকে দেখছো। আর যদি এরকম করতে সক্ষম না হও তবে মনে রেখো, তিনিতো তোমাদেরকে দেখছেন। একথার তাৎপর্য হচ্ছে, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রচিত্ততা সহ নামাজ আদায় করো। এরকম নামাজই সৌন্দর্যমন্ডিত নামাজ। আর ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন, তোমরা নিজের জন্য যা উত্তম মনে করো, অপরের জন্যও তেমনটি করো। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করো, অপরের জন্যও তা অপছন্দনীয় মনে করো। হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। তিনি স. আরো বলেছেন, সেই প্রকৃত মুসলমান যার হস্ত ও রসনা থেকে অন্যেরা নিরাপদ। সুনান রচয়িতাগণ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হজরত আমর বিন

আম্বাসা থেকে ইমাম আহমদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়ভাজন, যার চরিত্র সুন্দর। তিনি স. আরও এরশাদ করেন, আল্লাহ্পাক সকল কার্যাবলীর সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই তোমাদের হত্যাকান্ডেও যেনো সৌন্দর্যচেতনা জাগ্রত থাকে (যেনো নাক কান কাটা না হয়, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও নারী হত্যা করা না হয়)। পশু জবাই করার ব্যাপারেও সৌন্দর্যের দাবী পূরণ কোরো। ছুরিটাকে করো সুশানিত যাতে করে জবাইয়ের সময় পশুকে অতিরিক্ত ক্লেশ দেয়া না হয়। হজরত শাদ্দাদ বিন আউস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৬

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَ
لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا
اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ
اَمِنْتُمْ ۟ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

❒ তোমরা আল্লাহের উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুন্ডন করিওনা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদ্য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে ওমরা দ্বারা লাভবান হইতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করিবে। কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্বের সময় তিন দিন এবং গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য যাহাদের পরিজনবর্গ মস্জিদুল হারামের বাসিন্দা নহে।

আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মন্দকাজের প্রতিফল দানে কঠোর।

'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো'—এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, হজ ও ওমরার সকল অনুষ্ঠান ওয়াজিব। ঐকমত্য এই যে, হজ ফরজে আইন— যা কস্মিনকালেও রহিতযোগ্য নয়। হজ ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ। আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র গৃহের হজ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ফরজ, যাদের পাথেয় রয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাঁচটি স্তম্ভের উপরে ইসলামের ভিত্তি।১. এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ স. তাঁর রসুল। ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা। ৩. জাকাত সম্পাদন। ৪. হজ প্রতিপালন। ৫. রমজান মাসের রোজা পালন। বোখারী, মুসলিম। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। আর ওমরা ওয়াজিব- এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর নিকটও ওমরা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা থেকেও ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, ওমরা সুন্নত। ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ অভিমতও এরকম। অন্য বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ীও ওমরাকে সুন্নত বলেছেন বলে কথিত আছে। যারা ওমরা সুন্নত হওয়ার সমর্থক তাঁদের নিকট আয়াতটির ব্যাখ্যা এরকম— ওমরা শুরু করার পর শেষ করা ওয়াজিব। হজের নিয়মও এমনই। ইমাম আহমদের মাজহাবের পোষকতায় রয়েছে আলকামা এবং নাখয়ী এর উচ্চারণবিধি (ক্বেরাত) 'ওয়াআতিম্‌মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা লিল্লাহ্।' হজরত আলীর ক্বেরাতও এরকম। ওমরা যে ওয়াজিব তা আরো অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হাদিসে জিব্‌রাইলে রয়েছে— হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! ইসলাম কী? তিনি স. এরশাদ করলেন, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ তাঁর রসুল। আর নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত পরিশোধ করা, হজ ও ওমরা সম্পাদন করা, অপবিত্র হলে অজু বা গোছল করা এবং রমজান মাসে রোজা রাখা। বোখারী ও মুসলিমে অবশ্য রোজার উল্লেখ নেই তবে শক্তিশালী সনদসম্ভূত অন্যান্য বর্ণনায় ওমরার কথা এসেছে।

ওই বর্ণনাগুলোকে ইমাম দারা কুতনী বিশুদ্ধ বলেছেন। আর আবুবকর তাঁর জুমায়া গ্রন্থে বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলো গৃহীতও হয়েছে। হজরত আয়েশা প্রশ্ন করেছিলেন, হে প্রিয় নবী! জেহাদ কি মেয়েদের উপরে ফরজ? তিনি স. বলেছিলেন, যাতে হত্যা নেই সেই জেহাদই রমণীদের জন্য বিধিবদ্ধ। সেই জেহাদ হচ্ছে হজ ও ওমরা। ইবনে মাজা। সাহাবায়ে কেরামের আসার থেকেও প্রতিপন্ন হয় যে, ওমরা ওয়াজিব। হজরত উবাই বিন মা'বাদ হজরত ওমরের নিকট নিবেদন করলেন, আমি হজ ও ওমরা উভয়টির জন্য এহরাম বেঁধেছি। হজরত ওমর বললেন, তোমাকে রসুল স. এর আদর্শের উপরে চলার তওফিক দান করা হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, এমন কোনো সমর্থ ব্যক্তি নেই যার উপর হজ ও ওমরা ওয়াজিব নয়।এই বর্ণনাটি এনেছেন ইবনে খুজাইমা, দারা কুতনী, হাকেম। বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম বোখারী হাদিসটি তালিক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো রয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের আসার, যার বর্ণনাকারী ইমাম শাফেয়ী। ইমাম বোখারীও আসারটি তালিক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দলিল হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক ওই বর্ণনাটি যেখানে বলা হয়েছে— এক বেদুঈন রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে বলুন ওমরা ওয়াজিব কিনা।' তিনি স. বললেন, ওয়াজিব নয়। তবে তুমি যদি ইচ্ছে করে আদায় করো তবে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। তিরমিজি, আহমদ, বায়হাকী। কিন্তু হাদিসটির বর্ণনাকারীদের একজন হাজ্জাজ বিন আরতাত অযোগ্য ও পরিত্যক্ত। ইবনে মাহ্দী, আত্তান, হুয়াই ইবনে মুঈন, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মোবারক এবং নাসাঈ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তবে ইমাম জাহাবী তাঁকে সত্য বলে মেনেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান, সহীহ্। এ হাদিসটিই বায়হাকী বর্ণনা করেছেন অন্য এক বর্ণনাসূত্রে। সেই সূত্রভূত ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুবকে দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন আহমদ। আবু হাতেম বলেছেন, তাঁর বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।

আমি বলি, হজরত জাবের থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে- হজ এবং ওমরা উভয়ই ফরজ। ইবনে লেহিয়ার পদ্ধতিতে ইবনে আদী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে লেহিয়া বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের জন্য যাত্রা করলো, সে হজের সওয়াব পাবে। আর যে নফল নামাজের জন্য রওয়ানা করলো, সে পাবে ওমরার সওয়াব। ইয়াহ্ইয়া বিন হারিস এর পদ্ধতিতে বর্ণনাটি এনেছেন তিবরানী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে কানেয় বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হজ জেহাদতুল্য এবং ওমরা নফল স্বরূপ। আবু সালেহ্ হানাফীয়া থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শাফেয়ী। এ প্রসঙ্গে হজরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। দারা কুতনী বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন কানেয় স্মৃতিবিভ্রমতা দোষে দুষ্ট। আর ইবনে হাজাম আবু সালেহ্ হানাফিয়াকে বলেছেন জয়ীফ (দুর্বল)। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, তাঁকে জয়ীফ বলা ঠিক নয়। ইবনে মুঈন বলেছেন, আবু সালেহ্ হানাফিয়া নির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসগণের বড় একটি দল তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। হজরত তালহা থেকে বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী আজর বিন কায়েসকে জয়ীফ বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে অনেক অখ্যাত বর্ণনাকারী। আর ওমরা

যে ওয়াজিব নয় সে সম্পর্কে অনেক আসার রয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজ ফরজ আর ওমরা নফল। ইবনে আবী শায়বা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুসরণ জরুরী। এ পর্যন্ত বর্ণিত হাদিস ও আসার সমূহের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ দৃষ্ট হয়। তাই ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এরকম দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়কে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায় না। হেদায়া রচয়িতা বলেছেন, বিরোধপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে ফরজ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর উক্তি যুক্তিসঙ্গত। কেনোনা ফরজের জন্য থাকতে হবে অকাট্য প্রমাণ। তাই বিষয়টিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করাই উত্তম।

জমহুর ওলামার অভিমত হচ্ছে— হজকে ওমরা দ্বারা বাতিল করা সিদ্ধ নয়। 'আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা'— এই বাক্যটিই তাঁদের দলিল। ইমাম আহমদ বলেছেন, হজকে ওমরার দ্বারা বাতিল করা যাবে। তাঁর দলিল হচ্ছে— বিদায় হজের সময় সাহাবাগণের এহ্রাম ছিলো হজের। তখন রসুল পাক স. তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন তোমরা হজকে ওমরাতে পরিণত করো। পুনরায় বললেন, তোমরা হজের এহ্রামকে ওমরার এহ্রামে পরিণত করো। কিন্তু কোরবানী নির্বাচন করলে তা বাতিল কোরো না। এরকম দশটি হাদিস জমহুর আলেমগণের সমর্থনে রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি সন্দেহাতীত বলে গণ্য করা যায়। হাদিসগুলোর মধ্যে একটি এরকম— হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, রসুল পাক স. আমাকে ইয়েমেনে বসবাসরত আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলেন। নির্দেশানুযায়ী আমি সেখানে গেলাম। ফিরে এসে আমি রসুল পাক স. কে পেলাম বুত্হা নামক স্থানে। তিনি স. বললেন, তুমি কিসের নিয়ত করেছো? আমি বললাম, আপনার যা নিয়ত আমারও সেই নিয়ত। তিনি বললেন, তোমার নিকট কি কোরবানীর পশু আছে? আমি বললাম, না। এরপর আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করে এহ্রাম থেকে মুক্ত হলাম। এরপর এলো তাল্বিয়ার দিবস। তখন হজের এহ্রাম বাঁধলাম। হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময়ে বলেছেন, আমরা আল্লাহ্পাকের কিতাবের উপর আমল করবো। আল্লাহ্পাক বলেছেন—'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো।' আর আমরা রসুল পাক স. এর সুন্নতের উপর আমল করি। তিনি স. কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত এহ্রাম পরিত্যাগ করেননি। হজরত জাবের বলেছেন, সকল সাহাবী কেবল হজের এহ্রাম বেঁধেছেন। রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ শেষ করে এহ্রাম খুলে ফেলো, কেশ কর্তন করো এবং সময়াতিপাত করতে থাকো এহ্রামবিহীন অবস্থায়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজকে ওমরায় পরিবর্তিত করো। জননী হাফসা থেকে জননী আয়েশা এ বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেগুলোতে যে কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- আমরা বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মতো এহ্রাম মুক্ত হননি কেনো? তিনি স. বললেন, আমি

কোরবানীর পশু নির্বাচন করেছি। তাই কোরবানী না করা পর্যন্ত এহ্রাম মুক্ত হবো না। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে ওমর থেকেও। সবগুলো বর্ণনাই লিপিবদ্ধ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা হজযাত্রা করলাম। সকলে লাব্বাইক লাব্বাইক উচ্চারণ করে যাচ্ছিলাম— যখন আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ শেষ করলাম তখন তিনি স. বললেন, ওমরা আদায় করো। কিন্তু যারা কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছে তারা আপনাপন অবস্থার (এহ্রাম অবস্থার) উপরই থাকবে। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল সঃ এরশাদ করেন— আমার সঙ্গে কোরবানীর পশু না থাকলে আমিও এহ্রাম মুক্ত হতাম। হজরত বারা বিন আজিব এবং রবি বিন ছুবরাহ্ থেকেও এরকম অনেক বর্ণনা এসেছে। আমি সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছি মৎপ্রণীত মানারুল আহ্কাম পুস্তকে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে কোরআনের দলিল অকাট্য। আর কোরআনে বলা হয়েছে—'আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা'(তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো)। এই অকাট্য দলিল খবরে আহাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা কীভাবে বৈধ হবে? উত্তরে আমি বলতে চাই, এই প্রসঙ্গের হাদিসগুলোর সংখ্যা এতোবেশী যে, সেগুলোকে কোনোক্রমেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। 'তোমরা হজ ও ওমরা পূর্ণ করো' এই বাক্যটি একটি সাধারণ নির্দেশ এবং পরে উল্লেখিত 'তোমরা যদি বাধা প্রাপ্ত হও' বাক্যটি বিশেষ অবস্থা জ্ঞাপক। এভাবে সাধারণ নির্দেশের মধ্যে বিশেষ অবস্থাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিষয়টির সমাধান এভাবেও দেয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাকের সাধারণ নির্দেশের মধ্যে রসুল স. ওই সকল লোকের জন্য বিধানটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাদের হজ বাতিল হয়েছে- তাদের জন্যই রয়েছে হজ থেকে ওমরার অনুষ্ঠানগুলোকে পৃথক করার অনুমতি।

জমহুর আলেমগণ ইমাম আহমদের দলিল সমূহের জবাব দিয়েছেন এভাবে— বর্ণিত হাদিসগুলোর দ্বারা হজ বাতিল হওয়ার ব্যাপারটা কেবল সাহাবাগণের জন্যই নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্টকরণের প্রমাণ হচ্ছে— হজরত বেলাল বিন হারিস রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হজ বাতিল করার বিষয়টি কি কেবল আমাদের প্রতি প্রযোজ্য না সকলের জন্য? তিনি স. বললেন, শুধু আমাদের জন্য। আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত ওমর বলেছেন, হজ ও ওমরাকে পৃথক করো। হজ করো হজের মাসে এবং ওমরা করো অন্য সময়ে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হজরত ওমর উত্তম নিয়মটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, আবদুল আজীজ বিন মোহাম্মদ দারাওয়ারদি ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদিসটি বর্ণনা করেননি। আবু হাতেম বলেছেন, হাদিসটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমদ বলেছেন, হজ বাতিল করার নিয়ম যে কেবল সাহাবাগণের জন্যই নির্দিষ্ট — এরকম কোনো সহীহ্ হাদিস নেই। আমি বলি, হজরত ওমর বলেছেন, রসুল স. এর সময়ে দু'টি মাত্আ প্রচলিত ছিলো (একটি

হজের মাতাআ। অর্থাৎ ওমরা দ্বারা হজকে বাতিল করা। দ্বিতীয়টি নিকাহে মাতাআ— যা সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম)। আমি দু'টিকেই হারাম জানি। হজরত ওমরের সিদ্ধান্ত দ্বারা পূর্বোল্লিখিত হাদিসগুলো অকার্যকর হয়ে যায়। হজরত ওমরের বর্ণিত বক্তব্যটি না পাওয়া গেলে কেবল বেলালের হাদিস দ্বারা ওই সকল হাদিসের কার্যকারিতা রোধ করা যেতো না। কারণ, হজরত বেলালের হাদিসে রয়েছে দূর্বলতা। এক ব্যক্তি হজরত ওসমানের নিকট হজের মাতাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, ওটা তোমাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য। আবু দাউদ। ওমরার দ্বারা হজের বাতিল হওয়ার নিয়মটি কেবল সাহাবাগণের জন্য নির্ধারিত— এ কথাটি যদি হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের নিকট সুসাব্যস্ত না হতো, তবে তাঁরা রসুল স. এর নির্দেশের বিরুদ্ধে বলতেন না। স্মর্তব্য যে, হজে তামাত্তু একটি পৃথক বিষয়, যা কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। হজে তামাত্তু শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হজরত দ্ববী বিন মা'বাদ একই সঙ্গে হজ ও ওমরার এহরাম বেঁধেছিলেন। হজরত ওমর তাই বলেছিলেন, তোমাকে তোমার নবীর সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দেয়া হয়েছে। আবু দাউদ।

একব্যক্তি হজের নিয়ত করেছিলেন। অতঃপর ওমরার দ্বারা তা বাতিল করে দেন। এটা জানতে পেরে হজরত আবু জর বলেছিলেন, এরকম ব্যবস্থা কেবল রসুল স. এর সহচরদের জন্য সিদ্ধ। হজরত আবু জরের এই উক্তি ইতোপূর্বে বর্ণিত বেলাল বিন হারিসের বর্ণনার পোষকতা করে। হজরত আবু জরের উক্তি সম্পর্কে ইবনে জাওজী বলেছেন, এটি এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা যাঁর সঙ্গে হজরত আবু জরের সাক্ষাত হয়নি। আমি বলি, তবে আসারটি মুরসাল পদবাচ্য। আর মুরসাল আমাদের নিকট দলিল।

'তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও'—- একথার অর্থ, নির্দেশিত হজ ও ওমরা পালনে তোমরা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হও। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হুদাইবিয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এতে করে আরো প্রমাণিত হয়, হুদাইবিয়ার বৎসর তিনি স. ওমরার জন্য এহ্রাম পরেছিলেন। অতঃপর তিনি বাধাপ্রাপ্ত হলেন এবং এহ্রাম খুলে ফেললেন। ইমাম মালেক বলেছেন, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি স. হজের এহ্রাম খুলে ফেলেছিলেন, ওমরার নয়। তাঁর এই অভিমতটি অবিশুদ্ধ। 'উহ্সিরতুম' কথাটির অর্থ এরকম—হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের শত্রুতার কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে অথবা পাথেয় নিঃশেষ হওয়ায় বা রমণীদের ক্ষেত্রে মুহরিম এর পরলোকগমণের কারণে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হও। ইহ্সার বা হাসার শব্দের অর্থই হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। ইমাম আবু হানিফা এ রকমই বলেছেন। ফাররা, কাসায়ী, আখফান, আবু ওবায়দা, ইবনে সাকিদ প্রমুখ ভাষাবিদগণ বলেছেন, ইহসার অর্থ অসুস্থতার কারণে অন্তরায়

সৃষ্টি হওয়া এবং হাসার অর্থ শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আবু জাফর নুহাস বলেছেন, এ সিদ্ধান্তের উপর সকল ভাষাবিদ একমত।

আমি বলি, ভাষাবিদগণের উক্তির মর্ম হচ্ছে—শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তাহলে বর্ণিত দু'টি অর্থই যে গ্রহণীয় সে কথা বলা যায় না। যদি তাই হতো তবে 'ফাইন উহ্সিরতুম' বাক্যটি কেবল হুদাইবিয়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতো না। আর হুদাইবিয়ার বাধাপ্রাপ্তির ঘটনা অসুস্থতার কারণে ছিলো না। এখানে উল্লেখিত শব্দটি হচ্ছে, ইহ্সার। বাগবী বলেছেন, হাসার ও ইহ্সার সমার্থসম্পন্ন। যেমন আরববাসীরা বলে থাকে, হাসারতুররজুলা আন হাযাতিহি (আমি লোকটিকে তার প্রয়োজন পূরণে বাধা দিয়েছি)। তারা আরো বলে, আহ্সারাহুল আদুউ (তাকে শত্রু বাধা দিয়েছে)। এতে করে প্রমাণিত হয়, শব্দটির সাধারণ ব্যবহারিক নিয়মই ইমাম আবু হানিফার দলিল। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ 'হাসার' শব্দটি দ্বারা কেবল শত্রু কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আয়াতের বাকভঙ্গিমা তাঁদের অভিমতের বিরুদ্ধে। এই তিন ইমামের অভিমত হচ্ছে, হুদাইবিয়ার অবরোধ ছিলো কেবল শত্রুর দ্বারা।

আমি বলি, এখানে শব্দ ব্যবহারের দিকটি প্রধান হিসেবে ধরতে হবে। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখানে ধর্তব্য বিষয় নয়। এরপরও যদি কেউ বলে, আয়াতের প্রকাশভঙ্গি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে বিষয়টি (শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তি) সুনির্দিষ্ট। কেনোনা ক্ষণিক পরেই আল্লাহ্ বলেছেন, 'যখন তোমরা নিরাপদ হও।' আর এই নিরাপদ কথাটি আসে বিপদের পরেই। এর জবাবে আমি বলি, একথার মাধ্যমে এমনটি বুঝা যায় না যে, প্রতিবন্ধকতা কেবল শত্রুর মাধ্যমে হয়। বরং এখানে একথাই বুঝা যায় যে, শত্রুর দ্বারা যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় সেটাও ইহ্সার (বাধা)। আর অসুস্থতাও যে প্রতিবন্ধক হতে পারে, তার প্রমাণ হজরত আয়েশা বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে উল্লেখিত হয়েছে— একবার রসুল স. দুবায়াহ্ বিনতে জোবায়েরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজের ইচ্ছা করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো অসুস্থ। তিনি স. এরশাদ করলেন, ঠিক আছে। তুমি এরকম নিয়ত করো, হে আল্লাহ্! যেখানে অসুস্থতা আমার বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেখানেই আমি এহরামমুক্ত হবো। বোখারী, মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজিও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। উকাইলী বলেছেন, দুবায়াহ্ এর ঘটনাটি শুদ্ধ। এ হাদিসের দ্বারা ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী এই বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, শত্রু কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হলেও অসুস্থতার কারণে শর্ত সাপেক্ষে এহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। শর্তের ব্যাপারটি হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত আম্মার, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আয়েশা থেকে প্রমাণিত। ইমাম জাওজী বলেছেন, অসুস্থতার কারণে যখন এহ্রাম মুক্ত হওয়া সিদ্ধ তখন শর্তের ব্যাপারটা অনর্থক। আমরা বলি, দুবায়ার হাদিস হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ যা কোরআনের

প্রতিপক্ষ হতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, শর্তের বিষয়টি রহিত হয়েছে। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে। আমি বলি, হজরত দুবায়ার হাদিস মোস্তাহাবের অর্থবহ। ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে হাজ্জাজ বিন আমর আনসারীর হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন—এহ্রাম অবস্থায় যদি কারো শরীরের কোনো অঙ্গ জখম হয় অথবা সে যদি খোঁড়া হয়ে যায় তবে এহ্রাম মুক্ত হতে পারবে। তবে তাকে পরের বছর হজ সম্পাদন করতে হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী। বাগবী কিন্তু এ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।

'সহজলভ্য কোরবানী করো'— এ বাক্যটির অর্থ কয়েক রকম হতে পারে। যেমন— ১. তোমাদের উচিৎ যা সহজলভ্য তাই কোরবানী করা। ২. তোমাদের প্রতি ওয়াজিব যা সহজলভ্য তাই কোরবানী করা অথবা ৩. কোরবানী করো যা সহজে পাওয়া যায়— উট, ছাগল, গরু ইত্যাদি। কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার কথা যারা বলেন তাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি কোরবানী দুষ্প্রাপ্য হয় তবে একটি ছাগলের মূল্য ব্যয় করে মিস্কিনদেরকে খাওয়াবে। অথবা রোজা রাখবে। তিনি ক্রটির কারণে কোরবানীর সঙ্গে কোরবানীর প্রতিবন্ধকতাকে তুলনীয় করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানীর পরিবর্তে অন্য কোনো কিছু সিদ্ধ হবে না। অনুমানের উপর নির্ভর করে বিকল্প নির্ধারণ করা ঠিক নয়। আর ক্রটিপূর্ণ হজের কোরবানী সাধারণ ওয়াজিব কোরবানীর তুল্য ভাবা জায়েয হবে না। কারণ, ইহ্সার এবং জিনায়েতের (জরিমানার) মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

'যে পর্যন্ত কোরবানীর পশু তার স্থানে না পৌছে সে পর্যন্ত তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না।'— কোরবানীর স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কোরবানীর স্থান হলো হেরেম শরীফ। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'কোরবানীর অবতরণস্থল হলো বায়তুল্লাহ্। প্রকৃতপক্ষে রক্তপ্রবাহ করা ইবাদত নয়। ইবাদত হলো কোনো নির্দ্দিষ্টি স্থানে বা সময়ে কোনো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া। হেরেম শরীফে যদি কোরবানী সম্পন্ন না হয় তবে ইবাদত হবে না। আর ইবাদত না হলে এহ্রাম মুক্ত হওয়াও যাবে না। কাজেই অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হলো কোরবানীর পশুকে হেরেম শরীফে পৌছে দিতে হবে— বলে দিতে হবে পশুটি অমুক দিন জবাই করতে হবে। সেই দিন এসে গেলে অবরুদ্ধ ব্যক্তি এহ্রাম মুক্ত হতে পারবে। ইমামে আজমের মতে দশ তারিখেই কোরবানী করতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যারা বাধাপ্রাপ্ত তাদের কোরবানী দশ তারিখেই হতে হবে। অন্য তারিখ নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত হচ্ছে— হজে যাত্রাকারী যে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হবেন সে স্থানই হবে তাঁর কোরবানীর স্থান। সে স্থান হেরেম শরীফের ভিতরে বাহিরে যেখানেই হোক না কেনো। হজরত মুছাওয়ার বিন

মাখরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে— যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো তখন রসুল স. বললেন, পশু কোরবানী করো এবং মস্তক মুন্ডন করো। একথা তিনবার বললেন তিনি। হজ করতে না পারার কারণে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় ছিলো ভারাক্রান্ত। তাই রসুল স. এর নির্দেশ তাঁদের কর্ণগোচর হলো না। তখন তিনি, তাঁর নিজের কোরবানীর জন্য নির্ধারিত উটটি জবাই করলেন। তারপর পবিত্র মস্তক মুন্ডন করলেন। এ দৃশ্য দেখে সাহাবাগণও তাঁদের কোরবানীর পশুগুলো জবাই করলেন এবং মস্তক মুন্ডন করলেন। তখন তাঁরা ছিলেন মনোবেদনায় মুহ্যমান। দেখে মনে হচ্ছিলো যেনো তাঁরা একে অন্যকে খুন করেছেন। বোখারী। মাজমা বিন ইয়াকুবের পদ্ধতিতে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ যখন অবিশ্বাসীদের দ্বারা হুদাইবিয়ায় পথরুদ্ধ হলেন, তখন তাঁরা সেখানেই কোরবানী করলেন এবং মস্তক মুন্ডন করলেন। আল্লাহ্পাকের কুদরতে তাঁদের মুন্ডিত কেশরাজি বাত্যাতাড়িত হয়ে হেরেম শরীফে নিক্ষিপ্ত হলো। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন— রসুল স. তাঁর সহচারবৃন্দ সমভিব্যাহারে হুদাইবিয়ায় তাঁবু ফেললেন এবং সেখানেই কোরবানী সম্পাদন করে মস্তক মুন্ডন করলেন ও এহরাম মুক্ত হলেন। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, হুদাইবিয়ার অবস্থান হেরেম শরীফের বাইরে। বর্ণিত অভিমত ও হাদিস সমূহের প্রেক্ষিতে হানাফী আলেমগণ বলেছেন— ১. তাহাবী ও নাসাঈ'র হাদিসে দেখা যায় রসুল স. তাঁর কোরবানী হেরেমে অবস্থিত নাজিয়া বিন জুন্দুব আসলামীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। ২. হুদাইবিয়ার কিছু অংশ হেরেম শরীফের ভিতরে এবং কিছু অংশ বাইরে। তিনি স. হুদাইবিয়ার বাইরের অংশে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং কোরবানী করেছিলেন ভিতরের অংশে।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসটি অসম্পূর্ণ। তাছাড়া হাদিসটি প্রসিদ্ধ হাদিসগুলোর বিপরীত। এ হাদিসটিকে মেনে নিয়ে অন্য হাদিসগুলোর সঙ্গে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে—রসুল স. কিছু কোরবানীর পশু হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে পাঠিয়েছিলেন এবং কিছু জবাই করেছিলেন হেরেমের বাহিরে। উপরন্তু আল্লাহ্পাকের ঘোষণা এই, ওই সকল অবিশ্বাসী যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো এবং কোরবানীগুলোকেও যথাস্থানে পৌঁছাতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো। এ কথার দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছায়নি। আর এ কথাটিও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরবানীর স্থান হচ্ছে হেরেম শরীফ। সুতরাং এ রকম বলাই উত্তম যেমন বলা হয়েছে তা'লিক পদ্ধতিতে বোখারী বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে কোরবানী যদি যথাস্থানে পৌঁছানো সম্ভব না হয় তবে, যেখানে বাধা প্রাপ্ত হও সেখানেই জবাই করো। কোরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছানো ওয়াজিব— এ অভিমতের প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে—এরকম

যদি তোমরা সক্ষম হও তবে কোরবানী যথাস্থানে পৌছাও এবং মস্তক মুন্ডন করো।

ইমাম আবু দাউদ মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং আমর বিন মায়মুনের একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবু হাজিব হুমায়রী থেকে শুনেছি, তিনি আবু মায়মুন থেকে বর্ণনা করেছেন— যে বৎসর সিরিয়াবাসীরা হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরকে মক্কা মোয়াজ্জমায় অবরুদ্ধ করেছিলো— সেই বৎসর আমি ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার সাথে ছিলো অনেকের কোরবানীর পশু। অবরোধের কারণে আমি হেরেম শরীফে পৌছুতে সক্ষম হলাম না। অগত্যা যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হলাম সেখানেই কোরবানীর পশু জবাই করে ফিরে এলাম। পরের বছর কাজা ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করলাম। মক্কায় পৌছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের নিকট ঘটনাটি বললে তিনি জানালেন, গত বছরের জন্য একটি কোরবানী পাঠিয়ে দাও; যেহেতু রসুল স. সাহাবাগণকে বলেছিলেন, তোমরা হুদায়বিয়ায় যে কোরবানী করেছিলে, সেগুলোর বিনিময়ে একটি করে কোরবানী করো। এই ঘটনাটি উল্লেখ করে কেউ যদি বলে, হেরেম শরীফের বাইরে কোরবানী করা যদি সিদ্ধ হতো তবে দ্বিতীয়বার কোরবানীর নির্দেশ আসতো না- তবে আমি বলবো, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদিস আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার মতে হজ ও ওমরা একত্রকারীর উপর দু'টি কোরবানী ওয়াজিব। কারণ তাঁদের জন্য দু'টি এহরাম। একটি হজের, একটি ওমরার। জমহুরের অভিমত হচ্ছে এহরাম একটি। কোরবানীও একটি।

মাসআলাঃ হজ বা ওমরার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে, বাধাপ্রাপ্তির সাথে সাথে কি এহরাম মুক্ত হবে, না এহরাম মুক্তির নিয়তে কোরবানীর পশু জবাই করা জরুরী হবে। নাকি নিয়ত, জবাই, মস্তকমুন্ডন একসাথে হবে? এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নিয়ত, জবাই ও মস্তক মুন্ডন একসাথেই হবে। কেনোনা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে হজের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। বাকি থাকে কেবল এহরাম। এহরামের জন্য শরিয়ত মস্তক মুন্ডনের বিধান দিয়েছে। হ্যাঁ, মাথা মুন্ডন করতে হয় কোরবানীর পর। মাথামুন্ডন ও কেশকর্তনের মধ্যে মাথামুন্ডনই উত্তম। হুদাইবিয়ার দিবসে রসুল স. বলেছিলেন, মস্তক মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ্পাক করুণা বর্ষণ করুন। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আর কেশকর্তনকারীদের উপর? এ প্রশ্নটি তিনবার করার পর তিনি স. বলেছিলেন, কেশকর্তনকারীদের উপরেও। তাহাবী। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, যদি হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয় তবে মস্তক মুন্ডন ওয়াজিব। অন্যথায় নয়। কারণ, স্থান ও কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মস্তক মুন্ডন ইবাদত বলে গণ্য হয় না। এরকম বর্ণনা রয়েছে কাফী পুস্তকে। আর হেদায়া পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে- ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট মস্তকমুন্ডন ওয়াজিব নয়। পশু জবাই করলে এহরাম মুক্ত

হওয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের নিকট মস্তকমুন্ডন অতি জরুরী। তবে না করলে দোষ নেই। কেবল জবাই করলে এহরাম মুক্ত হওয়া যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন, বাধাপ্রাপ্ত হলেই এহরাম মুক্ত হবে। জবাই ওয়াজিব নয়। কিন্তু এই আয়াত ইমাম মালেকের বিপক্ষে। ইমাম মালেকের দলিল হজরত জাবের বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে- হুদাইবিয়ায় আমরা সত্তরটি উট জবাই করেছিলাম। প্রতিটি উটের অংশীদার ছিলাম সাত জন। রসুল স. বলেছিলেন, একটি উটের অংশীদার সাত জন। দারা কুতনী। হজরত জাবের থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— ষষ্ঠ হিজরীতে রসুল স. ওমরার জন্য এহ্রাম বেঁধেছিলেন। তাঁর সহচরের সংখ্যা ছিলো এক হাজার চারশ'। বর্ণিত হাদিস দু'টি মিলিতভাবে পাঠ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অবরুদ্ধদের জন্য কোরবানী ওয়াজিব নয়। শুধু নিয়তের মাধ্যমে এহরাম মুক্ত হওয়া যায়। সত্তরটি উট পাঁচশ' লোকের জন্য যথেষ্ট নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অবশিষ্টরা কোরবানী ব্যতিরেকেই এহ্রামুক্ত হয়েছিলেন।

আমি বলি, সম্ভবত অন্যেরা ছাগল কোরবানী করেছিলেন। তাছাড়া ইমাম মালেকের অভিমত অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী। কাজেই গ্রাহ্য নয়।

মাসআলাঃ হজ ও ওমরার এহরাম ধারণকারীগণ যদি বাধাগ্রস্ত হন, তবে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব কি না সে সম্পর্কে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, কাজা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল হচ্ছে—বায়যাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক ইহসারের আয়াতে কেবল কোরবানীর আলোচনা করেছেন। কাজার কথা বলেননি। সুতরাং কাজা ওয়াজিব নয়। ইবনে জাওজী বলেছেন, ষষ্ঠ হিজরীতে রসুল স. যখন ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁর সহযাত্রীর সংখ্যা ছিলো এক হাজার চারশ'। পরের বছর সংখ্যা ছিলো অনেক কম। যদি কাজা ওয়াজিব হতো, তবে তিনি পূর্ববর্তী বছরে সকলকে কাজা আদায়ের নির্দেশ দিতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমি অনেক হাদিসে দেখেছি পরের বছর কাজা আদায়ের সময় ওজর আপত্তি ছাড়াই অনেকে কাজা আদায় থেকে বিরত ছিলেন। যদি কাজা ওয়াজিব হতো তবে তিনি স. অবশ্যই আগের বছরের সকলকে পুনরায় সহযাত্রী হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে হজের এহ্রাম মুক্ত হলে একটি হজ ও একটি ওমরা— ওমরার এহরাম মুক্ত হলে একটি ওমরা এবং হজ ও ওমরার (হজে কিরান) এহরাম মুক্ত হলে এক হজ ও দুই ওমরা কাজা করা ওয়াজিব। তাঁর দলিল হচ্ছে, হজ ও ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা সর্বসম্মতরূপে ওয়াজিব। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'হজ ও ওমরা পূর্ণ করো।' কাজেই কাজা আদায়ের জন্য নতুন কোনো দলিলের আবশ্যক নেই। আর বাধাগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনায় (ফা'ইন উহ্সিরতুম) কেবল প্রতিবন্ধকতার কারণে এহরাম মুক্ত হওয়ার পদ্ধতিটি বিবৃত হয়েছে। এতে কাজা রহিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপরে বর্ণিত ইমামগণের দলিল প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে বলা যায়- প্রথমত আমরা একথা মানতেই পারি না যে, পরের বছর রসুল স. এর সহচরের সংখ্যা ছিলো অল্প। একথাও মানতে পারি না যে, তিনি ওমরার কাজা আদায় করতে বলেননি। বোখারী শরীফের মাগাজী অধ্যায়ে ওয়াকেদী তাঁর শায়েখগণের একটি বিরাট দল থেকে বর্ণনা করেছেন— সপ্তম হিজরীর জিলক্বদ মাসে রসুল স. এই মর্মে নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, যাঁরা গত বছর হুদাইবিয়ায় অবরুদ্ধ হয়েছিলো তাঁরা যেনো কাজা আদায় করে। কেউ যেনো বাদ না পড়ে। ইতোমধ্যে খায়বর যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া অন্য সকলে তাঁর সহগামী হয়েছিলেন। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নতুন কিছু সহযাত্রী। সপ্তম হিজরীতে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন দুই হাজারের অধিক। তাছাড়া আরো বলা যায়, যাঁরা পরের বছর সহগমন করেননি তাদের নিশ্চয়ই কোনো ওজর ছিলো। তাঁরা পরে কাজা আদায় করেছিলেন। রসুল স. ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে খোঁড়া কিংবা আহত হয়েছে সে এহরাম মুক্ত। আগামী বছর সে কাজা আদায় করবে। হজতো তাঁর দায়িত্বে রইলোই।

কেউ যদি বলে, কাজা ওয়াজিব না হলে ওমরাতুল কাজা কেনো বলা হয়? উত্তরে আমি বলি, ওমরার কাজা ছিলো বলেই একে ওমরাতুল কাজা বলা হয়নি। বরং এখানে কাজা মীমাংসা অর্থে ব্যবহৃত। যেহেতু বিগত বৎসর কোরাইশদের সঙ্গে এই মর্মে মীমাংসা হয়েছিলো যে, মুসলমানেরা আগামী বছর ওমরা আদায় করতে পারবে। তাই ওই ওমরার নাম রাখা হয়েছিলো ওমরাতুল কাজা।

'যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোজা কিংবা সদকা অথবা কোরবানী দ্বারা তার ফিদিয়া দেবে'— এ আয়াতে 'মিনকুম' বলতে এহরামধারীদের কথা বলা হয়েছে। 'মারিদ্ব' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যাদের জন্য মস্তক মুন্ডন করা কষ্টকর। 'আজাম মির রসিহি' অর্থ, মাথার কোনো অভিযোগ বা কষ্ট। এরকম কষ্টের কারণে যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মস্তক মুন্ডন করে ফেলে তবে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। যদি কেউ সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা সেলাই করা কাপড় পরে তবে তার উপর ফিদিয়া বাধ্যতামূলক। আর এখানে যে রোজার কথা বলা হয়েছে সে রোজা হচ্ছে তিন দিন। একটানা তিন দিন নয়। কিন্তু তিন দিন। এখানে সদকার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। সদকা নির্ধারিত হয়েছে হাদিস দ্বারা। হজরত কাআব বিন আজারা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন- রসুল স. যখন কাব বিন আজারাকে দেখলেন তাঁর মাথা ভর্তি উকুন মুখ পর্যন্ত নেমে এসেছে— তখন তিনি স. বললেন উকুনগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? হজরত কাব বললেন, জ্বী। রসুল স. তাঁকে মস্তক মুন্ডন করার কথা বললেন, তখন তাঁরা ছিলেন হুদাইবিয়ায়। যাত্রা ছিলো মক্কাভিমুখী। কিন্তু কাফেরদের বাধার কারণে অগ্রসর হতে পারলেন না। তিনি স. সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানে এহরাম মুক্ত হবেন। আর ঠিক সে সময়ই অবতীর্ণ হলো ফিদিয়ার এই আয়াত। তিনি স. হজরত কাবকে বললেন, এক ফরক খাদ্য শস্য ছয়জন

মিসকিনের মধ্যে বিলিয়ে দাও অথবা একটি ছাগল কোরবানী দাও কিংবা তিন দিন রোজা রাখো।

আমি বলি, ফরকের পরিমাণ তিন সা এর সমান। এখানে উল্লেখিত নুসুক শব্দটি বহুবচন— যার একবচন হচ্ছে 'নুসাইকা' বা 'নাসিকাহ'— যার অর্থ উন্নত পর্যায়ের কোরবানীর উট, মধ্যম পর্যায়ে গাভী এবং নিম্ন পর্যায়ে ছাগল। এহরামধারীদের ফিদিয়ার কোরবানী মক্কা মোয়াজ্জমায় জবাই করা ওয়াজিব। এটা ঐকমত্য। বাধাগ্রস্ত হলে যে কোরবানী করতে হয় সেই কোরবানীর পশু মক্কা মোয়াজ্জমায় জবাই করা ওয়াজিব নয়।

'যখন নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি হজের প্রাক্কালে ওমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়'— এ কথার অর্থ, যখন শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হবে না কিংবা অসুস্থতা অন্তরায় সৃষ্টি করবে না কিংবা প্রথম থেকেই নিরাপদ থাকবে— এ অবস্থাকে এখানে 'ফা ইজা আমিনতুম' বাক্যের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। 'ফামান তামাত্তাআ' অর্থ হজ এবং ওমরার মিলিতাবস্থায় লাভবান হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে 'কিরান' ও 'তামাত্তু' উভয় প্রকার হজের কথা। ওমরা ও হজকে একত্রে সম্পাদন করাকে বলে 'কিরান'। আর ওমরা সম্পন্ন করে এহরাম খুলে ফেলে স্বাভাবিক অবস্থার সুবিধা ভোগ করে (স্ত্রী সহবাস এবং অন্য সুবিধাদি ভোগ করে) হজের সময় পুনরায় এহরাম গ্রহণ করে হজ সম্পাদন করার নিয়মটিকে বলে 'তামাত্তু।' কেউ কেউ বলেছেন, এখানে লাভবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওমরা সম্পাদনের পর হজের এহরাম পরিধানের পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করা। এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে 'কিরান' হজ এ বিধানের বাইরে পড়ে যাবে। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি কোরআনের অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে অধিকতর উত্তম।

'সে সহজলভ্য কোরবানী করবে'—এ কথার অর্থ 'তামাত্তু' হজ সম্পাদনকারীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে যে কোনো ধরনের কোরবানী করবে। উর্ধ্ব পর্যায়ে উট অথবা নিম্ন পর্যায়ে ছাগল— যে কোনো একটি। এরকম করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে এ কোরবানী কৃতজ্ঞতার কোরবানী। সুতরাং কোরবানীদাতা তার গোশত্ খেতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এটা জরিমানার কোরবানী— তাই কোরবানীদাতা এর গোশত খেতে পারবে না। হজরত জাবের বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসটি প্রথমোক্ত অভিমতের দলিল যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. প্রতিটি কোরবানীকৃত উট থেকে এক টুকরো করে গোশত নিয়ে একত্রিত করলেন এবং একই পাত্রে রন্ধনের নির্দেশ দিলেন। রন্ধনের পর তিনি স. এবং হজরত আলী সে গোশত ও তার সুরুয়া ভক্ষণ করলেন। এ কারণে হাদিসটি দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, রসুল স. স্বয়ং 'কিরান' হজ সম্পাদন করেছিলেন। সকল উটের গোশত একত্রিত করার উদ্দেশ্য ছিলো কোরবানীদাতার জন্য তার কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা যে মোস্তাহাব সে বিষয়টিকে প্রমাণ করা। ইবনে জাওজীর মতে দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— হজরত আলী

থেকে আবদুর রহমান ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাটি। হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. আমাকে আহারের পর বেঁচে যাওয়া গোশত বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে করে প্রমাণিত হয়, এরূপ কোরবানীর গোশত খাওয়া সিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ীর মতে, যে সকল কোরবানী ওয়াজিব সেগুলোর গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ওই সকল গোশত মিসকিনদের হক। তাঁর দলিল হচ্ছে— হজরত নাজিয়া খাজামী যিনি রসুল স. এর উটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন- তিনি রসুল স.কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! কোনো উটের ক্ষতির আশংকা দেখলে কী করবো? তিনি স. বললেন, জবাই করো। জুতায় রক্ত মাখাও। তারপর উটের শরীরের পাশে দাগ দিয়ে ছেড়ে দাও। মিসকিনেরা খেয়ে নেবে। মালেক, আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। ওয়াকেদীর বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজিত রয়েছে একথাটি- তুমি বা তোমার কোনো বন্ধু (ওই গোশত) খাবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. একজনকে আমীর নিযুক্ত করে তাঁর তত্ত্বাবধানে ষোলোটি উট দিলেন এবং বলে দিলেন, তুমি বা তোমার কোনো লোক এগুলোর গোশত খাবে না। মুসলিম। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

আমি বলি, এ হাদিসগুলোর সঙ্গে 'কিরান' বা 'তামাত্তু' হজের কী সম্পর্ক? এগুলো হুদাইবিয়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। নাও পারে। তিনি স. হিজরতের পরে কেবল বিদায় হজ ব্যতীত অন্য কোনো হজ করেন নি। বর্ণিত হাদিসগুলোতে যে কোরবানীর উল্লেখ দেখা যায় সেগুলো কি হজের সঙ্গে সম্পর্কিত? মনে হয় না। বরং সেগুলো নফল কোরবানী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর আমরাও নফল কোরবানী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি যে, ওগুলোর গোশত খাওয়া সিদ্ধ নয়— যদি পথে ক্ষতির আশংকায় সেগুলোকে জবাই করা হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদের মতে তামাত্তু হজের কোরবানী, কোরবানীর দিন অর্থাৎ দশই জিলহজের পূর্বে জবাই করা সিদ্ধ নয়। দশই জিলহজ কংকর নিক্ষেপের পর কোরবানী করা উচিৎ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দশই জিলহজের আগেও কোরবানী করা যাবে। আমাদের দলিল হচ্ছে- জননী হাফসা, রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমাদের সঙ্গে এহরাম মুক্ত হলেন না কেনো? তিনি স. বললেন, কোরবানী পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনো মাথা মুন্ডন করিনি। কোরবানী সম্পাদনের পর এহরাম মুক্ত হবো। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিস এই— রসুল স. এরশাদ করেন, আমি কোরবানী না নিয়ে এলে এহরাম মুক্ত হতাম। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় 'কিরান' এর কোরবানী দশই জিল হজের আগে জবাই করা সিদ্ধ নয়। যদি হতো, তবে রসুল স. এহরাম মুক্ত হতে আপত্তি করতেন না।

যদি কেউ না পায় তবে তাকে হজের সময় তিন দিন রোজা রাখতে হবে। গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর রাখতে হবে সাতটি রোজা। এভাবে মোট দশদিন রোজা রাখতে

হবে তাকে। প্রথমোক্ত তিন দিনের শেষ রোজাটি হতে হবে আরাফার দিবসে। এই তিন দিনের রোজা ওয়াজিব। যদি এহরাম অবস্থায় আরাফা দিবসের পূর্বেই রোজা তিনটি পালন করে তবে ঐকমত্যসূত্রে সিদ্ধ হবে না। বরং কোরবানীর দিনে রোজা রাখা হারাম। তাই এহরামমুক্ত হওয়ার পর রোজা রাখলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. দুইদিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন ও কোরবানীর দিন; যে দিন কোরবানীর গোশত খাওয়া হয়। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত আমর বিন আস বলেছেন, রসুল স. কোরবানীর দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ ও ইবনে মুনজির। ইবনে খুজাইমা ও হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হজরত কাব বিন মালেক থেকে মুসলিম বলেছেন, এ দিনগুলো পানাহারের দিন। মুসলিমের বর্ণনায় নাবিসা হাজালী কর্তৃকও এরকম বলা হয়েছে। বিশর বিন সুহাইল থেকে নাসাঈর মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। বিশুদ্ধ সনদে উকবা বিন আমের থেকে সুনান প্রণেতাগণ, হাকেম এবং ইবনে হাব্বানও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবদুল বার বলেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেন, তাশরিকের দিন— পানাহার ও নামাজের দিন। ওই দিন রোজা রাখবে না। এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী যদি কোরবানী করতে সমর্থ না হয় এবং কোরবানীর আগে রোজা না রাখে তবে তাশরিকের দিন তাঁর জন্য রোজা রাখা সিদ্ধ। তবে কোরবানীর দিনে রোজা রাখা ঐকমত্য সূত্রে 'নাজায়েজ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও জননী আয়েশা বলেছেন, 'আইয়ামে তাশরিকে' রোজা রাখা যায় না। তবে যে কোরবানী সংগ্রহ করতে পারেনি তাঁর জন্য অনুমতি রয়েছে। বোখারী। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী আরও বর্ণনা করেন, 'তামাত্তু' সম্পাদনকারীদের জন্য আরাফার দিন পর্যন্ত রোজা রাখা জায়েয। তবে যে কোরবানী সংগ্রহ করতে অসমর্থ এবং আরাফার দিন পর্যন্ত যে রোজাও রাখেনি সে মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোজা রাখবে। ইমামত্রয় বলেছেন, যদিও এটা আসার- তবুও বিধানের দিক দিয়ে মারফুর স্থলাভিষিক্ত।

আমরা বলি, আসার বিধান হিসেবে মারফু- এ সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। মনে হয় হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত আয়েশা 'হজের তিন দিন' কোরআনের এই নির্দেশ থেকে আইয়ামে তাশরিকের তিন দিনকে ধরে নিয়েছেন। ওই তিন দিন হজের কিছু অনুষ্ঠান থাকে। যেমন কাঁকর নিক্ষেপ ইত্যাদি। তাই তাঁরা ওই তিন দিনের মধ্যে রোজা রাখা সিদ্ধ বলেছেন। কেউ যদি বলে, হজরত ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. কোরবানীর পশু নেই— এরকম

তামাত্তু হজ সম্পাদনকারীকে আইয়ামে তাশরিকে রোজা রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম তাহাবী ও হজরত আয়েশা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মত হচ্ছে, হজরত ইবনে ওমরের হাদিসের সনদভুক্ত ইয়াহ্ইয়া বিন সাম্মাম বর্ণনাকারী হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়। দারা কুতনী ও তাহাবী হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন। আরেক বর্ণনাকারী ইবনে আবী লায়লা সম্পর্কে তাহাবী এনেছেন স্মৃতিভ্রষ্টতার অভিযোগ। হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের সনদও দুর্বল। তাই এই হাদিসগুলো নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদিসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে কীরূপে? তাহাবী বলেছেন, অনেক আসার দ্বারা সুসাব্যস্ত হয়েছে যে, রসুল স. যখন মিনায় অবস্থান করছিলেন, তখন হাজ্জাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীদের অনেকেই ছিলেন তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী। আমি বলি, সকল হাজীই ছিলেন তামাত্তু অথবা কিরান হজ সম্পাদনকারী। কারণ, রসুল স. ওই বছর এহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এহরাম পুনর্গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তালবীয়ার দিনে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি স. ওই দিনগুলোতে রোজা রাখতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের উক্তি অনুযায়ী 'হজের সময় তিন দিন' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ওই তিন দিন কি হজের রোকন না ওই তিন দিন হজের দিন?

আমি বলি, হজের রোকনগুলো প্রতিপালনের সময়, রোজার সময় নয়। আরাফার দিনেই হজের সময় শেষ হয়ে যায়। 'আলহাজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত'— বলতে হজের সময় দু'মাস দশ দিন ধার্য করা হয়েছে—শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজের দশ তারিখ পর্যন্ত। পরের আয়াতে স্ত্রীসম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ বিধেয় নয় বলা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আইয়ামে তাশরিক পড়ে না। কারণ, এ দিবসগুলোতে পানাহার, রতিকর্ম, শিকার ইত্যাদি জায়েয।

মাসআলাঃ কেউ যদি মাথামুন্ডনের পূর্বে রোজা রাখা অবস্থায় অথবা রোজার পরে কোরবানীর পশু পেয়ে যায়, তবে আমাদের মতে কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে ওয়াজিব নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে- প্রথম অবস্থায় কোরবানী ওয়াজিব ছিলো। দ্বিতীয় স্তরে রোজা বিধিবদ্ধ হয়েছে- এই দ্বিতীয়াবস্থায় কোরবানী সহজলভ্য হওয়ার কারণেই কোরবানী ওয়াজিব হবে। যেমন তায়াম্মুম আদায়ের সময় পানি পেয়ে গেলে অজু করে নিতে হয়। আর যদি হজের সময় রোজা বাদ পড়ে যায় তবে একটি কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, আলোচ্য রোজা তিনটি পালন করতে হবে হজের পরে। আমরা বলি, রোজা করতে হয় কোরবানীর পরিবর্তে। ইচ্ছে করলেই এই পরিবর্তন করা যায় না। আর রোজার বিনিময়ে কোরবানী শরিয়তের ভিত্তিতে সাব্যস্ত।

'গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন'— এ কথার অর্থ হজ অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদনের পর সাতটি রোজা করতে হবে। একথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, একথার অর্থ যখন তোমরা হজ সমাপ্ত করে বাড়ির দিকে যাত্রা করবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কেউ যদি হজের পরে মক্কাতে বসবাস করতে চায়। অথবা যার বাড়িঘর বলতে কিছু নেই— সে কী করবে? কাজেই হজ সম্পাদনকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেনো, সেখানেই রোজা আদায় করবে।

'এই পূর্ণ দশদিন'— একথা বলা হয়েছে রোজাগুলোকে গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য। অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখিত তিন এবং পরের সাত— এই দশদিন রোজা পালন করতে হবে।

'এই বিধান তাদের জন্য যাদের পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়'। —এই কথাটির মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় বিধানটি মক্কাবাসীদের উপরে কার্যকর নয়। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, মক্কাবাসীদের জন্য হজে তামাত্তু জায়েয। কিন্তু তাদের জন্য কোরবানী ওয়াজিব নয়। তাদের মতে এই বিধান (ইহা) কোরবানীর প্রতি প্রযোজ্য। আমরা বলি, আমাদের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাসও করেছেন। একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের নিকট কাদের উপর তামাত্তু হজ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ— সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, মক্কাবাসী ব্যতীত সকলের জন্য সিদ্ধ। আল্লাহ্পাকও বলেছেন, 'ইহা তাদের জন্য যাদের পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়।' ইবনে হুম্মাম উল্লেখ করেছেন, মক্কাবাসীদের জন্য কিরান ও তামাত্তু হজ জায়েয নয়। হজরত ইবনে ওমর ও ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে—মিকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীরাই মসজিদে হারামের বাসিন্দা। হজরত ইকরামাও এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যাঁরা মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে সফরের (তিন দিনের) দূরত্বের ভিতরে বাস করেন তাঁরাই মসজিদে হারামের অধিবাসী। তাউস ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন হেরেম শরীফের অধিবাসী। যেহেতু মসজিদুল হারাম জনবসতির স্থান নয়, সেহেতু মসজিদে হারামের বাসিন্দা বলতে হেরেম শরীফের অন্তর্ভুক্ত বাসিন্দাদের বুঝতে হবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'কাবার (প্রতি চালিত) কোরবানী সমূহ।' আরেক আয়াতে মসজিদে হারাম বলতে হেরেম শরীফকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, মসজিদুল হারামের বাসিন্দা অর্থ বিশেষভাবে মক্কার বাসিন্দা। নাফে, আয়রাজ ও তাহাবীও এ মতের সমর্থক। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কোনো মক্কাবাসী যদি তামাত্তু হজ করে, তবে তাকে একটি ছাগল কোরবানী দিতে হবে। কারণ, সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে। এই কোরবানীর স্থলে রোজা রাখলে

চলবে না এবং ওই কোরবানীর গোশত সে খেতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য ইমামগণ বলেছেন, তাঁকে কিছুই করতে হবে না।

'আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে আল্লাহ মন্দকাজের প্রতিফল দানে কঠোর'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্র ভয়ে আদেশ প্রতিপালন করো এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত হও। কারণ, তিনি মন্দ কাজের কঠোর শাস্তি দানকারী।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্পাক এই আয়াতে হজ ও ওমরার বিবরণ দিয়েছেন। দু'টিকে আবার মিলিতাবস্থায় আদায় করতে বলেছেন। হাদিসের বর্ণনা দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, হজ ও ওমরার সম্মিলিত প্রতিপালন দুই প্রকৃতির হতে পারে। একটি হচ্ছে একই সাথে হজ ও ওমরার এহরাম গ্রহণ করে হজ ও ওমরা সমাধার পর এহরাম মুক্ত হওয়া— এরকম হজকে বলে হজে কিরান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রথমে ওমরার এহরাম গ্রহণ করে ওমরা সম্পাদনের পর এহরামমুক্ত হয়ে হজ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করা। এ অবস্থায় সঙ্গে থাকতে হবে কোরবানীর পশু। তালবীয়ার দিবস এলে পুনরায় হজের এহরাম পরিধান করা এবং হজ সম্পাদনের পর দশই জিলহজ কোরবানী করে এহরাম মুক্ত হওয়া। এই প্রকৃতির হজকে বলে হজে তামাত্তু। এই দুই প্রকৃতির হজই বৈধ। তবে কোনটি উত্তম, সে সম্পর্কে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসুল স. বিদায় হজে কোন প্রকৃতির হজ করেছিলেন? ইফরাদ, কিরান না তামাত্তু? আরো প্রশ্ন হতে পারে, হজ ও ওমরার জন্য একটি তাওয়াফই যথেষ্ট না একাধিক? জমহুর বলেছেন, এক তাওয়াফ ও এক সায়ী যথেষ্ট। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দুই তাওয়াফ ও দুই সায়ী করতে হবে। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লেখা মাসরুল আহকাম দেখে নেয়া যেতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, রসুল স. হজে কিরান সম্পাদন করেছিলেন। তাই তামাত্তু অপেক্ষা কিরান উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে- সঙ্গে কোরবানীর পশু থাকতে হবে। আর তামাত্তু উত্তম হবে তখনই, যখন কোরবানীর পশু সঙ্গে থাকবে না। হজে কিরান ও হজে তামাত্তু হজে ইফরাদ অপেক্ষা উত্তম। রসুল স. মক্কা মোয়াজ্জমায় এসে তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করেছিলেন। এরপর আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের আগে আর কোনো তাওয়াফ করেন নি। বোখারী।

আমি বলি, রসুল স. কৃত তাওয়াফ ও সায়ী ছিলো ওমরার জন্য। আর এই তাওয়াফই তাওয়াকে কুদুম এর জন্য যথেষ্ট। তিনি স. তাওয়াফ সম্পন্ন করেছিলেন পায়ে হেঁটে। হজরত হাবীবা বিনতে আবী তুজারা, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত জাবের থেকে এ সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম। রসুল স. তাওয়াফে জিয়ারত সম্পন্ন করে সাফা মারওয়ায় সায়ী করেছিলেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি সায়ী করেছিলেন বাহনে উপবিষ্ট হয়ে। এ রকম করেছিলেন এ জন্য যে, জনতা যেনো তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হতে পারে এবং তাঁকে হজ সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে পারে।

মুসলিম। অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়— বিদায় হজে তিনি তাওয়াফ করেছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে এবং যষ্টি দ্বারা চুম্বন করেছিলেন হাজারে আসওয়াদ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৭

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ○

❒ হজ্ব হয় সুবিদিত মাসে। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ করা তাহার কর্তব্য মনে করে তাহার জন্য হজ্বের সময়ে স্ত্রী- সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

হজের মাস সুনির্দিষ্ট ও সুবিদিত। হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, হজের মাস হলো শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ। আমি বলি, শাওয়াল ও জিলক্বদ সম্পূর্ন মাস এবং জিলহজ মাসে নয় দিন অর্থাৎ কোরবানীর দিনের সকাল পর্যন্ত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্ব মাসের দশদিন। বাগবী বলেছেন, বর্ণিত দু'টি হাদিসই শুদ্ধ। নয় দিন অর্থ জিলহজ মাসের পুরো নয় দিন এবং দশদিন অর্থ দশ রাত্রি। আরববাসীদের নিয়ম হচ্ছে— সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের উল্লেখ না করা। তাই এখানে নয় অথবা দশ বলা হয়েছে। তাই একস্থানে নয় দিনের পরের রাতকে না ধরে বলা হয়েছে নয় এবং আরেক স্থানে দশম রাত্রিকে দিন সহ ধরে বলা হয়েছে দশ। কোরআন মজীদের বর্ণনাতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন একস্থানে বলা হয়েছে—পবিত্র সেই পরম সত্তা, তিনি তাঁহার বান্দাকে নিয়ে গেলেন রাতে। মেরাজ সম্পর্কিত এ আয়াতে রাতের কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছিলো— কিন্তু বর্ণনায় এসেছে পুরো রাতের কথা। হজরত ওরওয়া বিন জোবায়ের বলেছেন, হজের মাস বলতে বুঝানো হয়েছে শাওয়াল, জিলক্বদ এবং পুরো জিলহজ মাস। কারণ, হজের পরেও হজ সম্পর্কিত অনেক অনুষ্ঠান বাকী থেকে যায়। যেমন— কোরবানী, কংকর নিক্ষেপ, তাওয়াফে জিয়ারত, মিনার প্রান্তরে অবস্থান ইত্যাদি। এগুলোকেও হজের মাসের মধ্যে সীমায়িত করা হয়েছে।

আমি বলি, জিলহজ মাসের তের তারিখের মধ্যে হজ সম্পর্কিত সকল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। কাজেই পুরো জিলহজ মাসকে হজের মাসের মধ্যে গণ্য করা ঠিক নয়। বায়যাবী বলেছেন, জিলহজ মাস পুরাপুরিই হজের মাস। তিনি আরো বলেছেন, জিলহজ মাসের মধ্যে হজ অপেক্ষা অন্য কোনো অনুষ্ঠান সর্বোত্তম নয়। ইমাম মালেক বলেছেন, জিলহজ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে ওমরা করা মাক্রূহ। আমি বলি, ব্যাখ্যাটি সুসংগত নয়। কারণ, ওই সময় বিদেশাগতদের জন্য ওমরা করা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। স্বয়ং রসুল স. জিলক্বদ মাসে চারবার ওমরা করেছিলেন। তাই ইমাম মালেক এবং শাফেয়ী বলেছেন মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু হজ সিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী এ আয়াত থেকেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, হজের সময়ের পূর্বে হজের এহরাম গ্রহণ সিদ্ধ নয়। দাউদ বলেছেন, হজের সময়ের পূর্বে হজের এহরাম অনর্থক। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, হজের সময়ের আগে যদি কেউ এহ্রাম গ্রহণ করে তবে তাঁর হজ হবে। তবে তা হবে মাকরূহ। তাঁদের দলিল হচ্ছে— এহরাম হচ্ছে হজের শর্ত— এ রকম নয়। কেউ যদি হজ বা ওমরার সংকল্প না করে এহরাম গ্রহন করে এবং পরে হজে কিরান বা তামাত্তু অথবা ওমরার নিয়ত করে তবে তা জায়েয হবে। হজরত আনাস বিন মালিকের বর্ণনাটিকে তাঁরা তাঁদের এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হজরত আলী ইয়ামান থেকে রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হলেন। রসুল স. বললেন, আলী তোমার উদ্দেশ্য কী? কিসের এহরাম গ্রহণ করেছো? হজরত আলী বললেন, রসুল স. এর যা নিয়ত আমারও তাই। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিস দু'টি রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। সুতরাং এটা সাব্যস্ত হলো যে, এহরাম হজের রোকন নয় বরং শর্ত। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শর্তের বাস্তবায়ন শরিয়ত সমর্থিত। যেমন, নামাজের শর্ত হচ্ছে অজু। আর নামাজের সময়ের আগেই অজু করা জায়েয। তবে এ কথাও ঠিক যে, নামাজের জন্য অজু কেবলই শর্ত। এহরামও শর্ত বটে, কিন্তু রোকনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ক্রীতদাস যদি এহরাম গ্রহণ করার পর আরাফার দিবসের আগে আজাদ হয়ে যায় তবে তার ফরজ আদায় হবে না। এ কারণেই আমরা মাকরূহ বলি। আবার এহরাম যেহেতু হজের শর্তও তাই হজের পূর্বে এহরাম গ্রহণকে সিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হজ সম্পন্ন হবে না। যেমন বিতির নামাজের জন্য এশার নামাজ শর্ত। কিন্তু তাই বলে বিতির আদায়ের জন্য কেউ যদি মাগরিবের পরপরই এশার নামাজ আদায় করে বিতির পড়ে তবে কি তা সিদ্ধ হবে? আল্লাহপাক সমধিক জ্ঞাত।

'যে এই মাসগুলোতে হজ করা তার কর্তব্য বলে মনে করে'— একথার অর্থ, যে হজের মাসে হজ সম্পাদনার্থে এহরাম গ্রহণ করে। এহরাম সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ বলেছেন, এহরাম হলো রোজার মতো মনে মনে হজের জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া। এখানে

তালবিয়া (লাব্বায়িক) উচ্চারণ করা কোনো শর্ত নয়। তবে ইমাম মালেক বলেছেন, এহরামের সময় লাব্বায়িক বলা ওয়াজিব। যদি কেউ এই ওয়াজিব পরিত্যাগ করে, তবে তাঁকে একটি কোরবানী দিতে হবে। শাফেয়ী ও আহমদও এরকম বলেছেন। তবে তাঁদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে— তালবিয়া সুন্নত। ইমাম আবু হানিফার মতে,তালবিয়া সহ এহ্‌রামের নিয়ত করতে হবে। যেমন, নামাজের নিয়তের সঙ্গে তাকবীর উচ্চারণ করতে হয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজের তালবিয়া পাঠ ফরজ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, তালবিয়া ফরজ। ইবনে আবী শাইবা বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদও এই অভিমত পোষণ করেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসটিই আমাদের দলিল— যাতে বলা হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, মদীনাবাসীদের জন্য জুলহুলাইফা থেকে তালবিয়া পাঠ করা উচিৎ। মাতা আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. এরশাদ করেন, যার সংগ্রহে কোরবানীর পশু রয়েছে, সে যেনো হজ ও ওমরা উভয়টির জন্য এহ্‌রাম গ্রহণ করে। দেখা যাচ্ছে, রসুল স. তালবিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তালবিয়া হচ্ছে উচ্চ স্বরে লাব্বায়িক বলা। আল্লাহ্ ও রসুল স. এর আদেশ ওয়াজিব। হাদিস শরীফের মাধ্যমে তালবিয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। যারা তালবিয়াকে ওয়াজিব বলেন না, হাদিস শরীফ তাদের বিপক্ষে। প্রকৃত কথা এই যে, এহ্‌রামই হলো তালবিয়া। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা একথা বলেছেন যে, যে যাত্রার জন্য উট সজ্জিত করে হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, সে এহ্‌রাম গ্রহণকারী হয়ে গেলো;তালবিয়া উচ্চারণ না করলেও। এতে করে বুঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা আমলকে (কর্মকে) উচ্চারণের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। কারণ, জিকির যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি হয় কর্ম দ্বারা। যে ব্যক্তি বসে বসে আজানের জবাব উচ্চারণ করে এবং যে ব্যক্তি আজানের প্রাক্কালে মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে- দু'জনই আজানের জবাব দানকারী। একজনের জবাব কথা। আরেক জনের জবাব কাজ। আর কাজই আজানের মূল জবাব। তেমনি তালবিয়ার অর্থ, স্বয়ং উপস্থিত হওয়া এবং আনুগত্যের প্রস্তুতি। পক্ষান্তরে 'লাব্বায়িক' (আমি উপস্থিত) বলা কেবল মৌখিক ঘোষণা।

আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজের ইচ্ছে নেই— এমন কেউ যদি মক্কা মোয়াজ্জমায় কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়, তবে সেও এহ্‌রাম গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য। তাঁর উপরও ওই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এহ্‌রাম গ্রহণকারীদের উপর। আসার দু'টির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়ে যে, এটাই ছিলো হজরত দ্বয়ের মাজহাব। তবে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে এর বিপক্ষে। বোখারী বলেছেন, জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান মাতা আয়েশার নিকট এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করলেন যে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস

বলেন, যারা মক্কা শরীফে কোরবানী পাঠিয়েছে, তাদের প্রতিও ওইসব বিষয় নিষিদ্ধ- যে সকল নিষিদ্ধতা থাকে এহরামকারীদের উপর। মাতা আয়েশা তখন বলেছিলেন, এটা ঠিক নয়। আমি স্বহস্তে কোরবানীর পশুর জন্য মালা বানিয়েছি। রসুল স. স্বয়ং তা পশুর গলায় বেঁধে দিয়ে আমার পিতার দায়িত্বে মক্কা শরীফে পাঠিয়েছেন; কিন্তু তিনি নিজের উপর কোনো কিছু হারাম করেননি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ঘটনাটি নবম হিজরীর।

'স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়'—জুযাজ বলেছেন, স্ত্রী সম্ভোগ বুঝাতে এখানে 'রাফাস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, রাফাস অর্থ অশ্লীলতা। আমি বলি, অশ্লীলতা তো সকল সময়ের জন্যই হারাম। সুতরাং এই আয়াতে রাফাস শব্দটির অর্থ অশ্লীলতা নয়, স্ত্রী সম্ভোগই বুঝতে হবে।

অন্যায় আচরণ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, এহরাম গ্রহণকারীদের জন্য যা নিষিদ্ধ তাই অন্যায় আচরণ বা ফুসুক্ব। এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধকর্ম ছয়টি। ১. রতিক্রিয়া ও রতিকর্মের প্রতি প্ররোচনা। এ বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই নিষেধাজ্ঞাটি লংঘন করলে হজ ও ওমরা দু'টিই বিনষ্ট হয়। অন্য নিষেধাজ্ঞাগুলো লংঘন করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোরবানী অপরিহার্য হয়। এভাবে হজ ও ওমরা বিনষ্টি থেকে রক্ষা পায়। অবশ্য আরাফা দিবসের পর স্ত্রী সম্ভোগ হজকে বিনষ্ট করে কিনা—সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু আরাফা দিবস পর্যন্ত নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোনোই মতানৈক্য নেই। ২. স্থলভাগে শিকার করা বা কোনো শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দেয়া। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'এহরাম অবস্থায় শিকার কোরো না।' আরেক স্থানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের উপর স্থলভাগের শিকার হারাম— যখন এহরামে থাকো।' ৩. চুল ও নখ কর্তন করা। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'মাথা মুন্ডন কোরো না যতোক্ষণ না— কোরবানীর স্থানে কোরবানীর পশু পৌঁছে যায়।' শরীরে উপবিষ্ট মাছি, মশা এবং উকুন মারাও কেশকর্তনের পর্যায়ভূত। ৪. শরীরে বা বস্ত্রে আতর ব্যবহার করা। রসুল স. এরশাদ করেন, এমন পোশাক পরিধান কোরো না, যাতে ব্যবহৃত হয়েছে জাফরান বা অরস। বোখারী, মুসলিম। এই চারটি নিষেধাজ্ঞা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অবশিষ্ট দু'টি নিষেধাজ্ঞা কেবল পুরুষের জন্য। সে দু'টো হচ্ছে— ১. সেলাই করা পোশাক পরিধান করা যাবে না ও মোজা পরিধান করা যাবে না। তবে কারো নিকট লুঙ্গি না থাকলে সে পাজামা পরতে পারবে আর জুতা না থাকলে পরতে পারবে মোজা। ২. মাথা ঢেকে রাখা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক বলেছেন, পুরুষ রমণী উভয়ের জন্য মুখমন্ডল আবৃত করা হারাম। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, মুখমন্ডল আবৃত করা হারাম কেবল রমণীদের জন্য। যেহেতু হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, পুরুষের জন্য মাথা আর নারীর জন্য মুখ ঢেকে রাখা হারাম। দারা কুতনী, বায়হাকী।

হজরত ওসমান বলেছেন, রসুল পাক স. এহরাম অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখাবয়ব ঢেকে রাখতেন। দারা কুতনী। তিনি বলেছেন, হাদিসটি মওকুফ। ফারাকেছা বিন উমায়ের হালাফী হজরত ওসমানকে আরজ নামক স্থানে এহরামের অবস্থায় মুখমন্ডল আবৃত রাখতে দেখেছিলেন। আমাদের দলিল হচ্ছে—হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক এহরামধারীকে তার বাহন আঘাত করলে সে মারা যায়। কাফনের সময় তাঁর মুখমন্ডল ঢেকে দেয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, মাথা ও মুখ ঢেকো না। সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে পুনরুত্থিত হবে।

এহরাম অবস্থায় বিবাহ করা যাবে কি না সে সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, এহরাম অবস্থায় নিজের কিংবা অন্যের বিবাহ সম্পাদন করা চলবে না। কাউকে উকিলও বানানো যাবে না। এরকম কিছু করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। হজরত ওসমান বর্ণিত হাদিসটি তাঁদের দলিল—যেখানে বলা হয়েছে, এহরাম অবস্থায় বিয়ে করা যাবে না, করানোও যাবে না। পাত্রীও দেখা যাবে না। মুসলিম, আবু দাউদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বিয়ে করা যাবে। বিয়ের চুক্তিও গ্রহণীয় হবে। যেহেতু আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. জননী মায়মুনাকে এহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি স. অবশ্য নব পরিণীতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এহরাম মুক্ত অবস্থায়। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস সম্পর্কে জমহুরগণ বলেছেন, হাদিসের বর্ণনা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইয়াজিদ বিন আসেম থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— জননী মায়মুনা বিনতে হারিস স্বয়ং আমাকে বলেছেন, রসুল স. যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন তিনি ছিলেন এহরাম মুক্ত। ইয়াজিদ বলেছেন, হজরত মায়মুনা আমার ও ইবনে আব্বাসের খালা। জমহুর বলেছেন, হজরত মায়নুনার বর্ণনাই অধিক গুরুত্ববহ। তিনি নিশ্চয় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের চেয়ে আপন অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া হজরত ওসমানের হাদিসে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। তদসত্ত্বেও হজরত ওসমানের হাদিস কওলী (কথা) এবং মাতা মায়মুনার হাদিস ফেলী (কর্ম)। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে রসুল স. এর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এঘটনাটি হয়তো সে রকমই বৈশিষ্ট্যভূত।

কলহ বিবাদ বিধেয় নয় (আলা জিদালা ফিল হাজ্জ)—ক্বারী আবু জাফর এখানে 'লা জিদালা' বাক্যাংশটিকে পড়তেন লা জিদালু এবং 'লাজিদ লুনা' অন্য ক্বারীগণ লা জিদালা-ই পড়েছেন।

মূর্খতার যুগের রীতি ছিলো হাজীরা আরাফার ময়দানের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতো। প্রত্যেকে মনে করতো আমি হজরত ইব্রাহিমের অবস্থানে আছি। এ মনোভাবের কারণে তাদের মধ্যে লেগে যেতো ঝগড়া ও মারামারি। ফলে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো। কেউ থাকতো আরাফায় আবার কেউ অবস্থান গ্রহণ

করতো মুজদালিফায়। কেউ হজ করতো জিলক্বদ মাসে কেউ জিলহজে। প্রত্যেকে ধারণা করতো তারা ঠিক কাজই করছে। এই ভ্রান্ত ধারণা উচ্ছেদ করতেই আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন-'আলা জিদালা ফিল হাজ্জ।' একথার মাধ্যমে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, সাবধান! রসুল স. যেভাবে হজ সমাপণ করলেন সেভাবেই হজ সম্পন্ন করতে হবে। ফলে এতে কোনো কলহ বিবাদ নেই। মুজাহিদ বলেছেন- একথার অর্থ হজ জিলহজ মাসেই অনুষ্ঠিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ বিবাদ নেই। এর মাধ্যমে 'নাসিয়া' কে বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ মোজার গোত্রগুলোর মধ্যে জীবন ধারণের উপকরণ ছিলো সামান্য। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও তাদের ছিলো না। সামান্য চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা। ওদিকে ইয়ামেনের হুমাইর গোত্রের অবস্থা ছিলো বেশ উন্নত। তাদের চাষাবাদের জমি ছিলো উর্বর। তদুপরি ব্যবসা বাণিজ্যেও তারা ছিলো অগ্রগামী। শিল্পসম্ভারেও এগিয়ে ছিলো তারা। মোজার গোত্রেরই একটি শাখার নাম কোরাইশ। সে হিসেবে ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিলো মোজার গোত্রের অধীনে। লুণ্ঠন, ছিনতাই, রাহাজানি এসকল ছিলো মোজার গোত্রের জীবিকার মূল মাধ্যম। তারা যাত্রীদের উপর হামলা করে তাদের ধন-সম্পদ ও পশুপাল ছিনিয়ে নিতো। নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতো। তারপর তাদেরকে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করতো। এটা হয়ে পড়েছিলো একটি সাধারণ নিয়ম। ফলে তাদের মধ্যে সবসময় লেগেই থাকতো যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া ফাসাদ। কিন্তু হজের মাসগুলো ছিলো এর ব্যতিক্রম। তখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও বসে যেতো তিনটি প্রসিদ্ধ মেলা—জুলমাজাজ, জুলমাজান্নাহ্ এবং ওকাজ। মেলা যাত্রীদের গমণাগমণ ও পণ্যসামগ্রীর সুষ্ঠ আমদানী রফতানীর জন্য তখন পথের নিরাপত্তা ছিলো অত্যন্ত জরুরী। তাই তারা রজব, জিলক্বদ, জিলহজ ও মহররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। মানুষেরা এ চারমাস নির্ভয়ে চলাচল করতে পারতো। যেখানে যখন খুশী যেতে পারতো। কিন্তু এতে করে লুণ্ঠনকারীদের স্বার্থ সংকুচিত হয়ে এলো। তারা তখন আবিষ্কার করলো এক নতুন ফন্দি। এ নতুন ফন্দির নাম 'নাসিয়া'। হজের পরে ওকাজের মেলায় কোরাইশদের সর্দার ঘোষণা দিলো—আগামী বছর মহররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে না। বন্ধ থাকবে সফর মাসে। পরের বছরের মেলায় সফর মাসের পরিবর্তে অন্য কোনো মাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো। এভাবে এক এক বছর এক এক রকম বিধান জারী করে তারা লুটপাটের সুযোগ সৃষ্টি করতো। কোরাইশরা ছিলো হজ অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক। তাদের এই জঘন্য 'নাসিয়া' রীতির মূলোৎপাটন করতেই আল্লাহ্পাক এখানে ঘোষণা করেছেন—'হজের সময়ে কলহ বিবাদ বিধেয় নয়।'

রসুল করীম স. এরশাদ করেন, শোনো! সেই যুগে ফিরে এসো— যে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিলো আসমান ও জমিন। এ নিয়মের কমবেশী করা যাবে না। বোখারী, মুসলিম।

'তোমরা যে সকল উত্তম কাজ করো আল্লাহ্পাক তা জানেন'—এ বাক্যটির মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের বর্ণনা শেষে উত্তমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিষিদ্ধতার পর দেয়া হয়েছে সৎকর্মের নির্দেশনা।

'তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়'— এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইয়ামেনবাসীরা পাথেয় না নিয়েই হজ যাত্রা করতো—বলতো আমরা মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল)। মুখে তারা এরকম বলতো বটে। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে শুরু করে দিতো ভিক্ষাবৃত্তি। বোখারী। বাগবী বলেছেন, তারা লুটপাটও করতো। একারণেই আল্লাহ্পাক বলেছেন, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো যেনো মক্কায় পৌঁছে প্রাত্যাহিক প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো এবং পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি থেকে রক্ষা পাও।

'আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়'— যাঞ্চা ও লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষা করাকেই এখানে আত্মসংযম বা তাকওয়া বলা হয়েছে।

এ আয়াতের শেষে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— 'আমাকে ভয় করো।' এ কথার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্কে প্রকৃত অর্থে ভয় করা কেবল বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বা জ্ঞানীগণের কাজ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৮

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

❐ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নাই। যখন তোমরা আরাফাত হইতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশয়ারুল হারামে পৌঁছিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে তাহাকে স্মরণ করিবে। যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

এখানে প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার অর্থ—হজের সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা। আয়াতে বলা হয়েছে এ সময়ে ব্যবসা করা কোনো পাপকর্ম নয়।

হজরত আবুদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখনকার প্রসিদ্ধ বাজার ছিলো তিনটি। ওকাজ, জুলমাজান্নাহ ও জুলমাজাজ। মুসলমানেরা ওই বাজারগুলোতে পণ্য বিপণন করাকে পাপ মনে করতেন। কিন্তু তা যে পাপ নয় সে কথাই আল্লাহপাক এ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। বোখারী।

ইমাম আহমদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট হজরত আবু উমামা তাহমী জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের বাহনগুলোকে মক্কা পর্যন্ত খাটাই। তাই কেউ কেউ বলে আমাদের হজ হয়নি। হজরত ইবনে ওমর বললেন, তোমরা কি অন্যের মতো হজের এহরাম গ্রহণ করো না? তাওয়াফ, সায়ী, কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি করো না? হজরত আবু উমামা বললেন, অবশ্যই করি। হজরত ইবনে ওমর বললেন, তবে তো তোমাদের হজ হয়েছেই। এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট তোমার মতোই প্রশ্ন করেছিলো। রসুল স. চুপ করেছিলেন। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই অবতীর্ণ হলো 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।'

'যখন তোমরা আরাফা থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে'— এখানে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন বুঝাতে ইফাদা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরাফাত একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ওই প্রান্তরের প্রতিটি অংশই আরাফা। তাই সমগ্র প্রান্তরকে বহুবচনে আরাফাত বলা হয়েছে। আরাফাতের নামকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন— ১. হজরত ইব্রাহিম আ.কে আরাফাত প্রান্তরের কতিপয় নিদর্শনের কথা বলা হয়েছিলো। সে নিদর্শনগুলো থেকে তিনি আরাফার মাঠ সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই ওই মাঠের নাম আরাফাত। ২. হজরত জিব্রাইল,হজরত ইব্রাহিমকে হজের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো পরিদর্শন করালেন। তখন হজরত ইব্রাহিম বললেন, আরিফতু (আমি চিনলাম) — আরাফা নামকরণ করা হয়েছে একথা থেকেই। ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আলী এ বক্তব্যের সমর্থক। ৩. হজরত জুহাক থেকে বাগবী বলেছেন— হজরত আদম পৃথিবীতে এসে ভারত ভূমিতে নামলেন এবং হজরত হাওয়া নামলেন জেদ্দায়। দীর্ঘ বিরহের পরে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটেছিলো এ মাঠে। এ যেনো ছিলো নতুন করে চেনা। তাই ওই মাঠের নাম হয়েছে আরাফা। ৪. সুদ্দী বলেছেন— হজরত ইব্রাহিম সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি হজের আহবান জানালেন। কেউ কেউ সে আহবানে সাড়া দিলো। তাঁরা তালবিয়া পড়তে পড়তে হজরত ইব্রাহিমের নিকট সমবেত হলো। আল্লাহপাক নির্দেশ করলেন— সবাই আরফাতের মাঠে যাও। হজরত ইব্রাহিমকে ওই মাঠের পরিচিতি দান করলেন আল্লাহ্পাক। তিনি তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আরাফা অভিমুখে চললেন। পথিমধ্যে আকাবা নামক স্থানে একটি গাছের নিকট এসে মুখোমুখি হলেন শয়তানের। থমকে দাঁড়ালো শয়তান। হজরত ইব্রাহিম তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন সাতটি কংকর। প্রতিটি নিক্ষেপের সময় তিনি তকবীর ধ্বনি দিলেন। শয়তান পালিয়ে

গেলো। হজরত ইব্রাহিম অগ্রসর হলেন দ্বিতীয় জুমরার স্থানে। সেখানেও তিনি তকবীর ধ্বনিসহ কংকর নিক্ষেপ করলেন। তৃতীয় জুমরার স্থানেও তিনি এ রকম করলেন- শয়তান আর পথরোধ করার সাহস পেলো না। হজরত ইব্রাহিম জুলমাজাজ নামক স্থানে পৌছলেন। সেখান থেকে আরও অগ্রসর হয়ে পৌছলেন আরাফায়। যে নিদর্শন সমূহ আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জানিয়েছিলেন সেই নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে তিনি সহজেই চিনে নিলেন আরাফা। সেদিন থেকেই এই ময়দানের নাম হলো 'আরাফা।' আরাফা প্রান্তরে সূর্য অস্তমিত হলো। হজরত ইব্রাহিম প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলেন। ফিরে এলেন মুজদালিফায়। ইজদিলাফ অর্থ নিকটে। তখন যে স্থানটির নিকটবর্তী হয়েছিলেন তিনি, সে স্থানের নামই হয়ে গেলো মুজদালিফা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম তালবিয়ার রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সন্তানকে জবাই করছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর তিনি ভাবতে শুরু করলেন ইঙ্গিতটি কোন দিক থেকে আসছে। আল্লাহ্‌র দিক থেকে, না শয়তানের দিক থেকে। তারবিয়া শব্দটির ধাতুগত অর্থ, চিন্তাভাবনা করা। তাই ওই দিনক'টির নাম হয়েছে ইয়াওমি তারবিয়া। স্বপ্নটি তিনি দেখেছিলেন আরাফার রাতে। চিন্তাভাবনার পর হজরত ইব্রাহিম বুঝতে পেরেছিলেন, স্বপ্নে ইঙ্গিত এসেছে আল্লাহর দিক থেকেই। যে স্থানে তিনি এই ইঙ্গিতের পরিচিতি পেয়েছিলেন, সেই স্থানের নামই আরাফা (পরিচয়)।

'তখন মাশয়ারুল হারামে পৌছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে'— মুজদালিফার দু'পাশের পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের নাম মাশয়ারুল হারাম। এই স্থানের বিস্তৃতি মাজমান থেকে মুহাস্‌সার উপত্যকা পর্যন্ত। অবশ্য মাজমান ও মুহাস্‌সার মুজদালিফার অন্তর্গত নয়। 'মাশআর' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে শিয়ার থেকে। 'শিয়ার' অর্থ নিদর্শন। হজের দর্শণীয় স্থান বলেই এই স্থানকে মাশআর বলা হয়েছে। আর হেরেম শরীফের অন্তর্ভূত বলেই বলা হয়েছে মাশয়ারুল হারাম। হজের বিধানবহির্ভূত কোনো কিছুই এখানে হালাল নয়। উর্না ব্যতীত আরাফার সকল স্থানই যেমন হাজীদের অবস্থানস্থল, তেমনি ওয়াদি মুহাস্‌সার ব্যতীত মুজদালিফার সকল স্থানও হাজীদের অবস্থানস্থল। এখানে মাগরিব ও এশা— এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করতে হয়। রসুল স. এরশাদ করেন, উর্না ব্যতীত আরাফার সকল স্থানে অবস্থান গ্রহণ কোরো। তেমনি মুজদালিফায় অবস্থানকালে ওয়াদি মুহাস্‌সার থেকে পৃথক থেকো। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিবরানী, তাহাবী ও হাকেম। বায়হাকী মাওকুফ ও মারফু উভয় পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত জোবায়ের বিন মুতয়েম, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবু রাফে

থেকে। হাদিসগুলোর সনদ সমালোচনামুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন মারফু পদ্ধতিতে।

আল্লাহ্পাক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করার অর্থ, মুর্খতার যুগের স্বকপোলকল্পিত স্মরণরীতিকে পরিত্যাগ করে খাঁটি তাওহীদের পদ্ধতিতে আল্লাহ্কে স্মরণ করো। এই সঠিক স্মরণ পদ্ধতি আল্লাহ্পাকই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানানোর আগে তোমরা এ সম্পর্কে ছিলে নিতান্তই অজ্ঞ, ইমান ও আনুগত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বেখবর।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৯

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

❒ অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হইতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হইতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করিবে। আর আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন-আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা হজের সময় সমবেত হতো আরাফায়। আর কোরাইশরা সমবেত হতো মুজদালিফায়। এই বৈসাদৃশ্যের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। হজরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন-কোরাইশরা হজের সময় মুজদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করতো। অন্যেরা অবস্থান নিতো আরাফায়। কেবল শায়বা ইবনে রবীয়া ছিলেন ব্যতিক্রম। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। বাগবী বলেছেন, কোরাইশরা নিজেদেরকে মনে করতো কুলীন। তাই অন্যদের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করাকে মনে করতো কৌলিন্যবিরোধী। বলতো, আমরা হলাম আল্লাহ্র পরিবারের সদস্য। আমরা হেরেমের অধিবাসী। তাই হেরেম পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। অন্য লোকেরা যখন আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করতো, তখন কোরাইশরা প্রত্যাবর্তন করতো মুজদালিফা থেকে। তাই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অন্যান্য লোকজন যেখান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেস্থান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। একথার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, আরাফায় অবস্থান করা হজরত ইব্রাহিম আ. ও হজরত ইসমাঈল আ. এর সুন্নত। আয়াতে অন্যান্য লোক (আন্নাস) কথাটির মধ্যে আত্মঘোষিত কুলীনরা ছাড়া অন্য সকলেই অন্তর্ভূত। জুহাক বলেছেন, এখানে আন্নাস অর্থ হজরত ইব্রাহিম। যেমন আম ইয়াহ্সুদুনান্নাস এর অর্থ গ্রহণ করা হয় হজরত মোহাম্মদ স.। এভাবেই 'ইজক্বলা লাহুমুন্নাসু ক্বদ জাময়া লাকুম বাকি' আননাস বলে বুঝানো

হয়েছে নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ীকে। জুহুরী বলেছেন, এখানে আন্নাস কথাটির অর্থ হবে হজরত আদম। তাঁর দলিল হচ্ছে, সাঈদ বিন জোবায়ের এ আয়াতটি উচ্চারণ করেছেন এভাবে— 'ছুম্মা আফিদু মিন হাইসু আফাদান্নাসু।' এই নাসু অর্থ হজরত আদম। কেনোনা নাসু অর্থ বিস্মৃত। হজরত আদম আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত হচ্ছে- আয়াতে ছুম্মা (অতঃপর) বলে আরাফাত থেকে মুজদালিফায় আগমনের পর মিনায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মত হচ্ছে, এখানে বলা হয়েছে আরাফা থেকে মুজদালিফায় প্রত্যাবর্তনের কথা। বস্তুতঃ এই ব্যাখ্যাটির সঙ্গে 'ছুম্মা' শব্দটি সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, আরাফাত থেকে রওনা হতে হয় মুজদালিফা থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে। তাই কোনো কোনো ভাষ্যকার ছুম্মা অব্যয়টির অর্থ 'অতঃপর' না করে 'এবং' করেছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে— এখানে ছুম্মা অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে আরাফায় ও মুজদালিফায় অবস্থানের গুরুত্ব বর্ণনার লক্ষ্যে। আরাফায় অবস্থান হজের রোকন, যা আদায় করা ফরজ। এই ফরজ পরিত্যাগ করলে হজই হবে না। মুজদালিফায় অবস্থান করা ফরজ নয়। সর্বসম্মত মত এই যে, মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন নয়। কেবল লাইস এবং আলকামা বলেছেন, মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন। তাঁরা তাঁদের পক্ষে কোরআনের এই নির্দেশটিকে পেশ করেছেন, 'ক্রীতদাস মুক্ত করো। ক্ষুধার অন্ন দান করো, আত্মীয়, এতীম এবং অভাবগ্রস্তদেরকে, অতঃপর তাদেরকেও যারা ইমানদার।' এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁরা বলতে চেয়েছেন, ইমান সকল সৎকর্মের শীর্ষে।

জ্ঞাতব্যঃ আরবী ভাষায় 'ছুম্মা' শব্দটি ব্যবহারে কর্মের পরম্পরা সূচিত হয়। ছুম্মা (অতঃপর) উল্লেখ করে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে পরে বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। দুই বর্ণনার ব্যবধান হিসেবে বসানো হয় এই শব্দটিকে। এই আয়াতে ছুম্মা ব্যবহৃত হয়েছে মুজদালিফার উল্লেখের পরে। এতে করে অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুজদালিফার পরে আরাফা। অথচ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। তাই মনে হয় ছুম্মা অব্যয়টি এখানে প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে রূপক অর্থে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানের ক্রমন্নোতির পর্যায়েও এই অব্যয়টির ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হয়। যেমন দাসমুক্ত করা সম্পর্কিত আয়াতটির শেষ দিকে ছুম্মা উল্লেখের পর ইমানের উল্লেখ এসেছে। সেখানে উল্লেখিত বিষয়গুলোর শীর্ষস্থানই হচ্ছে ইমান। উর্দু অনুবাদকের নিকট ব্যাখ্যাটি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন 'ছুম্মা কানা' দ্বারা হ্যাঁ বাচক বাক্য উল্লেখ করা হবে। কিন্তু অনেক ভাষ্যকার 'ছুম্মা কানা'কে না সূচক অর্থে নিয়েছেন। তারা বলেছেন, 'ছুম্মা কানা' সংশ্লিষ্ট হবে 'ইকতামাহাল আকাবাহ্' এর সঙ্গে। আর দু'টো বাক্যই না সূচক। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তাঁরা মু'মিনদের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে ছুম্মার ব্যবহার প্রকৃত অর্থে উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ, সর্বজনসমর্থিত

কর্মগুলোই উত্তম কর্ম। যেমন পিতৃহীনের প্রতিপালন, অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দান, ক্রীতদাস মুক্তি- এ সকল কাজ কাফেরদের দৃষ্টিতেও উত্তম। যদিও কেউ কেউ এ সকল প্রশংসিত স্বভাব থেকে বঞ্চিত। ওই লোকগুলো যেমন বর্ণিত সৎকার্যসমূহ থেকে বঞ্চিত তেমনি ইসলামের আবির্ভাবের পরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইমান থেকেও বঞ্চিত হয়ে রইলো। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

একথা নিশ্চিত যে, সর্ববাদিসম্মত মতানুযায়ী মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন নয়। তবে এটা ওয়াজিব কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব। জমহুর বলেছেন, এই ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানীর দিন ফজরের পর থেকে মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেছেন, এক ঘন্টার জন্য হলেও কোরবানীর রাতে মুজদালিফায় থাকা ওয়াজিব। ওয়াজিবের দলিল পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে (যখন তোমরা আরাফাত থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে)। মুজদালিফা বা মাশয়ারুল হারামে আল্লাহ্কে স্মরণ করার যে কথা বলা হয়েছে, তার জন্য আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন শর্ত। তাই মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব হওয়ার বিষযটি সুসাব্যস্ত। কেউ যদি বলে, মুজদালিফায় আল্লাহ্র স্মরণ করার বিষয়টি মোস্তাহাব বলে মনে হয়— এর জবাবে বলা যেতে পারে, ঔদাসিন্য অপসারণ করাই জিকির বা আল্লাহ্-স্মরণের উদ্দেশ্য। আর জিকির যেমন উচ্চারণের মাধ্যমে হতে পারে, তেমনি হতে পারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাও।

হাদিসবেত্তাগণ বলেন, যে আল্লাহ্পাকের অনুগত নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্পাকের স্মরণকারী। মুজদালিফায় অবস্থান আল্লাহ্পাকের নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন ওয়াজিব। নির্দেশ পালনকারীও তাই আল্লাহ্পাকের জিকিরকারী। তাছাড়া মুজদালিফায় তালবিয়া পড়তে হয়, দোয়া করতে হয় এবং নামাজও পাঠ করতে হয়। এগুলোও জিকির। মুজদালিফায় অবস্থান যে ওয়াজিব সে কথা কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এই ওয়াজিব হাদিস শরীফ দ্বারাও সুসাব্যস্ত। যেমন— ওরওয়া বিন মাজরাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর দিন ফজরের নামাজে আমাদের সঙ্গে মুজদালিফায় উপস্থিত থাকবে এবং বিগত দিন অবস্থান করবে আরাফায় তাঁর হজ হয়ে যাবে। সুনান প্রণেতাগণ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম এ বর্ণনাটি এনেছেন। বর্ণনাটিতে আরাফার সাথে সাথে মুজদালিফায় অবস্থানের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব। নাসাঈ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুজদালিফায় তার ইমামকে পেয়েছে সে পেয়েছে তার হজকে; যে পায়নি সে হজও পায়নি। আবু ইয়া'লী বলেছেন, যে ব্যক্তি মুজদালিফা পায়নি সে হজও পায়নি। এতে করে বুঝা যায়, মুজদালিফায় সুবহে সাদেকের পর অবস্থান গ্রহণ করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। উপরন্তু আলোচ্য আয়াত দ্বারাও মুজদালিফায় অবস্থান যে ওয়াজিব সে

কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। এখানে আরাফায় অবস্থানের সাথে সাথে মুজদালিফায় অবস্থানের কথাও রয়েছে।

ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, আরাফায় অবস্থানের সময় শেষ রাত পর্যন্ত। তাই কেউ যদি দশম জিলহজের রাত পর্যন্ত একঘন্টার জন্যও আরাফায় অবস্থান করেন তবে তার হজ সম্পন্ন হবে। নিঃসন্দেহে মুজদালিফায় অবস্থানের সূচনা হয় প্রত্যূষের পরে। হজরত আবদুর রহমান বিন ইয়াম্মার দায়লামী বলেছেন, আমি প্রত্যক্ষদর্শী যে, রসুল পাক স, আরাফার মাঠে অবস্থান নিয়েছিলেন। লোকজন সেখানে সমবেত হচ্ছিলো। এক সময় নজদবাসীরাও এলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, হজ কী? রসুল করীম স. বললেন, নবম জিলহজে আরাফার প্রান্তরে অবস্থান নেয়ার নামই হজ। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের আগেই মুজদালিফায় উপস্থিত হলো সে হজ পেয়ে গেলো। এরপর মিনায় অবস্থানের দিনগুলো আইয়ামে তাশরিক। সেখানে যে ব্যক্তি দু'দিন অবস্থান করে চলে গেলো তার কোনো অপরাধ নেই। আর যে সেখানে দু'দিনের বেশী থাকলো তারও কোনো দোষ নেই। তাহাবী। এ হাদিসের প্রেক্ষিতে ইমাম মালেক বলেছেন, ফজরের পূর্বেই মুজদালিফায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। কেনোনা সুনান প্রণেতা, হাকেম, দারা কুতনী ও বায়হাকী যে উদ্দেশ্যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; তাতে করে বুঝা যায়, আরাফায় অবস্থানই প্রকৃত হজ। আরাফায় অবস্থানের পর ফজরের আগেই যদি কেউ মুজদালিফায় পৌছে যায়, তবে সে তার হজকে পূর্ণ করেই নেয়। মুজদালিফায় গমনের সময় নির্ধারণ করা এ হাদিসের উদ্দেশ্য নয়। এ হাদিসটি থেকে আবার ইমাম আহমদ এই দলিল গ্রহণ করেছেন যে, মুজদালিফায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব। কেনোনা রসুল স. মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করেছেন এবং ফজরের নামাজের পরেও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি স. আরও বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের পদ্ধতি শিখে নাও।

আমি বলি, বর্ণিত দলিলের প্রেক্ষিতে বুঝা যায়, মুজদালিফায় রাত্রিবাস ও সেখানের ফজরের নামাজে অংশ গ্রহণ দু'টোই ওয়াজিব। কিন্তু তিনি স. তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁরা দুর্বল তাঁদেরকে ভোরবেলাতেই মুজদালিফা থেকে মিনায় যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যূষের পরে মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব নয়। যেমন বোখারী ও মুসলিম তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ভোরবেলায় যাঁদেরকে মিনায় পাঠিয়েছিলেন আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আসমা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. চাঁদ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং উম্মে হাবীবা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। এ সকল বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, দুর্বল ব্যক্তিদের অনুমতি লাভের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, যাঁরা দুর্বল নয় তাঁদের জন্য

মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব নয়। কেউ যদি বলে, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে যে, আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করা ওয়াজিব। অথচ বলা হচ্ছে, মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন নয়— তবে আরাফার অবস্থান কী করে হজের রোকন হয়? এর জবাব হচ্ছে, আরাফায় অবস্থান যে হজের রোকন একথা সাব্যস্ত হয়েছে ঐকমত্যের মাধ্যমে। তাই আরাফায় অবস্থান না করলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু মুজদালিফায় অবস্থান না নিলে হজ বাতিল হবে না। ঐকমত্যের সনদ হচ্ছে এই, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আরাফায় অবস্থানের নামই হজ। এই একক বর্ণনাটির (খবরে ওয়াহেদের) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঐকমত্য পোষণকারীগণ রসুল স. এর উক্তি থেকেই আরাফায় অবস্থানের রোকন হওয়াকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আরাফা প্রান্তরে অবস্থানের সময়সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আহমদ বলেছেন, আরাফায় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে নয়ই জিলহজ সকাল থেকে। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী বলেছেন, দ্বিপ্রহরের পর থেকে। আর ইমাম মালেক বলেছেন, নয়ই জিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে দশ তারিখের সুবহে সাদেক পর্যন্ত। হজরত আবদুর রহমান বিন ইয়াম্মার দায়লামী বর্ণিত হাদিসটি ইমাম মালেকের দলিল, যেখানে পরিষ্কাররূপে বলে দেয়া হয়েছে— ওই ব্যক্তির হজ সমাধা হয়েছে, যে দশই জিলহজ সুবহে সাদেকের পূর্বে মুজদালিফায় উপস্থিত হতে পেরেছে। ইমাম আহমদের দলিল হচ্ছে, ওরওয়া বিন নাদরানের ওই হাদিস— যেখানে বলা হয়েছে, যারা আরাফার দিনের পূর্বে দিনে বা রাতে আরাফায় উপস্থিত হলো, তাদের হজ হয়ে গেলো। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী। মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিসটিতে বলা হয়েছে- রসুল স. তালবিয়ার দিনে (আটই জিলহজ) বাহনে আরোহী হয়ে মিনায় গমন করলেন। সেখানে তিনি আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর। সূর্যোদয় হলো। তিনি স. লোক মারফত আরাফার মাঠে তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করলেন। তারপর যাত্রা করলেন আরাফা অভিমুখে। সেখানে তাঁর জন্য নির্মিত তাঁবুর সম্মুখে অবতরণ করলেন তিনি। দ্বিপ্রহরের পর তিনি আরোহন করলেন তাঁর কোসওয়া নামক উস্ট্রীতে। কোসওয়া উপনীত হলো বাতন উপত্যকায়। এই বিবরণটির মাধ্যমে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, আরাফায় প্রকৃত অবস্থানের সময় হচ্ছে দ্বিপ্রহরের পর। আরাফায় অবস্থানের সময় যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে হতো, তবে তখনই তিনি স. বাতন উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করতেন, তাঁবুতে থাকতেন না। এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের বিবরণে কেবল এতটুকুই বুঝা যায়, দ্বিপ্রহরের পরে আরাফায় অবস্থান গ্রহণ উত্তম। এতে করে একথা বুঝা যায় না যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে সেখানে অবস্থান নেয়া যাবেই না। আর সালিম বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর আরাফার দিন দুপুরের পর

হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হলেন। আমিও ছিলাম তাঁর সঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বললেন, হাজ্জাজ যদি তুমি সুন্নতসম্মত আমল করতে চাও, তবে এক্ষুণি যাত্রা করো। হাজ্জাজ বললো, ঠিক আছে। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিপ্রহরের পর আরাফায় অবস্থান উত্তম। কিন্তু এতে করে একথা বুঝা যায় না যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে অবস্থান গ্রহণ জায়েয নয়।

'আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'— একথার মধ্যে এই মর্মে নির্দেশ এসেছে যে, মূর্খতার যুগে তোমরা হজের নামে যে সকল অশোভন কর্মকান্ড করতে, সে সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। আল্লাহ্‌পাক তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি ক্ষমা পরবশ, পরম দয়ালু।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২০০, ২০১, ২০২

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ○ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

❒ অতঃপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। মানুষের মধ্যে অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকালেই দাও।' বস্তুতঃ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই।

❒ এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।'

❒ তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

'যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে'— এখানে হজের অনুষ্ঠান বলতে বুঝানো হয়েছে আকাবার কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী, মস্তক মুন্ডন, তাওয়াফ ও সায়ী। কোরবানীর দিন এগুলো সম্পন্ন করতে হয়। জানা প্রয়োজন যে, হজের মূল অনুষ্ঠান বা রোকন তিনটি- এহরাম, আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে জিয়ারত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সায়ী এবং মস্তক মুন্ডনও রোকনের অন্তর্ভূত। ইতোপূর্বে সায়ীর আলোচনা হয়েছে। আর মস্তক মুন্ডনের আলোচনা আসবে সুরা হজে।

'তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে'— এখানে আল্লাহ্র স্মরণের অর্থ, অধিক পরিমাণে হামদ, সানা ও তকবীর পাঠ। পিতৃপুরুষের স্মরণ প্রসঙ্গে মূর্খতার যুগের ওই কুসংস্কারটির কথা উল্লেখ করতে হয়- জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীরা হজ সমাধা করার পর বায়তুল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতো আর বর্ণনা করতে থাকতো পিতৃপুরুষদের বীরত্ব গাথা ও প্রশংসা। আল্লাহ্পাক এখানে সেই কুসংস্কারটির মূলোৎপাটনের নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, পিতৃপুরুষদের নয়, প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনা করতে হবে পরম প্রভুপ্রতিপালকের যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের এবং সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি জাতও নন, জন্মদানকারীও নন। কিন্তু তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেন। যেমন, এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, যা নিক্ষেপ করো স্ত্রীজরায়ুতে তার স্রষ্টা কি তোমরা-না আমি।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্ম হচ্ছে- শিশু সন্তানেরা যেভাবে পিতামাতাকে স্মরণ করে তোমরাও সেভাবে স্মরণ করো আল্লাহ্কে। আমি বলি, এ বক্তব্যটি অধিকতর সুসংহত হতো, যদি পিতৃপুরুষের স্থলে মাতার কথা উল্লেখ থাকতো।

'ওয়াআশাদ্দু জিকরা' (অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে)— একথার মাধ্যমে জিকিরের গভীরতর আবেদন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পিতৃপুরুষদের স্মরণের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র জিকির কখনো পিতৃপুরুষদের জিকিরের সমান্তরাল নয়। সুতরাং জিকিরে আরো অধিক মগ্নতা ও গভীরতা বাঞ্ছনীয়।

অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও'— আখেরাতের কল্যাণই সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ। হাদিস শরীফে কল্যাণ প্রার্থনার বিবরণ এসেছে এরকম— আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খইরি কুল্লুহু আজিলুহু ওয়া আজালুহু মা আমিলতু মিনহু ওয়া মালাম আ'লাম।

অবিশ্বাসী মুশরিকেরা আখেরাতের কল্যাণ চায় না। পৃথিবী পাওয়াই তাদের কাছে চরম ও পরম পাওয়া। অনেকে বলে— একথার মাধ্যমে ওই সকল অবিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীর দাস। তারা বলে, আমাদেরকে ইহকালেই দান করো। আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, এদের জন্য পরকালে কোনো কল্যাণ নেই।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং তাদের মধ্যে অনেকে বলে'— একথার অর্থ মানুষের মধ্যে যাঁরা ইমানদার তাঁদের প্রার্থনার বাণী এ রকম— 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও, পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।' 'ওয়াফিল আখিরতি হাসানা' অর্থাৎ পরকালের কল্যাণ অর্থ আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ ও আখেরাতের নেয়ামতের অফুরন্ত সম্ভার। বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিবেদনটিও রয়েছে। তাই পৃথিবী ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনার সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠে একথাটিও উচ্চারিত হয় যে, আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে স্বসূত্রে বাগবী বলেছেন, রসুল স. এক দুর্বল আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সে ছিলো ডিমের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা পক্ষীশাবকের চেয়েও দুর্বল। রসুল স. বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌পাকের নিকট কিছু যাঞ্চা করেছিলে? লোকটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আল্লাহ্‌পাককে বলেছিলাম, হে মেহেরবান আল্লাহ্! তুমি পৃথিবীতেই আমাকে পরকালের শাস্তি দিয়ে দাও। রসুল স. বললেন, সুবহানাল্লাহ্! সেই আযাব সহ্য করার শক্তি কি তোমার রয়েছে? তুমি এরকম প্রার্থনা করলে না কেনো, 'রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুন্‌ইয়া হাসানা, ওয়া ফিল আখিরতি হাসানা, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. প্রায়শঃই 'রব্বানা আতিনা........' এই প্রার্থনাটি করতেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈব বলেছেন, এই দোয়াটি রসুল স. পাঠ করতেন রোকনে জামাহ্ এবং রোকনে আসওয়াদে। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও ইবনে আবী শায়বা। আবুল হাসান বিন জুহাক বর্ণনা করেছেন–হজরত আনাস বলেছেন, রসুল আকরম স. শতবার দোয়া করলেও সকল দোয়ার শুরু এবং শেষে থাকতো, 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও.....' এই প্রার্থনাটি। এক সঙ্গে দু'টি প্রার্থনাবাণী উচ্চারিত হলে এই প্রার্থনাটি উচ্চারিত হতো দু'বার। হজরত আনাস থেকে নক্বী বিন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন- রসুল স. এর প্রার্থনার প্রথমে, মধ্যস্থলে এবং শেষে থাকতো, 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৩

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

❒ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে। যদি কেহ তাড়াতাড়ি দুই দিনে চলিয়া আসে তবে তাহার কোন পাপ নাই। আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই। ইহা তাহার জন্য যে সাবধানে চলে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে তোমাদিগকে তাহার নিকট একত্র করা হইবে।

পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় দল (যারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকামী) কে লক্ষ্য করে এখানে নির্দেশ এসেছে, তোমরা নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম দল (যারা কেবল পৃথিবী চায়) এবং দ্বিতীয় দল— এই দুই দলকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই নির্দেশ। পূর্বের আয়াতের শেষে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। এ সম্পর্কে হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক চোখের পলক নিক্ষেপের চেয়েও দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, একথার উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত সমাগত, সুতরাং সত্বর আখেরাতমুখী হও।

'আইয়ামে মা'দুদাত' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন। একথা বলে বোঝানো হয়েছে আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোকে (জিলহজের ১১, ১২, ১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরিক বলা হয়)। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এরকম বলেছেন— 'যদি কেউ তাড়াতাড়ি দুই দিনে চলে আসে'— একথার অর্থ আইয়ামে তাশরিকের তিনদিন পুরো না ক'রে যারা দু'দিন অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করে। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দু'দিনের পর তৃতীয় দিন যারা মিনার ময়দানে অবস্থান করে, তাদের জন্য তৃতীয় দিনের কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, তৃতীয় দিন বলতে তৃতীয় রাত না তৃতীয় দিন ধর্তব্য। জমহুর বলেছেন, রাত ধর্তব্য। অর্থাৎ তৃতীয় রাতে যারা মিনায় অবস্থান করবে তারা প্রস্তর নিক্ষেপ ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তৃতীয় রাতের আগমন ঘটলেও কংকর নিক্ষেপ জরুরী নয়। তবে রাত শেষে সুবেহ সাদেক এসে গেলে কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে। আর সুবেহ সাদেকের আগে চলে গেলে প্রস্তর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে কংকর নিক্ষেপের বিধান কার্যকর হয় দিবাভাগে। সুতরাং যে রাতে প্রস্থান করে তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে জুমআর নামাজের আগেই সফরে রওয়ানা হয়ে যায় (মুসাফিরের উপর জুমআ ফরজ হয় না)। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, রাতের বেলা কংকর নিক্ষেপের বিধান নেই। কিন্তু মিনায় যেহেতু রাত্রিবাস ঘটেছে, তাই রাত্রিশেষে আগত দিনে কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে। রাত এসে গেলে সন্নিহিত দিবসের কংকর নিক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রস্থান করা সিদ্ধ নয়। বলা হয়েছে, যারা দু'দিন (মিনায়) অবস্থান করে তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং যারা বিলম্ব ক'রে তিনদিন অবস্থানের পর প্রস্থান করে,

তাদের কারো জন্যই কোনো পাপ নেই। তাড়াতাড়ি গমনকারীরা আমল করে রুখসতের (সহজসাধ্যতার) উপর এবং বিলম্বে গমনকারীরা আমল করে আজিমতের (শ্রমসাধ্যতার) উপর। এই বিধানটি ঘোষণার মাধ্যমে মূর্খতার যুগের একটি জঘন্য মানসিকতার অপনোদন করা হয়েছে। মূর্খতার যুগে কেউ কেউ দ্রুত প্রস্থানকারীদেরকে পাপী মনে করতো। আবার কেউ কেউ পাপী মনে করতো বিলম্বে প্রস্থানকারীদেরকে।

'লিমানিত্তাক্বা' (এটা তাদের জন্য যারা সাবধানে চলে)— এই বাক্যটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, সাবধানতা বা আল্লাহ্‌ভীতি প্রতিটি কর্মের মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, যে সাবধানে চলে অর্থ, যে ব্যক্তি হজের আদিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে এবং পরিত্যাগ করে নিষিদ্ধ বিষয়সমুহ। এরূপ সাবধানী ব্যক্তি দ্রুততার সঙ্গে অথবা বিলম্বে– যেভাবেই প্রস্থান করুক না কেনো, সে অপরাধী নয়। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ এরকম অভিমতই পোষণ করেন। বাগবী একথা বলেছেন। এর সমর্থনে একটি মারফু হাদিসও রয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত ওই হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি হজের সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ এবং দূষণীয় কর্ম থেকে মুক্ত থাকে, সে হয়ে যায় সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. এরশাদ করেন, হজে মাবরুর (শরিয়তসম্মত হজ) এর প্রতিদান হলো জান্নাত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কামারের ভাটি যেমন লোহার মরিচা দূর করে, তেমনি হজ ও ওমরা দূর করে অভাব ও পাপকে। শাফেয়ী, তিরমিজি। হজরত ওমর থেকে আহমদও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মিনায় রাত্রিযাপন, প্রস্তর নিক্ষেপ- এসব হজের রোকন (মূল অনুষ্ঠান) নয়। মূল অনুষ্ঠানসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে পূর্বের আয়াতগুলোতে। সুতরাং পরের বিধানগুলো যে হজের রোকন নয়, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু পরের অনুষ্ঠানগুলো (আলোচ্য আয়াত যার বিবরণদানকারী) কোনটি ওয়াজিব এবং কোনটি ওয়াজিব নয়, সে ব্যাপারে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, মিনা প্রান্তরে রাত্রিবাস ও কংকর নিক্ষেপ— দু'টিই ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেছেন, রাত্রিযাপন ওয়াজিব এবং কংকর নিক্ষেপ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু হানিফা। তাঁর মতে, রাত্রিবাস সুন্নত এবং কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী থেকে দু'টি অভিমতের বর্ণনা এসেছে। একটি মত ইমাম আহমদের অনুকূল। অন্যটি ইমাম আবু হানিফার। কোনো কোনো আলেমের অভিমত হচ্ছে— – তকবীরের হেফাজতই কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য। তাই কেউ যদি কংকর নিক্ষেপ ছাড়াই কেবল তকবীর উচ্চারণ করে, তবে তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। জননী আয়েশা ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইবনে জারীর এরকমই

বলেছেন। এই অভিমতটি আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে, কিন্তু ঐকমত্যের প্রতিকূল।

ইমাম আহমদের দলিল, আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যটি। এখানে নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র স্মরণ— রাত্রিযাপন ও কংকরনিক্ষেপ উভয়টির ওয়াজিব হওয়াকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। এখানে রাত্রি যাপন ও কংকর নিক্ষেপকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়নি। রসুল স. এর আমল থেকেও এ দু'টির ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, আমার নিকট থেকে তোমরা হজের পদ্ধতি শিখে নাও। ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যেই মিনায় অবস্থান গ্রহণ করতে হয় এবং দিবসের প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন করতে হয়। কেবল রাত্রি যাপন মিনায় অবস্থানের উদ্দেশ্য নয়। দলিল হিসাবে তিনি বোখারী বর্ণিত হাদিসটিকে গ্রহণ করেছেন- যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বাতনে ওয়াদি (ওয়াদি উপত্যকা) থেকে কাঁকর ছুঁড়ে মারছিলেন। লোকেরা বললো, অন্য সকলে তো উপর দিক থেকে পাথর ছুঁড়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই সেই পরম সত্তার শপথ! যেস্থান থেকে আমি কাঁকর ছুঁড়ছি, সেস্থানটি ছিলো ওই মহামানবের যাঁর উপর সুরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র স্মরণ অর্থ, কংকর নিক্ষেপণ। ইমাম আবু হানিফার দ্বিতীয় দলিল— হজরত আসেম বিন আদী বলেছেন, রসুল স. মিনায় পৌঁছে উটের রাখালদেরকে রাতেই চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোরবানীর দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ সেরে নাও। এরপর এগারো, বারো এবং প্রত্যাবর্তনের দিনের নিক্ষেপ সম্পন্ন করো। নাসাঈ বলেছেন, রসুল স. রাতেই প্রস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, কোরবানীর দিনের এবং পরের দু'দিনের কংকর নিক্ষেপন একই সঙ্গে সম্পন্ন করো (একই দিনে তিন দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ সেরে নাও)। ইমাম মালেক বলেছেন, হাদিসটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোরবানীর দিনে কংকর নিক্ষেপ করবে। কোরবানীর দিনের পরের দিন অতিবাহিত হলে, অর্থাৎ বারো তারিখের কংকর নিক্ষেপের পূর্বে এগারো তারিখের কংকর নিক্ষেপের কাজা আদায় করবে। কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তাই রসুল স. এর কাজা আদায় করতে বলেছেন। মিনায় অবস্থানের কাজা আদায় করতে হবে একথাটি তিনি বলেননি। এতে করে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, প্রস্তর নিক্ষেপই মূল বিষয় এবং মিনায় অবস্থান ও রাত্রিক্ষেপন ওই উদ্দেশ্যের অনুষঙ্গ।

এই হাদিসের জবাবে ইমাম আহমদ বলেছেন, রাখালদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো প্রয়োজনবশতঃ। এই অনুমতিদানের অর্থ এই নয় যে, মিনায় অবস্থান করা ওয়াজিব নয়। এরকম ওয়াজিব বিধানের ক্ষেত্রেই তো অনুমতি ও অবকাশ (রুখসত) দেয়া হয়ে থাকে। ইমাম মালেকের দলিল হচ্ছে- হজরত ওমর এবং

হজরত ইবনে ওমর ওই সময় নামাজের বাইরের সকল অবস্থায় তকবীর উচ্চারণ করতেন। তাদের তকবীর ধ্বনি শুনে অন্য মানুষেরাও তকবীর উচ্চারণ করতেন। এই আয়াতকে তাঁরা দলিল হিসাবে গ্রহণ করতেন এবং বলতেন আইয়ামে তাশরিকে একমাত্র মিনা ব্যতীত অন্য কোথাও তকবীর বলা ওয়াজিব নয়। ইবাদত প্রতিপালন ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থান করাই জিকির। এর সঙ্গে মুখে যদি দোয়া ও তকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হয় তবে তা উত্তম। কাজেই আয়াতের মূল নির্দেশ হচ্ছে মিনায় অবস্থান গ্রহণ— কংকর নিক্ষেপ নয়। আমরা বলি, অবস্থান ও কংকর নিক্ষেপ দু'টিই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। জেনে রাখার প্রয়োজন যে, আয়াতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও এ সম্পর্কিত হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে— কোরবানীর দিনে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের সময় সাতটি কংকর ব্যবহার করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, কংকর নিক্ষেপের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিনে ফজরের পর থেকে। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মতে চাঁদের দশ তারিখের অর্ধ রাত্রির পর থেকে। মুজাহিদের মতে সূর্যোদয়ের পর থেকে।

মুজাহিদের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. তাঁর পরিবারের দুর্বল সদস্যদেরকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ো না। তিরমিজি। আমরা বলি, এই নির্দেশটি মোস্তাহাব প্রকৃতির। প্রকৃত কথা হচ্ছে— সুবহে সাদেকের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে স্বসূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত ইবনে আব্বাস ও অন্য দুর্বলদেরকে সুবহে সাদেকের পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদেকের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন সুবহে সাদেকের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। তাঁদের দলিল হচ্ছে, হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. হজরত উম্মে সালমাকে দশ তারিখের রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ফজরের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ করে আরও অগ্রসর হয়ে 'তাওয়াফে ইফাদা' সম্পন্ন করেছিলেন। দারা কুতনী। আমরা বলি এই হাদিসটির সূত্রভূত জুহাক বিন ওসমান একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, হজরত উম্মে সালমা ফজরের নামাজের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলেন। ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে নয়। এই দলিলটি আমাদের পক্ষে এবং মুজাহিদের বিপক্ষে।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, প্রস্তর নিক্ষেপের শেষ সময় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। জমহুরের মতে প্রস্তর নিক্ষেপের শেষ সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেনোনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরবানীর দিন রসুল স. কে যে সকল প্রশ্ন করা হয়েছিলো সেগুলোর উত্তরে তিনি বলেছিলেন কোনোই অসুবিধা নেই। যেমন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো জবাইয়ের পূর্বেই মাথা

মুড়িয়েছি। তিনি স. বললেন কোনো অসুবিধা নেই। এখন জবাই করো। আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রিয় নবী! আমি তো এশার নামাজের পরে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছি। তিনি স. বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। বোখারী। তবে এখানে এশার পরে কথাটির অর্থ হবে দ্বিপ্রহরের পরে- সূর্যাস্তের পরে নয়। যেহেতু কোরবানীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্তই থাকে।

প্রস্তর নিক্ষেপের শেষ সময় হচ্ছে— এগারো তারিখের ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত। কেনোনা রসুল পাক স. রাখালদেরকে রাতের বেলায় কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবি শায়বা এ রকম বলেছেন। এই অনুমতিদান থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অক্ষমদের জন্য রাতে প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। কিন্তু যারা সমর্থ তাদের জন্য এরকম করা মাকরূহ। আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোতে (এগারো, বারো ও তেরোই জিলহজে) প্রস্তর নিক্ষেপ করা উচিৎ। প্রতিটি স্তম্ভের জন্য সাতটি প্রস্তর নির্ধারিত। প্রথম দিন প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে ফজরের পরে। দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পরে। যেহেতু হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রসুল স. প্রস্তর নিক্ষেপ করেননি।

প্রস্তর নিক্ষেপের সময়সীমা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষমদের জন্য পরবর্তী দিনের সুবহে সাদেক পর্যন্ত। যারা সমর্থ তাদের জন্য সুবহে সাদেক পর্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ বিলম্বিত করা মাকরূহ। তৃতীয় দিবসেও প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। এটা ঐকমত্য যে, তৃতীয় দিবসে সূর্যাস্তের পর প্রস্তর নিক্ষেপ বৈধ নয়। কারণ আইয়ামে তাশরিকের শেষ সীমা তৃতীয় দিবসের সূর্যাস্ত পর্যন্তই। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তৃতীয় দিবসে (১৩ই জিলহজে) দ্বিপ্রহরের পূর্বেও প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। ইবনে হুম্মাম বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, প্রস্থানের দিন (১৩ই জিলহজ) সূর্যকিরণ প্রখর হতে শুরু করলে প্রস্তর নিক্ষেপ ও তাওয়াফের সময় হয়ে যায়। বায়হাকী। কিন্তু এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী তালহা বিন ওমরকে জয়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন বায়হাকী, ইবনে মুঈন ও দারাকুতনী। ইমাম আহমদ তাকে বলেছেন পরিত্যক্ত।

পর্যায়ক্রমে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে, না যেভাবে খুশী নিক্ষেপ করা যাবে— সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের নিকট তারতিব (পর্যায়ক্রম) ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার মতে সুন্নত। জমহুরের বক্তব্য হচ্ছে- ইবাদত সম্পর্কিত বিষয় কারও মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে তারতিব লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই তারতিব ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি তিনটি জুমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ একটি ইবাদতের অন্তর্ভূত হতো তবে তারতিব ওয়াজিব হতো। কিন্তু তিনটি জুমরায় প্রস্তর নিক্ষেপ পৃথক পৃথক তিনটি ইবাদতের পর্যায়। সুতরাং প্রস্তর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমকে মান্য করা ওয়াজিব নয়।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুযায়ী তারতিব শর্ত নয় বটে কিন্তু ওয়াজিব। কারণ প্রস্তরনিক্ষেপ পরিত্যাগকারীর জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয়। যেমন ওয়াজিব হয় কোরবানী, মস্তক মুন্ডন ও প্রস্তর নিক্ষেপের তারতিব ভঙ্গ করলে। সুতরাং তিনটি জুমরায় প্রস্তর নিক্ষেপের ক্রম ভঙ্গ করলেও কোরবানী ওয়াজিব হওয়া উচিৎ।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং একথা স্মরণে রেখো যে আল্লাহ্র নিকটই তোমাদের সকলকে সমবেত হতে হবে। তখন তোমাদের বিশুদ্ধচিত্তসম্বলিত সৎকর্মসমূহের প্রতিদান দেয়া হবে তোমাদেরকে।

কালাবী, মুকাতিল ও আতার উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী বলেছেন, আখনাস্ বিন শরিফ ছিলো বনি জোহরার মিত্র। আখনাস্ অর্থ অতিপশ্চাদবর্তী। বদর যুদ্ধে আখনাস্ রসুল স. এর সহযোগী হয়নি। সে তার তিনশ' অনুগামী নিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো। আখনাস্ ছিলো মিষ্টভাষী ও সৌম্যকান্ত। সে প্রায়শঃই রসুল স. দরবারে উপস্থিত হয়ে সুচতুর বাক্যালাপের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করতো যে, সে রসুল স.কে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসে। রসুল স. তার এই ভালোবাসাকে মনে করতেন অকৃত্রিম। কিন্তু আখনাস্ ছিলো খাঁটি মুনাফিক। সেই আখনাস্ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

❒ মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যাহার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃত পক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী।

❒ যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।

❒ যখন তাহাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর' তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যোগ্য। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

❒ মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহের সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তাহার দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি বলতে মুনাফিক আখনাস্‌কে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, হে প্রিয় রসুল! আখনাসের কথাবার্তা আকর্ষণীয় হলেও তার অন্তর অপবিত্র। সুদ্দী বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. একটি ক্ষুদ্র সেনাদলকে একটি বিশেষ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। ওই সেনাদলে ছিলেন হজরত আসেম এবং হজরত মাশহাদ। সেনা দলটি পরাস্ত হলো। তখন মুনাফিকদের মধ্যে দুই ব্যক্তি বললো, এরা কতোই না হতভাগ্য। তারা পরিবার পরিজনকে হারালো। আবার তাদের নেতা মোহাম্মদের নির্দেশও প্রতিপালন করতে পারলো না। মুনাফিকদ্বয়ের এই কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে— এ কথার অর্থ তার কথাগুলো সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয়। কিন্তু তার কথাগুলো অন্তর থেকে উৎসারিত নয়। তাই পৃথিবীতে মনোমুগ্ধকর হলেও আখেরাতে ওগুলোর কোনোই মূল্য নেই। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, মুনাফিকেরা যে ইমান ও ভালোবাসার কথা বলছে (আপনি সরল ও পবিত্র তাই) সে কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছেন— কিন্তু তাদের কথার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কেবল পার্থিব স্বার্থ, মিথ্যাচারিতা। আল্লাহর নামে তারা মিথ্যা শপথ করে চলেছে। সেই শপথকে বিশ্বাস্য মনে করে আপনি চমৎকৃত হচ্ছেন। 'আল্লাহর শপথ! আমি ইমানদার। আপনাকে খুব ভালোবাসি'— এ সকল কথা কেবল তাদের মুখেরই কথা। প্রকৃত পক্ষে তারা আপনার ঘোর বিরোধী।

ঘোর বিরোধী বুঝাতে এখানে 'খিসাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি খাসামতু শব্দের ধাতু। জুজায বলেছেন, শব্দটি খাসাম শব্দের বহুবচন। বাহার শব্দের বহু বচন যেমন বিহার, তেমনি খাসাম শব্দের বহু বচন খিসাম। শব্দটির অর্থ ঘোর বিরোধী অথবা চরম কলহপ্রিয়। হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন- আল্লাহ্‌র নিকট ওই ব্যক্তি সবচেয়ে ঘৃণ্য যে 'আলাদ্দুল খিসাম' (চরম কলহপ্রিয়)। কাতাদা বলেছেন, ওই ব্যক্তি আলাদ্দুল খিসাম যে অবাধ্যতায় দৃঢ়, বাকচাতুর্যে দক্ষ এবং মিথ্যাচারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে'— এখানে আখনাসের জঘন্য মানসিকতা ও আচরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাক্বিফদের সঙ্গে ছিলো আখনাসের চরম বিরোধ। আখনাস রাতে হত্যাকান্ড ঘটাতো। সাক্বিফদের শস্য-ক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিতো এবং তাদের পশুপালের অনিষ্ট সাধন করতো। মুকাতিল বলেছেন, একবার আখনাস তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। সেখানে গিয়ে সে ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিলো এবং একটি স্ত্রী গাধার চার পা-ই কেটে ফেললো। তখন আল্লাহপাক 'ওয়া ইজা তাওয়াল্লাহ্'— এই আয়াতটি নাজিল করলেন। জীব-জন্তুর বংশ বুঝাতে এখানে নসল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ পশু সকল প্রাণীর বংশকেই বলা হয় নসল। জুহাক বলেছেন, 'ইজা তাওয়াল্লাহ্' অর্থ যে শাসনকর্তা ফেৎনা সৃষ্টি করে। মুজাহিদ বলেছেন, যে শাসক নিযুক্ত হলে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্পাক বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন— চরম খরায় ধ্বংস হয়ে যায় ক্ষেত-খামার ও পশুপাল। সেই ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক অশান্তি (ফেৎনা) পছন্দ করেন না।

'যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে'— এখানে 'ক্বিলালাহু' বাক্যাংশটির হু (তাকে) সর্বনামটির মাধ্যমে আখনাসকে বুঝানো হয়েছে। সে ছিলো জাত্যাভিমানী, মূর্খতার যুগের অহংকার ও আত্মাভিমানে নিমজ্জিত। আরববাসীরা বলে 'আখাজতু হু বিকায়া'- একথার অর্থ, আমি তাকে অমুক কাজে উৎসাহিত করেছি। এ আয়াতেও পাপ কর্মের প্রতি উৎসাহদানকারী হিসাবে আত্মাভিমানের (আখাজতুহুল ইজ্জাত) কথা বলা হয়েছে। এখানে 'বিল ইসমি' অর্থ যে পাপ তার অন্তরে আছে। মুনাফিকের অন্তরে থাকে কুফরী বা অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাসী অভিমানই মুনাফিকদেরকে পাপের প্রতি প্ররোচিত করে। তাই তারা রসুল স. এর সঙ্গে প্রতারণার মতো জঘন্য কর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধাগ্রস্থ হয় না।

'জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য'— এ কথার অর্থ, জাহান্নামই তাদের প্রকৃত পরিণাম। জাহান্নাম হচ্ছে শাস্তির স্থান। আভিধানিকভাবে শব্দটি অগ্নির সমার্থবোধক।

'নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল'— বাগবী বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্পাকের নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে— যদি কেউ কাউকে বলে আল্লাহকে ভয় করো, তদুত্তরে ওই ব্যক্তি বলে 'আরে মিয়া নিজের চরকায় তেল দাও।' এক বর্ণনায় এসেছে— এক লোক হজরত ওমরকে বললো, আল্লাহকে ভয় করুন। সাথে সাথে হজরত ওমর বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন।

'মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে'- এখানে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা জেহাদ অথবা সৎকার্যের আদেশ দান কার্যে নিজের জীবনকে করে উৎসর্গীকৃত। এরকম উৎসর্গ বা আত্মবিক্রয়ের কথা অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে। যেমন 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন বিশ্বাসীদের জীবন.....।' হজরত আবু উমামা বলেছেন, এক ব্যক্তি হজরত রসুল স.কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোন জেহাদ সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা। হজরত আবু সাঈদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও বায়হাকী।

আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভই হতে হবে জেহাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই এখানে 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি' লাভার্থে বলা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ তাহার দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।' অর্থাৎ তিনি দয়ার্দ্র বলেই আত্মবিক্রয়ের মতো অমূল্য নেয়ামতের সন্ধান দিয়েছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে হারিস বিন আবী উসামা এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন- হজরত সুহাইব হিজরত করে রসুল স. এর কাছে যাচ্ছিলেন। একথা জানতে পেরে কতিপয় কোরাইশ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। হজরত সুহাইব তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। তুন থেকে তীর টেনে নিয়ে কোরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ভালো করেই জানো, আমি তুখোড় তীরন্দাজ। আল্লাহ্‌র কসম, আমার তীরাধারে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা আমাকে বশীভূত করতে পারবে না। আরও জেনে নাও আমার তরবারীর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্তও তোমরা আমার কাছ ঘেঁষতে পারবে না। এখন ভেবে দেখো, তোমরা কী করবে? আমি মক্কায় রক্ষিত আমার সম্পদের সন্ধান দিচ্ছি। যদি চাও, তবে সেগুলো দখল করে নাও। আমার পথ ছেড়ে দাও। পশ্চাৎধাবনকারীরা তাঁর সম্পদের সন্ধান জেনে নিয়ে পশ্চাৎধাবনে ক্ষান্ত হলো। মদীনায় পৌঁছে রসুল স. এর নিকটে এই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন হজরত সুহাইব। রসুল স. অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বললেন, হে আবু ইয়াহ্‌ইয়া! তুমি বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করেছো। খুবই লাভজনক হয়েছে তোমার ব্যবসা। রসুল স. এর এ কথার পর 'ওয়ামিনান্নাসি মাই ইয়াশরী ...' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাতেম এই হাদিসটি ইবনে মুসাইয়েবের সূত্রে খোদ হজরত সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন সালমা, হজরত সাবেত, হজরত আনাস সূত্রে। হাকেম আরও বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইবনে জারীর বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সুহাইব বিন সানান রুমী সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এই- একবার হজরত সুহাইব আরো কয়েকজন মুসলমানের সঙ্গে মুশরিকদের হাতে বন্দী হলেন। মুশরিকেরা তাঁকে অসহনীয় কষ্ট

দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি বললেন, দেখো! আমি বয়োবৃদ্ধ। আমি কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষে গেলে তেমন কিছু যাবে আসবে না। তোমরা বরং আমার ধনসম্পদ নিয়ে আমাকে রেহাই দাও। মুশরিকেরা তাঁর কথা মেনে নিলো। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে রাজি'এর পথের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে। ইবনে ইসহাক, মোহাম্মদ বিন সায়াদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হোজাইলের একটি গোত্রের নাম ছিলো লেহ্ইয়ান। তাদের এক লোককে হত্যা করেছিলেন হজরত আবু সুফিয়ান। তখন হোজাইলের কতিপয় লোক কারা নামক এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট গিয়ে বললো, তোমরা মোহাম্মদ স. এর নিকটে গিয়ে কিছু হাদিয়া পেশ করো। যখন ইসলামের পয়গাম নিয়ে তাঁর স. কতিপয় সাহাবী তোমাদের কাছে আসবেন, তাঁরা তোমাদেরকে ধর্মের কথা শোনাবেন, তখন আমরা তোমাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করবো। তারা মনে মনে স্থির করলো, ওই ধর্মপ্রচারক সাহাবাগণকে এভাবে নিজেদের আওতায় নিয়ে এলে তাঁদের কয়েকজনকে হত্যা করা যাবে এবং বাকীগুলোকে মক্কার বাজারে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনও করা যাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজল ও কারা গোত্রের লোকেরা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের জনপদে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে দিন। তাঁদের নিকট থেকে আমরা ধর্মজ্ঞান লাভ করতে পারবো। রসুল স. তখন হজরত আসেম বিন সাবেত আনসারীকে দলপতি নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠালেন- হজরত খোবাইব বিন আবি আনসারী, হজরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ, হজরত গানাভী, হজরত খালিদ বিন বকর, হজরত আবদুল্লাহ বিন তারিক এবং হজরত জায়েদ বিন দাসনা কে। সহীহ্ বোখারীর ভাষ্যমতে তাঁরা ছিলেন দশজন— হজরত আসেম বিন সাবেত আনসারী ছিলেন তাঁদের অধিনায়ক। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ধর্মপ্রচারক সাহাবাগণ যখন কাফেরদের জনপদে গেলেন তখন একশ' জন তীরন্দাজ তাঁদেরকে ঘিরে ফেললো। অপর বর্ণনায় দেখা যায়, যারা ঘিরে ফেলেছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো দুইশ'। আমি বলি, তারা দুইশ' জনই ছিলো। তবে তীরন্দাজের সংখ্যা ছিলো একশ'। হজরত আসেম ও তাঁর সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন পাহাড়ের একটি টিলায়। অবিশ্বাসীরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে বললো, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদেরকে হত্যা করা হবে না। হত্যার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা তোমাদেরকে মক্কাবাসীদের নিকট বিক্রয় করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে চাই। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে নিচে নেমে এসো। হজরত আসেম বললেন, অবিশ্বাসীদের দেয়া প্রতিশ্রুতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। তিনি দোয়া করলেন, হে আমাদের আল্লাহ্! তোমার দ্বীনের সাহায্যকারী হতে গিয়ে আজ আমরা দুর্দশাগ্রস্ত। আমাদের রক্ত ও গোশতের হেফাজত করো। রসুল স.কে আমাদের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে দাও। তাঁর দোয়া কবুল হলো। যখন তাঁরা শহীদ হলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের শাহাদাতের

সংবাদ পৌঁছে গেলো রসুল স. এর নিকটে। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন সাহাবাগণ। কাফেরদের তীব্র তীর বর্ষণের ফলে সাতজন শহীদ হলেন। বেঁচে রইলেন কেবল হজরত খোবাইব, হজরত আবদুল্লাহ বিন তারিক ও হজরত জায়েদ। হোজাইল বংশের লোকেরা হজরত আসেমের পবিত্র মস্তক কর্তন করার উদ্যোগ নিতেই সহসা এক ঝাঁক বোলতা এসে তাঁর পবিত্র মরদেহ ঘিরে ফেললো। ফলে অবিশ্বাসীরা তাঁর পবিত্র মস্তকের নিকটে যেতে পারলো না। এ ঘটনার কারণেই হজরত আসেমের একটি নাম হয়েছে 'হামীউদ্‌দুবার' (বোলতা কর্তৃক আশ্রিত)। এরপর হঠাৎ মেঘ জমতে শুরু করলো আকাশে। মুষলধারে শুরু হলো বৃষ্টি। সেই ঘনঘোর বর্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেলো হজরত আসেমের পবিত্র লাশ।

জ্ঞাতব্যঃ উহুদ যুদ্ধে সালাফা নাম্নী এক রমণীর পুত্রকে হজরত আসেম হত্যা করেছিলেন। তখন ওই রমণীটি শপথ করেছিলো যদি সে কোনো দিন হজরত আসেমের ছিন্ন মস্তক পায়, তবে সে ওই মস্তকের খুলিতে মদ্য পান করবে। আর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যেই অবিশ্বাসীরা হজরত আসেমের মস্তক কর্তন করতে উদ্যত হয়েছিলো।

হজরত আসেম আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার লাভ করেছিলেন যে, তিনি কোনো মুশরিককে স্পর্শ করবেন না। কোনো মুশরিকও যেনো তাঁকে স্পর্শ না করে। আল্লাহ্‌পাক বোলতাবাহিনীর মাধ্যমে তাঁর সে অঙ্গীকার পূরণ করেছিলেন। হজরত খোবাইব, হজরত আবদুল্লাহ বিন তারিক ও হজরত জায়েদ বন্দী হলেন মুশরিকদের হাতে। মুশরিকেরা বন্দীত্রয়কে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। যাহরান নামক স্থানে পৌঁছলে হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর হাতকড়া ভেঙে ফেলে অসি উত্তোলন করলেন। মুশরিকেরা প্রস্তর বর্ষণ করে তাঁকে শহীদ করে দিলো। যাহরানেই তিনি সমাহিত হলেন। অবশিষ্ট সাহাবাদ্বয়কে মক্কার বাজারে বিক্রয় করে ফেললো মুশরিকেরা। ইবনে ইসহাক ও ইবনে সায়াদ বলেছেন, হজরত জায়েদকে কিনে নিলো সাফওয়ান বিন উমাইয়া। তার ছেলের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া ছিলো তার ইচ্ছা। এই সাফওয়ান পরে মুসলমান হয়েছিলেন।

সাফওয়ান হজরত জায়েদকে নিয়ে তার ক্রীতদাস ফুসতাস এর হাতে ন্যস্ত করলো। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো তানয়ীম নামক স্থানে। আবু সুফিয়ানসহ কোরাইশদের একটি বিরাট দল সেখানে উপস্থিত হলো। আবু সুফিয়ান বললো, জায়েদ। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এই সিদ্ধান্তটিকে তুমি কেমন মনে করো? তুমি মোহাম্মদের স্থলে এবং তিনি তোমার স্থলে অধিষ্ঠিত হোক। তার মস্তক কর্তিত হোক আর তুমি রেহাই পেয়ে যাও- এটা কি তোমার জন্য কল্যাণকর নয়? হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই এ রকম সম্ভব নয়। তিনি আমার স্থলে এবং আমি তাঁর স্থলে— এ রকম আমি কখনোই চাই না। তাঁর স. পবিত্র

চরণে কাঁটা বিদ্ধ হওয়াও আমার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। আবু সুফিয়ান বললো, মোহাম্মদের সাথীরা তাঁকে যে রকম ভালোবাসে সে ভালোবাসার কল্পনাও আমার মাথায় আসে না। এরপর ক্রীতদাস ফুসতাস হজরত জায়েদকে নির্মমভাবে শহীদ করে দিলো।

হজরত খোবাইবকে ক্রয় করেছিলো হারিসের সন্তানেরা। বদর যুদ্ধে তাদের পিতা নিহত হয়েছিলো হজরত খোবাইবের হাতে। বন্দী অবস্থায় একদিন একটি চুল কামানোর ক্ষুর হারিসের মেয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন খোবাইব। একটি শিশু হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলো হজরত খোবাইবের বন্দীকক্ষে। কিছুক্ষণ পর শিশুটির মা দেখলো শিশুটি বসে আছে হজরত খোবাইবের কোলে আর তাঁর হাতে রয়েছে সেই ধারালো অস্ত্র। মেয়েটি তখন ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। হজরত খোবাইব বললেন, তুমি কী মনে করেছো? আমি কি একটি অবোধ শিশুর ক্ষতি করতে পারি? অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমার স্বভাব নয়। মেয়েটি পরে বলেছিলো হজরত খোবাইবের মতো বন্দী আমি কোনো দিন দেখিনি। আমি বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ সারা মক্কা জুড়ে কোথাও তখন আঙ্গুর পাওয়া যেতো না। নিশ্চয়ই আল্লাহপাকই তাঁকে আঙ্গুর খেতে দিয়েছিলেন।

একদিন হেরেম শরীফের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হলো হজরত খোবাইবকে। অবিশ্বাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো— তাঁকে শূল বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। হজরত খোবাইব নামাজ পাঠের জন্য কিছু সময় চেয়ে নিলেন। আদায় করলেন দু'রাকাত নামাজ। তখন থেকেই বধ্যভূমিতে প্রাণদানের পূর্বে নামাজ পাঠের প্রথা চালু হয়ে গেলো। নামাজ পাঠের পর হজরত খোবাইব বললেন, তোমরা হয়তো মনে করবে মৃত্যুভয়ে আমি আমার নামাজ দীর্ঘায়িত করছি। তাই আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করলাম। এরপর তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার আল্লাহ! তুমি এদেরকে একজন একজন করে ধ্বংস করে দিও। এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন— আমি মুসলমান অবস্থায় নিহত হচ্ছি! সুতরাং আমার মনে এরকম আশংকা নেই যে আমি মৃত্যুর পর কিভাবে পড়ে থাকবো। আর এটাতো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জীবন সমর্পণ। যদি আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করেন তবে আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও রহমতে বরকতে বিভূষিত করে দেবেন। হজরত খোবাইবকে শূলীতে চড়ানো হলো। প্রাণবিয়োগের পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন— হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তোমার রসুলকে এই সংবাদটি জানিয়ে দাও।

কেউ কেউ বলেছেন, সালমান মাইসারা হজরত খোবাইবের বুকে বল্লম স্থাপন করলো। হজরত খোবাইব বললেন, রে দূরাচার! আল্লাহকে ভয় কর। এ কথা শুনে সালমান মাইসারা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং বল্লমের আঘাতে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো। আত্মবিক্রয়ের এই অনন্য নিদর্শনের কথাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত উসামা বিন জায়েদ বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, হজরত জিব্‌রাইল এখনই আমাকে খোবাইবের সালাম পৌঁছে দিলেন। সমবেত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, কে এমন আছো যে শূলী থেকে খোবাইবের লাশ আনতে পারবে? যে তাঁর লাশ আনতে পারবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। লাব্বাইক (আমি হাজির) বলে উঠে দাঁড়ালেন হজরত জোবায়ের। বললেন, আমি এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদই এ কাজের জন্য যথেষ্ট। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন হজরত জোবায়ের এবং হজরত মেকদাদ। দিনে তাঁরা পথ চলতেন এবং রাতে আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে খোঁজ নিতে নিতে তাঁরা পৌঁছে গেলেন তানয়ীম নামের বধ্যভূমিতে। দেখলেন, হজরত খোবাইবের পবিত্র দেহ তখনও শূলবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছে আর সেখানে পাহারা দিচ্ছে চল্লিশজন ভয়ংকরদর্শন কাফের। রাতে এক সময় পাহারাদারেরা সব ঘুমিয়ে পড়লো। তখন তাঁরা দু'জনে মিলে শূলী থেকে লাশ নামালেন। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, চল্লিশদিন আগের শহীদ হজরত খোবাইবের লাশ সম্পূর্ণ সতেজ। শরীরের একটি জখমের উপরে ছিলো তাঁর হাত। সেই ক্ষতস্থান থেকে তাজা লাল রক্ত ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। সে রক্তের সুবাস মেশক্ আম্বরকেও হার মানায়। হজরত জোবায়ের তাঁর ঘোড়ায় দ্রুত লাশ উঠিয়ে নিলেন। তারপর দু'জনে যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। ওদিকে প্রহরীরা জেগে গেলো। তৎক্ষণাৎ তারা লাশ অপহরণের সংবাদ পৌঁছে দিলো কোরাইশ নেতাদের নিকট। সতেরোজন অশ্বারোহী বেরিয়ে পড়লো লাশের সন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে তারা হজরত জোবায়েরের সন্ধান পেলো। হজরত জোবায়ের বিপদ আঁচ করতে পেরে হজরত খোবাইবের লাশ রেখে দিলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি তাঁকে উদরস্থ করে নিলো। এ জন্যই তাঁর নাম 'বলিউল আরদ্' (মৃত্তিকা কর্তৃক গ্রাসিত)। হজরত জোবায়ের এবং হজরত মেকদাদ যখন মদীনায় ফিরে গেলেন তখন হজরত জিব্‌রাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভাই মোহাম্মদ স.! ফেরেশতারা জোবায়ের এবং মেকদাদকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তখনই অবতীর্ণ হলো 'মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে.......।' এ পটভূমির প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্ম হবে এরকম— যে ব্যক্তি হজরত খোবাইবকে শূলী থেকে উদ্ধার করতে জীবন উৎসর্গ করে।

হজরত ইকরামা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, ইহুদীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম, হজরত সায়লাবা, হজরত ইবনে ইয়ামীন, হজরত ইবনে কাব, হজরত আসাদ, হজরত উসাইয়েদ, হজরত সাঈদ বিন আমর এবং হজরত কায়েস বিন জায়েদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা সপ্তাহের বিশেষ দিনের মর্যাদা রক্ষা করে চলতাম। আপনার অনুমতি সাপেক্ষে আমরা এখনও বিশেষ দিনটির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চাই। আর তওরাত তো আসমানী কিতাব। রাতে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তওরাত পাঠ করতে চাই। এ রকম বর্ণনা করেছেন বাগবী। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করা

সত্ত্বেও তাঁরা উটের গোশত ও দুধ হারাম মনে করতেন। তাঁদের এহেন চিন্তাচেতনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত—

সুরা বাকারা ঃ ২০৮, ২০৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পূর্ণ রূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

❒ সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

'তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর'— এখানে ইসলাম শব্দের অর্থ সততা ও আনুগত্য। ইসলাম বললেই সততা ও আনুগত্যের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা যায়। নাফে ইবনে কাসির ও কাসায়ীর মতে 'আসলিমু' শব্দটির সীন জবর যুক্ত। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন যের সহযোগে। এখানে কাফ্ফা শব্দটির অর্থ পূর্ণরূপে। আর 'উদখুলু' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করো বা গ্রহণ করো। পূর্ণ বাক্যটির মর্ম হবে এরকম- তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা আল্লাহ্পাকের প্রতি পূর্ণ অনুগত করে তোলো।

আমি বলি, জাহেরী ও বাতেনী আনুগত্য সুফী অর্থাৎ পীর আউলীয়া ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না। এ বাক্যটির মোটামুটি অর্থ হচ্ছে ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হয়ে যাও। ইসলামের সঙ্গে অন্য কিছুর সংমিশ্রণ ঘটিও না। অর্থাৎ ইসলামের প্রতিটি শাখা প্রশাখা ও আদেশ নিষেধের মধ্যে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হও। হজরত হুজাইফা বিন ইয়ামিন বলেছেন, এ আয়াতের তাফসীর হচ্ছে, ইসলামের আটটি বিষয় পুরোপুরি আঁকড়ে ধরতে হবে। এর যে কোনো একটি বাদ পড়লে সে পুরোপুরি মুসলমান বলে গণ্য হবে না। সে আটটি বিষয় হচ্ছে- নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ওমরাহ, জেহাদ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

আমি বলি, হজরত হুজাইফা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আটটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে ইসলামের প্রতিটি দিককে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকল আদেশ যেমন সর্বান্তকরণে মেনে নিতে হবে, তেমনি সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে

পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে। এরকমও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ— এ বিধানটির মধ্যেই রয়েছে ইসলামের সকল বিধান। তাই কাউকে সদুপদেশ দিতে গেলে নিজেও সৎ কাজ করতে হবে এবং সকল অসদাচারণ থেকে রক্ষা পেতে হবে।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বলেন, ইমানের সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ। লজ্জাও ইমানের একটি অঙ্গ। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

'শয়তানের পদাংক অনুসরণ কোরো না'— এ কথার অর্থ সপ্তাহের বিশেষ দিনের মর্যাদা রক্ষা করতে যেয়ো না। উটের গোশতকেও হারাম জেনো না। কারণ, পূর্বেকার বিধান এখন রহিত।

'নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'- এ বিষয়টি একটি হাদিসের মাধ্যমে ভালো করে বুঝে নেয়া যেতে পারে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, একবার রসুল পাক স. এর খেদমতে হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইহুদীদের কথা বার্তাতো ভালোই। অনুমতি দান করলে আমি তাদের কিছু কিছু কথা লিখে রাখতাম। রসুল স. বললেন, তোমরাও কি ইহুদী খৃষ্টানদের মতো সীমাতিক্রমকারী হবে? আমিতো তোমাদেরকে দিয়েছি সূর্যসম উজ্জ্বল শরিয়ত। হজরত মুসা যদি এখন থাকতেন তবে তাঁকেও আমার অনুসারী হতে হতো। আহমদ, বায়হাকী। হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

'সুস্পষ্ট নিদর্শন আগমণের পর যদি তোমরা স্খলিত হও তবে জেনো আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়'- এখানে সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে 'আল বাইয়্যেনাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে এমর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের সুদৃঢ় অবস্থান থেকে যদি তোমরা সরে যাও তবে স্মরণে রেখো, আল্লাহ্পাক কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিশোধ বাস্তবায়ন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি একারণেই অবকাশ দান করে থাকেন যে, তিনি প্রজ্ঞাময় (হাকিম)। তাঁর এ অবকাশ দানের মধ্যে রয়েছে অপার এক রহস্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১০

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

❐ তাহারা শুধু ইহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতা-সহ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহেরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

এখানে 'ইয়ানজুরুনা' শব্দটির অর্থ হবে 'ইয়ানতাজিরুনা' (প্রতীক্ষায় রয়েছে)। 'জুলাল' শব্দটি এসেছে 'জুল্লাতুন' শব্দ থেকে। আর বাগবীর মতে 'আল গামাম' অর্থ শ্বেতশুভ্র মেঘমালা। 'গম' অর্থ আচ্ছাদন। তাই গামাম অর্থ আড়াল বা ছায়া। মুজাহিদ বলেছেন, মেঘ ছাড়া অন্য কিছুকে বলে 'গামাম।' বনি ইসরাইলেরা সেই গামামের ছায়াই পেয়েছিলো মেঘের ন্যায়।

'আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাসহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন'— এ প্রসঙ্গে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকলেই অভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, আল্লাহপাক দেহবিশিষ্ট নন— নশ্বর প্রকৃতির কোনো কিছুর মতোও নন। তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন— একটি হচ্ছে এই, এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করতে হবে এবং বলতে হবে বিষয়টি আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত। আল্লাহ্পাকের এ কালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য বলে জানতে হবে। কালাবী বলেছেন, বিষয়টি গোপনীয় ও ব্যাখ্যার অতীত। এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে মাকহুল, আওজায়ী, মালেক, ইবনে মোবারক, সুফিয়ান সাওরী, আবু লাইস, আহমদ ও ইসহাক বলেছেন- এ রকম আয়াত যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই রক্ষা করতে হবে। সুফিয়ান বিন ওয়াইনা বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর কিতাবে যে সকল গুণবত্তা দ্বারা বিশেষিত হয়েছেন, সেগুলোকে তেলাওয়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আলোচনাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। আল্লাহপাক এবং তাঁর রসুলই কেবল এ সকল আয়াতের তাফসীর করতে পারেন। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য কেউ জানে না। আর 'ওয়ার রসিখুনা' (যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর) — তাঁরাও এ সকল ব্যাখ্যা থেকে পৃথক।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে— সুসংগত পদ্ধতিতে এ ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতির প্রবক্তারা বলেন, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর তাঁরাও এ ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন। বায়যাবী বলেছেন ইল্লা আঁই ইয়া'তিয়া হুমু ল্লাহু বাক্যটির ব্যাখ্যায় আল্লাহ্পাকের হুকুম ও আল্লাহ্র ভয় অর্থ গ্রহণ করা যায়। তিনি এখানে সম্বোন্ধিতকে উহ্য মনে করেছেন।

প্রকৃত কথা এই— যে মেঘমালা রহমত লাভের মাধ্যম, সেই মেঘমালা থেকেই নেমে আসবে শাস্তি। অর্থাৎ কঠিন লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়াই উদ্দেশ্য। আমি বলি, এ আয়াত সম্পর্কে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বায়যাবীর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন 'ইয়াউমা তাশাক্কাকুস্ সামাউ বিল গামামী'— আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক মানব-দানব, ভূচর-খেচর সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। সে দিন বিদীর্ণ হবে আকাশ ও পৃথিবী। পৃথিবীবাসীদের চেয়েও অধিকসংখ্যক আকাশবাসী অবতরণ করবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে ঘিরে ফেলবেন। পৃথিবীবাসীরা তাঁদেরকে বলবে আমাদের প্রতিপালককে কি তোমরা দেখেছো? তাঁরা বলবেন, না। এরপর অবতীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীরা। তাঁদের সংখ্যা হবে আগের দুই দল অপেক্ষা বেশী। পৃথিবীবাসী ও প্রথম আকাশবাসীরা একযোগে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে— আমাদের প্রভুপালয়িতা কি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন? তারা বলবে, না। এভাবে একে একে নেমে আসবে— তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের অধিবাসীরা। প্রতিটি নতুন আগমনকারী দলের সংখ্যা হবে পূর্ববর্তী দলের চেয়ে অধিক। পূর্ববর্তীরা নতুন আগমনকারী দলকে একই প্রশ্ন করে যাবেন। পরে আগমনকারীরা প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকবে না, কেবলই না। অবশেষে মেঘমালার ছত্রছায়ায় আল্লাহ্পাক অবতরণ করবেন স্বয়ং। চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করবেন নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবী ও সাত আকাশের ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী। সেখানে আরও উপস্থিত থাকবেন, আরশবাহী ফেরেশতারা। বর্শাফলকের মতো ধারালো হবে তাদের শিং। তাদের দুই পায়ের ব্যবধান হবে অনেক অনেক (বর্ণনাকারী ব্যবধান পরিমাপ করতে সমর্থ নন বলে অনেক অনেক বলেছেন)। তাদের পদতল থেকে টাখনু পর্যন্ত পরিসর হবে পাঁচশ বৎসর দূরত্বের সমান। তেমনি টাখনু থেকে হাঁটু এবং হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পাঁচশ বছর পথের সমদূরত্ব সম্পন্ন হবে। কোমর থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত তেমনি একই দূরত্ব থাকবে। ঘাড় থেকে কানও একই দূরত্ব সম্পন্ন হবে।

আমি বলি, বায়যাবী এখানে সম্বোন্ধিতকে লোপ করে যে অর্থের অবতারণা করেছেন, যদি সে অর্থ ধর্তব্য হয় তবে ব্যাপারটা হবে 'তুমি জিজ্ঞেস করো গ্রামকে'। আয়াতের অর্থ 'তুমি জিজ্ঞেস করো গ্রামবাসীকে'—এর মতো। এরকম অর্থ করা হলে কোরআন মজীদের কোনো আয়াতই আর মোতাশাবেহ আয়াত থাকবে না। অথচ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, এর মধ্যে কতিপয় আয়াত মোহকাম যা কোরআনের মূল আর অন্যগুলো মোতাশাবিহাত।

সম্মানিত সুফী সম্প্রদায় এরকম আয়াত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নতর পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। তাদের অভিমত হচ্ছে, কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট আল্লাহ্ পাকের বিকাশ অনির্ণেয় পরিবেশে প্রতিভাত হয়, যেমন আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে এবং কাবা শরীফে আল্লাহপাকের বিশেষ বিকাশ (তাজাল্লী) প্রতিভাসিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এ বিকাশ প্রতিটি

মানুষের উপরেই বর্ষিত হয়। কারণ, মানুষ মহান সৃষ্টি এবং আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধি (খলিফা)। এ বিকাশ কখনো হয় বিদ্যুৎ চমকের মতো- একে বলে 'তাজাল্লীয়ে বরকী।' আবার কখনো হয় স্থায়ী- এ সকল তাজাল্লীর কারণে আকার প্রকারহীন পরম সত্বার অবিনশ্বরতায় ন্যূনাধিক্য ঘটে না। তিনি যেমন চিরবিদ্যমান, চিরঅক্ষয় ও অতুলনীয় পবিত্র—তেমনি থাকেন। পক্ষান্তরে এ নশ্বর সৃষ্টি লয়, ক্ষয় ও নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। যেমন সূর্য ও আয়না। আয়না স্বচ্ছ হলে সূর্যকিরণের প্রতিফলন লাভ করে ধন্য হয়। আয়নায় আলো পড়লে সে আলো যেমন সূর্যের মৌলিকতায় কোনোই প্রভাব বিস্তার করে না, তেমনি সৃষ্টির তাজাল্লী লাভে আল্লাহপাকের কোনোই ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না। তাই আল্লাহ পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন, 'আর তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে তাজাল্লী নিক্ষেপ করলেন'। তেমনি এখানেও বলা হয়েছে — মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাসহ তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা। এখানে উপস্থিত হওয়া অর্থ তাজাল্লী নিক্ষিপ্ত হওয়া বুঝতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক মেঘমালার উপর তাঁর তাজাল্লী নিক্ষেপ করবেন। যাদের অর্ন্তজগত এ জগতেই নূর ও দিব্য দৃষ্টি পেয়েছে, তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দিব্যদৃষ্টি পৌঁছে যায় ওই মেঘমালারও উর্ধ্বে। একজন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মহাশূন্যের উর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সক্ষম। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে তাঁর দর্শন হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। অতএব মেঘমালার উর্ধ্বে দিব্য দৃষ্টিতো গমন করতে পারবেই। আর যে সকল লোক এ পৃথিবীতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়নি, তারা দৃষ্টিহীন। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে অন্ধ। ওই মেঘমালাই তাদের দৃষ্টির অন্তরায়।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ুতী তাঁর 'বদরু স্‌সাকিরাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি শায়েখ বদরুদ্দীন জারাক্‌সীর হাতের লেখায় দেখেছি সালমা বিন কাসেম গারাইবে উসুল পুস্তকে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের তাজাল্লী দৃষ্টিগোচর হবে। মেঘচ্ছায়ায় তাঁর উপস্থিতির অর্থ তিনি সৃষ্টির দৃষ্টিশক্তি পরিবর্তন করে দেবেন, তখন তারা পরিবর্তিত দৃষ্টিতে সেরকমই দেখবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদাহরণরহিত অধিষ্ঠান আরশের উপরেই থাকবে। তিনি পরিবর্তন ও রূপান্তরের অতীত। আর স্থানান্তরেরতো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বলি, একথার আরও অধিক সূক্ষ্ম মর্ম এই যে, সৃষ্টি তখন তাঁকে দেখবে স্বচ্ছ মেঘপুঞ্জ থেকে অন্তহীনতার দিকে। জালালউদ্দীন সুয়ূতী বলেছেন, আবদুল আজীজ মাজেশুন থেকে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্পাক সৃষ্টির দৃষ্টিশক্তিকে এমন করে দিবেন, যাতে করে তারা আল্লাহ্পাকের নেমে আসা অবলোকন করতে সক্ষম হবে। বিচ্ছুরিত তাজাল্লীর মাধ্যমে তিনি সঙ্গোপনে বান্দাদেরকে আহবান করবেন অথচ প্রকৃতার্থে তিনি রূপান্তরাতীত, স্থানান্তরাতীত ও কালাতীত। বিভিন্ন হাদিসের সূত্রে আমরা জানতে পারি হজরত জিব্‌রাইল তাঁর আপনাকৃতিতে রসুল স. এর

সকাশে উপস্থিত হতেন, আবার কখনো হাজির হতেন হজরত দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতিতে। অথচ তিনি হজরত দাহিয়াতুল কালবী অপেক্ষা মহান।

আমি বলি, আমি এখানে যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি উত্তরসূরীরা তার অনুভূতিকেও স্পর্শ করতে পারবে না। আর পূর্বসূরীদের বক্তব্য এরকম— তিনি আরশে অধিষ্ঠিত, তিনি মেঘচ্ছায়া ইত্যাদিতে অবতরণ করবেন। আয়াতের এরকম বর্ণনা যথাস্থানেই রাখতে হবে। তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি অসমীচীন কোনো ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যাবে না।

যারা বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত তারা এর যথাব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নন। যদি দিতে চান তবে শ্রোতাদের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটবে এবং প্রকৃত মর্ম যা নয় তাই বুঝে ফেলবে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে মৌনতাবলম্বনই শ্রেয়। আয়াতের প্রতি নির্বিবাদ বিশ্বাস ওয়াজিব। আল্লাহপাক ও তাঁর প্রিয় রসুল ছাড়া এ রকম আয়াতের ব্যাখ্যা করার সাহস ও সামর্থ্য কারো নেই।

সমস্ত বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (ওয়া ইলাল্লাহি তুরজ্বাউল উমুর)— ক্বারী ইবনে আমের, হামজা, কাসায়ী এবং ইয়াকুব 'তুরজ্বাউল উমুর' কথাটি কোরআন মজীদের যেখানেই থাকুক না কেনো সেখানেই 'তা' অক্ষরে জবর এবং 'জীম' অক্ষরে যের দিয়ে 'তারজীউল উমুর' পড়েছেন। অন্য ক্বারীগণ পড়েছেন 'তুরজ্বাউল উমুর'— যেমন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১১, ২১২

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُم مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

❐ বনি ইস্রাইলকে জিজ্ঞাসা কর আমি তাহাদিগকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি। আল্লাহের অনুগ্রহ আসিবার পর কেহ উহার পরিবর্তন করিলে আল্লাহ্ মন্দ কার্যের প্রতিফল দানে কঠোর।

❐ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত। তাহারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া থাকে; অথচ যাহারা সাবধানে চলে

কিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

এখানে বনী ইসরাইল বলতে বুঝানো হয়েছে মদীনার ইহুদীদেরকে। 'বনী ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস কর'— এই জিজ্ঞেস করার কথা বলে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সাবধান করে দেয়া হয়েছে। 'আমি তাদেরকে কতো স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি'— একথার মর্ম হচ্ছে আমি তাদেরকে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু তারা সেগুলোকে বিকৃত করে ফেলেছে। 'কাম অতাইনাহুম' বাক্যের 'কাম' অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হওয়ার কারণে সাল বনী ইসরাইল (বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস কর!) বাক্যটির অবস্থা জ্ঞাপক হয়েছে এভাবে— বনী ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস করুন আমি তাদেরকে কতোইনা দিয়েছি। আবার কাম শব্দটি বিজ্ঞপ্তিসূচক হওয়ার কারণে প্রশ্নাকারে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— (হে রসুল!) আপনি বনী ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের নিকট অসংখ্য নিদর্শন ছিলো কিনা? আর ওই নিদর্শনগুলো ছিলো সরাসরি প্রকাশ্য মোজেজা। তওরাত শরীফ ছিলো হজরত মুসার নবুয়তের প্রমাণ। আর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর নবুয়তের নিদর্শনও লিপিবদ্ধ ছিলো ওই কিতাবে।

'আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসবার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ মন্দকাজের প্রতিফল দানে কঠোর'— এখানে মোজেজা সমূহকেই নেয়ামত বা অনুগ্রহ বলা হয়েছে। কারণ, মোজেজাই হচ্ছে হেদায়েতের (পথপ্রাপ্তির) উপকরণ। আর এখানে অনুগ্রহ বলতে বুঝতে হবে আল্লাহ্র কিতাবকে। পরিবর্তন করার অর্থ হবে কিতাবানুযায়ী আমল না করাকে। এখানে আরেকটি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় যে, অনুগৃহীত বাণী বিশ্লেষণের অবকাশ ছিলো। আর ইহুদীরা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলেছে।

'আল্লাহ্পাক মন্দ কাজে প্রতিফল দানে কঠোর'-- এ কথায় বুঝা যায় ইহুদীদের অপরাধ সীমাহীন। তাই এখানে কঠোর প্রতিফল দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

কাফেরদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত। পার্থিব অপার্থিব সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা। সীমালংঘনকারীদের সৌন্দর্যবোধ, ভোগস্পৃহা এবং তাদের সৌন্দর্যের উপকরণ— সবকিছু তাঁরই দান। তাই সীমালংঘনকারীরা সুশোভন পার্থিবতায় মগ্ন। জুজায বলেছেন, শয়তান অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে পার্থিব সৌন্দর্যকে আরো অধিক মোহনীয় করে তোলে।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক বান্দাদের ক্রিয়াকর্মেরও স্রষ্টা। শয়তানও আল্লাহ্র সৃষ্টি। পার্থিব সৌন্দর্যের সঙ্গে অধিকতর সৌন্দর্যের সংযোগ ঘটানোর ক্ষমতা শয়তানের নেই। তবে সে কুমন্ত্রণা দানের যোগ্যতা লাভ করেছে। তাই সে কুমন্ত্রণার মাধ্যমেই মানুষকে শোভন পৃথিবীপ্রেমে ডুবিয়ে রাখে। কেউ কেউ

বলেছেন, এ আয়াতের (২১২) শুরুতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে বুঝানো হয়েছে আবু জেহেলকে।

'তারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে থাকে'—একথার অর্থ কাফেরেরা দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন দরিদ্র বিশ্বাসী ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার, হজরত খোবাইব, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব প্রমুখ। হজরত মুকাতিল বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গী মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকতো। আর দরিদ্র মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলতো— দেখো! দেখো! মোহাম্মদ এদের নিয়েই বিজয়ের স্বপ্ন দেখে। আতা বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছে ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতো। তাই আল্লাহ্পাক মুসলমানদের নিকট এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বিনা যুদ্ধে তিনি বনী কুরাইজা ও বনী নাজিরের সকল সম্পদ মুসলমানদের অধিকারে দিয়ে দিবেন।

'অথচ যারা সাবধানে চলে'- একথা বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল দরিদ্র মুসলমানদেরকে যারা আল্লাহর ভয়ে সতর্ক জীবন যাপনকে বেছে নিয়েছে। একথার মাধ্যমে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১. তারাই মুত্তাকী (সাবধানী)। ২. তাকওয়া বা সাবধানতাই তাদের উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ। ৩. আমল ও ইমান ভিন্নবস্তু— পূর্ববর্তী বাক্যে বিশ্বাসীগণকে (আল্লাজিনা আমানু) বলে ইমানের কথা বলা হয়েছে। পরক্ষণেই সাবধানতার কথা বলে আমলকে আলাদা করে নির্দেশ করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন তাঁরা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। এ কথায় বুঝা যায় তাকওয়া অবলম্বনকারীরা উন্নত মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা আল্লাহ্পাকের নিকট সম্মানিত। পৃথিবীতে কাফেরেরা তাঁদেরকে দেখে যেমন বিদ্রুপের হাসি হাসছে তেমনি কিয়ামতের দিন তাঁদের দৃষ্টিতে কাফেরেরাও হাস্যাস্পদ হবে। কারণ, সেদিন কাফেরদেরকে বরণ করে নিতে হবে চরম লাঞ্ছনা।

কেবল কিয়ামতের দিনে নয়, পৃথিবী ও আখেরাত উভয় জগতে অবিশ্বাসীদের চেয়ে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্পাকের অধিক প্রিয়। হজরত সহল বিন সা'আদ বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি দরবারে নববী থেকে বিদায় গ্রহণ করলে রসুল স. উপস্থিত সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কেমন? একজন বললেন, খুবই অভিজাত। যদি সে কোথাও বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পয়গাম কবুল করা হবে। কারও জন্য সুপারিশ করলে সেই সুপারিশ সাথে সাথে গ্রহণ করা হবে। রসুল পাক স. নীরব রইলেন। ইত্যবসরে আর একজনের আগমন ঘটলো। রসুল স. বললেন, এই লোকটি কেমন? পূর্বে যিনি জবাব দিচ্ছিলেন তিনি বললেন, ইনি একজন দরিদ্র মুসলমান। তিনি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে অগ্রাহ্য হবে। কারো জন্য সুপারিশ করলে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে

না। ইনি কিছু বললে কেউ তার কথা শুনবেও না। রসুল স. বললেন, আগের লোকটির মতো যতো লোক পৃথিবীতে থাকুক না কেনো এই একজনই তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বোখারী। হজরত উসামা বিন জায়েদ বলেছেন— নবী পাক স. এরশাদ করেন, আমি জান্নাতের দরোজায় দাঁড়িয়ে দেখবো অধিকাংশ মিসকিনই জান্নাতী। দোজখের দরোজায় দাঁড়ালে দেখবো অধিকাংশ নরকবাসী রমণীরা। আর বিত্তশালীরা অপেক্ষমান থাকবে। তাদের মধ্যে যারা নরকবাসী তাদেরকে নরক গমনের নির্দেশ দেয়া হবে।

'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন'— এখানে উভয় জগতের দানের কথা বলা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, অপরিমিত অর্থ এতো অধিক যার হিসাব রাখা যায় না। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে অপরিমিত বলার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্পাক যা দেন তাঁর হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাঁর নিকট কৈফিয়ত চাইবার কেউ নেই। তিনি কখনও কোনো কোনো লোককে প্রয়োজনাতিরিক্ত দান করেন, আবার যার প্রয়োজন তাকে দান করেন অল্প। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অপরিমিত বলার অর্থ তাঁর দানের ভান্ডার অফুরন্ত— সেখানে ঘাটতির আশংকা মাত্র নেই।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৩

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا
اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ج
فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ
مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ মানুষ এক মতাদর্শী ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে তাহা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত আল্লাহ্ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ

অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

বায্যার তাঁর মসনদে, হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এবং ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির তাঁদের তাফসীরে বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এরকম— হজরত আদম ও হজরত নুহ এর মধ্যে দশটি যুগের ব্যবধান ছিলো। ওই সকল যুগের লোকেরা ছিলো সঠিক ধর্মের অনুসারী। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। হজরত কাতাদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, দশটি যুগের ব্যবধানেই ছিলেন হজরত আদম ও হজরত নুহ। তাঁদের মধ্যবর্তী লোকেরা ছিলেন বিদ্বান ও পথপ্রাপ্ত। পরে তাদের একতা বিনষ্ট হয়। তখন হজরত নুহ্কে আল্লাহ্পাক নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম প্রেরিত রসুল। আতা ও হাসান বলেছেন, হজরত আদমের মহাপ্রস্থানের পর থেকে হজরত নুহ আ. এর আবির্ভাবকালের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষেরা ছিলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো-অবিশ্বাসী। আল্লাহ্পাক তখন হজরত নুহ আ. কে প্রেরণ করেন। প্রকাশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী হাদিসগুলোর দ্বন্দ্ব এভাবে নিরসন করা যেতে পারে যে, প্রথম দিকে মানুষেরা তো মুসলমানই ছিলো। কিন্তু হজরত নুহের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তারা অধোপতিত হয়েছিলো। হজরত নুহের মাতা-পিতা ছাড়া সকলেই হয়ে গিয়েছিলো কাফের। তাঁর পিতা-মাতা যে ইমানদার ছিলেন তা প্রমাণিত হয় কোরআন মজীদে উল্লেখিত হজরত নুহের দোয়ার মাধ্যমে। হজরত নুহ দোয়া করেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করো।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, তদানীন্তন আরবের সকল মানুষই এই আয়াতের লক্ষ্য। ইবনে কাসীর বলেছেন, আমর বিন আমের খাজায়ী মক্কার শাসনকর্তা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল আরববাসী ছিলেন দ্বীনে ইব্রাহিমের অনুসারী। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আরব ভূখন্ডে সর্বপ্রথম ষাঁড় ছেড়ে দেয়া ও প্রতিমা পূজার প্রচলন করেছিলো আবু খাজাআ আমর বিন আমের। আমি তাকে ছিন্ন নাড়ীভূঁড়িসহ নরকাগ্নিতে জ্বলতে দেখেছি। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন- আমি আমর বিন আমের বিন লেহিয়া বিন কাসআ বিন খন্দককে নাড়ীভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে জ্বলতে দেখেছি। সেই ছিলো সর্বপ্রথম ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার রীতি প্রচলনকারী। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে এরকমই বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, আমর বিন আমেরই দ্বীনে ইব্রাহিমের উচ্ছেদসাধনকারী।

মানুষ এক মতাদর্শী ছিলো (কানান্নাসু উম্মাতাঁউ ওয়াহিদা) — এখানে নাস বা মানুষ বলতে যদি আরববাসীকে বুঝানো হয়ে থাকে তবে আয়াতের অর্থ সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. ব্যতীত আরব

উপদ্বীপে আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। দলিলস্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ্পাক বলেছেন— (রসুল স. এর আগমন) 'এমন একটি সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শনের জন্য যাদের পিতৃপুরুষকে কখনো ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি, বাস্তবে তারা উদাসীন'। হজরত উবাই বিন কাআব থেকে আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন (আত্মার জগতে হজরত আদমের বুকের পাশ থেকে তাঁর সন্তানদেরকে বের করে তাঁর সামনে রাখা হলো। তখন সকলেই ছিলো এক মতাদর্শী। সকলেই তখন আল্লাহ্তায়ালার প্রতিপালকত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। পরে আর কখনও তারা একমতে থাকেনি। বরং সকল যুগেই তাদের মধ্যে বিরাজ করেছে মতদ্বৈততা।

আমি বলি, 'মানুষ এক মতাদর্শী ছিলো'— কথাটির ব্যাখ্যা হবে এ রকম- সকল মানুষের মধ্যেই সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বিদ্যমান। ফিতরত বা স্বভাব ধর্মের উপরেই সকলকে সৃজন করা হয়েছে। এরপর মানব ও দানবরূপী শয়তানেরা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। এভাবেই একে একে সত্যস্খলিত হয়ে গিয়েছে মানুষেরা। হজরত আবু হোরায়রা বলেন- রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টান অগ্নিপূজক ইত্যাদিতে পরিণত করে। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তাদের নিজেদের মতো শাবক প্রসব করে— সেগুলোর কোনোটির কান (বা অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) নেই- এমনটি কি দেখা যায়? বোখারী, মুসলিম।

'অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন'— এই বাক্যটিকে যদি 'কানান্নাসু উম্মাতাঁউ ওয়াহিদা' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় এবং যদি ধরা হয় সকল মানুষ অবিশ্বাসে একীভূত ছিলো— তবে তাদের একতাভঙ্গের কারণ হিসেবে ধরতে হবে নবী প্রেরণকে। নবী প্রেরণের মাধ্যমেই সমীভূত অবিশ্বাস থেকে ইমানদারদেরকে আলাদা করে নেয়া হয়। অবিশ্বাস ও অশান্তি দূর করার মানসেই তাঁরা প্রেরিত হয়ে থাকেন। হজরত আবু জর বলেছেন, আমি 'নাবীঈন' শব্দটি সম্পর্কে রসুল স.কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! নবীগণের মোট সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, দুই লাখ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে রসুল ছিলেন তিনশত পনেরোজন। আহমদ। হজরত আবু জরের অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসুলগণের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু অধিক। বাগবী বলেছেন, তাঁদের মধ্যে রসুলগণের সংখ্যা ছিলো তিনশত তেরো। আর আটাশজনের নাম কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে।

আমি বলি, কোরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে ছাব্বিশ জনের নাম। তন্মধ্যে আঠারো জনের উল্লেখ এরকম- ওয়া তিলকা হুজ্জাতুনা আতাইনাহা ইবরহীমা আলা ক্বওমিহি, ওয়া ওয়াহাবনা লাহু ইসহাকা ওয়া ইয়াকুবা কুল্লান হাদাই না ওয়া নুহান হাদাইনা মিন ক্ববলু ওয়া মিন জুররিইয়াতিহি দাউদা ওয়া সুলাইমানা ওয়া আইয়্যুবা ওয়া ইউসুফা ওয়া মূসা ওয়া হারুনা ওয়া কাজালিকা নাজ্জিল মুহসিনিন। ওয়া

জাকারিয়া ওয়া ইয়াহ্ইয়া ওয়া ঈসা ওয়া ইলইয়াসা কুল্লুম মিনাস সলিহিন। ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইয়াসাআ ওয়া ইউনুসা ওয়া লূতান ওয়া কুল্লান ফাদ্দ্বালনা আলাল আলামীন। অবশিষ্ট আটজন হচ্ছেন, আদম, ইদ্রিস, হুদ, সলেহ, শুয়াইব, জুলকিফল, উযায়ের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। কোনো কোনো তাফসীরবিদগণের অভিমত হচ্ছে, সুরা মু'মিনুনে উল্লেখিত ইউসুফ হজরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ নন। তিনি হচ্ছেন ইউসুফ বিন ইব্রাহিম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব। এই হিসেবে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশে। অনেকে আবার হজরত ঈসার মাতা মরিয়মকে নবী বলে মনে করেন। এই হিসেব ধরলে আটাশজন হয়। কিন্তু কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে- আর আপনার পূর্বে পুরুষ ব্যতীত কাউকে প্রেরণ করিনি। এই আয়াতের মাধ্যমে হজরত মরিয়মের নবুয়ত স্বীকৃত হয় না। সম্ভবতঃ আটাশতম নবী লোকমান হাকীম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বলা হয়েছে, নবী প্রেরণ করা হয়েছে সুসংবাদ দান ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য। নবীগণ জানিয়ে দেন— অনুগতদের জন্য রয়েছে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুসমাচার এবং অবাধ্যদের জন্য রয়েছে ভীতিপ্রদ শাস্তি। মানুষের মধ্যে সৃষ্ট মতভেদের মীমাংসার জন্য আল্লাহ্পাক নবীদেরকে সত্যের সাক্ষ্যবাহী কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। এখানে কিতাব অর্থ কিতাব জাতীয় সকল আকাশী পুস্তক। সত্যসহ অর্থ সত্যের সাক্ষ্যসহ। নবীগণ তাঁদের প্রতি অবতারিত কিতাবের বিধান অনুযায়ী মীমাংসা প্রদান করেন। 'যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো'— একথার অর্থ, যে সকল বিষয়ে দেখা দিয়েছিলো সন্দেহ।

'যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিলো স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসবার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করতো'— একথার লক্ষ্য ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও তারা বিরুদ্ধবাদী হয়েছে। এই বিরোধিতার কারণ ছিলো কেবলই পারস্পরিক অসূয়া। নিছক অসূয়াবশতঃই তারা অবজ্ঞা করেছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে। গোপন করেছে মহানবী মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাব সম্পর্কিত বিবরণসমূহ। তারা এই মর্মে মতভেদ সৃষ্টি করেছে যে, আমাদের কাছে কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস্য ও অবশিষ্টাংশ অস্বীকার্য।

'যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো আল্লাহ্পাক তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন'— এ সম্পর্কে হজরত ইবনে জায়েদ বলেছেন, তাদের মতবিরোধ ছিলো কেবলা সম্পর্কে । কেউ নামাজ পড়তো পুবমুখী হয়ে। কেউ নামাজ পড়তো পশ্চিম দিকে মুখ করে। আবার কেউ তাদের নামাজে বায়তুল মাক্দিস মুখী হতো। আর আল্লাহ্পাক আমাদেরকে কাবামুখী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। রোজা সম্পর্কেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড মতবিরোধ। আল্লাহ্পাক আমাদের উপর রমজান

শরীফের রোজা ফরজ করে দিয়েছেন। সাপ্তাহিক উপাসনার বিশেষ দিন নিয়েও তাদের মধ্যে রয়েছে চরম অমিল। ইহুদীরা শনিবার ও খৃষ্টানেরা রবিবারকে সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন বলে ধার্য করে নিয়েছিলো। আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য শুক্রবার নির্ধারণ করেছেন। হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কেও ছিলো তাদের মধ্যে ভয়ানক মতানৈক্য। ইহুদীরা বলতো, তিনি ছিলেন ইহুদী এবং খৃষ্টানেরা বলতো, তিনি ছিলেন খৃষ্টান। আল্লাহ্পাক আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য দান করেছেন। হজরত ঈসা সম্পর্কেও বিপরীতমুখী ছিলো তারা। ইহুদীরা তাঁকে বলতো, চরিত্রহীনার পুত্র (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। আর খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করতো, তিনি ছিলেন আল্লাহর পুত্র (আল্লাহ পাক নিরাপদ রাখুন)। আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক বিশ্বাসের সংবাদ দিয়েছেন। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করার কথা। সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। এই সরল পথই সফলতার পথ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৪

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ○

❐ তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই! অর্থ-সংকট ও দুঃখ দারিদ্র তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এমন কি রসুল এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহের সাহায্য কখন আসিবে?' হাঁ, হাঁ, আল্লাহের সাহায্য নিকটেই।

আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত 'আম' অব্যয়টি প্রসঙ্গান্তর জ্ঞাপক। আগের আয়াতগুলোতে ইহুদী খৃষ্টানদের মতবিরোধ, বিশ্বাসীদের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই আয়াতে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ। এই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে— বিশ্বাসীদেরকে বিরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে; শত বিপদ মুসিবতের মধ্যেও এগিয়ে যেতে হবে মূল উদ্দেশ্যের দিকে।

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আহজাব (খন্দক) যুদ্ধের দিন। ওই যুদ্ধে রসুল স. এবং তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ মুশরিক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুসলমান বাহিনীর উপর নেমে এসেছিলো চরম দুঃখ-কষ্ট ও শংকা। উহুদ যুদ্ধের সময়েও এরকম বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন মুসলমানগণ। আল্লাহ্পাক সে সম্পর্কে এরশাদ করেছিলেন, 'তোমাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়েছিলো। আল্লাহপাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্নরূপ অলীক ধারণাকে আশ্রয় করেছিলে। সেখানেই পরীক্ষা করা হলো বিশ্বাসীদেরকে। আর আহত করা হলো প্রচন্ড আঘাতে।'

আতা বলেছেন, হিজরতের পর রসুল স. ও তাঁর সঙ্গী মুহাজিরগণ বিভিন্ন রকম বিপদাপদের সম্মুখীন হতে লাগলেন। বসত-বাটী, সম্পদ— সবকিছু তাঁরা পরিত্যাগ করে মদীনায় এসেছিলেন। কিন্তু মদীনাতেও তাঁরা সুস্থির হতে পারছিলেন না। আহার, আবাস— এ সকল চিন্তাতো ছিলোই, তার উপরে ছিলো ইহুদীদের জ্বালাতন। তাদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিলো। এ রকম সঙ্গীন অবস্থায় অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি।

এখানে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, তোমরা কি মনে কর ইমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য না হয়েই বেহেশতে প্রবেশ করবে? তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা লাভ করেছিলো বেহেশতের অধিকার তাঁদের কথা স্মরণ করো। অর্থসংকটে পতিত হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদেরকে স্পর্শ করেছিলো দুঃখ দারিদ্র। বিপদে ভীত ও কম্পিত হয়ে তাঁরা বলে উঠতেন, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই।

রসুল স. বলেছেন, জান্নাত আচ্ছাদিত রয়েছে বিপদাপদ দ্বারা। আর জাহান্নামের আচ্ছাদন হচ্ছে লোভনীয় বস্তুসমূহ। হজরত আনাস ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে।

ইবনে হাব্বান থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আমর বিন জমুহ একবার প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা কোন সম্পদ কোথায় ও কিভাবে ব্যয় করবো। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মুসলমানেরা যখন এরকম প্রশ্ন করলো তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৫

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

❒ লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন এবং পর্যটকদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এই বিধানটি অবতীর্ণ হয়েছিলো জাকাত ফরজ হওয়ার আগে। জাকাতের বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই বিধানটি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে- এই আয়াতটি জাকাতের প্রতিদ্বন্দ্বি নয়। তাই এখানে রহিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং বিধানটি এখনও সচল। এখানে মাতা-পিতা, নিকটজন, এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরের জন্য অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে— তোমাদের সকল উত্তম কাজ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা সম্যক অবগত। ওই সকল সৎকাজের নিয়ত অনুযায়ী তোমরা প্রতিফলও প্রাপ্ত হবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৬

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

❒ তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অরুচিকর; কিন্তু তোমরা যাহা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যাহা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন; তোমরা জান না।

আতা বলেছেন, জেহাদ নফল। এই আয়াতে যে ফরজের কথা বলা হয়েছে তা কেবল রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি প্রযোজ্য। ইমাম সওরীও এরকম বলেছেন। তাঁর সমর্থনে রয়েছে ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, জীবন ও সম্পদসহ যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে, তারা গৃহবাসীদের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে অধিক মর্যাদাশালী করেছেন এবং যারা জেহাদ করে এবং যারা জেহাদ করে না উভয়ের সঙ্গে আল্লাহ্পাক কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন। আতা ও সওরী বলেছেন, জেহাদ যদি ফরজ হতো তবে আল্লাহ্পাক যারা জেহাদ করে না তাদের সঙ্গে কল্যাণের অঙ্গীকার করতেন না। হজরত সাইয়েদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানের উপর জেহাদ ফরজ। আর এই আয়াতটি তার দলিল। এছাড়া তিনি দলিল হিসাবে আরও হাদিস পেশ

করেছেন। যেমন হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ জেহাদ করলো না— এমন কি জেহাদের ইচ্ছাকেও অন্তরে স্থান দিলো না, সে মৃত্যুবরণ করলো এক ধরনের নেফাকের (অপবিত্রতার) উপর। মুসলিম। জমহুরের মতে জেহাদ হচ্ছে ফরজে কেফায়া। কিছুসংখ্যক মানুষ জেহাদ করলে অন্য সকলে জেহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। যেমন জানাজার নামাজ। এ অভিমতটির উপরে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, শহরবাসীদের উপর জেহাদ ফরজ। তারা জেহাদ করবে নিকটবর্তী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। যদি তাদের দ্বারা জেহাদ সম্ভব না হয় অথবা তারা পরাজিত হয়, তবে তাদের পার্শ্বস্থ মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরজ হয়ে যাবে। তারাও যদি পর্যুদস্ত হয় তবে তাদের পার্শ্ববর্তীরা জেহাদে অংশগ্রহণ করবে। এভাবেই ধারাবাহিক অংশগ্রহণ চলতে থাকবে। এ ব্যাপারেও সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যখন শত্রুরা মুসলমানদের উপর চড়াও হবে এবং সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জেহাদের আহবান জানানো হবে, তখন শহরবাসী গ্রামবাসী সকলের উপর একযোগে জেহাদ ফরজ হয়ে যাবে। এটাও ঐকমত্য যে, যাদের প্রতি জেহাদ সুনির্দিষ্ট নয়, তারা পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে জেহাদে যেতে পারবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও মহাজনের অনুমতি ব্যতিরেকে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট জেহাদের অনুমতি চাইলেন। রসুল স. বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, গৃহগমন করো এবং মাতাপিতার খেদমতে রত হও। বোখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ এবং নাসাঈও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। 'যুদ্ধের বিধান তোমাদের জন্য অরুচিকর'— এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, জেহাদ তোমাদের নিকট স্বভাবজাত অনীহার কারণ। এতে রয়েছে জীবনহানির আশংকা ও অবধারিত অর্থ ব্যয়— যা সাধারণতঃ স্বভাববিরুদ্ধ। একথার অর্থ এরকম নয় যে, আল্লাহ্পাকের নির্দেশ প্রতিপালনে সাহাবাগণ অসম্মত ছিলেন।

'তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবতঃ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর'— জেহাদে যেমন জীবনহানী ও সম্পদঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিজয় ও গনিমত প্রাপ্তির আনন্দ। তদুপরি রয়েছে শাহাদত লাভের সৌভাগ্য ও পুণ্যার্জনের সুযোগ। এগুলো নিশ্চয়ই কল্যাণকর।

'তোমরা যা পছন্দ করো সম্ভবতঃ তাই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, জেহাদ পরিত্যাগের মধ্যে রয়েছে পাপ, লাঞ্ছনা, গনিমত ও পুণ্যের সুযোগ বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো নিশ্চয়ই কল্যাণবিরোধী।

সম্ভবতঃ 'আ'সা' শব্দটি সন্দেহের স্থলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে শব্দটি এ জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, প্রবৃত্তি পবিত্র হওয়ার পর সকল আশা-আকাংখা

শরিয়তের অনুকূল হয়ে যায়। তখন তার নিকট ওই সকল বস্তু নিকৃষ্ট মনে হয় যা আল্লাহ্পাকের নিকট নিকৃষ্ট। আর আল্লাহ্পাকের নিকট যা অভিপ্রেত, তাই হয়ে যায় তার প্রসন্ন অভিপ্রায়।

'আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে সত্বর আল্লাহপাকের নির্দেশানুগত হও। তিনিই জানেন কিসে দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সর্বোৎকৃষ্ট আমল কোনটি? তিনি স. বললেন, সময়মতো নামাজ পাঠ। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, মাতা পিতার সেবা। আমি পুনরায় বললাম, তারপর? তিনি স. এরশাদ করলেন, আল্লাহর পথে জেহাদ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি আরো প্রশ্ন করলে তিনি স. আরো উত্তর দিতেন। বোখারী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট প্রশ্ন করলেন, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি স. এরশাদ করলেন, রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন। ওই ব্যক্তি বললেন, তারপর? তিনি স. বললেন, আল্লাহর পথে জেহাদ। ওই ব্যক্তি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কী? তিনি স. এরশাদ করলেন, মকবুল হজ। বোখারী ও মুসলিম। এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের বিরুদ্ধ বলে মনে হয়। প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে, জেহাদ অপেক্ষা নামাজ উত্তম। পরের হাদিসে সেরকম বলা হয়নি। হাদিস দু'টির সামঞ্জস্য বিধান এভাবে সম্ভব যে, প্রশ্ন উত্থাপনকারীর যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করে তিনি স. জবাব দিয়েছিলেন। অথবা বলা যেতে পারে, হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে বর্ণিত রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে নামাজ ও জাকাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমরান বিন হাশিম থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, জেহাদের মাঠে মুজাহিদদের কাতারে একদিন দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বৎসর দাঁড়িয়ে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, বোখারীর শর্তানুযায়ী বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পথে একবার দন্ডায়মান হওয়া স্বগৃহে সত্তর বছর নামাজ পড়ার চেয়ে শ্রেয়। তিরমিজি। হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন— এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জেহাদের সমতুল্য কোনো আমল আছে কি? তিনি স. বললেন, আছে। তবে সে আমল প্রতিপালনের সাধ্য তোমাদের নেই। প্রশ্নকারী দুই কিংবা তিনবার একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনি স. একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহর পথে যে জেহাদ করে সে ওই ব্যক্তির মতো, যে সার্বক্ষণিক দন্ডায়মান অবস্থায় কোরআন মজীদ পাঠ করে এবং নামাজ ও রোজা রত থাকে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু উসামা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সেনাদলে ছিলাম। যুদ্ধযাত্রাকালে আমরা একটি নিচু ভূমি অতিক্রম করছিলাম। দেখলাম, স্থানটি জলমগ্ন ও শ্যামল। আমার এক সঙ্গী স্থানটি দেখে বিমোহিত হলেন। সংসার ত্যাগ

করে সেখানেই বসবাস করতে মনস্থ করলেন তিনি এবং এর জন্য রসুল স. এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. বললেন, আমি তোমাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টান বানাতে আসিনি। আমি প্রেরিত হয়েছি একটি সমুজ্জ্বল আদর্শ নিয়ে। আমার জীবনাধিকারী সেই পরম সত্তার শপথ! জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি সকাল বা সন্ধ্যা পথচলা পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ সকল বস্তু হতে উত্তম। জেহাদের কাতারে একবার দাঁড়ানো ষাট বছরের নামাজ থেকে শ্রেয়। আহমদ।

আমি বলি, হাদিসে যে নামাজের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা নফল নামাজ। আর নফল নামাজ অপেক্ষা জেহাদ উত্তম। এর কারণ হচ্ছে, বিধানগতভাবে জেহাদ ফরজে কেফায়া। একজন জেহাদ করলেও সকলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আর জেহাদ সব সময় আদায় করাও যায় না। কিন্তু জেহাদ শাহাদাতের উপলক্ষ্য, যা মর্যাদার দিক দিয়ে নবুয়তের নিকটবর্তী। নামাজ রোজার ব্যাপারটি অন্য রকম। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া নামাজ রোজা আদায় করা যায় না। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া যে নামাজ রোজা পালন করা সম্ভব, তা নফল পর্যায়ভুক্ত। আবার নফল ফরজের তুল্যও নয়। যদি কেউ বলে রসুল স. এরশাদ করেছেন, জিকির ব্যতীত আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি দানকারী অন্য কিছুই নেই। সাহাবাগণ বললেন, তবে জেহাদ? তিনি বললেন, জেহাদও নয়। যদিও কাফেরদের উপর তলোয়ার চালাতে চালাতে তলোয়ার খন্ডবিখন্ড হয়ে যায়। তিনি স. পরপর তিনবার এরকম বলেছিলেন। আহমদ, তিবরানী, ইবনে আবী শাইবা হজরত মুআজ সূত্রে এই বর্ণনাটি এনেছেন। প্রকাশ্যতঃ এই হাদিসটি প্রথমে বর্ণিত হাদিসগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বি। দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, এখানে জিকির অর্থ হুজুরে দায়েমী (সার্বক্ষণিক মগ্নতা)। এই মগ্নতা নিরবচ্ছিন্ন। এরকম মগ্ন ব্যক্তি নামাজ রোজাও যথাযথরূপে পালন করেন। এ ধরনের মানুষই সংসারাসক্তি মুক্ত। এই অবস্থাকে বলা হয় জেহাদে আকবর। বর্ণিত হয়েছে– একবার এক জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. এরশাদ করেছিলেন, এবার আমরা জেহাদে আসগর (গৌণ জেহাদ) থেকে জেহাদে আকবরের (মূখ্য জেহাদের) দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, জেহাদে আসগরে লিপ্ত থাকাবস্থায় রসুল স. কি জেহাদে আকবরে মগ্ন ছিলেন না? জবাবে আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি তখনও নিমগ্নচিত্ত ছিলেন। কিন্তু বাইরের কোলাহল ও ক্রিয়াকর্মের প্রচন্ডতায় তাঁর সেই মগ্নতা ছিলো নিষ্প্রভ। বাইরের কর্মমুখরতা যখন সমাপ্ত হলো তখন পুনরায় প্রবল হয়ে উঠলো নিমগ্নতার বৈভব।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত হয়েছে— যার পা আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত হবে, আল্লাহ্‌পাক তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দিবেন। হজরত ওসমান বলেছেন— আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি যুদ্ধক্ষেত্রে একরাত পাহারায় নিযুক্ত থাকা হাজার রাতের ইবাদত ও হাজার দিনের রোজা থেকে উত্তম। হজরত আবু বকর সিদ্দিক আরো বলেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, যে

সম্প্রদায় জেহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্পাক তাদের উপর সাধারণ বিপদাপদ অবতীর্ণ করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে একশত দরোজা। সেগুলো আল্লাহ্পাক শহীদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। এক দরোজা থেকে আরেক দরোজার ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর সমান। জান্নাত প্রার্থনা করলে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, জান্নাতুল ফেরদৌস সকল জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ জান্নাতই সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত। এর উপরেই রয়েছে আরশে আজীম। অন্যান্য জান্নাতের নদীগুলো জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে উৎসারিত। বোখারী। হজরত আবু হোরায়রা আরও বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, বিত্ত বৈভব বিধ্বংসী বস্তু, সম্পদ থাকলে আনন্দ, না থাকলে নিরানন্দ। প্রকৃত আনন্দ রয়েছে ওই মানুষের জন্য, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান। যার কেশগুচ্ছ অবিন্যস্ত ও পদযুগল ধূলিধূসরিত সে যদি প্রহরী হয়, তবে পাহারার স্থানেই তার অবস্থান। আর যদি সে অগ্রগামী বাহিনীর সদস্য হয়, তবে সেখানেই তাকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়। তার জন্য অন্যত্র গমনের অনুমতি নেই। যুদ্ধকালে তার স্বতন্ত্র কোনো বক্তব্য থাকে না। বোখারী।

সকল সৎকর্মের তুলনায় জেহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণেই যে, জেহাদই ইসলামের প্রচার ও মানুষের হেদায়েত লাভের উপকরণ। তাই কোনো মুজাহিদের চেষ্টায় যদি কারো হেদায়েত লাভ হয়, তবে হেদায়েত ও জেহাদ উভয়ের জন্য সে পুরস্কৃত হবে। তবে জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান শিক্ষা দেয়া জেহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের মূলতত্ত্ব।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৭, ২১৮

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجٰهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহের পথে বাধাদান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহের নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিত্‌না হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।' তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দ্বীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহকাল ও পরকালে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ যাহারা বিশ্বাস করে এবং যাহারা আল্লাহের পথে স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জিহাদ করে তাহারাই আল্লাহের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, ইবনে সা'আদ এবং বায়হাকী হজরত জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন- দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধের দু'মাস আগে রসুল স. তাঁর ফুফাত ভাই হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশের নেতৃত্বে আটজনের একটি বাহিনীকে অভিযানে পাঠালেন। তাঁরা ছিলেন সকলেই মুহাজির। ওই দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে— হজরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস, জুহরী, ওক্কাসা বিন মাহসিন আসাদী, উৎবা বিন গজওয়ান সালামী, আবু হুজায়ফা বিন উৎবা বিন রবীয়া, সুহাইল বিন বাইজাহ, আমের বিন রবীয়া, ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ এবং খালেদ বিন বুকাইর। কোনো কোনো বর্ণনায় সুহাইল বিন বাইজার নাম রয়েছে কিন্তু সহল, খালেদ এবং ওয়াক্কাসের নাম নেই। কেউ কেউ আবার মিকদাদ বিন আমরের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে সা'আদ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বারো জন। প্রতিটি উটে তাঁরা দু'জন করে আরোহন করতেন। রসুল স. তাঁদের অধিনায়ক হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নামে যাত্রা করো। দু'দিন পথ চলার পর দ্বিতীয় মঞ্জিলে উপস্থিত হয়ে এ নির্দেশনামাটি খুলবে এবং খুলে সকলকে পড়ে শুনাবে। নির্দেশনামা অনুযায়ী কাজ করবে। যারা স্বেচ্ছায় তোমার সহগামী হতে চায় কেবল তাদেরকেই সঙ্গে নিও।

কাউকে সঙ্গী হতে পীড়াপীড়ি কোরো না। অধিনায়ক বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এখন আমরা কোনদিকে যাত্রা করবো? তিনি স, বললেন, নজদের দিকে।

বিশেষ বাহিনীটি পথ চলতে শুরু করলো। দু'দিন পর একস্থানে থেমে শিবির স্থাপন করলেন তাঁরা। সেখানে বাহিনীর অধিনায়ক নির্দেশনামাটি পাঠ করতে শুরু করলেন—'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্পাকের বরকত ও রহমতের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হও। বাত্নে নাখলাতে পৌছে কোরাইশ বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় থাকো। তারা এলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং যা কিছু হস্তগত হয় তাই নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।' নির্দেশনামাটি শোনার সাথে সাথে বাহিনীর সকল সদস্য বললেন, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। অধিনায়ক বললেন, যদি শহীদ হওয়ার বাসনা থাকে তবে আমার সহগামী হও। নতুবা অন্যত্র গমন করো। রসুল স. আমাকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করেছেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন। সকলে স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগমন করলেন। বাহিনী পৌছলো মারজানে। স্থানটি ছিলো হেজাজ এলাকায়। একটি উচ্চ ভূমির নাম নাজরান। সেখানে হজরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের উটটি হারিয়ে গেলো। উটটি খুঁজতে যেয়ে তিনি পিছনে পড়ে গেলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্যরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী বাত্নে নাখলায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, কোরাইশদের একটি বাণিজ্যবাহিনী তায়েফ থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্গে ছিলো চামড়া, কিসমিস ইত্যাদি। বাণিজ্যবাহিনীটিতে ছিলো আমর বিন হাজরামী, হাকাম বিন ইমাম, ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুগীরা মাখজুমী ও তার ভাই নওফেল বিন আবদুল্লাহ মাখজুমী। মুসলমান বাহিনীকে সামনে দেখতে পেয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হলো। অধিনায়ক হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ তাঁর সাথীদেরকে বললেন, ওরা ভয় পেয়েছে। তোমরা কেউ একজন মস্তক মুন্ডন করে তাদের সাথে সাক্ষাত করো। তাহলে তাদের ভয় কেটে যাবে। হজরত ওয়াক্কাস মাথা মুন্ডন করে তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা বললো, আরে তুমিতো দেখছি আমাদের গোত্রের লোক। তবে তো আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। মুসলিম বাহিনী মনে করেছিলো দিনটি ছিলো জমাদিউল আখের মাসের শেষ তারিখ। কিন্তু সে দিনটি ছিলো পহেলা রজব। তাঁরা স্থির করলেন, আজকের মধ্যেই রসুল স. এর নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে। নতুবা কাল থেকে শুরু হবে সম্মানিত রজব মাস। আর সম্মানিত মাসে রক্তপাত হারাম। একথা ভেবে তাঁরা কোরাইশদের বাণিজ্যবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। হজরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ্র তীরের আঘাতে নিহত হলো আমর বিন হাজরামী। বন্দী হলো ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুগীরা এবং হাকাম বিন কীসান। আর নওফেল পালিয়ে গেলো। পণ্য সম্ভার ও বন্দীদেরকে নিয়ে নির্বিঘ্নে মুজাহিদবাহিনী ফিরে এলো রসুল স. এর নিকট।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গণিমতের) এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে অবশিষ্ট অংশ যোদ্ধাগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিলো। এই বন্টন পদ্ধতি এ ঘটনা থেকেই প্রচলিত হয়। প্রথম মুশরিক বন্দী হয় এ ঘটনায় এবং কোনো মুশরিক প্রথম নিহত হয় এ ঘটনাতেই। নিহত হয়েছিলো আমর বিন হাজরামী এবং বন্দী হয়েছিলো ওসমান বিন হাকাম।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ তাঁর বাহিনী, বন্দীদ্বয় ও গণিমত নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলে রসুল স. বললেন, আমিতো তোমাদেরকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি। ওদিকে মক্কার কোরাইশরা সেখানকার মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো, দেখো! মুসলমানেরা কী রকম। তোমরা সম্মানিত মাসের মর্যাদা রক্ষা করো না। একথা শুনে মুসলমানেরা লজ্জিত হলো এবং আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগলো। অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদরাও ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরাতো হাজরামীকে হত্যা করার পর সন্ধ্যাবেলা আকাশে নতুন চাঁদ দেখেছিলাম। আমরা মনে করেছিলাম, সেদিনটি ছিলো জমাদিউল আখের মাসের শেষ তারিখ। রজব মাসের প্রথম তারিখ বুঝতে পারলে আমরা এ ঘটনা ঘটাতাম না। কিন্তু তাদের এ কৈফিয়ৎ রসুল স. ও অন্যান্য মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। তখন অবতীর্ণ হলো এ আয়াতটি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. গণিমতের এক পঞ্চমাংশ নিজের কাছে রেখে বাকী চতুর্থাংশ যোদ্ধাগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এরকমও বলেছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত বাত্নে নাখলার গণিমত বন্টনহীন অবস্থায় ছিলো। বদর যুদ্ধের গণিমতের সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলোকে বন্টন করা হয়।

মক্কার মুশরিকেরা ফিদিয়ার বিনিময়ে বন্দীমুক্তির প্রস্তাব পাঠালো। রসুল স. তাদেরকে বলে পাঠালেন, সা'আদ এবং উতবা মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে না। কারণ, আমরা আশঙ্কা করি তোমাদের লোককে ছেড়ে দিলে তোমরা সা'আদ ও উতবাকে হত্যা করে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করবে। কিছু দিন পর সা'আদ এবং উতবা মদীনায় পৌছলেন। তখন রসুল স. প্রত্যেক বন্দীর জন্য চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হাকাম বিন কিসান মক্কায় আর ফিরে গেলেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনাতেই থেকে গেলেন। পরে তিনি বীরে মাউনার অভিযানে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। অপর বন্দী ওসমান বিন আবদুল্লাহ মক্কায় ফিরে গেলো। তার মৃত্যু হয়েছিলো অবিশ্বাসী অবস্থায়। আর নওফেল তার নিজের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছিলো খন্দক যুদ্ধের সময়।

'উহাতে (সম্মানিত মাসে) যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়'— এ বিধানটি 'তোমরা যেখানে পাও মুশরিকদের হত্যা কর' আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্বান

এরকম বলেছেন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, 'হাইছু' শব্দটি সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ 'যখনই পাও' নির্দেশের মাধ্যমে বুঝা যায় এ আয়াতটি আসলে রহিতই।

আমি বলি 'হাইছু' শব্দটি স্থান বা কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — এরকম প্রমাণ কারো কাছে নেই। স্থান ও কাল সম্পৃক্তির কথা যদি মেনেও নেয়া যায়, তবু তা সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপার সন্দেহ থেকেই যায়। এরকম সন্দিগ্ধতা দ্বারা কোনো বিধানকে রহিত মনে করা সঙ্গত নয়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে রহিত করার ব্যাপারটা অনির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়কে রহিত করার মতো। তাই বিধানটি রহিত না হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট বিধান রহিত হওয়া সম্ভব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে অনির্দিষ্টি (আম) নির্দিষ্টির (খাস)এর মতোই অকাট্য। আর শাফেয়ীর মতে আম হচ্ছে বিবেচনাধীন বিষয়। কিন্তু খাস এর বিপরীত। কেনোনা এমন কোনো আম নেই যার কিছু অংশ খাস নয়।

বায়যাবী বলেছেন, উত্তম অভিমত হচ্ছে- সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণ নিষিদ্ধতার সমর্থনে এ আয়াতটিকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন না করাই উত্তম। 'কিতাল' (যুদ্ধ) শব্দটি অনির্দিষ্ট হ্যাঁ সূচক। সুতরাং একে নির্দিষ্ট বলা যায় না। আমি বলি, হ্যাঁ সূচক ক্রিয়ার অধীনে অনির্দিষ্টিও নির্দ্দিষ্টির পর্যায়ভূত হয়। ওদিকে ইবনুল হুম্মাম মনে করেন, হাদিসের মাধ্যমেও কোরআন রহিত হওয়া সম্ভব। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে— 'সকল মুশরিককে হত্যা করো।' আর হাদিসে বলা হয়েছে, মানুষ যতোক্ষণ না এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই একথা স্বীকৃতি দেয় আমি ততোক্ষণ তাদের হত্যার জন্য আদিষ্ট।

আমি বলি. ইমাম বায়যাবীর দলিল যথাযথ নয়। কারণ, এ আয়াতের সাধারণ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে মুকাল্লিফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) দের অবস্থার উপর। বিষয়টি কালসম্পৃক্ত নয়। সুতরাং সম্মানিত মাস আগমনের সাথে সাথে রহিত করণের নীতি যে প্রযোজ্য হবেই— সে কথা বলা যাবে না। বরং কালের সঙ্গে সাধারণ সম্পৃক্তির কথা মেনে নেয়া গেলেও দলিলের প্রয়োজন থেকেই যায়। কিন্তু এখানে দলিলের প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। তাই রহিতকরণ কিংবা নির্দ্দিষ্টকরণ কোনোটিই এখানে থাকে না। যাঁরা আয়াতটি রহিত হয়েছে বলে মনে করেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে ওই আয়াতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যেখানে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্র বিধান ও গণনার মাস বারোটি, আসমান সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে সম্মানিত মাস চারটি। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না। আর তোমরা সমবেতভাবে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো। যেমন তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে তোমাদের সাথে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো আল্লাহ্ আল্লাহ্ভীরুদের সাথে রয়েছেন। মাসের অগ্র পশ্চাৎ করা শুধু মাত্র বৃদ্ধি করে

কুফরী। যদ্দরুন কাফেরেরা পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে অন্য বছর; যাতে তারা গণনা পূরণ করে নেয় আল্লাহ্র নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করা হলো তাদের জন্যই। আর আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হেদায়েত করেন না।'

নবম হিজরীতে অবতীর্ণ এই আয়াতটিই যুদ্ধ সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতকে বলে তলোয়ারের আয়াত। এখানেও সম্মানিত মাসের উল্লেখ রয়েছে। কাজেই এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, জেহাদ ওয়াজিব হওয়া এ মাসগুলো সম্মানিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আল্লাহ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

মহাতিরোধানের দু'মাস পূর্বে রসুল স. বিদায় হজ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তখন এই চারমাস যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মনে রেখো, আকাশ পৃথিবী সৃজনের সময় যেমন ছিলো, তেমনি সময় ফিরে এসেছে আজ। বছরের বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তার মধ্যে তিনটি মাস পরস্পরলগ্ন এবং একটি পৃথক। সংলগ্ন মাস তিনটি হচ্ছে— জিলক্বদ, জিলহজ ও মুহররম এবং পৃথক মাসটি রজব। ওই ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, তোমাদের পরস্পরের রক্ত এবং সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম। যেমন হারাম এই শহর, এই মাস এবং আজকের দিবস। হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, রসুল স. জিলহজ মাসের বিশ তারিখে তায়েফ অবরোধ করেছিলেন। মাসাধিককাল স্থায়ী ছিলো ওই অবরোধ। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, আলোচ্য আয়াতটি রহিত। কিন্তু মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ বিশই জিলহজ নয়, তায়েফ অবরুদ্ধ হয়েছিলো অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের বছর রমজান মাসে আমরা রসুল স. এর সঙ্গে মদীনা থেকে যাত্রা করি। বিশুদ্ধ সনদসহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। বিশুদ্ধ সূত্রে বায়হাকী ও জুহুরীর বর্ণনাতেও এসেছে, মক্কাবিজয় সংঘটিত হয়েছিলো পবিত্র রমজানের তেরো তারিখে।

আমি বলি, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রমজানের প্রথম বারো দিন রসুল স. পথিমধ্যে ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. তখন মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সতেরো কিংবা আঠারো দিন। বোখারীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে আঠারো দিনের কথা। মক্কাবিজয়ের পর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ রবিবার তিনি রওনা হয়েছিলেন হুনায়েন অভিযানে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হুনায়েন যাত্রার তারিখ ছিলো পাঁচই শাওয়াল। এ সম্পর্কে ওরওয়া এবং ইবনে জারীরের অভিমত অভিন্ন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. হুনায়েনে উপস্থিত হয়েছিলেন শাওয়ালের দশ তারিখে। হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। রসুল স. তখন গণিমত একত্রিত করলেন। এরপর তায়েফে আবির্ভূত

হলো সকীফ গোত্রের নেতা নওফেল। সে তায়েফবাসীদেরকে নগরীর অভ্যন্তরে সমবেত করলো। তারপর বন্ধ করে দিলো নগরের প্রধান তোরণ। যুদ্ধপ্রস্তুতিও শুরু করে দিলো তারা। রসুল স. তায়েফ পুনঃঅবরোধ করলেন। হজরত আনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিম বলেছেন, ওই অবরোধ স্থায়ী ছিলো চল্লিশ দিন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য (শাজ)। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় তিরিশ দিন অবরোধের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন বিশ দিনের কথা। অবরোধ শেষে তিনি স. মক্কাভিমুখী হলেন। জিলক্বদ মাসের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি পৌঁছলেন জিইররানা নামক স্থানে। সেখানে অবস্থান করলেন তেরো দিন। এরপর মক্কায় ওমরা পালন শেষে জিলক্বদের আঠারো তারিখ বুধবারে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন ২৭শে জিলক্বদ শুক্রবারে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, মক্কা যাত্রা, বিজয়, হাওয়াজেন সম্প্রদায়কে আক্রমণ, তায়েফ অবরোধ ইত্যাদি শেষ করে তাঁর স. এর সময় লেগেছিলো দুই মাস ষোলো অথবা ছাব্বিশ দিন। সুতরাং তায়েফ অবরোধ কাল ছিলো, জিলহজের বিশ তারিখ থেকে মুহররমের শেষ পর্যন্ত- ইবনে হুম্মামের এই মন্তব্য অসঠিক। সার কথা এই যে, সম্মানিত মাসের বিধান রহিত হয়নি। তবে হ্যাঁ, এ আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত ওই আয়াতটি রহিত হয়েছে; যেখানে বলা হয়েছে, সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস। আর কিসাসই হলো সম্মান; 'যারা যেমন সীমাতিক্রম করবে, তোমরাও তেমনি সীমাতিক্রম কোরো'— এ আয়াত দ্বারা সম্মানিত মাসের যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ মনে হয়, যদি সে যুদ্ধ কাফেরদের পক্ষ থেকে হয়। কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের আগে। আর সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধতার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে পরে।

'আল্লাহ্র পথে বাধাদান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর অন্যায়'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে অবিশ্বাসীরা সকল অন্যায় কর্মে ব্যাপৃত। তাদের এ সকল অন্যায় অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ ও তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত অন্যায় অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর। আর ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, ভুলবশতঃ তাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা ওই দিনটিকে মনে করেছিলেন জমাদিউল আখেরের শেষ দিন। সেই দিনটি যে পহেলা রজব তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

'ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়'— একথার অর্থ, হাজরামীকে হত্যা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে হত্যার চেয়ে কাফেরদের সৃষ্ট ফেৎনাগুলো অনেক বেশী গুরুতর। হত্যার জন্য তারা মুসলমানদেরকে দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু মুসলমান বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ওই হত্যাকান্ডটি ছিলো ভ্রমজনিত। আর অবিশ্বাসীরা ফেৎনার পর ফেৎনা করে যাচ্ছে অবলীলায়, সজ্ঞানে।

'তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করার অভিপ্রায়ে— যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল। তারা জাহান্নামের অধিবাসী, আর জাহান্নামই তাদের স্থায়ী আবাস'— ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ধর্ম ত্যাগ করে অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত কৃতকর্ম নিষ্ফল হয় না। যেমন, জোহরের নামাজ আদায়ের পর কেউ ধর্মত্যাগী হলো, আবার জোহরের সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলো—এমতাবস্থায় তাকে জোহরের নামাজ পুনঃ আদায় করতে হবে না। তেমনি হজ সম্পন্ন করার পর ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় ইসলামে ফিরে এলে তার উপর পুনঃ হজ সম্পাদন জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ীর মতে, কৃতকর্ম সবসময় উৎসের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর উৎস বলে আর কিছু থাকে না। সুতরাং নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকাবস্থায় কোনো ধর্মত্যাগী পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করলে ওই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা ফরজ। ঠিক তেমনি দ্বিতীয় বার হজ করাও ফরজ— যদি প্রথম হজের পরে কেউ ধর্ম পরিত্যাগ করে।

যে ধর্ম ত্যাগ করে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া যাবে না। তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ধর্মত্যাগীকে তিন দিন অবকাশ দেয়া ওয়াজিব। এর মধ্যে যদি সে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তবে সে জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।

ধর্মত্যাগী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের ইহকাল যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি পরকালও নিরাপত্তাহীন। উভয় জগতে নিষ্ফল যারা— তাদের জন্য রয়েছে অগ্নিঅধিবাস। এটাই অবিশ্বাসীদের পরিণতি। তাদের দোজখবাস চিরস্থায়ী।

বাত্নে নাখলার অভিযানে অংশগ্রহনকারী সৈনিকবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের এই অভিযানের বিনিময় কি আমরা পাবো? আমাদের এই অভিযানকে কি জেহাদ নামে অভিহিত করা যায়? তাঁদের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো, 'যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহ্র পথে স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জেহাদ করে, তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।' এখানে অনুগ্রহ প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে একারণে যে, কেউ যেনো মনে না করে, সৎকর্মের প্রতিদান দেয়া আল্লাহ্র জন্য অপরিহার্য। সৎকর্মই সওয়াব প্রাপ্তির একমাত্র উপলক্ষ্য নয়। সবকিছুই নির্ভর করে পরিণতি ও পরিণামের উপর। ওই ব্যক্তি উত্তম যার শেষ অবস্থা উত্তম। অতএব বিশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবীপরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নিশ্চিতি নেই। তাই শেষ সময় পর্যন্ত সৎকর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে। আর প্রত্যাশী হয়ে থাকতে হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহের।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

❒ লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল,'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কী তাহারা ব্যয় করিবে? বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত।' এই ভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা চিন্তা কর,

❒ ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাহাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।' তোমরা যদি তাহাদের সহিত একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদিগকে কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, মদীনাবাসীরা মদ্য পান করতো ও জুয়া খেলতো, রসুল স. এর মদীনা আগমনের পর মদীনাবাসীরা তাঁর নিকট মদ্যপান ও জুয়া খেলা বৈধ কিনা জানতে চাইলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের বিবরণদৃষ্টে বৈধা-বৈধ নির্ণয় করা যায় না। তাই মদ্যপান ও জুয়া বন্ধ হলো না। এর মধ্যে ঘটলো একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। এক মুহাজির মাগরিবের নামাজ পাঠকালে এমন নেশাগ্রস্ত হলেন যে, তাঁর কোরআন আবৃত্তি বার বার ভুল হতে লাগলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন, হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না। এর কিছুদিন

পরে জুয়ার বিষয়ে প্রত্যাদেশ হলো, হে বিশ্বাসীরা! নিঃসন্দেহে শরাব, জুয়া, প্রতিমা পূজা ও শুভাশুভ নির্ঘন্ট শয়তানের কাজ, অপবিত্র— এরকম অবতীর্ণ হওয়ার পর সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, শরাব ও জুয়া হারাম।

বাগবী বলেছেন, মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাজিল হয়। প্রথমে মক্কায় নাজিল হলো, 'তোমরা খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল থেকে মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করো।' তখন অনেকেই মদ্যপান করতেন এবং তখন মদ্যপান করা ছিলো হালাল। একবার হজরত ওমর, হজরত মুআজ বিন জাবাল প্রমুখ রসুল স. এর সকাশে নিবেদন করলেন, শরাব ও জুয়ার কারণে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনি আমাদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করুন। তাঁদের এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে মদ ও জুয়ার মধ্যে মহাপাপ ও উপকার উভয়টি রয়েছে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, উপকার অপেক্ষা পাপই অধিক। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মহাপাপের আশংকায় কেউ কেউ মদ্যপান পরিত্যাগ করলেন। আর উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেকেই মদ্যপান চালিয়েই যেতে লাগলেন। এক দিনের ঘটনা— হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ কিছুসংখ্যক সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করলেন। আহারের পর নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রচুর মদ্যপান করলেন। মাগরিবের নামাজের সময় হলো। নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই তাঁরা সকলে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নেশাচ্ছন্নতার কারণে ইমামের কোরআন পাঠে মারাত্মক ভুল হয়ে গেলো। সুরা কাফেরুন পাঠ করছিলেন তিনি। ওই সুরায় যে কয়টি 'লা' শব্দ ছিলো তার সব কয়টি তিনি বাদ দিয়ে সুরাটি পাঠ করলেন। তখন আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশ করলেন, 'হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সকলে মনে করলেন, নামাজের সময়ই কেবল মদ্যপান হারাম। তাই তাঁরা নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময় মদ্যপান চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেউ কেউ পান করতেন ফজরের নামাজের পর যাতে জোহরের আগেই নেশা ছুটে যায়। আবার কেউ কেউ পান করতেন এশার পর যাতে ফজরের আগেই নেশার প্রতিক্রিয়া অবলুপ্ত হয়ে যায়। একদিন হজরত উতবা বিন মালিক কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত দিলেন। মেহমানদের জন্য বিরাট উট জবাই করা হলো। উটের গোশ্‌ত খাওয়ার পর মেহমানেরা প্রচুর পরিমাণে শরাব পান করলেন। নেশার ঘোরে তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। কখনও কখনও একে অপরের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতে থাকলেন। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস আনসারদের প্রতি কটাক্ষ পূর্বক একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। আবৃত্তি শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে এক আনসার সাহাবী আহার শেষে পড়ে থাকা উটের মাথা দিয়ে আঘাত করলেন হজরত সা'দ এর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা ফেটে গেলো। রসুল স. এর নিকট এই ঘটনাটি জানানো হলো। রসুল স. তখন আল্লাহ্‌পাকের নিকট প্রার্থনা করলেন— হে আমার আল্লাহ্! একি অবস্থা আমার উম্মতের। দয়া করে মদ্যপান সম্পর্কে একটি বিধান

দান করুন। সঙ্গে সঙ্গে সুরা মায়েদার ওই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো— 'হে বিশ্বাসীরা! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, প্রতিমা, শুভাশুভ নির্ণয় শয়তানের কাজ যা অপবিত্র।'

শরাবের সংজ্ঞাঃ শরাব বা খামারের সংজ্ঞা নির্ণয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আঙ্গুরের কাঁচা রসে ঝাঁঝ ও ফেনার সৃষ্টি হলে মাদকতাপূর্ণ সেই রসকে বলে শরাব। সাহেবাইন বলেছেন, আঙ্গুরের রসে ফেনা সৃষ্টি না হলেও তা শরাব। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, যে কোনো পানীয় হোক না কেন অধিক পরিমাণে পান করলে যদি মাদকতা আসে তবে সেটাই খামার। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ভাষাবিদগণের নিকট যা খামার বলে পরিচিত সেই বিশেষ পানীয়ের নামই খামার। অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, মুসাল্লাস, তেলা, মুনাসসাফ, বাজেক ইত্যাদি। জমহুর বলেছেন, যে বস্তু বিবেককে চঞ্চল করে সেই বস্তুই খামার। আমার অভিমত হচ্ছে, খামার একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। সাধারণ ও বিশেষ দুই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সচরাচর সাধারণ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কামুস অভিধান রচয়িতা বলেন, যে পানীয়ের মধ্যে মাদকতা রয়েছে, তাকেই খামার বা শরাব বলা হয়। সে পানীয় আঙ্গুরের রস থেকে হোক অথবা অন্য যে কোন পানীয় হোক। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যখন শরাব হারাম ঘোষিত হয়, তখন আঙ্গুরের রস দিয়ে শরাব প্রস্তুতির প্রচলন ছিলো না। বোখারী। হজরত আনাস বলেছেন, যেদিন মদ্যপান হারাম ঘোষিত হয় সেদিন আমি ছিলাম শরাব পরিবেশনকারী। তখন কাঁচা পাকা নিষিক্ত মদ ব্যতীত অন্য কোনো মদ পাওয়া যেতো না। বোখারী, মুসলিম। তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে, আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবু তালহা এবং অন্যান্যদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। অন্য একটি বর্ণনায় আবু তালহার সঙ্গে আবু ওবায়দা বিন জাররা এবং উবাই বিন কা'আব শুহাইলের নাম এসেছে। বর্ণিত হয়েছে, ইত্যবসরে একজন এসে জানালেন, মদ হারাম হয়ে গিয়েছে। মদ্যপায়ীগণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আনাস। মদের পাত্র উপুড় করে দাও। তখন থেকে তাঁরা আর মদ্য পান করেননি। তাঁরা তখন সংবাদদাতা কর্তৃক আনীত মদ্য পান হারাম সম্বলিত সংবাদটিকে যাচাই করতে উদ্যোগীও হননি। হজরত আনাস আরও বলেছেন, যখন মদ হারাম হয় তখন আঙ্গুরের তৈরী মদ খুব কমই পাওয়া যেতো। তখন মদ তৈরী হতো সাধারণত কাঁচা পাকা ভুট্টা থেকে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'খামার' শব্দটি কখনো কখনো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদে শব্দটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির সাধারণ অর্থ গ্রহণ না করলে ওই প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের জবাব যথাযথ হয় না। প্রশ্ন বা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিলো তৎকালীন প্রচলিত মদ সম্পর্কে। হজরত ওমর ও হজরত মুআজ বলেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ স. আমাদেরকে ওই নেশাশক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিন যা বিবেককে বিপর্যস্ত করে।

আল্লাহ্পাকও তাই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুরাও অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়। আর উদাসীন রাখতে চায় আল্লাহ্র জিকির ও নামাজ থেকে।'— এখানে বিশেষভাবে আঙ্গুরের রসের কথা বলা হয়নি। আর তখনকার সমাজে আঙ্গুরের রসের প্রচলনও ছিলো না।

হজরত ওমর ফারুক থেকে বর্ণিত হয়েছে, শরাব নিষিদ্ধ। আর শরাব প্রস্তুত হয় আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু থেকে। ওই পানীয়কে শরাব বলে যা বিবেককে বিভ্রান্ত করে দেয়। বোখারী, মুসলিম।

শরাবের উপকরণঃ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, মাদক দ্রব্য তৈরী হয় গম, যব, খেজুর, কিসমিস ও মধু থেকে। মারফু পদ্ধতিতে হজরত নোমান বিন বশীর থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। ইমাম আহমদের একটি বর্ণনার শেষ দিকে দেখা যায়, রসুল স. বলেছেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন সকল বস্তুই হারাম। মুসলিম। হজরত আনাস বলেছেন, মদ প্রস্তুত হয় আঙ্গুর, খেজুর, মধু ও ভুট্টা থেকে। অল্প বা অধিক সকল পরিমাণ মদই হারাম ও অপবিত্র। মদ্যপানকারীকে শরিয়তসম্মত শাস্তি দিতে হবে। মদের বেচাকেনাও হারাম। কেউ মদ নষ্ট করলে তাকে জরিমানা দিতে হবে না। মতভেদ ও বস্তু পার্থক্যহেতু আঙ্গুরের কাঁচা রস ছাড়া যব, গম, ভুট্টার পানীয় হালাল- এগুলো যে পান করে তাকে কাফের বলা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শরাব জাতীয় তিন বস্তু হারাম। ১. তেলা-যা আঙ্গুরের রস থেকে প্রস্তুত হয়। এ জাতীয় শরাব প্রস্তুত হয় আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেললে। ২. আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে অর্ধেক কমিয়ে ফেললে যে শরাব হয় তার নাম মুনাস্সাফ। ৩. জ্বাল দেয়া রস যদি অর্ধেকের কম হয়ে যায় তখন সেই শরাবকে বলে বাজেক। খেজুরের শরবত থেকে প্রস্তুত শরাবকে বলে 'সাকার'। যখন খেজুরের রস ঝাঁঝালো হয় ও তা থেকে ফেনা নির্গত হতে থাকে তখনই তা হারাম হয়ে যায়। তৃতীয় আরেক ধরনের শরাব প্রস্তুত হয় কিসমিসের রস থেকে। যখন কিসমিসের রসের ফেনা বের হতে থাকে তখনই তা শরাব পদবাচ্য হয়। ইমাম আবু ইউসুফ অবশ্য ঝাঁঝালো হওয়ার কথা বলেননি।

সকল প্রকার মদ হারাম ও অপবিত্র। এক বর্ণনামতে লঘু অপবিত্র (নাজাসাতে খফিফা) এবং অন্য বর্ণনামতে গুরু অপবিত্র (নাজাসাতে গালিজা)। অল্প পরিমাণ মদ্যপান করাও হারাম। যেমন হারাম অল্প পরিমাণ প্রস্রাবও। নেশাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত মদ্যপানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি অনুমানের পর্যায়ে থেকে যাবে। আর অনুমানে কাউকে শাস্তি আরোপ করা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিঃসন্দেহে শরাবে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো পানীয় বিক্রয় করা যাবে। এবং সেই পানীয় কেউ বিনষ্ট করলে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাবে। সাহেবাইন একথায় একমত হননি। খেজুর,

আঙ্গুর ও কিসমিসের রসের অধিকাংশই যদি অল্প পরিমাণে ঝাঁঝালো হয়ে যায় এবং তা পান করলে যদি মাদকতা না আসে তবে তা পান করা বৈধ— ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক বৈধ বলেননি। তবে বলেছেন, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পান করলে দোষ নেই। আর যদি স্ফূর্তি তামাশার উদ্দেশ্যে পান করা হয় তবে তা ঐকমত্যানুযায়ী হারাম হবে। পানকারীর উপর প্রযোজ্য হবে শরিয়তের শাস্তি (হদ)। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, যদি তিন পেয়ালা পান করলে মাদকতা সৃষ্টি হয় তবে শেষ পেয়ালাটি পান করা হারাম হবে। কারণ শেষেরটির কারণে মাদকতা সৃষ্টি হয়েছে। গম, যব, ভুট্টা, মধু, নাবিজ, দুধ, ইত্যাদি পান করা বৈধ। এসব পান করলে যদি মাদকতা আসে তবে পানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অপর বর্ণনায় রয়েছে, এসব পানীয় পান করে নেশাগ্রস্ত হলে পানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে। হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে— আলেমগণ বলেন, এইরূপ পানকারীর উপর শাস্তি আরোপিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ তিনজনই বলেছেন, বর্ণিত পানীয়গুলো অপবিত্র (নাপাক) নয়। কারণ ওগুলোর অল্প পরিমাণকে তাঁরা হারাম বলেন না। ফতওয়ায়ে নাসাফী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে— ভাঙ হারাম। ভাঙখোর যদি তালাক প্রদান করে তবে তা কার্যকর হবে। ভাঙকে যে হালাল মনে করবে তাকে হত্যা করা যাবে। মদ্যপানকারীর মতোই সে শাস্তিযোগ্য।

অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নেশাজাত দ্রব্য হারাম— অল্প অধিক যে পরিমাণই হোক না কেনো। হজরত জাবের বলেছেন, একবার ইয়েমেন থেকে এক লোক এসে নবী পাক স. কে জিজ্ঞেস করলো, ভুট্টা থেকে তৈরী মদ হালাল না হারাম? আমাদের অঞ্চলের লোকেরা ভুট্টার রস পান করে। রসুল স. জানতে চাইলেন ওই রস পান করলে কি নেশা হয়? লোকটি বললো, হাঁ। রসুল স. বললেন, নেশাজাত দ্রব্য অল্প বিস্তর সবই হারাম। মুসলিম। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, অল্প কিংবা বেশী সকল পরিমাণ নেশা আনয়ণকারী বস্তুকে রসুল স. হারাম বলেছেন। নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, বায্যার। হজরত জাবের বলেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, যা মত্ততা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম। তিরমিজি,আবু দাউদ, ইবনে মাজা। যেমন জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. বলেন, যে বস্তু অধিক পান করলে মত্ততা আসে সে বস্তু অল্প পান করাও হারাম। আবু দাউদ, তিরমিজি, আহমদ, ইবনে হাব্বান।

হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, মত্ততা আনয়নকারী ও বিবেক লোপকারী প্রতিটি বস্তুকে রসুল স. হারাম বলেছেন। আবু দাউদ। হজরত দাইলাম হুমাইরি বলেছেন— আমি নিবেদন করলাম, হে অনুকম্পার নবী! আমরা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী। আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কর্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং শৈত্যাধিক্য থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা গমজাত পানীয় পান করি। রসুল স.

বললেন, তাতে কি মত্ততা আসে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি স. বললেন, ওসব পরিত্যাগ করো। আমি বললাম, কিন্তু জনসাধারণ তো পরিত্যাগ করতে চাইবে না। তিনি স. বললেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আবু দাউদ। হজরত আবু মালেক আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতগণের অনেকে মদ্যপান করবে। তারা মদকে অন্য নামে অভিহিত করবে। আবু দাউদ। হজরত আলী থেকে দারা কুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। মুসতাদরাক গ্রন্থে খাওয়াত বিন জোবায়ের থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম কিছু সংখ্যক হাদিসের মাধ্যমে নাবীজ মোবাহ হওয়া প্রমাণ করেছেন। যব ও খেজুরের তৈরী মদকে বলে নাবীজ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, নবী পাক স. এর জন্য রাতে খেজুর ভিজিয়ে রাখা হতো। সকালে তিনি তা পান করতেন। কখনো কখনো সেই রস পরের দিন সকালে সন্ধ্যায় অথবা রাতে এবং পরের দিন আসরের সময় পর্যন্ত পান করতেন। তাঁর পানের পর অবশিষ্ট শরবত তিনি ফেলে দিতেন অথবা তাঁর কোনো খাদেমকে পান করতে বলতেন। এই হাদিসটি বর্ণনা করে মুসলিম বলেছেন, যদি ওই রস হারাম হতো তবে রসুল স. তাঁর খাদেমকে তা পান করতে দিতেন না। একথার জবাবে বলা যায়, তখন পর্যন্ত ওই রস নেশার দ্রব্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু তাতে নেশা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তাই তিনি সম্ভাবনা না থাকলে খাদেমকে পান করতে দিতেন। আর সম্ভাবনা থাকলে ফেলে দিতেন। এক মাসআলায় বলা হয়েছে, মদ ব্যতীত অন্যান্য পানীয়ের ক্ষেত্রে কেবল শেষ পেয়ালা হারাম। অর্থাৎ অল্প পরিমাণ গ্রহণ করলে তা হারাম নয়। এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিটি মত্ততা বিশিষ্ট বস্তুই হারাম। একথা বলে ওই সকল পানীয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেগুলো মত্ততা আনে। দারা কুতনী। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি জয়ীফ। হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং আম্মার বিন মাতার এই হাদিসের বর্ণনাকারী। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে নাখয়ীর উক্তি। আর এর সূত্র জড়িত রয়েছে ইবনে মোবারকের সঙ্গে। একজন এই হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সম্মুখে বর্ণনা করলে তিনি বলেছিলেন, হাদিসটি বাতিল। আবার ওই সকল আলেম এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন যাঁরা মদকে সরাসরি হারাম করেছেন। উপরন্তু মত্ততাজাত পানীয়কেও হারাম বলেছেন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে জাওজী হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন হজরত আবু সাঈদ থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি মওকুফ (সাহাবীর উক্তি)। -এর সনদ হজরত আবু সাঈদ পর্যন্ত পৌঁছেনি। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, উত্তম সনদে হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পর্যন্ত পৌঁছেছে যার বিবরণ এরকম— সকল প্রকার শরাবই হারাম— অল্প হোক কিংবা অধিক। যে পানীয় নেশা সৃষ্টি করে— তাও হারাম।

আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তির মর্ম হচ্ছে, কম হোক বেশী হোক— প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম। কিন্তু হজরত আবু মাসউদ

আন্‌সারীর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কাবা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন তিনি। পানি চাইলে একজন মশক থেকে নাবীজ এনে দিলেন। নাবীজ দেখে অসন্তুষ্ট হলেন তিনি স.। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এটা কি হারাম পানীয়? তিনি স. বললেন, না। তবে জমজমের এক মশক পানি নিয়ে এসো। জমজমের পানি আনা হলে তিনি সেই পানির সঙ্গে নাবীজ মিশিয়ে পান করলেন এবং তাওয়াফ সম্পূর্ণ করলেন। তারপর বললেন, অধিক পিপাসিত হলে এভাবেই পান কোরো। নেশার ঝাঁঝ বিশিষ্ট নাবীজ সম্পর্কে একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি তখন বলেছিলেন, রসুল স. একবার এক বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলেন। কোথা থেকে যেনো নাবীজের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছিলো। তিনি স. একজনকে পাঠিয়ে সেই নাবীজ নিয়ে এলেন। ঘ্রাণ নিয়ে বুঝতে পারলেন নেশার ঝাঁঝ শুরু হয়েছে। তিনি তখন নাবীজের সঙ্গে পানি মিশালেন এবং সেই পানি পান করলেন। তারপর বললেন, নেশার ঝাঁঝবিশিষ্ট নাবীজ এভাবেই পানি মিশিয়ে পান করতে হয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। দারা কুতনী এ ধরনের হাদিসগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট জানতে চাইলেন, নাবীজ হালাল না হারাম? তিনি স. বললেন, হালাল। এ বর্ণনাটি এনেছেন ইবনে জুরাইজ। সায়ি বিন জিলকুয়াহ্ বলেছেন, একলোক নাবীজ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছিলো। হজরত ওমর তাকে দোররা মেরেছিলেন। লোকটি তখন বলেছিলো, আমি তো আপনার পাত্র থেকে পান করেছি। হজরত ওমর বলেছিলেন, আমি দোররা মেরেছি তোমার মাতাল হওয়ার কারণে। এ হাদিস সম্পর্কে বলা যায় যে, দারা কুতনী বলেছেন, আবু মাসউদ ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামান নামে পরিচিত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাঁকে একজন বলেছিলেন, আর কেউ কি এরকম বর্ণনা করেছে? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। আরেকজন বর্ণনা করেছেন— কিন্তু সে ইয়াহ্ইয়ার চেয়েও দুর্বল। নাসাঈ বলেছেন, তার বর্ণনাকে দলিল হিসেবে নেয়া যায় না। আবু হাতেম বলেছেন, তার বর্ণনা অসঙ্গতিপূর্ণ। নাসাঈ ও দারা কুতনী বলেছেন, এ হাদিসটি পরিত্যক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বর্ণনাকারী দেখেই বুঝা যায়— সে মিথ্যাবাদী। হজরত ইবনে ওমরের সনদসংযুক্ত একজনের নাম আবদুল মালেক বিন রাফে— সে অখ্যাত ও দুর্বল। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কাসেম বিন বাহরাম সম্পর্কে ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়। হজরত আবু মুসা বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারীর নাম আবদুল আজিজ বিন আবান— ইমাম আহমদ বলেছেন, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে লুমাইর বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। সাঈদ বিন লাকওয়াকে দাজ্জালের ওস্তাদ বলে অভিহিত করেছেন আবু হাতেম। হজরত ওমর থেকে ইবনে আবী শাইবা অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাটির সূত্র অটুট নয়। নাবীজ

সম্পর্কে আসলে কোনো মতভেদ নেই। ঐকমত্যসূত্রে নেশা সৃষ্টিকারী নাবীজ হারাম— কম বা বেশী যে পরিমাণই হোক না কেনো। আর ঐকমত্যসূত্রে ওই নাবীজ হালাল যা পান করলে নেশা হয় না। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

মদের মতো জুয়াও হারাম। জুয়ার মাধ্যমে অতি সহজে এক জনের সম্পদ অন্যজনের কুক্ষিগত হয়। আরবীতে জুয়াকে বলে মাইসির। শব্দটি ক্রিয়ামূল। আতা, তাউস ও মুজাহিদের মিলিত মত এই যে, যে কাজের সঙ্গে জুয়ার লেশ থাকে সে কাজ হারাম। ছেলেদের আখরোট ও কড়ি খেলাও জুয়ার তুল্য। হজরত আলী থেকে বায়হাকী বলেছেন, সতরঞ্জ হচ্ছে অনারবদের জুয়া। হজরত বুরাইদা বলেন, নারোদ ও সতরঞ্জ সম্পর্কে নবী পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নারোদ খেলে সে যেনো শুয়োরের গোশত নিজের হাতে মাখে।

হাব্বাহ্ বিন মুসলিম থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে আবদান আবু মুসা বিন হাজম বর্ণনা করেন— সতরঞ্জ খেলোয়াড়রা অভিশপ্ত আর দর্শকেরা শুয়রের গোশত ভক্ষনকারী তুল্য। হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে— যে ব্যক্তি সতরঞ্জ খেলে সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত আবু মুসা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, গোনাহ্গার ব্যতীত অন্য কেউ সতরঞ্জ খেলে না। সতরঞ্জ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, সতরঞ্জ একটি বাতিল খেলা। এ খেলা আল্লাহপাকের অপছন্দনীয়। বায়হাকী। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— মদ, জুয়া ও গুটি খেলা নিষিদ্ধ। মারফু সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আবু দাউদ। অনেকে গুটি খেলার স্থলে বলেছেন, তবলা বাজানোর কথা। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স. কবুতরের পশ্চাদ্ধাবনকারী এক লোককে দেখে বললেন, এক শয়তানের পিছনে আর এক শয়তান দৌড়াচ্ছে। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী। মোটকথা কোন কিছুর বিনিময়ে খেলা হারাম— এটা ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সতরঞ্জ খেলা মোবাহ্। পরে অবশ্য তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলো পাল্টিয়ে ছিলেন। সতরঞ্জ খেলা অপব্যয়ের নামান্তর। এতে সম্পদ নষ্ট হয়। তাই এ খেলা হারাম। তাই সুদ, ঘুষ ও জুয়াকেও হারাম বলা হয়েছে। আল্লাহ্পাক বলেন, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। জুয়ার ক্ষতি দু'টি— সম্পদ ক্ষয় ও সময়ের অপচয়। তাই জুয়া হারাম এটা ঐকমত্য। সতরঞ্জ ও জুয়া জাতীয় সকল খেলাই গোনাহে কবীরা।

মদ ও জুয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয়। এ দু'টো মহাপাপকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় ঝগড়া, ফাসাদ ও মারামারি। বন্ধু হয়ে যায় শত্রু। আল্লাহ্র জিকির কিংবা নামাজের কথা তাদের মনেই থাকে না। হজরত মুআজ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— মদ্যপান কোরো না। মদ্যপান সকল অশ্লীলতার মূল। আহমদ। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বলতেন— ব্যভিচারের প্রাক্কালে ব্যভিচারী— অপহরণের প্রাক্কালে অপহরণকারী এবং মদ্যপানের প্রাক্কালে মদ্যপায়ী

ইমানদার থাকে না। বোখারী। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মহানবী স. বলেন, মদ্যপানই সকল অশ্লীলতার মূল এবং কবীরা গোনাহ্ সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি গোনাহ্। মদ্যপায়ী নামাজ পরিত্যাগকারী; নামাজ পড়লেও তাদের নামাজ হয় না। সে মাতা, ভগ্নী, ফুফু, খালার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্তদের মতো অপরাধী। তিবরানী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে— যে মদ্যপান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা তার নামাজ কবুল করেন না। তবে যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ্পাক তাকে মাফ করে দেন। সে এ রকম সুযোগ পায় তিনবার। চতুর্থবার এ রকম করলে আল্লাহপাক তার চল্লিশ দিনের নামাজ গ্রহণ করেন না এবং তার তওবাও কবুল করেন না। কিয়ামতের দিন তাকে পান করানো হবে পুঁজমিশ্রিত পানি। নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— মদ যাবতীয় অসৎকর্মের মূল। মদ্যপানকারীর চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হয় না। মাতাল অবস্থায় মৃত্যু কুফরীর মৃত্যু। তিবরানী। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান, জুয়াড়ী, উপকারের পর খোঁটাদানকারী ও সদা মদ্যপানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। দারেমী। মারফু সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম। ১. সর্বদা মদ্যপানকারী। ২. মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। ৩. দাইউস। আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন— আমি মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রহমত ও হেদায়েত। কর, প্রতীমা, ক্রুশ ও মূর্খতা যুগের সকল কুসংস্কার উচ্ছেদ করার নির্দেশ পেয়েছি আমি। আল্লাহপাক তাঁর আপন সত্তার শপথ করে বলেছেন, আমার যে বান্দা এক চুমুক শরাব পান করবে আমিও তাকে সেই পরিমাণ পুঁজ পান করাবো। আর যে আমার ভয়ে শরাব পরিত্যাগ করবে আমি তাকে পান করাবো কাওসারের পানি। হজরত আবু মুসা আশআরীর বর্ণনায় এসেছে— যাদুর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, সদা মদ্যপানকারী এবং নির্দয় ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পাবে না। আহমদ। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন— প্রতিদিন যারা মদ খায় এবং এরকম অবস্থায় মারা যায় তারা আল্লাহপাকের সমীপে হাজির হবে মুশরিকদের মতো। আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু মুসা বলতেন, আমার নিকট মদ্যপান এবং আল্লাহপাককে ছেড়ে দিয়ে ওই খুঁটির উপাসনা একই ব্যাপার। মদ ও জুয়ার মধ্যে উপকারী একটি দিকও রয়েছে, কিন্তু এ দু'টোর মধ্যে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। তাই এ দু'টোকে আয়াতে মহাপাপ বলা হয়েছে। মদ্যপানের ফলে যে উপকারগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে এই— নেশার আনন্দ, কর্মস্পৃহা, সাহসের উজ্জীবন, আহার্যের

পরিপাকে সহায়তা লাভ, কোনো কোনো রোগ থেকে অব্যাহতি ইত্যাদি। আর জুয়াতে রয়েছে বিনা পরিশ্রমে সম্পদ অর্জনের সুযোগ।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে শরাব থেকে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ নয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ। কেনোনা আল্লাহ্‌পাক বলেছেন 'হ্যাঁ, যদি তোমরা নিরুপায় হও।' আরও বলেছেন, যারা উপায়হীন; তাদের কোনো গোনাহ্ নেই। যেমন, কারো গলায় খাদ্য জাতীয় কিছু আটকে গেলো তখন যদি মদ ব্যতীত সে অন্য কোনো পানীয় না পায় তবে জীবন রক্ষার্থে মদ্যপান করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত ঠিক এর বিপরীত।

মদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ বলেছেন, যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অল্প পরিমাণ হলে ব্যবহার করা যাবে— বেশি পরিমাণে যাবে না। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, মদের পাত্রের তলানীটুকুও পান করা জায়েজ হবে না। হারাম বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করাও হারাম। তাই ঘায়ের উপর এবং পশুর গায়ের পোকার উপর শরাব ব্যবহার করা যাবে না। শিশু ও জিম্মীকেও শরাব পান করানো যাবে না। কেউ পান করালে তাকে শাস্তি দিতে হবে। পশুকেও মদ পান করানো যাবে না। উজায়ীর বিন হাজাফ বলেছেন, এক লোক ঔষধ হিসেবে মদ ব্যবহার সম্পর্কে রসুল স. এর সমীপে জিজ্ঞেস করলেন। রসুল স. বললেন, হারাম। লোকটি বললেন, যদি কেবল ঔষধের জন্যই প্রস্তুত করা হয়? তিনি স. বললেন, এর দ্বারা রোগের প্রতিকার হয় না, বরং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। মুসলিম। তারিক বিন সুমাঈদ বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা আঙ্গুরের রসকে পানীয় ও শরবত হিসাবে ব্যবহার করি। তিনি স. বললেন, এরকম অনুচিত। আমি পুনরায় একই কথা বললাম, তিনি পুনরায় একই জবাব দিলেন। আমি বললাম ঔষধ হিসেবেও কি ব্যবহার করা যাবে না? তিনি স. বললেন, এতে করে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায় না বরং নিশ্চিতরূপে নতুন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আহমদ। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার এক পেয়ালা নাবীজ তৈরী করেছিলাম রসুল স. গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাবীজের ঝাঁঝ অনুভব করলেন। বললেন, কি তৈরী করেছো? আমি বললাম মেয়েটার অসুখ, তাই ওষুধ তৈরী করেছি। তিনি স. বললেন, আল্লাহপাক তোমাদের জন্য এটা হারাম করেছেন। এর মধ্যে তিনি তোমাদের জন্য নিরাময় রাখেননি। বায়হাকী, ইবনে হাব্বান। ইবনে হাব্বানের বর্ণনা এরকম— আল্লাহ্‌পাক হারাম বস্তুতে তোমাদের জন্য আরোগ্য রাখেন নি। বোখারী।

আমি বলি, হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌পাক তোমাদের জন্য নিরাময় রাখেননি— একথার অর্থ এই নয় যে, হারাম বস্তুর মধ্যে রোগের প্রতিষেধক নেই। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে কোরআনের আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ হয়। কারণ এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোনো হেরফের নেই। কোনো বস্তু হারাম ঘোষিত হলে তার

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও গুনাবলী লোপ পায় না। সুতরাং বর্ণিত উক্তিটির মর্ম এই যে, তোমাদের জন্য হারাম বস্তু থেকে রোগ মুক্তির অনুমতি নেই। কখনো কখনো হারাম দ্রব্যকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন হজরত আনাস বলেছেন, একবার উকাল ও উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এলো। মদীনার আবহাওয়া ছিলো তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমরা উটের বাথানের সাথে জঙ্গলে অবস্থান গ্রহণ করো। এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করো। তারা নির্দেশ পালন করে আরোগ্য লাভ করলো। শেষে একদিন রাখালকে হত্যা করে উটের পালসহ পালিয়ে গেলো। বোখারী, মুসলিম।

বর্ণিত হাদিসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাদিসে বর্ণিত নির্দেশটি পরে রহিত হয়েছে। কথিত ঘটনাটি ঘটেছিলো সুরা মায়েদার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে পশুর গোশত ভক্ষণ করা হয় সেগুলোর প্রস্রাব পান করা যায়। তৎসত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা সিদ্ধ।

শরাব দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা যাবে কি না— সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে যাবে। সিরকায় পরিণত হলে শরাব পাক হয়ে যায়। ইমাম মালেক বলেছেন, এরকম করা মাকরূহ্। তবে সিরকায় পরিণত শরাব পবিত্র। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন শরাব দ্বারা প্রস্তুতকৃত সিরকা পান করা নাজায়েয এবং তা পবিত্রও নয়। জননী উম্মে সালমা বর্ণিত ওই হাদিসটি ইমাম আবু হানিফার দলিল— যেখানে বলা হয়েছে, আমার একটি দুগ্ধবতী ছাগল ছিলো। সেটিকে দেখতে না পেয়ে একদিন রসুল স. বললেন, তোমার ছাগল কই? আমি বললাম, মরে গেছে। তিনি স. বললেন, তুমি তার চামড়াটা কাজে লাগালে না কেনো? আমি বললাম, ওটাতো মৃত। তিনি বললেন, চামড়া পাকা করলেই পাক হয়ে যেতো। যেমন শরাব থেকে সিরকা প্রস্তুত করলে পাক হয়ে যায়। দারা কুতনী। ফারাহ বিন ফুজালা এই হাদিসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দারা কুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, সে সনদ উল্টা পাল্টা করে। তাই তার হাদিস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর দ্বারা অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলোর মূল নেই। তাছাড়া এখানে উল্লেখিত তার বর্ণনাটি প্রসিদ্ধও নয়।

হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ। ওই হাদিসে বলা হয়েছে হজরত আবু তালহা ওই সকল এতিম সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যাদের সঙ্গে সম্পদের অংশ হিসেবে শরাবও ছিলো। রসুল স. বললেন, ওসব ফেলে দাও। হজরত আবু তালহা বললেন, ওই শরাবগুলোকে কি সিরকায় পরিণত করা যায় না? তিনি স. বললেন, না। মুসলিম। অপর এক সূত্রে ওই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে হজরত আবু তালহা বললেন, আমি কয়েকটি এতিমের প্রতিপালক। আমি তাদের জন্য কিছু শরাব তৈরী করেছি। রসুল স. বললেন, ওগুলো ফেলে দাও। আর পাত্রগুলোও ভেঙে ফেলো। তিনি তিনবার এরকম বললেন। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— হজরত আবু সাঈদ

বলেছেন, মদ্যপান নিষিদ্ধ হলে আমি রসুল স. এর সমীপে নিবেদন করলাম, আমার কয়েকজন এতিম পোষ্য আছে। তাদের কিছু মদও মওজুদ আছে। তিনি স. বললেন, ওগুলো ফেলে দাও। সাথে সাথে আমি মদগুলো ফেলে দিলাম।

বাগবী বর্ণনা করেন, জুহাক বলেছেন, উপকার অপেক্ষা পাপ অধিক— একথার অর্থ নিষিদ্ধ হওয়ার পর মদ দ্বারা উপকার লাভ করা নিষিদ্ধপূর্ব উপকার অপেক্ষা অধিকতর পাপ। কেউ কেউ বলেছেন, এ কথার অর্থ- হারাম হওয়ার পূর্বে মদের উপকারের চেয়ে পাপই ছিলো বেশী। আর আমার মতে হারাম হওয়ার পর মদের উপকারের চেয়ে পাপ বেশী। কারণ পাপের ক্ষতিকর দিকটি আখেরাতসম্পর্কিত যা চিরস্থায়ী। আর উপকারের দিকটি পৃথিবী সম্পর্কিত যা ক্ষণস্থায়ী।

ইবনে আবি হাতেম, সাঈদ এবং ইকরামা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এই সম্পদ ব্যয়ের উদ্দেশ্য কী এবং এই ব্যয় কোথায় কীভাবে করতে হবে? ইয়াহ্ইয়া থেকে ইবনে আবী হাতেমের আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুআজ বিন জাবাল ও হজরত সায়লাবা রসুল স. নিকট নিবেদন করলেন, হে অনুগ্রহের নবী! আমাদের নিকট আমাদের পরিবারবর্গ এবং কয়েকজন ক্রীতদাস আছে। এখন আমরা সম্পদ ব্যয় করবো কীভাবে? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে,'লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে কী তারা ব্যয় করবে। বলো, যা উদ্বৃত্ত।' উদ্বৃত্ত বুঝাতে 'আল আফওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ক্বারী আবু আমর শব্দটিকে 'আল আফবু' উচ্চারণ করতেন। এরকম উচ্চারণ করলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যা ব্যয় করবে তাই হবে অতিরিক্ত। আতা, সুদ্দী ও কাতাদা বলেছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই 'আল আফবু' বলে। এই বিধানানুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম সারা দিন ধরে যা উপার্জন করতেন, তার দ্বারা প্রয়োজন নির্বাহের পর অতিরিক্ত উপার্জন দান করে দিতেন।

হজরত আবু উমামা বলেছেন, আসহাবে সুফফাগণের একজন ইন্তেকাল করলে দেখা গেলো তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে রয়েছে একটি আশরাফি। রসুল স. বললেন, এটা হচ্ছে দোজখের অগ্নির একটি নিদর্শন। আরেকজনের মৃত্যুর পর দেখা গেলো, তিনি রেখে গিয়েছেন দু'টি আশরাফি। রসুল পাক স.বললেন, এ দু'টো হচ্ছে দোজখের দু'টি নিদর্শন। আহমদ, বায়হাকী। হজরত আবু হাশেম বিন উকবা বলেছেন, রসুল স. আমাদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার কোনো আবশ্যকতা নেই। একজন চাকরও প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা। পরে জাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে এই নির্দেশটি রহিত হয়ে যায়।

আমি বলি, সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়। কারণ, জাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরীতে। অর্থাৎ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে। তাই বলা যেতে পারে, এই বিধানটির দ্বারা যে শর্তটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে— জাকাত দিতে

হবে ঋণ পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পরে অবশিষ্ট সম্পদের উপর। অথবা বলা যেতে পারে, সাহাবাগণের সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত প্রশ্নটি ছিলো নফল সদকা সংক্রান্ত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অভাবহীন অবস্থার সদকাই হলো উত্তম সদকা। মুজাহিদ বলেছেন, 'আল আফবু' এর অর্থ যারা দান করতে সমর্থ তাদের দান করা। যারা সমর্থ তারা যদি দান করে তবে তা কঠিন হয় না।

হজরত আমর বিন দিনার বলেছেন, আফবু অর্থ মধ্যবর্তী অবস্থার দান— যা অতিরিক্ত নয়, কার্পন্যও নয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'তারা অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না।' তাউস বলেছেন, আফবু অর্থ, যে দান যার পক্ষে সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যার পক্ষে যা দেয়া সহজ হয়, তাই দান করা। এ রকম ব্যয়ে কষ্ট নেই। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সামর্থবানদের সদকাই উত্তম সদকা। আর সদকা শুরু করতে হবে নিকটজন থেকে। বোখারী, আবু দাউদ। হাকেম বিন হাজাম থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিনি অতিরিক্ত যে কথাটি বলেছেন, তা হচ্ছে নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে সামর্থবানদের দানই উত্তম দান। তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে— এক ব্যক্তি রসুল স.এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে প্রিয় নবী! আমার নিকট একটি আশরাফি আছে। কাকে দান করবো? তিনি স. এরশাদ করলেন, নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, তাঁর জন্য আরেকটি আশরফি আছে। তিনি স. বললেন, তোমার সন্তানদের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আরো একটি আছে। তিনি স. বললেন, পরিবারের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আরো একটি আছে। তিনি স. বললেন, তোমার চাকরকে দিয়ে দাও। সে বললো, আরো একটি রয়েছে। তিনি স. বললেন বিষয়টি এখন তোমার বিবেচনাধীন। আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে— এক ব্যক্তি গণিমত হিসেবে একটি সোনার মুকুট পেয়েছিলো। সে মুকুটটি রসুল স. সকাশে উপস্থাপন করে বললো, হে আমার প্রাণপ্রিয় নবী! এটিকে আমার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গ্রহণ করুন। রসুল স. তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। সেই ব্যক্তি বারবার একই নিবেদন জানাতে লাগলো। তিনি স. রাগতঃ স্বরে বললেন, দাও। তারপর মুকুটটি নিয়ে এতো জোরে ছুঁড়ে মারলেন যে, সেটি তার মাথায় লাগলে মাথা ফেটে যেতো। এরপর রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের সকল সম্পদ সদকা করার জন্য হাজির করছো, পরে আবার পথে বসে হাত পাততে হবে। মনে রেখো, সামর্থবানদের দানই শ্রেষ্ঠ দান। বাযযার, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম। বায্যারের বর্ণনায় এরকম রয়েছে— ওই লোকটি মুকুটখানি পেয়েছিলো গণিমত হিসেবে। অন্যান্য হাদিসবিদগণের বর্ণনায় রয়েছে কোনো এক যুদ্ধে ওই মুকুটটি তাঁর হস্তগত হয়েছিলো। বর্ণিত হাদিসগুলো এবং আলোচ্য বিধানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সকল সম্পদ ব্যয় করা মাকরুহ। কপর্দকহীনের

শ্রমলব্ধ সম্পদ ব্যয় করাও মাকরূহ। ব্যয় করবে সামর্থবানেরা। সামর্থহীনেরা নয়। কিন্তু হজরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিসে দেখা যায়, সমুদয় সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব। শ্রমলব্ধ সম্পদ ব্যয় করার কথাও হাদিস শরীফে এসেছে। এক লোক তাঁকে স. জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ধরনের সম্পদ ব্যয় সর্বোৎকৃষ্ট? তিনি স. এরশাদ করলেন দৈন্যদশায় অর্জিত উপার্জন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকতো, তবে আমি তিন দিনের মধ্যে ওগুলো নিঃশেষ করে দিতাম। শুধু ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রেখে দিতাম। বোখারী। হজরত আসমা বলেছেন, প্রিয়তম নবী আমাকে বলেছেন, আসমা! দান করতে থাকো। সম্পদ আটকে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ্পাক তোমাকে আটকে রাখবেন। দান বন্ধ করে বিত্ত সঞ্চয় কোরো না। যদি করো, তবে আল্লাহপাক তাঁর দান বন্ধ করে দেবেন। যথাসম্ভব দান করতেই থাকো। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, অবস্থা, যোগ্যতা ও পরিবেশের পার্থক্যের কারণে প্রবর্তিত বিধানের তারতম্য সূচিত হয়। এরকম লোকও রয়েছে, যারা তাদের সকল সম্পদ দান করে অপরের নিকট প্রার্থী হয়। অভাব অনটনের ফলে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। এরকম লোকের জন্য সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে দান করা অনুচিত। আর যারা ধৈর্য্যশীল ও দায়িত্বমুক্ত, তাদের জন্য সমুদয় সম্পদ ব্যয় করাই উত্তম। দায়িত্ব অর্থ দায় দেনা ইত্যাদি। অপরের চেয়ে আত্মীয়স্বজন, চাকরবাকরের জন্য ব্যয় করা এ কারণেই উত্তম যে, এদের জন্য ব্যয় অপরিহার্য। দূরবর্তীদের জন্য সে রকম অপরিহার্য নয়। যারা কৃচ্ছসাধনে লিপ্ত, তাদের জন্যই কেবল প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ মওজুদ রাখা মাকরূহ। এঁরা হচ্ছেন রসুল স. এর অনুপম আদর্শানুসারী সাহাবায়ে কেরাম, আসহাবে সুফফা এবং খানকাবাসী সুফী আউলিয়াবৃন্দ। হজরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিস এদের প্রতি প্রযোজ্য। তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, জমানো সম্পদের উপরে যে বছরে একবার জাকাত প্রদান করে, সে সম্পাদন করে একটি ফরজ ইবাদত। কিন্তু যারা সঞ্চয়ের চিন্তা না করে ক্রমাগত দান করে যায়, তারা কেবল নফল ইবাদত করে যেতে থাকে। তাহলে নফল কীভাবে ফরজের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়? আমরা বলি, সম্পদের মালিক হওয়াই জাকাত ফরজ হওয়ার উপলক্ষ্য। যিনি সম্পদ দান করেছেন, তাঁর পথে ব্যয় করার নাম কৃতজ্ঞতা। জাকাত প্রদানকারী এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বছরে কেবল একবার। আর ক্রমাগত প্রদানকারী হচ্ছে সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। এক বছর পর জাকাত প্রদানকারী জাকাত প্রদানের যোগ্যতা লাভ করে। সে যোগ্যতা আসার পূর্বেই যারা দান করতে থাকে, তারা তো যোগ্যতার মূলকেই দান করে ফেলে। তাই তাদের নফল ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে ফরজ ইবাদতও আদায় হয়ে যায়। যেমন নামাজের ক্বেরাত সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে, 'কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, তাই পাঠ

করো।' এই নির্দেশানুযায়ী একটি বড় অথবা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করলেই ক্বেরাতের ফরজ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এক রাকাতে সমস্ত কোরআন পাঠ করে ফেলে তবে কি তার ক্বেরাত সম্পর্কিত ফরজ আদায় হবে না? নিশ্চয়ই হবে। কারণ, সমস্ত কোরআন পাঠ যদিও নফল, তবুও সে নফল আদায় করতে গিয়ে নিশ্চয় ফরজও আদায় করে ফেলেছে। প্রকৃত কথা এই যে, 'কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, তাই পাঠ করো' এবং 'লোকে যা জিজ্ঞেস করে— তারা কী ব্যয় করবে? বলো, যা উদ্বৃত্ত'। বিধান দু'টি একই পর্যায়ের।

'এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দশন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে'- আল্লাহ্পাক সুস্পষ্টরূপে দলিল-প্রমাণ ও বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নির্দশন। এরকম নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কারণ, তিনি সকল প্রকার ক্রিয়া-কান্ডের কল্যাণজনক পরিণতি সম্পর্কে অবগত। কাজেই নির্বিবাদে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নে মনোযোগী হও। তাহলেই তোমরা লাভ করবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। এখানে 'কাজালিকা' শব্দের 'কাফ' অক্ষরটি একটি উহ্য মাছদার (মূলধাতু) থেকে বিশেষিত হয়েছে। ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— আল্লাহ্পাক তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে আয়াত বর্ণনা করেন, যেমন— দান-খয়রাত ইত্যাদি। আর 'কাজালিকা' শব্দের মাধ্যমে একবচনসূচক সম্বোধন করা হলেও অর্থ গ্রহণ করতে হবে বহুবচনের। অথবা মনে করতে হবে এখানে রসুল স.কে একক সম্বোধনের মাধ্যমে সকল উম্মতকে একীভূত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন— 'হে নবী! যখন আপনারা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক প্রদান করেন।' কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হবে এরকম— আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য ওই সকল আয়াত বর্ণনা করেন, যেগুলো তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে— ইহকালেও। পরকালেও। কাজেই তোমরা চিন্তাভাবনা করে দেখো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— তোমরা ওই সকল বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করো— যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর অবলম্বন করো ওই বিষয়াবলীকে যেগুলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। জীবন ধারনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ গ্রহণ করো, অতিরিক্তগুলো দান করে দাও। এভাবে অর্জন করো ইহকাল ও পরকালের সকল কল্যাণ। চিন্তাগবেষণা করে দেখো কোন কাজটি চিরস্থায়ী ও অধিক কল্যাণজনক।

হজরত আলীর বর্ণনায় রয়েছে- রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে সরে যায় এবং নিকটবর্তী হতে থাকে পরকাল। তোমরা পরকালেই চিরস্থায়ী হবে, পৃথিবীতে নয়। হিসাববিহীন পৃথিবীতে রয়েছে কেবল আমল এবং আমলবিহীন আখেরাতে রয়েছে কেবল হিসাব। বোখারী। বায়হাকী কর্তৃক এই বর্ণনাটি এসেছে হজরত জাবের থেকে।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে— একবার রসুল স. চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলে দেখা গেলো তাঁর পবিত্র শরীরে মুদ্রিত হয়েছে চাটাইয়ের দাগ। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি নির্দেশ করলে আরামদায়ক শয্যার ব্যবস্থা করতাম। তিনি স. বললেন, এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কীইবা সম্পর্ক? এখানে তো আমি ওই পরিব্রাজকের মতো যে বিশ্রামের জন্য ক্ষণকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করে। তারপর উঠে চলে যায়। আহমদ, তিরমিজি। হজরত আবু দারদা থেকে মারফু সূত্রে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— তোমাদের সম্মুখে রয়েছে গভীর গহ্বর। পাপের বোঝা নিয়ে তোমরা সে গহ্বর অতিক্রম করতে পারবে না। বায়হাকী।

'এতিমদের সম্পদের নিকটবর্তী হইওনা উত্তম পন্থা ব্যতীত' এবং 'নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা জুলুম করে।'— যখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো তখন সকল মুসলমান ভীতসন্ত্রস্ত হলেন। তাঁরা এতিমের সম্পদ নিজেদের সম্পদ থেকে পৃথক করে ফেললেন। আহার্যদ্রব্যও প্রস্তুত হতে লাগলো পৃথকভাবে। খাদ্যভক্ষণের পর এতিমদের বেঁচে যাওয়া খাদ্য কেউ খেতেন না। ফলে তা নষ্ট হয়ে যেতো। এ অপচয়ও তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। তাই রসুল স. এর স্মরণাপন্ন হলেন। আর ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো 'লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বল! তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সঙ্গে একত্রে থাকো, তবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী।' এ কথার মাধ্যমে এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে সহজসাধ্যতার মধ্যে এনে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পিতৃহীনদের বিষয়-আশয় পৃথক করে রাখা যেতে পারে— আবার তাদের সঙ্গে একত্রাহারেও দোষ নেই। কারণ, তারা তোমাদের ভাই। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে তোমাদের ধর্মীয় সম্পর্ক। কখনোও আবার বংশগত সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সহানুভূতি শুভেচ্ছা। এ বন্ধনের কারণে একে অপরের সম্পদ থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারে। আর আল্লাহপাকতো একথা জানেনই যে, কে হিতকারী— কে অনিষ্টসাধনকারী। আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিতে পারতেন। অর্থাৎ পিতৃহীনদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিধানটিকে শিথিল করতেন না। ফলে পিতৃহীনদের পৃথক তত্ত্বাবধান তোমাদের নিকট হয়ে যেতো কঠিন।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ তিনি তাঁর দাসদের প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমনই বিধান বলবৎ করতে পারেন, সহজ অথবা কঠোর। কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাময় বলেই আপন মাহাত্ম্যে কুশলতার সঙ্গে সহজসাধ্য বিধান দান করেন।

বাগবী বলেছেন, মক্কায় অন্তরীণ মুসলমানদেরকে গোপনে উদ্ধার করার জন্য রসুল স. হজরত আবু মারসাদকে মক্কায় পাঠালেন। এ সংবাদ জানতে পেরে আনাক নাম্নী এক নারী তাঁর কাছে এলো। মূর্খতার যুগে হজরত আবু মারসাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট

সম্পর্ক ছিলো। সে হজরত আবু মারসাদকে নির্জন সহবাসের প্রস্তাব দিলো। তিনি বললেন, আমি তো এখন মুসলমান। আনাক বললো, তুমিতো আমাকে বিয়ে করতে পারো। তিনি বললেন, রসুল স. এর অনুমতি নিতে হবে। আনাক বললো, বুঝেছি তুমি টালবাহানা করছো— একথা বলেই সে চিৎকার জুড়ে দিলো। চিৎকার শুনে ছুটে এলো মক্কার মুশরিকেরা। তারা হজরত আবু মারসাদকে প্রহার করলো। হজরত আবু মারসাদ মদীনায় ফিরে এলেন। রসুল স. সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আনাককে আমি বিয়ে করতে পারবো কিনা? তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

❒ অংশীবাদী নারীকে ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করিও না। অংশীবাদী নারী তোমাদিগকে চমৎকৃত করিলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদিগকে চমৎকৃত করিলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম। উহারা অগ্নির দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম, ওয়াহেদি এবং মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবী হজরত আবু মারসাদ সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়নি। তিনি ব্যভিচারিনী আনাককে বিয়ে করা যাবে কি না জানতে চেয়েছিলেন। এ জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো সুরা নূরের ওই আয়াত যেখানে বলা হয়েছে, ব্যভিচারিনীকে বিয়ে করবে ব্যভিচারী। এ রকম বলেছেন ইমাম সুয়ূতি। আবু দাউদ, তিরমিজি। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে।

আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টান রমণীদের উদ্দেশ্যে। 'তোমাদের পূর্বের গ্রন্থধারীদের সধবা রমণীগণ'– এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদী ও খৃষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ করে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু গ্রন্থধারীরা প্রকৃতপক্ষে মুশরিক (অংশীবাদী)। কারণ, তারা হজরত উযায়ের ও হজরত ঈসার পূজা করে। তাই এ আয়াত দ্বারা পূর্বেকার বৈধতা রহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অংশীবাদী নারীকে বিবাহ কোরো না যতোক্ষণ না তারা ইমান আনে। আরও বলা হয়েছে সম্পদ ও রূপ-যৌবনের দিক দিয়ে অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও তাদের চেয়ে বিশ্বাসিনী ক্রীতদাসীই উত্তম। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছে খামাসা সম্পর্কে। খামাসা ছিলেন হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামিনের সুন্দরী ক্রীতদাসী। হজরত হুজায়ফা তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। আবু মালিক ও ওয়াকিদির উদ্ধৃতি সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার এক কুদর্শন ক্রীতদাসী ছিলো। একদিন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাঁর ওই দাসীকে চড় মেরেছিলেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি ঘটনাটি রসুল স.কে জানালেন। রসুল স. বললেন, ক্রীতদাসীটি কি রকম? হজরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বললেন, সে ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রোজা প্রতিপালন করে এবং সুন্দরভাবে অজু করে নামাজ পাঠ করে। রসুল স. বললেন, তাহলে সে তো মু'মিনা (বিশ্বাসিনী)। হজরত ইবনে রাওয়াহা বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় রসুল! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করবো। তিনি তাই করলেন। কিছু লোক এর জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলো। ক্রীতদাসীকে বিয়ে করাই ছিলো এই ভর্ৎসনার কারণ। ভর্ৎসনাকারীরা এক স্বাধীনা রমণীকে দেখিয়ে বললো, এই মেয়েটিকে বিয়ে করো। এ ক্রীতদাসী নয়। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতের বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সম্পদবতী, সুন্দরী ও অসৎচরিত্রা নারীর চেয়ে দরিদ্র, সৎচরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা কুদর্শন রমণী উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, নারীদেরকে বিয়ে করা হয় ধর্ম, চরিত্র, রূপ ও ধনের কারণে। কিন্তু অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ ধর্মপরায়ণাতাকে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর সম্পদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে চরিত্রবতী নারী। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরীও মারফু পদ্ধতিতে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, রমণী সংশ্রব থেকে ব্যবধান রচনা করো। বনী ইসরাইলদের প্রধান ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রমণীর কারণে। মুসলিম।

আয়াতের পরবর্তী বক্তব্য নারীদের প্রতি। বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসিনী রমণীকুল! তোমরা অংশীবাদী পুরুষকে পতি হিসেবে গ্রহণ কোরো না। অথবা সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবককুলকে— হে অভিভাবকবৃন্দ! তোমরা তোমাদের

অভিভাবকত্বাধীন নারীকে মুশরিকদের সঙ্গে বিবাহবদ্ধ কোরো না। অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে বিয়ে দিও না। প্রশাসক বা বিচারকদের প্রতিও এমতো সম্বোধন করা হয়ে থাকতে পারে। আয়াতের বক্তব্যানুযায়ী একথা পরিষ্কার যে, ইমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিধর্মীদের সঙ্গে কোনো মু'মিনাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। সে বিধর্মী ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক যেই হোক না কেনো। বিধর্মীরা রূপবান, সম্পদশালী কিংবা অন্য কোনো গুণসম্পন্ন হলেও তাদের চেয়ে মুসলমান ক্রীতদাস উত্তম। বিধর্মীদের আহবান আগুনের দিকে আর আল্লাহ্‌র আহবান ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। আল্লাহ্‌র আহবান অর্থ নবী রসুলগণের আহবান। অথবা তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহর অলিগণের আহবান। এই আহবানে সাড়া দিলে ক্ষমা ও জান্নাত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং আউলিয়াগণের সংসর্গে অবস্থান করা উচিত।

'আল্লাহ্‌পাক মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে'- একথার অর্থ, আল্লাহর নিদর্শনাবলীই মানুষের উপকার গ্রহণের মাধ্যম। আল্লাহু আ'লাম।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা তাদের ঋতুবতী স্ত্রীদের সঙ্গে একত্রাহার করতো না। তাদের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করতো না। সাহাবা কেরাম একথা রসুল স. এর নিকট উপস্থাপন করলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচনা উত্থাপনকারী সাহাবী ছিলেন হজরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্‌। সুদ্দী থেকে ইবনে জারীর এরকম বলেছেন। এ প্রসঙ্গটির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহপাক অবতীর্ণ করলেন—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২২, ২২৩

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

❑ লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উহা অশুচি।' সুতরাং তোমরা রজঃস্রাব কালে স্ত্রী-সংগ বর্জন করিবে; এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া

পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করিবে না। সুতরাং তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্ তওবাকারী এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদিগকে পছন্দ করেন।

❒ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য-ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিও। আর জানিয়া রাখিও যে তোমরা আল্লাহের সম্মুখীন হইতে যাইতেছ এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও।

'ইয়াস আলুনাকা' শব্দটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত তিনটির স্থলে 'ওয়াও' (এবং) ব্যতীত উল্লেখিত হয়েছে। পরের তিনটির স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াও' সহযোগে। এ আয়াতের (২২২) শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াও' সহযোগে (ওয়া ইয়াস আলুনাকা)। প্রথমে প্রশ্ন করে তার জবাব দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। প্রশ্নটি রজঃস্রাব সম্পর্কিত। রজঃশীলা নারীর সঙ্গে কী রকম আচরণ করতে হবে এটাই ছিলো প্রশ্ন। আল্লাহ্পাক তার জবাব দিয়েছেন এভাবে— হে নবী! আপনি বলুন, ওটা হচ্ছে অশুচি। সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবে এবং পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম করবে না। এখানে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার অর্থ একত্রাহার, এক শয্যায় শয়ন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা নয়। পরিত্যাগ করতে হবে কেবল সঙ্গম।

ইতোপূর্বে হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে— এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন, সম্ভোগ ছাড়া আর সবকিছুই তোমরা করতে পারবে। জননী আয়েশা বলেছেন— আমার ঋতুবতী অবস্থাতে আমি ও রসুল স. একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তখন শয়নকালে তিনি আমাকে অন্তর্পরিধেয় পরে নিতে বলতেন এবং আমার পাশে শুয়ে পড়তেন। তিনি যখন মসজিদে এতেকাফ করতেন তখন তাঁর পবিত্র মস্তক জানালা দিয়ে হুজরার দিকে এগিয়ে দিতেন এবং আমি ঋতুবতী অবস্থায়ও তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা আরও বলেছেন, রজঃশীলা অবস্থায় আমি যে পাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতাম তিনিও সেই পাত্রের সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন। খাবার সময় আমি হাড় চুষে তাঁকে দিতাম তিনিও তখন সে হাড়টি চুষতেন। মুসলিম। তিনি আরও বলেছেন, আমার হায়েজ অবস্থাতেও তিনি আমার কোলে মাথা রেখে কোরআন পাঠ করতেন। জননী আরও বলেছেন, তিনি স. মসজিদ থেকে ডেকে বলতেন, আয়েশা আমার বিছানাটা দিয়ে দাও। আমি বলতাম আমি যে অপবিত্রা। তিনি বলতেন, তোমার হাততো অপবিত্র নয়?

জননী মায়মুনা বলেছেন, প্রিয়তম রসুল স. যে চাদর গায়ে জড়িয়ে নামাজ পাঠ করতেন সে চাদরের একপ্রান্ত গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম আমি। অথচ আমি ছিলাম তখন ঋতুবতী। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরও বলেছেন, আমি ঋতুকালীন অবস্থার

পোষাক পরেছিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি রজঃশীলা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন আমার সঙ্গে এক চাদরের নিচে শয়ন করলেন।

আয়াতে বলা হয়েছে— 'পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না'— (অলা তাক্বরাবো হুন্নাহ হাত্তা ইয়াত্ হুরনা) ক্বারী আবু বকর, হামজা ও কাসায়ী বলেছেন— ক্বারী আসেম 'ইয়াত হুরনা' শব্দটিকে পড়তেন 'ইয়াত্তাহ হারনা' (ত্বোয়া এবং হা অক্ষরে তাশদীদ সহযোগে)। অন্য ক্বারীগণ 'ইয়াত্ হুরনা'ই পড়েছেন। উচ্চারণভিন্নতার কারণে অর্থগত তারতম্যও হওয়া উচিৎ। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত হচ্ছে— এখানে অর্থগত তারতম্যের অবকাশ নেই। তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋতুঃস্রাব বন্ধ হলেও স্ত্রী সঙ্গম বৈধ হবে না যতোক্ষণ না তারা গোসল করে পবিত্র হয়। ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— উচ্চারণ ভিন্নতার কারণে অর্থগত তারতম্য হবে। 'ইয়াত্হুরনা' অর্থ হবে— ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর পবিত্র হলে। আর 'ইয়াত্তাহ্হারনা' অর্থ হবে ঋতুস্রাবের পর গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে। অর্থাৎ প্রথম অর্থ অনুযায়ী ঋতুস্রাব বন্ধ হলেই সঙ্গম করা যাবে। কিন্তু পরের অর্থানুযায়ী ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর সঙ্গম বৈধ হবে না যতোক্ষণ না গোসল করা হয়। মোট কথা, ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হচ্ছে— দশদিন পর ঋতুঃস্রাব বন্ধ হলে গোসল না করা সত্ত্বেও সহবাস করা যাবে। আর দশদিন হওয়ার আগে বন্ধ হলে গোসল না করা পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না। উচ্চারণভিন্নতার কারণে এরকমই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু 'ইয়াত্তাহ্হারনা' বললে গোসলের পূর্বে সঙ্গম নিষিদ্ধ-এরকম কোনো ইঙ্গিত কিন্তু এখানে নেই। যদি তাই হয় তবে 'ইয়াত্ হুরনা' উচ্চারণের ক্ষেত্রে গোসলের পূর্বে সহবাস বৈধ হয় কীভাবে? এর জবাব হচ্ছে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি দ্বারাই অর্থ নিরূপিত হয়। যাই হোক, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম হারাম।

ঋতুকালীন অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ করলে কাফফারা দিতে হবে কি না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব নয়। ক্ষমাপ্রার্থনা (ইসতেগফার) করলেই যথেষ্ট হবে। ইমাম শাফেয়ীর দুইটি অভিমতের একটি এরকমই। ইমাম আহমদ বলেছেন, এক দিনার সদকা করতে হবে। না পারলে সদকা করতে হবে অর্ধ দিনার। ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় অভিমতটি এই— ঋতুকালীন অবস্থার প্রথমদিকে সম্ভোগ করলে এক দিনার এবং শেষ দিকে করলে অর্ধ দিনার দিতে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস ঋতুকালীন অবস্থায় সম্ভোগকারীর বিধান জানতে চাইলে রসুল স. বলেছিলেন, এক অথবা অর্ধ দিনার দান করতে হবে। বর্ণনাটি ইমাম আহমদ ধারাবাহিকরূপে ইয়াহ্ইয়া, শা'বা, হাকাম, আবদুল হামিদ ও মুকিম থেকে উপস্থাপন করেছেন। সুনান রচয়িতাগণ ও দারা কুতনীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। বোখারী ও মুসলিমেও এ রকম বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু মুকিমের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন কেবল বোখারী। ইবনে কাত্তান, হাকেম এবং দাকিকুল ঈদ বর্ণনাটিকে অতি বিশুদ্ধ বলেছেন। এটিকে মওকুফ পদ্ধতিতে বর্ণনা

করাতেও অসুবিধা নেই। কারণ যারা নির্ভরযোগ্য তাঁদের মওকুফ বর্ণনাও মারফু হিসাবে গৃহিত হয়। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম অভিমতের প্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেছেন— হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রক্তের রং যখন হলুদ হয়ে যায় তখন সম্ভোগ করলে অর্ধ দিনার জরিমানা দিতে হবে, আর রক্তের রং লাল হলে, দিতে হবে পুরো দিনার। এই বর্ণনাটির ভিত্তি আবদুল করিম আবু উমামা— যে ঐকমত্যসূত্রে পরিত্যক্ত। আবু আইয়ুব সখতিয়ানী তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আহমদ এবং ইয়াহইয়ার মতে সে নির্ভরযোগ্য নয়।

ঋতু অবস্থায় সম্ভোগ ছাড়া অন্যান্য আদর অনুরাগ বৈধ কি না সে সম্পর্কে ওলামাগণের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য উপভোগ বৈধ হওয়ার পক্ষে রয়েছেন ইমাম আহমদ। জমহুর বলেছেন, অন্যভাবে আস্বাদন জায়েয নয়। ইমাম আহমদের সমর্থনে রয়েছে হজরত আনাসের ওই হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে— রতিকর্ম ছাড়া যা কিছু ইচ্ছা করতে পারো। রসুল স. এর কতিপয় পবিত্র পত্নী থেকে ইকরামা এই বর্ণনাটি এনেছেন— রসুল স. তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীগণের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে মেলামেশা করতেন এবং তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গে ব্যবহার করতে বলতেন অতিরিক্ত বস্ত্র। ইবনে জাওজী। হজরত মুআজ বিন জাবালের হাদিসটি জমহুরের দলিল। হজরত মুআজ বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম— হে অনুগ্রহের নবী! ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে আমি কী রকম আচরণ করবো? তিনি স. বললেন, পাজামা পরিহিত অবস্থায় সবকিছু করতে পারবে। তবে দূরে থাকাই উত্তম। রজীন। মুহিউস সুন্নাহ বলেছেন, এই হাদিসের সনদগুলো তেমন শক্তিশালী নয়। এরকম বর্ণনা এসেছে আবদুল্লাহ্ থেকেও। আবু দাউদের উদ্ধৃতিতেও এরকম রয়েছে। হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি আমার রজঃশীলা ভার্যাকে কীভাবে ব্যবহার করবো। তিনি বললেন, তাকে পাজামা পরিয়ে দাও— তারপর যথেচ্ছ ব্যবহার করো। মুরসাল পদ্ধতিতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম মালেক ও দারেমী। এ ব্যাপারে প্রত্যায়িত সিদ্ধান্ত এই যে, রিপু নিয়ন্ত্রণে থাকলে পাজামার উপর যে কোনো ধরনের সম্ভোগ বৈধ। কোরআনের বিধানে কেবল যৌনাচার নিষিদ্ধ। অন্য ব্যাপারে নিষিদ্ধতা নেই।

এ বিষয়ে আলেমগণ একমত যে, ঋতুগ্রস্তা রমণীদেরকে নামাজ পড়তে হবে না। পরে কাজাও আদায় করতে হবে না। কিন্তু রোজার নিয়ম ভিন্ন। ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা যাবে না, কিন্তু পরে তার কাজা আদায় করতে হবে। মাতা আয়েশা বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে রোজার কাজা করতে বলতেন কিন্তু নামাজের কাজা করতে বলেননি। মুসলিম, তিরমিজি। হাদিসটি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্ববহ। অধিকাংশ সাহাবা এই বর্ণনাটি করেছেন। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এক রমণীকে বলেছিলেন, ব্যাপারটা কী এরকম নয় যে, হায়েজের সময় তোমাদের নামাজ ও রোজা নেই। আরেক মহিলাকে তিনি স. বলেছিলেন, ঋতু শুরু হলে নামাজ পরিত্যাগ কোরো।

ঋতু অবস্থায় নামাজ পড়া, মসজিদে যাওয়া, তাওয়াফ করা, এবং কোরআন মজীদ স্পর্শ করা ঐকমত্যসূত্রে নিষিদ্ধ। রসুল স. বলেছেন, ঋতুবতী নারীদের জন্য মসজিদের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দাও। আবু দাউদ। তিনি স. আরও বলেছেন, ঋতুবতীরা যেনো কোরআন না পড়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারা কুতনী। ইমাম দারা কুতনী বর্ণিত হজরত জাবেরের হাদিসটিও এই বিবরণটির সমর্থক। কিন্তু বর্ণিত দু'টি হাদিসের সনদই সন্দেহযুক্ত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন'— এখানে 'তাতাহ্হারনা' শব্দটি সকল ক্বারীর উচ্চারণে একই রকম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋতূত্তর সম্ভোগের জন্য গোসল শর্ত। 'তাদের নিকট সেভাবে গমন করবে'— অর্থ পরিশুদ্ধ অবস্থায় তাদেরকে সম্ভোগ করা বৈধ (মোবাহ)। এতে করে বুঝা যায়— সম্ভোগ বা সহবাস ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয় বরং মোবাহ (বৈধ)। আর 'যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন'— একথার অর্থ, আল্লাহপাকের নির্দেশ হচ্ছে, সম্ভোগে যথাঅঙ্গ ব্যবহার করতে হবে। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, নারীঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে যৌনচরিতার্থতা আল্লাহ্পাকের বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাসও একথা বলেছেন। কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত মিন (থেকে) অব্যয়টির অর্থ হবে ফি (মধ্যে)। অর্থাৎ যে অঙ্গ সম্ভোগের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে অঙ্গই ব্যবহার করতে হবে। ইবনে হানাফিয়া বলেছেন, যে পথ বৈধ সে পথে, যে পথ অবৈধ সে পথে নয়।

'আল্লাহ তওবাকারী এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন'-অর্থাৎ যারা ঋতুবতীদেরকে সম্ভোগ করে না এবং যৌন মিলনে অবৈধ অঙ্গ ব্যবহার করে না, তারা আল্লাহ্পাকের প্রিয়। অবশ্য যৌনমিলন মাত্রই অপবিত্র। বৈধাবৈধ সকল প্রকার সম্ভোগেই শরীর অপবিত্র হয়। তাই সম্ভোগের পর গোসল ফরজ করা হয়েছে। যথাঅঙ্গে যৌনচরিতার্থতার অনুমতি এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, এতে করে মানব বংশের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকবে। তবে এই অনুমতি কতকগুলো বিধানের অধীন। যেমন, বিবাহ করতে হবে; যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ কেবল তাদেরকেই। স্ত্রীকে হতে হবে ঋতুগ্রস্তাহীন, নারীঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না। ইত্যাদি।

সমকাম অবৈধ। বিধানটি ঐকমত্যের মাধ্যমে সুসাব্যস্ত। হজরত লুত আ. এর সম্প্রদায় সমকামে লিপ্ত হওয়ার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুসঙ্গম বৈধ নয়। আল্লাহ্পাক তাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন, তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। একথার অর্থ শস্যক্ষেত্রে যেমন ফসলের বীজ বপন করা হয়, তেমনি শস্যভূমি তুল্য জরায়ুতে বপন করা হয় বীজ তুল্য বীর্য। ভূমিতে যেমন উৎপন্ন হয় ফসল, তেমনি রমনীগর্ভে আবির্ভূত হয় মানব শিশু। আয়াতের

বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাটিই সুস্পষ্ট হয় যে, সম্ভোগ যদিও সুখকর, তবুও তা মূল উদ্দেশ্য নয়। সহবাসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানববংশ বিস্তার।

'অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো'— যেভাবে ইচ্ছা বুঝাতে আয়াতে 'আন্না' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি বহু অর্থবোধক। এখানে যেভাবে ইচ্ছা বা যেমন ইচ্ছা অর্থটি অধিক সংগতিপূর্ণ।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, সম্ভোগকর্মে স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার করা বৈধ নয়। ইমাম মালেক থেকে এ সম্পর্কে দু'রকম অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি এটাকে জায়েয বলেছিলেন। কিন্তু পরে এই অভিমতটি পরিত্যাগ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী থেকেও দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে এই– – রসুল স. যখন স্পষ্ট করে বিষয়টিকে হালাল বা হারাম বলেন নি তাই হালাল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ইবনে আবদুল হাকামের বক্তব্যটি ছিলো এই ধরনের— যেমন কেউ তার স্ত্রীর বগল, পাঁজর, উরু ইত্যাদি অঙ্গে রতিকর্মের স্বাদ অনুভব করতে চায়, তবে তা বৈধ হবে। ইবনে আবদুল হাকামের বক্তব্যকে সনদসহ হাকেম উল্লেখ করেছেন এ রকম— আমি ইমাম শাফেয়ীর সম্মুখে বিষয়টি তুললাম। তিনি বললেন, মোহাম্মদ বিন হাসানও আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, এ সম্পর্কিত বিবরণের সনদগুলো সম্পর্কে তুমি তো জানোই। এখন তুমি কি চাও? বিতর্ক না সমাধান। তিনি বললেন, আমি সমাধান চাই। কিন্তু জানতে চাই কোন দলিলের মাধ্যমে আপনি একে হারাম বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।' আরো বললেন, 'তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।' এতে করে বুঝা যায়, স্ত্রীঅঙ্গ ব্যবহার করাই আল্লাহ্পাকের নির্দেশ এবং এই অঙ্গই শস্যক্ষেত্র তুল্য। এই শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশী সেভাবে বীজ বপণ করা যায়। ভূমি ব্যতিরেকে যেমন শস্য উৎপাদিত হয় না, তেমনি স্ত্রীঅঙ্গ ব্যতীত মানব শিশুও জন্মলাভ করে না। আমি বললাম, তবে কি ওই একপথ ছাড়া অন্য সকল পথই হারাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কেউ যদি স্ত্রীর হাতে, বগলে, কিংবা উরুতে সম্ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করতে চায়, তবে সেটাও কি হারাম? তিনি বললেন, না। আমি পুনঃ প্রশ্ন করলাম, তবে যে আয়াতকে আপনি দলিল হিসাবে পেশ করলেন, সেটা নিশ্চয় সঠিক দলিল নয়। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক অন্যত্র বলেছেন, 'আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।' এখানে স্পষ্ট করে যথাঙ্গের কথা বলা হয়েছে। আমি বললাম, দেখুন এটাই সেই দলিল, যদ্দারা আলেমগণ পশ্চাৎদ্বারের যৌনমিলনকে সিদ্ধ বলেছেন। কারণ, আপনি যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক ওই সকল লোকের প্রশংসা করেছেন, যারা আপন ক্রীতদাসী ও সহধর্মিণী ব্যতীত অন্যের প্রতি ইন্দ্রিয়লালসা মুক্ত।

আমি বলি, আমাদের অভিমত হচ্ছে, স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার হারাম। কারণ, এ কর্মটি অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অশ্লীল। তাই ইমাম শাফেয়ী পরবর্তীতে এই অভিমতটিকেই গ্রহণ করেছেন। হাকেম বলেছেন, পরবর্তীতে তিনি এ কর্মটিকে হারাম বলেই অভিহিত করেছেন। রবী বলেন, এতদ্‌সম্পর্কে রবীয় হজরত ইমাম শাফেয়ী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা মিথ্যা। মহামান্য ইমাম তাঁর সুনানে বিষয়টিকে হারামই বলেছেন। অনেক আলেম কর্তৃক বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। মাওয়ারদি আবু নসর বিন সাবাহ্ এবং অন্যান্য আলেম রচিত গ্রন্থাবলীতে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী আবার ইবনে আবদুল হাকামের সমর্থন করে বলেছেন, তিনিই বিষয়টির একক বর্ণনাকারী নন। বরং তার ভাই আবদুর রহমানও বর্ণনাকারীদের একজন।

ইমাম শাফেয়ীর সর্বশেষ মত জমহুরের সমান্তরাল। অননুমোদিত অঙ্গকে জমহুরও হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থনে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জাওজী বলেছেন, এ সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত খুজাইমা, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে ওমর, হজরত আমর ইবনে আস, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত উকবা বিন আমর, হজরত বারা বিন আজিব, হজরত আবু জর, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ প্রমুখ।

আমি বলি, আতা বিন সালেহের মাধ্যমে হজরত ওমরের হাদিসে বর্ণনা করেছেন নাসাঈ ও বায্‌যার। জাম'আ তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হাদী থেকে এবং তিনি হজরত ওমর থেকে। জাম'আ দুর্বল— আহমদ ও ইবনে আবী হাতেম এ রকম বলেছেন। জাহাবী বলেছেন, তিনি সালেহুল হাদিস। কিন্তু তাঁর বর্ণনা মওকুফ ও মারফু হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হজরত আলীর হাদিস বর্ণনা করেছেন— এভাবে সত্য কথা বলতে আল্লাহ্‌পাক লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা রমণীদের সঙ্গে নিকৃষ্ট কর্ম কোরো না। হজরত খুজাইমার হাদিসটি এ রকম— একলোক স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে উপগত হওয়া যাবে কি না জানতে চাইলে রসুল স. জবাব দিলেন, যাবে। লোকটি চলে যাচ্ছিলো, তিনি তাঁকে পুনরায় ডেকে বললেন, না। কক্ষনো যাবে না। সত্য কথা বলতে আল্লাহ্‌পাক দ্বিধাগ্রস্ত হন না। খবরদার! নারীদের পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার কোরো না। বর্ণনাটি এনেছেন, শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও দারেমী। এই সূত্রভূত আমর বিন আজনাহা একেবারে অপরিচিত। তবে এই বর্ণনাটি আবার নাসাঈ এনেছেন ইবনে সুয়াইদ বিন হেলালের সূত্রে। সূত্রটি এরকম— সুয়াইদ তাঁর পিতা আলী ইবনে সায়েব, হামীম বিন মুহসিন, হারমি বিন আবদুল্লাহ- হজরত খুজাইমা। হারমির সূত্রে আবার আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন। হাকেম বর্ণনা করেছেন আবু আলী নিশাপুরী থেকে। নাসাঈ বলেছেন, বোখারী বর্ণনা দু'টিকে মেনে নিয়েছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. এরশাদ

করেন, যারা স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে উপগত হয় তারা অভিশপ্ত। আরো বর্ণিত হয়েছে— হাশর প্রান্তরে ওই সকল লোকের প্রতি আল্লাহ্পাক সুদৃষ্টি দিবেন না, যারা নারীর পশ্চাৎদ্বার সম্ভোগ করে।

'পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্কে ভয় করিও'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের জন্য কিছু সৎকর্ম কোরো। অর্থাৎ স্ত্রী সম্ভোগের মাধ্যমে সৎকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারটিকেও যেনো গুরুত্ব দান করা হয়। সম্ভোগের হারাম পদ্ধতিকে যেনো গ্রহণ না করা হয়। আর সম্ভোগের উদ্দেশ্য যেনো এটাও থাকে যে, এই সহবাসের মাধ্যমে সৎ সন্তান জন্মলাভ করুক যারা মৃত মাতাপিতার জন্য ইস্তেগফার করবে এবং হাশরের প্রান্তরে পরিত্রাণের অসিলা হবে।

মোবাহ্ বিষয়গুলো বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পাদন করলে ইবাদত হয়। রসুল স. এরশাদ করেন, স্ত্রীসহবাসের মধ্যেও সওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থ করবো, অথচ সওয়াবের অধিকারীও হবো! তিনি স. বললেন, যারা হারাম উপায়ে লালসা চরিতার্থ করে তারা কি গোনাহ্গার নয়? তাদের হারাম কার্যে পাপ হলে তোমাদের হালাল কর্মে পুণ্য হবেনা কেনো? হজরত আবু জর থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন- মানুষ মৃত্যুবরণ করলে সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। বাকী থাকে কেবল তিনটি জিনিস। ১. সদকায়ে জারীয়া— জনকল্যাণমূলক কর্ম যার দ্বারা মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম উপকৃত হতে থাকে। ২. এলেম— যা শিক্ষার্থী পরম্পরায় জারী থাকে, মৃত্যুর পরেও যার সুফল মানুষ পেতে থাকে। ৩. সৎ সন্তান— যারা পূর্বপুরুষদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, রসুল স. এক আনসার মহিলাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, যাকে তাদের মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছে— সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। বোখারী, মুসলিম। এক আনসারী রমণী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি কেউ দু'টি শিশু সন্তান হারায়? রসুল স. বললেন, তবুও বেহেশ্তে যাবে। মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, যার দু'টি শিশু সন্তান মারা যায়, আল্লাহ্পাক তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। জননী আয়েশা বললেন, একটি মারা গেলে? তিনি স. বললেন, একজন মারা গেলেও। তিরমিজি।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, 'তোমরা পূর্বাহ্নে তোমাদের জন্য কিছু করো' (ওয়া কাদ্দিমু লি আনফুসিকুম) বাক্যটি পুর্বোক্ত 'তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো' এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে বাক্য দু'টির মিলিত অর্থ হবে এরকম— যে তার শস্যক্ষেত্রে যথানিয়মে চাষাবাদ করে সেই পূর্বাহ্নে নিজেদের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়।

বিবাহের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় সুসন্তান জন্মগ্রহণের মাধ্যমে। পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হলেও বিবাহ একটি মহৎ কর্ম। কারণ বিবাহই সৎসন্তানের আগমণ নিশ্চিত করে। আতা ও মুজাহিদ বলেছেন, 'পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু কোরো'— একথার অর্থ যৌনমিলনের আগে তোমরা বিসমিল্লাহ পাঠ কোরো এবং দোয়া কোরো। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেন, সহবাসকালে এই দোয়া পাঠ করা উচিৎ— 'আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রজাকতানা।' এই দোয়া পাঠের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, শয়তান কোনোদিন তার ক্ষতি করতে পারবে না।

'আল্লাহ্‌কে ভয় করো'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে রক্ষা পাও।

'তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে যাচ্ছো'— একথার মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে শেষ বিচারের দিনের কথা— যখন সবাইকে তাদের কর্মফল দেয়া হবে। সৎকর্মের পরিণাম শুভ। আর অসৎকর্মের পরিণতি অশুভ।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও।' আসলে বিশ্বাসীদের সকল সংবাদই সুসংবাদ। অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই তাঁদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। সুহাইব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, কী বিস্ময়! বিশ্বাসীরা আনন্দিত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ কারণে লাভ করে কল্যাণ। আবার বিপদে ধৈর্য ধারণ করলেও পায় কল্যাণ। মুসলিম।

বাগবী বলেছেন, একবার হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এবং তাঁর সহোদরাপতি হজরত নোমান বিন বশীরের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ দেখা দিলো। তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা শপথ করে বললেন যে, তিনি কখনোই হজরত নোমান বিন বশীরের কাছে যাবেন না, তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাঁর কোনো ব্যাপারে আপোষ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁকে কেউ হজরত নোমান বিন বশীর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, আমি শপথ করেছি— তাঁর কোনো ব্যাপারেই আমি নেই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৪,২২৫

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

❒ তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইতে বিরত রহিবে এই শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে তোমরা অজুহাত করিওনা। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

'আইমান' অর্থ শপথের বাক্যাবলী। 'উরদ্বাতান' অর্থ প্রতিবন্ধক। আয়াতের শুরুতে নির্দেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শপথকে যেনো সৎকর্মের অন্তরায় করা না হয়। আত্মসংযম, শান্তিস্থাপন — এসবের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌পাকের শপথকে দাঁড় করানো অভিপ্রেত নয়।

কারো সামনে কোনো বস্তু নিশানা বা বাধা হিসাবে প্রোথিত করাকেও 'উরদ্বাতান' বলা যেতে পারে। যেমন আরববাসীরা বলে থাকেন, অমুক কজের জন্য অমুক বস্তু পুঁতে দিয়েছি। এই অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে— কৃত শপথে আল্লাহ্‌পাককে নিশানা বা বাধা হিসেবে দাঁড় করিওনা। অর্থাৎ কথায় কথায় শপথ উচ্চারণ কোরো না।

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুণঃ পুণঃ শপথ করা মাকরূহ্ (অনভিপ্রেত)। অধিক শপথকারী আল্লাহ্‌পাককে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করায়— বাহাদুরী প্রদর্শনই থাকে তার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য। এই আচরণটি আল্লাহ্‌ভীরুদের আচরণ নয়। রসুল স. বলেছেন, অধিক শপথ করলে ভেঙে ফেলতে হয় অথবা এর জন্য লজ্জিত হতে হয়। বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বোখারী তাঁর তারীখ পুস্তকেও হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এর দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সৎকর্মের বিরুদ্ধে শপথ করার পর তা ভঙ্গ করলে জরিমানা (কাফফারা) দিতে হবে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— কোনো ব্যক্তি শপথ করার পর যদি দেখে তার শপথ কল্যাণরহিত, তখন তাকে শপথ ভঙ্গ করতে হবে এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিয়ে কল্যাণের দিকে ফিরে যেতে হবে। মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আবু মুসার হাদিসে এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আমি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে কোনো বিষয়ে কসম করার পর যদি দেখি, কসমের বিপরীতেই রয়েছে কল্যাণ, তবে কসমের কাফফারা দিয়ে অবশ্যই আমি কল্যাণের দিকে ধাবিত হবো। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবুবকর সম্পর্কে। তিনি এই মর্মে কসম করেছিলেন যে, আমি মিসতাহ্ এর সঙ্গে সদাচরণ করবো না। কারণ মিসতাহ্ আয়েশাকে অপবাদ দিয়েছিলো। হজরত ইবনে জুরাইরা থেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর।

'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'— একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক তোমাদের শপথ বাক্যগুলো শোনেন। কারণ, তিনি সর্বশ্রোতা। আর তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তিনি জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না।' এখানে তোমাদের দায়ী করবেন না অর্থ আখেরাতে শাস্তি দিবেন না। এরকম অর্থ হতে পারে যে, দুনিয়া ও আখেরাত— কোনো স্থানেই নিরর্থক কসমের জন্য দায়ী করা হবে না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, অর্থহীন শপথ ভঙ্গের কারণে কাফফারা দিলে দুনিয়াতে দায়ী করা হবেনা। অর্থাৎ এখানে কেবল দুনিয়াতে দায়ী না করার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র কসমের সঙ্গেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে পার্থিব সংশ্লিষ্টতা নেই। বিষয়টি জাকাতের মতো বিশুদ্ধ আল্লাহ্‌র হক। একারণেই জাকাত এবং কাফফারা আদায় না করে কেউ মারা গেলে উত্তরাধিকারীদের প্রতি তা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায় না। কিন্তু ঋণ, ওশর এবং খাজনা আদায়ের দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের উপরে থেকেই যায়। আবার শপথ করলেই কাফফারা দিতে হবে— এমন নয়। বরং কাফফারা দিতে হবে শপথ ভঙ্গ করলে। কাজেই এখানে অভিযুক্ত না করার যে কথা বলা হয়েছে তা পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ আখেরাতে দায়ী করবেন না। আর কাফফারা দিতে হয় অঙ্গীকারাবদ্ধতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, আল্লাহ্‌র দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য নয়।

অর্থহীন শপথ বুঝাতে এখানে 'লগবু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো বিষয়ের সঙ্গে শব্দটি সংযুক্ত হলে বুঝতে হবে ওই বিষয়টি ধর্তব্যই নয়। এরকম বলা হয়েছে কামুস অভিধানে। অর্থহীন শপথ ওই নিরর্থক অঙ্গীকারের নাম যা ধারণা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ব্যক্ত করা হয়। সেই অঙ্গীকার অতীত বা ভবিষ্যৎ কালবোধক হতে পারে। পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে হয়ে থাকতে পারে। এরকম বলেছেন মাতা আয়েশা সিদ্দিকা।

শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেন, নিরর্থক শপথ এরকম— লা ওয়াল্লা, বালা ওয়াল্লা (আল্লাহ্‌র কসম না, আল্লাহ্‌র কসম হাঁ)। আবু দাউদ বিবরণটি পেশ করেছেন মারফু সূত্রে। শাফেয়ী ও ইকরামার মন্তব্যও অনুরূপ। একই কথা

বলেছেন ইমাম শাফেয়ীও। লগবু শব্দটির উদ্দেশ্য এরকমই। যা অনিচ্ছায় ঘটে তা ধর্তব্য নয় এবং তার মধ্যে পাপও নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অর্থহীন শপথ আসলে শপথই নয়। তাই তা ভঙ্গ করার প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনি শপথ ভঙ্গের কাফফারা দেয়ার কথাও আসে না। আয়াতে 'দায়ী করা হবে না' বলে সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার মতে এধরনের শপথও কার্যকর। আর এরজন্য কাফফারাও অবধারিত। কারণ রসুল স. এরশাদ করেন, তিনটি বিষয় এমন, যা সত্য বললেও সত্য, আবার ঠাট্টা করে বললেও সত্য। বিষয় তিনটি হচ্ছে— বিবাহ, তালাক ও শপথ। হেদায়া রচয়িতাও এরকম বলেছেন। কিন্তু আমরা হাদিস গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করেও বর্ণিত হাদিসটি পাইনি। তবে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু পদ্ধতিতে আব্দুর রহমান বিন হাবিব, আতা, ইউসুফ বিন জুহাক, আবু হোরায়রা এরকম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনটি বিষয় সত্য হলেও সত্য, ঠাট্টা হলেও সত্য— বিয়ে, তালাক, রজায়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম ও দারা কুতনী। তিরমিজির মতে হাদিসটি হাসান এবং হাকেমের মতে বিশুদ্ধ। ইবনে জাওজী বলেছেন, সূত্রে উল্লেখিত আতা হচ্ছে আজলানের পুত্র যার বর্ণনা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, কথাটি ঠিক নয়। আতা আসলে আবু রিবাহের পুত্র। আজলানের পুত্র নয়। আব্দুর রহমান বিন হাবীব সম্পর্কেও মুহাদ্দিসগণের মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নাসাঈ বলেছেন, লোকটি হাদিসের সনদ অমান্যকারী। অবশ্য অন্যান্যরা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাজেই হাদিসটি হাসান। হাদিসটি ইবনে আদি তাঁর কামেল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে— তিনটি বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলবে না— বিদ্রূপের সাথে ব্যক্ত করলেও তা সত্য বলে গণ্য হবে। বিষয় তিনটি হচ্ছে— বিয়ে, তালাক ও ক্রীতদাসমুক্তি। হাদিসটির এক বর্ণনাকারী লেহিয়া জয়ীফ।

আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর এবং হজরত আলী বলেছেন, তিনটি বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলে না— বিয়ে, তালাক ও গোলাম আযাদ। তাদের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে মানতের কথা। মানতও শপথতুল্য।

আমি বলি, শাফেয়ী বর্ণিত হাদিসটি মারফু প্রকৃতির এবং তা আলোচ্য আয়াতের তাফসীর। কাজেই প্রকাশ্য নসের প্রতিপক্ষে কিয়াসের স্থান নেই। উপরন্তু কিয়াস হিসেবে গৃহীত হাদিসটি মওকুফ যা মারফু হাদিসের তুলনায় নিম্নমানের।

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, শপথের হাদিসটি সঠিক হলেও এখানে তা দলিল হিসেবে ধর্তব্য হবে না। কারণ, হাদিসের বক্তব্য শুধু এতোটুকুই যে, ঠাট্টা করে কেউ শপথ করলেও তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে। যে ঠাট্টা করে শপথ করে, সে জেনে শুনেই করে। তাই সে শপথকারী হিসেবে গণ্য। কিন্তু ভুলক্রমে যদি কেউ মিথ্যা বলে তবে তাকে মিথ্যবাদী বলা যায় না। সে হয়তো বলতে চেয়েছে একটি, কিন্তু মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গিয়েছে অন্যটি। সুতরাং ঠাট্টা শপথ এবং ভুলে কিছু বলে

ফেলা, এক কথা নয়। আর শপথ ঠাট্টা ভেবে করা হয়েছে কিনা, তা বুঝার উপায় নেই। তাই 'লগবু' শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হচ্ছে, বুঝে শুনে শপথ করার পর শপথের বিপরীত আচরণ করলেই কেবল বলা যাবে, শপথটি ছিলো 'লগবু' বা নিরর্থক। জুহুরী, হাসান ও ইব্রাহিম নাখয়ীও এরকম বলেন।

হজরত কাতাদা ও মাকহুল বলেন, এধরণের শপথে কোনো পাপ নেই। কাফফারাও নেই। এধরণের শপথকারী জানে যে, তার শপথ আসলে শপথই নয়। তাই তার শপথকে শপথ হিসেবে ধরাই যাবে না।

শাফেয়ীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সত্য ধারণার উপর স্বেচ্ছায় শপথের পর শপথ থেকে সরে গেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ, তা আয়াতে উল্লেখিত নিরর্থক শপথের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেহেতু শপথ করা হয়েছে স্বেচ্ছায়। যেমন গমুস জাতীয় শপথ করা হয়। তবে এই শপথের সঙ্গে গমুস শপথের পার্থক্য এতোটুকুই যে, গমুস শপথকারী চিন্তাভাবনা না করেই শপথ করে, তাই তাতে পাপ নেই।

আমি বলি, যদিও এটা নিরর্থক শপথের পর্যায়ভুক্ত নয়, তবুও এতে পাপ নেই, কাফফারাও নেই। পাপ নেই একারণে যে, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তোমাদের মুখ থেকে ভুলবশতঃ যা উচ্চারিত হয়, তাতে পাপ নেই। হ্যাঁ, যাতে মনের প্রত্যয় থাকে।' আর এতে পাপ নেই বলে কাফফারাও নেই। পাপ মোচনই কাফফারার উদ্দেশ্য। তাই পাপই যখন নেই, তখন কাফফারাও নেই। আর এই শপথ 'ফীমা আকাত্তুমুল আইমানা' আয়াতটির সঙ্গে সম্পৃক্তও নয়। প্রকৃতপক্ষে কাফফারা ওই আয়াতটির সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

কেউ যদি বলে বসে, পাপই যদি কাফফারার কারণ হয় এবং হাদিস ও ঐকমত্যের দৃষ্টিতে ভুলের জন্য যদি কোনো পাপ না থাকে, তবে ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটালে কাফফারা কি ওয়াজিব হবে না? আমাদের জবাব হচ্ছে— একটি হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকে দু'টি অপরাধ-অন্যায়ভাবে প্রাণ হরণ ও আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন। ইচ্ছাকৃত হত্যা কবীরা গোনাহ। তাই কেবল কাফফারা দিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের মধ্যে প্রাণহরণ ও নির্দেশলংঘন দু'টোই রয়েছে। কিন্তু ভুলক্রমে হত্যাকান্ডে রয়েছে কেবল প্রাণহরণের অপরাধটি। সুতরাং কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘনের কারণে কাফফারা আদায় করলে হত্যাকারী কখনো দায়মুক্ত হতে পারবে না।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, পাপকর্মের সঙ্গে জড়িত শপথের নাম অর্থহীন শপথ (কসমে লাগবু)। এরকম শপথকারী আল্লাহ্পাকের শাস্তির উপযোগী হবে না। কিন্তু তাদেরকে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিতে হবে। একথা মেনে নিলে প্রকৃত শপথ এবং অর্থহীন শপথ একজাতীয় হয়ে পড়ে। অথচ আয়াতের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত শপথ দু'টি এক প্রকারের নয়। কাফফারা ওয়াজিব হওয়া

এবং দায়ী না হওয়া পরস্পরবিরুদ্ধ। পাপের কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়। আবার দায়ী হতে হয় পাপের কারণেই।

মাসরুক বলেছেন, পাপ কর্মে শপথ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। আবার শয়তানী পদস্খলনেও কাফফারা দিতে হয়। পাপকর্মে শপথকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে শা'বী বলেছিলেন, তার কাফফারা হলো তওবা।

আমি বলি, পাপকর্মে শপথকারীর উচিৎ শপথ ভঙ্গ করা। কেউ যদি পাপকর্মে শপথ করে এবং তা পূরণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়, তবে ওই শপথ প্রকৃত শপথের পর্যায়ভুক্ত এবং ওই শপথের কারণে সে আল্লাহপাকের শাস্তিযোগ্য হবে। যেমন, তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা সুদৃঢ় শপথ করো, তখন আল্লাহ্পাক তা গ্রহণ করেন।' এরকম শপথকে নিরর্থক শপথ বলা যায় না। রসুল স. এর ওই উক্তিতে একথার পোষকতা রয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন, কাজেই তার উচিত, সে যেনো কাফফারা দেয় এবং উত্তমকর্ম সম্পন্ন করে। আর আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

'কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন'— একথার অর্থ, মিথ্যা শপথের যে দৃঢ় সংকল্প তোমরা অন্তরে ধারণ করেছো, তার জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের শপথ অর্থহীন শপথ নয়। এ হচ্ছে পরিপক্ক মিথ্যা শপথ, যা ভঙ্গ করলে পাপ হয়। শুধুমাত্র শপথে কোনো পাপ নেই। কেউ যদি এই মর্মে আপত্তি তোলে যে, সুরা মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে, 'যে শপথে তোমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী, আল্লাহ্ অবশ্যই তা ধরবেন।' তাহলে প্রমাণিত হয় যে, দৃঢ় সংকল্প পাপ এবং ধর্তব্য বিষয়। যদি তাই হয়, তবে কীভাবে বলা যায় যে, পরিপক্ক শপথ এই ব্যাখ্যার বাইরে?

আমি বলি, ওই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে— আল্লাহ্পাক তোমাদের ওই সকল শপথ ধরবেন, যা তোমরা সংকল্প করেছো এবং ভঙ্গ করেছো। কিন্তু এখানে সেকথা বলা হয়নি। এখানে বিবৃত হয়েছে রূপক অর্থেরই একটি অংশ। আর প্রকৃত ও রূপক অর্থ কখনো একীভূত হয় না। গমুস জাতীয় শপথের বেলায় কেবল শপথ করার সাথে সাথে ধর্তব্য হয়। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, সুরা মায়েদায় বর্ণিত শপথ হচ্ছে পরিপক্ক শপথ। আর এখানে যে শপথের কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে গমুস শপথ। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য হচ্ছে, অন্তরের সংকল্প এবং তোমরা যে পরিপক্ক শপথ করেছো— আয়াত দু'টি একই মর্মবোধক। তাঁর ধারণায়, অন্তরের সংকল্পই হচ্ছে পরিপক্ক শপথ, যা অর্থহীন শপথের বিপরীত। কাজেই বর্ণিত আয়াত দু'টির মধ্যে পরিপক্ক, গমুস, নিরর্থক-সকল শপথই রয়েছে। তাই সবগুলোর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব। আমরা বলি, ব্যাপারটি সে রকম নয়। বরং পরিপক্ক শপথকারীর উপরে রয়েছে একটি দায়িত্ব, যা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে ইমানদারগণ। তোমাদের শপথ পূর্ণ করো।' কিন্তু এখানে পাপ বা ধর্তব্যের কথা বলা হয়নি। তবে শপথ ভঙ্গের ও অন্তরের সংকল্পের বিষয়টি স্বতন্ত্র। হজরত আয়েশার ব্যাখ্যানুসারে অন্তরের সংকল্প অর্থহীন শপথের বিপরীত।

আর যেহেতু এখানে অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করার কথা বলা আছে, তাই এ ধরনের শপথ পাপ। গমুস শপথেই পাপের ধারণা রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব। কাফফারা দিলে এ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল- একথার অর্থ, আল্লাহপাক ক্ষমাপরবশ। তাই তোমাদের কবীরা গোনাহ তওবার মাধ্যমে অথবা বিনা তওবায় ক্ষমা করে দেন। এই ক্ষমা এখানে 'অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না' বাক্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরে উল্লেখিত অন্তরের সংকল্প বা গমুস শপথের সঙ্গেও আল্লাহপাকের ক্ষমাশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রমাণ হিসেবে বোখারী বর্ণিত হজরত আয়েশার হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য— যেখানে তিনি বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যিনি বলেছেন, 'লা ওয়াল্লাহ্ ওয়া বালা ওয়াল্লাহ্ (আল্লাহর কসম না আল্লাহর কসম হ্যাঁ)।

জেনে রাখা প্রয়োজন, শপথ অর্থ- শক্তি। যেমন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'লা আখজ্নাহু বিল ইয়ামিন (অবশ্যই আমি তাকে শক্তভাবে ধরেছি)।' এই জন্যই ডান হাতের নাম ইয়ামিন। কারণ, ডান হাত বাম হাতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

শপথ দুই ধরনের। ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত শপথ হচ্ছে- ভূতভবিষ্যত,সত্যমিথ্যা, বিবৃতিমূলক বা অবিবৃতিমূলক বচন- যা অচিন্ত্যনীয়রূপে মুখে উচ্চারিত হয়। এ ধরনের শপথকে বলে লগবু বা অর্থহীন শপথ। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ শপথের কোনো মূল্যই নেই— তাই এ সম্পর্কে কোনো বিধানও নেই। তবে ইমাম আবু হানিফা এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। ইচ্ছাকৃত শপথ আবার দুই প্রকার। ১. বিবৃতিমূলক— যা বাস্তবে সত্য এবং বক্তার ধারণাতেও সত্য। যেমন, কেউ বললো, আল্লাহর কসম! হজরত মোহাম্মদ স. আল্লাহর রসুল। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে ইত্যাদি। এতাদৃশ শপথ সমালোচনার উর্ধ্বে। বরং এ হচ্ছে ইবাদত। তবে এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক তোমাদের বাপ দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং শপথ করতে চাইলে আল্লাহ্র নামে শপথ কোরো। অন্যথায় নিশ্চুপ থেকো। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করলো, সে অবশ্যই শিরিক করলো। তিরমিজি। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে— রসুল স. বলেছেন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও প্রতিমার নামে শপথ কোরো না। আর আল্লাহর ওয়াস্তেও শপথ কোরো না, যদি তা মিথ্যা হয়। আবু দাউদ, নাসাঈ।

শপথকারীর শপথ তার ধারণায় সত্য হলেও বাস্তবে তা যদি মিথ্যা হয়, তবে শপথকারীর ধারণার ভিত্তিমূল কী তা বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে তার ধারনা নিছক কল্পনার উপর, না একক কোনো বর্ণনার উপর। একক বর্ণনা নির্ভুল হলেও ভুলের সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। তাই ইমাম আবু হানিফার মতে, এ রকম

শপথের নাম ধারণাপ্রসূত শপথ। এ রকম শপথই অর্থহীন শপথ। একে গমুস শপথও বলা যেতে পারে যা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ।

কারও মিথ্যা কসমের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে তা স্পষ্ট রূপে গমুস শপথ হিসাবে প্রমাণিত হয়। যেমন অবিশ্বাসীরা বলে, হজরত ঈসা আল্লাহ্র পুত্র, আল্লাহ্পাক কবরবাসীদিগকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না ইত্যাদি। এমনও হতে পারে যে, বক্তার উক্তি সত্য কিন্তু সে তা অন্তরে বিশ্বাস করে না, অন্তরে মিথ্যা বলে জানে। যেমন মুনাফিকেরা রসুল স.কে বলতো আল্লাহর কসম— আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রসুল। আপনাকে আমরা ভালোবাসি ইত্যাদি। এ ধরনের শপথও গমুস শপথ। আরেক ধরনের গমুস শপথ হচ্ছে এ রকম— বক্তার উক্তি মিথ্যা এবং বাস্তব অবস্থাও সত্যের অনুকূল নয়। যেমন ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্ মানুষের উপর কোনো কিছু অবতীর্ণ করেন না, যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ্ তাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন না, ইত্যাদি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বলেন— কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে অংশীস্থাপন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা, হত্যা, গমুস শপথ। বোখারী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. এরশাদ করেন, যদি শপথকারীর উদ্দেশ্য হয় সম্পদ আত্মসাত, তবে সে হাশরের দিন আল্লাহ্পাকের সকাশে উপস্থিত হবে তাঁর চরম অসন্তোষ অবস্থায়। এরপর রসুল স. ওই আয়াতটি পাঠ করলেন, যেখানে বলা হয়েছে— 'আর যারা ক্রয় করে আল্লাহ্র অঙ্গীকারের বিনিময়ে শপথের মাধ্যমে সামান্য কিছু সম্পদ।' হজরত আবু উমামার বিবরণে রয়েছে, রসুল স. বলেন- যে ব্যক্তি শপথের বিনিময়ে কোনো মুসলমানের অধিকার হরণ করে, আল্লাহ্পাক তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন এবং হারাম করে দেন জান্নাত। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আনিসের বিবরণে রয়েছে— রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শিরিক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা শপথ করা কবীরা গোনাহ্। তিরমিজি। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৬

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❑ যাহারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ করে তাহারা চার মাস অপেক্ষা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'ইলা' শব্দের অর্থ শপথ করা। শব্দটির পর 'মিন' অব্যয়টি থাকলে অর্থ হবে শপথ। এবং 'আলা' অব্যয়টি থাকলে অর্থ হবে বিচ্ছিন্নতা। হজরত কাতাদা বলেছেন, মূর্খতার যুগে 'ইলা' শব্দটি ব্যবহার হতো তালাকের ক্ষেত্রে। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, জাহিলী যুগে ইলা দ্বারা রমণীদেরকে লাঞ্ছনা করা হতো। স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে ইলা করে বসতো। ফলে স্ত্রী অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্বামী-সন্নিধান বঞ্চিত হতো। অপর স্বামী গ্রহণের অধিকারও থাকতো না তার। ফলে সে না হতো সধবা না হতো বিধবা। এই মূর্খজনোচিত প্রথাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগেও অনুসৃত হয়ে আসছিলো। শেষে ইসলাম এর একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলো।

'চার মাস অপেক্ষা করবে'-একথার অর্থ যারা ইলা করবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে চার মাস অপেক্ষা করা। এর মধ্যে তালাক কার্যকর হয় না।

'অতঃপর তারা যদি প্রত্যাগত হয়'— একথার অর্থ চার মাস অতীত হওয়ার পর স্ত্রীসম্ভোগের মাধ্যমে যদি তারা শপথ ভঙ্গ করে— এ রকম অর্থ গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ। কারণ 'ফা' অব্যয়টি অতঃপর অর্থে ব্যবহার হয়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, চার মাসের কম হলে 'ইলা' হবে না। আবার চার মাস অতিক্রান্ত না হলেও ইলা হবে না। চার মাস অতিক্রান্ত হলেই কেবল ইলা বিধিবদ্ধ হবে। তাই চার মাস অতীত হলেও তালাক হয়েছে মনে করা যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ আয়াতটি পাঠ করেছেন এভাবে 'ফাইন ফাউ ফী হিন্না'— এ কথার অর্থ— ওই চার মাসে যদি প্রত্যাবর্তন করে; এই পাঠভঙ্গির প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন— চার মাসের জন্য যদি কেউ এ ধরনের শপথ করে, তবে সে হবে ইলাকারী। আর তার পক্ষে উচিৎ হবে ওই চার মাসের মধ্যেই প্রত্যাগত হওয়া। এখানে অর্থগত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে 'ক্বেরাতে শাজ্জা' (বিরল ক্বেরাত)। অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, 'ক্বেরাতে শাজ্জা' হাদিস তো নয়ই— কোরআনের আয়াতও নয়। কোরআনের আয়াত হলে তা সর্বজনবিদিত হতো। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন ক্বেরাতে শাজ্জার উপর আমল করা ওয়াজিব। কারণ ওই ক্বেরাত হয় কোরআনের আয়াত অথবা কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস। আর কোরআন ও হাদিস দু'টিই দলিল। যদি কেউ বলেন, ক্বেরাতে শাজ্জা যদি সর্বজনবিদিত ক্বেরাতের (ক্বেরাতে মুতাওয়াতির) বিরোধী হয় তবে অবশ্যই শাজ্জা পরিত্যক্ত হবে। আমরা বলি, উভয় ক্বেরাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হলে পরিত্যক্ত হবে নতুবা নয়। কিন্তু এখানে সামঞ্জস্য বিধায়ন সম্ভব। কারণ 'ফা' অব্যয়টি যেমন অতঃপর অর্থে ব্যবহার হয়, তেমনি ব্যবহৃত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিস্তৃত ব্যাখ্যা অর্থেও। যেমন 'ফানাদা নুহুর রব্বাহু', 'ফাক্বলা রব্বি ইন্নাব্নি মিন আহলি'— এই আয়াতগুলোতে 'ফা' অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আয়াতে যখন বলা হয়েছে চার মাস অপেক্ষা করবে, তখন বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কাজেই 'ফাইন ফা'উ' থেকে পরবর্তী আয়াতের শেষ পর্যন্ত

(সামিউন আলিম) ব্যাখ্যার আওতায় আনতে হবে। এছাড়া 'ফা' অব্যয় থেকে কালগত দিক অনুযায়ী পশ্চাতে ধরা হয়, তাহলে সম্ভবতঃ ঘটনাটি ইলার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য হবে। সেক্ষেত্রে 'যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে' একথার অর্থ হবে— অতঃপর যদি তারা ইলার পরে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু এখানে সর্বজনবিদিত ক্বেরাত সাধারণভাবে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে প্রমাণ করে। সেই প্রত্যাবর্তন চার মাসের মধ্যেও হতে পারে এবং চার মাস পরেও হতে পারে। আর ক্বেরাতে শাজ্জাতে সময়সীমা সুনির্ধারিত হয়ে যায়, অর্থাৎ 'ক্বেরাতে শাজ্জা' অনুযায়ী চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। ফেকাহ্‌বিদগণের সূত্রানুযায়ী সীমিত অর্থও চূড়ান্ত অর্থ হিসাবে গৃহীত হয় । ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ক্বেরাত অবিখ্যাত (শাজ্জা) নয় বরং মশহুর (প্রসিদ্ধ) । কিতাবুল্লার নির্দিষ্টকরণ ও সাধারণার্থক শব্দকে সীমিতার্থক শব্দের স্থলে ব্যবহার সিদ্ধ।

'তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'— এ সম্পর্কে হাসান ইবনে ইব্রাহিম ও কাতাদা বলেছেন, ইলাকারী ইলা থেকে প্রত্যাবৃত হলে কাফফারা দিতে হবে না। কারণ, এ আয়াতের শেষে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার করেছেন। জমহুর বলেছেন, ইলা থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। কারণ, ক্ষমাপ্রার্থনার দ্বারা কাফফারা অপসারিত হয় না। সুরা মায়েদার একটি আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। হাদিস শরীফেও বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ শপথ করার পর উত্তম বিষয়ের সন্ধান পায়, তবে সে যেনো শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিয়ে ধাবিত হয় উত্তমতার দিকে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৭

وَاِنۡ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ۝

❐ আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এখানে তালাক দেয়ার সংকল্পের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ইলার' চার মাস অতিক্রান্ত হলেও তালাক কার্যকর হবে না। যতোক্ষণ না তালাকের ঘোষণা দেয়া হয়। যদি চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আপনা আপনি তালাক হয়ে যেতো তবে তালাকের সংকল্পের কথা উঠতো না। আর এ কথা বলার প্রয়োজন হতো না যে, 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' একথার অর্থ, আল্লাহ্‌তায়ালা তালাকের ঘোষণা শোনেন এবং তালাকপ্রদাতার অন্তরের উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানেন। এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কেউ যদি ইলা করার পর প্রত্যাবর্তন না করে এবং

তালাকও না দেয় তবে এক্ষেত্রে কী বিধান হবে? এমতোক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ মতপার্থক্য করেছেন। দু'টি দিক রয়েছে তালাকের। একটি হচ্ছে 'ইমসাক বিল মারুফ' (সৎভাবে সংরক্ষণ। অর্থাৎ ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করা তথা তালাক ফিরিয়ে নেয়া)। আরেকটি দিক হচ্ছে 'তাসরীহ বি ইহসান' (বিধানগত দেনা পাওনা পরিশোধ করে সম্মানজনকভাবে বিদায় করা)। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, আদালত ইলাকারীকে তালাক প্রদানে নির্দেশ করবে। ইলাকারী যেহেতু 'সৎভাবে সংরক্ষণ' বিধি কার্যকর করেনি— তাই বিচারক তাকে 'সম্মানজনক বিদায়দান' নীতি মানাতে বাধ্য করবে। যেমন বিধান রয়েছে নপুংশকদের ক্ষেত্রে। অপর এক বর্ণনায় শাফেয়ী ও আহমদের এমন অভিমতও পাওয়া যায় যে, বিচারক ইলাকারীর উপর চাপ সৃষ্টি করে তালাক প্রদান করাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একথার অর্থ ইলাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাবর্তন না করে চার মাস অতীত হওয়ার সুযোগ দিলে তালাকই কার্যকর করতে হবে। আর এটাই হবে 'আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' বাক্যটির প্রতিফলন। অর্থাৎ এভাবে বাস্তবায়িত তালাক সম্পর্কে তিনি শোনেন এবং জানেন।

আলেমগণ বলেছেন, এভাবে তালাক যদি কার্যকর নাই হয়, তবে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইলাকারীর প্রত্যাবর্তন বৈধ হবে। এরকম হলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ক্বেরাত হয়ে পড়বে অর্থহীন (তাঁর ক্বেরাতের অনুকূল অর্থ হচ্ছে চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে)। আবার আমরা যদি বলি, চার মাস পর ফিরিয়ে নেয়া সিদ্ধ হবে না বরং তালাক হয়ে পড়বে অনিবার্য— তবে বিষয়টি হয়ে যাবে ঐকমত্যবিরোধী। এরকম ঐকমত্যবিরুদ্ধ কথা কেউই বলেননি। এরকম ধারণা আয়াতের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ' কথাটির অর্থও হয়ে পড়ে বিসদৃশ। যেমন ইলা প্রত্যাখ্যান না করার পরিণামে যে ঝগড়া লড়াই ও বাকবিতন্ডা শুরু হয়— আল্লাহ্‌পাক তা শোনেন। যেমন তিনি শোনেন শয়তানের কুমন্ত্রণা। অথবা তিনি শোনেন ওই ইলার ঘোষণা যা প্রকৃত অর্থে তালাক— যা নির্ভর করে সম্ভোগবিহীন চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার উপর। আর তিনি সর্বজ্ঞ। তাই ইলাকারীর জুলুম সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এ রকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতটি হবে তিরস্কারসূচক।

এই বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিমতগুলোও পরস্পরবিরোধী। হজরত ওমর, ওসমান, আলী, জায়েদ বিন সাবেত, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাসের অভিমতানুসারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা। তবে শুধু মাত্র হজরত ওমরের একটি বর্ণনা এর ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমী অভিমতটি তালাকে রজয়ী সম্পর্কিত। ইসহাক থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন— ধারাবাহিক সুত্রে মুসলিম বিন শিহাব, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আবু বকর বিন আবদুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর বলেছেন, চার মাস পার হলে এক তালাক হবে। স্ত্রীর ইদ্দত পালনের সময়সীমার মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ণ

অধিকার রয়েছে স্বামীর। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন— আমার কাছ থেকে ধারাবাহিক সূত্রে মুয়াম্মার, আতা খোরাসানী, আবি সালমা বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান বিন আফ্ফান এবং হজরত জায়েদ বিন সাবেত ইলা সম্পর্কে বলতেন, চার মাস অতিক্রান্ত হলে এক তালাকই হবে। আর স্ত্রী তার প্রাণের অধিকতর অধিকারিনী এবং সে ইদ্দত পালন করবে তালাকপ্রাপ্তা রমণীর মতো। আব্দুর রাজ্জাক আরও বর্ণনা করেন, আমার নিকট থেকে ধারাবাহিক সূত্রে মুয়াম্মার ও কাতাদা বলেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলতেন, ইলা সম্পন্ন হওয়ার পর চার মাস চলে গেলে এক তালাক হয়েছে ধরে নিতে হবে। স্ত্রী তার আপন প্রাণের অধিকতর দাবীদার। সে তালাকপ্রাপ্তা নারীর মতো ইদ্দত পালন করবে। আব্দুর রাজ্জাক এও বর্ণনা করেছেন যে, আমার নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে মুয়াম্মার, ইবনে উয়াইনিয়া, আবী কিলাবা বর্ণনা করেছেন। আবী কিলাবা বলেন, হজরত নোমান তাঁর স্ত্রীর সাথে ইলা করেছিলেন। একদিন তিনি হজরত ইবনে মাসউদের পাশে বসে ছিলেন। তখন তাঁর উরুতে মৃদু করাঘাত করে হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিন্তু এক তালাক মনে করে নিবে। হজরত ইবনে আবি শাইবা বর্ণনা করেন, আমা থেকে ধারাবাহিকরূপে আবু মুয়াবিয়া, আয়মান, হাবিব, সাঈদ বিন জোবায়ের বর্ণনা করেন— হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, ইলা করার পর চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করলে তালাকে বায়েন হবে। আবার হজরত ওসমান, হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এর বিপরীত অভিমত প্রকাশ পেয়েছে যা ইমাম শাফেয়ীর মাজহাবের অনুকূল। অন্যান্য সাহাবা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। দারা কুতনী বলেছেন, আমার নিকট আবু বকর মায়মানী বলেছেন, আমি হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে আতা খোরাসানীর হাদিস শুনেছি। আতা খোরাসানী হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন হজরত ওসমান থেকে। হাদিসটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, আমি বুঝতে পারছি না বর্ণনাটি তাঁরই অভিমতের বিপরীত হলো কেনো? একজন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এর বর্ণনাকারী আসলে কে? তিনি বললেন, বর্ণনাসূত্র হলো এরকম— হাবীব বিন সাবেত, তাউস, হজরত ওসমান। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় জাফর বিন মোহাম্মদ— তাঁর পিতা— হজরত আলী— এ ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ইলা করে তবু তালাক হবে না— চার মাস অতিক্রান্ত হলেও। দেখতে হবে সে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করে, না তালাক দেয়। হজরত ইবনে ওমর থেকে সূত্রসহ বোখারী বর্ণনা করেছেন- হজরত ইবনে ওমর বলতেন, আল্লাহ্পাকের বক্তব্যানুযায়ী ইলার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওই নারী আর বৈধ থাকে না। তবে খুশী মনে তাকে রাখতে চাইলে রাখা যাবে, অন্যথায় তালাক দিতে হবে। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ এরকমই। ইসমাইল বিন তাউস- ইমাম মালেক- নাফে- হজরত ওমর-এই সনদে বোখারী বর্ণনা করেছেন, চার মাস অতিক্রান্ত হলেও তালাকের জন্য অপেক্ষা করা

উচিত। শাফেয়ী বলেছেন, আমি সুফিয়ান সওরী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি সুলায়মান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন— সুলায়মান বলেন, দশ এর অধিক সাহাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বলতেন, ইলাকারীদের জন্য প্রতীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। আমি বলি, এটা তাঁদেরই অভিমত; প্রতীক্ষা করাই যাঁদের সিদ্ধান্ত ছিলো। বাগবী বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন হজরত ওমর ও হজরত আবু দারদা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আমি হজরত ওসমান ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে যে বিবরণটির উল্লেখ করেছি, সেটি হজরত ওসমানের মাধ্যমে আহমদ কর্তৃক বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, আমাদের বিবরণটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর সূত্রপরম্পরা সুসংহত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনাসূত্রাধীন হাবীব পর্যন্ত কতিপয় বর্ণনাকারীর পরিচয় জানা যায় না। এটাও নিশ্চিত নয় যে, তাউস হজরত ওসমান থেকে হাদিস শুনেছেন। এদিকে হজরত আলী থেকে মোহাম্মদ বিন আলী কর্তৃক বর্ণনাটি মুরসাল। যেমন মুরসাল হজরত আলী থেকে কাতাদার বর্ণনা। অথচ তাঁরা দু'জনই ছিলেন সমবয়স্ক। আর আমরা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছি— সে সকল বর্ণনার বর্ণনাকারী থেকে অনেক হাদিস উদ্ধৃত করেছেন বোখারী ও মুসলিম। বাগবী বলেছেন, ইলায় প্রতীক্ষার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণকারী তাবেয়ীগণ হচ্ছেন সাঈদ বিন জোবায়ের, সুলায়মান বিন ইয়াসের এবং মুজাহিদ। আর এর বিপরীত মত পোষণকারীরা হচ্ছেন— সুফিয়ান সওরী, সাঈদ বিন মুসাইয়েব এবং জুহুরী। দু'টি দলই আবার বলেছেন, এক্ষেত্রে এটি তালাকে রজয়ী হবে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত যাঁদের অনুকূলে তাঁরা হচ্ছেন—আতা, জাবের বিন ইয়াজিদ, ইকরামা, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আবু বকর বিন আবদুর রহমান এবং মাকহুল। এরকম বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী, ইবনে হানাফিয়া, শা'বী, নাখয়ী, মাশরুক, হাসান, ইবনে সিরিন— কাবীসা এবং আবী সালমা থেকে। মোট কথা, আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য নিঃসন্দেহে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের অনুকূল। তবে ইমাম আবু হানিফার অভিমত অধিকতর উচ্চ অর্থসম্পন্ন। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা বলেছেন, কোরআনের প্রকাশ্য দিকটিকে প্রাধান্য দিতে হবে— একথা আসলে তাঁদের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। আর যারা ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য শ্রুতিনির্ভরতার অনুকূলে। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, এটাই হচ্ছে প্রাধান্য প্রদানের একটি সাধারণ নীতি।

এই বিষয়টির আলোচনায় আরো কিছু মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, কেউ যদি আল্লাহ্র শপথ ব্যতিরেকেই ইলা করে বসে, অর্থাৎ তালাক, গোলাম আযাদ অথবা কোনো সদকা বা ইবাদত নিজের উপর অবধারিত করে নেয়, তবে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ইলাকারী হবে কি না? যেমন বলে, যদি আমি এরূপ করি, তবে আমার ক্রীতদাস স্বাধীন। কিংবা আমার দায়িত্বে একটি হজ ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ রকম বক্তব্য দানকারী ইলাকারীগণের অন্তর্ভূত হবে। যদিও

তার ইচ্ছা থাকে কেবল স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া অথবা উদ্দেশ্য থাকে অপর কোনো কল্যাণের। যেমন, সে রোগাক্রান্ত হলো অথবা কোনো কল্যাণের ধারণায় নিজেই রোগী সেজে বসলো। ইমাম মালেক বলেছেন, এ রকম ব্যক্তি ইলাকারী নয়। সে ইলাকারী হবে তখনই, যখন সে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার মানসে শপথ করবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, শপথ ছাড়া স্ত্রীকে কেবল কষ্ট দেয়ার মানসে এরকম করলে সে ইলাকারী পর্যায়ভূত হবে। ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম বর্ণনানুযায়ী তিনি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল।

দ্বিতীয় মতবিরোধ হচ্ছে— কেউ যদি তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে শপথ ব্যতিরেকে রতিক্রিয়াসম্পর্ক ব্যতীতই চার মাস অতিবাহিত করে, তবে সে ইলাকারী বলে গণ্য হবে কি না? ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, সে ইলাকারীগণের মধ্যে গণ্য হবে। জমহুর ওলামা বলেছেন, হবে না।

তৃতীয় মতপার্থক্য হচ্ছে— ক্রীতদাসের ইলার সময়সীমা কতো? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, সময়সীমা চারমাস। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে- আয়াতটির সঙ্গে রয়েছে মানুষের স্বভাবসম্পৃক্ততা। আর রমণীরা স্বভাবতঃ স্বামীবিহীন অবস্থায় চারমাসের অধিক ধৈর্যধারণে অক্ষম। আর স্বভাবের দিক থেকে স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস সমপর্যায়ের। তাই ক্রীতদাসের সময়সীমাও স্বাধীন মানুষের অনুরূপ। যেমন নপুংশকদের সময়সীমা। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে, ক্রীতদাসের সময়সীমা স্বাধীন মানুষের সময়সীমার অর্ধেক। তবে ইমাম আবু হানিফার মতে এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে ক্রীতদাসী এবং ইমাম মালেকের মতে ক্রীতদাস। এই পার্থক্যটি সূচিত হয়েছে তাদের তালাক সম্পর্কিত অভিমতের পার্থক্যের দরুন।

চতুর্থ মতভিন্নতা হচ্ছে— কেউ রতিক্রিয়ায় সামর্থহীন হলে তার প্রতি প্রযোজ্য বিধান কেমন হবে? ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম ব্যক্তি কেবল মুখে বলবে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম। এরকম বললেই তার ইলা প্রত্যাহৃত হবে। তবে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি সে রতিক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তবে তার জন্য সম্ভোগ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সম্ভোগ ব্যতীত ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্ভবই নয়। কারণ, প্রবৃত্তিচরিতার্থতার জন্য সম্ভোগ অপরিহার্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৮

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ

بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

❒ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে তাহাদের পুনর্গ্রহণে তাহাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বলতে সকল প্রকারের তালাকপ্রাপ্তা রমণীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সে তালাক বায়েন হোক অথবা রজয়ী হোক। তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হোক অথবা গর্ভমুক্ত, সম্ভোগে ব্যবহৃতা হোক অথবা না হোক, ক্রীতদাসী হোক অথবা স্বাধীনা। তবে হাদিস ও এজমার মাধ্যমে ক্রীতদাসীকে এ আয়াতের বিধানের বাহিরে রাখা হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেন, ক্রীতদাসীদের বিধান হচ্ছে- দুই তালাক এবং তাদের ইদ্দত, দুই হায়েজ। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। পরবর্তী আয়াতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

গর্ভবতী রমণীদের ব্যাপারে 'ওয়া উয়ালাতুল আহ্‌মালি আযালু হুন্না'— এ আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে। অনুরূপ বিধান রহিত হয়েছে ওই সকল রমণীর ক্ষেত্রে, যারা সহবাসে ব্যবহৃতা হয়নি। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু ইজা নাকাহ্‌তুমুল মুয়্‌মিনাতি সুম্মা তাল্লাকতুমুহুন্না, মিন কাব্‌লি আন্‌তামুসসুহুন্না, ফামালাকুম আলাইহিন্না মিন ইদ্দাত।'

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কালের প্রতীক্ষায় থাকবে— এ কথার মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তাদেরকে প্রতীক্ষার অন্তরাল গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই প্রতীক্ষা তাদের আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত করে। তাদের এই প্রতীক্ষার সময়সীমা হবে তিন ঋতুস্রাব কাল। এই সময়সীমা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুরু' শব্দটি। শব্দটি বিপরিতার্থক এবং বহু অর্থবোধক। ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরু অর্থ হায়েজ ও তুহুর উভয়টি হয়। তুহুর অর্থ দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্রাবস্থা। হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে ওমর এবং জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা মতে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন কুরু অর্থ তুহুর। হজরত ইবনে ওমর তাঁর স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হজরত ওমর বিষয়টি রসুল স. এর

গোচরীভূত করলেন। তিনি স. ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এখনই তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া উচিৎ। সে হায়েজ থেকে পবিত্র হবার পূর্বেই। পুনরায় হায়েজগ্রস্তা হবে এবং পুনরায় পবিত্র হবে। তারপর যদি তালাকের দৃঢ় সংকল্প হয় তবেই তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তুহুর অবস্থায় যেনো তালাক দিয়ে দেয়। আর এই সময়সীমা হলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশিত তালাক প্রদানের সময়সীমা। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনারা রমণীদেরকে তালাক দিলে তাদের ইদ্দতের মধ্যে দিয়ে দিন। এই ইদ্দতের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, ইদ্দতের সময়ে তালাক দিয়ে দেয়া। বর্ণিত হাদিসে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইদ্দত হচ্ছে তুহুর— যে সময় স্ত্রীকে স্পর্শ করা হয়নি। কাজেই এখানে একথাটি স্পষ্ট যে, কুরু অর্থ তুহুর। ইমাম শাফেয়ীর এই সিদ্ধান্তের জবাবে আমরা বলি, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদিসের ইদ্দত, তালাকের পর প্রতিপালনীয় ওয়াজিব ইদ্দত নয় বরং এই ইদ্দত অর্থ তালাক প্রদানের সময়।

ইমাম শাফেয়ী আরেকটি যুক্তি দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছেন— তা হচ্ছে আরবী ভাষায় সাংখ্যক যদি পুঃলিঙ্গ হয় তবে দুই থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা তার বিপরীত স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। আর সাংখ্যক স্ত্রীলিঙ্গ হলে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় পুংলিঙ্গে। ব্যাকরণবিদগণের এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনে লিপিবদ্ধ 'সালাসাতু' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় এর সাংখ্যক কুরু অবশ্যই পুঃলিঙ্গ অর্থে ধরতে হবে। আর কুরু শব্দটির দুইটি অর্থে তুহুর হলো পুঃলিঙ্গ এবং হায়েজ স্ত্রীলিঙ্গ। কাজেই সমাধানে তুহুরই গ্রহণযোগ্য। এই যুক্তিটিকে আমরা অচল মনে করি। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আরবীতে 'বুর' এবং 'হিন্তাহ্' অর্থ গম। বুর পুঃলিঙ্গ এবং হিন্তাহ্ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু তাই বলে কী একই বস্তুর (গমের) দু'টি পৃথক লিঙ্গ হয়? বরং বলা যেতে পারে যে, হিন্তাতুন স্ত্রীলিঙ্গবোধক— 'তা' চিহ্নটি বাস্তবে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন নয়। চিহ্নটি অতিরিক্ত সংযোজন আর এরকম অতিরিক্ত সংযোজনের দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় বহুল পরিমানে বিদ্যমান।

ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন কুরু অর্থ হায়েজ। এই অভিমতের প্রমাণস্বরূপ পাঁচটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো। ১. হজরত ইবনে ওমরের হাদিস যা দলিল হিসাবে পেশ করেছেন ইমাম শাফেয়ী। হজরত ইবনে ওমরের ক্বেরাত একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ। ২. ছালাছা অর্থ তিন— এটি একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা। এই সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি গ্রাহ্য নয়। দলিল প্রমাণ ইজমার ধারায় তালাক প্রদানের পদ্ধতি হচ্ছে- তালাক প্রদান করতে হবে তুহুর অবস্থায় (পবিত্রাবস্থায়)। তবে তুহুর অবস্থায় তালাক প্রদানের পর ছালাছাতা কুরুর (তিন হায়েজ) গণনা করতে হবে। তখন দেখা যাবে তালাক প্রদানের সময় তুহুরের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়েছে এবং কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং ইদ্দত গণনা করতে গেলে পুরো তুহুর অবস্থাটি গণনায় আসছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে তিনটি পূর্ণ তুহুর হচ্ছে না, হচ্ছে দুই পূর্ণ তুহুর ও

এক তুহুরের কিয়দংশ। অথবা পুরো তিন তুহুর ও এক তুহুরের কিয়দংশ। অথচ কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে ছালাছাতা কুরু (তিন কুরু)। সুতরাং কুরু শব্দের অর্থ তুহুর হবে কীরূপে? পক্ষান্তরে কুরু অর্থ হায়েজ বললে বিধিমতো তুহুর অবস্থায় তালাক প্রদানের পর একে একে তিনটি হায়েজ পুরোপুরি গণনা করা সম্ভব। ৩. তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে— রসুল স. বলেছেন, ক্রীতদাসীদের তালাক দুইটি এবং তাদের ইদ্দত দুই হায়েজ। তাছাড়া এজমার রীতিতে স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীর ইদ্দত পালনে কোনো বৈপরিত্য নেই। শুধু তিন হায়েজ ও দুই হায়েজের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ তিন হায়েজ এবং পূর্ণ দুই হায়েজ। অতএব বিষয়টি পরিষ্কার যে, ইদ্দত গণনার ভিত্তি হবে হায়েজ। ৪. গর্ভমুক্ত করাই ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্য। আর গর্ভমুক্তি হায়েজের মাধ্যমেই হয়। তুহুরের মাধ্যমে হয় না। তাই কুরু শব্দের অর্থ হায়েজ গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত। ৫. যে সকল সাহাবা আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি তাঁরা হচ্ছেন, হজরত খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কাব, মুআজ বিন জাবাল, আবু দারদা, উবাদা বিন সামেত, জায়েদ বিন সাবেত এবং আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। মাবাদ জুহনীকেও এই তালিকাভুক্ত করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূল তাবেয়ীগণ হচ্ছেন— সাঈদ বিন মুসাইয়েব, ইবনে জুবায়ের, আতা, তাউস, মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা, জুহাক, হাসান বসরী, মুকাতিল, শরিফুল কাযী, সওরী, আওযায়ী, ইবনে শুবরামা, রবিহা, সুদ্দী, আবু উবায়দা, এবং ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন। পরবর্তীতে ইমাম আহমদ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি ঈসা বিন আবি ঈসা, খাইতাত, সাঈবী— এ সূত্রে তেরো জন সাহাবার মাধ্যমে রসুল স. এর এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে দেখেছি। বর্ণনাকারীগণ সকলেই বলতেন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হকই সর্বাধিক। তাই স্ত্রী যেনো তৃতীয় হায়েজ থেকে গোসল করে নেয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়'—এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, ইদ্দত পূরণ করতে হবে যথানিয়মে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। রজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর দাবী বাতিলের লক্ষ্যে গর্ভাবস্থা গোপন করা যাবে না এবং হায়েজকেও গোপন করা যাবে না। এখানে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, এই সকল বিষয়ে রমণীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য। আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে'— একথা বলার কারণ এই যে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তারা সত্য গোপন করে না। কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় না। এভাবে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে রমণীদেরকে বিশ্বাসভাজনহীনা হওয়া থেকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে।

'যদি তারা আপোষনিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাতে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার'— এখানে আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে কী করতে হবে

তা বলা হয়েছে। আয়াতে আপোষনিষ্পত্তিকামী স্বামীদেরকে বলা হয়েছে 'বুয়ুল'। শব্দটি 'বায়াল' শব্দের বহুবচন। এখানে শব্দটি বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বায়াল অর্থ প্রভূ বা নেতা। আর স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর কার্যনির্বাহক বা নেতা। তাই আরবী ভাষায় স্বামীকে বায়াল বলা হয়। এখানে 'হুন্না' সর্বনামটি রজয়ী তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত (যে তালাকের পর ইদ্দত পালনাবস্থায় স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায় সেই তালাকের নাম তালাকে রজয়ী)। 'তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার'— একথার অর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকারটি সর্বোচ্চ। তাই তালাকে রজয়ীর ইদ্দতের সময় স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে— এতে স্ত্রীর স্বীকৃতি থাকুক অথবা নাই থাকুক।

তালাকে রজয়ীর ইদ্দতকালে স্বামী তার স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে একথা ঠিক; কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকতে হবে মহৎ। থাকতে হবে আপোষনিষ্পত্তি ও সংশোধনের মনোভাব। উৎপীড়ন করাই ছিলো মূর্খতা যুগের রীতি। কেউ কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিতো ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে। আবার তাকে গ্রহণ করতো। আবার তালাক দিতো, আবার ফিরিয়ে নিতো- এভাবে উৎপীড়ন চালাতো তারা। এ আয়াতের মাধ্যমে মূর্খতার যুগের ওই কদর্য আচরণের বিরোধীতা করা হয়েছে। পুনঃগ্রহণকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, পুনঃগ্রহণের উদ্দেশ্য থাকতে হবে মহৎ— আপোষমীমাংসা ও সম্প্রীতি।

রজয়ী তালাকের ইদ্দতাবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে— এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে ইদ্দতকালে সম্ভোগ সিদ্ধ হবে কি না সে সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের সর্বাধিক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে সম্ভোগ সিদ্ধ। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের সিদ্ধান্ত ইমাম শাফেয়ীর অনুরূপ। শাফেয়ী বলেছেন, তালাক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তালাকই হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অন্তরায়। আমরা বলি, রজয়ী তালাক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অন্তরায় নয়। এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতকালে তালাক কার্যকর থাকে না। তাদের সম্পর্ক তখন পুরোপুরি ছিন্ন হয় না। তখনও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খোরপোষ ওয়াজিব থাকে এবং সে স্ত্রীর স্বীকৃতি ব্যতীতই তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। সুতরাং এ কথাটি স্পষ্ট যে, ইদ্দতের সময় বিবাহবন্ধন অটুটই থাকে। আল্লাহ্পাকের বক্তব্যে সে কথাই প্রমাণিত হয়। তাই আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার।'

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে 'বি রদ্দিহিন্না'— এখানে 'রদ' শব্দটি প্রমাণ করে যে, সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন আর নেই। আমরা বলি, রদ শব্দটির রূপক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। রূপক অর্থে 'রদ' শব্দের অর্থ হতে পারে এখতিয়ার (অবকাশ)। আর রদ অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। এই ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হতে পারে এরকম— স্বামী তার স্ত্রীকে পূর্বাস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার হকদার। এ সকল ব্যাখ্যার পরেও যদি আপত্তি থাকে তবে 'ইমসাক বি মারূফ' এবং 'আমসিকু

হুন্না বি মারূফ' আয়াত দু'টিতো রয়েছেই। 'ইমসাক বি মারুফ' অর্থ সুন্দরভাবে আবদ্ধ রাখা। 'আমসিকু হুন্না বি মারুফ' অর্থ তাদেরকে বেঁধে রাখো সুন্দর রূপে। এক্ষেত্রে বিবাহের কার্যকারিতা অবশিষ্ট না থাকলে আয়াত দু'টির নির্দেশ এরকম হতো না।

আর একটি বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, সে বিষয়টি হচ্ছে— স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় কিছু বলতে হবে কি না? ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বলতে হবে। তাঁর একথা বলার অর্থ হচ্ছে— তিনি মনে করেন এটি হচ্ছে পুনঃবিবাহ। ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন, স্বামী রজয়াতের অধীনা স্ত্রীকে সম্ভোগ করলে, চুম্বন করলে, কামতাড়নাসহ স্পর্শ করলে অথবা কামুক দৃষ্টিতে গোপণ স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলেই ফিরিয়ে নেয়া হয়ে যাবে। তাদের মতে রজায়া নূতন বিবাহের মতো কিছু নয়। বরং এটা প্রথম বিবাহেরই ধারাবাহিকতা। তাই ধারাবাহিকতাটি অক্ষুণ্ন রাখতে এমন ক্রিয়াকলাপই যথেষ্ট যাতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বাবস্থাই বহাল রয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে— রতিক্রিয়ার সময় রজায়াতের নিয়ত করলেই রজায়াত হবে, অন্যথায় হবে না।

রজায়াতের সময় সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে কি না— সে সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, সাক্ষী উপস্থিত রাখা শর্ত। অপর দল বলেছেন শর্ত নয়। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মতে সাক্ষী উপস্থিত রাখা শর্ত। যেহেতু সুরা তালাকে বর্ণিত হয়েছে 'আর তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়নিষ্ঠ দুজন সাক্ষী রেখে নিও'। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অপর এক বিশুদ্ধ বক্তব্যানুসারে সাক্ষী উপস্থিত রাখা শর্ত নয়। ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। সুরা তালাকের আয়াতে, সাক্ষী উপস্থিত করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে নির্দেশটি আসলে মোস্তাহাব প্রকৃতির। কারণ, রজায়াতের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা যদি ওয়াজিব হতো, তবে তালাকের সময়ও সাক্ষী থাকা জরুরী হতো— যা সম্পৃক্ত থাকতো 'ফারিকুহুন্না বিমারুফ' নির্দেশটির সঙ্গে। কিন্তু এরকম কথা কেউই বলেননি। কাজেই রজায়াতকালে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়।

'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের'- এ কথার অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি রয়েছে উভয়ের অধিকার। কিন্তু যেহেতু নারী পুরুষ নয় এবং পুরুষ নারী নয় তাই তাদের পারস্পরিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা।

ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্থ শরিয়তসম্মত অধিকার। এই অধিকার প্রতিফলিত হতে হবে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে। প্রাত্যহিক সংসার কর্মে রক্ষা করতে হবে পারস্পরিক মর্যাদা ও শিষ্টাচার। মনে রাখতে হবে দাম্পত্য জীবনই সম্প্রীতি ও ভালোবাসার প্রকৃত ভিত্তি। পারস্পরিক তুষ্টি সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে দু'জনকেই। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার স্ত্রী আমার মনঃতুষ্টির জন্য যেমন প্রসাধন ব্যবহার করেন, আমিও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য তেমনই সৌন্দর্য চর্চা করতে ইচ্ছা

করি। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, স্ত্রীদের জন্য তেমনি, যেমন তাদের যোগ্য; নীতিগতভাবে। হজরত মুয়াবিয়া কুসাইরিয়া রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে প্রিয়তম নবী! আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কী রকম? তিনি স. বললেন, যখন তোমরা আহার করবে তখন তাদেরকেও আহার করাবে। যখন পরিধান করবে তখন তাদেরকেও পরিধান করতে দিবে। তাদের মুখমন্ডলে প্রহার করবে না। তাদেরকে মন্দ বলবে না এবং লাঞ্ছনা দিবে না। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ তাঁর পিতা, তিনি হজরত জাবেদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূল স. বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্পাকের তত্ত্বাবধানে আপন অধিকারে গ্রহণ করেছো। আল্লাহ্র বিধানানুসারেই তাদের লজ্জাস্থান তোমাদের জন্য হয়েছে হালাল। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হচ্ছে —তারা তোমাদের শয্যায় অন্য কাউকে স্থান দিবে না। যদি এমন করে, তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার কোরো। কিন্তু সীমাতিক্রম কোরো না। আর তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, নীতিগতভাবে তোমরা তাদেরকে ভরণ পোষণ দান করবে। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স.বলেন, সৎচরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পূর্ণ ইমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে তার সহধর্মিনীর সঙ্গে সৎভাবে বসবাস করে। এই হাদিসের বর্ণনাকারী তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান, বিশুদ্ধ। হজরত আয়েশা থেকেও তিনি অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন জাম'আ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, যেমন তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসকে প্রহার করো তেমন করে পত্নীদেরকে প্রহার কোরো না। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. বলেন— তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমিই পরিবার পরিজনের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করি। তিরমিজি, দারেমী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজাও এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, পত্মীদের প্রতি সদাচার সম্পর্কিত আমার উপদেশ স্মরণে রেখো। রমণীরা পাঁজরের অস্থি থেকে পরিগঠিত। এই অস্থি উর্ধ্বমুখী বক্রতা বিশিষ্ট। সেই বক্রতা সরল করতে চাইলে ভেঙে যাবে। আবার চেষ্টা ছেড়ে দিলে বক্রই থাকবে। কাজেই তাদের সম্পর্কে আমার উপদেশের কথা স্মরণে রেখো।

'কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে'— এ কথার অর্থ পুরুষেরা রমণীর তুলনায় কিছুটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। রসুল স. এরশাদ করেন, আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে ললনাকুলকে বলতাম, তারা যেনো তাদের স্বামীগণকে সেজদা করে। আল্লাহ্পাক পুরুষদের জন্য যে মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই মর্যাদা প্রকাশার্থেই আমি ওরকম বলতাম। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত কায়েস বিন সায়াদ থেকে আবু দাউদ, হজরত

মুআজ বিন জাবাল থেকে আহমদ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি। হজরত আবু জুরইয়ান এবং হজরত উম্মে সালমা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— — রসুল স. বলেন, মৃত্যুকালে যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন থাকে সে স্ত্রী অবশ্যই জান্নাতিনী। তিরমিজি। হজরত তালক বিন আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে আহবান করলে স্ত্রী যেনো তৎক্ষণাৎ সে আহবানে সাড়া দেয়। উনুনে রান্না চড়ানো থাকলেও। তিরমিজি।

'আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' অর্থাৎ পারস্পরিক হক বিনষ্টকারীদের প্রতি তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, তাই শরিয়তের বিধান অবতীর্ণ করেছেন যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গতরূপে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৯, ২৩০

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

❒ এই তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে; যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং

তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। এইসব আল্লাহের সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা এইসব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই জালিম।

❒ অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে। তারপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে যদি মনে করে যে, তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহের সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

'আত্তালাকু মাররতান' অর্থাৎ এই (রজয়ী) তালাক দুইবার। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে তো দু'টি তালাকের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়টি ? তিনি স. বললেন, তৃতীয়টি হচ্ছে 'তাসরীহ্ বি ইহসান' (সৎভাবে বিদায় দান)। ইবনে মারদুবিয়া ইবনে রজীম আসাদী থেকে বর্ণনাটি এনেছেন এবং এটিকে উল্লেখ করেছেন আবু দাউদ তাঁর নাসিখ গ্রন্থে এবং সাঈদ বিন মানসুর তাঁর সুনান পুস্তকে। বাগবী বলেছেন, হজরত উরওয়া বিন জোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের প্রথম দিকে লোকেরা যখন তখন স্ত্রীকে তালাক দিতো। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে রজায়াত করতো। পুনরায় তালাক দিতো। পুনরায় রজায়াত করতো। এভাবে স্ত্রীকে কষ্ট দিতো তারা। পরিস্থিতি যখন এ রকম— তখনই অবতীর্ণ হলো, 'আত্তালাকু মাররতান' তালাক দুইবার (যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়)। লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্পাক বলেছেন, তালাক দুইবার। এরকম বলেননি যে, তালাক দুই প্রকার। এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একযোগে দুই তালাক প্রদান করা মাকরূহ। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এ কথাটিকেই প্রমাণ করে। একসাথে দুই তালাক গ্রাহ্য হবে না। যদি এ রকমই হয়, তবে তৃতীয় তালাকের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তালাক দিতে হবে—একটি একটি করে। ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা যেতে পারে, তালাককে শরিয়তসম্মত করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন তুহুরে (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্র অবস্থায়) পর্যায়ক্রমে দু'টি তালাক প্রদান করতে হবে। এক সাথে দুই তালাক দেয়া যাবে না। এখানে 'মার্‌রতান' শব্দটিকে কেবল দ্বিবচন মনে করলে হবে না, মনে করতে হবে একের পর এক- এভাবে দুইবার। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'সুম্মার জিয়েল বাছারা কার্‌রকতাইন ' (অতঃপর দৃষ্টি ফেরাও দু'বার) একথার অর্থ দৃষ্টি ফেরাও একবার। তারপর আরেকবার— এভাবেই দুইবার। এখানে দু'টি দৃষ্টিপাতই হতে হবে পৃথক পৃথক সময়ে; একই সময়ে নয় (আর একই সময়ে তো দু'বার দৃষ্টিপাত করা সম্ভবই নয়)। সুতরাং দু'টি দৃষ্টিপাতকেই হতে হবে পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা জটিলতাও রয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে 'ফাইম সাক বি মারূফ'

বাক্যটিকে সম্পৃক্ত করা দূরূহ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি 'ফা ইনতাল্লাকাহাফালা তাহিল্লুলাহু' বাক্যটিকেও এ সম্পর্কিত আলোচনায় আনা যায় না। বর্ণিত ব্যাখাগুলোকে সম্মিলিতভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়— দুই তালাক বা তিন তালাক এক বাক্যে বা পৃথক পৃথক বাক্যে একই তুহুরে একই সাথে প্রদান করা হারাম বা বেদাত— যা শক্ত গোনাহ্। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম করলে দোষ নেই। কিন্তু অন্য সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে— তোমাকে তিন তালাক দিলাম— তবে তিন তালাকই কার্যকর হবে।

ইমামীয়া সম্প্রদায় বলে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়, তবে আয়াতের বক্তব্যানুযায়ী এক তালাকও হবে না। হাম্বলী মাজহাবের কতিপয় অনুসারীদের মতে, এ রকম করলে একটি তালাক হবে। যেহেতু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবু সুহবান হজরত ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেন, আপনার কি স্মরণ নেই রসুল স. হজরত আবু বকরের সময়ে ও হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম দুই বছরে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, অবশ্যই মানুষ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়া করেছিলো যেখানে বিলম্ব করাই ছিলো শ্রেয়। আপনি যদি ওই নিয়ম পুনঃপ্রচলন করতে পারেন তবে করুন। ইকরামার মাধ্যমে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- হজরত ইবনে আববাস বলেছেন, রুকানা বিন আবদ তাঁর বিবিকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলেন। পরে তিনি এ জন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন। রসুল স. তাঁকে বললেন, কীভাবে তালাক দিয়েছো তুমি? তিনি বললেন, হে অনুকম্পার নবী! আমি এক বৈঠকেই তিন তালাক দিয়েছি। তিনি স. বললেন, তবে তো তুমি একটি তালাকই দিয়েছো। সুতরাং রজায়াত করতে পারবে (ফিরিয়ে নিতে পারবে)। তাউস ও ইকরামা বলেছেন, যারা তিন তালাক দিয়েছে তারা সুন্নতবিরোধী কাজ করেছে। কাজেই সুন্নতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তাদের কর্তব্য। ইবনে ইসহাকও এ রকম বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সহবাসে ব্যবহৃতাদেরকে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে। আর সম্ভোগ করা হয়নি এরকম স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে হবে এক তালাক। কারণ মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ উল্লেখ করেছেন- আবু সুহবান হজরত ইবনে আব্বাসকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। একদিন তিনি বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই কেউ এক সঙ্গে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সাহাবায়ে কেরাম তাকে এক তালাক বলে ধরে নিতেন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, না সে রকম নয় বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে কেউ যদি তার স্ত্রীকে সম্ভোগের পূর্বেই এক সঙ্গে তিন তালাক দিতো, তবে রসুল স.ও হজরত আবু বকরের যুগে এবং হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম দিকে, এক তালাক ধরে নেয়া হতো। কিন্তু যখন দেখা গেলো অধিকাংশ লোকই ওই রকম করতে শুরু করেছে তখন সকলে বললেন, ওই লোকগুলোর খামখেয়ালীপনা থেকে নারী সম্প্রদায়কে রক্ষা করা উচিত।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একটি বাক্যের মাধ্যমে একাধিক তালাক দেয়া সিদ্ধ। আর এ রকম করলে কোনো দোষও হবে না। সহল বিন আসআদ এর সনদে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হাদিসটি তাঁর দলিল— যেখানে বলা হয়েছে, হজরত উয়াইমির আবালী নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে 'লেয়ান' করেছিলেন। স্বামী স্ত্রীর উভয়ের লেয়ান সমাপ্ত হওয়ার পর হজরত উয়াইমির রসুল স.কে জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি যদি ওই স্ত্রীলোকটিকে আমার নিকটে রাখি তবে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিতে চাই। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাকে তিন তালাক। এতে রসুল স. নিষেধ করেননি। আবার ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন,আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলো। তখন রসুল স. আমার খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি। বাসস্থানের ব্যবস্থাও করে দেননি। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। হজরত হাসান বিন আলীও তাঁর এক পত্মীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন।

আমরা বলি, একসঙ্গে তিন তালাক বললে তিন তালাকই হবে। কিন্তু তালাকদাতা গোনাহ্‌গার হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে এই— হজরত ইবনে ওমর তাঁর এক ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। পরবর্তী দুই ঋতুর সময় আরো দুই তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিলো তাঁর। বিষয়টি রসুল স. এর গোচারীভূত হলে তিনি বললেন, কী ব্যাপার, আল্লাহ্‌পাক কি তোমাকে এমন করার আদেশ দিয়েছেন? তুমি তোমার নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করেছো। সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে তাকে পবিত্রাবস্থায় আসতে দাও। তারপর প্রতিটি হায়েজের পরে একটি একটি করে তালাক দাও। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি রসুল স. এর নির্দেশানুযায়ী রজয়াত করলাম। রসুল স. বললেন, যখন সে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাকে হয় তালাক দিও অথবা রেখে দিও। হজরত ইবনে ওমর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! যদি আমি তাকে এক সাথে তিন তালাক দেই তবে কি ঠিক হবে? তিনি স. বললেন, না। এ রকম করলে সে তো বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হবেই। তুমিও হবে গোনাহ্‌গার। দারা কুতনী এবং ইবনে আবি শায়বা এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইবনে হাসান থেকে। হাসান বলেছেন, আমি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছি। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আতা খোরাসানীর সংশ্লিষ্টতার কারণে হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন বায়হাকী। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতার বর্ণনা এমনই অতিরঞ্জিত যে, অপর বর্ণনাকারীদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাওয়া ভার। আর তিনি নিজেও একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তাই তাঁর একক বর্ণনা গ্রাহ্য নয়। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, আতা সম্পর্কে বায়হাকীর মন্তব্য অগ্রাহ্য। কারণ, আতার সনদ ও মতনের অনুসরণ করেছেন সুয়াইব বিন রুজাইফ— যা তিবরানীও উদ্ধৃত করেছেন। আর হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসেও এ তথ্যটির উল্লেখ রয়েছে যে, নিয়মটি মনসুখ বা রহিত। যেহেতু বহুসংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে হজরত ওমরের তিন তালাকের প্রচলন এবং তা কার্যকর করাই প্রমাণ করে যে, নিয়মটি নাসেখ বা রহিতকারী। তাঁর

পূর্বের খলিফা হজরত আবু বকরের যুগেও বিষয়টি ছিলো সন্দেহপূর্ণ। এদিকে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বিপরীতে তাঁর নিজেরই ফতোয়া বিদ্যমান। আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- মুজাহিদ বলেছেন, আমি হজরত ইবনে আব্বাসের পাশে ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি আমার বিবিকে তিন তালাক দিয়েছি। একথা শুনে হজরত ইবনে আব্বাস চুপ করে রইলেন। তাঁকে দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকতে দেখে আমার মনে হলো সম্ভবত তিনি তালাক ফিরিয়ে দেবেন। এমন সময় তিনি বললেন, তোমরা বোকার স্বর্গে আরোহণ করো আর বলো, হে ইবনে আব্বাস এই হয়েছে, সেই হয়েছে। তোমরাতো আল্লাহ্কে ভয় করো না।। অথচ আল্লাহ্পাক বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্পাক তাদের জন্য একটা সুরাহা করেই দেন। তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে নাফরমানী করছো আর তোমাদের বিবিরা বায়েন তালাক হয়ে যাচ্ছে। আল্লামা ত্বাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে, এক লোক তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস তাকে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করো। আর তোমাদের বিবিরা বায়েন তালাক হয়ে যায়। তোমরা আল্লাহ্পাককে ভয় করো না বলেই আল্লাহ্পাক তোমাদের সমস্যার সমাধান করেন না। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন, এক লোক হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে এসে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে একশ' তালাক দিয়েছি। এখন আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তোমার দিক থেকে তালাক হয়েছে তিনটি। বাকী সপ্তানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহ্র কালামের প্রতি বিদ্রুপ করেছো।

তিন তালাকের সমাধানের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐকমত্য সুপ্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ফকিহগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন, এক লোক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকটে এসে বললো,আমি আমার স্ত্রীকে আটটি তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, আলেমগণ তোমাকে কী বলেছে? লোকটি বললো তাঁরা বলেছেন, তালাকে বায়েন হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, তাঁরা ঠিকই বলেছেন। একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি ঐকমত্যসম্ভূত। আলকামা থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ইবনে মাসউদের নিকট হাজির হয়ে বললো, আমি আমার পত্নীকে নিরানব্বই তালাক দিয়েছি। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার দেয়া মাত্র তিনটি তালাকই তাকে বায়েন করেছে। আর অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার নাফরমানির চিহ্ন। মোহাম্মদ বিন আজাফ বিন বুকাইর বলেছেন, এক ব্যক্তি সম্ভোগের পূর্বেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলো। পুনরায় তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু এভাবে বিয়ে করা যাবে কি না তা জানার জন্য সে বিজ্ঞ কোনো সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করলো। আমিও চললাম তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমেই সে হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু হোরায়রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তাঁরা জানালেন, ওই মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হওয়ার আগে তুমি আর তাকে বিয়ে

করতে পারবে না। সে বললো, আমিতো তাকে একবারে তিন তালাক দিয়েছি। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার নিকট যা ছিলো তার সবই তো তুমি দিয়ে দিয়েছো। ইমাম মালেকের মুয়াত্তায় হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম বর্ণনা রয়েছে। ইমাম তকি, আমাশ থেকে তিনি হাবিব বিন সামেদ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত আলীর কাছে গিয়ে বললো, আমার স্ত্রীকে আমি এক হাজার তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, ভালোই করেছো। হাজারের মধ্যে তিনটি দ্বারাই তোমার স্ত্রী বায়েন হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্টগুলো তোমার অন্য স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দাও। মুয়াবিয়া বিন আবি ইয়াহ্ইয়া থেকে তকি বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওসমানের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি তো আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছি। এখন শরিয়তের বিধানে কী বলে? তিনি বললেন, মাত্র তিনটি তালাকের মাধ্যমেই সে তোমার নিকট থেকে বায়েন সূত্রে পৃথক হয়েছে।

হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন— তাঁর পিতা তাঁর এক স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিলেন। হজরত উবাদা ঘটনাটি রসুল স. এর গোচরীভূত করলেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে নাফরমানি করা সত্ত্বেও মহিলাটি তিন তালাকের মাধ্যমে বায়েনা হয়েছে। অবশিষ্ট নয়শ' সাতানব্বইটি তালাক দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে জুলুম ও অবাধ্যতা। আল্লাহ্পাক এর জন্য শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, অন্য লোকের সঙ্গে ওই মহিলাটির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। একবারে তিন তালাক প্রদাতা কাউকে পেলে হজরত ওমর তার পিঠে চাবুক মারতেন। হজরত আনাস হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার পর তালাক দিলে হজরত ওমর বলতেন, অন্য কেউ মেয়েটিকে বিয়ে করে পুনঃতালাক না দেওয়া পর্যন্ত মেয়েটি প্রথম জনের জন্য হালাল নয়। প্রতিপক্ষগণের বর্ণিত হাদিসের জবাবে বলতে হয় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা। তখন একটি তালাকের কথায় তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক এইভাবে বলা হতো। গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এ রকম বলা হতো। এই নিয়মটিকেই পরে লোকেরা তিন তালাক প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করে। তখন বিধান দাতাও এরকম করলে তিন তালাকের সিদ্ধান্ত দান করেন। অথবা কেবল সাবধানতা বশতঃই এ রকম বিধান চালু করা হয়েছে। আর রুককানার হাদিস মুনকার (পরিত্যক্ত)। তবে তার হাদিসটিকে এভাবে নিষিদ্ধ বলে মেনে নেয়া যেতে পারে যে— আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেন, রুককানা তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু রসুল স. বলেছেন, তাঁর ইচ্ছে ছিলো এক তালাকের। তাই রসুল স. তাঁর স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে বলেছিলেন। পরে রুককানা হজরত ওমরের যুগে দ্বিতীয় তালাক দিয়েছিলেন এবং তৃতীয় তালাক দিয়েছিলেন হজরত ওসমানের যুগে। আবু দাউদ বলেছেন, এই বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ।

আলোচ্য মাসআলা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস এবং সাহাবাগণের আসারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি পাপ কর্ম ও বেদাত। শাফেয়ী উল্লেখ করেছেন, লিয়ান করার পর উয়াইমির তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। যদি তাই হয় তবে তাঁর নিজের উক্তি তাঁর বিরুদ্ধেই এভাবে দলিল হয়ে যাবে যে, রসুল স. তাঁকে নিষেধ করেননি। আর নিষেধ না করার উপর সাক্ষী বিদ্যমান। আবার অপর একটি ঘটনায় দেখা যায়, রসুল স. নিষেধ করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে— হয়তো তিনি স. নিষেধ করেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারী ভুল করে সে কথা উল্লেখ করেননি। অথবা এ রকমও হতে পারে যে, তিনি নিষেধই করেন নি। কারণ, লিয়ান করার পর তালাকের অবকাশ আর থাকে না। আর তিন তালাকের উল্লেখ সম্বলিত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, তার স্বামী তাকে তালাকে বায়েন দিয়েছিলো। তালাক দেয়ার সময় তার স্বামী কোনো এক সেনাদলে ছিলো। সামনাসামনি তালাক না দেয়ার কারণে তার স্ত্রী, প্রদত্ত তালাকের কথা হুবহু শুনতে পায়নি। অন্যদের মাধ্যমে জানা গিয়েছিলো তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিলো। উপরন্তু হজরত ওমর ফাতেমা বিনতে কায়েসের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, আমি জানি না মহিলাটি সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। বিষয়টি কি তার স্মরণে আছে? নাকি সে বিস্মৃত হয়েছে। এদিকে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হজরত হাসানের 'আসার' মারফু হাদিসের সমান্তরাল হিসেবেও গণ্য করা যায় না।

মাসআলাঃ তিন তালাক এক সাথে দেয়া হারাম ও বেদাত। প্রতি তুহুরে এক তালাক প্রদান করা 'ফাইন তাল্লাকাহা' আয়াত অনুসারে জায়েয ও মোবাহ্। তবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়া ব্যতীত গত্যন্তর না থাকে, তবে এক তালাকে রজয়ী প্রদান করে ছেড়ে দেবে। যদি ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা না থাকে তবে ইদ্দত শেষে বায়েন হয়ে যাবে। মোবাহ কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহ্পাকের নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে তালাক। তাই উত্তম পন্থায় একটি তালাক প্রদান করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। জাদুর অপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, তারা তাদের নিকট থেকে শিখতো ওই জ্ঞান যা, বিভেদ সৃষ্টি করতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি একটি অতি নিকৃষ্ট কর্ম।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, ইবলিস পানির উপর সিংহাসন পেতে বসে। তারপর তার লোকদেরকে পাঠিয়ে দেয় মানুষের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে সেই শয়তানই ইবলিসের প্রিয়ভাজন হয়, যে অধিক পরিমাণে অনাসৃষ্টি ঘটাতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বলে, আমি অনেকগুলো অপকীর্তি করেছি। ইবলিস তখন বলে, তুমি কিছুই করতে পারোনি। কেউ যদি বলে, আমি এক দম্পতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছি। ইবলিস তখন বলে,

হ্যাঁ। তুমি একটা কাজের মতো কাজ করেছো। হজরত আনাস বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে হজরত জাবের একথাও বলেছেন যে, ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বৈধ বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্পাকের নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে তালাক। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। ইমামিয়া সম্প্রদায় বলে, হবে না। আমরা বলি, তালাক হবে কিন্তু এ রকম কাজ হারাম। তবে এতে রজায়াত করা ওয়াজিব। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমরের হাদিসে তালাক হওয়া, হারাম হওয়া ও রজায়াত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

কেউ রজায়াত করার পর সুন্নত পদ্ধতিতে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে তা কী প্রকারে সমাধা করবে, সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে হায়েজের সময় তালাক দেয়া হয়েছিলো, সেই হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর আরেক হায়েজ শেষে পবিত্র হলে দ্বিতীয় বার তালাক দিতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ মাবসুত গ্রন্থে এ রকম লিখেছেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের (তাঁর সহচরদ্বয়ের) বিপরীত কিছু বলেননি। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদও এ ব্যাপারে একমত। ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ অভিমতটিও এ রকম। মুসলিমে উল্লেখিত হজরত ইবনে ওমরের হাদিসের প্রেক্ষাপটেই এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে। রসুল স. হজরত ওমরকে বলেছিলেন, ইবনে ওমর যেনো রজায়াত করে নেন। হায়েজ থেকে পবিত্র হবে, আবার হায়েজ হওয়ার পর পবিত্র হবে— তখন তালাক দিতে ইচ্ছা করলে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দিবে। আর এটা হলো তার ইদ্দত, যে ইদ্দতের কথা কোরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে— যে হায়েজে তালাক দেয়া হয়েছে, সেই হায়েজ ব্যতীত আরো একটি হায়েজ আসতে দাও (অতঃপর তালাক দাও)। ইমাম আবু হানিফার উক্তিকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন এভাবে— ওই তুহুরে তালাক দিবে যা ওই হায়েজের পরে যে হায়েজে তালাক দেয়া হয়েছিলো। শাফেয়ীর উক্তিও এ রকম। তাহাবী আরো বলেছেন, প্রথম উক্তিটি ইমাম আবু ইউসুফের। আর দ্বিতীয় উক্তির দলিল হচ্ছে হজরত ইবনে ওমরের পূর্বোল্লেখিত ওই হাদিস, যা বর্ণিত হয়েছে সালেম কর্তৃক। ওই হাদিসে বলা হয়েছে- তাকে বলো এখন রজায়াত করবে, পরে তুহুর বা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দিবে। এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন মুসলিম ও সুনান প্রণেতাগণ। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দ্বিতীয় উক্তির চেয়ে সমধিক শুদ্ধ। সেখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ব্যাপকতা রয়েছে। ব্যাপকতার উপরেই আমল করা উত্তম।

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, রসুল স. হজরত ইবনে ওমরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দাও; যতোক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রজায়াতের মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব হওয়ার বিধান ওই

হায়েজের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাতে তালাক দেয়া হয়েছিলো। যদি সে তখন রজায়াত না করে এবং তার স্ত্রী ওই অবস্থায় হায়েজ থেকে পবিত্র হয়, তবে তার গোনাহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

'বিধিমতো রেখে দিবে'— একথার অর্থ, রজায়াত করে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ দুই তালাকের পরেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনেই স্বাধীন হয়। তবে ক্রীতদাস-দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের পর আটকে রাখা বৈধ নয়, যদি সে কোনো ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়।

স্বাধীন স্বামীর ক্রীতদাসী স্ত্রী এবং ক্রীতদাস স্বামীর স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কী বিধান— সে সম্পর্কে আলেমগণ মতান্তর করেছেন। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, স্বাধীন স্বামীর ক্রীতদাসী স্ত্রীও তিন তালাক প্রাপ্তির অধিকারিনী। আর ক্রীতদাস স্বামীর স্বাধীনা স্ত্রী পাবে দুই তালাক। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মত এর বিপরীত। তাঁর মতে তালাকের ক্ষেত্র হচ্ছে স্ত্রী। হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ এই অভিমতের প্রবক্তা। উভয় দলের বক্তব্যের সমর্থনে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সবকটি জয়ীফ। ইবনে জাওজী এ রকম বলেছেন। জননী আয়েশা থেকে জাওজী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, ক্রীতদাস দিতে পারবে দুই তালাক এবং ক্রীতদাসীকে ইদ্দত পালন করতে হবে দুই হায়েজ। হজরত আয়েশা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী ও দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন—ক্রীতদাসীদের তালাক দুইটি আর ইদ্দত দুই হায়েজ। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের সূত্রভূত মুজাহির বিন আসলাম সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের মন্তব্য হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করা যায় না। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, মুজাহির মুনকারুল হাদিস। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, ইবনে হাব্বান মুজাহিরকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। হাকেম বলেছেন, মুজাহির ছিলেন বসরাবাসীদের ওস্তাদ। আমাদের পূর্বসূরীগণ মুজাহিরকে দোষারোপ করেননি। ইবনে জাওজী বলেছেন, তালাককে যাঁরা পুরুষনির্ভর বলে মনে করেন, তাঁরা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তালাক পুরুষনির্ভর এবং ইদ্দত নারীনির্ভর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের। দারা কুতনী সূত্রে ইবনে জাওজী হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, ক্রীতদাসীদের জন্য দুইটি তালাক আর তাদের ইদ্দত দুই হায়েজ। ইবনে জাওজী একথাও বলেছেন যে, বর্ণিত হাদিস দু'টি নির্ভরযোগ্য নয়। এ জন্যই নির্ভরযোগ্য নয় যে, এর মধ্যে রয়েছে একজন অবিশ্বস্ত বর্ণনাকারী—ইবনে মোবারক তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না। সা'দ বলেছেন, সুলাইম বিশ্বস্ত (সেকাহ্) নয়। দ্বিতীয় হাদিসটি মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়নি। এর বর্ণনাকারীদের একজন আমর বিন শাবীব

জয়ীফ। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, শাবীবকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য করা যায় না। আবু জারয়া বলেছেন, লোকটি খেয়ালখুশী মতো হাদিস বর্ণনা করে। বিশুদ্ধ সমাধান এই যে, বর্ণনাটি আসলে হজরত ওমরের উক্তি, মারফু হাদিস নয়। ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি এভাবে প্রাধান্য পেতে পারে যে, তুহুরের উপর ভিত্তি করে তালাকের বিধান দেয়া হয়েছে। আর আলেমদের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাসীর ইদ্দত দুই হায়েজ। এতে করে প্রমাণিত হয়, তাদের তালাকও দুইটি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতে একটি জটিলতাও দৃষ্ট হয়। তাঁর নীতি অনুসারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (আম) তার সকল একককে সম্মিলিত করে। একারণেই খবরে ওয়াহেদ ও কিয়াস দ্বারা আম শব্দকে বিশিষ্টার্থক করা সিদ্ধ নয়। খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াস দ্বারা মনসুখও সম্ভব নয়। অথচ 'আল মুতালাক্বাতু ইতারা ব্বাসনা' এবং 'আত্তালাকু মার্‌রতান' আয়াত দু'টি স্বাধীনা ও ক্রীতদাসী— দুই ধরনের রমণীকেই সম্মিলিত করে। অর্থাৎ এ আয়াতের বিধান সাধারণভাবে সকল নারীর প্রতি প্রযোজ্য। স্বাধীনা অথবা ক্রীতদাসী সকলের ইদ্দতকাল তিন হায়েজ এবং সকলের জন্যই বিধিবদ্ধ দুই ধরনের তালাক। রসুল স. এর এরশাদ (ক্রীতদাসীদের জন্য তালাক দুইটি আর ইদ্দত দুই হায়েজ) এখানে খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনাসম্ভূত)। সুতরাং এই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বর্ণিত আয়াত দু'টির বিশিষ্টার্থকতা নির্ণয় করা ঠিক নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, হজরত সাহাবায়ে কেরাম রসুল স. থেকে এমন কিছু শুনেছেন, যার উপর ভিত্তি করে একটি অকাট্য প্রমাণকে খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে বিশিষ্টার্থকতা দেয়া হয়েছে। আর তাঁরা বিষয়টি সম্যক অবগত ছিলেন বলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।' কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, একথার অর্থ তৃতীয় তালাক। আমি বলি এ রকম বলা ঠিক নয়। কারণ একথাটি 'বিধিমত রেখে দিবে' কথাটির সঙ্গে সংযোজিত। সুতরাং পূর্বের কথাটির অর্থ হবে এরকম–– দু'টি নীতির মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করো। সানন্দে রেখে দাও অথবা সৎভাবে বিদায় করো। অথচ বিধান কিন্তু তা নয়। বরং তার জন্য বৈধ হলো রাখবেও না ছেড়েও দিবে না। বরং ইদ্দত পূরণ করা পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই ছেড়ে দিবে।

কেউ কেউ বলেছেন, রজায়াত না করে এমনি এমনি থাকতে দাও। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর পৃথক হয়ে যাবে। বাগবী ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণ দু'টি অভিমতই উল্লেখ করেছেন। তবে উত্তম অভিমত হলো 'সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে' কথাটির ব্যাখ্যা এমনভাবে করা— হয় তালাক দিবে অথবা ইদ্দত পুরো করে তাকে পৃথক করে দিবে। এইভাবে পুরো কথাটি দাঁড়াচ্ছে এরকম— তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সানন্দে তাকে নিজের সাথে রাখো অথবা সদয়ভাবে তাকে পৃথক করে দাও। তৃতীয় তালাক দাও বা না দাও। বাক্যটির আসল বক্তব্য হচ্ছে, অযথা

নীতিবর্জিতরূপে স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হারাম। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'যদি তাকে তালাক দেয়, তবে এরপর তার জন্য হালাল হবে না' আয়াতের সম্ভাব্য দু'টি ব্যাখ্যার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা এটাই। আর সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়াকে পৃথক তালাক মনে করে নিলে সেটা হবে চতুর্থ তালাক।

এক লোক রসুল স. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল! আত্তালাকু মাররতান (তালাক দুইবার) তাহলে তৃতীয় তালাকের উল্লেখ কোথায়? তিনি স. বললেন, তৃতীয়টি হচ্ছে, 'তাসরিহ্ বি ইহসান' (সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া)। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর নাসেখ গ্রন্থে এবং সাঈদ বিন মনসুর তাঁর সুনান পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। আর মুরসাল পদ্ধতিতে আবু রজীন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া।

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাযথ নয়। এছাড়া ইমাম দারা কুতনী ও বায়হাকী আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদের সূত্রে তিনি ইসমাইল থেকে এবং তিনি হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। দারা কুতনী ও বায়হাকী দু'জনেই বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম সনদে ইসমাইল—আবু রজীন থেকে এবং তিনি রসুল স. থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক এভাবেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাত্তান বলেছেন, এই বিবরণটি মারফু এবং বিশুদ্ধ। আমি বলি তৃতীয় তালাক সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসুল স. জবাব দিয়েছিলেন 'তাসরিহ্ বি ইহসান' (সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে)।

আবু দাউদ বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে বলা হয়েছে, ইসলামের প্রথম দিকে স্ত্রীরা তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে স্বামীদেরকে কিছু দিলে, স্বামীরা তা ভক্ষণ করাকে বৈধ মনে করতো। মনে করতো এই সম্পদ ভক্ষণ করলে কোনো গোনাহ্ হবে না। এই ধারণার অপনোদনার্থে অবতীর্ণ হলো 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছো, তার মধ্য থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।' নির্দেশটি অবতীর্ণ হয়েছে স্বামীদের প্রতি। আর এখানে কোনো কিছু গ্রহণ করা অর্থ, মোহর থেকে কিছু গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেছেন, নির্দেশটি বিচারকদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ, আদান-প্রদানের মাধ্যম তাঁরাই। তাঁরাই স্বামী স্ত্রীর কলহবিবাদ মীমাংসা করে দেন। কিন্তু এই শেষোক্ত মন্তব্যটি শুদ্ধ নয়।

'যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না'—একথার অর্থ, স্ত্রীর যদি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, স্বামীর অনুগত হলে আল্লাহ্পাকের অবাধ্য হতে হবে। আবার স্বামীর যদি এ রকম ধারণা প্রবল হয় যে, আমার দ্বারা এই স্ত্রীর অধিকার পূরণ হবে না। অথবা অর্থ হবে এরকম, এই স্ত্রীকে তালাক না দিলে তার প্রতি জুলুম করা হবে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি পারস্পরিক জুলুমের আশংকা করে।

'তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না'— এ কথার অর্থ, হে বিচারকমন্ডলী! তোমরা যদি আশংকা করো যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর বিধানের উপর স্থির থাকতে পারবে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই বিধান দেয়া হয়েছে যে, যদি স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়; তবে স্বামী স্ত্রী কেউই অপরাধী হবে না। ক্বারীগণ বলেছেন, 'আলাই হিমা' (তাদের উপর) বলতে এখানে কেবল স্বামীকেই বুঝানো হয়েছে। স্বামী স্ত্রী মিলে দাম্পত্য জীবন। এই মিলিত জীবনের কারণে এখানে 'তাহারা' শব্দটি এসেছে। যেমন অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'মুসা এবং তার খাদেম মৎসটির কথা ভুলে গিয়েছে।' বাস্তবে কেবল খাদেমই মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, হজরত মুসা ভোলেননি। তবুও ভুলের উল্লেখ করতে গিয়ে দু'জনের কথাই চলে এসেছে।

আমি বলি, এই সম্পদ গ্রহণ স্বামীর পক্ষে যেমন অপরাধ তেমনি অপরাধ স্ত্রীর পক্ষেও। তাই আল্লাহ্পাক বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছো, তার মধ্য থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। আর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে রসুল স. বলেছেন, ভীতিজনক অবস্থা ছাড়া যে নারী তার স্বামীর নিকট তালাক কামনা করে; তার জন্য জান্নাতের বাতাসও হারাম। আহমদ, তিরমজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী- এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সাওবান থেকে। গোনাহ্ হওয়ার কারণে এক পক্ষে সম্পদ দেয়া যেমন হারাম, তেমনি অপর পক্ষে সম্পদ অপচয় করাও নিষিদ্ধ। এরমধ্যে দ্বীন-দুনিয়ার কোনো কল্যাণ নেই। তবে আল্লাহ্র বিধান লংঘন ও পাপে পতিত হওয়ার আশংকা যদি দেখা দেয়, তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানে দোষ নেই। বিধানটি তখনই কার্যকর হবে, যখন উভয় পক্ষ কলহ-বিবাদের আশংকা করবে। কেবল স্বামীর পক্ষ থেকে যদি সমস্যার উদ্ভব হয়, তবে স্বামী কিছু গ্রহণ করলে তা বৈধ হবে না। হেদায়া গ্রন্থ রচয়িতা বলেছেন, তার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা মাকরুহ তাহরিমী হবে। প্রকৃত পক্ষে এটা হারামই। যার প্রমাণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। হারাম হওয়ার দ্বিতীয় দলিল এই যে, অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, কষ্ট দেয়ার জন্য স্ত্রীকে সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে আটকে রাখা হারাম। স্ত্রীর দিক থেকে যদি বাড়াবাড়ি হয় তবুও তালাক নেয়ার উদ্দেশ্যে সম্পদ দেয়া হারাম। এরকম করলে স্ত্রী গোনাহগার হবে।

খোলা তালাকের বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, খোলার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে সম্পদ দান করবে এরকম করা ওয়াজিব। যদিও জাহেরিয়া ফেরকা এই অভিমতের বিরুদ্ধে। আমাদের দলিল হচ্ছে খোলা বা বিবাহ বিচ্ছেদ সকল ক্ষেত্রেই শরিয়তের বিধান স্বতন্ত্র। আর শরিয়তের বিধান নিষিদ্ধ হওয়া নির্ভর করে তার প্রয়োগ ও বিধিবদ্ধতার উপর— যাতে রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার অনুষঙ্গটি।

মাসানীদের মতাদর্শ হচ্ছে—শরিয়তে খোলার নির্ভরযোগ্যতা নেই। তারা বলে, খোলার এই বিধানটি 'ওয়া ইন আরাদতুমুল ইসতাবদালা যওযিন' আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। তাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্ণিত আয়াতে স্বামী স্ত্রীর সম্মতিনির্ভর আদান-প্রদান অথবা বিনিময়ের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে আলোচ্য আয়াতটির সঙ্গে বর্ণিত আয়াতের কোনো বিরোধ নেই। আর পরস্পরবিরুদ্ধ না হলে মনসুখ বা রহিত হওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

খোলা বাস্তবে তালাক না বিবাহবিচ্ছেদ— সে সম্পর্কে মতান্তর রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মত এই যে, খোলা এক ধরণের তালাক। ইমাম আহমদও এ কথাই বলেছেন। তবে অপর একটি বর্ণনা মতে আহমদ ও শাফেয়ী বলেছেন, খোলা আসলে কোনো তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

যারা খোলাকে বিবাহ বিচ্ছেদ বলেন, তাদের নিকট খোলা দ্বারা তালাকের সংখ্যা হ্রাস পায় না। এবং খোলায় দ্বিতীয় তালাকের সুযোগও থাকে না। আবার ইদ্দত পালনকালে স্বামী-স্ত্রীর কোনো প্রকার দায়িত্বও এখানে অনুপস্থিত।

এ সম্পর্কে মতবিভেদকারী উভয় পক্ষ কোরআনের এই একই আয়াত দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। খোলাকে যাঁরা বিবাহবিচ্ছেদ বলেন, তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ্পাক আলোচ্য আয়াতের প্রথমে দুই তালাকের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর আলোচিত হয়েছে খোলা প্রসঙ্গ। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে বিবরণ দিয়েছেন তৃতীয় তালাকের। খোলা যদি একটি তালাকই হয় তবে তালাকের সংখ্যা হয়ে যাবে চারটি। অথচ ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, তালাক সর্বমোট তিনটি। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এই মতটির সমর্থন বিবৃত হয়েছে।

সনদসহ তাউস থেকে ইবনে জাওজী বলেছেন, আমি (তাউস) ইব্রাহিম বিন সায়াদের নিকট থেকে শুনেছি, তিনি (ইবনে সায়াদ) হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট ওই লোক সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর খোলা করেছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, লোকটি যদি ইচ্ছা করে তবে তালাক দেয়া ওই স্ত্রীকে বিয়ে করে নিতে পারে। কারণ, আল্লাহ্পাক তালাকের আলোচনা করেছেন প্রথমে ও শেষে। আর খোলার আলোচনা করেছেন মাঝখানে। আবদুর রাজ্জাকও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, খোলা একটি পৃথক বিষয়। হজরত ইবনে ওমরের মুক্ত ক্রীতদাস নাফে থেকে বর্ণিত হয়েছে- তিনি মুআজ ইবনে আফরা এর কন্যা রবীহ্ থেকে শুনেছেন, তিনি হজরত ইবনে ওমরের সামনে বলেছিলেন, আমি হজরত ওসমানের যুগে, আমার স্বামীর সঙ্গে খোলা করেছিলাম। অতঃপর আমার পিতৃব্য হজরত ওসমানের নিকট হাজির হয়ে আবেদন জানালেন, মুআজের কন্যা তার স্বামীর সাথে খোলা করেছে। এমতাবস্থায় সেকি তার নিজের বাড়িতে চলে যাবে? হজরত ওসমান বলেছিলেন,

অবশ্যই চলে যাবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এখন আর কোনো অংশীদারিত্ব নেই (স্বামীর দায়িত্বে খোরপোষ এবং স্ত্রীর দায়িত্বে ইদ্দত নেই)। তবে হ্যাঁ একটি হায়েজ আগমন না করা পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারবে না। বিবরণটি শুনে হজরত ইবনে ওমর বললেন, হজরত ওসমান ছিলেন উত্তম মানুষ আর তিনি বিজ্ঞ আলেমও ছিলেন।

আমরা বলি, আলোচ্য আয়াতে রজায়াতসংশ্লিষ্ট তালাকের আলোচনা করা হয়েছে দু'বার। তারপর আলোচনা এসেছে স্ত্রীর ফিদিয়া বা দায়মুক্তি সম্পর্কে। এতদ্বসত্ত্বেও বিষয়টি স্বামী স্ত্রী উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বামীকে কিছু দেয়ার সম্পর্ক স্ত্রীর সঙ্গে এবং তা গ্রহণ করে পৃথক করে দেয়ার সম্পর্ক স্বামীর সঙ্গে। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, তালাক কেবল স্বামীরই অধিকারাধীন।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাক দুই প্রকার তালাকের আলোচনা করেছেন। একটি তালাক সম্পদবিশিষ্ট এবং অপরটি সম্পদবিহীন। এরপর বর্ণনা করেছেন, 'ফাইন তাল্লাক্বহা ফালা তাহিল্লু লাহু।' আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী 'ফা' অব্যয়টি বিষয়ের পরম্পরা নির্ণায়ক। ফিদিয়া বা দায়মুক্তির আলোচনার পরে আল্লাহ্পাক তালাকের আলোচনা করেছেন। খোলা যদি তালাক না হয়, তাহলে ফা অব্যয়টি ব্যবহারের উদ্দেশ্য থাকে কি? যদি কেউ বলে, মাঝখানের খোলা সম্পর্কিত আলোচনাটি অপ্রাসঙ্গিক। তবে এটিকে মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ, এর কোনো প্রমাণ নেই। এতে করে আল্লাহ্পাকের কালামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। আর আয়াতের প্রথমে তালাক, শেষে তালাক এবং মাঝখানে খোলার আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিটিও সঠিক নয়। কারণ, আলোচ্য আয়াতে খোলা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো আলোচনাই করা হয়নি। শুধু স্ত্রী কর্তৃক কিছু বিনিময় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে কোনো কথা নেই। কাজেই স্বামীর কর্তব্যটি ওই তালাকই যা ইতোপূর্বে বলে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্পষ্টতই বিষয়টি এ রকম দাঁড়ায় যে, প্রথমে আলোচিত তালাক যদি বিনিময়শূন্য হয়, তবে তা হবে রজয়ী। আর যদি বিনিময় সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তা হবে বায়েন। স্বামীর উপর এক সাথে বিনিময় ও তালাক প্রদান একত্রিত হতে পারে না। এই একত্রিত হতে না পারাকে তালাক অথবা খোলা যে কোনো নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যবহারিক ভাষার মাধ্যমে এই অবস্থাটিকে বলা হয়েছে খোলা। শব্দটি কালাম পাক থেকে উচ্চারিত নয়।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুজুল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোলা আসলে তালাক। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা হারিস বিন করিমের স্ত্রী জমিলা অথবা দারা কুতনীর সূত্রে ইবনে হাজার বলেছেন, তাঁর নাম জয়নাব (সম্ভবত তাঁর দু'টি নাম ছিলো)। অপর একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর নাম হাবিবা বিনতে সহল। ইবনে হাজার বলেছেন, দু'জন নারী সম্পর্কে দু'টি পৃথক ঘটনা ঘটেছিলো। হাদিস দু'টি খুবই মশহুর। সনদও বিশুদ্ধ। তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা গরমিল

লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— ওই স্ত্রীলোকটি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন। স্বামীর প্রহারের চিহ্ন ছিলো তাঁর শরীরে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি আমার স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট নই, তিনিও আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন। রসুল স. তখন তাঁর স্বামীকে ডেকে এনে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি বিবাদ হয়েছে? তিনি (সাবেত) শপথ করে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনার পর আমার এই স্ত্রী পৃথিবীতে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। রসুল স. জমিলাকে বললেন, তুমি কী বলো? জমিলা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি তো আপনার নিকট একটি অভিযোগ পেশ করেছি। এখন ওই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমিতো কিছু বলতে পারি না। তবে একথা ঠিক যে, সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। কিন্তু আমার মন বসে না। তাই আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট নই। সেও আমার প্রতি অপ্রসন্ন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন— সাবেত বিন করিমের স্ত্রী রসুল স.কে বলতে শুরু করলেন, হে দয়ার নবী! কায়েসের ধর্মাচরণে ও স্বভাবে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে কুফরীর সংমিশ্রণ করা আমার নিকট অপছন্দনীয়। রসুল স. বললেন, তুমি কি তার বাগানটা ফেরৎ দিতে পারো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. তখন সাবেতকে বললেন, তুমি বাগানটা নিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও। ভিন্ন একটি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জমিলা খোলা করার উদ্দেশ্যে রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বলেছেন, ইসলামের সর্বপ্রথম খোলা হয় সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি রসুল স.এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার আর সাবেতের মাথা আর একত্রিত হতে পারে না। অন্যদের সঙ্গে আমি যখন তাকে তুলনা করি তখন দেখি, সে সবচেয়ে কালো ও বেঁটে। সে দেখতেও অতি কদর্য্য। রসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তাঁর বাগানটিকে ফেরৎ দিতে পারো? জমিলা বলেছিলেন, হ্যাঁ। সে চাইলে আমি আরো কিছু অতিরিক্ত দিতে পারি। রসুল স. তখন দু'জনকে পৃথক করে দিয়েছিলেন।

হজরত হাবিবা বিনতে সহল থেকে আবু দাউদ, ইবনে হাববান এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, সাবেতের স্ত্রী (হাবিবা) নবী পাক স. এর নিকট নিবেদন করলেন, আমরা কেউ কারো প্রতি সন্তুষ্ট নই (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)।

হজরত ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতটি সাবেত ও হাবিবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। হাবিবা রসুল পাক স. এর নিকট হাজির হয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। রসুল পাক স. বললেন, তুমি কি তার বাগানটাকে ফেরৎ দিতে সম্মত আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল পাক স. তখন সাবেতের মতামত চাইলেন। সাবেত বললেন, আপনি কি আমার ব্যাপারে এটাই উত্তম ধারণা করেছেন? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ।

সাবেত বললেন, ঠিক আছে আমি নিষ্কৃতি দিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খোলা তালাক পর্যায়ভূত। হাদিসের ভাষ্যেও তাই সরাসরি বলা হয়েছে, তুমি বাগানটি নিয়ে তাকে তালাক দাও।

যদি কেউ প্রশ্ন করে বর্ণনাগুলোর বিপরীত কার্যক্রম দ্বারা ইমাম আবু হানিফার ভাষ্য নাসেখ (রহিতকারী) প্রতীয়মান হয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারীর বর্ণনায় খোলার পরে তালাকের প্রমাণ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস পুনঃ মন্তব্য করেছেন যে, খোলা হলো বিবাহবিচ্ছেদ। খোলার পরে তালাকের আর প্রয়োজন নেই।

আমরা বলি, সম্ভবত হজরত ইবনে আব্বাস ধারণা করেছিলেন, হজরত সাবেত রসুল স. এর নির্দেশানুযায়ী তাঁর বিবিকে তালাক দিয়েছিলেন। আর ওই তালাক ছিলো সম্পদের বিনিময়ে। খোলা ছিলো না। অতঃপর তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা অনুসারে এই ফতোয়া জারী করে দিয়েছেন যে, খোলা হলো বিবাহবিচ্ছেদ। কাজেই হজরত ইবনে আব্বাসের ফতোয়া ছিলো তাঁরই ধারণানির্ভর। হাদিসের বিপরীত ছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি (এটাই ছিলো ইসলামের সর্বপ্রথম খোলা) রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর হজরত ইবনে আব্বাসের ধারণার অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়।

খোলা তালাক সম্পর্কে যে সকল দলিল বর্তমান, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা যা তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে উদ্ধৃত করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. খোলাকে তালাকের একটি পর্যায় সাব্যস্ত করেছেন। বিবরণটি মুরসাল ও বিশুদ্ধ। আমাদের নিকট মুরসাল হাদিসও দলিল হিসাবে গ্রহণীয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের মুরসাল হাদিসও সনদ বিশিষ্ট হাদিসের পর্যায়ভূত। কারণ, আমি সেগুলোকে সনদ সহই পেয়েছি। খোলা যে আসলে এক প্রকার তালাক, তা হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, খোলা এবং ইলা দ্বারাও বায়েন তালাক হয়। এ রকম বলেছেন ইবনে আবি শাইবা। উম্মে বকরার অনুরূপ বিবরণ হজরত আলী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। উম্মে বকরা বলেছেন, তিনি তাঁর স্বামীর নিকট খোলা করে নিয়েছিলেন। ঘটনাটি যখন হজরত ওসমানের আদালতে পৌঁছলো, তখন তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, এটা হলো তালাকে বায়েন। স্বামী স্ত্রী যদি অন্য কোনো সমাধানে আসে তবে সেটা আলাদা বিষয়। মালেক। তবে এই বিবরণটি সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপণ করে বলেন যে, এর মধ্যে জুমহান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মশহুর নন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, জুমহান ছিলেন আবু ইয়ালী আসলামিয়াইনের মুরিদ। আবার কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন ইয়াকুব কিব্‌তির মুরিদ এবং ছিলেন তাবেয়ী। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত ওসমান বিন আফফান, হজরত আবু হোরায়ারা, এবং হজরত

উম্মে বকরা থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন উরওয়া বিন জোবায়ের, মুসা বিন উবাইদা জোবাইদি এবং আরও অনেকে। ইবনে হাব্বান মনে করেন, তিনি ছিলেন ধীশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারী।

মাসআলাঃ আয়াতের সাধারণ বক্তব্যানুসারে এ বিষয়টিতে সকলে একমত যে, মোহর থেকে অতিরিক্ত খোলা নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন, এ রকম করলে মাকরূহ হবে। আলেমদের অধিকাংশ বলেছেন মাকরূহ হবে না। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা থেকে জামিউস সগিরের বিবরণ। এই মাসআলাটিতে সাহাবায়ে কেরামের মতভিন্নতার কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মাকরূহ হওয়ার কারণ আবু দাউদের মারাসিল গ্রন্থভূত ইবনে আবি শাইবা ও আবদুর রাজ্জাকের ওই বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. তাঁকে (সাবেতের স্ত্রীকে) বলেছিলেন, সাবেত মোহরস্বরূপ তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিলো তা তুমি ফেরৎ দিতে রাজি কি না? তিনি বলেছিলেন, রাজি। বরং চাইলে আরও বেশী কিছু দিবো। রসুল স. বলেছিলেন, অতিরিক্ত প্রদান অনুচিৎ। দারা কুতনীও অনুরূপ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এরকম বর্ণনা করেছেন ওয়ালিদ—ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ইবনে জাওজী দারা কুতনী থেকে এবং তিনি আবু জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের কন্যা জয়নাব সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রী ছিলেন। সাবেত তাঁকে মোহর হিসেবে একটি বাগান দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বনিবনা হলো না। জয়নাব তখন রসুল স. এর দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, তুমি কি বাগানটি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো? তিনি বলেছিলেন, পারি। বরং কিছু অতিরিক্ত দিতে পারি। তিনি স. বললেন, অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই। শুধু বাগানটা দিলেই চলবে। একথা বলে রসুল স. বাগানটি সাবেতকে দিয়ে দু'জনকে পৃথক করে দিলেন। সাবেত বললেন, আমি রসুল পাক স. এর মীমাংসা অবনত মস্তকে মেনে নিলাম। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ। দারা কুতনী বলেছেন, আবু জোবায়ের অনেকের নিকট থেকে ঘটনাটি শুনেছেন। আতা থেকে সনদসহ দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, মহানবী স. এরশাদ করেন— খোলা প্রাপ্তাদের নিকট থেকে যা দেয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত নিও না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা বলেছেন, সুলুল তনয়া রসুল স. সকাশে হাজির হলেন। রসুল স. সাবেতকে আদেশ করলেন, শুধু বাগানটি নিয়ে নাও, অতিরিক্ত নিও না।

সার কথা হচ্ছে, বিশুদ্ধ মুরসাল হাদিসে অতিরিক্ত গ্রহণের প্রমাণ রয়েছে। হজরত আলী থেকে এরকম প্রমাণ বিদ্যমান। স্বামী তার স্ত্রীকে মোহর হিসেবে যা দিয়েছে তার অতিরিক্ত নিতে পারবে না— এ রকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক এবং তকী। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রবীয়্ বিনতে মুআজ থেকে। ওই বর্ণনাটিতে রয়েছে তিনি তাঁর স্বামীর নিকট তাঁর সকল সম্পদ

প্রত্যার্পণ করে খোলা করেছিলেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো বিবাদ। বিষয়টি হজরত ওসমানের আদালতে পেশ করা হলে, তিনি পূর্বের আদেশই বহাল রেখেছিলেন এবং রবীয়কে বলেছিলেন, টুপি ও অন্যান্য যা কিছু আছে সব দিয়ে দাও। নাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমরের স্ত্রীর এক মুক্ত ক্রীতদাসী সকল সামগ্রী এমন কি পরিধেয় বস্ত্রের বিনিময়ে খোলা করেছিলেন। বর্ণিত আসার দুইটিতে এমন কোনো কিছু উল্লেখ নেই যা মকরূহ্ সিদ্ধান্তের বিপরীতে যায়। বরং আসার দু'টি খোলার প্রচলিত বিধানকেই সমর্থন করে। কেউ এটাকে অস্বীকার করেন নি।

যাঁরা মকরূহ হওয়াকে স্বীকার করেন না, তাঁরা আলোচ্য আয়াতের ওই বাক্যটিকেই দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন— যেখানে বলা হয়েছে, 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা ফি মাফতাদাত্ বিহী' (তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে কারো কোনো অপরাধ নেই)। এখানে 'মা' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এর দ্বারা কম বেশী দু'টিই বুঝায়। কোরআনের বিধানের প্রতিকূলে যাবে না— এই নীতিতেই খবরে ওয়াহিদ গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে প্রতিকূলতা লক্ষ্যণীয়।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার আচরণীয় সূত্র হচ্ছে, যে আম অন্তর্ভুক্তি হিসেবে অকাট্যরূপে প্রমাণিত সেই আম (সাধারণ) কে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যাবে না। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সুনির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ তবে আমরা এও বলতে পারি—আয়াতের বিধান মোহরের পরিমাণের উপর সংযুক্ত। আর পরিমাণের হ্রাস সংশ্লিষ্ট ওই হাদিসগুলোর সঙ্গে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত একটি হাদিস মকরূহ না হওয়াকে প্রমাণ করেছে। তিনি বলেছেন, আমার বোন এক আনসারীর স্ত্রী ছিলেন। ওই আনসারী মোহরানা হিসেবে একটি বাগান দিয়েছিলেন তাকে। হাদিসটির শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে— রসুল স. আমার বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি ওই বাগানটি ফেরৎ দাও তবে সে তোমাকে তালাক দিবে। আমার বোন বললো, তাই হোক। বাগানটার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু দাও। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। বর্ণনাকারীদের একজন আতিয়া আওফি সম্পর্কে ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার হাদিস শিক্ষা করা জায়েয নয়। অপর এক বর্ণনাকারী হাসান বিন আম্মারাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছেন শো'বা।

'এই সব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা এই সীমালংঘন কোরো না। যারা এ রকম করে তারা জালেম'— আল্লাহ্পাকের বিধানে দু'টি সম্ভাবনা ছিলো। একটি হচ্ছে বিধিমতো রেখে দেয়া এবং অন্যটি হচ্ছে সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া। 'ফাইন তাল্লাক্বাহা' (অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়) বাক্যটি হচ্ছে দ্বিতীয় সম্ভাবনা (আয়াত ২৩০)। আল্লাহ্পাক এর পর তাঁর বিধান করেছেন এভাবে— 'তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে।'— একথার অর্থ, তালাকপ্রাপ্তাকে বিশুদ্ধভাবে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হতে হবে। এখানে আমি বিশুদ্ধ কথাটির উল্লেখ এজন্যই করলাম যে, চূড়ান্ত অর্থবোধক (মুতলাক) থেকেই পূর্ণ একক মর্ম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৈবাহিক সম্পর্কের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী উভয়েই জড়িত। কারণ, এই সম্পর্কটি হয় ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে। আয়াতের অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব ও দাউদ বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ ব্যতিরেকে প্রথম স্বামী পুনঃবিবাহ করতে পারবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, প্রথম স্বামীর পুনঃবিবাহ শুদ্ধ করতে চাইলে দ্বিতীয় স্বামীকে সম্ভোগ করতেই হবে। একারণেই অনেক ভাষ্যকার বলেন, এখানে নিকাহ্ (বিবাহ) শব্দটির অর্থ সম্ভোগ।

কেউ যদি একথা বলে জটিলতা সৃষ্টি করে যে, সম্ভোগ করা স্বামীর কর্ম, স্ত্রীর নয়। স্ত্রী কেবল সম্ভোগের ক্ষেত্র। তাহলে সম্ভোগের শর্ত স্ত্রীর প্রতি করা হয়নি। এই জটিলতা অপনোদনার্থে আমরা বলি, মাজাজী (মাধ্যমিক) অর্থ হিসেবে এ রকম বলা জায়েয। কিন্তু আয়াতটি চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশক। মাজাজ (মাধ্যমিক) নয়। কারণ নিকাহ্ অর্থ যদি চুক্তি হয় তবে জওজ শব্দটি মাজাজ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কারণ তখনও চুক্তি হয়নি। তবে সে স্বামী হয় কেমন করে। এ জন্য তাকে বলা হলো আগাম স্বামীর কথা। তেমনি যদি নিকাহ্ শব্দের অর্থ ধরা হয় সম্ভোগ তবে সম্পর্কগতভাবে সেটাও হবে মাজাজী। এও বলা যেতে পারে যে, নিকাহ্ এর মাজাজী মর্ম হবে— সে সম্ভোগ করতে পারে। আয়াতটির এ রকম জটিল ব্যাখ্যা করার কারণ হজরত আয়েশা সিদ্দিকার একটি হাদিস, যে হাদিসে তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা আবু বকর রসুল স. এর কাছে ছিলাম। তখন রেফায়া কারজীর স্ত্রী এসে বললো, রেফায়া আমাকে মুসাল্লাসা তালাক দিয়েছিলো। তারপর আবুদর রহমান আমাকে বিয়ে করেছিলো। তার নিকট আমি পেলাম যেমন সুতার গুচ্ছ, বলেই সে উড়নার সুতার গুচ্ছ ধরে দেখালো। রসুল স. তার কথায় মৃদু হাসলেন। বললেন, তাহলে তুমি আবার রেফায়ার নিকটে যেতে চাও? কিন্তু তাতো হতেই পারে না যতোক্ষণ না সে তোমার এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ করেছো। মুহাদ্দিসগণের এক বড় দল এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বোখারী ও মুসলিম। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, সে প্রথমে ছিলো রেফায়ার স্ত্রী। রেফায়া তাকে তিন তালাক দিয়েছিলো। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে মুসাওয়ার বিন রেফায়া কারজী থেকে, তিনি জোবায়ের বিন আবদুর রহমান বিন জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এর যুগে রেফায়া বিন সামওয়াল তার স্ত্রী তাসিমা বিনতে ওয়াহাবকে তিন তালাক দিয়েছিলো। এরপর তাকে বিয়ে করেছিলো আবদুর রহমান বিন জোবায়ের। কিন্তু সে ছিলো নপুংসক। তাসিমা তাই তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। এরপর রেফায়া তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে রসুল স. তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, যতোক্ষণ না আবদুর রহমান তাকে সম্ভোগ করবে ততোক্ষণ তোমার বিবাহ হালাল হবে না। বহুসংখ্যক

মুহাদ্দিস হজরত আয়েশার হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে— এক ব্যক্তি রসুল স.এর নিকট জানতে চাইলো এক লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো। এরপর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তার নির্জন বাস হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু সঙ্গম হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিলো। এখন ওই রমনীকে তার প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারবে কি না? তিনি স. বললেন, না— যতোক্ষণ না প্রথম স্বামীর মতো দ্বিতীয় স্বামী তাকে সম্ভোগ করে। মুকাতিল বিন হাব্বান থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় আবদুর রহমান বিন আতিকের কন্যা আয়েশা সম্পর্কে। সে ছিলো রেফায়া বিন ওয়াহাব বিন আতিকের স্ত্রী। রেফায়া ছিলো তার চাচাত ভাই। রেফায়ার বায়েন তালাকের পর তাকে বিয়ে করেছিলো আবদুর রহমান বিন জোবায়ের কারেজী। আবদুর রহমানও তাকে তালাক দিলেন। সে তখন রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে জানালো, দ্বিতীয় স্বামী সম্ভোগ করার আগেই আমাকে তালাক দিয়েছে। আমি কি এখন প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবো? তিনি স. বললেন, না— যতোক্ষণ না সে তোমাকে সম্ভোগ করে। সেই সময় অবতীর্ণ হলো 'অতঃপর যদি তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না—যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হয়।' দ্বিতীয় স্বামী সম্ভোগ করার পর তালাক দিলে কি হবে সে কথা বলা হয়েছে পরক্ষণেই 'তারপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ই যদি মনে করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না।'

বাগবী বলেছেন, এ ঘটনার পর আয়েশা কিছুদিন চুপচাপ রইলো। পুনরায় রসুল স. এর নিকটে আবেদন জানালো, হে আল্লাহর রসুল! আমার দ্বিতীয় স্বামী আমার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার কথাকেই মিথ্যা প্রমাণ করছো (আগে বলেছো সে নপুংশক)। তাই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আয়েশা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরেই রসুল স. দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক হলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর নিকট গিয়ে আয়েশা বললো, আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে সম্ভোগ করার পর তালাক দিয়েছেন। হজরত আবু বকর বললেন, তুমি তো রসুল পাক স. এর নিকটে একথা বলেছো। এ ঘটনা সকলেই জানে। সুতরাং তুমি প্রথম স্বামীর নিকটে আর যেতে পারছো না। কিছুদিন পর হজরত আবু বকর সিদ্দিকও পরলোকগমন করলেন। আয়েশা তখন হাজির হলো দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের নিকট। হজরত ওমর তার কথা শুনে বললেন, যদি তুমি প্রথম স্বামীর নিকট যাও, তবে আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবো।

এখানে নিকাহ্ শব্দটির অর্থ যদি চুক্তি ধরা হয়, তবে এ হাদিসের দ্বারা কোরআনের বিধানকে পরিবর্তন করা হবে। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা করা যদিও সিদ্ধ কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মাজহাবে এ রকম করা সিদ্ধ

নয়। কতিপয় আলেম বলেছেন, হাদিসটি খবরে ওয়াহিদ নয় বরং মশহুর। আর মশহুর হাদিস দ্বারা কিতাবুল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা যায়; কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, হাদিসটি আসলে খবরে ওয়াহিদ, মশহুর নয়। তবে বলা যেতে পারে হাদিসটির অনুকূলে যখন ঐকমত্য সংগটিত হয়েছে এবং জমহুর আলেম তা স্বীকারও করে নিয়েছেন তখন হাদিসটি মশহুর হাদিসের পর্যায়ভূত হয়েছে। তাই এ হাদিসের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহকে অতিক্রম করা সিদ্ধ হয়েছে।

'ইয়াতারজাআ' শব্দটি স্বামী স্ত্রী উভয়ের প্রতি সম্বন্ধিত। তাই বলা হয়েছে 'তারা উভয়ে যদি মনে করে' এই সম্মিলক সম্বোধনটি পূর্ববর্তী আয়াতের একটি বাক্যের বিপরীত যেখানে বলা হয়েছে— তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার— সেখানে স্বামীরাই ছিলো এককভাবে সম্বোধনকৃত।

'তারা উভয়ে যদি মনে করে যে তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে'—এখানে মনে করা বুঝাতে 'জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মনে করা অর্থ বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাস এলেম বা জ্ঞান দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ অদৃশ্যের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান কারো জানা নেই। সুতরাং এখানে 'জন' বলতে বিশ্বাস করা, মনে করা অথবা ধারণা করা বুঝতে হবে। অর্থাৎ তাদের দু'জনেরই এরকম প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবো।

এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ প্রথম স্বামীর তিন তালাকের বিলোপ সাধন করে। ওই রমণী যদি প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনঃবিবাহবদ্ধ হয় তবে প্রথম স্বামী পুনরায় তিনটি তালাকের অধিকার লাভ করবে। তবে এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, তিন তালাকের কম হলে তা লোপ পাবে কিনা। অর্থাৎ প্রথম স্বামী যদি এক কিংবা দুই তালাক প্রদান করে থাকে, তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতও পূর্ণ হয়ে যায়, তারপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহ করে পুনরায় তালাক দেয়— তারপর ইদ্দত পালন শেষে প্রথম স্বামী তাকে পুনঃবিবাহ করলে তিন তালাকের অধিকারী হবে, না আগের দুই অথবা এক তালাকের অধিকারী হবে? এমতাবস্থা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্য হচ্ছে, দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ প্রথম স্বামীর প্রথম তালাকের সমুদয় অধিকার অবলুপ্ত করে দেয়। দ্বিতীয় স্বামীর তালাকের পর প্রথম স্বামী পুনঃবিবাহ করার সাথে সাথে পুনরায় পূর্ণ তিন তালাকের অধিকারী হয়। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, তিনের কম তালাক অবলুপ্ত হয় না। যেহেতু আল্লাহপাকের নির্দেশ 'তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে।' এর দ্বারা ওই গুরুতর নিষিদ্ধ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটেছে যা তিন তালাক দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিলো, আর এই বিধানটি শুধুমাত্র তিন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট। মনে রাখতে হবে যে কোনো বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিষিদ্ধ হয় না।

আমাদের দলিল হচ্ছে, আলোচ্য বিধানটি (দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগের পর তালাক প্রদান) প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার একটি উপলক্ষ। তাই বলা হয়েছে 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা আঁই য়াতারজায়া' অর্থাৎ এবার তাদের পুনর্মিলনে কারো কোনো অপরাধ নেই। তদুপরি রয়েছে রসুল স. এর ওই নির্দেশ 'আল্লাহ্পাক হালালকারী ও হালালকৃতকে অভিশম্পাত দিয়েছেন।' এখানে দ্বিতীয় স্বামীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী গণ্য করা হয়েছে। আর হালাল হওয়ার বিধান হয়েছে এজন্য যে, সবকিছুই যেনো হালাল পন্থায় সম্পাদিত হয়। একারণে প্রথম স্বামী তিন তালাকেরই অধিকারী হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ যখন গুরুতর নিষিদ্ধ বিষয়ের বিনাশ সাধন করতে সক্ষম, তখন লঘু নিষিদ্ধতাও নিশ্চয়ই বিনাশ সাধন করতে পারবে।

প্রথম স্বামীর ছেড়ে দেয়া স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামীকে এই শর্তে গ্রহণ করে যে, আমাকে তালাক দিতে হবে; আর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তার শর্ত মেনে নিয়ে পুনরায় তালাক দেয় তবে ইদ্দতান্তে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম বিবাহ বৈধ যেহেতু সে বিশুদ্ধ বিবাহের আওতায় সম্ভোগ করেছে। শর্তের দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। ইমাম মোহাম্মদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ শুদ্ধ হবে ওই দলিল অনুসারে যা আমি পূর্বেই পেশ করেছি। কিন্তু প্রথম স্বামীর জন্য এটা বৈধ হবে না, কারণ সে এমন একটি বিষয়ে ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছে, শরিয়ত যেটাকে রেখে দিয়েছে পশ্চাতে। কাজেই শরিয়তের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে তাকে শাস্তি দিতে হবে। যেমন, অংশীদারিত্ব দ্রুত হস্তগত করার জন্য কেউ যদি কোন উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে তবে সে অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ইমাম মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফের বক্তব্য হচেছ, ওরকম করলে বিয়েই শুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফেয়ী থেকেও এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতর মতটি হচ্ছে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, এটা নির্ধারিত সময়ের (মুত্আ) বিয়ের বিধানের মধ্যেই পড়ে। আর বিয়েই যদি শুদ্ধ না হয় তবে প্রথম স্বামীর জন্য হালালও হবে না। কারণ হালাল হওয়ার নিয়ম এখানে পালন করা হয়নি। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিবাহের রীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ইমামত্রয় এরকম বিবাহ বিশুদ্ধ না হওয়ার সমর্থনে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসটিকে পেশ করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. হালালকারী এবং হালালকৃতের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। দারেমী ও তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত উকবা বিন আমের থেকে।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিসটিতো আমাদেরই পক্ষে। কেনোনা রসুল স. দ্বিতীয় স্বামীকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসের 'মুহলিল' শব্দটি বৈধতাকেই সমর্থন করে। তাই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ শুদ্ধ হবে। তবে এ প্রসঙ্গটি ভিন্ন যে, দ্বিতীয় স্বামী অন্য একটি নিষিদ্ধ বিষয়ের অপরাধে অপরাধী। আমরাও সে কথা

বলি— প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে যদি কেউ বিবাহ করার পর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে কাউকে পরিত্যাগ করে তবে বিবাহ ও তালাক দু'টিই বিশুদ্ধ হবে। ইমাম আবু হানিফা, তাঁর সহচরদ্বয় এবং ইমাম শাফেয়ী একথা বলেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেছেন, মনে মনে ছেড়ে দেয়ার উদ্দেশ্য থাকলেও শুদ্ধ হবে না। হালালা কর্মটি ইমামদের ঐকমত্যানুযায়ী মাকরূহ। বাগবী বলেছেন, নাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- জনৈক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমরের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, এক লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, তখন তার ভাই তাকে কিছু না বলেই ভাইয়ের পরিত্যক্তাকে বিয়ে করলো। মেয়েটিকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করাই ছিলো তার ইচ্ছা। এখন আপনি কি বলেন? হজরত ইবনে ওমর বললেন, হালাল হবে না। মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয় অধিকারে রাখার জন্য, পরিত্যাগ করার জন্য নয়। রসুল স. এর যুগে ওই লোককে আমরা ব্যভিচারী পর্যায়ে ফেলতাম। আল্লাহ্পাক হালালকারী এবং হালালকৃতের প্রতি অভিশম্পাত দিয়েছেন।

সবশেষে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহ হচ্ছে আল্লাহপাকের সীমারেখা। এ সকল বিধান আল্লাহপাক ওই সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাদের জ্ঞান আছে, এবং যারা জ্ঞান অনুযায়ী আমলও করে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩১

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

❒ যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু অন্যায়রূপে তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তোমরা

আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহের নিদর্শনকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি অবদান ও কিতাব এবং হিকমত যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন ও যদ্দারা তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন তাহা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।

আয়াতের 'আযল' (আযালাহুন্না থেকে) শব্দটি সময়সীমা ও সময়সীমার শেষ প্রান্তকে নির্দেশ করে। মানুষের আয়ুষ্কালকেও আযল বলে। আবার মৃত্যুকেও আযল বলে, যা আয়ুর প্রান্তসীমা। এখানে আযল বলে বুঝানো হয়েছে ইদ্দতের সময়সীমার শেষ প্রান্তকে। কারণ, ইদ্দতের সূচনা হয় তালাকের পরক্ষণেই।

'বুলুগ' অর্থ কোনো বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। কখনো আবার রূপক অর্থে কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়াকেও বুলুগ বলে। আলোচ্য আয়াতে 'ফা বালাগনা' বলে দ্বিতীয় অর্থটিকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেনো পূর্বোক্ত আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অটুট থাকে।

'তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমতো মুক্ত করে দিবে।'(ফা আমসিকুহুন্না বি মা'রূফ আও সাররিহু হুন্না বি মা'রুফ) — একথার অর্থ, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর একটি নন্দিত পরিসমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছণীয়। তাকে (স্ত্রীকে) অনর্থক আবদ্ধ করে রাখা বৈধ হবে না। নিশ্চিত করতে হবে সুন্দর প্রত্যাবর্তন অথবা সুশিষ্ট বিদায়।

'কিন্তু অন্যায়রূপে তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এমন করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে'— একথার অর্থ দীর্ঘদিন তাকে আটকে রেখে কিছু আদায় করতে চেষ্টা কোরো না। 'দ্বেরার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদে। কর্তৃপদে ব্যবহৃত হয় অবস্থা জ্ঞাপক হিসেবে। 'লি তা'তাদু' শব্দের 'লাম' অক্ষরটি 'লা তুমসিকুহুন্না'র সাথে সম্বন্ধিত। এটাও কর্মপদ হিসেবে 'দ্বেরার' শব্দের ব্যাখ্যা। অথবা 'লি তা'তাদু' শব্দের 'লাম' 'দ্বেরার' শব্দটির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এটি 'দ্বেরার' শব্দের ব্যাখ্যারূপে ব্যবহৃত। দ্বেরার একটি চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দ। জুলুম বা উৎপীড়নের চূড়ান্ত অবস্থা বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌পাক সৌজন্যের সাথে রাখতে বলেছেন অথবা ছেড়ে দিতে বলেছেন শিষ্টাচারের সঙ্গে। আর নিষিদ্ধ করেছেন উৎপীড়নকে। এরপর বলেছেন, যে এ রকম করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। অর্থাৎ সে নিজেই নিজেকে শাস্তিযোগ্য করে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আওফীর সূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, প্রথম দিকে এমন অবস্থা ছিলো যে, কোনো কোনো লোক লাঞ্ছনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতো। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ফিরিয়ে নিতো, পুনরায় তালাক দিতো। ক্রমাগত এ রকমই করতে থাকতো তারা। এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ওই পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করেই। বাগবী, সুদ্দী ও ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, এ আয়াত এক আনসারীকে লক্ষ্য করে

অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর নাম ছিলো সাবেত বিন ইয়াসার। সাবেত তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে পত্নীপীড়নই ছিলো তাঁর ইচ্ছা। এ অবস্থাকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন, 'এবং তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে ঠাট্টা তামাশা কোরো না।' অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানাবলীকে উপেক্ষা কোরো না এবং তার বাস্তবমান্যতায় অলসতাকে প্রশ্রয় দিও না। নাসাঈ বলেছেন, একথার অর্থ 'সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ এবং সম্প্রীতির সঙ্গে বিদায়'— আল্লাহ্পাকের এই কথাকে ঠাট্টা মনে কোরো না। এই নির্দেশটি আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত আচরণকারী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, তারা সকলে আল্লাহ্র বিধানকেই উপহাস করে। ইবনে আবী আমর তাঁর মাসনাদ গ্রন্থে এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত আবু দারদা থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এই বিবরণটি এনেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামের প্রথমাবস্থায় এমন ছিলো যে, কেউ কেউ তালাক দিয়ে বলতো, আমি তো ঠাট্টা করেছি। কেউ আবার ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়ে বলতো,আমি তো একটা তামাশা করলাম। হজরত আবু দারদা থেকে বাগবী বলেছেন, কেউ কেউ বিয়ে করেও বলতো, আমি একটি মশকরা করলাম। মানুষের এ সকল অশিষ্টাচরণের প্রতিবাদে আল্লাহ্পাক বললেন, 'তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু বানিও না।' ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে জারীর হাসান থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন—ঠাট্টা- উপহাস করে বললেও তিনটি বিষয় কার্যকর হবে— তালাক, দাসমুক্তি ও বিয়ে। ইতোপূর্বে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, হেসে খেলে বললেও তিনটি বিষয় সত্য হবে— বিয়ে, তালাক, রজায়াত।

'এবং তোমাদের প্রতি অবদান ও কিতাব এবং হিকমত, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যদ্দারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন তা স্মরণ করো'— একথার মাধ্যমে মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের প্রধান অনুগ্রহগুলোকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সকল কিছুই জানেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩২

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

❒ তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করে, তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছে মেয়েদের অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে। বলা হয়েছে, তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হলে মেয়েরা যদি পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হতে চায় তবে, হে অভিভাবকবৃন্দ! তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। বাধা দেয়া বুঝাতে এখানে 'আযালাহুন্না' বলা হয়েছে। আযল অর্থ বাধা। মূলতঃ আযল শব্দের অর্থ সংকীর্ণতা, কঠোরতা। যে রোগের কোনো চিকিৎসা নেই সে রোগকে আরববাসীরা বলে, আদ্দাউল আযাল (কঠিন রোগ)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বুলুগ (বালাগ্না) শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিলো এখানে সে অর্থ হবে না। অর্থ হবে 'পৃথক'।

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মা'কাল বিন ইয়াসারের বোন জুমলা বিন ইয়াসারকে লক্ষ্য করে। বদাহ বিন আসিম বিন আজলাম তাকে তালাক দিয়েছিলো। বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং আরো অনেকে মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন— এক লোকের সঙ্গে আমি আমার বোনের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বোনকে সে তালাক দিয়ে দিলো। ইদ্দতের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো। আমি বললাম, আমি তো তোমার সাথে আমার বোনের বিয়ে দিয়েই ছিলাম। তোমার সংসারও গুছিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তুমি হতভাগা, তাই স্বচ্ছন্দ সংসারকে ভেঙে দিয়েছো। এখন আবার বিয়ে করতে চাও কোন বিবেচনায়? না, আমার বোন আর কিছুতেই তোমার সংসারে যাবে না। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আমি হাজির হলাম রসুল স. এর খেদমতে। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি অবশ্যই তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিয়ে দেবো। এরপর তার সাথেই বিয়ে হয়ে গেলো আমার বোনের।

ইবনে জারীর কয়েকটি পদ্ধতিতে সুদ্দীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন— এ আয়াত নাজিল হয়েছে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারীকে লক্ষ্য করে। তার এক বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলো। ইদ্দত পুরো হয়ে গেলে সে পুনরায় তার বোনকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু হজরত জাবের বিয়ে দিতে অস্বীকৃত হলেন।

প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। এ রকম হতে পারে যে, দু'টো ঘটনাই ছিলো এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। আয়াতের সম্বোধনভঙ্গি দৃষ্টে মনে হতে পারে— যারা তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো তাদেরকেই যেনো এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে, তারা যেনো তালাকপ্রাপ্তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা না দেয়। কিন্তু আমি বোখারী ও অন্যান্য বর্ণনাসূত্রে আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করেছি তাতে করে একথা স্পষ্ট যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবকদেরকে। কারণ, বাধাটা ছিলো জুমলার ভ্রাতা মা'কাল বিন ইয়াসারের পক্ষ থেকে। আমার মনে হয়, উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, এখানে সাধারণভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা পুনঃবিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একজনের মাধ্যমে কোনো কর্ম সম্পাদিত হলে যেমন তার পুরো সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়, এখানে ব্যাপারটি সে রকমই। আল্লাহ্পাকের কালামে এর দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন, 'তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না।' আরো বলা হয়েছে, 'তোমাদের নিজেদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিও না।' এমতাবস্থায় আয়াতটির মর্ম দাঁড়াবে এ রকম— যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পত্নীকে তালাক দেয় এবং সেই তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতকালও পূর্ণ করে তখন, হে অভিভাবকবৃন্দ! তোমরা তাদেরকে প্রথম স্বামী অথবা নতুন স্বামী গ্রহণে বাধা দিও না। এখানে সকল অবস্থায় স্বামী উল্লেখ করা হয়েছে— বিবাহে রাখার সময়, তালাকের পর এবং পুনঃবিবাহের পর।

এখানে অভিভাবকদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তাদেরকে বাধা দিওনা। তাই শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, এ আয়াতই একথার প্রমাণ যে, মেয়েরা স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে না। যদি পারতো তবে অভিভাবকদেরকে 'বাধা দিও না' একথা বলা হতো না। শাফেয়ীগণ বলেন, মেয়েদের মতামতকে মাজাজী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাই বলা হয়, তাদের স্বীকৃতি ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হয় না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার এরকম নয়। কারণ, অভিভাবকগণ ওই সময়েও বিবাহে বাধা দিতে পারবেন, যখন বিবাহকে নারীর স্বেচ্ছাকর্ম বলে স্থির করা হবে। রসুল স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্র দাসীদেরকে আল্লাহর গৃহে যাতায়াতে বাধা দিও না।—এ নির্দেশটি তখনই দেয়া হয়েছিলো যখন মসজিদে যাতায়াত মেয়েদের জন্য স্বেচ্ছাকর্ম ছিলো। আমাদের জেনে রাখা উচিত, স্বেচ্ছাকর্মের ক্ষেত্রেই বাধা দেয়ার বা উৎসাহিত করার সুযোগ রয়েছে।

মাসআলাঃ স্বাধীনা, বুদ্ধিমতি এবং প্রাপ্তবয়স্কা নারী কি অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করতে পারে? এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, পারে। তাদের স্বীকৃতি সাপেক্ষে প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে হতে পারে। অভিভাবক যদি এতে সম্মত না থাকে— তবুও। কুফু (বংশীয় সমতা) না থাকলেও। অবশ্য বংশগত অসাম্যের ক্ষেত্রে অভিভাবক আপত্তি উত্থাপন করতে

পারে। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়- বংশগত অসাম্যের ক্ষেত্রে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, বংশগত সাম্য অসাম্য সকল ক্ষেত্রে বিবাহ সিদ্ধ। তবে তা নির্ভর করবে অভিভাবকের স্বীকৃতির উপর। ইমাম মালেক বলেছেন, অধিকাংশ মানুষই চান সৎবংশ জাতিকা, রূপবতী ও সম্পদবতীকে বিয়ে করতে। এরকম কন্যার বিবাহ অভিভাবকগণের স্বীকৃতি ব্যতীত জায়েয হবে না। বর্ণিত গুণসম্পন্ন না হলে কন্যার সম্মতিতে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তাই বলে কন্যার সম্মতিই চূড়ান্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, ওলী (অভিভাবক) ব্যতীত বিয়েই হবে না। ইমাম আবু ইউসুফও এরকম বলেছেন। এ মতের প্রবক্তাদের দলিল এই আয়াতটিই। তাঁরা আরো কিছু দলিল সংগ্রহ করেছেন হাদিস শরীফ থেকে। তাছাড়া হজরত আয়েশা সিদ্দিকার একটি বর্ণনাতেও রয়েছে— যে রমনী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার বিবাহ বাতিল। তার বিবাহ বাতিল। তার বিবাহ বাতিল। তবে যদি সে সম্ভোগিত হয়, তবে মোহরের দাবীদার হবে। যদি কলহ বাধে তবে যার অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক হবে সুলতান (প্রশাসক)। সুনান প্রণেতাগণ ইবনে জুরাইজের সূত্রে— তিনি সুলাইমান বিন মুসা থেকে— তিনি জুহুরী থেকে— তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি হজরত আয়েশা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। তাহাবী বলেছেন, আমি ইবনে আবী ইমরান থেকে— তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন থেকে— তিনি ইবনে উতবা থেকে এবং তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে এই বিবরণটি এনেছেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি ইমাম জুহুরীকে এই হাদিসটি শোনালাম। তিনি হাদিসটি অস্বীকার করে বসলেন। আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী। ইবনে জাওজী এ সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম জুহুরী সুলাইমান বিন মুসার খুব প্রশংসা করেছেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর নাম না থাকায় ইমাম জুহুরী বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন। হজরত আয়েশার অপর একটি হাদিসে রয়েছে রসুল স. এরশাদ করেন, ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না। যার ওলী নেই তার ওলী সুলতান নিজে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। এই হাদিসের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাত জয়ীফ। হজরত আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, ওলী এবং দুই ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হবে না। দারা কুতনী। এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইয়াজিদ বিন সানান এবং তার পিতাকে দারা কুতনী জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেছেন, তারা পরিত্যক্ত। আহমদও তাদেরকে জয়ীফ বলেছেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার অন্য এক হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেন, বিবাহে চারজন লোক অত্যাবশ্যক— ওলী, স্বামী ও দু'জন সাক্ষী। দারা কুতনী। এ হাদিসের বর্ণনাকারী নাফে বিন ইয়াসার, আবু খতীব মাজহুল অখ্যাত। হজরত আবু বুরদাহ্ তাঁর পিতা হজরত আবু মুসার মাধ্যমে রসুল স. থেকে বর্ণনা করেছেন— ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না। যার ওলী নেই তার ওলী

প্রশাসক। আহমদ এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ বিন আরতাতের সনদে— যিনি জয়ীফ বলে চিহ্নিত। হাদিসটি অন্য একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের বর্ণনাকারী আদী বিন ফজল এবং আবদুল্লাহ্ বিন ওসমান জয়ীফ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, যে কন্যা নিজে নিজেই বিয়ে করে, সে ব্যভিচারিণী। ওলী, দু'জন সাক্ষী ও মোহর ব্যতীত বিয়ে হয় না। কম হোক, বেশী হোক মোহর হতেই হবে। ইবনে জাওজী। এ হাদিসের এক বর্ণনাকারী তেহাসকে জয়ীফ বলেছেন ইয়াহ্ইয়া। ইবনে আদী বলেছেন, সে অযোগ্য। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, দু'জন ন্যাপরায়ণ সাক্ষী ও ওলী ব্যতীত বিয়ে হয় না। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী বুকাইর বিন বিকার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কোনো বর্ণনাকারীই নয়। আরেক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ বিন মাহরাজকে পরিত্যক্ত বলেছেন দারা কুতনী। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী সাবেত বিন জুহাইর নিজেই হাদিস অস্বীকারকারী। আবী হাতেমও এ রকম বলেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার হাদিস প্রামাণ্য নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, এক নারী যেমন অপর নারীকে বিয়ে করে না, তেমনি কোনো নারী নিজে নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। যে রমণী ব্যভিচারিণী সে-ই কেবল নিজে নিজে বিয়ে করে। দারা কুতনী এ হাদিসটি দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একটি সূত্রের জামিল বিন হাসান এবং অপর সূত্রের মুসলিম বিন আবী মুসলিম অখ্যাত। হজরত জাবের বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে— ওলীর নির্দেশনা ও দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে হয় না। ইবনে জাওজী। এ হাদিসের এক বর্ণনাকারী মোহাম্মদ বিন ওবায়দুল্লাহ্ আজরামীকে মাতরুক বলেছেন নাসাঈ ও ইয়াহ্ইয়া। তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য নয়। আরেক বর্ণনাকারী কতর বিন ইয়াসির জয়ীফ। হজরত মুআজ বিন জাবাল বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে যে নারী বিবাহ করে সে তো ব্যভিচারিণী। দারা কুতনী। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারীর নাম আবু আসমা এসিম বিন আবী মারিয়াম। তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়। দারা কুতনী বলেছেন, সে মাতরুক।

হানাফীগন 'তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে' (আয়াত ২৩০) এবং 'তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীগণকে বিবাহ করতে চাইলে' (আয়াত ২৩২) — এই দুই আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। আয়াত দু'টি স্পষ্ট অর্থবোধক অর্থাৎ মেয়েরা নিজেরাই বিয়ে করতে পারবে। স্বামী নির্বাচনের অধিকার তাদের রয়েছে। তাছাড়া এ সম্পর্কে একটি মারফু হাদিসও রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসে বলা হয়েছে, বিধবা নারীগণ ওলী অপেক্ষা নিজেরাই অধিক দায়িত্বশীলা। আর বিবাহে কুমারী নারীদের স্বীকৃতি নেয়া অত্যন্ত জরুরী। মৌনতাই তাদের স্বীকৃতি। মুসলিম,

মালেক, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ। হাদিসটি থেকে দলিল সংগ্রহের কারণ একথা বুঝে নেয়া যে, বিবাহ বন্ধনের আয়োজন ছাড়া ওলীগণের আর কোনো হক নেই। আর বিধবা নারীরা ওলীদের চেয়ে নিজেরাই অধিকতর হকদার। তাই তাদের জন্য নিজে নিজেই বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়া উত্তম। হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান বর্ণিত হাদিসটিও এই বিষয়ের আরেকটি দলিল। তিনি বলেছেন, এক নারী রসুল স. এর নিকটে হাজির হয়ে বললো, আমার পিতা এক লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। আমি এ বিয়েতে সম্মত নই। রসুল স. তাঁর পিতাকে বললেন, বিয়ে দেয়ার অধিকার তোমার নেই। আর মেয়েটিকে বললেন, যাও তোমার যাকে পছন্দ হয় তাকে বিয়ে করো। ইবনে জাওজী। শাফেয়ীগণ বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল— আর মুরসাল হাদিস তাঁদের নিকট দলিল হিসাবে গণ্য নয়। আমরা বলি, মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট । হজরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে— কাতাদাহ্ নামের এক মেয়ে আমাকে বললো, আমার আব্বা বংশমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর আপন ভাতিজার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। এ বিয়ে আমার পছন্দ নয়। আমি বললাম ঠিক আছে, বসো। ইত্যবসরে রসুল স. ঘরে এলেন। মেয়েটি তাঁকেও স. ঘটনাটি খুলে বললো। রসুল স. তার পিতাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, কন্যার মতামতই চূড়ান্ত। মেয়েটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল, আমি আমার পিতার দেয়া বিয়েকেই কবুল করে নিলাম। কন্যার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত একথাটা সকল মেয়েকে জানিয়ে দেয়াই ছিলো আমার এখনকার অভিযোগের উদ্দেশ্য। নাসাঈ। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান পিতা কিংবা অভিভাবকের অধিকার বহির্ভূত। এই বিষয়ে একটি বিরোধও লক্ষ্যণীয়। কারণ, ইতোপূর্বে হজরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হবে না। হানাফীগণ এই বিরোধের নিরসন করেছেন এ কথা বলে যে, দু'টি বর্ণনার মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলে দেখতে হবে কোনটি অধিক প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী। অথবা দু'টি বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো পথ আছে কিনা। এভাবে পরীক্ষা করতে যেয়ে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম বর্ণিত হাদিসটির সনদ অধিকতর শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ। তাই তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্য বর্ণনাগুলোর সনদ দুর্বল। তাই সেগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম প্রাধান্য দেওয়াই সমুচিত। আমরা বলি, ১. ওলীগণের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয় না। হাদিসটির অর্থ হচ্ছে এ রকম— বিবাহ সুন্নত পদ্ধতিতে হয় না। ২. যে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব বিদ্যমান সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হবে। যে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের সুযোগ নেই, সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হবে না। যেমন কন্যা সম্মত থাকলেও মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বিবাহ হবে না। মুহরিমের (নিষিদ্ধ পুরুষের) সঙ্গে বিবাহ হবে না এবং প্রথম স্বামীর ইদ্দত পালনকারিণী বিবাহ করতে পারবে না। হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে,

বংশগত সাম্য না থাকলে বিবাহ হবে না। ওলীর অনুমতির কথা বলা হয়েছে এ সকল ক্ষেত্রে। আমরা বলি, হজরত আয়েশার হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত যদি কোনো মেয়ে বিয়ে করে, তবে সে বিয়ে শুদ্ধ হবে। এরকম বিবাহ জায়েয। কারণ, এখানে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। বরং বুঝতে হবে এতে করে ওলীর অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওলী যে বিবাহের অনুমতির অধিকারী সেই বিবাহই সম্পন্ন হয়েছে— তাকে বাদ দিয়ে হলেও। কারণ, বিবাহের চূড়ান্ত সম্মতিদানের অধিকার কন্যার। এ হচ্ছে কুমারী রমণীর প্রসঙ্গ। আর বিধবা রমণীরা তো বিবাহ করার ব্যাপারে অভিভাবক অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্না। আর অভিভাবকেরা ওই সকল বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখেন যে সকল বিবাহে কুফু (বংশগত সমতা) রক্ষিত হয়নি।

'তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়' এ কথাটি প্রমাণ করে যে, প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা নারীর উপর মতামত চাপিয়ে দেওয়া জায়েয নয়। বিধানটি ঐকমত্যপুষ্ট। কুমারী প্রাপ্তবয়স্কাদের ক্ষেত্রে মতামত চাপিয়ে দেয়া যাবে কি না- সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর বিয়ে তার সম্মতি ব্যতীত তার পিতামহ ও পিতা সম্পন্ন করতে পারেন। ইমাম মালেক বলেছেন, কেবল তার পিতা পারেন। ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ বক্তব্য এ রকমই।

আলোচ্য আয়াতটি বিধবাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে— বিবাহিত নারীর অধিকার তার অভিভাবক অপেক্ষা অগ্রগামী। আর কুমারী নারীর পিতা নিজে তার কন্যা থেকে সম্মতি আদায় করবে। ইবনে জাওজী এ হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা বলি, এরকম দলিল গ্রহণ কোরআনের আয়াত ও হাদিসবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি আমাদেরই পক্ষে। কারণ, এখানে কুমারী নারীর নিকট থেকে তার অভিভাবক সম্মতি আদায় করবে বলা হয়েছে। সম্মতি বা অনুমতি চাওয়া এবং মতামত চাপিয়ে দেয়া নিশ্চয়ই এক কথা নয়। এ আয়াতেই বলা হয়েছে, 'এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম।' এ কথাতে প্রমাণ হয় যে, মেয়েদেরকে বিবাহে বাধা দেয়া যাবে না। তাদের সম্মতিগ্রহণ অপরিহার্য। অর্থাৎ বিধবা বা কুমারী কারো ক্ষেত্রেই মতামত চাপানোর উৎপীড়ন করা যাবে না।

যদি কেউ বলে, বিবাহের সম্মতি দানের ক্ষেত্রে বিধবা ও কুমারীর বিধান যদি একই হয়, তাহলে হাদিস শরীফে কেবল 'বিবাহিত নারীদের অধিকার ওলীদের চেয়ে অগ্রগামী' একথা বলা হলো কেনো? কুমারীদের ক্ষেত্রে তো এরকম বলা হয়নি। আর মুসলিমের বর্ণনায় বিধবা এবং কুমারীদেরকে পৃথক করে উল্লেখ করার কারণই বা কী? এই দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমরা বলি, কুমারী ও বিধবাদের সম্মতি প্রদানের ধরন যে ভিন্ন, সেকথা বুঝাতেই তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা

হয়েছে। বলা হয়েছে, কুমারীর অনুমতি হলো মৌনতা। কিন্তু বিধবার মৌনতা অথবা তার অনুমতি প্রদানকে সম্মতি মনে করা যাবে না। বরং তার জন্য জরুরী যে, সে প্রথম থেকেই একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। অথবা সরব বক্তব্য প্রকাশ করবে। এছাড়া কুমারীর বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগে হয় না। তাই হাদিস শরীফে কুমারী ও বিধবাকে সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে তাদের সম্মতি দানের পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে।

হাসান থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদিসগুলোকে দলিল হিসেবে নিয়েছেন ইবনে জাওজী। তিনি বলেছেন, বিয়ের সময় কুমারী নারীদের অনুমতি নেয়া উচিৎ। যদি তারা অস্বীকার করে তবে বলপ্রয়োগ করতে হবে। হাদিসটি সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকেই দুর্বল। মতনের দিক থেকে দুর্বল এ কারণে যে, এখানে অনুমতি ও বলপ্রয়োগের কথা একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর। আর সনদের দুর্বলতা এই যে, এই সনদের একজন বর্ণনাকারী আবদুল করিম কুখ্যাত। তার কুখ্যাতি সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিস একমত। আমরা আমাদের মতের সমর্থনে ইতোপূর্বে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছি। এখানে এ সম্পর্কে আরো একটি হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক কুমারী রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমার পিতা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন, আর এ বিয়ে আমার পছন্দ নয়। রসুল স. তাকে স্বমতে বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার দিলেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা। হাদিসটির সনদ মুত্তাসিল এবং এর বর্ণনাকারীগণ পরীক্ষিত। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। হতে পারে কোনো সূত্রে এটি মুরসাল। কিন্তু মুরসাল আমাদের নিকট দলিল। হাদিসটির কোনো কোনো সূত্র মুত্তাসিল। ইবনে কাত্তান বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। মেয়েটির নাম ছিলো খানসা বিনতে জুজাম। কিন্তু সে কুমারী ছিলো না ছিলো বিধবা। আর তার বিবাহে সে সন্তুষ্ট ছিলো না। তাই রসুল স. তার বিবাহ বাতিল করে দিয়েছিলেন। বোখারী এরকম বলেছেন। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, খানসা ছিলো কুমারী। কিন্তু বোখারীর বর্ণনায় 'বিধবা ছিলো' কথাটি প্রাধান্য পেয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. কুমারী ও বিধবা দু'জন নারীর বিবাহ ভঙ্গ করে দিয়েছিলেন— যাদেরকে তাদের পিতা তাদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনী বলেছেন, এক লোক তাঁর কুমারী মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে সন্তুষ্ট ছিলো না। রসুল স. সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে ওমরের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে— যে নারী পিতার দেয়া বিয়েতে সন্তুষ্ট থাকতো না, রসুল স. তার সে বিয়ে ভেঙে দিতেন। সে সধবা হোক অথবা বিধবা।

হজরত জাবের থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন— এক লোক কন্যার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিয়ে দিলো। মেয়েটি রসুল স. এর নিকটে তার অসন্তোষের কথা জানালো। রসুল স. তখন তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, কাতাদাহ নাম্নী এ মহিলা রসুল স.এর নিকটে এসে বললো, আমার পিতা বড়োই সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমার অমতে তার ভাতিজার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের অসৎ স্বভাব দূর করাই ছিলো তার এ বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য। রসুল স. তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করলেন। সে বললো, আমি আমার পিতার দেয়া বিয়ে মেনে নিয়েছি। এখন আমার অভিযোগ পেশ করার উদ্দেশ্য এই যে, অন্য মেয়েরা যেনো জানতে পারে— বিয়ের ব্যাপারে পিতাদের কোনো অধিকার নেই। দারা কুতনী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত জাবের এবং হজরত আয়েশার হাদিসগুলো মুরসাল। হজরত আয়েশা থেকে ইবনে বরীদের হাদিস শোনা প্রমাণিত হয়নি। হজরত জাবেরের হাদিসটিকে ইমাম আহমদও গ্রহণ করেননি। দারা কুতনী বলেছেন, এটাই বিশুদ্ধ কথা যে, হাদিসটি আতা থেকে মুরসাল। হাদিসটির মারফু হওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন সুয়াইব। ইবনে জাওজী বলেছেন, হজরত ইবনে ওমরের হাদিস প্রামাণ্য নয়। কারণ, নাফে থেকে ইবনে আবু জিব হাদিস শুনতেই পারেন না। বরং তিনি শুনেছেন ওমর বিন হোসাইন থেকে। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, হাদিসটি বাতিল। আমরা বলি, মুরসাল হাদিস হুজ্জত (দলিল) বিশেষ করে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এবং প্রমাণকে শক্তিশালী করার সময়। ইবনে জাওজী বলেছেন, বংশগত সমতাহীন প্রতিবেশী কুমারী নারীর বিবাহ প্রসঙ্গে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ, হজরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে— মেয়েটি বলেছে তার পিতা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলো। পিতার ভ্রাতষ্পুত্র অর্থাৎ কন্যার চাচাতো ভাই তো একই বংশভূত। সুতরাং বংশগত অসাম্যের কথা এখানে ওঠে না। যদি বলা হয়, সে ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলো মায়ের সম্পর্কের দিক থেকে। তবে তাকে স্বকপোলকল্পনা ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

মাসআলাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহে পিতার এখতিয়ার (অধিকার) সংরক্ষিত— এ বিষয়ে ফেকাহ তত্ত্ববিদগণ একমত। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার বিবাহের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার বিবাহ জায়েয নয়। বরং বিধবার বিবাহে কন্যার সম্মতি চূড়ান্ত কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কা না হলে তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। মতামত গ্রহণ করতে হবে বিবেকবতীর। অথচ অপ্রাপ্ত বয়স্কাকে বিবেকবতী বলা যায় না। তাই তার বিবাহ জায়েজ হবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— বিধবার বিবাহ তার অনুমতি ব্যতিরেকে দেয়া যাবে না। তিরমিজি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন

হাদিসটি শুদ্ধ। ইতোপূর্বে বোখারী বর্ণিত খানসা সম্পর্কিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা তার সম্মতি ছাড়াই বিয়ে দিয়েছিলেন এবং রসুল স. সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে বিধবার বিয়েতে ওলীর কোনো এখতিয়ার নেই। দারা কুতনী বর্ণিত এই হাদিসটি জয়ীফ। তিনি নিজেই হাদিসটির ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। এই বিষয়টি ঐকমত্যসিদ্ধ যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার নিকট থেকে অনুমতি নেয়া যাবে না। আর সে অনুমতি দিলেও, সে অনুমতিকে অনুমতি মনে করা যাবে না। এটাও ঐকমত্য সাব্যস্ত যে, সে স্ব-উদ্যোগে বিবাহ করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিয়ে দিতে পারবে। কন্যা এতে সম্মত না থাকলেও। অপ্রাপ্ত বয়স্কা এবং কুমারী— এই দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে অভিভাবকদের অধিকার। সুতরাং কন্যা কুমারী না হয়ে বিধবা হলেও অভিভাবকের অধিকার থেকেই যায়। তাই অভিভাবক তাকে বিয়ে দিতে পারবে।

'তারা যদি বিধিমতো পরস্পর সম্মত হয়'— এখানে বিধিমতো বলতে বুঝানা হয়েছে শরিয়তের বিধান মোতাবেক এবং শালীনতার বিধি অনুসারে। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, যে বিবাহ বিধিমতো সম্পন্ন হয় না সেই বিবাহে বাধা দান করা বৈধ। যেমন, যে বিবাহ সমতা সম্পন্ন নয় অথবা ইদ্দত পালনকালে বিবাহবদ্ধ হয়— এ সকল বিবাহকে বিধিমতো বলা যায় না। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে বাধা দেয়া যাবে।

পরবর্তী বাক্যটি শুরু হয়েছে এভাবে— 'জালিকা ইউয়াযুবিহি মানকানা মিনকুম।' এখানে 'ইহা' (জালিকা) শব্দটি একটি ইঙ্গিতসূচক অব্যয়। শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল লোককে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা বিধিসম্মত বিবাহে প্রতিবন্ধক হয় না। শব্দটির মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে তাদের সকলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা শব্দটি কেবলই ইঙ্গিত। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সুনির্দিষ্টভাবে এই ইঙ্গিতের লক্ষ্য নয়। কিংবা কেবল রসুল স.ই এই ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য।

'ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হয়।' —একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, শরিয়তের বিধিবিধান কেবল বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য। অবিশ্বাসীরা শরিয়তের বিধানের আওতায় পড়ে না।

'ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম'— অর্থাৎ বিধিসম্মত বিবাহে বাধা না দেয়ার এই বিধানের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ। এই বিধি লংঘিত হলে শুদ্ধতম ও পবিত্রতম জীবন কলুষিত হবে। বিস্তার ঘটবে ব্যভিচারের। আর বিবাহে পরস্পর সম্মতির বিধান দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, এতে করে প্রতিষ্ঠিত হবে দাম্পত্য জীবনে শান্তি। যদি এই বিধান জারী করা না হতো তবে এক পক্ষ সম্মত না হলেও অন্য পক্ষ বল প্রয়োগ করতো অথবা মনান্তর ও মতান্তর শেষ

পর্যন্ত এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো; যাতে করে খোলা তালাক হয়ে পড়তো অনিবার্য। তাই বলা হয়েছে, 'ইহা' (আল্লাহ্‌পাক প্রবর্তিত এই বিধান) তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম।

শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।' অর্থাৎ তোমরা জানো না কিসে তোমাদের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ। আর আল্লাহ্‌পাক সব কিছুই জানেন। তাই তোমাদের কল্যাণকে নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যেই দেয়া হচ্ছে এই উপদেশ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৩

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

❐ যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানগণকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণপোষণ করা। কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। এবং উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখিতে চায় তবে তাহাদের কাহারো কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা স্তন্য পান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ উহার দ্রষ্টা।

মায়ের জন্য তার শিশুকে দুধ পান করানো বাধ্যতামূলক। তবে মা অসমর্থ হলে এই বাধ্যবাধকতা আর থাকে না। তখন শিশু অন্য দুগ্ধবতী রমণীর দুধ পান করতে পারবে। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা পরস্পর সংকীর্ণ হও তবে দুধ পান করাও অপর রমণী থেকে।' অথবা 'শিশুর কারণে মাকে কষ্ট দিবে না' আয়াত দ্বারা এই বিধানটি বিশিষ্টার্থক করা হয়েছে। শিশুর দুধ পান করানোর মূল দায়িত্ব তার মায়েরই। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার ইদ্দত পালনকারিণীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সন্তানের দুগ্ধদাত্রী হিসেবে নিয়োগ করে, তবে তা জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে, মায়ের দুধ শিশুর আমানত। সুতরাং মাকে দুধ পান করাতেই হবে। তবে দুধ পান করাতে অসমর্থ হলে ভিন্ন কথা। মা দুধ পান করাতে না চাইলে তাকে অক্ষম (মাজুর) মনে করতে হবে। কিন্তু সে যদি অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধ দান করতে রাজী হয়, তবে তাকে আর অক্ষম মনে করা যাবে না। এবং তাকে দুগ্ধ পানের বিনিময় প্রদানও সিদ্ধ হবে না। যদি কেউ বলে, এই আয়াতের বিধানানুযায়ী তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দত পুরো হওয়ার পর তার সন্তানকে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করা জায়েয নয় অথচ এ বিষয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যসিদ্ধতা রয়েছে— কারণ কি? আমরা বলি, অর্থের বিনিময়ে মাতাকে তার সন্তানের দুগ্ধদান কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা, 'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করায় তবে মজুরী দিয়ে দাও।' এই আয়াতেও বলা হয়েছে, জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ পোষণ করা। সুতরাং স্ত্রীর ভরণপোষণ দান যেমন স্বামীর প্রতি আবশ্যিক তেমনি সন্তানকে দুগ্ধদানও স্ত্রীর প্রতি বাধ্যতামূলক। এই উভয় বাধ্যবাধকতা বলবৎ থাকে ইদ্দত পূরণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইদ্দতের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব আর থাকে না। তাই তখন দুগ্ধ দানের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে যায় স্ত্রী। আর তখনই মজুরী খোরপোষের স্থলবর্তী হয়। 'পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে'— কোনো কোনো মা তার সন্তানকে দুগ্ধ দানে আলস্য করে। তাই এখানে দু'বছর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত দুগ্ধদান আবশ্যিক।

এই সীমা বেঁধে দেয়ার অর্থই হচ্ছে দু'বছরের সীমা কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না। কারণ, মানুষের মূল অঙ্গ থেকে অন্য মানুষ উপকার গ্রহণ করতে পারে না। কেবল অসহায়ত্বের কারণে দু'বছর এই অবকাশ ছিলো। দু'বছর পর শিশুরা বিকল্প খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। তাই তখন থেকে বলবত হয়েছে দুগ্ধপানের নিষিদ্ধতা।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছিলো, 'যে স্তন্য পান কাল পূর্ণ করতে চায়'— পূর্ণ স্তন্য দান কাল যে দু'বছর, সে কথা এখানে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, খোরপোষ দানের দায়িত্ব পিতার এবং দুগ্ধ দানের দায়িত্ব

মাতার— যদি মাতা অসমর্থ না হয়। কাতাদা বলেছেন, পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করানোকে আল্লাহ্পাক ফরজ করেছিলেন। অতঃপর 'যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়' এ কথা বলে ফরজের গুরুভার লাঘব করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, দু'বছর পর স্তন্যদান বৈধ হবে না। দু'বছর পরের স্তন্য পানকে স্তন্য পান হিসেবে গণ্যই করা হবে না। তাই স্তন্য পানের কারণে যে সকল রমণীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, সে সকল নিষিদ্ধতা দু'বছর পরের পানকারীর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আবু ইউসুফ, শাফেয়ী ও আহমদ। হজরত ওমরও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ রকম বলেছেন ইবনে আবী শায়বাও। ইমাম মালেক বলেছেন, স্তন্য পান কাল দু'বছরের কিছু অধিক। তবে তিনি বলেননি কিছু অধিক অর্থ কতোদিন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এই কিছু অধিক অর্থ তিন মাস। ইমাম জুফার বলেছেন, স্তন্যপান কাল তিন বছর। যারা দু'বছর বলেন তাদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'কামেলাইন।' একথার অর্থ, পূর্ণ স্তন্যপান কাল। আর এখানে এই স্তন্যপান কালের কথা স্পষ্টতঃই দুই বছর বলে দেয়া হয়েছে। দুই বছর পরে সকল শিশু মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য খাদ্য গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয় না। শিশুর এই অভ্যস্ততার তারতম্য অনুসারে ইমামগণের কথিত সময়সীমার তারতম্য সূচিত হয়েছে। আর এ কারণেই ইমাম মালেক সুনির্দিষ্ট সময়সীমার কথা বলেননি।

আমরা বলি, দু'বছর পর শিশুরা মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয় কি হয় না— সে রকম বিবরণ দান এই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। এখানে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করার অর্থ, কেউ যেনো দুই বছরের স্তন্য পান কালের এই সময়সীমাকে কমিয়ে আনার প্রয়াস না পায়। আমাদের এই দাবীর সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের ওই হাদিস, যাতে বলা হয়েছে— রসুল স. বলেন, সেটাই হচ্ছে স্তন্যপান কাল যেটা সম্পন্ন হয় দু'বছরে। ইবনে জাওজী, দারা কুতনী। ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণিত হয়েছে— দারা কুতনী মন্তব্য করেছেন, এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী সঠিক। তবে হাইসুম বিন জামিল সম্পর্কে কিঞ্চিত আপত্তি থাকলেও তিনি ছিলেন হাফেজ ও সেকাহ (বিশ্বস্ত)। তাঁর বিশ্বস্ততাকে সমর্থন করেছেন- আহমদ, আজালী, ইবনে হাব্বান এবং আরো অনেকে।

'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা'— এ কথার অর্থ, জনকই যেহেতু সন্তানের জন্মদাতা, তাই সন্তানের স্তন্যদাত্রীকে ভরণপোষণ দানের দায়িত্ব তারই। সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব সব সময় তার পিতার উপর। শিশুকালে স্তন্যদাত্রীর মাধ্যমে এবং দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সরাসরি মাতার উপর ভরণপোষণের কোনো দায়িত্ব নেই। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। আবার খাস্সাফ এবং হাসানের বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফার অভিমতের কথা বলা হয়েছে এ রকম— সন্তানের ব্যয়ভার জনকজননী উভয়ের

দায়িত্বভূত। অংশীদারিত্ব অনুপাতে এই ব্যয়ভারের দুই ভাগ জনকের এবং এক ভাগ জননীর।

'কাহাকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না'। এ কথায় বুঝা যায় যে, সাধ্যাতীত ব্যয়ভার যুক্তিযুক্ত মনে হলেও শরিয়তসম্মত নয়। সাধ্যবহির্ভূত বিধান আল্লাহ্‌পাক কখনই দান করেন না।

'কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না'— এ কথার অর্থ মা তার সন্তানের জন্য সন্তানের পিতাকে কষ্ট দিবে না। মজুরী সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করবে না অথবা ক্লেশ দিবে না। সন্তানের পরিচর্যায় নিজে উদাস থাকবে, অথচ সন্তানের পিতাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে— এ রকম করবে না। আর সন্তানের পিতাও সন্তানের কারণে সন্তানের মাতাকে কষ্ট দিবে না। যেমন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাতা তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করাচ্ছিলো— এমতাবস্থায় অন্য মহিলাকে দেওয়ার জন্য সন্তান ছিনিয়ে নিবে না। অথবা পারিশ্রমিক কমিয়ে দেবে না। কিংবা স্তন্য দানে বল প্রয়োগ করবে, অসমর্থ হলেও। এখানে সন্তানকে তার মাতা এবং পিতা উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা হয়েছে এবং বিধান জারী করা হয়েছে যে, সন্তানের কারণে তার মাতা-পিতা একে অপরকে কষ্ট দিতে পারবে না।

'এবং উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরূপ কর্তব্য'— এখানে উত্তরাধিকারীগণ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এখানে উত্তরাধিকারীগণ বলতে বুঝানো হয়েছে— ওই সকল দুগ্ধপোষ্য শিশুকে যারা তাদের মৃত পিতার উত্তরাধিকারী। তাদের দুগ্ধ পানের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান করতে হবে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে। পিতা কোনো সম্পদ না রেখে গেলে, ব্যয়ভার বহন করবে মাতা। কেনোনা সন্তানের ব্যয়ভার সব সময় পিতা মাতার দায়িত্ব। কেউ কেউ বলেছেন, ভরণপোষণের দায়িত্ব মাতা অথবা পিতার মধ্যে যে জীবিত থাকবে তার। স্তন্যপানের ব্যয়ভার বহণ করবে সেই। আর আহার বস্ত্র ইত্যাদি ব্যয়ভার বহণ করবে পিতা। ইমাম শাফেয়ীও এই মত পোষণ করেন। তবে তার প্রথমোক্ত অভিমতটি ইমাম মালেকের অভিমত সদৃশ। প্রথমোক্ত অভিমতটি সম্পর্কে বলতে হয়, সন্তান যদি তার নিজের সম্পদ থেকে ব্যয়ভার গ্রহণ করে, তবে অন্যান্য দায়িত্বশীল অভিভাবকদের কর্তব্য কী হবে? একটু আগেই পিতার ব্যয়ভারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে উত্তরাধিকারীগণের কথা। সুতরাং পিতা ও উত্তরাধিকারীর পৃথক উল্লেখের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। দ্বিতীয় অভিমত সম্পর্কে একই ধরনের পুনরুক্তির প্রশ্নটি এসে যায়। সুতরাং মাতাপিতা ও উত্তরাধিকারীগণ নিশ্চয়ই এক নয়। উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যা এখানে অন্য কিছু হবে।

ইমাম আহমদ, ইসহাক, কাতাদা এবং ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, উত্তরাধিকারী অর্থ সন্তানের উত্তরাধিকারী। সে নারী হোক অথবা পুরুষ। অর্থাৎ

প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে তাদের উত্তরাধিকারের অংশানুপাতে বলপ্রয়োগ করে সন্তানের ভরণপোষণ আদায় করতে হবে। এই বিধানের আওতায় রক্ত সম্পর্কীয় এবং রক্ত সম্পর্ক বহির্ভূত সকল উত্তরাধিকারী অন্তর্ভূত হবে। সন্তান ওই উত্তরাধিকারীর অংশীদার কি না, সে প্রশ্নে কিছু যাবে আসবে না। যেমন, চাচাতো ভাই, ভাতিজা জেঠাতো বোনের অংশীদার হয়। অথচ এর বিপরীতরা তা অংশীদার হয় না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আহমদ বলেন, বলপ্রয়োগ সেখানেই প্রযোজ্য, যেখানে পারস্পরিক অংশীদার বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফার অভিমত ইমাম আহমদের প্রথমোক্ত অভিমতের মতো। আর আয়াতের বক্তব্যও এ রকম। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উত্তরাধিকারীগণকে হতে হবে নিকটাত্মীয়। এভাবে উত্তরাধিকারীগণকে সীমাবদ্ধ করার সমর্থনে রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের কেরাত— 'ওয়া আলাল ওয়ারিসি (জিরিহ্মিল মুহরিমি) মিসলি জালিকা।' আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উত্তরাধিকারী অর্থ রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় (আসাবা)। অর্থাৎ সন্তানের পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি তার প্রতিপালনের জন্য বলপ্রয়োগ করা যাবে। যেমন, চাচা, দাদা, ভাই ইত্যাদি।

বাগবী বলেছেন, হজরত ওমর ফারুক এই অভিমত পোষণ করেছেন। আর এর অনুসরণ করেছেন ইব্রাহিম, হাসান, মুজাহিদ, আতা ও সুফিয়ান। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে ভরণপোষণের ব্যয়ভারের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে কল্যাণকামীতার কথা। অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ যেনো ওই সন্তানের কল্যাণকামী হয়, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় না থাক। বাগবী বলেছেন, এই অভিমতটি ইমাম জুহরী ও শা'বীর। আমি বলি, এ রকম অর্থ করা ঠিক নয়। কারণ, ক্ষতির চেষ্টা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ কেবল উত্তরাধিকারীদের মধ্যেই সীমিত হতে পারে না। আর ক্ষতির প্রসঙ্গ পূর্বোক্ত বাক্যে উল্লেখই করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সন্তানের পিতা-মাতা একে অপরের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিন্তু এখানে পৃথক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীগণের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। সে কর্তব্য হচ্ছে ভরণপোষণ জনিত কর্তব্য। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিকট আত্মীয়দের ব্যয়ভার বহন করা সম্পদশালীদের জন্য ওয়াজিব। যদি সেই নিকটাত্মীয় হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অভাবগ্রস্ত অথবা অভাবগ্রস্তা। অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক পুরুষ ও বয়স্কা নারী। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে শিশুদের উদ্দেশ্যে। তবুও অভাবী নিকটাত্মীয় নারী-পুরুষেরাও এর অন্তর্ভূত হবে। কিন্তু উপার্জনক্ষম অভাবীরা এর অন্তর্ভূত হবে না। তাদের ব্যয়ভার বহণ করা কারোর প্রতি বাধ্যতামূলকও হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রত্যেকের উপর তার মাতা-পিতা ও দাদা-দাদীর ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব। যদি তারা মুখাপেক্ষি, অভাবী অথবা

কাফেরও হয়। এ দায়িত্ব পুত্র-কন্যা উভয়ের উপর। আর এ দায়িত্ব উত্তরাধিকারের বিষয়াবলীর অন্তর্ভূত নয়। এ বিধানের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দায়িত্ব দুইভাগ পুরুষের এবং এক ভাগ নারীর। ইমাম আবু হানিফা থেকেও এইরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়। তবে এই আয়াত তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি নয়। বরং তিনি বলেছেন, তাদের ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব আদি অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। অংশীদারিত্বের সূত্রে নয়। কাফের পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তোমাদের পিতা-মাতা যদি তোমাদেরকে এ বিষয়ে বাধ্য করে যে, তুমি আমার সাথে-— ওই সবের শরিক করো, যার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না— সেক্ষেত্রে তুমি তাদের অনুসরণ কোরো না। পৃথিবীতে সৎভাবে তাদের সাথে অবস্থান করো।' সুতরাং এটা কোনো সৎ অবস্থান নয় যে, পিতা-মাতা নিরাহারের কষ্ট সহ্য করবে আর সম্পদ সঞ্চয় করবে সন্তান। রসুল স. বলেছেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার। সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সেটাই যা মানুষ ভক্ষণ করে পুত্রের উপার্জন থেকে। যেহেতু পুত্রই তার উপার্জন। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ধারাবাহিক সূত্রে আমর বিন সোয়াইব, তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলো, আমি বিত্তাধিকারী। আর আমার পিতা আমার অর্থবিত্তের মুখাপেক্ষী। রসুল স. বললেন, তুমি এবং তোমার অর্থবিত্ত তোমার পিতার। সন্তান-সন্ততি সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন। কাজেই তোমরা সন্তানের উপার্জন থেকে আহার করো। হাদিসের বর্ণনানুসারে দেখা যায়, পিতা তার পুত্রের সম্পদের মালিক কিন্তু উম্মতের ঐকমত্য—উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত ও অন্যান্য কারণে সরাসরি এরকম বলা যাবে না। বরং এতোটুকুই বলা সঙ্গত যে, প্রয়োজনে পিতা তার পুত্রের সম্পদাধিকারী হতে পারে। তাই পিতা-মাতার ব্যয়ভার বহণ পুত্রের উপর ওয়াজিব। উত্তরাধিকারীদের কারো প্রতি এ রকম দায়িত্ব নেই। মনে রাখতে হবে, এই বিধানটি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানের আওতাভূত নয়। এ হচ্ছে, দাদা-দাদী ও পিতা-মাতা সংক্রান্ত নির্দেশনা। এই নির্দেশনানুযায়ী পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদা-দাদী অংশ পায় এবং বিবাহে দাদা ওলী হয়। আমর বিন সোয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল পাক স. এর নিকটে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, আমি সহায়সম্বলহীন। এক এতিম শিশু আমার পোষ্য। তিনি স. বললেন, ওই এতিম শিশুর সম্পদ থেকে আহার করো। কিন্তু অপব্যয় কোরো না, অথবা নিজের নিকট সঞ্চয় কোরো না। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

ইমাম মালেক বলেছেন, পিতা-মাতা ও নিজের সন্তান ব্যতীত অন্য কারো জন্য খোরপোষ ওয়াজিব নয়। দাদা-দাদী, কিংবা নাতি-পুতির জন্যও ওয়াজিব নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মূল ও শাখা অর্থাৎ পিতা, দাদা এবং পুত্র, পৌত্র, উভয় সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক খোরপোষ প্রদান সাধারণভাবে বাধ্যতামূলক। তিনি আরও বলেছেন, খোরপোষের দায়িত্ব বর্তে কেবল পুরুষের উপর, নারীদের উপর নয়। যেমন দাদা, পিতা, পুত্র, পৌত্র। ইমাম মালেক বলেছেন, ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি সকলের প্রতি খোরপোষের দায়িত্ব বিদ্যমান। এর মধ্যে যে ধনী সে অভাবীর ব্যয়ভার বহণ করবে।

কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই— একথার অর্থ পিতা-মাতা উভয়ে পরামর্শক্রমে শিশুর স্তন্যপান দুই বছরের আগেই বন্ধ করে দিতে চায়। এই পরামর্শ করার সুযোগ রয়েছে দুই বছরের আগেই। কারণ, আয়াতে দুই বছরে দুধ ছাড়ানো বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কেউ কেউ দ্বিধান্বিত হয়ে বলেছেন, পিতা-মাতা দুধ ছাড়ানোর প্রয়োজন যদি অনুভব করে দুই বছর পূর্ণ করার পর, তখন যদি তারা পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়.......। কিন্তু এ রকম বক্তব্য গ্রহণীয় নয়। কারণ, এই বাক্যে উল্লেখিত 'ফা' অব্যয়টির মাধ্যমে দুধ পানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাফসীরে মাদারেক প্রণেতা বলেছেন, এখানে পরামর্শসংক্রান্ত বিধানটি একটি সাধারণ বিধান। এই পরামর্শ দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেও হতে পারে কিংবা হতে পারে পরেও। বস্তুত দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণার পর এই হচ্ছে কিছুটা অবকাশ। তাফসীরে মাদারেক রচয়িতার এই ব্যাখ্যাটি ইমাম আবু হানিফার অভিমতপুষ্ট। অভিমতপুষ্ট একারণে যে, তাঁর মাজহাবের নিয়মানুযায়ী স্তন্যপানের সময়সীমা দুই বছর ছয় মাস। ইনশাআল্লাহ্ সুরা নেসার আলোচনায় বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দেয়া হবে।

কেউ যদি বলেন, দুগ্ধ পান বন্ধের পরামর্শের কথা বলে স্তন্য পানের বাধ্যতামূলক সময়সীমাকে কি রহিত করা হয়নি? আমরা বলি, আল্লাহ্পাকের বর্ণনাভঙ্গি এ রকম 'যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়'—এতে করে বুঝা যায়, দুগ্ধপানের পরামর্শ একটি মোবাহ বিধান। অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য স্তন্যপান বন্ধ সংক্রান্ত পরামর্শকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এ রকম পরামর্শ তারা করতে পারবে। যদি করে তবে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। সুতরাং এই মোবাহ বিধান বাধ্যতামূলক বিধানের বিপরীত নয়। তাই, রহিত হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসে না।

বর্ণিত পরামর্শ সম্পাদন করতে হবে শিশুর শারীরিক প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ একথা ভেবে দেখতে হবে যে, বন্ধ করা অথবা না করা— কোনটি শিশুর জন্য অধিক উপকারী। এ রকম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কারো কোনো অপরাধ হবে না। একথার মাধ্যমে একতরফা সিদ্ধান্ত

গ্রহণের সুযোগ রহিত করে দেয়া হয়েছে। কারণ, একপেশে সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া সম্ভব। আর পারস্পরিক পরামর্শ সেই সম্ভাবনাকে রহিত করে। তাই বলা হয়েছে, এ রকম করলে পিতা-মাতা কেউই অপরাধী সাব্যস্ত হবে না।

'তোমরা যা বিধিমতো দিতে চেয়েছিলে তা যদি অপূর্ণ করো তবে ধাত্রী দ্বারা স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো পাপ নেই'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে ওহে শিশুর পিতাগণ, শিশুর মাতা যদি দুগ্ধ দানে অস্বীকৃত হয় বা কোনো অসুবিধার কারণে অক্ষম হয় অথবা তার দুগ্ধপ্রবাহ শুকিয়ে যায় কিংবা সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে উদ্যোগী হয়; তবে তোমরা পারশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য ধাত্রী নিয়োগ করতে পারবে। এ রকমও হতে পারে— শিশুর মাতা অধিক পারিশ্রমিক দাবী করে বসলো। এ রকম অবস্থাতেও শিশুর পিতা অন্য ধাত্রী নিয়োগ করতে পারবে।

এখানে উল্লেখিত 'মা আতাইম' কথাটির অর্থ হচ্ছে, দুধ পান করানোর সময়সীমার জন্য বিধিমতো বা নির্ধারিত পারিশ্রমিক অর্পণ করো। ঐকমত্যসূত্রে এ রকম অর্পণ মোস্তাহাব। জায়েযের কোনো শর্ত নেই। ইবনে কাসীর এই আয়াতে এবং সুরা রূম-এ 'আতাইতুম' শব্দটি আলিফ মাকসুরা সহ পাঠ করেছেন। এ রকম পাঠ করলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যা করেছো। আর 'সাল্লামতুম' এর অর্থ দাঁড়াবে নির্বিবাদ আনুগত্য।

এখানে 'বিধিমতো' কথাটি সম্পৃক্ত রয়েছে 'সাল্লামতুম' এর সঙ্গে। এভাবে কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে, প্রথাটি যেনো শরিয়তসমর্থিত হয়। এই শরিয়তসম্মত অবস্থাকে এখানে 'বিধিমতো' শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।' অর্থাৎ শিশু ও স্তন্যদাত্রী সম্পর্কে এখানে যা কিছু আলোচনা করা হলো সেগুলোকে আল্লাহ্র ভয়ে মান্য করে চলো। আল্লাহ্পাক সকল কিছুর দ্রষ্টা। তাই তিনি অবশ্যই দেখছেন কে তাঁর পবিত্র বিধানে সমর্পিত এবং কে নয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৪

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

❐ তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগণ চারি মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে। যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করিবে তখন তাহারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

আয়াতে উল্লেখিত 'তাওফি' বা 'তুয়াফ্‌ফা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে তার পূর্ণত্বসহ অর্জন করা। এখানে অর্থ হবে নির্ধারিত সময়সীমা (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করা। 'ইয়াতারাব্‌বাছ্‌না' শব্দের সর্বনামটি স্ত্রীগণের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে। যারা গর্ভবতী এবং যারা গর্ভবতী নয়— সকল স্ত্রীদেরকে এখানে নির্দেশ করা হলেও গর্ভবতীদেরকে অন্য আয়াত দ্বারা আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে—'আর গর্ভবতী নারীদের জন্য সময়সীমা হলো গর্ভপাত পর্যন্ত।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, সুরা বাকারার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে সুরা তালাক। মুসাওয়ার বিন মাখরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাবিয়া আসলাম নেফাসগ্রস্তা হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পনেরো দিন পরে তিনি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তিনি রসুল স.এর নিকটে হাজির হয়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. অনুমতি দিলেন। আর তিনি শীঘ্রই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হলেন। বোখারী। সাবীয়া থেকেও অনুরূপ হদিস উদ্ধৃত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। উম্মে সালমা থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পনেরো দিন পরেই সাবীয়ার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। বোখারীর এক বর্ণনায় চল্লিশ দিন এবং অপর এক বর্ণনায় দশ রাতের কাছাকাছি— এ রকম বলা হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে— স্বামীর পরোলোকগমনের পনেরো দিন পর সাবীয়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, বিধবা রমনী ইদ্দতের ওই সময়সীমা পূর্ণ করবে যে সময়সীমা হবে সর্বাধিক। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে ওই বর্ধিত সময়ই হবে তার ইদ্দত। আর চার মাস দশ দিনের কম সময়ে প্রসব হলে ইদ্দতের সময়সীমা হবে চার মাস দশ দিন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর নাসিখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হজরত ওমর বলেছেন, স্বামীর জানাযার সময় যদি কোনো রমণী সন্তানের জন্ম দেয়, তবে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। মালেক, শাফেয়ী, ইবনে আবি শাইবা।

মাসআলাঃ ক্রীতদাসীর স্বামী মারা গেলে ঐকমত্যানুযায়ী তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে দুই মাস পাঁচ দিন।

জ্ঞাতব্যঃ ঐকমত্যানুসারে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারীনির জন্য শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। হাসান এবং শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে— ওয়াজিব নয়। ঐকমত্যানুযায়ী একথাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতের শোক প্রকাশ করা যাবে না। বায়েন তালাকের ইদ্দতের শোক প্রকাশ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে শোক প্রকাশ ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেছেন, ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ থেকে যাবে ও যাবে না— উভয় প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। আমাদের মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের জন্য কোনো শোক নেই। কারণ সে পরিণত বয়সে পৌঁছেনি। জিম্মি নারীদের জন্য কোনো শোক নেই। কারণ তারা শরিয়তের আওতাধীন নয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও জিম্মি রমণীদের জন্যও শোক ওয়াজিব। শোক প্রকাশ করতে হবে এভাবে— সুরমা লাগাবে না, মেহেদী ব্যবহার করবে না, রূপচর্চা করবে না, জাফরানরঞ্জিত প্রসাধন ব্যবহার করবে না। রূপচর্চার উদ্দেশ্যে অলংকার ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না। মাথা ও শরীরে সুবাসিত অথবা অসুবাসিত তেল লাগাবে না। সুরমা ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন আলেমগণ। শাফেয়ী বলেছেন, সুরমা লাগাতে হবে রাতে এবং মুছে ফেলতে হবে সকালে। এ রকম অত্যধিক প্রয়োজন পড়লে খেজাবের ব্যবহারেও দোষ নেই।

রজয়ী অথবা বায়েন তালাক প্রাপ্তাদের জন্য দিনে কিংবা রাতে ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, খবরদার, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না; আর তারা নিজেরাও যেনো ঘর থেকে বের না হয়। আর যার স্বামীবিয়োগ ঘটেছে, সে দিন অথবা রাতের কোনো এক সময়ে ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে অন্যের ঘরে রাত্রি যাপণ করবে না। শাফেয়ী বলেছেন, বিধবাদের জন্য দিনে ও রাতে ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয। আর যে স্বামী কর্তৃক বায়েন তালাক পেয়েছে তার পক্ষে কেবল দিবাভাগে বের হওয়া জায়েয। আতা বলেছেন, মিরাসের আয়াত দ্বারা মেয়েদেরকে গৃহাবদ্ধ রাখার বিধান রহিত হয়েছে।

জননী উম্মে হাবিবা ও জননী জয়নাব বিনতে জাহাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, যে নারী আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসিনী, তার পক্ষে জায়েয হবে না কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে মৃত স্বামীর জন্য তাকে শোক প্রকাশ করতে হবে চার মাস দশ দিন। বোখারী, মুসলিম। উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেন, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোকাকুলা থাকা কোনো নারীর পক্ষে বৈধ নয়। কিন্তু মৃত স্বামীর জন্য শোক পালন করতে হবে চার মাস দশ দিন। শোক পালনের নিদর্শন হচ্ছে, রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করতে পারবে না। লাগাতে পারবে না সুরমা কিংবা সুগন্ধি। তবে পবিত্রাবস্থায় ব্যবহার করতে পারবে কিস্‌ত অথবা

আজফার। বোখারী, মুসলিম। এর সঙ্গে খেজাব ব্যবহার করা চলবে না। এ কথা বলেছেন, আবু দাউদ। জননী সালমা বলেছেন, এক রমণী রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার কন্যা বিধবা হয়েছে। তার চোখে রয়েছে পীড়া। সে কি চোখে সুরমা লাগাতে পারবে? রসুল স. বললেন, না। ওই রমণী এ রকম প্রশ্ন করলেন দুই অথবা তিনবার। তিনি স. প্রতিবারই জবাব দিলেন, না। পুনরায় বললেন, এখন থেকে তোমাদের ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে চার মাস দশ দিন। ইতোপূর্বে তোমাদের অবস্থা ছিলো কতই না শোচনীয়। তখন এক বৎসর শোক পালনের পরও তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হতো উটের নাড়িভুঁড়ি। বোখারী, মুসলিম। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমার স্বামী আবু সালমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর রসুল স. আমার নিকট দয়া করে এলেন। আমি তখন মুখমন্ডলে মালিশ করছিলাম মুসাব্বর। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সালমা, ওটা কী? আমি বললাম, মুসাব্বর। এতে কোনো সুগন্ধ নেই। তিনি স. এরশাদ করলেন, মুসাব্বর চেহারাকে উজ্জ্বল করে। কাজেই তুমি এটা রাতে ব্যবহার করতে পারো কিন্তু দিনে মুছে ফেলবে। অন্য কোনো সুগন্ধি বা মেহেদীও ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ এটা হলো খেজাব। আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! তাহলে আমি কেশবিন্যাস করবো কীভাবে? রসুল স. বললেন, শুধু বরই পাতা নিষিক্ত পানি দ্বারা মাথা ধৌত করো। আবু দাউদ, নাসাঈ। জননী উম্মে সালমা আরও বর্ণনা করেছেন, বিধবারা কুসুম ও গোলাপী রঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। অলংকারও ব্যবহার করতে পারবে না। আর ব্যবহার করতে পারবে না খেজাব এবং সুরমা। আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত জয়নাব বিনতে কায়াব থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বোন এবং মালিক বিন সানানের কন্যা ফারিয়াহ্ বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বললাম, আমার স্বামী ক্রীতদাসের সন্ধান করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর ঘর বাড়ী নেই। ঘরে আহারের ব্যবস্থাও নেই। এমতাবস্থায় আমি আমার পিত্রালয়ে যেতে পারবো কি? তিনি স. বললেন, হাঁ, যেতে পারো। তবে চার মাস দশ দিন ঘর থেকে বের হয়ো না। আমি তাই করেছি। মালেক ইবনে হাব্বান, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী। হাকেম দু'টি পদ্ধতিতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, দু'টি পদ্ধতিরই সূত্রপরম্পরা বিশুদ্ধ। তিরমিজিও এরকম বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, হাদিসটি মশহুর। আলেমগণ এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। দারা কুতনী বলেছেন, রসুল স. এক বিধবাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করবে। কেউ কেউ বলেছেন, আবু মালিক আশআরি ব্যতীত অন্য কেউ হাদিসটিকে মারফু বলেননি। আর আবু মালিক জয়ীফ। ইবনে কাত্তান বলেছেন, এই বর্ণনার সূত্রভূত বর্ণনাকারিনী মাহবুবা বিনতে মুহরার জয়ীফ। তাই দারা কুতনী বর্ণনাটিকে দূষণীয় বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মৃত স্বামীর গৃহে মাথা গোঁজার

ঠাই না হলে বিধবা সেখান থেকে প্রস্থান করবে। তবে তাঁর প্রস্থানের সমর্থনে সঙ্গত কারণ থাকতে হবে। যেমন, গৃহ ধ্বসে পড়ার আশংকা, ঘর ভাড়া পরিশোধে অসামর্থতা, ইত্যাদি।

'যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই'— একথার অর্থ ইদ্দত পালন শেষে বিধবারা রূপচর্চা করতে পারবে। ঘরের বাইরে যেতে পারবে, অথবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। যথাবিধি (বিল মারুফ) অর্থ শরিয়তসমর্থিত। অর্থাৎ বিধবারা শরিয়তের অনুমোদন সাপেক্ষে সবকিছু করতে পারবে। যদি তাদের আচরণ শরিয়ত বিগর্হিত হয়, তবে বাধা দেয়া ওয়াজিব। আর তখন যে বাধা দিতে কার্পণ্য করবে সে হবে অপরাধী।

শেষে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' অর্থাৎ তিনি তোমাদের সবকিছুই জানেন। তাই তিনি তোমাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী তোমাদেরকে প্রতিফল দান করবেন, ভালো অথবা মন্দ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৫

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

❑ স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহ্ প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে তাহা গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ্ জানেন যে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অংগীকার করিও না; নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করিওনা। এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, সহনশীল।

এখানে 'খিত্বা' শব্দের অর্থ বিবাহের প্রস্তাব। 'তায়রীদ্ব' অর্থ ইঙ্গিত বা ইশারা। এসম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে, সাকিনা বিনতে হানযালা

বিধবা হয়েছিলেন। ইদ্দত পালন অবস্থায় তার নিকট উপস্থিত হলেন আবু জাফর মোহাম্মদ বিন আলী আল বাকের।

তিনি বললেন, হে হানযালা নন্দিনী! আমিতো সেই ব্যক্তি, রসুল পাক স. যার নিকট আত্মীয়। তুমিতো ভালো করেই জানো আমার পিতামহ হজরত আলী কেমন ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং ছিলেন প্রথম দিকের মুসলমান। সাকিনা বললেন, তুমি দেখছি আমার ইদ্দতের মধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছো। এটাতো অপরাধ। আবু জাফর বললেন, আমিতো রসুল পাক স. এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিবৃত করছিলাম। আর তিনি স.ও হজরত উম্মে সালমার নিকট তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্পাকের নিকট তাঁর মহামর্যাদার কথা। সে সময়ে তাঁর স. এর পবিত্র হস্তে ছিলো একটি চাটাই। তার ভারে তাঁর স. হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিলো।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথা পরিষ্কার যে, ইদ্দত পালনরতাদের নিকট ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করা যাবে। এতে কোনো অপরাধ নেই। আর ওই সময়ে মনে মনে বিবাহের ইচ্ছা করলেও কোনো অন্যায় হবে না। পরক্ষণেই হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু গোপনে তাদের নিকট কোনো অঙ্গীকার করা যাবে না। অর্থাৎ শরিয়তের বাইরে কোনো কিছু করা যাবে না। অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি এরকম— তোমরা মনে মনে ইদ্দত পালনরতাদেরকে বিবাহের ইচ্ছা করতে পারো, ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারো; কিন্তু প্রকাশ্যতঃ বিবাহ বা সম্ভোগের প্রস্তাব করতে পারবে না। সম্ভোগের প্রস্তাবকেই এখানে গোপন অঙ্গীকার বলা হয়েছে। আর 'নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না'— একথা বলে বিবাহের প্রকাশ্য প্রস্তাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইদ্দত পালনরতাদের নিকট প্রকাশ্যে বা গোপনে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা যাবে না। আর সম্ভোগ প্রস্তাবতো প্রকাশ্য ও গোপন —সকল অবস্থায় হারাম।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে রমণী স্তন্যপান করানোর জন্য বা অন্য কোনো কারণে পৃথক বাস বা ইদ্দত পালন করছে কিংবা 'লিয়ানের' কারণে বায়েন হচ্ছে, অথবা তিন তালাক পাওয়ার কারণে যাকে প্রথম স্বামী ফিরিয়ে নিতে অক্ষম, তাকে অপরিচিত কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে। কেউ যদি দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তাকে কেবল প্রথম স্বামী ইঙ্গিতবহ প্রস্তাব দিতে পারবে। অন্যেরা পারবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, পারবে। কারণ এ হচ্ছে নতুন বিবাহ প্রস্তাব। প্রথম বিবাহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। এ অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তালাকের পর বিবাহের প্রভাব আর থাকে না।

ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। এ বিধানটি স্পষ্ট। তাই বলা হয়েছে— বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না। কিন্তু মনের সংকল্প এই বিধানের বাইরে। 'আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে'— একথায় বুঝা যায় আন্তরিক সংকল্প মোবাহ্। তবে অন্তরে দৃঢ় সংকল্পকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে

না। কারণ, দৃঢ় সংকল্পকে রোধ করা কঠিন। দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই 'নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না' বলা হয়েছে।

ইদ্দত পালন ফরজ। তাই একে কিতাব আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিতাব অর্থ ফরজ। যেমন আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'কুতিবা আলাইকুমুস্ সিয়াম' (তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে)।

'এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন'— এ কথার অর্থ তোমাদের মনের সংকল্প সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এতে করে বুঝা যায় অন্তরের সংকল্প মাকরূহ্।

'সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ সহনশীল'— — এ কথার মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে, যারা সংকল্প করলো এবং পরক্ষণেই আল্লাহ্র ভয়ে সে সংকল্প পরিত্যাগ করলো; আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও সহনপরায়ণ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৬, ২৩৭

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَّمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

❒ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ অথবা তাহাদের জন্য মোহর ধার্য করিয়াছ তাহাদিগকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও। বিত্তবান তাহার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তাহার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত সংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।

❒ তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করিয়া থাক; তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা

যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

শরিয়তে মোবাহ্ বিষয়গুলোর মধ্যে তালাকই হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট বিষয়। তাই আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে উল্লেখিত শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলা হয়েছে, স্পর্শ করার পূর্বে যদি তালাক দেয়া হয় তবে মোহরানা দেয়া বাধ্যতামূলক নয়, যদি মোহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকে। মোহরানা নির্ধারিত হয়ে থাকলে স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক এবং স্পর্শের পরে তালাক দিলে পুরো মোহর পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ফা'তুহুন্না উযুরাহুন্না বিল মারূফ' এটা ঐকমত্য যে, মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকলে পরিশোধ করতে হবে মোহরে মিসাল।

'তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কোরো'- এ কথার অর্থ স্পর্শের আগে তোমরা যাদেরকে তালাক দিয়েছো তাদেরকে কিছু লাভ দাও। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, যে নারীর বিবাহের মোহরানা নির্ধারিত হয়নি এবং যাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, তাকে কিছু না কিছু দিতেই হবে। এটা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম মালেক বলেছেন, ওয়াজিব নয়। তবে কিছু দিলে তা হবে মোস্তাহাব। আমরা বলি, এখানে আল্লাহ্পাকের কথা এ রকম 'হক্কান আলাল মুহসিনিন' এখানে 'হাল' ও 'আলা' শব্দ দুটিমোস্তাহাবের বিপরীত। আরবী ভাষায় আদেশসূচক বাক্য ফরজকে নির্দেশ করে।

অনির্ধারিত মোহরের অনাঘ্রাতাদেরকে কি পরিমাণ সম্পদ দেয়া ওয়াজিব হবে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনটি কাপড় দিতে হবে— জামা, চাদর ও ওড়না। কাপড় দিতে হবে ওই ধরনের যা সে সাধারণত পরিধান করে থাকে। ইমাম আবু হানিফা মেয়েদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এরকমই বলেছেন। এই সম্পদ দান মোহরে মিসাল তুল্য। তাই এর পরিমাণ মোহরে মিসালের অর্ধেকের বেশী হওয়া চলবে না। আর পাঁচ দিরহাম অপেক্ষা কমও হওয়া যাবে না। ইমাম কারখী এ রকম বলেছেন। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এই দান হতে হবে দাতার যোগ্যতার অনুকূল। তাই আল্লাহ্পাক পরক্ষণেই বলেছেন, 'বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমতো সংস্থানের ব্যবস্থা করবে।' ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এটাই এক্ষেত্রে সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ— যা নির্ভর করে স্বামীর সম্পদ— ক্ষমতার উপর। এ রকম বর্ণনা এসেছে হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আতা ও শা'বী থেকে।

বাগবী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক্ষেত্রে উন্নতমানের দান হচ্ছে একটি ক্রীতদাসের মুক্তি মূল্য। মধ্যম মান হচ্ছে একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি পাজামা— এই তিনটি কাপড়। আর নিম্নতম মান হচ্ছে এমন একটি পরিধেয় যদ্দারা শরীর আবৃত করা যায়। অথবা কিছু পরিমাণ

রুপা। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ থেকে প্রাপ্ত দুটিঅভিমতের মধ্যে বিশুদ্ধতর অভিমতটি হচ্ছে—এটা নির্ভর করবে বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর। তাঁর নির্ধারণই চূড়ান্ত। ইমাম শাফেয়ী থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে— এই দানের পরিমাণ হচ্ছে কম বেশী যে কোনো সম্পদ পদবাচ্য বস্তু। তবে মোস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে, তিন দিরহামের কম যেনো না হয়। ইমাম আহমদের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে দিতে হবে কমপক্ষে এমন পরিমাণ পরিচ্ছদ যদ্দারা নামাজ শুদ্ধ হয়। আর তা হচ্ছে দুটিকাপড়— – একটি জামা ও একটি ওড়না। বাগবী বলেছেন, আবদুর রহমান বিন আউফ তালাক প্রদানের পর তাঁর এক স্ত্রীকে দিয়েছিলেন একটি হাবসী ক্রীতদাস। হজরত হাসান বিন আলী তাঁর এক তালাক প্রাপ্তাকে দিয়েছিলেন দশ হাজার দিরহাম।

'ইহা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে শরিয়ত যাকে উত্তম বলে, তোমরা তালাক প্রাপ্তাদেরকে সে রকম উত্তম অনুদান প্রদান করো। বিষয়টি বিচারকের বলপ্রয়োগ পর্যন্ত যেনো না গড়ায়।

'তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করে থাকো, তবে যা তোমরা ধার্য করেছো তার অর্ধেক'- এ কথার অর্থ অনাঘ্রাতাদেরকে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক প্রদান করা ওয়াজিব। এই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জমহুর ওলামার সিদ্ধান্ত হচ্ছে— অর্ধেক মোহরের অতিরিক্ত কোনো অনুদান দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু হাসান ও সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তাকে অতিরিক্ত অনুদান বা কল্যাণভাতা দিতে হবে। যদিও মোহর ও নির্দ্ধারণ স্পর্শ করার পূর্বে তালাক কার্যকর করা হয়। অথবা নির্দ্ধারণ করার পর স্পর্শ করার পূর্বে। কারণ, আল্লাহ্পাক বলেছেন, তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো। সুরা আহযাবে রয়েছে, হে বিশ্বাসীরা! যখন তোমরা মুসলমান নারীদেরকে বিবাহ করো, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তবে তাদেরকে ইদ্দত পালন করানোর অধিকার তোমাদের নেই। তাদেরকে কিছু কল্যাণভাতা দিয়ে উত্তম পন্থায় বিদায় নিশ্চিত করো। এই নির্দেশটি সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তাদের প্রতি প্রযোজ্য।

জমহুর ওলামা এ রকম মনে করে থাকতে পারেন যে, কল্যাণ ভাতাই তাদের অর্ধমোহর। মোহর হলো শ্লীলতা সম্ভোগের প্রতিদান। আর এক্ষেত্রে তাদের শ্লীলতা ও সম্ভোগ সুসংরক্ষিত। যেহেতু তারা এখানে আঘ্রাত হয়নি, তাই অর্ধমোহরই অনিবার্যরূপে এখানে কল্যাণভাতা।

যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয় এবং মাফ করে দেয়াই আত্মসংযমের নিকটতর— এখানে বলা হয়েছে স্ত্রী যদি তার প্রাপ্য মোহরানার দাবী পরিত্যাগ করে বা মাফ করে দেয় তবে স্বামী হয়ে যাবে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

'যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে'— একথা বলে বুঝানো হয়েছে স্বামীকে। অর্থাৎ স্বামী যদি মোহরানা পূর্বেই পরিশোধ করে দেয় এবং তালাকের পর অর্ধেক

মোহরের দাবী না তুলে মাফ করে দেয়, তবে স্ত্রীও অর্ধেক মোহর ফেরৎ দেয়া থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে আমর বিন শোয়াইব থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে, অর্থ স্বামী। কারণ, স্বামীই মোহরানার মাধ্যমে বিবাহ কার্যকর করে। এরকম মন্তব্য করেছেন হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব, সাঈদ বিন জোবায়ের, শা'বী, শুরাইহ্, মুজাহিদ ও কাতাদা। বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম উদ্বৃতি দিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর সর্বশেষ অভিমত। এখানে মাফ করার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, বিবাহের প্রাক্কালে স্বামী মোহরানা পরিশোধ করেছিলো আর তাই হয়েছিলো সম্ভোগের দাবীদার। এখন সম্ভোগ ব্যতীতই যখন তাকে তালাক দিলো, তখন দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো অর্ধেক মোহরের। স্বামী সেই অর্ধেক মোহর ফেরৎ চাইলো না, তার মানে সে মাফ করে দিলো। অথবা 'ইয়া'ফুনা' শব্দের সাথে সম্পৃক্ত বলে এর তাৎপর্য হচ্ছে— ক্ষমার ঔদার্য্য। হজরত জোবায়ের বিন মুত্য়ীম থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি এক রমণীকে বিয়ে করে সম্ভোগের পূর্বেই তালাক দিয়েছিলেন এবং তাকে পরিশোধিত পূর্ণ মোহর মাফ করে দিয়ে বলেছিলেন,মার্জনা করার অধিকার আমারই। বায়হাকী।

'কেউ কেউ বলেছেন, 'যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে'—বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কন্যার অভিভাবককে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন বায়হাকী। ইমাম আবু হানিফা এই ব্যাখ্যাটিকে তাঁর অভিমত হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর প্রথমোক্ত অভিমতটি ছিলো ইমাম শাফেয়ীর। ইমাম আহমদ থেকে দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর নিকট এই আয়াতের অর্থ—স্ত্রী যদি প্রাপ্তবয়স্কা হয় তবে সে তার প্রাপ্য মোহর ক্ষমা করে দিতে পারবে, আর যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা হয় তবে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দিতে পারবে তার অভিভাবক। অবস্থা যদি এমন হয় যে, কন্যার কথা ধর্তব্য নয়, তবে তার অভিভাবকের পক্ষে ক্ষমা করে দেয়া জায়েয হবে। এরকম বলেছেন আলকামা, আতা, হাসান, জুহুরী ও রবীয়াহ্। আমরা বলি, মোহর রমণীদের ন্যায্য প্রাপ্য। তাই মোহরের ক্ষেত্রে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। তাই তার অভিভাবক দাবী মাফ করতে পারে না। ঐকমত্যানুযায়ী জায়েযও হবেনা তালাকের পূর্বে তার মোহর থেকে দান করে দেয়া।

'তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইওনা।'— এই নির্দেশটি পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য। এখানে প্রাধান্য পুরুষেরই। তাই দান এবং ক্ষমা উভয় ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে অগ্রগামী হতে হবে। দেখাতে হবে সদাশয়তার নিদর্শন। মনে রাখতে হবে দাতাই গ্রহীতা অপেক্ষা উত্তম।

এতোক্ষণ সাংসারিক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, দুগ্ধপান, ইত্যাদির প্রকৃষ্ট নির্দেশনা। এবার আলোচিত হচ্ছে ইবাদত প্রসঙ্গ। নামাজ ধর্মের স্তম্ভ। নামাজ আল্লাহ্পাকের স্মরণের বিশেষ অনুশীলন। নামাজ

আল্লাহ্পাকের প্রসন্নতা লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই নামাজ সম্পর্কে বিবরণ এসেছে নিম্নের আয়াতে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৮,২৩৯

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

❐ তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহের উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে;

❐ যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যদি তোমরা নিরাপদ বোধ কর তবে আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

এখানে নামাজের জন্য যত্নবান হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করতে হবে। নামাজের প্রতি মনোযোগ ও মহব্বত থাকতে হবে। এবং নামাজের স্তম্ভ ও বৈশিষ্ট্য সমূহ যথানিয়মে সম্পাদন করতে হবে।

নামাজ নিশ্চিতরূপে ফরজ। এ বিষয়ে সকল উম্মত একমত। নামাজ অস্বীকারকারী কাফের। ইমাম আহমদ বলেছেন, যে জেনে শুনে নামাজ পরিত্যাগ করে সে কাফের। তাঁর অপর একটি উক্তিতে কাফের নয় বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকও এ অভিমত পোষণ করেন। তবে তাঁরা বলেন, নামাজ পরিত্যাগকারীকে তওবা করাতে হবে। তওবা করলে উত্তম। নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হত্যা করা যাবে না। তবে তাকে যাবজ্জীবন কারাবন্দী করে রাখতে হবে। তখন তার জন্য যে কোনো একটি পথ খোলা থাকবে—তওবা অথবা জেলখানায় জীবনাবসান।

হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি ইমাম আহমদের দলিল— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে নামাজ। মুসলিম। হজরত বুরাইদা থেকে আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন- রসুল পাক স. বলেন, নামাজই তাদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য

সূচিত করেছে। তারাই কুফরী করলো, যারা নামাজ পরিত্যাগ করলো। ইবনে মাজা বর্ণিত হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমরের হাদিসে রয়েছে— একবার রসুল পাক স. নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করতে যত্নবান হবে, হাশরের দিনে তার নামাজ হবে তার জন্য নূর, বোরহান এবং পরিত্রানের একটি উপলক্ষ্য। আর যে নামাজের হেফাজত করবে না, হাশরের দিনে থাকবে না তার জন্য কোনো নূর, বোরহান এবং পরিত্রানের উপলক্ষ্য। সেদিন সে অবস্থান করবে কারুন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই বিন খাল্ফের সঙ্গে। আহমদ। জমহুর ওলামা হাদিসগুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন, নামাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। হাদিসগুলোর সারকথা হচ্ছে, নামাজ সকল ইবাদতের চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ। তাই যে নামাজ পরিত্যাগ করলো সে যেনো কাফের হয়ে গেলো। আর যে নামাজকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মনে করে পরিত্যাগ করলো, সে অবশ্যই কাফের হয়ে গেলো।

নামাজের মর্যাদাঃ নামাজের মর্যাদা প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে— রসুল স. বলেন, ধরো তোমাদের গৃহের সম্মুখে রয়েছে একটি প্রবহমান নদী। ওই নদীতে যদি তোমরা প্রতিদিন পাঁচ বার অবগাহন করো তবে বলো, তোমাদের শরীরে কি কোনো অপরিচ্ছন্নতা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। রসুল স. বললেন. এটাই হলো নামাজের উপমা। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহ্পাক সকল পাপ পরিচ্ছন্ন করে দেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত উবাদা বিন সামেতের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্পাক পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি সুচারুরূপে অজু সম্পন্ন করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে— সঠিকভাবে রুকু ও সেজদা সম্পাদন করে— আল্লাহ্পাক তার পরিত্রানের জিম্মাদার হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে অনীহ, আল্লাহ্পাক তার জিম্মাদার নন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে অব্যাহতি দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। আহমদ, আবু দাউদ। ইমাম মালেক ও নাসাঈ থেকে এরকম আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। জমহুর ওলামা এই হাদিসটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগকারী কাফের নয়। আল্লাহ্পাকই সমধিক অবহিত।

'বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের'— মধ্যবর্তী নামাজ বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'ওয়াস্ সালাতিল উস্তা' বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য এখানে বিশেষ হুকুমকে সাধারণ হুকুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখিত 'উসতা' শব্দটি 'আওসাত' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ। বাগবী বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগে ওলামায়ে কেরাম সালাতে উস্তা সম্পর্কে অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, সালাতে উস্তা হচ্ছে প্রত্যুষের নামাজ। হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত

মুআজ বিন জাবাল এরকমই বলেছেন। আতা, ইকরামা এবং মুজাহিদও এই মতের অনুসারী। এটাই ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব।

জোহরের নামাজকে কেউ কেউ সালাতে উস্তা বলেছেন। এই দলে রয়েছেন হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত উসামা। জোহরের নামাজ পড়তে হয় দিবসের মধ্যভাগে। আর এই নামাজই দিবাভাগের নামাজের মধ্যস্থিত নামাজ। বোখারী বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. জোহরের নামাজ পড়েছেন রৌদ্রের কেন্দ্রবিন্দুতে। হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকী ও ইবনে জারীর। বর্ণিত সময়ে নামাজ আদায় করতে অসুবিধা বোধ করছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আহমদ বর্ণনা করেছেন, ঠিক দুপুরে জোহরের নামাজ পাঠ করতেন রসুল পাক স.। তখন তাঁর পশ্চাতে এক অথবা দুই কাতার লোক হতো। ওই সময়টি ছিলো সাংসারিক ও ব্যবসায়িক ব্যস্ততার সময়। তখন নামাজী কম হতো বলে রসুল পাক স. বলেছিলেন, লোকেরা নামাজে যোগ দিবে, অন্যথায় আমি তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিবো। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস দুইটির মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ওই নামাজ ছিলো জোহরের। সর্বাধিক প্রামাণ্য বক্তব্যানুসারে ওই নামাজ ছিলো আসরের নামাজ। অধিক সংখ্যক আলেমের অভিমত এটাই। রসুল পাক স. থেকে এক বিরাট দলের বর্ণনানুসারে আসরের নামাজই সালাতে উস্তা। একথা বলেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু আইয়ুব, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আয়েশা সিদ্দিকা। ইব্রাহিম নাখয়ী, কাতাদা এবং হাসানও এই মতের অনুসারী। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। হজরত আলী বলেছেন, রসুল পাক স. খন্দকের যুদ্ধের সময়ে বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক ওই সকল লোকের ঘর-দরোজা ও কবর আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন— যারা আমাদেরকে সালাতে উস্তা থেকে দূরে রেখেছে। আর এদিকে সূর্যও অস্তমিত হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, খন্দকের যুদ্ধের সময়ে কাফের বাহিনী আসরের নামাজ পড়তে দেয়নি। আল্লাহ্‌পাক তাদের অন্তর্দেশ ও আবাসস্থলগুলো অনলপূর্ণ করে দিন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার মুশরিকেরা রসুল স. কে আসরের নামাজ পড়তে দেয়নি। সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিলো অথবা বলেছেন লাল রং ধারণ করেছিলো। তখন রসুল স. বলেছিলেন, তারা আমাকে সালাতে উসতা আদায় করতে দিলো না। আল্লাহ্‌পাক তাদের উদর ও কবরগুলোকে অগ্নিস্তুপে ভর্তি করে দিন। মুসলিম। আবু ইউনুস (হজরত আয়েশার মুক্ত ক্রীতদাস) বলেছেন, আমাকে হজরত আয়েশা আদেশ দিলেন, আমার জন্য একখন্ড কোরআন পাক লিখে দাও। তারপর বললেন, ওই আয়াতে পৌঁছলে আমাকে জানাবে। নির্দেশিত আয়াতে পৌঁছলে আমি উম্মত জননীকে জানালাম। তিনি বললেন, 'হাফিজু

আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস্‌ সালাতিল উস্‌তা ওয়া সালাতিল আসর।' তিনি আরও বললেন, আমি একথা শুনেছি রসুল স. থেকে। মুসলিম। হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, আয়াতটি প্রথমে ছিলো এরকম— 'হাফিজু আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস্‌সালাতিল আসর। এরপর আল্লাহ্‌পাক আয়াতটি রহিত করে দেন; তদস্থলে অবতীর্ণ করেন 'হাফিজু আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা।' মুসলিম। ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের বর্ণিত হজরত আমর বিন রাফের হাদিসে রয়েছে, আমি রসুল স. এর সহধর্মিণী হজরত হাফসার কোরআন শরীফে দেখেছি— সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে 'হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা, ওয়া সালাতিল আসর।' ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আব্‌দ বিন রাফে বলেছেন, আমি জননী উম্মে সালমার কোরআন শরীফে এই আয়াতটি লিপিবদ্ধ দেখেছি এভাবে— 'হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা, ওয়া সালাতিল আসর।' আবু দাউদ বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আয়াতটি এভাবেই পাঠ করতেন। আবু দাউদ আরো বলেছেন, জননী হাফসার মুক্ত ক্রীতদাস আবু রাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—আমি কোরআন শরীফ লিখতাম। জননী মহোদয়া বললেন, এই আয়াতটি এভাবে লিখো—'হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা, ওয়া সালাতিল আসর। এরপর আমি হজরত উবাই বিন কা'ব এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, জননী ঠিকই বলেছেন। আমরা কি জোহরের সময় উট ছাগল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি না? ইমাম শাফেয়ী ও তার সহচরবৃন্দ জননীদ্বয়ের (হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসার) হাদিস দু'টোকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন, এখানে সালাতে উস্‌তা ও সালাতে আসর বলা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, সালাতে উস্‌তা ও সালাতে আসর পৃথক পৃথক নামাজ। আমরা বলি, না। এখানে সালাতে আসর কথাটি এসেছে সালাতে উস্‌তার ব্যাখ্যা হিসাবে। বাগবী তাঁর তাফসীরে হজরত আয়েশার বিবরণটিকে 'ওয়াও (এবং)' বিহীন অবস্থায় এভাবে উল্লেখ করেছেন— 'হাফিজু আলাস্‌ সালাওয়াতি ওয়াস্‌সালাতিল উস্‌তা, সালাতিল আসর।' ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আবু কাবিসা বিন জুয়াইব বলেছেন, সালাতে উস্‌তা হচ্ছে মাগরিবের নামাজ। কারণ, এই নামাজ মধ্যম প্রকৃতির অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্টও নয়, আবার দু'রাকাত বিশিষ্টও নয়। বরং তিন রাকাত বিশিষ্ট। উত্তরসুরীগণের মধ্যে এরকম কোনো ব্যাখ্যা নেই যে, সালাতে উস্‌তা হচ্ছে ইশার নামাজ। তবে কিছু সংখ্যক পূর্বসুরী উল্লেখ করেছেন, ইশার নামাজই সালাতে উস্‌তা। কারণ, এই নামাজ হ্রস্বও নয় দীর্ঘও নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে যে কোনো ওয়াক্তকে সালাতে উস্‌তা বলা যেতে পারে। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে প্রতিটি নামাজই যত্ন সহকারে সম্পাদনের অনুপ্রেরণা লাভ করা যেতে পারে। এভাবে প্রতিটি নামাজকে বিশেষভাবে নির্দেশ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক যেমন শবেকুদর, জুম্মার নামাজের সময় এবং ইসমে আজমকে অস্পষ্ট রেখেছেন, তেমনি

এই আয়াতের মাধ্যমে সালাতে উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামাজকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছেন।

অনেকের বক্তব্য থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, মধ্যবর্তী নামাজ একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির নামাজ যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাইরে। আমার মতে এই ধারণাটি বাস্তবসম্মত নয়। বরং আয়াতের বাকভঙ্গিমার মাধ্যমে দেখা যায়— সাধারণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা করার পর বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে গুরুত্ববহ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যবর্তী নামাজটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসরের নামাজের সময় সাধারণতঃ লোকজন বাজারে ব্যস্ত থাকে— তাই এই নামাজের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশী। যেনো পার্থিব ব্যতিব্যস্ততার কারণে এই নামাজ পাঠে বিঘ্নসৃষ্টি না হয়। যেনো খেয়াল রাখা হয় জামাতের এবং যেনো বিলম্বের কারণে মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পঠিত না হয়। এই নীতিমালায় একেক সময় ও একেক পরিস্থিতিতে একেক ওয়াক্তের নামাজ মধ্যবর্তী নামাজ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। যেমন শীতকালের ফজর ও ইশার নামাজ, গ্রীষ্মকালের জোহরের নামাজ, হাট বাজার এলাকায় আসরের নামাজ এবং চারণক্ষেত্রে মাগরিবের নামাজ।

'এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে' (ওয়াকুমু লিল্লাহি ক্বনিতিন)। 'কুনুত' শব্দের অর্থ মানুষের সঙ্গে কথোপকথন না করা। হজরত জায়েদ বিন আরকাম বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠকালে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। আমাদের এই আচরণের প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে আমাদের উপর নামাজে নিশ্চিত থাকার নির্দেশ এসেছে। পাঁচ জন ইমাম থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, লোকজন নামাজের মধ্যে আলাপচারিতা করতো, একে অন্যকে কাজের কথা বলতো, তখন আল্লাহ্‌পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, কুনুত অর্থ বিনয়াবনত হওয়া। আরও বলেছেন, রুকু দীর্ঘ করা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মস্তক অবনত করা। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নামাজীদের অবস্থা এরকম হলো যে, তাঁরা আর এদিক সেদিক তাকাতেন না। পাথর সরাতেন না, কিংবা অন্তরে কোনো কিছু ধারণাও করতেন না। আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁরা এরকম করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, কুনুতের মর্ম হচ্ছে— নামাজে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা। হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট একজন জানতে চাইলেন, উত্তম নামাজ কোনটি? তিনি স. বললেন, দীর্ঘতম নামাজ। দীর্ঘতম নামাজ একটি অবাস্তব ধারণা। এরকম দীর্ঘতম দন্ডায়মানতা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এখানে কুনুত অর্থ দোয়া কুনুত। আর হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— সুলাইম, বায়াল, জাকওয়ান ও আসীয়া এই গোত্রগুলোর উপর রসুল স. দোয়া কুনুত পাঠের মাধ্যমে বদদোয়া করেছিলেন। এই উক্তিটি অসঙ্গত। আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা বিনীতভাবে নামাজে দাঁড়াবে (অকুমুলিল্লাহি

কৃনিতিন)। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণিত উক্তিটি গ্রহণ করলে প্রতি ওয়াক্তের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করা অত্যাবশ্যক হয়ে যায়, যা অযৌক্তিক।

ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করা সম্পূর্ণতই বেদাত। আবু মালেক আশয়ারী বলেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা, আপনিতো রসুলে পাক স. এর অনুসারী হয়ে নামাজ পড়েছেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের পশ্চাতে দাঁড়িয়েও নামাজ আদায় করেছেন; তাঁরা কি নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, বৎস! এটাতো বেদাত। আমিতো রসুল স. এর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি, তিনি দোয়া কুনুত পাঠ করেননি। এরপর হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি, তাঁরা নামাজে কখনোই দোয়া কুনুত পাঠ করেননি। আবু মালেক আশয়ারীর প্রকৃত নাম সা'য়াদ বিন তারিক বিন আসলাম। ইমাম বোখারী বলেছেন, তিনি ছিলেন সাহাবী। তাঁর হাদিসের সূত্র বিশুদ্ধ। ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করার সপক্ষে নয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে— যার সবগুলোই জয়ীফ অথবা অপরিচ্ছন্ন। আর কুনুতে নাজিলা (যা অভাবিত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে জানতে হলে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে। শা'বী, আতা, সাঈদ বিন জোবায়ের, হাসান, কাতাদাহ্ এবং তাউসের মতে কুনুত অর্থ আনুগত্য। আল্লাহ্পাক একস্থানে বলেছেন, 'উম্মাতন কৃনিতান' (অনুগত উম্মত)। কালাবী এবং মুকাতিল বলেছেন, এক ওয়াক্ত করে নামাজ নির্ধারিত ছিলো পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য। এতো সহজ হুকুম সত্ত্বেও তাদের নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার ভঙ্গিমা ছিলো অনমনীয়। তাই এই উম্মতের জন্য আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে, তোমরা নমনীয়ভাবে দাঁড়াবে। কেউ কেউ বলেছেন, কুনুত অর্থ নামাজ। যেমন আল্লাহ্পাক এক জায়গায় বলেছেন, 'আম্মান হুয়া কৃনিতুন আনা আল লাইলী'— এখানে কৃনিত অর্থ নামাজী। আবার কেউ বলেছেন, কুনুত অর্থ জিকির (স্মরণ)। তাই এখানে অর্থ হবে তোমরা দন্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহ্পাকের জিকির করতে থাকো। স্মর্তব্য যে, কুনুত শব্দটির সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন মর্ম প্রথম দিকে বিবৃত হয়েছে। হজরত জায়েদ বিন আরকাম বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত মর্মই অধিকতর সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ। পরের বর্ণনাগুলো সে তুলনায় অপরিচ্ছন্ন ও অনিশ্চিত।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষোক্তটিতে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা আশংকা করো তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় যদি তোমরা নিরাপদ বোধ করো তবে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে; যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন— যা তোমরা জানতে না'— এ আয়াতের আলোচনাসূত্রে ইমাম আহমদ বলেছেন, ছুটন্ত অশ্বারোহী অশ্বোপরি নামাজ আদায় করতে পারবে। এ আয়াতকে তিনি তাঁর পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনে জাওজী দলিল গ্রহণ করেছেন বোখারী থেকে— যে বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উপস্থাপন করেছেন নাফে। হজরত ইবনে ওমরকে জনৈক ব্যক্তি, আতংকাবস্থার নামাজ (সালাতে খওফ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলেন। তিনি বিস্তারিত জবাব দানের পর বললেন, এর চেয়েও অধিক ভীতির সম্মুখীন হলে, যে প্রকারে সম্ভব নামাজ আদায় করে নিও। পদচারী অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায়, কেবলামুখী অবস্থায় অথবা অন্য যে কোনো মুখী অবস্থায়। নাফে বলেছেন, আমার মনে হলো অবশ্যই হজরত ইবনে ওমর এ কথা শুনেছেন রসুল পাক স. থেকে। মনগড়া কোনো কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পদচারণা কালে অথবা অশ্বারোহী অবস্থায় গমনকালে নামাজ পাঠ করা সিদ্ধ নয়। দৌড়রত অশ্বের আরোহী অবস্থায় নামাজ পাঠের কথা এই আয়াতে নেই। কারণ, এখানে উল্লেখিত 'রিজালান' শব্দটি 'রাজিল' শব্দের বহুবচন। আর রাজিল শব্দের অর্থ পদবিক্ষেপরত নয়। বরং শব্দটির প্রকৃত অর্থ দু'পায়ের উপর দন্ডায়মান ব্যক্তি। তেমনি হাদিসে উল্লেখিত রিজালান ও ক্বিয়ামান শব্দদ্বয়ের সংযোজিত উপস্থাপনাও চলন্ত অবস্থায় নামাজ সিদ্ধ হওয়াকে প্রমাণ করে না। হাদিসটিকে নাফে মারফু মনে করেছেন। কিন্তু বর্ণনাটির মারফু হওয়া সুস্পষ্ট নয়।

যদি কেউ বলে, আতংকজনক অবস্থায় নামাজের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করা ঐকমত্যানুসারে জায়েয। তাহলে চলন্ত অবস্থায় নামাজ সঠিক হবে না কেনো?

আমরা বলি, শরিয়তের বিধানের উপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। চলন্ত অবস্থায় ব্যাপারটা এ রকম- নামাজরত অবস্থায় অজু ভেঙে গেলে অজুর জন্য চলে যাওয়া যায়। এ রকম চলন্ত অবস্থায় নামাজ জায়েয একথা বলা যায় না।

মাসআলাঃ এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, চরম ভয়সঙ্কুল পরিবেশে কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হলে, আরোহী অবস্থাতে যে দিকে মুখ করা সম্ভব সে দিকেই মুখ করে নামাজ আদায় করে নিতে হবে। রুকু সেজদা সম্পন্ন করতে হবে ইশারায়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ রকম অবস্থায় নামাজ আদায় করতে হবে এককভাবে। জামাতবদ্ধভাবে নয়। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, জামাতবদ্ধভাবে আদায় করতে হবে। হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ভয়সঙ্কুল পরিস্থিতিতে জামাত করা সম্ভব নয়।

মাসআলাঃ ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুর ওলামার অভিমত হচ্ছে— এমতাবস্থায় নামাজের রাকাত হ্রাস করা যাবে না। মুজাহিদের মাধ্যমে মুসলিম কর্তৃক হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য এসেছে এ রকম— রসুল স. বলেন, আল্লাহ্পাক আবাসে চার রাকাত, প্রবাসে দুই রাকাত এবং ভীতিসঙ্কুল পরিস্থিতিতে এক রাকাত নামাজ পড়া ফরজ করে দিয়েছেন। আতা, তাউস, হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাও একথা বলেছেন। সুরা নিসায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে ইন্শাআল্লাহ্।

অতঃপর নিরাপদ অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করার (নামাজ আদায় করার) কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিরাপদ অবস্থায় সকল বিধিবিধানসহ পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করতে হবে। যে নামাজ আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর রসুলের মাধ্যমে।

শেষে বলা হয়েছে, 'যা তোমরা জানতে না' — একথার অর্থ আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলের মাধ্যমে নামাজের সম্যক পরিচয় দানের পূর্বে তোমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৪০, ২৪১, ২৪২

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

❒ তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু আসন্ন তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভরণপোষণের অসিয়ত করে। কিন্তু যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

❒ তালাক প্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামত ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য।

❒ এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

এখানে উল্লেখিত 'অসিয়ত' শব্দটি ক্বারী আবু আমর, ইবনে আমের, হামজাহ ও হাফস্ পাঠ করেছেন 'যবর' সহযোগে। এরূপ পাঠে 'ফাল ইয়া উসু' একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ হবে। অন্য ক্বারীগণ অসিয়ত শব্দটি পাঠ করেছেন পেশ সহযোগে। এমতাবস্থায় বর্ণনাভঙ্গিটি হবে এ রকম— 'কুতিবা আলাইকুম অসিয়াতুন'। 'কুতিবা আলাইকুমুল অসিয়াতু'-এ রকম পাঠরীতিও পরিদৃষ্ট হয়। সকল পাঠরীতির ভাষাগত ও শব্দগত সমন্বয় সাধিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিরা তাদের সহধর্মিণীদের জন্য অসিয়ত করাকে কর্তব্য মনে করবে। সেই অসিয়ত অনুযায়ী সহধর্মিণীরা তার সম্পদ থেকে উপস্বত্ব ভোগ করতে পারবে। এ আয়াত অনুসারে স্ত্রী সম্পর্কে অসিয়ত করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যেমন ওয়াজিব পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত—যার সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'কুতিবা আলাইকুম ইজা হাদ্বারা আহাদুকুমুল মাউতু ইনতারকা খইরা নিল ওয়াসিয়াতু লিল

ওয়ালিদাইনে ওয়াল আকরবিনা বিল মা'রুফ'। পরে বিধানটি রহিত হয়। যেমন রহিত হয় এই আয়াতে বর্ণিত অসিয়ত সম্পর্কিত বিধানটি। ইতোপূর্বে উল্লেখিত মীরাস সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে অসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতগুলো রহিত হয়েছে। রসুল আকরম স. বলেছেন, উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়ত করার প্রয়োজন নেই। ইবনে আবি হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে মেয়েরা এক চতুর্থাংশ ও এক অষ্টমাংশের অংশীদার হওয়ার কারণে খোরপোষের প্রসঙ্গটি অপসৃত হয়েছে।

মূর্খতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সারা বৎসর শোক পালন করতে হতো। কেউ কেউ বলেছেন, সারা বৎসরের শোক পালন সম্পর্কিত মেয়াদ চার মাস দশ দিনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। আয়াতটি তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রে কিন্তু অবতরণের ক্ষেত্রে পশ্চাতে। হজরত ওসমান বিন আফফান থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সারা বছর শোক পালনের বিধান চার মাস দশ দিনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি তায়েফবাসী হাকিম বিন হারিসকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর পরলোকগমনের পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। রসুল পাক স. পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁর পিতামাতা ও সন্তানদের দিয়েছিলেন। স্ত্রীকে কিছুই দেননি। বলেছিলেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বিধবা স্ত্রীকে দিতে হবে এক বৎসরের ভরণপোষণ। ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্ মুকাতিল বিন হাব্বান থেকে এ রকম তাফসীর করেছেন। তবে তার ব্যাখ্যায় ওই হিজরতকারীর নামোল্লেখ করা হয়নি।

আমি বলি, বর্ণিত বক্তব্য অসঠিক নয়। তবে আয়াতের গতিধারা হাদিসের বিপরীত। আয়াতে বলা হয়েছে, অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কথা। আর হাদিসে বলা হয়েছে, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক বৎসরের খোরপোষ দেয়ার কথা। অর্থাৎ আয়াত অনুসারে অসিয়ত ওয়াজিব এবং হাদিস অনুসারে খোরপোষ ওয়াজিব। সম্ভবতঃ ওই তায়েফবাসীর মৃত্যুর পর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তিনিও পূর্বাহ্নে স্ত্রীর এক বৎসরের খোরপোষের অসিয়ত করেছিলেন। রসুল পাক স. সেই অসিয়ত কার্যকর করেছিলেন। হাদিসের বক্তব্যানুসারে বুঝা যায়, এই আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে 'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ উপদেশ দেন।' আবার কেউ বলেছেন, পরে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি —'আর তাদের (স্ত্রীদের) জন্য এক চতুর্থাংশ।'

'কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমতো নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই'— এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে। বাগবী একথা বলেছেন। পাপ না হওয়ার কারণ এখানে দু'টি। একটি আগেই আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই— বিধবারা এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বের হয়ে গেলে তোমরা যদি খরচ বন্ধ করে দাও তবে কোনো দোষ নেই। আমি বলি, এ রকম ব্যাখ্যা আয়াতের বক্তব্যভঙ্গির পরিপন্থী। বক্তব্য

যদি এরকমই হতো তবে 'তারা যা করবে' এর স্থলে বলা হতো— 'তোমরা যা করবে।' তখন ব্যাখ্যাটি যুক্তিযুক্ত মনে হতো। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সারা বৎসর শোক পালন করা এবং ইদ্দত পালন করা ইতোপূর্বেও ওয়াজিব ছিলো না। বরং অন্ধকার যুগে কুসংস্কারবশতঃ পতিবিচ্ছেদিনীরা বিরহকাতরতার অনুষ্ঠান করতো। আল্লাহ্‌পাক তাই মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সারা বৎসর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব করে দিয়েছেন। বিধান দিয়েছেন সারা বৎসর শোক পালনের সময় তোমরা তাদেরকে গৃহহারা কোরোনা এবং তাদের ব্যয়ভারও বহন করে যেতে থেকো। ফলকথা, মৃত ব্যক্তির ইদ্দতের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে চার মাস দশ দিনের বিধান। আর আলোচ্য বিধানটি নতুন আরেকটি বিধান যা কোনো বিধানকে রহিত করেনি।

এ আয়াত (২৪০) এর শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ তিনি পরাক্রান্ত তাই বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; আর প্রজ্ঞাময় বলেই তিনি সার্বজনীনতার অনুকূলে কল্যাণকর বিধান দান করেছেন।

'তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথমত ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য'— একথার অর্থ তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ইদ্দত পর্যন্ত খোরপোষ দিতে হবে। আর এই খোরপোষ দেয়ার ব্যাপারে অবলম্বন করতে হবে সাবধানতা। বিত্তশালী ও অবিত্তশালীরা তাদের স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে খোরপোষ দিবে। এরকম সাবধানতাসম্পন্ন খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের 'মাতা' শব্দটির উদ্দেশ্য ইদ্দতকালীন খোরপোষ। প্রসঙ্গটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পূর্বের আয়াত এবং এই আয়াত সমার্থক হওয়ার কারণ হচ্ছে— মৃত্যু ও তালাক উভয় অবস্থাতেই রমণীরা ইদ্দত পালন পর্যন্ত স্বামীর অধিকারাধীনা থাকে। আর ওই সময়ের জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে তাদের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব থাকে।

ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতকালে স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব। কিন্তু বায়েন তালাকের ইদ্দতকালে খোরপোষ প্রদান ওয়াজিব কিনা— সে কথা স্পষ্ট নয়। কারণ, এই আয়াতে তালাকের বিবরণ এসেছে সাধারণভাবে। তালাকের প্রকার এখানে নির্দেশ করা হয়নি।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বায়েন তালাকের ইদ্দতেও খোরপোষ প্রদান ওয়াজিব। অপর একটি দলিল হচ্ছে এই— 'আর তাদেরকে বসবাস করতে দাও, যেখানে বসবাস করো তোমরা, নিজের সামর্থ অনুসারে'। হজরত ইবনে মাসউদের পাঠ ভঙ্গিমায় এ রকমও এসেছে— 'আর তাদেরকে বাসস্থান দান করো যেখানে বসবাস করো তোমরা, আর তাদেরকে খোরপোষ দাও তোমাদের সাধ্যানুসারে'। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি হচ্ছে তৃতীয় দলিল যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা রমণীগণের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ

অপরিহার্য। দারা কুতনী। কেউ যদি এই বলে অনুযোগ তোলে যে, এ হাদিসের এক বর্ণনাকারী হারিস বিন আবুল আলীয়াকে জয়ীফ বলেছেন ইহাহ্ইয়া বিন মুয়ীন। আমি বলতে চাই, হারিস বিন আবুল আলীয়া ছিলেন, আবু মুয়াজ, আবদুল্লাহ্ কাওয়ারিরীর ওস্তাদ। তাঁর জয়ীফ হওয়া প্রামাণ্য নয়। চতুর্থ দলিল হচ্ছে— খোরপোষ পাওয়ার অজুহাত আগে যেমন বর্ণিত হয়েছে— এখানেও তেমনি বর্ণনা করা হয়েছে। ইদ্দত পালন করা অর্থ গর্ভসঞ্চারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। এই নিশ্চিতি লাভ হওয়া পর্যন্ত তাই খোরপোষ পরিশোধের দায়িত্ব থাকে স্বামীর।

বিধবাদের খোরপোষের বিষয়টিকে শরিয়তে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া হয়নি। বরং এর পরিবর্তে ওয়ারিশী স্বত্ব অনুমোদন করেছে। তাই এই বিধানকে সম্পূর্ণ রহিত হয়েছে বলা যায় না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিধবাদেরকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব নয়। বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব। ইমাম আহমদের একটি অভিমতও এ রকম। তাঁর অপর অভিমতটি হচ্ছে— খোরপোষ কিংবা বাসস্থান কোনোটিই দিতে হবে না। এ অভিমতের সমর্থনে ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদিসকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর স্বামী আমর বিন হাফস্ দূরদেশ থেকে তাঁর নামে তালাকনামা পাঠিয়েছিলেন এবং আহার্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সামান্য গম। ফাতেমা তখন অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ পেশ করলেন। রসুল স. বললেন—'লাইসা লাকি নাফক্ব' (তোমার জন্য কোনো খোরপোষ নেই)। তুমি উম্মে শরীফের গৃহে ইদ্দত পালন করো। পুনরায় বললেন, উম্মে শরীফের গৃহে তো অনেক লোক যাতায়াত করে— তোমার পর্দার অসুবিধা হবে। তুমি বরং ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে চলে যাও এবং সেখানে ইদ্দত পুরা করো। মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়— ফাতেমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। তিনি তখন রসুল স. এর স্মরণাপন্ন হলেন। রসুল স. জানিয়ে দিলেন তোমার জন্য কোনো খোরপোষ নেই। ইমাম আহমদ এ হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন— যেখানে বলা হয়েছে— ফাতেমা বিনতে কায়েস তাঁকে বলেছেন, রসুল স. আমার বাসস্থান কিংবা খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাত্ জয়ীফ। ইমাম আহমদ ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, মেয়েরা বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে তখনই যখন তাকে দেয়া হবে রজয়ী তালাক। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকারিণী নয়। এ হাদিসের প্রেক্ষিতেই ইমাম আহমদ বলেছেন, তাদের জন্য বাসস্থানও নেই।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের এরশাদ 'তাদেরকে বাসস্থান দাও' অনুসারে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব। তাঁর সহচরগণও একথায় একমত। হয়তো তাঁরা কোনো কারণে এই হাদিসের কার্যকারিতা মেনে নিতে চাননি। আমরা বলি, ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদিস আল্লাহ্র কালামের বিপরীত। তাই পরিত্যাজ্য। হজরত ওমর বহুসংখ্যক সাহাবীর সম্মুখে এই হাদিসের কার্যকারিতা পরিত্যাগ করেছেন।

এই হাদিসের সূত্রপরম্পরায় তিরমিজি মুগিরা থেকে, তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স.এর যুগে আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। রসুল স. আমাকে তখন বলেছিলেন, তোমার জন্য তোমার স্বামীর দায়িত্বে খোরপোষ নেই, বাসস্থানও নেই। মুগিরা বলেছেন, আমি এই হাদিসের বিষয়ে ইব্রাহিমের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি জানালেন, ফাতেমার কথা শুনে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতকালে বলেছিলেন, এক নারীর বিবৃতির উপর আমরা আল্লাহ্র কালাম এবং রসুল স. এর আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারি না। জানি না, প্রকৃত অবস্থা তাঁর মনে আছে কিনা। হজরত ওমর এরকম তালাকপ্রাপ্তাদেরকে প্রায়শঃই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইব্রাহিম হজরত ওমরের যুগের মানুষ নয়। এদিকে অধিকাংশ বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় এসেছে-তাঁর বক্তব্যের উপর আমরা আল্লাহ্র কিতাবকে পরিত্যাগ করতে পারি না। এ সব বর্ণনায় রসুল স. এর আদর্শের কথা উল্লেখিত হয়নি। এই বর্ণনাগুলোই বিশুদ্ধ। আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, রসুল স. এর সিদ্ধান্তবিরোধী কোনো সাহাবীর উক্তি গ্রহণীয় নয়।

আমরা বলি, ১. ইব্রাহিম যদি হজরত ওমরের যুগ না পেয়ে থাকেন তবে হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট দলিল। ২. হজরত ওমরের উক্তি 'আমরা আমাদের নবীর আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারি না'— প্রমাণ করে যে হাদিসটি মারফু। ৩. যদি আমরা তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিই তবে 'আমরা আল্লাহ্র কিতাব পরিত্যাগ করতে পারি না'- ইবনে জাওজী কর্তৃক উপস্থাপিত এ বিবরণটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, হজরত ওমরের উক্তি হজরত ইবনে মাসউদের উচ্চারণ ভঙ্গিমার বিশুদ্ধতার প্রমাণ, যার অর্থ হয় এ রকম—'তাদের খোরপোষ দাও তোমাদের সামর্থ অনুয়ায়ী' এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, 'মাতাউম বিল মা'রুফ' এর মর্ম হচ্ছে— কল্যাণ ভাতা যা খোরপোষ থেকে পৃথক আর কল্যাণভাতা হলো তিনটি কাপড়। কল্যাণভাতা ওই রমণীর প্রাপ্য যে অনাঘ্রাতা অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফার নিকট 'লিল মুতালাককৃতি' আয়াতের জন্য প্রামাণ্য বর্ণনা হচ্ছে—ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত ইবনে জারীরের বর্ণনাটি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো। বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী বিধিমতো সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। এ রকম করা সত্য-পরায়ণ লোকের কর্তব্য।'— এ আয়াত অবতীর্ণ হলে এক ব্যক্তি বললো, তাহলে আমি স্ত্রীর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করতেও পারি— নাও পারি। অর্থাৎ তার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন আমার জন্য অপরিহার্য নয়। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'তালাকপ্রাপ্তারা বিধিসম্মত কল্যাণভাতার অধিকারিণী। এ কল্যাণভাতা পরিশোধ করা মুত্তাকীদের দায়িত্ব।' সুতরাং অনাঘ্রাতা, তালাকপ্রাপ্তা রমণীর কল্যাণভাতার অধিকারটি সুপ্রমাণিত। এটাই ইমাম আবু হানিফার অভিমত।

কেউ যদি অনুযোগ করে বলে, যদি এ রকমই হয় তবে ইমাম আবু হানিফা কেনো বলেছেন— ওই নারীকে কল্যাণভাতা দেয়া মোস্তাহাব যাকে সম্ভোগ করার পর তালাক দেয়া হয়েছে— মোহরানা নির্ধারিত না হলেও।

আমরা বলি, সম্ভোগের পরে তালাক দেয়া নারীর কল্যাণভাতা মোস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি এ আয়াতের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত নয়। এর প্রমাণ রয়েছে সুরা আহযাবের ওই আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে- 'এসো, তোমাদের কল্যাণ ভাতা দিবো এবং সুন্দরভাবে বিদায় করে দিবো।'

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন—সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তাদেরকে কল্যাণভাতা প্রদান করা ওয়াজিব। কেবল তাদেরকে দেয়া ওয়াজিব নয় যারা সম্ভোগের পূর্বে এবং নির্ধারিত মোহরযুক্ত অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে।

আমি বলি, সকল তালাকপ্রাপ্তাই যদি এ বিধানের অন্তর্ভূত হয় তবে সম্ভোগপূর্বরা আবার ব্যতিক্রম হলো কেনো? যদি বলা হয় 'ইস্তিস্না' বা ব্যতিক্রম প্রকাশক অব্যয় এর কারণে এরকম হয়েছে। তবে আমরা বলবো অর্ধেক মোহরই তো তাদের কল্যাণভাতা। বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইমাম শাফেয়ীর ব্যাখ্যা সুনির্ধারিত নয়। বরং সম্ভাব্য অর্থবোধক। বিষয়টি সার্বজনীন হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর এরকম সন্দিগ্ধতার মাধ্যমে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। তাই আমরা এক্ষেত্রে মোস্তাহাবের উপর আমল করার প্রবক্তা।

শেষোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' এখানে এ অঙ্গীকার প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, সত্বরই আল্লাহ্পাক এমন প্রমাণ ও বিধান বর্ণনা করবেন, যা হবে তোমাদের ইহ-পারলৌকিক জীবনের অতিআবশ্যকীয় অবলম্বন। তোমাদের জ্ঞানকে আল্লাহ্তায়ালার বিধান অনুধাবনে নিয়োজিত করতে পারো তোমরা। যদি বুঝো তবে নিশ্চয়ই এরকম করবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৪৩,২৪৪,২৪৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মৃত্যু ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হউক।' তারপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

❒ তোমরা আল্লাহের পথে সংগ্রাম কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ কে সে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

'আলাম তারা' একটি বিস্ময় প্রকাশক সম্বোধন। শ্রোতাদের অভিনিবেশকে আকর্ষণ করার জন্য এরকম সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। 'আলাম তারা' অর্থ তুমি (তোমরা) কি দেখ নাই? এরকম সম্বোধনের মাধ্যমে অশ্রুতপূর্ব, অদর্শিত ও বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করাই সমীচীন। যারা এসব কথা শ্রবণ করেছে — সেই আহ্লে কিতাবের নিকট এরকম ঘটনা আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের প্রমাণ। এর মর্মার্থ যেনো এরকম—ওহে সম্বোধিত ব্যক্তি (ব্যক্তিবর্গ) এই আয়াত যে আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা কি তোমরা বুঝ না? কোরআন মজীদের সকল স্থানে 'আলাম তারা' সম্বোধনটির মর্মার্থ এরকমই মনে করতে হবে।

'যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিলো।'— এসম্পর্কে আতা খোরাসানী বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। ওয়াহাব বলেছেন চার হাজর। হাকেমও তাই বলেছেন। আরও বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিলো সর্বমোট আট হাজার। সুদ্দী বলেছেন, ত্রিশ হাজার। ইবনে জুরাইজ বলেছেন চল্লিশ হাজার। ইবনে জারীর হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রে একবার চল্লিশ হাজার আরেকবার আট হাজারের কথা বলেছেন। আতা বিন রিবাহ্ বলেছেন সত্তর হাজারের কথা।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'উলুফ' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'উলফাত' থেকে— যার মর্ম হচ্ছে তারা ছিলো চিত্তাকর্ষক, অর্থাৎ সুশ্রী। বাগবী বলেছেন, (জর্দানে অবস্থিত) ওয়াসিত এর উপকণ্ঠে ছিলো দাওয়ারদান নামে একটি গ্রাম। সেই গ্রামে একবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলো। কিছু লোক সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। যারা রয়ে গেলো তাদের সকলেরই জীবনাবসান হলো। মহামারীর অধ্যায় শেষ হলে পলায়নকারীরা পুনরায় ফিরে এলো গ্রামে। দু'চারজন তখনও বেঁচে ছিলো। তারা প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে দেখে বলতে শুরু করলো, তোমরা খুবই হুঁশিয়ার। আমরা তোমাদের সঙ্গে পালালে সকলেই জীবিত

থাকতে পারতাম। আবার যদি কখনও প্লেগ আসে, তবে একজনও আমরা গ্রামে থাকবো না। সকলেই পালিয়ে যাবো এখান থেকে। পরের বছর পুনরায় প্লেগ দেখা দিলো। অধিকাংশ গ্রামবাসী তখন পালিয়ে গিয়ে দূরে এক তরুলতাহীন উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হলো। প্লেগমুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো তারা। কিন্তু মৃত্যুর বিধান অলঙ্ঘনীয়। হঠাৎ একজন ফেরেশতা জঙ্গলের দিক থেকে এবং অন্য একজন আকাশের দিক থেকে কর্ণবিদারী আওয়াজ তুললেন— মৃত্যু। এই আওয়াজ শুনে সকলেই মরে গেলো। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, কোথাও মহামারীর প্রাদুর্ভাব জানতে পারলে তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর তোমাদের জনপদে যদি মড়ক এসে পড়ে তবে অন্যত্র গমন কোরো না।

বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিরিয়ার সন্নিকটে সারাসা নামক স্থানে উপস্থিত হলে সংবাদ পেলেন সিরিয়ায় দেখা দিয়েছে ভয়াবহ প্লেগ। সঙ্গী হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ তখন সবাইকে বর্ণিত হাদিসটি শুনিয়ে দিলেন। হজরত ওমর আর অগ্রসর হলেন না। ফিরে এলেন মদীনায়।

কালাবী, মুকাতিল ও জুহাক বলেছেন, প্লেগ থেকে নয়, ওই লোকগুলো পলায়ন করেছিলো জেহাদ থেকে। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— ইসরাইল বংশীয় এক রাজা প্রজাবৃন্দের উপর নির্দেশ জারী করলেন— রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে চলো। শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত প্রজারা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলো ঠিকই; কিন্তু পেশ করতে শুরু করলো বিভিন্ন রকমের ওজর আপত্তি। বললো, মহারাজ! আমরা সংবাদ পেয়েছি— যে দেশে যুদ্ধ করতে যাবো সেখানে এখন ভয়াবহ মহামারী। সুতরাং মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখাই সমীচীন। রাজা তাদের কোনো ওজর আপত্তি শুনলেন না। তখন ভীত প্রজারা গোপনে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। রাজা আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! হে হজরত ইয়াকুবের প্রতিপালক! হে হজরত মুসার মা'বুদ! অব্যাধ্যদের প্রাণ সংহার করে এমন একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো যাতে তারা বুঝে, পলায়ন করলেও মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।'— এই হুকুমের ফলে গৃহপালিত পশুসহ সব লোক একই সঙ্গে মরে গেলো। পরে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে এলাকাটি ঘিরে রেখে দিলো। যেনো মানুষ ও পশুদের লাশ হেফাজতে থাকে। এভাবে অতিবাহিত হলো কিছু দিন। কেউ কেউ বলেছেন, আট দিন অতিবাহিত হয়েছিলো এভাবে। কেউ বলেছেন, মৃতদের লাশ গলে গিয়েছিলো। আবার কেউ বলেছেন, অবশিষ্ট ছিলো কেবল তাদের অস্থিসমূহ।

'তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন।'—একথার অর্থ মৃত ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র হুকুমেই পুনর্জীবিত হলো। ইবনে জারীর সুদ্দীর সূত্রে আবু মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন— হজরত হিযকিল আ. দাওয়ারদান গ্রামটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন মৃত ব্যক্তিদের হাড়গোড়গুলো রোদের তাপে চকচক করছে। প্রতিটি হাড় ছিলো সংযোগচ্যুত। হজরত হিযকিল এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে কীভাবে আবার জীবন দান করবেন। অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ হলো— 'অস্থিগুলোর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলো, 'কুমু বিইজনিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র আদেশে দাঁড়িয়ে যাও)। প্রত্যাদেশানুযায়ী তিনি ডাক দিলেন, কুমু বিইজনিল্লাহ্। সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে গেলো মৃতের দল। হজরত হিযকিল বিন ইউজা ছিলেন হজরত মুসা পরবর্তী খলিফাবৃন্দের মধ্যে তৃতীয় খলিফা। হাসান এবং মুকাতিল বলেছেন, তিনিই ছিলেন জুলকিফল আ.। কিন্তু হিযকিল নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন সত্তরজন নবীর জিম্মাদার। তাঁদেরকে তিনি মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, পুনর্জীবনপ্রাপ্ত লোকগুলো ছিলো হজরত হিযকিলেরই সম্প্রদায়ভূত। তাদেরকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন হজরত হিযকিল। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় তাদেরকে না পেয়ে পেয়েছিলেন কেবল অস্থিসমূহ। এই নিদারুণ পরিণতি দেখে তিনি খুব কাঁদলেন। প্রার্থনা জানালেন, হে আমাদের দয়াময় প্রভু-প্রতিপালক! এই লোকগুলো তো তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করতো, পাঠ করতো তোমারই নামের তাসবীহ, ঘোষনা করতো তোমারই মহিমা। স্বীকার করতো তোমার এককত্ব। সবাইকে তুমি এভাবে মৃত্যুদান করলে— আর আমি রয়ে গেলাম একা। এ দৃশ্য বড়ই মর্মবিদারক, বেদানবিধূর। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে হিযকিল! যাও, তাদেরকে পুনর্জীবিত করবার অনুমতি আমি তোমাকে দান করলাম। হজরত হিযকিল তখন চিৎকার করে বললেন, 'আহ্ইউ বিইজনিল্লাহ্' (আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও)। সঙ্গে সঙ্গে সকলে জীবিত হয়ে গেলো। মুজাহিদ বলেছেন, 'সুব্‌হানাকা রব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা লা ইলাহা ইল্লা আংতা' পুনর্জীবনপ্রাপ্তরা আপন আপন গৃহে ফিরে গেলো। কিছুকাল পরেই তাদের চেহারায় ফুটে উঠলো বার্ধক্যের ছাপ। তারপর তাদের পরিধেয় বস্ত্র হয়ে গেলো কাফনের মতো। একে একে মৃত্যুর স্বাভাবিক বিধানকে আলিঙ্গন করলো তারা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমে বার্ধক্য তারপর মৃত্যু। এ নিয়মটিই পরবর্তীদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, পলাতকদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আল্লাহ্‌পাক। তাই তাঁর একটি হুকুমই তাদের সকলকে একসঙ্গে মৃত্যু দান করেছিলো। পরে হজরত হিয্‌কিলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক পুনরায় জীবন দান করেছিলেন সকলকে। পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থানের পর আবার ঘটেছিলো তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল।'- একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, পুনর্জীবনদানের ঘটনাটি ছিলো আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহশীলতার নিদর্শন। এতে করে

এই শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিলো যে, আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় পরাক্রম অবলোকন করে ওই মানুষগুলো যেনো সৎকর্মপরায়ণতার দিকে ধাবিত হতে পারে। আর ওই ঘটনা এখন যাদেরকে শোনানো হচ্ছে— তারাও যেনো আল্লাহ্র প্রতি অধিকতর মনোনিবদ্ধ করে। যেনো বুঝতে পারে সত্যি আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল।

'কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'— আল্লাহ্পাকের এই এরশাদ, যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতিই সদুপদেশ ও সৎপ্রেরণা। এতে করে তারা অধিকতর আল্লাহ্নিষ্ঠ হবে এবং তকদীরের অনড় লিখনকে মেনে নিবে মনে প্রাণে। এভাবে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে জেহাদের দিকে।

'তোমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করো এবং জেনে রাখো যে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'— একথার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। তাই মৃত্যুকে এড়ানোর চেষ্টা নয় বরং মৃত্যুকে জেহাদের মাধ্যমে মহিমান্বিত করাই শ্রেয়। তাই বিশ্বাসীগণের উচিৎ — তারা হয় শাহাদতের মাধ্যমে মৃত্যুকে দান করবে মহিমা নয়তো বিজয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর জীবনকে করবে পুরস্কৃত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। সুতরাং মনে রেখো তোমাদের অন্তর ও বাহিরের সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি যেমন শোনেন তেমনি জানেনও।

এবার আলোচনা করা হচ্ছে কর্জে হাসানা সংক্রান্ত শেষোক্ত আয়াতটি। এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনা রয়েছে তাঁর সহীহ্ বোখারীতে। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে ওমর থেকেও এ বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণটি এই— 'তাদের দৃষ্টান্ত হলো-যারা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে.......।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. দোয়া করলেন, হে বিশ্বসমূহের প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরও বেশী দান করো। তখন এই আয়াতটি (২৪৫) অবতীর্ণ হয়।

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে 'কে সে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?' কর্জে হাসানা অর্থ উত্তম ঋণ। করজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ কর্তন করা। অর্থাৎ বিনিময় কেটে নেয়া। কাউকে কোনো কিছু দিয়ে তার নিকট থেকে পুনরায় সমপরিমাণ সম্পদ ফিরিয়ে নেয়াকে করজ বলা হয়। এইভাবে প্রদত্ত সম্পদ নয় বরং তার বিনিময় কর্তন করার নামই করজ। এখানে করজ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। এখানে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয়ার অর্থ আল্লাহ্র বান্দাকে উত্তম ঋণ দেয়া। এখানে সরাসরি শাব্দিক অর্থ নয় বরং রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। হাদিস শরীফেও এরকম রূপক অর্থ সম্পন্ন বাকভঙ্গিমার ব্যবহার রয়েছে। যেমন, মারফু পদ্ধতিকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের নিকট থেকে আহার্য চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা দাওনি। মানুষেরা বলবে, হে পরোয়ারদিগার! তুমিতো মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। বিশ্বসমূহের প্রতিপালক তুমি। সকল সৃষ্টির আহার্য্য তুমিইতো দয়া করে দান করো।

আল্লাহ্পাক বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলো, তুমি দাওনি। তুমি যদি সেদিন তাকে খাদ্য দান করতে তবে আজ আমার নিকট থেকে পেতে উত্তম প্রতিদান। মুসলিম।

ঋণদানের মহিমা বিষয়েও হাদিস রয়েছে অনেক । তার মধ্যে হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসটিও রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, প্রত্যেক করজই সদকা। হাদিসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও বায়হাকী। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার করজ দিলে তা হবে দু'বার দানের সমতুল্য। ইবনে মাজা। বর্ণনাটি প্রত্যয়ন করেছেন ইবনে হাব্বান। দু'টি পদ্ধতিতে মারফু সূত্রে বায়হাকীও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী।

এখানে করজের অর্থ রূপক হিসেবেও বলা হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় মর্ম হবে পৃথিবীতে এমন সৎকর্ম সাধন যার মাধ্যমে উত্তম প্রতিদান লাভের আকাঙ্খা করা যেতে পারে। এ আয়াতের শানে নুজলের বর্ণনা কালে বোখারীর উদ্বৃতিতে এরকম উল্লেখিত হয়েছে।

উত্তম ঋণ বা কর্জে হাসানা দিতে হবে বিশুদ্ধতার সঙ্গে সন্তুষ্ট চিত্তে। ইবনে আবী হাতেম থেকে বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর বলেছেন, সৎসাধনা ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয়ের নামই কর্জে হাসানা।

'তিনি তার জন্য উত্তম ঋণ বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।' এ সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, এই বহুগুণে বৃদ্ধির পরিমাণ কতো- তা আল্লাহ্পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিনিময় হবে সাত শত গুণ পর্যন্ত। প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

'আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে'—এখানে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করার অর্থ রিজিকের সংকোচন ও প্রসরণ। আল্লাহ্পাক তাঁর আপন অভিপ্রায়ে কারো প্রতি আপতিত করেন অনটন এবং কারোর জন্য নির্ধারণ করেন প্রাচুর্য। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, প্রতি প্রত্যূষে যখন মানুষ জেগে উঠতে থাকে তখন আকাশ থেকে অবতরণ করেন দু'জন ফেরেশতা। একজন বলেন, হে পরোয়ারদিগার! দাতাকে বিনিময় দাও। দ্বিতীয়জন বলেন, হে মা'বুদ! কৃপণের বিত্ত বিনষ্ট করো। বোখারী, মুসলিম।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সংকোচন ও প্রসরণের ব্যাপারটি অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ তিনি কারো অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন—ফলে দানের অনুপ্রেরণা সেখানে ঠাঁই পায় না। আর যাঁদেরকে দান করেন সম্প্রসারিত হৃদয়, তাঁদের অন্তঃকরণ থাকে দানের আনন্দে ভরপুর। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, দাতা ও কৃপণের দৃষ্টান্ত লৌহবস্ত্র পরিহিত ওই ব্যক্তিদ্বয়ের মতো যাদের বস্ত্রের হাতগুলো লেগে থাকে তাদের বুকের সাথে। দাতা

দান করতে চাইলে বুক থেকে ওই হাত দুটো আলগা হয়ে যায়। আর বখিল দান করতে চাইলে হাত দু'টো থাকে অনড়। বোখারী, মুসলিম। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহ্‌পাকের হাতের দুই আঙ্গুলের মধ্যে। তিনি সকলের অন্তঃকরণকে যেদিকে খুশী সেদিকে ঘুরিয়ে দেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের মর্ম হচ্ছে— আল্লাহ্ পাক দান খয়রাত গ্রহণ করেন। আর বাড়িয়ে দেন প্রতিদান ও সওয়াব। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, স্বোপার্জিত সম্পদ থেকে খেজুরের দানা পরিমাণ দানকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌পাক। তারপর তিনি এই দানকে প্রতিপালন করতে থাকেন যেমন তোমরা প্রতিপালন করো গোবৎসকে। এভাবে সে দান হয়ে যায় পাহাড়ের মতো। আর আল্লাহ্‌পাক কেবল হালাল উপার্জনকেই গ্রহণ করেন। বোখারী, মুসলিম। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের মর্ম হবে এরকম- আল্লাহ্‌পাক মৃত্যুর সময় হস্তগত করেন রূহ্ এবং নফ্‌সকে। আর যাদের মৃত্যুলগ্ন এখনও আসেনি তাদেরকে হস্তগত করেন সুপ্তির সময়। যাদের মৃত্যু সমুপস্থিত তাদেরকে পাকড়াও করেন আর অবশিষ্টদেরকে দান করেন এক নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশ।

'এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে।' —একথার অর্থ অবশেষে তোমরা যখন তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে তখন তিনি তোমাদেরকে সকল সৎকর্মের (বিশেষ করে উত্তম ঋণের) বিনিময় দান করবেন। কাতাদা বলেছেন, এখানে তাঁর দিকে কথাটির অর্থ হবে মাটির দিকে। অর্থাৎ তোমরা মৃত্যুর পর মাটির দিকেই ফিরে যাবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৪৬,২৪৭,২৪৮

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

❒ তুমি কি মূসার পরবর্তী বনীইস্রাইল — প্রধানদিগকে দেখ নাই? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিতে পারি', সে বলিল, 'ইহাতো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা সংগ্রাম করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি তখন আল্লাহের পথে কেন সংগ্রাম করিব না? 'অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ সীমালঘংনকারীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❒ তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন'; তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার কর্তৃত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার! এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই!' নবী বলিল, 'আল্লাহ্ই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

❒ তাঁহার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবুত আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন সম্প্রদায় যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফেরেশতাগণ ইহা

বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের জন্য উহাতে নিদর্শন আছে।

বনী ইসরাইল প্রধানগণ তাদের নবীকে তাদের জন্য এক রাজা নির্বাচন করে দিতে বললো। যে নবীর নিকট তারা এ প্রস্তাব পেশ করেছিলো, সে নবীর নাম হজরত ইউশা ইবনে নুন। সুদ্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত সামউন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে— সে নবী ছিলেন হজরত শামুয়েল। ওয়াহাব ইবনে আবী ইসহাক, কালাবী এবং আরও অনেকে বলেছেন, হজরত মুসার মহাপ্রস্থানের পর বনী ইসরাইলদের নবী হয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নূন। তাঁর তিরোধানের পর নবী হয়েছিলেন হজরত হিয্কিল। তাঁর পরলোকগমনের পর বনী ইসরাইলদের মধ্যে দেখা দিলো নতুন নতুন মতবাদ। তারা আল্লাহ্পাকের অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লো বিগ্রহ বন্দনায়। তওরাতের বিধান পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক তখন পাঠালেন হজরত ইলিয়াস নবীকে। তাঁর জীবনাবসানের পর এলেন হজরত আল ইয়াসায়া। তিনি যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, তখন পুনরায় দেখা দিলো বিশৃংখলা, মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো অসংখ্য শরিয়তবিরোধী মতবাদ।

বনী ইসরাইলদের পাপানুষ্ঠান ও ধৃষ্টতা চরমরূপ ধারণ করলো। তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকেরা চড়াও হলো তাদের উপর। তারা ছিলো মিশর ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তী সাগর তীরে বসবাসকারী জালুত্ সম্প্রদায়ের লোক। তারা বনী ইসরাইলদেরকে বন্দী করলো। রাজার বংশের চারশ' চল্লিশ জন তরুণও হয়েছিলো বন্দী। বনী ইসরাইলদের উপর জিজিয়া কর আরোপিত হলো। লুণ্ঠিত হলো তওরাত। লাঞ্ছনা ও অপমানের সীমা পরিসীমা আর রইলো না। বনী ইসরাইল তখন নবীবিহীন। নবীবংশে অবশিষ্ট ছিলেন কেবল একজন গর্ভবতী রমণী। আল্লাহ্পাকের অনুকম্পা হলো, তিনি ওই রমণীকে দান করলেন এক পুত্র সন্তান। আর তার নাম রাখলেন শামুয়েল। সেই শামুয়েল নবীকে ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো বাইতুল মাক্দিসে। তাঁর শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত হলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকলেন হজরত শামুয়েল। একদিন তিনি ওই প্রবীণ ব্যক্তির পাশে শায়িত ছিলেন। অকস্মাৎ হজরত জিব্রাইল আবির্ভূত হয়ে প্রবীণ ব্যক্তিটির স্বরে ডাক দিলেন, শামুয়েল! শামুয়েল তৎক্ষণাৎ উঠে প্রবীণ তত্ত্বাবধায়কের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, পিতঃ! আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? তিনি হাঁ না কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, বৎস! যাও, শুয়ে পড়ো। তরুণ নবী শামুয়েল পুনরায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হজরত জিব্রাইল এসে পুনরায় ডাক দিলেন। হজরত শামুয়েল পুনরায় উঠে গিয়ে প্রবীণকে বললেন, আপনি আমায় ডেকেছেন কি? পর পর তিনবার একই ঘটনা ঘটলো। তখন তিনি বুঝলেন, ইনি হচ্ছেন হজরত জিব্রাইল আমিন। হজরত জিব্রাইল তাঁকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও। তাদের নিকট তোমার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করো। আল্লাহ্পাক তোমাকে তাঁর বাণীবাহক নিযুক্ত করেছেন। হজরত শামুয়েল তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে

এলেন। সত্যের প্রতি আহবান জানালেন তাদেরকে। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করলো না। বললো, যদি তুমি সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাকো তবে আমাদের জন্য একজন সম্রাট নিযুক্ত করে দাও। আমরা তার অনুগামী হয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবো।

হজরত শামুয়েল নবী তখন তাদেরকে বললেন, তোমাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলে- এরকমতো হবে না যে, তোমরা যুদ্ধযাত্রা পরিত্যাগ করবে? তারা বললো, কেনো পরিত্যাগ করবো? আমরাতো আমাদের আবাসভূমি এবং সন্তান-সন্ততিদের নিকট থেকে পৃথক হয়েছি। তবে আল্লাহ্‌র পথে আমরা সংগ্রাম করবো না কেনো। তারা এরকম বললো বটে, কিন্তু শেষে অধিকাংশই পশ্চাদাপসরণ করলো। কেবল কিছুসংখ্যক ব্যক্তি একটি নদী অতিক্রম করে নদীর অপর তীরে পৌঁছতে সক্ষম হলো। যারা পিছনে পড়ে রইলো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, সীমালংঘনকারীগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

হজরত শামুয়েল আল্লাহ্‌পাকের নিকট একজন সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করলেন। হজরত শামুয়েলকে তখন দেয়া হলো একটি লাঠি ও একটি তেল ভর্তি পাত্র। ওই তেল ছিলো বাইতুল মাকদিসের। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো— — এক লোক আসবে —যার শরীর হবে এই লাঠির সমান লম্বা। সে এলে পাত্রে রক্ষিত এই তেলে সৃষ্টি হবে এক তরঙ্গ। সেই আগন্তুকের মাথায় তেল মালিশ করে দিয়ে তাকে বনী ইসরাইলদের রাজা হিসাবে মনোনয়ন দান করবে তুমি।

তালুত্ ছিলেন একজন চর্মশিল্পী অথবা ভিস্তিওয়ালা। কয়েকটি গাধা ছিলো তাঁর। হঠাৎ তাঁর গাধাগুলো একটি একটি করে হারিয়ে গেলো। গাধাগুলোর খোঁজ করতে করতে তিনি হজরত শামুয়েলের গৃহে পদার্পন করলেন। হারানো গাধাগুলোর সন্ধান জানতে চাইলেন তাঁর নিকট। । হজরত শামুয়েল দেখলেন তালুত্ আসার সাথে সাথে সেই পাত্রে রক্ষিত তেলে সৃষ্টি হয়েছে তরঙ্গ। তিনি ওই লাঠি দ্বারা মাপ নিলেন তালুতের। দেখলেন তালুত্ এবং লাঠির দৈর্ঘ এক সমান। তিনি তখন তালুতের মাথায় তেল মালিশ করে দিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করলেন বনী ইসরাইলদের নৃপতিরূপে। বনী ইসরাইলদের ডেকে বললেন, আল্লাহ্‌পাক তালুত্‌কে তোমাদের নৃপতিরূপে মনোনয়ন দিয়েছেন। বনী ইসরাইলদের মধ্যে লাদী বিন ইয়াকুব থেকে বংশপরম্পরায় নবী প্রেরিত হয়ে আসছিলো। আর রাজবংশ জারী ছিলো ইহুদীদের মধ্য থেকে। কিন্তু তালুত্ ছিলেন বিন ইয়ামিন বংশের এক দরিদ্র ব্যাক্তি। তাই বনী ইসরাইলরা বলে বসলো, আমরা এ লোকের কর্তৃত্ব মানবো কীভাবে। তারতো প্রচুর ঐশ্বর্য নেই। আমরাই বরং তার চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যের অধিকারী। সুতরাং কর্তৃত্ব করার দিক থেকে আমরাই তাঁর চেয়ে অধিকতর যোগ্য।

নবী বললেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁকেই তোমাদের সম্রাট হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছেন এবং তাঁকে দিয়েছেন জ্ঞান ও শারীরিক সৌষ্ঠব। কালাবী বলেছেন, তালুত্ ছিলেন রণনিপূন ও সুদর্শন। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী ছিলেন তিনি। কেউ উর্ধ্বে হাত

প্রসারিত করলে সে হাতের অগ্রভাগ হতো তাঁর মস্তক বরাবর। অন্যদের তুলনায় এরকমই দীর্ঘদেহী ছিলেন তিনি। তিনি রাজত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ আসতে শুরু করলো।

আমি বলি, আয়াতে তালুত্ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক তাঁকে রাজা মনোনীত করেছেন। আরো বলা হয়েছে আল্লাহ্পাক তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানে ও দেহে। এই জ্ঞান ছিলো শরিয়তের জ্ঞান। আল্লাহ্পাক তাঁর দ্বারা ধর্মীয় ও পার্থিব সমস্যা সমূহ সমাধান করে দিয়েছিলেন। সুতরাং যারা তাঁকে হজরত দাউদ নবীর পিতামহ বলে থাকে আরও বলে তাঁর প্রহারের ভয়ে দাউদ নবী পালিয়ে গিয়েছিলেন।—বনী ইসরাইলের আলেমগণ একারণে তাকে ভর্ৎসনা করেছিলো— ফলে রাগান্বিত হয়ে তালুত্ অনেক আলেমকে হত্যা করেছিলেন— ইত্যাদি ঘটনা সম্পূর্ণ অলীক, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব দান করেন। তিনি প্রাচুর্যময় বলেই যাকে ইচ্ছে করেন তার দারিদ্র বিমোচন করে সচ্ছলতা দানে ধন্য করেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময় তাই ভালোভাবে জানেন, কে সম্রাট হওয়ার যোগ্য। বনী ইসরাইলরা নিতান্তই মূর্খ ও অপরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী। তাই তারা জানে না এবং মানে না যে, যোগ্যতার মনোনয়ন ও প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে আল্লাহ্তায়ালারই নিয়ন্ত্রনভূত। বংশপরিচয় কোনো যোগ্যতা নয়। রাজাকে জনতার সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা দিতে হয়। আর নির্দেশনা দিতে গেলে প্রয়োজন হয় জ্ঞানের। জ্ঞানানুসৃত সমাধান প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শারীরিক শক্তিও প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ও বাহ্যিক ক্ষমতা আল্লাহ্পাক দিয়েছিলেন তালুত্কে। সুতরাং বনী ইসরাইলদের জানা উচিৎ যে,ঐশ্বর্যকে বনী ইসরাইলেরা যোগ্যতার মাপকাঠি মনে করেছে, সেই বিত্ত-ঐশ্বর্য আসলে কোনো যোগ্যতাই নয়। অর্থাগমের কোনো নিশ্চিতি নেই। কখনও আসে। কখনও চলে যায়। সুতরাং তা ধর্তব্য নয়। তদুপরি এ হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ। এ নির্দেশ অলংঘনীয়।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ২৪৮) আল্লাহ্পাক হজরত তালুতের কর্তৃত্বের নিদর্শন বিবৃত করেছেন। বলেছেন, তাঁর কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট আসবে এক বিশেষ সিন্দুক (তাবুত)। 'তাবুত' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'তাওব' থেকে যার অর্থ প্রত্যাবর্তন। 'তাবুত' থেকে যা বের হয় তা পুনরায় তাবুতেই ফিরে যায়। তাই এর নাম 'তাবুত' বা বিশেষ সিন্দুক। কেউ কেউ বলেছেন, ওই সিন্দুকটি ছিলো শেমশাদ কাঠের এবং স্বর্ণের কারুকার্য খচিত। ইবনে মুনজির, ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, সিন্দুকটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিলো যথাক্রমে তিন হাত ও দুই হাত। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, আল্লাহ্পাক হজরত আদমের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন একটি বিশেষ সিন্দুক। যার মধ্যে ছিলো অনেক নবীর প্রতিকৃতি। হজরত আদম সেই সিন্দুকটি সংরক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ওই

সিন্দুকের সংরক্ষক হোন হজরত শীশ। শেষ পর্যন্ত নবী পরম্পরায় ওই সিন্দুকটি এসে পৌঁছে হজরত মুসার কাছে। ওই সিন্দুকে তিনি তওরাত শরীফ রাখতেন। হজরত মুসার মহাতিরোধানের পর সিন্দুকটির সংরক্ষণাধিকার লাভ করেন পরবর্তী নবীগণ। কেউ কেউ বলেছেন, তওরাত সংরক্ষণের জন্যই সিন্দুকটি নির্মিত হয়েছিলো। যুদ্ধগমনকালে ওই সিন্দুকটি রাখা হতো সকলের সামনে। আর ওই সিন্দুকের বরকতেই বিজয়ী হতো বনী ইসরাইলেরা। সামনে চলতো সিন্দুক। পেছনে চলতো বনীইসরাইল যোদ্ধৃবৃন্দ। সিন্দুক থেমে গেলে তারাও থেমে যেতো।

'যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত প্রশান্তি'— একথার অর্থ ওই বিশেষ সিন্দুক দেখলে তোমাদের হৃদয়ে নেমে আসবে প্রশান্তি। তখন তালুতের রাজত্ব সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না। এখানে 'ফিহি'(যাতে) সর্বনামটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই বিশেষ সিন্দুকটিকে। অর্থাৎ ওই সিন্দুকে সংরক্ষিত বস্তু দৃষ্টিগোচর হলেই তোমাদের অন্তরে নেমে আসবে শান্তি। ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ্ থেকে ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন— যুদ্ধকালে হজরত মুসা সিন্দুকটি স্থাপন করতেন সকলের সম্মুখে। এর ফলে বনী ইসরাইলেরা দৃঢ় সংবদ্ধ হতো। তখন আর পলায়নের চিন্তা করতে পারতো না তারা। আমি বলি, এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্পাকের নিদর্শন, আল্লাহর নবী ও তাঁদের অনুসারী পুণ্যবানদেরকে দেখলে অন্তরে নেমে আসে প্রশান্তি। শয়তান তখন আর তার প্ররোচনার প্রভাব ফেলতে পারে না।

ইবনে আসাকের কালাবী থেকে, তিনি আবি সালেহ থেকে, তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন— চিত্তপ্রশান্তি আনয়নকারী সাকিনা হচ্ছে জবরজদ ও ইয়াকুতের তৈরী একটি প্রতিচ্ছবি যা সংরক্ষিত ছিলো ওই সিন্দুকে। তার মস্তক ও লেজ ছিলো বিড়ালের মস্তক ও লেজের মতো। দু'টিডানা ছিলো তার। সে কাঁদ্তো ও চিৎকার করতো। ওই সাকিনাবাহী সিন্দুকটি শত্রুদের পশ্চাৎধাবন করতো। বনীইস্রাইল সেনারা তখন তার পিছনে পিছনে দৌড় দিতো। সিন্দুকটি থেমে গেলে সৈনিকেরাও থেমে পড়্তো। তারপর অবতীর্ণ হতো আল্লাহ্পাকের বিশেষ সাহায্য। মুজাহিদ থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেন, সাকিনা ছিলো একটি ঝটিকা প্রবাহ। কালাবী বলেছেন, তার ছিলো দু'টিমস্তক এবং মুখাবয়ব ছিলো মানুষের মতো। হজরত আলী থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেন, সাকিনা একটি ঝটিকা প্রবাহের নাম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে সাকিনা হচ্ছে ওই স্বর্গীয় আধারের নাম, যেখানে নবীগণের অন্তঃকরণ প্রক্ষালন করা হয়ে থাকে।

'এবং মুসা এবং হারুন সম্প্রদায় যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে'- এখানে হজরত মুসা ও হজরত হারুনের নামের পূর্বে 'আল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকম করা হয়েছে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। অথবা আলু মুসা ওয়া আলু হারুন বলে নির্দেশ করা হয়েছে

বনী ইসরাইলদের পরবর্তী নবীগণকে। পরবর্তী নবীগণ ছিলেন তাঁদের পিতৃব্যের বংশধর। কেউ কেউ বলেছেন, ওই সিন্দুকে ছিলো তওরাতের অক্ষত ও বিক্ষত ফলকসমূহ। ছিলো হজরত মুসার যষ্টি; উভয়ের পাদুকা, হজরত হারুনের পাগড়ী, লাঠি এবং কিয়ৎ পরিমাণ মান্না। পরবর্তীতে বনী ইসরাইল হয়ে পড়লো অবাধ্য। ধর্মের নামে সৃষ্টি করলো নতুন নতুন মতবাদ। বায়তুল মাকদিসকে করে ফেললো অপকর্মের কেন্দ্রস্থল। তখন একদিন আকস্মাৎ উধাও হয়ে গেলো সিন্দুকটি। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহপাক সিন্দুকটি আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে- বিজয়ী শত্রুরা অধিকার করেছিলো ওই সিন্দুকটি।

'ফেরেশত্াগণ ইহা বহন করে আনবে।'— এ কথায় বুঝা যায় সিন্দুকটি আল্লাহ্পাকই আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তাই ফেরেশতার মাধ্যমে পুনরায় পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। আর বিজয়ী শত্রুদের সিন্দুক দখল সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে এরকম- তারা সিন্দুকটি স্থাপন করলো তাদের প্রতিমা গৃহে। ওই সিন্দুকের উপরেও তারা স্থাপন করলো একটি প্রতিমা। কিন্তু দেখা গেলো সিন্দুকটি রয়েছে প্রতিমার মস্তকের উপর এবং অন্য সকল প্রতিমা ভেঙে চুরমার হয়ে আছে। তখন তারা সিন্দুকটি স্থাপন করলো একটি গৃহাঙ্গণে। কিন্তু দেখা গেলো সে গৃহের সকল লোক মরে পড়ে আছে। মহাবিপদে পড়লো আমালিকেরা। তারা তখন সিন্দুকটি পাঠিয়ে দিলো দূরের একটি গ্রামে। সেখানে প্রাদুর্ভাব ঘটলো একটি ইঁদুরের। গ্রামবাসীরা রাত্রে শয্যাগ্রহণ করলে বের হতো ইঁদুরটি। সকালে দেখা যেতো রাতের মধ্যে ঘুমন্ত মানুষের নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলেছে ইঁদুরটি। তাদের কাছে এক বন্দিনী বনীইসরাইল রমণী তখন বললো, এই সিন্দুকটি যতোদিন তোমাদের কাছে থাকবে ততোদিন এ রকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে। কাজেই ভালো যদি চাও তবে শীঘ্রই সিন্দুকটি কোথাও রেখে এসো। গ্রামবাসীরা তখন সিন্দুকটি একটি বৃষভযানে স্থাপন করলো। তারপর গাড়ীটি হাঁকিয়ে দিলো দূর দেশের দিকে। অজানার দিকে এগিয়ে চললো তওরাতের সিন্দুকবাহী বলদ। আল্লাহ্পাক সেই গরুর গাড়ীর সঙ্গে নিযুক্ত করলেন চারজন ফেরেশতা। ফেরেশতারা বলদটিকে হাঁকিয়ে দিলো বনী ইসরাইলের জনপদ অভিমুখে। কেউ কেউ বলেছেন, সিন্দুকটি ছিলো তীহ্ মরুপ্রান্তরে। হজরত মুসা সেই সিন্দুকটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তা রেখে গিয়েছিলেন পরবর্তী নবী হজরত ইউশা বিন নুনের কাছে। তালুতের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সিন্দুকটি সেখানেই ছিলো। তালুতের রাজত্ব লাভের পর সেই সিন্দুকটি তাঁর গৃহে পৌছে দেয়া হলো।

'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে নিদর্শন।' এ কথাটি সম্ভবতঃ শামুয়েল নবীর। অথবা এটি আল্লাহ্পাকের একটি পৃথক বক্তব্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার লাঠি ও সিন্দুক রয়েছে বুহাইরা তিররিয়াত নামক স্থানে। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে সেগুলো প্রকাশিত হবে।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ
عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

❐ অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল সে তখন বলিল, 'আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে, আর যে কেহ উহার স্বাদ- গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সে-ও।' অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ যখন উহা অতিক্রম করিল তখন তাহারা বলিল, 'জালুত ও তাহার

সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই'; কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিলো যে আল্লাহের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহারা বলিল, 'আল্লাহের অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে!' আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

❒ তাহারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল তাহারা তখন বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য দান কর।

❒ সুতরাং তাহারা আল্লাহের অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে পরাভূত করিল; দাউদ জালুতকে সংহার করিল, আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব এবং হিক্‌মত দান করিলেন, এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী কলুষিত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়।

❒ এই সব আল্লাহের নিদর্শন; আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি, নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্যতম।

জনতা যখন সেই বিশেষ সিন্দুকটি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তাঁরা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত। তালুতের ডাকে তখন সকলেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। হজরত তালুত বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা অসংসারী ও সুঠামদেহী কেবল তারাই আমার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবে। মুকাতিলের বর্ণনানুযায়ী তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেছিলো সত্তর হাজার যুবক। তখন ছিলো তাপদগ্ধ গ্রীষ্মকাল। সেনাদল হজরত তালুতের নিকট নিবেদন করলো, আপনি আল্লাহ্পাকের অনুমোদনক্রমে একটি নদী প্রবাহিত করে দিন। হজরত তালুত বললেন, আল্লাহ্পাক এক নদীর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। হজরত তালুত যদি নবী হয়ে থাকেন, তবে তিনি সরাসরি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়ে এরকম বলেছিলেন; আর যদি নবী না হয়ে থাকেন তবে নবীর নির্দেশক্রমে একথা বলেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও সুদ্দী বলেছেন নদীটি ছিলো ফিলিস্তিনের। কাতাদা বলেছেন, জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী ছিলো নদীটি।

'ফাসলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বহির্গত হওয়া। আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে হজরত তালুত তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের জনপথ থেকে বর্হিগত হলেন। তখনই বললেন, আল্লাহ্পাকের পরীক্ষার কথা। আয়াতে উল্লেখিত 'ইব্‌তিলা' শব্দটির অর্থ পরীক্ষা। নদীটি ছিলো পরীক্ষার মাধ্যম। ওই নদীর মাধ্যমে অনুগত ও অবাধ্যদের পৃথক করে ফেলাই ছিলো আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। হজরত তালুত তাই বললেন, যে ওই নদীর পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে পান করবে না সেই আমার দলভুক্ত। আর যে মাত্র এক আঁজলা পান করবে সেও আমার দলে থাকতে পারবে। এখানে পান করা বুঝাতে 'তায়াম' শব্দটি ব্যবহৃত

হয়েছে। এর অর্থ কোনো আহার্য বা পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করা। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে বুঝা যায়, যারা মাত্র এক আঁজলা পানি পান করবে, তারাও হজরত তালুতের দলে থাকতে পারবে। কিন্তু যারা আদৌ পান করবে না তারাই হবে অধিকতর মর্যাদাশীল।

বিষয়টি বুদ্ধিগত দিক থেকে বিশ্লেষিত হলে প্রতীয়মাণ হবে যে, প্রচন্ড দাবদাহের সময় অধিক পানি পান করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। যারা এ রকম করবে তারা যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এমন কি এতে করে তাদের মৃত্যুরও সম্ভাবনা রয়েছে। হজরত তালুত তাই তাঁর সৈন্যদেরকে অতিরিক্ত পানি পান করতে নিষেধ করেছিলেন।

এক কোষ বা এক আঁজলা পানি বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, 'ইগ্‌তারফা' শব্দটি। হেজাজ ও বসরার অধিবাসীগণ শব্দটিকে উচ্চারণ করতেন 'গারফাতুন।' অন্য ক্বারীগণ পড়তেন 'গুরফাতুন'। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, আঁজলা ভর্তি করার সময় যে পানিটুকু হাতে থাকে সেটাই গুরফাতুন। আর সাধারণভাবে আঁজলা ভর্তি পানিকে বলে গারফাতুন।

এ রকম বলা যেতে পারে যে, পানি পানের মাধ্যমে পরীক্ষা করার বিষয়টি ছিলো আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকার শাস্তি। প্রচন্ড গরমের কারণে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েছিলো যোদ্ধারা। আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির অপেক্ষা না করেই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলো একটি নদীর জন্য। তাই ওই নদীর মাধ্যমেই তাদেরকে পরীক্ষারূপী শাস্তি দেয়া হয়েছিলো।

পিপাসিত সেনানীরা অধিকাংশই ধৈর্য ধারণ করতে পারলো না। তারা তাৎক্ষণিক পিপাসা নিবৃত্তির জন্য নদী থেকে পান করলো প্রচুর পানি। অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য কেবল দৃঢ়রূপে ধৈর্য অবলম্বন করলো। পানি পান করা থেকে বিরত রাখলো নিজেদেরকে। সুদ্দী বলেছেন, ওই ধৈর্যশীলদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। কিন্তু এ সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, আমরা কয়েকজন বলাবলি করছিলাম আমাদের বদর যুদ্ধের সৈন্য এবং তালুতের নদী অতিক্রমকারী সৈন্যদলের সংখ্যা ছিলো একই। তাঁরা ছিলেন মুসলমান। তাঁদের সংখ্যা ছিলো তিনশত দশের মতো। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো তিন শত তের জন। যাঁরা এক আঁজলা পানি পান করেছিলেন তাঁদের অন্তকরণও হয়েছিলো শক্তিশালী। পানির পিপাসা আর ছিলো না তাঁদের। আর যারা প্রচুর পানি পান করে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ লংঘন করেছিলো, তারা হয়েছিলো দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ। তাদের ওষ্ঠদ্বয় হয়ে গিয়েছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। তারা নদীর এ পারেই রয়ে গিয়েছিলো। নদী অতিক্রম করার সামর্থ তাদের হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, তারাও নদী অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলো। কিন্তু এই অভিমতটি বাস্তবসম্মত নয়।

নদীর ওপারে গমণকারী পরীক্ষিত সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, জালুত ও তার সৈনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নেই। পিপাসা, দুর্বলতা, অথবা সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের কারণে এক আজঁলা পানি পানকারীরা এরকম বলেছিলো মনে হয়। কিন্তু যাঁরা আদৌ পানি পান করেননি তাঁরা বলেছিলেন অন্য কথা। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা আয়াতে বলেছেন, কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিলো যে, আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বললো, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ধৈর্যশলীদেরকে সাহায্য করতে ও প্রতিদান দিতে সদা বিদ্যমান। সুফী দার্শনিকগণ বলেছেন, আল্লাহ্পাকের এই সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারটির অবস্থানগত কোনো রূপ নেই। বিষয়টি ধারণার অতীত।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, তালুত বাহিনী যখন জালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সমরপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন তখন বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো। অবিচলিত রাখো আমাদের পদদ্বয়কে এবং আমাদেরকে সাহায্য দান করো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। — নবী ও পুণ্যবানদের রীতি এরকমই। সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে তাঁরা এভাবেই আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ্র অনুমতিসাপেক্ষে শত্রুদেরকে পরাভূত করলো। দাউদ নামের এক বীর সেনানী সংহার করলো জালুতকে। আল্লাহ্ তখন দাউদকে দান করলেন কর্তৃত্ব ও হিকমত। এবং তিনি যে রকম ইচ্ছা করলেন, সেরকমই শিক্ষা দিলেন তাঁকে। হজরত দাউদ, তাঁর পিতা ও তাঁর তেরোজন ভ্রাতা ছিলেন হজরত তালুতের সেনাবাহিনীর সদস্য। তাঁরা সকলেই নদী অতিক্রম করে হজরত তালুতের সহগামী হয়েছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন দাউদ। তিনি চারণ ভূমিতে ছাগল চরিয়ে বেড়াতেন। আল্লাহ্পাক বনী ইসরাইলের নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই ছেলেটিই জালুতের জীবনাবসান ঘটাবে। পথিমধ্যে তিনটি পাথর দাউদকে বলেছিলো, তুমি জালুতের জীবন সংহারক। দাউদ পাথর তিনটি তুলে নিয়ে তাঁর ঝুড়িতে রেখে দিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে হজরত তালুত তাঁকে দিতে চাইলেন একটি অশ্ব, একটি জেরা ও একটি তলোয়ার। কিন্তু দাউদ সেগুলো গ্রহণ করলেন না। বললেন, আল্লাহ্পাক যদি আমাকে সাহায্য না করেন তবে এগুলো কোনো কাজেই আসবে না। শুধুমাত্র ঝুলিটি সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে জালুতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হজরত দাউদ। তিনি ছিলেন খর্বাকৃতি, রোগাটে ও হরিদ্রাভ বর্ণবিশিষ্ট। আর জালুত ছিলো প্রচন্ড শক্তিশালী, ক্ষিপ্র ও উদ্ধত। অনেক সৈনিককে একাই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতো সে। কিন্তু দুর্বল দাউদকে দেখে কেনো যেনো ভীত হয়ে পড়লো সে। বললো, কে তুমি? পাথর নিয়ে কুকুর তাড়াতে এসেছো না কি? হজরত দাউদ বললেন, তুমি কুকুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তারপর একে একে

তিনটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন তিনি। ছুঁড়ে মারলেন ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতিপালকের নামে। পাথরগুলো জালুতের মস্তিষ্কের সম্মুখ দিকে প্রবেশ করে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেলো। এভাবে জালুতবধ সম্পন্ন হলো। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে হজরত তালুত তাঁকে আপন কন্যা দান করেছিলেন।

হজরত তালুতের মৃত্যুর পর আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে রাজত্ব দান করেছিলেন। আয়াতে সে কথা বুঝাতে বলা হয়েছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দানের কথা। আরও দান করেছিলেন হিকমত অর্থাৎ নবুয়ত। বনীইসরাইলদের মধ্যে এককভাবে রাজত্ব ও নবুয়তের সর্বপ্রথম অধিকারী ছিলেন তিনি। ইতোপূর্বে রাজবংশ ও নবীবংশ ছিলো পৃথক। আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে দান করলেন যবুর শরীফ। তিনি হাত দিলে লোহা মোমের মতো গলে যেতো। এটা ছিলো আল্লাহ্পাক প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন (মোজেজা)। কিন্তু রাজত্বাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপন হস্তে উপার্জন করতেন তিনি। সেই উপার্জনেই ব্যয় নির্বাহ করতেন সংসারের। হজরত মেকদাদ বিন মা'দী কারাব বলেছেন— রসুল পাক স. এরশাদ করেন, আপন হস্তে উপার্জনের মাধ্যমে সংগৃহীত আহার্যের চেয়ে উত্তম আহার্য নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ নিজ হাতে উপার্জনের মাধ্যমে ক্রয়কৃত আহার্য ভক্ষন করতেন। বোখারী। আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে পাখির ভাষা এবং পিপীলকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তদুপরি দান করেছিলেন চিত্তহরণকারী কণ্ঠস্বর। অনেকে বলেছেন, তিনি যখন যবুর শরীফ পাঠ করতেন, তখন অরণ্যের পশুকুল তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে যেতো। মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করতো পক্ষীকুল। থেমে যেতো প্রবহমাণ স্রোত। থমকে দাঁড়াতো বাতাস। রসুল পাক স. হজরত আবু মুসা আশআরীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আবু মুসা, তুমি দাউদ বংশের ভূবনমোহিনী কণ্ঠস্বরগুলোর একটি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত দাউদের প্রতি আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ সমূহের বর্ণনার পর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেতো। একথার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্পাকের মানবতা রক্ষার চিরাচরিত রীতি। এই রীতির মাধ্যমেই সত্যানুসারীরা প্রতিহত করে থাকে সীমালংঘনকারীদেরকে। এই শাশ্বত রীতি প্রবর্তিত না হলে অবিশ্বাসীরা ও পৌত্তলিকদের দল পৃথিবীতে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে বসতো। ধ্বংস করে দিতো নগর, বন্দর, জনপদ। শুরু করতো বিরতিহীন হত্যাযজ্ঞ। ধুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতো উপাসনালয়গুলোকে। আল্লাহ্পাকের গুণকীর্তনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিতো তারা। চিরপ্রতিবন্ধক হয়ে যেতো ইমানের, ইবাদতের। এ রকম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ। আল্লাহ্পাকের এই অনুপম নীতিমালার মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অনাসৃষ্টির বিলোপ সাধনার্থেই আল্লাহ্পাক জেহাদকে ফরজ

করেছেন। 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন' আয়াতের আলোচনায় এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

কতিপয় ভাষ্যকার আলোচ্য আয়াতটির এ রকম অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্পাক যদি বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের মাধ্যমে কাফের ও ফাসেকদেরকে শায়েস্তা না করতেন তবে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতো। আবদুর রহমান বিন আহমদের সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর অসিলায় তার এক শত প্রতিবেশীকে নৈসর্গিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখেন আল্লাহ্পাক। এরপর রসুল স. এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নামাজী, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও নিষ্পাপ পশুকূল না থাকলে তোমাদের উপর নেমে আসতো সীমাহীন শাস্তি।

শেষে বলা হয়েছে— কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, নবুয়তের মাধ্যমে প্রদত্ত মঙ্গল বা কল্যাণের কথা। আর ইঙ্গিত করা হয়েছে এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত ঘটনাবলীর দিকে। হজরত তালুত, বিশেষ সিন্দুক, জালেম জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, জালুত বধ, হজরত দাউদ, তাঁর রাজত্ব ও নবুয়তপ্রাপ্তি ইত্যাদি কল্যাণদায়ক সকল ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এ কথায়।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এসব হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন; আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি, নিশ্চয়ই তুমি রসুলগণের অন্যতম।' —একথার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে রসুল মোহাম্মদ স. এর নবুয়তের অবিসংবাদিত প্রমাণ। অবিশ্বাসীরা বলতো, আপনি আল্লাহ্র নবী নন। তাদের সেই হঠকারিতার প্রতিবাদে এখানে 'ইন্না' (নিশ্চয়ই) শব্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.এর রেসালতের অকাট্য প্রমাণপঞ্জি। তিনি ছিলেন উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। তিনি কোনো বই পুস্তক পাঠ করেননি। খৃষ্টান কিংবা ইহুদী পন্ডিতের সংসর্গেও যাননি। অথচ তিনিই আবৃত্তি করে চলেছেন আদিকালে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে। আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি। আল্লাহ্পাকই তাঁর প্রিয়তম রসুলের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণের বিস্মৃত ইতিহাস। সুতরাং আল কোরআনের বাহক এই সর্বশেষ রসুল সম্পর্কে কোনোপ্রকার সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যায় কি?

প্রথম খন্ড শেষ